একশ বছরের নির্বাচিত সেরা প্রেমের গল্প

সম্পাদনায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ও

জগন্নাথ প্রামাণিক
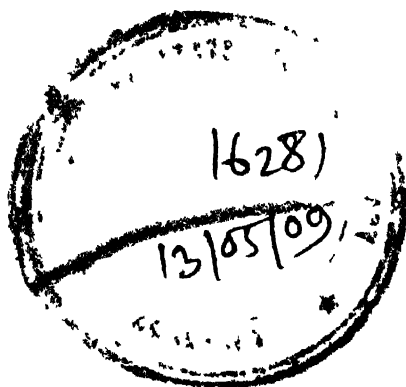
বীণা লাইব্রেরী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

AKSO BACHARER NIRBACHITA SERA PREMER GALPA
EDITED BY
SUCHITRA BHATTACHARYA
&
JAGANNATH PRAMANIK
Rs.150.00

❖ **প্রকাশক ঃ**
তপন কুমার দাস
১২৭/১১ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া - ১

❖ **প্রথম প্রকাশ ঃ** কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৬৪
❖ **দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ** জানুয়ারি ১৯৬৫

❖ প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

❖ **বর্ণগ্রন্থন ঃ**
দি একজিকিউটিভ প্রিন্টার
৩৭, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

❖ **মুদ্রক ঃ**
সুবোধ প্রেস
৬, ডালিম তলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❖ **মূল্য ঃ একশ পঞ্চাশ টাকা মাত্র।**

সূচিপত্র

মাল্যদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে একদিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধু-ধু করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গিয়াছে—সেই পথ বাহিয়া বোঝাই খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, কী যতান, পূর্বজন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি।'

যতিন কহিল, 'কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগ্য যে, ভা৷৭৬৮ ২৯৬লই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।'

আত্মীয়-সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে—তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না—আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতো করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি—কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায়, সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমাব গা জ্বালা করে।'

যতীন হাতজোড় কবিয়া কহিল, 'থাক্ থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্‌কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।'

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পাটনা এসোই না।

যতীন। না না, একটা কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিযাছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।—বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বারবার একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়োর কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পবিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তাহা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল—ওর ঐ রকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না—অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতার আবগারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবগাবি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিযা যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, 'ও কুড়ানি।'

মেয়েটি কহিল, 'কী, দিদি।'

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, 'কেমন, ভালো দেখিতে না?'

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হাঁ, ভালো।'

যতীন লাল লইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, 'আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি করিতেছ।'

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, 'ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনি তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাল্গুন-চৈত্রে লগ্ন নাই—এখনো হাতে সময় আছে।

ব্যাপাটেল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স কুড়ানির হইবে, শরীর ছিপছিপে—মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে পটল-একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষাতাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে—কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণ মাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

স্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, এই যে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটার প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাহেব জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে—আমাকে দিদি বলিস। পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোন কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুলসী, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন তো।'

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনেব উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, 'বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছলছল করিতেছে—এখনো শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয নাই। ও কিছুই বোঝে না—উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনেব হরিণী।'

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠাপ্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, 'শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।'

পটল ফস করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তাব

পরীক্ষা দেখিতে চাও?'

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, 'ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?'

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, 'হাঁ।'

পটল কহিল, 'আমার ভাইকে তুই বিয়ে করবি?'

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, 'হ্যাঁ।'

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'আঃ পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করি' ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

হরকুমার কহিলেন, 'নহিলে আমিও যে উহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে—তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।'

পটল। ঐ জন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে—ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই—আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কমই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল—ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গুনের এই কূজন গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া

পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে, শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতল করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছে, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বার বার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, হরকুমারবাবু ছটফট করিতেছেন, তুমি যাও পটল।'

পটল কহিল, 'পরের দোহাই দিবে বৈকি। ছটফট কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে।'

যতীন। 'আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, 'তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধূলা নে।'

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধূলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'থাক থাক, কাজ নাই।' কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদবর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল, 'পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও, তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম।'

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে

কি না ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, 'কেমন ধরা পড়িয়াছ।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে—পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আমাদের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।' কুড়ানিকে বলিল, 'ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না।'

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত সংকুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'কুড়ানি, দেখ তোমার মালা দেখি।' বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটা আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে—'পালাইলাম। শ্রীযতীন।'

'ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!' বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর। রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাব ভিতরদিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের সংগত কোনা অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরব-মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটিকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতবে যে একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—ভূমিতলে পুঞ্জীভূত

সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, 'লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।'

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'ও কী হইতেছে, কুড়ানি।'

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও পোড়ামুখি সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস।

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, 'এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।'

হরকুমার কহিল, 'তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।'

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কি বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল।'

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, 'কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুষ্টু, কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তাহার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না। তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা। তাকে মাপ কর।'

কিন্তু, কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ, সুপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন-গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানিব সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবার প্লেগ-দমনের বিভীষিকায়

এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষু-দুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া ধরিল কোথায়। যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটি সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরীর মতো আকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল, 'কুড়ানি'—তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল—যতীনকে সে চিনিল এবং তখনি তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখ-দুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, 'কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।'

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনেব মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও

চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখ-দুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাতধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'আমি আবার এখনি আসিব কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।'

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিণীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোকে বিকীর্ণ করিয়াছিল—ব্র্যাকেটের উপরে একটি ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিকটিক শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, 'তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।'

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ভালো বোধ হইতেছে?'

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, 'হ্যাঁ।'

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিকটিক শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা—নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন রৌদ্রের আলোকে, কোন রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, 'তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না, তখনি একটি গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।'

পটল হরকুমারকে কহিল, 'চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।'

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আশা আছে?'

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল যতীন সত্য বলো। তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।'

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, 'কুড়ানি, কুড়ানি।'

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, 'কী. দাদাবাবু।'

যতীন কহিল, 'কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।'

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, 'তোমার মালা আমাকে দিবে না?'

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, 'কী হবে, দাদাবাবু।'

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।'

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিযা হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানির গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'কুড়ানি।'

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, 'কী দিদি।'

'পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই বোন?

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমলদৃষ্টিতে কহিল, 'না দিদি।'

পটল কহিল, 'যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।'

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানা বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক এক গাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, 'যতীন।'

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইযা পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই—কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল; 'বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।'

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

ছবি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজরানী ছিল, পাত্রমিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; তখন পর্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনি বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্বে পেগুর ক্রোশ-পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকাকড়ি, মস্ত জমিদারি।এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছে ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে-সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশি বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকেই তাঁহার যথাসর্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাঁধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এতবড় সুযোগই তিনি এ জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁহারও ওপারের শমন আসিয়া পৌঁছিল এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ, বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইঁহার মৃত্যু-উৎসব শুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল এবং নীচে খেল্যধূলা, নৃত্যগীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোনমতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

দুই

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুশী হইয়া রাজ-হস্তের

বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকার-সূত্রে মা-শোয়েই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশী লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এতবড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিযাছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর—সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিন দেশের রানী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁর অনেক রানী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁদের কারও আছে? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

তিন

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।

বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজসজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়দৌড়? যে জয়ী হইবে সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে!

কৈ তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই-নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী—হয়ত বা-থিন দুই-চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটি ছবির পানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক।

বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও—তুমি কাহারও কলঙ্ক নয়,—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি দুচক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয়ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন?

এই ছবিখানি পাঁচদিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতবাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন একথার কোন উত্তর দিল না। পিতৃ ঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, আমাকে বিক্রি করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিযা জিজ্ঞাসা কবিল, কিন্তু করিবে কি?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুনি আছে সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তারপর?

তারপরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তারপরে?

তার পরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে?

তারপরে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গেছে—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ, সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাবো না।

যাবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদগ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তিভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই—আমি যাবো না!

ছিঃ—

তবে তুমিও চল!

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্যভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি ম্লান করিরা কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

একমুহূর্ত বা-থিনের কর্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষণ্নমুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিযা সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চার

প্রায় অপরাহ্ণবেলায় মা-শোয়ের রূপা-বাঁধানো 'ময়ূরপঙ্খী' গোযান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে

হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোশাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়া ছিল। দেখিলে মনে হয় আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল, এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া কয়জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্তদেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদসিক্ত হস্তে তাহার শিরে জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়িতে স্থান দিল এবং সজলকণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর, কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়।

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্বল, কোমল ও সর্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর-আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ কবিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহু লোক ভিড় করিয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিযা নীরবে চাহিয়া বহিল।

পাঁচ

সান্ধ্যভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল কাল সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উলটা রকমেব হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই

সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে-সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমনি অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গতরাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথম মা-শোয়ের ঐশ্বর্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারের সম্ভ্রমের কথা—এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ-সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্যের আলোচনা শুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ এবং যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না। এবং আলাপ শেষ হইলে, পো-থিন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে, তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাসি-তামাশা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য গীতের সঙ্গে যখন খাওয়াদাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে-সকল যেন কত যুগের পুরানো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যানপ্রান্তের একটা নির্জন গৃহে এখন নির্বিঘ্নে আছে,—আজিকার এতবড় মাতামাতির

লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয়ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

ছয়

চিরদিনের অভ্যাস, প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল; কিন্তু কাছে বসিয়াও আর একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকী কত?

অনেক।

তবে, এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই—আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার জামা-কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে, মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেমন নীচ তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনাদোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমাব ঘর থেকে আমি চিরকালের জন্য সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযত-স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহাব পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানেব জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে কোন কারণেই কাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালবাসা একদিনেই যে এতবড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসিয়া দেখিয়া মা-শোয়েব দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা হলে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত-নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

সাত

শিশুকাল হইতে যে দুইজনের কখনও একমুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার নবীন উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেকদিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযতচিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া, অনেক ভাঙ্গা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইত, এতদিন শুধুমাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন-কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া আছে—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি-উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত, সেও মানুষ—সেও ঈর্ষার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয়ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্ত শয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি

জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক সে-সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল, কিছুই না—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহাব কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গেছে—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি-উৎসবের বিরাট আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানাঘুষাও চলিতেছিল যে একদিন এই লোকটাই এ বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সেদিন বড় বেশী দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—চারিদিকেই আনন্দ-কলরব। শুধু যাহার জন্য এই-সব সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো চোখেই প্রায় পড়িল না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-একজন সাবেকদিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে-লোক নাই, সে মালা নাই; সে-আশীর্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা, কৈ তাহাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্য গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে তাহার বাড়ি যাও—আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দু'জনকে আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিযাছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি এক প্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা-গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইযা সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিযা গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাই হোক, তোমার অতিথি। একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গেছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও ত লোক আছেন, তাঁরা ত কথা বলিতে পারেন! বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গেছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল! নইলে তুমিও ত তাঁকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে!

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-দুই পরে টের পাইল; আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে-লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূলকিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। একমাসের অধিককাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজ-দরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র-সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিযা সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আব তাহার বুঝিতে বাকী নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য বাহিরে টানিযা আনিযাছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিযাছে—সে জাতকেব গোপা নহে, সে তাহার-ই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন কবিয়া বিড়ম্বিত কবিলে, তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!

নয়

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা কব্রেন মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয তবে

দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

একজনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলিল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাহি না।

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ একমুহূর্তে উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না—একটা কড়ি পর্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেমনি করিয়া। আজই এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত। সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে: তাহার পরে যেমন করিয়া খুশি, যত খুশি রক্ত শুষিবেন, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ, গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব হইবে না, সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কতবড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কথা কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দশ

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র কিছু একটা করা চাই।

একদিন নাকি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময় ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা-কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কিনা। গ্রামের মধ্যেই একজন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে

সর্বস্ব বিক্রি করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল,কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর অজ্ঞাতসারে কতবড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেইদিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটির সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কানাকড়ি নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল।

বা-থিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাতদিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত শুষ্ক মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পেলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে। বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না।

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গোযান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, পেগুতে কে যাবে? গাড়ি কার? কোথায় এত টাকা পেলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুকনো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার --

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ, এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাশে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু-কণ্ঠে কহিল, ব'সো। বলিয়া সে নিজেই

বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে।

বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশীদিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও-সব আর একদিন শুনিব। টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন ঢেক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ-হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার হাত ধরিল।

এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা একমুহূর্তেই একেবারে পবিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে-মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান—কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহাব পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিযাই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এ ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মরফোলজি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মলার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে যেদিন ঢুকি সেদিনই প্রথম দেখা। আমি আই-এসসি পাশ করে মেডিকেল কলেজে ঢুকেচি, বয়েস উনিশ.

চোখে প্রথম যৌবনের রঙীন নেশাটেশা একেবারেই ছিল না বললে ভুল বলা হবে, যতই কেন অধ্যয়নপরায়ণ ভালো ছেলে হই না কেন। সেই নেশার ঘোরেই বোধহয় নির্মলাকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হলো প্রথম দর্শনেই। ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে, টানা-টানা চোখ, জোড়া ভুরু, দিব্যি দেখতে মুখখানি। নীল রংয়ের শাড়ী পরণে, গায়ে ফুল-হাতা ব্লাউজ, সরু চুড়ি ক-গাছা হাতে। চোখে মুখে একটা দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ। নারীসুলভ লজ্জা তার মধ্যে মোটেই নেই। আছে বিদ্রোহিনীর উগ্র চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হোত ওর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি পুরুষজাতকে চ্যালেঞ্জ করচে যে, আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে এসো না, আমি সে ধরনের মেয়ে নই। খবরদার!

সেইজন্যেই যত দিন যেতে লাগলো তত আমি ওর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলাম। তখন জানি নে, যে, আমার জীবনটা একেবারে মাটি করে দেবার জন্যে ও এসেচে। কার জন্যে আজ আমি এই পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করেও অকৃতদার, সন্তান-সন্ততিহীন, ছন্নচাড়া, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ? কার জন্যে সারা জীবন তৃপ্তি পেলুম না, সুখ পেলুম না, আপনার বলতে কাউকে পেলুম না, টাকা রোজকার করতে হয় করে যাচ্ছি, খেতে হয় খেয়ে যাচ্চি, কলেজে অধ্যাপনা করতে হয়, করে যাচ্চি, জীবনের না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না আছে কোনো অবলম্বন।

শুনেছি অনেকের এরকম হয়, প্রেমের নেশায় পড়ে অল্প বয়সে, সে নেশা কাটিয়েও ওঠে। কিন্তু আমার মত এমন উচ্ছন্ন যায় কে?

যাক সে সব কথা।

কেমন করে কি হোল বলি।

আমাদের ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। কেউ বি-এসসি কেউ আই-এসসি পাশ করে এসে মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। পাঁচটি মেয়েকে আমার আজও বেশ মনে আছে। একজনের নাম শকুন্তলা সেন, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, বড়-বড় চোখ ও মুখশ্রী মন্দ নয়—হাতের কব্জির কাছটা বড্ড মোটা বলে মনে হোত। শকুন্তলা ছিল বড় শান্ত মেয়ে, কোনোদিকে চাইতো না, একমনে প্রোফেসরের বক্তৃতা শুনে নোট করে যেতো। একজনের নাম সুনীতি, তার উপাধি আমার মনে নেই, ওর রং ছিল খুব ফর্সা গোল চাঁদের মত মুখখানা, ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে, ক্লাসের ছেলেদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতো। একটির নাম ছিল মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—সেকেলে নাম কিন্তু বড্ড একেলে মেয়ে—সুন্দরী হিসেবে মন্দ নয়, অতি চমৎকার গঠন-পারিপাট্য শরীরের, খুব শৌখীন, চোখে চশমা, কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়তো, এটিও ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে। মহামায়ার সঙ্গে একসঙ্গে আসতো, ওরই কি রকম বোন

হয়, চপলা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখতে শুনতে মহামায়ার চেয়েও ভালো, কিন্তু বড় নিরীহ, ভালমানুষ, সাত চড়ে কথা বের হোত না। আর একটি গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, ওর নাম বেলা চক্রবর্তী। মোটাসোটা, ফর্সা সাদাসিদে সূতীর শাড়ী পরে আসতো, সাদা ব্লাউজ ফুল হাতা—সকলের সঙ্গে মিশতো সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলতো—বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম বলেই মনে হোত! এদের সকলের বয়স উনিশ-কুড়ির মধ্যে। সেদিক থেকে আমরা প্রায় সকলে সমবয়সী, এক-আধ-বছরের বেশি বা কম, শকুন্তলা ছাড়া, তার বয়েস ছিল আমাদের চেয়ে তিন-চার বছর বেশি। আমরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলতাম—শকুন্তলাদি।

যেমন হয়ে থাকে। ক্লাসসুদ্ধু ছেলে ঝুঁকে পড়লো মেয়েদের দিকে। যে যার সঙ্গে জমিয়ে নিতে পারে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। মাস দুই অগ্রসর হয়নি, ফার্স্ট ইয়ার এম-বি ক্লাস। এরই মধ্যে বেধে গেল প্রণয়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝগড়া, রেষারেষি। এক এক মেয়ের পেছনে চার-পাঁচটি বা ততোধিক ছেলে। থার্ড ইয়ার ক্লাসে সেবার বিখ্যাত সুন্দরী ফিরিঙ্গি মেয়ে মিস ইভশ্যাম পড়তো— আমরা কলেজে ঢুকেই শুনি, মেডিকেল কলেজসুদ্ধ ছাত্র তার জন্য পাগল। এই ফিরিঙ্গি মেয়েটির নাম চিরকাল লেখা থাকা উচিত মেডিকেল কলেজের অলিখিত ইতিহাসে। অন্ততঃ দুটি আত্মহত্যা ও বহু সংখ্যক উচ্ছন্ন যাওয়ার জন্যে এই মেয়েটি দায়ী। চার-পাঁচটি পিতার বিষয় পুত্র কর্তৃক সমর্পিত হয়েচে এই দেবীর বেদীমূলে অর্ঘ্যস্বরূপ। তবুও এঁর আকাঙ্ক্ষা মেটেনি!

আমি মিস ইভশ্যামকে দেখলুম কলেজের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রীদের গ্যালারীতে। এই প্রথম তাকে দেখি—খুব চটকদার সুন্দরী বটে। বয়েস বাইশের বেশি নয়। বিদ্যুৎলতা। তবে আমি দূর থেকে দেখেছি এই পর্যন্ত। আরও অনেকবার দেখেচি, লম্বা করিডরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে—কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইবার বা নড় করবার মত সহৃদয়তা মিস্ ইভশ্যামের ছিল না। ফার্স্ট বা সেকেণ্ড ইয়ারের কোনো ছেলেকে সে পুছতো না। কেনই বা পুছবে? তার স্তাবকবর্গের মধ্যে পাশ-করা হাউস-সার্জনরাও ছিল, উঁচু ক্লাসের ধনী ছাত্র ছিল, শোনা যায় দু-একজন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমি ছিলাম লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। আই-এসসিতে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু বুঝতামও না, মেযেদের সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে যেতেই চিরদিন অভ্যস্ত। লজ্জায় চোখ তুলে অপরিচিতা মেয়েদের দিকে চাওয়া ছিল আমার পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার। আজকার দিনের কথা নয়, কথা হচ্ছে আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে। তখন মেয়েরা বেথুন কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজে পড়তো না—আর পড়তো মেডিকেল কলেজে। মেয়েরা তখন অনেক ছাত্রের কাছেই অন্য জাতের জীব বা দেবী-টেবী বলে গণ্য হোত।

মেডিকেল কলেজে ঢুকে প্রথম সহপাঠিনীরূপে ওদের পেয়ে—ছাত্রদল যদি ঝুঁকে পড়েই ওদের দিকে, ওদের নিয়ে যদি বাধিয়ে দেয় হুড়োহুড়ি—তবে আশ্চর্যের কথাটা এমন কি?

এই আবহাওয়ার মধ্যে আমি ভালোছেলে রূপে ফার্স্ট ইয়ারের তিন-চার মাস

দিলাম কাটিয়ে। এর মধ্যেই নির্মলাকে নিয়ে ক্লাসে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে। ধনী ছাত্র শশধর মুহুরী নির্মলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই চ্যালেঞ্জপূর্ণ উগ্র দৃষ্টির সামনে এতটুকু হয়ে গিয়েচে। আরও কয়েকটি ছাত্র চোখরাঙানি খেয়েচে রীতিমত। অথচ ওরাই মহামায়াকে বা সুনীতিকে নিয়ে মটরবিহার করতো, কলেজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে খেতো, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গে করে ট্রামে উঠতো।

আমার কি ছিল, ক্লাসে এসে নির্মলার দিকে চেয়ে থাকতাম যখনই সুবিধা হোত চেয়ে দেখবার। ভয় হোত, বুক টিপ টিপ করতো, পাছে নির্মলা কিছু মনে করে। একদিন আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ওব সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেও এক অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য ব্যাপার! আমি ওব দিকে চাইতে গিয়ে দেখি ও-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার আগে থেকেও ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন নির্মলা আমার দিকে চেয়ে আছে?

আমাকে কি ওর ভাল লাগে?

নইলে কেন আমার দিকে চাইলে ও!

আমার চেহারা বলতো সকলে ভালো। চিরকাল শুনে এসেছি এই কথা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখ থেকে। আয়নায় নিজের চেহাবা দেখেও খারাপ মনে হয় নি কোনোদিন। দেখতে ভালো বলে বিয়ের সম্বন্ধও দু-একটি আসতে আরম্ভ করেছিলো বড় ঘর থেকে। আমাদের অবস্থাটাও ভালো, কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী, ভাড়া থেকে মাসিক আয় হোত মন্দ নয়। তারপর আমিও স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। পড়াশুনোয় নামকরা ভালো ছেলে। বিয়ের সম্বন্ধ আসবার অপরাধ কি?

একদিনের কথা আমার মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের দিন। কেমিস্ট্রি ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমেচি, উদ্দেশ্য কলেজ রেস্টুরেন্ট থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবো, এমন সময়ে হঠাৎ আমার পেছনে কে মৃদুস্বরে ডাকলে—

—শুনুন—

আমি চমকে উঠে পেছনে চাইলুম।

নির্মলা!

নির্মলা আমায় ডাকচে!

আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। না আর কেউ কোনোদিকেই নেই তো? আমাকেই ডাকচে বটে।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—আমাকে ডাকচেন!

নির্মলা বোধ হয় আমার আনাড়ি ও আড়ষ্ট ভাব দেখে হাসতে যাচ্ছিল, হাসির রেখা ওর মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললে—আপনাকেই ডাকচি—

—ও, বলুন—

—আপনি প্রফেসর গুপ্তের নোট টুকেচেন?

—হ্যাঁ, টুকেচি।

—খাতাখানা কাইগুলি দেবেন একদিনের জন্যে? কালই ফেরত দেবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এই নিন। আপনি যে ক-দিন ইচ্ছে রাখতে পারেন।

—না, আমি কালই ফেরত দেবো। থ্যাঙ্কস্।

আমি যে সময় ওর হাতে খাতা দিচ্ছি, ঠিক সেই সময় আমাদের ক্লাসের বিশ্ব-বখাটে ছোকরা সোমেশ্বর গুহঠাকুরতা অদূরে আবির্ভূত হোল, কোথা থেকে কি জানি!

পায়ের শব্দে নির্মলা খাতা নিতে নিতে যেন চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই খাতা নিয়ে আর কোনো কথা না বলে হন হন করে চলে গেল।

সোমেশ্বর আমার কাছে এসে দাঁত বের করে হেসে বললে—কি বাবা ভাল ছেলে, ডুবে-ডুবে জল খাওয়া?

আমার রাগ হোল, লজ্জাও হোল। সোমেশ্বরের সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। অত ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া দেখে আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে ঘৃণা করতাম। ওরাও ভালো ছেলে বলে আমায় ঘৃণা করতো। সব কলেজেই বখাটে ছেলেরা ভালো ছেলেদের ঘৃণা করে থাকে।

আমি বললাম—কি?

—মানে, ধরে ফেলেচি। নির্মলা সরকারের সঙ্গে জমালে কবে থেকে তলায়-তলায়?—হুঁ হুঁ বাবা—হাতে-হাতে ধরে ফেলেচি আজ—

—কি বলচেন বাজে কথা? উনি আমার কাছে আজই কেমিষ্ট্রির নোট চেয়ে নিলেন।

—আজই? মানে আজই? সোমেশ্বর শর্মা যেদিন দেখে ফেলেচে সেই দিনই?

—সত্যি বলচি।

—বেশ বাবা বেশ। তবে বলে দিচ্চি, বেশি ওদিকে নজর দিও না। হরিপ্রসাদকে চেনো তো? হরিপ্রসাদ ডুয়েল লড়বে তোমার সঙ্গে। সে বড়লোকের ছেলে, নির্মলার জন্যে সে নিজের জমিদারী বিলিয়ে দেবে বলেচে। পয়সা খরচ করতে সে হটবে না।

—বাপের জমিদারী আমারও আছে জেনে রাখবেন।

কথা শেষ করে আমি রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলাম। ওদের মত ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। কলেজ থেকে বের হয়ে একটা নির্জন স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলুম গড়ের মাঠে! চিনেবাদাম চিবুতে-চিবুতে কতক্ষণ ভাবলাম আজকার কথাটা। নির্মলা সরকার কি ধরনের মেয়ে আমি জানি। সে দেবী, আমার চোখে অতি পবিত্র। তার নামে কেউ কিছু বললে আমার সহ্য হয় না। এতো মেয়ে তো আছে কলেজে কিন্তু ওকে আমার অত ভাল লাগে কেন? এর জবাব নেই।

সেই নির্মলা আজ আমার সঙ্গে কথা বলচে? নিজের থেকে? নোট চেয়ে নিয়ে গেল? কেন আমারই নোট নিয়ে গেল, কলেজে তো কত ছেলে রয়েচে? ভালো ছেলে বলে নিয়ে থাকে যদি। মধুপ্রসাদ বা মাধোপ্রসাদ বলে একটি জৈন ছাত্র নাকি আমার চেয়ে ভালো—অবিশ্যি এটা শুনেচি আমি তাদের কাছে, যারা ক্লাসে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে খুশী হয়। যাই হোক সে রয়েছে তো?

আজ কি সুন্দর দিনটি আমার! কার মুখ দেখে না জানি উঠেছিলাম।

পরিদিন রবিবার নেশার ঘোরে সারাদিন কেটে গেল। আমার মনে সেই এক ভাবনা—নির্মলা আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলেচে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। চলে যাবো বহুদূর বিদেশে। অনেকদিন পরে ফিরে আসবো। ওকে দেখিয়ে দেবো আমি কত বড় ত্যাগী। হঠাৎ আমায় দেখে ও অবাক হয়ে যাবে।

এ সব সঙ্কল্প অবশ্য সঙ্কল্পই থেকে গেল! সোমবার ক্লাসে আবার ওর সঙ্গে দেখা হোল। সহজভাবেই ও আমায় খাতা ফেরত দিলে এবং আমিও সহজভাবে নিলুম।

এর পরে মাঝে মাঝে ও আমার কাছ থেকে খাতা নিয়ে যায়। আবার ফেরত দেয় দু-তিন দিন পরে। আমি ভাবি ওকে একদিন নির্জনে দেখা করতে বলবো। কিন্তু খাতা ফেরত নেবার সময় মুখ শুকিয়ে যায়, বুক টিপ টিপ করে, কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোনো একটি কথাও বেরোয় না। সহজভাবে আমি ওর সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি নে দেখলুম। সহজভাবে চলতে চেষ্টা করি, বাইরে দেখাই সম্পূর্ণ সহজভাবেই চলচে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আড়ষ্ট ও মুখচোরা হয়ে যাই। জিভ শুকিয়ে আসে কেন কে বলবে? বুকের টিপ টিপ শব্দ যেন ও শুনতে পাবে মনে হয়। কিসের একটা ঢেউ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গলার স্বর আটকে দেয়।

গোটা ফার্স্ট ইয়ার এভাবে কেটে গেল।

অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার মন নেই, তাদের মধ্যে অনেকে কথা বলে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশি। দু-একজনকে চা-ও খাওয়াই কলেজের মধ্যে ও বাইরে। কিন্তু নির্মলার বেলা সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিন্তু এসব তো সাধারণ কথা।

আসল ব্যাপার হচ্চে আমার প্রতিদিনের ভীষণ বেদনা ও মনোকষ্ট। সে যন্ত্রণা দিন দিন আমার বাড়চে। ভেতরে-ভেতরে শুকিয়ে যাচ্চি। অথচ কাউকে বলতেও পারি নে সে দারুণ যন্ত্রণা। সকাল থেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি সে সময়টিব, কখন আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আটটা বাজলো! এখনো তিন ঘন্টা। এগারোটার ক্লাস।

দশটা বাজলো অমনি শুরু হলো। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারি নে।

প্রতিদিন ভাবি, আজ কলেজে গিয়ে ওর সঙ্গে সব কথা খুলে বলবো। কিংবা আশা করি ও আজ হয়তো আমাকে বলবে, চলুন আপনি ও আমি বেড়িয়ে আসি। কিছুই ঘটে না কোনো দিন।

কি সব যন্ত্রণার দিন আমার গিয়েচে, এখনো মনে করলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভগবানের কাছে বলি, অমন অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পুরো দেড়বৎসর সহ্য করলাম সে যন্ত্রণা।

সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেবো। এরকম যন্ত্রণা আর বেশি দিন সহ্য করতে পারবো না। অসহ্য হয়ে উঠেচে আমার পক্ষে। সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

বাড়ীতে বলে সব রাজি করলুম। বললুম ডাক্তারি পড়ায় মন নেই আমার। এবার মড়া-কাটা শুরু হবে। মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না। ছেড়ে দেবো মেডিকেল কলেজ। বি-এসসি পড়বো।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো একদিন।

আমার একটা নোট-বই চার-পাঁচদিন হোল নির্মলার কাছে ছিল। হঠাৎ ভাবলুম ওর হোস্টেলে গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসবো। খুব দুঃসাহসিক সঙ্কল্প। মেডিকেল কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই মেয়েদের হোস্টেল।

বেলা সাড়ে চারটে। কিছুক্ষণ আগে য়্যানাটমির ক্লাস শেষ হয়েচে। দেওয়ান বাহাদুর হীরালালবাবুর নাম-করা ক্লাস, টুঁ শব্দটি করবার যো ছিল না কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর। ফিরিঙ্গি ছাত্রগুলো পর্যন্ত চুপ করে থাকতো।

গার্লস হোস্টেলের দরজায় যেতেই দরোয়ান বললে—কাকে খুঁজচেন বাবু?

আমি বললাম—মিস নির্মলা সরকার, সেকেণ্ড ইয়ার।

—নামঠো লিখ দিজিয়ে বাবু ইস স্লিপ মে। মেট্রনকো পাস লে যানে হোগা।

দরোয়ান স্লিপ নিয়ে চলে গেল মেট্রনের কাছে। আমার বুকের মধ্যে ততক্ষণ বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েচে। মুখ শুকুতে আরম্ভ করেচে। মনকে বোঝালাম, কেন! আমি তো ছেড়েই যাচ্চি কলেজ। নির্মলার জন্যে আসি নি। আমি এসেচি আমার নোট-বই নিতে। নির্মলার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? বা রে, আমার নোট-বই আমি চেয়ে নেবো না? এতে আর কি হয়েচে? নির্মলা কিছু মনে করে করুক।

একটু পরে দরোয়ান দেখি ফিরে আসচে। আমার বুকের মধ্যে যে গর্ত হয়ে খানিক বসে গিয়ে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হোল হঠাৎ। দরোয়ান কি বলবে? নির্মলা বিরক্ত হয়ে হয়তো বলে পাঠিয়েচে, এখানে কেন? কাল ক্লাসে দেখা করবেন। ভারি বিরক্ত হয়েচে আমার ওপর। আমার নোট-বইয়ে আমার দরকার থাকতে পারে না? জরুরি দরকার থাকতে পারে না? তুমি এনেছিলে কেন আমার নোট-বই? বেশ তো?

দরোয়ান এসে বললে—আইয়ে বাবু! ভিজিটার্স রুমমে বৈঠিয়ে।

ভিজিটার্স রুমে বসতে বলে যে! তাহলে নির্মলা চটে নি। না, তা কেন চটবে। চটবার কি আছে এর মধ্যে।

ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসবার একটু পরেই একখানা ফিকে নীলরঙের শাড়ী পরে স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে নির্মলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। পিঠে চুল খুলে এলিয়ে দেওয়া। ক্লাস থেকে ফিরে স্নান করেচে।

ও ঘরে ঢুকে বললে—কি ব্যাপার? আপনি যে হঠাৎ?

আমার মনে অবদমিত আবেগ যেন উত্তাল হয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। এখানে তো কেউ নেই। নির্মলা—নির্মলা সরকার আমার সামনে। শুধু দু-জন এই ঘরের মধ্যে। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বলে ফেলি। এমন সুযোগ জীবনে আর আসবে না। দেড় বৎসরের মধ্যে মহা প্রতীক্ষিত সেই পরম শুভ মুহূর্তটি আজ সমাগত এই মেয়েদের হোস্টেলের নির্জন ভিজিটার্স রুমে। ছেড়ো না এ সুযোগ। যা হয় হবে। হয় এস্পার—নয় ওস্পার।

আমি ওর চোখের দিকে চাইলাম। নির্মলাও আমার চোখের দিকে দেখি চেয়ে

আছে। আমার মনে হোল, অবশ্য আমার ভুল হোতে পারে তবে আমার আজও তাই ধারণা—যে ওরই চোখে সেদিন প্রতীক্ষার দৃষ্টি দেখেছিলাম। অতি অল্পক্ষণের জন্যে একথা আমার মনে হয়েছিল। তার পরেই ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম—নোট-বইখানা নিতে এসেচি—

—ও!

—কাল একবার ভেবেছিলুম আসবে—

নির্মলা আবার যেন প্রতীক্ষা ও আহ্বানের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। দেবীর মত রূপ। কি উজ্জ্বল মুখ-চোখ, কি ঢেউ খেলানো কালো মেঘের মত একরাশ চুল। অপূর্ব রূপ ফুটেচে ওর। আমি চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। কেন চোখ নামিয়ে নিলাম? আজ আমার মনে হয় আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েদের রূপ পুরুষের পূজোর জন্যে নয়। তাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। নির্মলা আশা করে এসেছিলো সেদিন। ওর আশা আমি ভঙ্গ করেছিলুম সেদিন—নিজের ভীরুতার জন্যে।

ও বললে—তবে এলেন না কেন!

—আসতে পারি নি শেষ পর্যন্ত, কাজ ছিল।

আর একটি আশ্চর্য কথা ও বললে। সে কথা ও যে আমাকে বলবে এমন আশা করিনি। তবুও বলি, এ কথার গুরুত্ব তখন তত বুঝি নি, পরে যত বুঝলাম।

ও বললে—কাজ থাকলে বুঝি আমার কাছে আসা যায় না?

আমি শুধু বোকার মত হাসলাম।

নির্মলা আবার বললে—বলুন না?

—না-না-না—তাই দেরি হয়ে গেল কি-না?

আমার উত্তরের বিশেষ কোনো মানে হয় না। অসংবদ্ধ প্রলাপ।

—কিসের দেরি হয়ে গেল?

—না, দেরি হয় নি। এমনি বলচি।

—আপনি অদ্ভুত লোক।

—কেন?

—কেন? আপনাকে কি বোঝাবো। নিজে বুঝতে পারেন না? বসুন, আমি খাতাখানা আনি।

আমি তো বুঝতে পারলুম না, কিসে আমি অদ্ভুত লোক হোলাম। নির্মলার এ কথার মানে কি?

একটু পরে ও ফিরে এলো। এসে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করলে। খাতাখানা আমার হাতে দিয়ে হঠাৎ ঈষৎ নিচু হয়ে যেন আমার দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে মুখ সরিয়ে নিলে। আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েই সরে গেলো এবং খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমার মাথা ঘুরে উঠলো। গম্ভীর ও সংযত মেয়ে নির্মলা ক্লাসের মধ্যে। তার একি লীলা! আমি খাতা হাতে নিয়ে উঠে বললুম—তবে আজ আসি।

নির্মলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বললে—বসুন না?

—যাই। বেলা গিয়েচে। কাজ আছে বাড়ীতে।

—চললেন তা হোলে? ডিসেক্‌শান রুমে দেখা হবে কাল তো?

—হ্যাঁ, যাই।

—কাল ডিসেক্‌শ্যন রুমে আসবেন তো ঠিক?

—আসবো।

নির্মলা ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। আমি টলতে-টলতে বাইরে এলাম। বাইরে এসে বাড়ী যাবার পথে কতবার ভাবলাম নির্মলার এ অদ্ভুত আচরণের অর্থ কি? ও তো অতি গম্ভীর মেয়ে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথাই কয় না ভালো করে। আমাকে কি অন্য চোখে দেখে? কি জানি।

বাড়ীতে তখন আমার বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি চলচে। বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নির্মলা আমার চোখে ও মনে জ্বল জ্বল করচে। অন্য মেয়েকে ওর আসনে বসাতে হবে?

নির্মলা খুব বড় লোকের মেয়ে। অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেচি। ওকে পেতে যাওয়া মানে বামন হয়ে চাঁদে হাত। আমার মত একজন নগণ্য ছেলেকে মেয়ে দেবে—ওর মা-বাপ?

আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম...

কলেজে তিলে তিলে দগ্ধ হোতে পারবো না আমি। মেডিকেল কলেজে মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না।

বি-এসসি পড়লুম, প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলুম। এম-এসসিতে দ্বিতীয় শ্রেণী বটে, কিন্তু সেবার আমার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে কেউ ছিল না।

কলকাতায় একটা কলেজের অধ্যাপকের চাকরি জুটে গেল সহজেই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া কঠিন হোত না, কিন্তু আমি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চাই জীবন। পয়সার অভাব নেই আমার ভগবানের ইচ্ছায়। কার জন্যেই বা অত খাটতে যাবো? না বিয়ে-থাওয়া, না ছেলেপুলে, বেশ আছি।

নির্মলার কথা ভুলি নি। তার জন্যেই বিয়ে করতে পারলুম না। এ যে কি টান, কি মোহ, কি করে বলবো। মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলাম কই?

নির্মলার বিয়ে হয়েছিল একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে। নিজে সে একজন লেডি ডাক্তার। একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিভাবে তা বলি।

লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নির্মলা তখন কাজ করে, আমি জানতাম।

রোজ কলেজ থেকে বেরিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের কাছে এসে মুখ উঁচু করে কবে দাঁড়াই। সম্পূর্ণ অকারণে, কেন দাঁড়াই নিজেই তা জানি নে। কলেজের ছুটির পর পা দু-খানার গতি হয় লেডি ডাফরিন হাসপাতালের দিকে—আপনিই হয়।

যে সময়ের কথা বলচি, তখনও নির্মলার বিবাহ হয় নি।

একদিন ওই রকম অভ্যাসমত এসে দাঁড়িয়েচি স্কট্‌স্ লেনে, হাসপাতালের ঠিক নিচে। এমন সময় এল বর্ষা। সেটা ছিল আশ্বিন মাস। আমার কাছে ছাতি নেই—ছাতি বওয়া আমার অভ্যাস নেই। দাঁড়িয়ে ভিজছি, সরে যেতে ইচ্ছে করচে না, ভিজে যাচ্ছি তবুও কিসের আশায় চাতক-পাখির মত আকুল আগ্রহ নিয়ে মুখ উঁচু করে

দাঁড়িয়ে অসাড়ে ভিজছি—বোধহয় সাধনার কঠোরতায় সিদ্ধি আসে সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই দক্ষিণ পাণি প্রসারিত করে অকপট সাধনার ফল হাতে হাতে দেন। তাই শব-সাধনার এত নাম আমাদের দেশে। রাতারাতি সিদ্ধিলাভ।

শব-সাধনা টব-সাধনা যাক গে।

আমার ফল এল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ভাবে। এখনও তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

হঠাৎ রাস্তার দিকের জানলা খুলে গেল হাসপাতালের দোতলায়। একটি মেয়ে উঁকি মেরে রাস্তায় আমায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখলে। আমি চিনলাম, সে নির্মলা।

নির্মলা কিন্তু আমাকে একবার দেখেই হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেই জানলা থেকে তখুনি সরে গেল।

আমি তো অবাক। আমার রক্ত তখন দ্রুত স্রোতে বুকের দিকে ঠেলে উঠচে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। হাসপাতালের গেটের কাছে নির্মলা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছাতি। আমি এগিয়ে গেলাম, কতকাল পরে দেখা। ও হাত জোড় করে বললে—নমস্কার, কোথায় আছেন, কি করচেন? কতদিন পরে দেখা—

—হ্যাঁ—ইয়ে—তাই—

—কি, করচেন আজকাল?

—কলেজ প্রফেসরি করি। ছুটির পরে এ পথে আসছিলাম, তাই, বৃষ্টি এল হাসপাতালের কাছে, ওই জায়গায়—তাই—

—এম-এসসিতে তো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলেন। বিলেত গেলেন না কেন? আপনি তো স্টেট স্কলারসিপ পেতেন—

—না, কি হবে গিয়ে?

পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বললাম—বাবার শরীর খারাপ। আপনি এখানে কি করচেন?

—রেসিডেন্ট হাউস সার্জেন। আমি তো আর বছর পাস করে বেবিয়েচি—

নির্মলার দিকে চেয়ে দেখলাম ভাল করে। বালিকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে, এসেচে সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনের দীপ্তি ও গাম্ভীর্য। একটু যেন মোটা হয়ে পড়েচে—তবে আমারই চোখে পড়লো, অন্য কেউ দেখলে ওকে মোটা বলবে না। মধুশ্রীতে পূর্ণিমা চন্দ্রের পূর্ণতা।

নির্মলাও দেখি আমার দিকে চেয়ে আছে। নির্মলা কি বুঝতে পেবেচে আমি রোজ ওর হাসপাতালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি? আরও কোনোদিন দেখেচে নাকি?

আমি বললাম—ভালো আছেন?

—মন্দ নয়। আপনি মেডিকেল কলেজ ছাড়লেন কেন? ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিলেন তো।

আমি ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া সূচক হেসে বললাম—ও কিছু না। কত ভাল ছেলে ছিল। আপনিও তো খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন। আমার মড়া-কাটা পছন্দ হোল না।

ও খপ করে একটা প্রশ্ন করে বসলো। এ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বড় ব্যথা দিলে প্রশ্নটা করে। বললে—বিয়ে কবেচেন?

—না। আচ্ছা—নমস্কার—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতিটা নিয়ে যান। ভিজচেন দেখে ছাতিটা নিয়ে এলাম। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

চলে এলুম ছাতি নিয়ে। নিজে যাই নি। ছাতি অন্যের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এর পরের বছরই কি সেই বছরই নির্মলার বিবাহের সংবাদ পাই। এর পরে নির্মলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর একটিবার।

আমহার্স্ট স্ট্রীট বেয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা মোটর দাঁড়িয়ে গেল পাশে। নারীকণ্ঠে কে বললে—এই যে, নমস্কার—। চেয়ে দেখি নির্মলা। বেশ মোটা হয়েচে। আমার লজ্জা হোল হঠাৎ এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতে। কারণ আমিও মেদবৃদ্ধি পথে কম অগ্রসর হই নি। ওর চেয়ে দুজনের পাল্লাপাল্লিতে বোধহয় আমিই জিতবো।

—কোথায় যাচ্চেন? আসুন গাড়ীতে—উঠুন—

এ একাই ছিল গাড়ীতে।

—না, আর গাড়ীতে উঠবো না। ধন্যবাদ। এই তো সুকিয়া স্ট্রীটে যাবো—

—গাড়িতে আসুন না? নামিয়ে দেবো ওখানে—সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় বলুন।

—না না থাক, থ্যাঙ্কস্—ওই তো পাশের গলি, মোড়ের মাথায়। কতটুকু—নমস্কার—আমার অসহ্য হোল। আর দাঁড়াতে পারলুম না। নিজে মোটা হয়েচি বলে লজ্জাও হোল ওর সামনে দাঁড়াতে।

এর পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

সে আজ বহু বৎসরের কথা। সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা। দিন যায় যত, নির্মলার কথাও তত ভুলি। ক্রমে নির্মলার ছবিও অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

এমন সময় সেদিন এক ব্যাপার হয়ে গেল। মাস-খানেকও হয় নি।

আমাদের কলেজে বি-এসসি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হচ্চে। অন্য কলেজের কয়েকটি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্চে। মেয়েদের পরীক্ষা আমি তত্ত্বাবধান করচি ও পাহারা দিচ্চি সেই রুমে।

একটি মেয়েকে দেখেই আমার মন ছাঁত করে উঠলো। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এর মুখ আমার সুপরিচিত। মনে হোল অনেকদিন আগে একে চিনতাম। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবচি একে কোথায় দেখেছিলাম প্রথম যৌবনের কোনো দিন।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙলো। কি মনে করবে। আমি প্রৌঢ় অধ্যাপক। ওরা অন্য কলেজের মেয়ে, আমাকে চেনে না, কি ভাবতে পারে।

মেয়েটির ব্যাপার দেখে বুঝলুম সে ফাঁপরে পড়েচে। দুটি প্রশ্ন আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের। একটি হিস্টোলজির, অপরটি মরফোলজির। মেয়েটি একটি লতার অংশ সরু করে কেটেচে। কিন্তু কিছুতেই সেটাকে রাঙাতে পারচে না। তিনবার, চারবার ধরে চেষ্টা করলে। ওর হাত কাঁপচে, চোখে জল টলমল করচে।

আমি দেখলুম মেয়েটি এ কাজ কখনো মন দিয়ে করে নি। সিনেমা দেখে বেড়িয়েচে, ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে এসে এখন নিজেই ফাঁকে পড়ে গিয়েচে।

কাছে গিয়ে বললুম—কি হচ্চে খুকী?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—সেকশনটা স্টেইন্ নিচ্চে না—জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্চে—আমি হেসে বললাম—তুমি কোন্ কলেজেব স্টুডেন্ট?

—স্কটিশচার্চ।

—সেকশন কাটতে শেখো নি তো? অত মোটা করে সেকশন কাটে? তাছাড়া দেখচো না এ লতায লাল হড়হড়ে আঠা বয়েছে। ওটা অ্যালকোহলে ধুয়ে না নিলে কখনো স্টেন নেয়? ওটা অ্যালকোহলে ওযাশ করে নাও।

মেয়েটি আমাব কথায় অ্যালকোহলে ধুতে গেল। কিন্তু মা লক্ষ্মী দেখলুম সিনেমা দেখেই কাটিযেচেন। লেখাপড়া কিছুই কবেন নি।

বললাম—ও কি হচ্চে? তুমি অ্যালকোহলে ধুতে জানো না? গ্রেডে তোলো—নইলে সেকশনটা গুটিয়ে যাবে যে। আগে কুড়ি, তারপরে পঞ্চাশ, তাবপবে সত্তর, তারপরে নব্বুই—তারপর অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে তোলো—

—কেন, লাইজল দিয়ে ধুয়ে ফেলবো না?

—পাগল, লাইজলে দিয়ে এখন ধোবে কেন? অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে আগে তোলো। ওর হাত কাঁপচে। কখনো একাজ করেনি। গ্রেডে তোলা কাকে বলে তাই ভালো কবে শেখেনি। হাতে-কলমে করতে, আমাব মাযা হোল। বললুম—ছেড়ে দাও খুকী—তুমি মরফোলজির কোশ্চেনটা ট্রাই কবো—আমি দেখচি—

আমি ল্যাববেটরীর হেড য্যাসিস্ট্যান্ট নরেনকে ডাকলুম। নবেন আমারই ছাত্র, প্র্যাকটিক্যাল কাজে ঘুণ। তাকে বললাম—নরেন, এই সেকশনটা মাউন্ট করে নিযে এসে দাও তো?

নরেন আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সেকশনটা হাতে নিয়ে চলে গেল। হয়তো ভাবলে প্রৌঢ় অধ্যাপকের এ দুর্বলতা কেন? সুন্দবী মেযে দেখে তাকে পবীক্ষায বে-আইনি সাহায্য কবচেন।

একটু পবে নরেন বেশ চমৎকাব ভাবে নিপুণ হস্তে সেকশনটা শ্লাইডেব ওপব বসিয়ে কানাদা বালসম্ দিয়ে বন্ধ কবে আমাব হাতে এনে দিলে। আমি নিয়ে গিয়ে বললাম—এই নাও খুকী।

তার প্রশ্নের উত্তর বে-আইনি ভাবে পেয়ে মেযেটি কৃতজ্ঞতামূলক হাসলে। অনেকদিন আগে এ হাসি কোথায় দেখেচি। এ হাসি আমাব কুযাশাচ্ছন্ন জীবন-দিনেব প্রথম অরুণবাগেব হাসি। বিস্মৃত অকুণবাগেব সে শুভ ক্ষণটি আজও কি ভুলেচি?

মৃদু কৌতুহলের সুবে প্রশ্ন কবলুম—তোমাব নাম তো নীলিমা বসু লেখা বযেচে—তোমাদেব বাড়ি কোথায?

—লোয়াব সাবকুলার রোডে, ডাক্তাব বিভাস বসুকে চেনেন?

—ডাক্তার বি. বসু—আই স্পেশালিস্ট?

—হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা।

—ও।

—আমাব মাথা ঘুবে উঠলো। ডাক্তার বিভাস বসু নির্মলাব স্বামী। মেযেটি হেসে বললে—আসবেন আমাদের বাড়ি। বাবা বড খুশী হবেন।

ভালোবাসা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

"কশ্চিৎ প্রৌঢ়"—বরেষু

গত শ্রাবণ (১৩৪৬) 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার 'ভালোবাসা' শীর্ষক সরস রচনাটি পড়িলাম। আপনার শেষ কথাগুলি এই—"পুরুষ এবং স্ত্রী—জাতির ভালবাসা প্রকাশের ধারার বিভিন্নতা কি?—এই ধরনের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন আছে। আপনাদেরও নিশ্চয় বলবার অনেক কথা মনে হচ্ছে এবং বলবার ইচ্ছা করছেন, সুতরাং এইবার আপনারা বলুন, আমি চুপ করি।"

বলিবার অনেক কিছুই আছে সবারই, কেন না, ও জিনিসটির হাত হইতে কেহ তো আর রেহাই পাইল না। আর 'বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা'—সারা জন্মে দাগ মেলায় না। তাহা হইলে যাহা জানি বলি, আপনি চুপ করিয়া শুনুন।

পুরুষের ভালোবাসা সম্বন্ধে আপনার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাই রহিয়াছে, শ্রীমতীর বেতো পায়ে ওরিয়েন্টাল বাম মালিশ করিতে করিতেই সেটা বেশ অনুভব করেন। বরং আরও একটু আগাইয়া ধরিলে বলা যাইতে পারে, বাড়িতে নববধূরূপে সালক্তকচরণে তাঁহার প্রথম প্রবেশ করার সময় হইতে আপনার শুভ তত্ত্বাবধানে সেই পা-ই বাতগ্রস্ত হওয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ অবসরে ভালবাসার সব অবস্থারই আপনার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহার পূর্বেরও যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকে আপনার, অর্থাৎ পূর্বরাগের, তো সে সম্বন্ধে আপনি নীরব, সুতরাং আমার কৌতূহলও অনধিকারী। ধরিয়া লওয়া যাক—আছে, তাহা হইলে পুরুষের ভালবাসার অভিব্যক্তির প্রায় সব রূপগুলিই আপনার প্রশ্নের অর্ধেক হিস্যে বাদ দিলাম। বাকি থাকে মেয়েদের ভালবাসার অভিব্যক্তি। পুরুষ বর্বর, তাহার সমস্তটাই স্পষ্ট, তাহাকে অনায়াসেই চেনা যায়; নারী ঠিক বিপরীত ইহার, তাহাকে চেনা কঠিন, ঠিক যেমন কঠিন—পাহাড়ে উঠার চেয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করা। তবুও তাঁহাদের ভালবাসা সম্বন্ধে যতটা জানি অথবা জানি বলিয়া বিশ্বাস, তাহার কিছু বলি।

মোহাড়াতেই বলিয়া রাখি, আমার সঞ্চয় সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে। তবে বিশ্বাস করুন, আমার নিজের অভিজ্ঞতা নয়, তাহা হইলেও আমি নিজের নামেই চালাইব। প্রথমতঃ ফাঁকতালে নিজেকে নায়ক করিয়া চালাইবার মধ্যে একটা নিখরচার আনন্দ আছে, আর দ্বিতীয়তঃ যাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমায় বড় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের গূঢ়তম গোপন কথাটি বলিযাছিল, তাহাদের নাম জাহির করা অধর্ম হইবে। এখন, মূল নামই গুপ্ত রাখিলাম তো, নিজেকে বাদ দিয়া রামা-শ্যামাকে নায়ক করিয়া বসাই কেন? এত বলা সত্ত্বেও যদি মনে করেন এসব আমার আত্মগোপনের চেষ্টা মাত্র তো কি আর করা যায়?

কিন্তু মুস্কিল, কোথা হইতে আরম্ভ করা যায়? বেশ, একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি—কুন্তলার কথা থেকে।

কুন্তলার বয়স তখন বছর সাতেক...

বয়সের কথা শুনিয়া আপনি বিস্ময়ে হাত পা গুটাইয়া বসিলেন যে! সাত বছরের মেয়ে ভালোবাসার কিছু জানে না? খুব জানে। অত কথা কেন, স্থির হইয়া একটু অঙ্ক কষিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—জানে। আমরা পুরুষেবা সংসারে প্রবেশকবি বাইশ তেইশ বৎসরে, ভালবাসার হাতে খড়ি হয় চৌদ্দ-পনেবোয়; ওরা সংসারে প্রবেশ করে চৌদ্দ-পনেরোয়, মানেন তো? তাহা হইলে ভালবাসিতে শুরু কবে করিবে আঙুল গুনিয়া দেখুন না।

কুন্তলা যখন সাত বছরের, তখন থেকেই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ কবে। অবশ্য শত্রু ভাবে আচরণ করিলে ভালবাসার পাত্রকে আরও শীঘ্র পাওয়া যায়—রামায়ণের এই তত্ত্বটা কুন্তলার জানা ছিল কিনা জানি না; মেয়ে জাত, অবচেতনার স্তরে জানাও সম্ভব। মোট কথা, কুন্তলা আমার জীবন অসহ্য করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমি মেয়েটাকে বাঘের মত ভয় করিতাম। উদয়াস্ত তাহার কাজ ছিল আমার খুঁত ধরা এবং সেইগুলি যথাস্থানে পেশ করিয়া আমায় যথাসাধ্য বিপন্ন করা। ও বয়সে ত্রুটি-বিচ্যুতির অভাব হয় না; কেননা , যাহাদের হাতে ঐ সময় আমাদের জীবন, জীবনের মাপকাঠি সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে অনেক মতভেদ থাকে। তবুও যদি কুন্তীর ভয়ে কোনদিন অতিবিক্ত সাবধানে থাকিয়া নিখুঁত থাকিয়া যাইতাম তো, কুন্তী নিজেই খুঁত গঠন করিয়া লইত। আমার বইয়ের পাতা ছিঁড়িত, জুতার ফিতা হারাইত, গোটা পেনসিলটা না ভাঙ্গিলে অন্ততঃ তাহার সীস ভাঙ্গিত, বৈঠকখানায় তাস, কাকার এস্রাজের তার পাওয়া যাইত আমার জামার পকেটে। নির্দোষ বেচারী আমি জানিতাম, কিন্তু কিছু বলিবার উপায় ছিল না। মেয়েটার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, আমায় যে পরিমাণ জ্বালাইতে পারিত, বাবা কাকা ওঁদের সবাইকে ঠিক সেই পরিমাণেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল—মাথার পাকা চুল তুলিয়া, কানে শুড়শুড়ি দিয়া, ফাইফরমাস খাটিয়া; আরও তাহার নিজস্ব নানা পদ্ধতিতে। পলিটিক্স্ মেয়েদের মজ্জাগত, শুধু মজ্জাগতই নয়, জন্মসিদ্ধ। একবার আমার বালিশের তলায় সেজ মামার হারানো ছুরি পাওয়া গেলে আসল অপরাধিনীর নাম করিয়া যে লাঞ্ছনাটা ভোগ হইয়া ছিল কোন জন্মে ভুলিব না। এখনও যেন সব স্পষ্ট,—বাবার কোলের কাছে অভিমানে অশ্রুমতী কুন্তী, তাহাকে যেন কোনমতেই ঠাণ্ডা করা যায় না, বাবার হাতে আমার ছুরিটা, চারদিক ঘিরিয়া ছেলেবড়য় এক পাল, সদ্যলব্ধ চপেটাঘাতে আমার বাঁ রগটা তখনও ঝিন-ঝিন করিতেছে। বাবা বলিতেছেন, "লজ্জা করে না তোমার রাস্কেল, নিজে দোষ ক'বে পরের একটা নিরীহ মেয়ের ঘাড়ে দোষটা চাপাচ্ছ। কাওয়ার্ড! বেচারী তোমাদের বাড়ি আসে বলে?...না মা, চুপ কর তুমি, ওর আজ খাওয়া বন্ধ।"

সেই একবার চেষ্টা করিযাছিলাম। এটুকু মেয়ে, এমনভাবে তদ্বির করিল মামলাটা যে, সেই থেকে আর ওদিক দিয়া যাই নাই।

২

যাক্, ভালবাসার কথা তুলিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম; কিন্তু আসলে অনেক দূর আসিয়া পড়ি নাই; ভালবাসা সমান্তরালেই চলিতেছে। সেটা একদিন টের পাওয়া গেল।—

তখন কুন্তলার বয়স বছব আষ্টেক হইয়াছে। অর্থাৎ আমার ঘাড়েব উপর দিয়া

আরও এক বছরের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। বাঘও যেন এখন গা সওয়া হইয়া গিয়াছে, কুন্তীকে যে এখন কিসের মত ভয় করি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।— তাড়কা রাক্ষসী? চীনের ড্রাগন? ঐ রকম একটা কিছু হইবে, কেন না, দৃষ্ট জগতে কোন তুলনা পাওয়া যাইতেছে না।

তাড়কার সঙ্গে অন্য দিক দিয়াও একটা সাদৃশ্য ছিল কুন্তলার। সে মায়া জানিত। ওদিককার কথা বলিয়াছি; সে আমার মধ্যেও মোহ আনিত।

বেশ মনে আছে সেদিনের কথা, আমি বাইরের ঘরে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি, কুন্তলা আসিয়া একবার এটা নাড়িয়া, একবার ওটা নাড়িয়া পাশে আসিয়া বসিল। আমি ভয়কণ্টকিত হইয়া একবার আড়চোখে দেখিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলাম।

কুন্তলা ডাকিল, "শৈল!"

ফিরিয়া চাহিতে কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা পান বাহির করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "খাবি?"

মারাত্মক ছিল তাহার হাসিটা। অমন নিরীহ হাসি দেখা যায় না; যেন সে মেয়েই নয়। অঙ্ক কষিতে কষিতেই বলিলাম, "হ্যাঁ, খাই, আর তুই গিয়ে বাবাকে বলে দে— পান খেয়ে মুখ রাঙা করেছি।"

ফিরিয়া চাহিলাম। কুন্তলা হাসি হাসি মুখটা অভিমানে তোলো-পানা করিয়া লইয়াছে। বলিল, "বেশ, না খাবি খাস নি, বদনাম দিস কেন? চুরি ক'রে এনেছিলাম তোর জন্যে, তাই বললাম।"

"দে, কিন্তু—" বলিয়া পানটা লইয়া মুখে পুরিয়া দিলাম।

বেশ যখন মজিয়া আসিয়াছে, অপটুতার দরুণ মুখের দুই কোণ আর ঠোঁট দিয়া রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, কুন্তী হঠাৎ উঠিবার ভান করিয়া বলিল, চললাম বলতে। বিবর্ণ মুখে উঠিতে যাইব, ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, "না রে না, খা তুই। আমি কি এতই বেইমান?"

অনেক রকম আগড়ম-বাগড়ম কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বেশ যখন ভয় ভাঙ্গা হইয়া কতকটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি, কুন্তলা যেন নিছক কৌতূহলচ্ছলেই প্রশ্ন কবিল, "আচ্ছা শৈল, পৃথিবীর মধ্যে তুই সকলের চেয়ে কাকে ভয় করিস—স-ক্কলের চেয়ে?"

দুরবগাহ নারীর মন কে অত বোঝে?

বলিলাম, "সেকেণ্ড মাস্টারকে কুন্তী, শুধু আমি কেন, সব ছেলে ভয় করে— যমের মতন। না হ'লে দেখ্ না, দশটা বেজে গেছে, এখনও ব'সে বসে তাঁর অঙ্ক কষছি। পনেরো টা অঙ্ক হোমটাস্ক দিয়েছেন ঠেলে, একটিও বাদ পড়ুক দিকি নি!"

"তোব হয়েছে সব?"

"না হয়ে উপায় আছে? এইটে শেষ, এই পাঁচখানি পাতা বোঝাই অঙ্ক" অঙ্কটা শেষ করিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলাম, "বা-বাঃ, আর মাত্র পনেরোমিনিট। আজ আবার পয়লা ঘণ্টাতেই সেকেণ্ড মাস্টার!"

কুন্তলা বলিল, "তুই খেয়েনিগে তাড়াতাড়ি শৈল; আমি ততক্ষণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সব রেখে দিচ্ছি। কোন্‌গুলো সব বল দিকিন?"

চটিতে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আঙুল দিয়া ছড়ানো বই, খাতা, পেন্সিল সবদেখাইয়া

দিয়া বাড়িতে চলিয়া গেলাম।

এর পরে একেবারে স্কুলের দৃশ্যটা উদ্‌ঘাটন করা যাক। মনের স্ফূর্তিতে ফার্স্ট বেঞ্চে বসিয়া আছি। সেকেণ্ড মাস্টার আজ পিছনের বেঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন একটি সাইক্লোন-ঝড় বহিয়া আসিতেছে, কোন ছেলে বেঞ্চের নীচে লুটাপুটি খাইতেছে, কেহ হাই-বেঞ্চে মাথা গুঁজিয়া পিঠ রগড়াইতেছে, কেহ আর নয় স্যার, ম'রে গেলাম বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে; কেহ বেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, সীটে ফিরিয়া আসিতে সাহস নাই। এক রকমারি কাণ্ড!

সেকেণ্ড মাস্টার আমার সামনে আসিয়া বলিলেন, "আপনি—?

'হয়েছে স্যার সবগুলোই!"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খাতা খুলিতেই চক্ষু স্থির! আজকের অঙ্ক যাহাতে কষা ছিল, সেই পাঁচখানি পাতা একেবারে বেমালুম সাবাড়।

সেকেণ্ড মাস্টারের ভীষণতার উপরে একটা সরসতার আবরণ থাকিত, সে আবার আরও ভীষণ, সেকেণ্ড মাস্টার একটু রহস্যপ্রিয় ছিলেন, সবাই এটাকে শিবু-মাস্টারের 'খেলিয়ে মারা' বলিতাম।

ঠিক যেন অঙ্কগুলার উপর দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুলাইয়া যাইতেছেন, এইভাবে তিনখানি সাদা পাতা এক এক করিয়া উল্টাইয়া দেখিয়া গিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, সবগুলোই ঠিক হয়েছে, বাঃ বেশ ছোকরা শৈলেন, তুই নিজেই সবগুলো করেছিস?"

আমার তখন ধড়ে প্রাণ নাই। শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, "সব করেছিলাম স্যার, কিন্তু—"

"নেই বুঝি খাতায়? আমি ভেবেছিলাম, নিশ্চয় সূক্ষ্মরূপে আছে কোথাও; অঙ্কও কষবে না, আবার মিছে কথাও বলবে এ কখনও হতে পারে? শৈলেন কি আমাদের সেই রকম ছেলে যে—"

তাহার পরেই মার। সে যে কি মার, বলিয়া বোঝান যায় না, ডেস্কের নীচে থেকে বেঞ্চের নীচে গেলাম, তাহার পর ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম, বেত্রবর্ষণ অপ্রতিহত ধারায় চলিয়াছে, বুক, পিঠ, হাঁটু, কব্জি, আঙ্গুল—কোন জায়গা বাদ নাই—বেতটা গেছে ফাটিয়া, তাহার ঝুরিগুলো যেখানে পড়িতেছে, যেন গাঁথিয়া বসিয়া যাইতেছে।

অনেক ছেলেবেলায় কি করিয়া মাথার ডানদিকে এক জায়গায় কাটিয়া গিয়া একটা দাগ ছিল, শেষে বেতটা তাহার উপর পড়িয়া পাতলা চামড়া ফাটাইয়া দিতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইলে সেকেণ্ড মাস্টারের রাগ পড়িল। অবশ্য না পড়িলেও তখন আমার পক্ষে বিশেষ ইতরবিশেষ ছিল না, তখন আমাব অনুভব করিবার চৈতন্য একেবারে নিম্ন-পর্দায়।

আমায় বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ভালবাসার প্রসঙ্গটা ভুলি নাই, সেই কথাতেই আসিতেছি!

তাহার পরদিন বিছানায় শুইয়া আছি। জ্বর,সমস্ত গায়ে বেদনা, মাথায় একটা পটি বাঁধা। পাশে বসিয়া আছে কুন্তী, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, কিছু দরকার

হইলে যোগাইয়া দিতেছে: দারুণ অভিমানে সেবা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু আবার অভিমানের বশেই গ্রহণ করিতেছি,—ও দেখুক, নিতান্ত অকারণেই ওকি দশা করিযাছে আমার।

হঠাৎ একবার কি ভাবিযা কুন্তী মাথাটা আমার মুখের কাছে লইয়া আসিল, একটু স্থিব দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "পাতাগুলো কেন ছিঁড়ে রেখেছিলাম, বলব শৈল?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন আবার—বদমাইসি। তোর কি করেছিলাম আমি যে—!" গলার স্বর আমার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কুন্তী আমার কাঁধে হাত দিয়া মুখ আরও নামাইয়া বলিল, "বদমাইসি না শৈল, তোকে বড্ড ভালবাসি। মাইরি বলছি, যত লোকে বকে, মারে; তোর যত কষ্ট হয়, তত তোকে এত ভাল লাগে শৈল, কি বলব! তোর মুখটা যদি সর্বদা বেশ শুকনো শুকনো থাকে, তোকে চমৎকার লাগে। এই তোর কাছে ব'সে আছি বেশ লাগছে। মাইরি বলছি মাইরি, না পেত্যয় যাস, দেখিস, সমস্ত দিন উঠবই না তোর কাছ থেকে। তোকে খুব ভালবাসি যে এখন, বে—শ, চমৎকার লাগছে। যত্ত তোকে বেশি মারে লোকে তত্ত তোকে ভাললাগে, মাইরি বলছি শৈল। মনে হয়,—আহা, শৈল বেচারীকে মারলে অমন করে। তোকে ভালবাসি ব'লেই তো মনে হয় শৈল বিশ্বাস করলি নি?..."

আপনি বিশ্বাস করিলেন?

কিন্তু বিশ্বাস করিলেন, কি না—করিলেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। ভালবাসার মুল কথা অধিকার-স্পৃহা। আমাদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে ওটা আরও প্রবল, তা নিশ্চয স্বীকার করিবেন, কেন না, একেবারে মেষে পরিণত করিয়া ফেলিবার চক্রান্তটা ওদেরই; কিন্তু ইহার সঙ্গে আবার একটা করুণার ভাবও মিশ্রিত থাকে—একটা "আহা বেচারী"—এই রকম ভাব। তাহার কারণ আমরা শুধু ভাবি (ভুল করিয়া ভাবি), মেয়েরা অবলা, সরলা; ওরা জানে (পাকা রকম জানে) আমরা দুর্বল, বোকা, অসহায়। সেই জন্য বোধ হয় নারী যতটা ভালবাসিতে পারে, পুরুষ ততটা পাবেনা। আমরা শুধু খাঁটি ভালবাসা বাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকি, ওরা ভালবাসার সোনায় করুণার রং চড়াইয়া কণ্ঠে পরে। সখ হইলে রংটা ইচ্ছামত গাড় করিয়া লয়, যেমন করিয়া লইয়াছিল কুন্তলা। কুন্তলার ওটা ভালবাসাই ছিল, নারীর ভালবাসারই একটা অভিব্যক্তি। ও ছোট বলিয়া ওর কথাটা অবিশ্বাস করুন, কিন্তু বড়র ভালবাসায় এই জিনিসটিই বড় আকারে পাইতে পারেন, সতর্ক করিয়া দিতেছি। এ পর্যন্ত বলিতে পারি, করুণা উদ্রেকের অন্য উপায় না থাকিলে, অর্থাৎ শিবু-মাস্টারের অভাব ঘটিলে ওঁরা সে-ব্যবস্থাটা নিজের হাতেই তুলিযা লন, মানবেব ইতিহাসে এরূপ উদাহরণেরও অভাব নাই।

নারী প্রেমের সহস্রবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম। বিশ্বাস করেন, আরও দেওয়া যাইবে।

পরিশেষে অমর কবি Shakespeare এর 'Twelfth Night' থেকে দুইটা লাইন উদ্ধৃত করিবাব লোভ সংবরণ করা গেল না ঃ

Viola : I Pity hyou,

Olivia : That's a degree to love.

যুগল স্বপ্ন

বনফুল

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুল-সুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি। তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল, হাসি, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল, তা না হ'লে বলব না।

হাসি বলিল, বলুন না—কি?

কি দেবে বল আমাকে?

কি আর দিতে পারি আমি? আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এম্‌ব্রয়ডারি ক'রে দেব। চমৎকার প্যাটার্ন পেয়েছি একটা।

না, ওতে আমি রাজি নই।

তবে কি চাই আপনার? চকলেট আছে দিতে পারি।

আমি কি কচি খোকা নাকি? চকলেটে তুষ্ট হব।

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তা হ'লে শুনতে চাই না, যান। এম্‌ব্রয়ডারি করে দেব বললাম, চকলেট দিতে চাইলাম, তাতে যখন আপনার—

সুধীর বলিল, চললাম তা হ'লে।

হাসি আবার ডাকিল, বলবেন না কিছুতে?

একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে সেদিন যা চেয়েছিলাম।

—বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল।

বলিল, আপনাকে বলেছি, তা হয় না।

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে শুনিল, সুধীর বলিতেছে— মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ কর আমায়। শুনে এলাম, তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে।

বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল, সুধীরদা, শুনে যান।

সুধীর ফিরিয়া আসে নাই।

দুই

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা যাহাকে একবার দেখিবার জন্য অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত, কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে।

অলকা আসিয়া বলিতেছে, আচ্ছা অজয়দা, ইংরেজীতে 'পেট' বলে কোন কথা

আছে নাকি?

অজয় বলিল, হ্যাঁ আছে, 'পেট' মানে মাথা।

সত্যি?

অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা।

আমাদের বরুণাদি তা হ'লে ঠিক বলেছেন তো!

অজয় বলিল, আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরেজী কি বল তো?

অলকা মিটিমিটি তাকাইয়া বলিল, হেড।

হেড মানেও তো মাথা।

মুণ্ডু মানেও তো মাথা।

অজয় হাসিয়া বলিল, এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষার জ্ঞান। মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু! অলকা হাসিয়া বলিল, তফাত কি?

অজয় গম্ভীরভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচি ধোপানীটার সঙ্গে কোন তফাত নেই তা হ'লে বল! দুজনেই তো মেয়েমানুষ!

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, পাঁচি ধোপানীটি কে?

ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমাব বয়সী হবে।

অলকা বক্র হাসিয়া কহিল, আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে আরম্ভ কবেছেন! ধোপানী পর্যন্ত বাদ পড়ে না।

অজয় বলিল, নিশ্চয়। নিজের জিনিসটি যে ভাল, সেটা যাচাই ক'রে দেখে নিতে হবে না?

কে আপনার নিজের জিনিস?

আছে একজন।

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুইটি স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয, স্বামী-স্ত্রী।

জনৈক কাপুরুষের কাহিনী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সকালবেলা করুণা নিজ হাতে চা নিয়ে এলো।

চায়ের আনুষঙ্গিকের বহর দেখে না হেসে পারলাম না, বললাম—"তোমাদের এদেশী জলহাওয়া ভালো হতে পারে, কিন্তু আমার জীর্ণ করবার ক্ষমতাটা এখনো স্বদেশী আছে—এই দু-দিনে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।"

উত্তরে শুধু একটু হেসে প্লেটগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে করুণা চলে যাবার উপক্রম করতে আবার ডেকে বললাম—"তুমি কি আমার সঙ্গে লৌকিকতা শুরু করে দিলে নাকি? বিমলবাবু লৌকিকতা করলে না-হয় বুঝতাম, কিন্তু—"কথার মাঝখানেই করুণা বললে—"বিমলবাবুর হয়েই যদি করি—দোষ আছে কি?"—তারপর হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চায়ের পেয়ালা সামনে ঠাণ্ডা হতে লাগলো। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

না, করুণার ব্যবহারটা মোটেই ভালো লাগছে না, একথা নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে আর বাধা নেই।

করুণা নাটকীয় একটা-কিছু করে বসবে তা অবশ্য আশা করিনি। আশা কেন, সেটা রীতিমতো আশঙ্কার বিষয়ই ছিলো। গোড়ায় তার সহজ স্বাভাবিকতায় তাই বুঝি আশ্বস্তই বোধ করেছি। কিন্তু মনের কোনো গোপন কোণে আহত অহংকার তারপর ধীরে ধীরে সাড়া দিতে শুরু করেছে। মনে হয়েছে, এতটা হবার বুঝি দরকার ছিলো না। সূর্য অস্ত গেছে যাক্ কিন্তু তার বিলম্বিত রঙ পশ্চিমের মেঘে একটু লেগে থাকলে ক্ষতি কি ছিল!

নাটকীয় না হয়ে করুণা অতিমাত্রায় কঠিন ও সংযত হয়ে উঠলে বুঝি সবচেয়ে খুশি হতাম। ধরা দেবার ভয়ে তার সেই সযত্ন সাবধানতায় আমার আত্মাভিমান সবচেয়ে বোধহয় তৃপ্ত হত।

কিন্তু করুণা নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা কঠিন ঔদাসীন্য—দুই-এর কোনো দিক দিয়েই গেলো না।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না, অনায়াসে এই কথাই ভাবতে পারতাম। এবং তাই ভাবাই ছিলো উচিত। সত্যি করুণার সঙ্গে দেখা হবার কোনো আশা বা আকাঙ্খা আমার তো ছিলো না! তার সঙ্গে দেখা হবার কথাও নয়। বিশাল পৃথিবীর জনতায় এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে আমরা হারিয়ে গেছিলাম যে কোনো দিন আবার পরস্পরকে খুঁজে পাওয়াই ছিলো অভাবিত।

কিন্তু সেই অভাবিত ব্যাপার যখন ঘটলো তখন দেখলাম, করুণাকে অনায়াসে ভুলে গেছি যখন মনে করেছি তখনও সে আমায় ভুলতে পাবে না—মনের এ গোপন গর্বটুকু ত্যাগ করতে পারিনি।

এ রকম একটা গর্ব থাকা খুব অস্বাভাবিক বোধহয় নয়।

সে-সব দিনের কথা একেবারে ভোলা তো যায় না! বিশেষ করে সেই একটি

বিকেল। সারাদিন বাইরে অবিশ্রান্তভাবেই বৃষ্টি পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও কোথাও আর বার হওয়া হয়নি। বিকেলে চাকর এসে খবর দিলে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।

এই হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে একটি মেয়ে। প্রথমটা সত্যিই একটু বিমূঢ় হয়ে গেছিলাম। চাকরের সঙ্গে করুণা যখন ঘরে এসে ঢুকলো তখনও আমার মুখের বিস্ময় নিশ্চয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

চাকর চলে যাবার পর করুণা কাছে এগিয়ে এসে বললে—

"খুব আশ্চর্য হয়েছো না?"

"তা একটু হয়েছি, কিন্তু তুমি যে একেবারে ভিজে গেছো!"—আমি সত্যই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

করুণা কাছের একটা চেয়ারে বসে বললে—"বৃষ্টিতে বেরুলে ভিজতে হয়, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না।"

তারপর হেসে উঠে বললে—"ব্যস্ত হয়ে করবেই বা কি। তোমাদের এ নারী-বিবর্জিত রাজ্যে মেয়েদের পোশাক পাবে কোথায়? সখের থিয়েটার পার্টি তো নিশ্চয়ই তোমাদের নেই!"

একটু ভেবে বললাম—"ওপরে দশ নম্বরে একজনেরা আছেন—স্বামী-স্ত্রী!"

করুণা আবার হাসলো—"তাঁদের কাছে শাড়ি ব্লাউজ চাইতে যাবে? কি বলে চাইবে?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে—"তার চেয়ে ভিজে কাপড়েই আমি বেশ আছি। আমার অসুখ করবে না, ভয় নেই।"

অগত্যা তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমি কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে আবার বললে—"ভাবছো, এমনভাবে এখানে আসার মানে কি? কেমন?"

এবারও কোনো উত্তর দিলাম না। করুণা খানিকক্ষণের জন্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মনে হলো। তারপর সম্পূর্ণ রূপান্তর। এই দুর্বার আবেগ সে এতক্ষণ জোর করে ধরে রেখেছিল বুঝলাম।

একেবারে আমার বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সে ব্যাকুল স্বরে বললো—

"আমায় পাটনায় নিয়ে যাচ্ছে। মামা কাল চিঠি দিয়েছেন।"

বুঝতে কিছু পারলাম না এমন নয়। তবুও বেদনাময় সত্যটা যতক্ষণ সম্ভব অস্বীকার করে বললাম—"তোমাদের কলেজের তো ছুটি হচ্ছে?"

করুণা আরো ব্যাকুল স্বরে বললে—"না না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারছো না। এখানে আমায় আর রাখবে না; এই যাওয়া আমার শেষ!"

তার ঠাণ্ডা একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হ্যাঁ, বেদনা সেদিন আমার হৃদয়েও ছিলো, কিন্তু করুণার উদ্বেল আবেগের তুলনায় সে বুঝি কিছু নয়! আমার ভালোবাসার মধ্যে সে উদ্দামতা ছিলনা যা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ করতে পারে।

কিন্তু করুণা খানিক বাদে অশ্রুসজল মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বললে—"আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না। কেন যাবো?"

কি উত্তর এ-কথার দেবো ভেবে পেলাম না। মনের গভীরতায় হয়তো সেইদিনই

তার এ বিদ্রোহে আমার সায় ছিল না। তখনই আমি জানতাম যে এ বিদ্রোহ নিষ্ফল।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় বললাম—"তুমি যা মনে করছো তা তো নাও হতে পারে করুণা, তুমি হয়তো মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো।"

করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠলো—"না না, আমি জানি; জোর করে তারা আমায় সেখানে বন্দী করে রাখতে চান। তাঁদেব ধারণা এ-সব ছেলেমানুষী সারাবার তাই অব্যর্থ ওষুধ।"

করুণা একটু তিক্ত হাসি হাসলো।

তারপর বললে—"আমি কলেজে যাবার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। এখানে এসে তোমায় অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু না এসে যে উপায় নেই, পিসিমার বাড়িতে তোমার যাওয়া তো প্রায় বন্ধ হয়েছে। সেখানে এসব কথা তোমায় জানাতেও পারতাম না।"

একটু থেমে করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠলো আবেগে—"সত্যি কি আমায় নিয়ে যাবে জোর করে! কিছুই আমরা করতে পারবো না?"

সেদিন কি আশ্বাস, কি সান্ত্বনা দিয়ে করুণাকে তাব পিসিমার বাড়ি বেখে এসেছিলাম, তার বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মনে যত বড়োই ব্যথা পেয়ে থাকি না, কিছুই তারপর করতে পারিনি এটা ঠিক।

করুণাকে তার মামারা জোর করে কিনা জানি না, তারপর পাটনায় নিয়ে গেছেন; যাবার আগে দেখা করার সুযোগও মেলেনি আমাদের।

নিমন্ত্রিত অবশ্য হইনি, কিন্তু একদিন কোথা থেকে ককণার বিযে হয়ে যাওয়াব সংবাদও কানে এসেছে। নির্লিপ্ত নির্বিকার মনে সে-সংবাদ শুনেছি এমন কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আজ বিশ্লেষণ করে দেখে বুঝতে পাবি এ-সংবাদ পাবার পব কয়েকটি দিন ও রাত যে আমার কাছে হতাশায় ধূসর হয়ে গেছে, তা প্রধানতঃ করুণার দুঃখের কথা ভেবে। ভালোবেসে না পাওয়ার ব্যর্থতা সেদিন নিজের দিক দিয়ে নয়, করুণার দিক দিয়েই উপলব্ধি করেছি এবং সেই উপলব্ধির বেদনায় নিজের আত্মপ্রসাদ কিছু মেশানো ছিলো কিনা তা বোঝবার শক্তি তখন ছিলো না।

করুণার স্মৃতি যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখনও মনেব কোন গোপন কোণে এ বিশ্বাস বুঝি ছিলো যে, আমি ভুললেও সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না!

সে-বিশ্বাসে রূঢ় আঘাত পাওয়ার পরই মনেব যে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো তাতে নিজের কাছেই নিজে কেমন একটু লজ্জিত বোধ কবলাম, কিন্তু তবু আত্মসংযম করতে পারলাম না।

করুণা খানিক বাদে যখন আমার ঘরে এলো তখন আমার আচরণে ও কথায একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চেষ্টা করলে হয়তো সেও লক্ষ্য করতে পারতো।

করুণা খাবার প্লেটটার দিকে চেয়ে বললে—"একি! কিছুই যে খাওনি!"

পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে আঁটতে তার দিকে ফিবে চাইলাম; একটু হেসে বললাম—"লৌকিকতার বদলে লৌকিকতাই করতে হয় যে; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মতো প্লেট সাফ্ কবে ফেললে তুমি ভাবতে কি?"

"তুমি এখনো সেই এক কথা ধরে বসে আছো!"—করুণার স্বর একটু যেন ক্ষুণ্ণ।

"এক কথা ধরে বসে থাকা আমার একটা দুর্বলতা করুণা, এখনও এটা শোধরালো না।"—আমার স্বর বেশ গাঢ়।

করুণা অন্যদিকে ফিরে খাবার প্লেটটা সরিয়ে রাখছিলো, তার মুখ দেখতে পেলাম না। কিন্তু যে উত্তর সে দিলে তাতে সহজ কৌতুক ছাড়া আর কিছুরই আভাস নেই।

"আর সব দুর্বলতা তাহলে শুধরে ফেলেছো!" আমার দিকে ফিরে করুণা আবার বললে—"একি, এরই মধ্যে বেরুচ্ছো নাকি?"

"হ্যাঁ, গাড়িটার কতদুর কি হলো একবার দেখতে তো হয়!"

"তুমি দেখলেই তো সেটা তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাবে না। উনি তো খোঁজ নিয়ে আসবেন বলেছেন। ওঁর ফিরতে আর দেরি নেই। তোমায় থাকতেই বলে গেছেন।"

"সুতরাং ততক্ষণ তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে বলেছেন?"—হেসে বলবার চেষ্টা করলাম।

সকৌতুক মুখভঙ্গি করে করুণা বললে—"তা করতে পারো।"

আমার স্বর আপনা থেকে তখন বুঝি গাঢ় হয়ে এসেছে—"অনায়াসে বলে ফেললে যে করুণা!"

"এমন কি একটা কঠিন কথা সে অনায়াসে বলা যায় না?"—করুণার মুখে একাধারে হাসি ও বিস্ময়।

"এমন কিছু কঠিন নয় করুণা? সত্যি বলছো? আমার সঙ্গে একা বসে গল্প করতে তোমার ভয় করে না? আমার যে নিজেকে এখনো ভয় করে।"

"তোমার মাথাটি বেশ খারাপ হয়েছে দেখছি।"—বলে হেসে আমায় বেশ একটু অপ্রস্তুত করে করুণা এবার বেরিয়ে গেলো। দরজার কাছ থেকে ফিরে আবার বললে—"তুমি কিন্তু যেও না, আমি এখুনি আসছি।"

কিন্তু অনেকক্ষণ করুণা তারপর আর আসে না। ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে মনের মধ্যে কী একটা জ্বালা অনুভব করি। সেটা আমার নিজের না করুণার বিরুদ্ধে বোঝা শক্ত। হয়তো সেটা নিয়তির বিরুদ্ধে।

কী দরকার ছিলো এমন করে আবার তার সঙ্গে দেখা হবার! দেখা হওয়াটা দৈবের আয়োজিত পরিহাস ছাড়া আর কি?

ক-দিন ছুটি পেয়ে মোটরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কাল রাত্রে এই শহরের মাঝখানে এসে যখন তার কল হঠাৎ বিগড়ে গেছিলো তখন জঙ্গলের পথে না হয়ে একটা ভদ্রগোছের শহরের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিয়েছিলাম। ভবিষ্যতটা তখন জানতে পারলে বোধহয় জঙ্গলের পথটাই শ্রেয় মনে করতাম।

একে রাত্রিকাল, তায় অচেনা শহর। ডাকবাংলো ও স্টেশনের ওয়েটিংরুম থেকে দরিদ্রতম হোটেল পর্যন্ত টাঙ্গা করে ঘুরে আশ্রয় না পেয়ে শেষে, যে কারখানাতে মোটর মেরামত করতে দিয়েছিলাম, সেখানেই ফিরে গেছিলাম হতাশ হয়ে। সেখানেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। কাছাকাছি একটা কয়লার খনিতে তিনি কাজ করেন। সেখানকার কি প্রয়োজনে এ-কারখানায় এসেছিলেন। প্রবাসে বিপন্ন বাঙালীর সাহায্যে

তিনি নিজে থেকেই অগ্রসর হয়ে তাঁর বাড়িতে রাত্রি কাটাবার প্রস্তাব করেছিলেন। সামান্য একটু আপত্তিও হয়তো করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শোনেননি।

শহরের নির্জন এক প্রান্তে বিমলবাবুর বাড়ি। সেখানে পৌঁছে দেখা গেছিলো সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে বিমলবাবু বলেছিলেন—"আজ আমার আসবার কথা ছিল কিনা। চাকর ব্যাটারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে!"

খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলাই লণ্ঠন হাতে এসে বাইরের দরজা খুলে নিদ্রাজড়িত স্বরে বলেছিলেন—"বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি যে বলে গেছিলে আজ আসবে না!"

বিমলবাবু হেসে বলেছিলেন—"বরাতে একটা পরোপকারের পুণ্য ছিলো, তাই বোধহয় আসার সুবিধে হয়ে গেলো। আমি না এলে এই ভদ্রলোক একটু বিপদেই পড়তেন বোধহয় অজানা শহরে!"

করুণা এইবার আমায় দেখতে পেয়েছিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে সরে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বিমলবাবু তখনও বলে চলেছেন—"তুমি চাকরগুলোকে ডেকে দাও, বাইরের ঘরটা খুলে একটা বিছানা ঠিক করে দিক। ভদ্রলোকের একটু কষ্ট হবে—"

হঠাৎ তাঁকে করুণার কথায় সবিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে।

করুণা হেসে বলেছে—"বিদেশ-বিভুঁয়ে একটু কষ্ট হলোই বা ভদ্রলোকের।"

বিমলবাবু অবাক হয়ে আমাদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—"তার মানে! এঁকে তুমি চেনো নাকি!"

"তা একটু চিনি বৈকি!"—করুণা হেসে উঠেছে।

"কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যটা কিসের। তোমার অচেনা বলে আমার চেনা হতে নেই! তোমার সঙ্গে মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তার আগে কুড়ি বছর আমি সলিটারি সেলে ছিলাম মনে করো!"

বিমলবাবু হেসে ফেলে বলেছেন—"কিন্তু ভদ্রলোককে বাইরে ঠাণ্ডায দাঁড করিয়ে রেখে আমাদের দাম্পত্য জীবনের নমুনাটা নাই দেখালে।"

করুণা গম্ভীর হবার ভান করে বলেছে—"ও আমি শুধু ঝগড়া করি এই তুমি বোঝাতে চাও!"

এবার একটা-কিছু বলা উচিত বলেই হাসবার চেষ্টা কবে কথা বলেছি—"ব্যবসাই পেশা বিমলবাবু, নমুনা দেখে আমি ভুলি না।"

এতদিন বাদে করুণার প্রথম আলাপেব ধবনে তখনই মনে কোথায আমার একটা খট্‌কা লেগেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন নিজেই বেরিয়ে পড়বো কি না ভাবছি তখন করুণা এলো। সাজ-পোশাকের পরিবর্তন দেখে যা বলতে যাচ্ছিলাম নিজে থেকেই তার উত্তর দিয়ে সে বললে—"একটু বাইরে যেতে হবে। আসবে আমাব সঙ্গে?"

চাদবটা আলনা থেকে তুলে নিযে বললাম—“শুধু আদেশেব অপেক্ষা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছো?

“বাজাব কবতে।”—বলে করুণা হাসলে।

“বাজাব কবতে।”—অবাক হযে জিজ্ঞাসা কবলাম।

“আমি তো প্রায়ই যাই।” সে হেসে বললে—“এখানে ‘চেঞ্জাব’ ছাডা বাসিন্দাদেব মেযেবা বডো একটা নিজেবা বাজাবে যান না বটে, কিন্তু আমি ও-সব মানি না, উনি না থাকলে আমি নিজেই চাকব নিযে বেবিযে পডি।”

“কিন্তু বিমলবাবু তো আজ আছেন।”

“ও, তোমায বুঝি বলা হযনি। উনি খবব পাঠিযেছেন আজ আসতে পাববেন না, হঠাৎ বিশেষ জকবি কাজে আটকে পডেছেন।”

ককণা বেশ সহজভাবেই কথাটা বলে গেলো। কিন্তু আমি বাস্তাব মাঝেই থমকে দাঁডিযে পডলাম—“তা হলে?”

“তা হলে আব ভাবনা কিসেব। উনি না থাকলে কি তোমাব যত্ন হবে না।”

ককণাব চোখে-মুখে কৌতুকেব দুষ্টু হাসি।

“তুমি বাস্তায দাঁডিযে ভাবতে শুরু কবলে আমায একলা এগিযে যেতে হবে।”

অগত্যা নীববে তাব সঙ্গে এগিযে যেতে হলো। এদিকেব পথটা বেশ নির্জন। দূবে দূবে দু-একটা বাডি। তাবও অনেকগুলি খালি পডে আছে। বাস্তায লোক নেই বললেই হয।

খানিকদূব নীববে চলাব পব প্রশ্ন না কবে পাবলাম না—“বিমলবাবু আজ বাত্রে ফিববেন তো?”

“বোধহয না। এখন দু-চাব দিন হযতো সেখানে থাকতে হবে।”

আবাব নীববে অনেকটা পথ পাব হযে গেলাম। ককণা কযেকবাব আমাব দিকে ফিবে তাকাবাব পব হেসে বললে—“কি ভাবছো অতো গম্ভীবভাবে?”

“ভাবছি আজই আমায় চলে যেতে হবে।”

“তোমাব গাডি তো আজকেব মধ্যে মেবামত হযে উঠবে না।”

“গাডি এবা পবে পাঠিযে দেবেখন। আমি ট্রেনেই যাবো।”

“এত ব্যস্ত কেন? তোমাব এখানে ভয কিসেব?”

বাস্তাব মাঝে আবাব দাঁডিযে পডলাম—“বলেছি তো ভয আমাব নিজেকে। নিজেকে আমি বিশ্বাস কবি না।”

ককণা এবাব বেশ জোবেই হেসে উঠলো—“না-ই বা কবলে, তাতে কাকব তো কোনো ক্ষতি নেই।”

না, এ বুঝি আব সওযা যায না। হঠাৎ সমস্ত সংযম হাবিয়ে তাব হাতটা ধবে ফেললাম—“ক্ষতি যদি তোমাবই হয ”

ককণা হাত ছাডিযে নিলো না। কিন্তু পবিহাসেব হাসিতে আমাব সমস্ত আবেগকে নিষ্ঠুবভাবে হাল্‌কা কবে দিযে বললে—“কেমন কবে হবে? আমি তো নিজেকে বিশ্বাস কবি।”

করুণার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—"সে বিশ্বাস এখনো কি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে না করুণা? সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ঢেউ কি আসতে পারে না?"

করুণার চোখে সেই দুর্বোধ্য সকৌতুক হাসি—"কি জানি, পরীক্ষা অবশ্য হয়নি।"

তারপর কি বলতাম ঠিক জানি না, কিন্তু রাস্তা এবার জনবহুল হয়ে এসেছে। বাধ্য হয়েই চুপ করে গেলাম।

সকালবেলা বাইরে বার হবার পোশাকে করুণার একরূপ দেখেছিলাম। দুপুরবেলা ষোড়শোপচার আহারের আয়োজনের আসনের সামনে বসে তার আর একরূপ দেখলাম। একটি সাদা সেমিজের ওপর লাল চওড়া কস্তাপাড় শাড়ি পবে আধ-ঘোমটার পাশ দিয়ে ভিজে এলোচুল পিঠে এলিয়ে সে এসে কাছে এসে বসলো। এমন আশ্চর্য তাকে কোনোদিন লাগেনি।

পাখাটা নাড়তে নাড়তে হেসে সে বললে—"কি দেখছো? কখন দেখোনি নাকি!"

"মনে হচ্ছে সত্যি কখনও দেখিনি!"

"তা হতে পারে'—বলে সে অদ্ভুতভাবে হাসলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, আমার বাজার করা দেখে কি ভাবছিলে বলো তো?"

"এই কথাই ভাবছিলাম যে তুমি আমার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার!"

"তাই নাকি, কিন্তু, দোহাই, বেচারা কলম্বাসের দাবিটুকু উড়িয়ে দিও না।"

"কলম্বাসেরও আগেকার দাবি যদি থাকে?"

"দাবি থাকলেও দলিল নেই তো!"—নিজের রসিকতায় করুণা নিজেই হেসে মাত করে দিলে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খেয়ে যাবার পর বললাম—"দলিলের দাম সকলেব কাছে নেই! ও তুচ্ছ জিনিস অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলা যায়।"

এবার করুণা হাসলো না। আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে—"তোমায় মিষ্টি দেওয়া হয়নি," বলে হঠাৎ উঠে গেলো।

তারপর মিষ্টি করুণা নিয়ে এলো না, নিয়ে এলো ঠাকুর।

কিন্তু খানিক বাদে ঘরে সে নিজেই পান নিয়ে এলো এবং হঠাৎ বলে বসলো—"তুমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই তাহলে যাচ্ছো?"

সবিস্ময়ে তার মুখেব দিকে তাকালাম। আমাবই মনেব ভুল, না তাব মুখে একটা অস্ফুট অস্থিরতার ছায়া?

বললাম—"বেশ, তাই যাবো।"

"বেশ তাই যাবো মানে? আমি যেন তোমায় জোব করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি তো তোমায় থাকতেই বলছি, তুমি নিজেই তো যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে তখন।"

গলার ঝাঁঝটা এবার লুকোবার নয়।

হেসে বললাম—"আমি কি তোমায় দোষ দিচ্ছি? আমাব সত্যিই না গেলে নয়!"

একটু যেন লজ্জিত হযে করুণা হাসবাব চেষ্টা করে বললে—"তা জানি, এমন

জায়গায় তোমার মন টেকে? কিন্তু শোনো, সন্ধ্যায় ঐ একটি ছাড়া আর গাড়ি নেই তা জানো তো? ঠিক সাড়ে ছটায়, মনে থাকে যেন।"

গাড়ির সময় আমার মনে রাখবার প্রয়োজন ছিলো না। বিকেল না হতেই জিনিসপত্র বাঁধিয়ে, আমার মোটরের কারখানায় খবর দিতে পাঠিয়ে, স্টেশনে যাবার গাড়ি ডাকিয়ে করুণা নিজেই সব বন্দোবস্ত করে ফেললে এবং স্টেশনে যাবার পনেরো মিনিটের পথ যেতে পাছে কোনো গোলমাল হয় বলে এক ঘণ্টা আগে আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু বলবার অবসর তার মেলেনি।

বাড়ি থেকে টাঙ্গায় ওঠবার সময় সে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"তুমি আমায় কি ভাবছো কে জানে! যেন তোমায় বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি মনে হচ্ছে, না?"

"সেইটুকু ভেবেই যা কিছু সান্ত্বনা!"

করুণা হেসে উঠলো—"সান্ত্বনাটা এতো সস্তা হলে আর সত্যিকার কিছু মেলে!" টাঙ্গাওয়ালা গাড়ি চালানোর শব্দে তার হাসির রেশ মিলিয়ে গেলো।

এ-গল্পের শেষ ঐখানেই হলে ভালো হতো, কিন্তু তা হলো কই!

স্টেশনে যখন পৌছলাম তখনও ট্রেনের অনেক দেরি। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে এদিক-ওদিক অকারণে ঘুরে বেড়িয়েও সময় কাটাতে না পেরে তখন বই-এর স্টলে এসে দাঁড়িয়ে কি কেনা যায় ভাবছি, হঠাৎ পাশে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম।

"একি! করুণা, তুমি এখানে?"

ম্লান একটু হেসে বললে—"এই এলাম!"

স্টেশনের শেডের আবছা আলোর দরুন, না সত্যিই করুণাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে।

স্টল থেকে একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না করুণা, হঠাৎ স্টেশনে আসার মানে?"

করুণা আবার হাসলো, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—"দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।"

খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ব্যাকুলভাবে বললাম—"কি বলছো করুণা!"

"খুব অসম্ভব কি কিছু বলছি? সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনো?" করুণার স্বর ক্রমশ যেন গাঢ় হয়ে উঠলো।

আমার বুকের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে চোখের দিকে চোখ তুলে সে বললে—"তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না? যাবে না নিয়ে, বলো?"

অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লাম—"আমি...তোমায় নিয়ে..."

"কোথায় যাবে ভাবছো? যেখানে খুশি!"

কোনো কথা এবার আর মুখ দিয়ে বেরুলো না। মনের ভেতর শুধু একটা অস্থির আলোড়ন অনুভব করছি।

"তোমায় অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও তো তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা, নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি!"

করুণা কাতরভাবে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কী বলবো? কী এখন বলতে পারি। নির্বোধের মতো আমিই তার রুদ্ধ বন্যার বাঁধ খুলে দিয়েছি, এখন তাকে কেমন করে ফিরিয়ে দেবো?

"কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভালো করে ভেবে দেখোনি, করুণা। যে ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করবো।"

করুণা তখনও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে তার সমস্ত মুখ যেন বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠলো।

"তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আর একটু হলেই নোঙর উপড়ে গেছিলো আর কি!"—করুণা এবার সশব্দেই হেসে উঠলো।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সমস্তই কি তবে আমাকে বিদ্রূপ করার জন্যে অভিনয়!

করুণা সহজভাবে বললে—"যাও, ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়েছে। আমার ট্রেনেরও বোধহয় দেরি নেই।"

"তোমার ট্রেন!"

"পিসিমারা কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁরা বাড়ি চেনেন না। উনি নেই, তাই নিজেই এলাম নিয়ে যেতে। শুনে খুব হতাশ হলে বুঝি?"

কোনো কথা আর না বলে ও ধারের প্লাটফর্মে যাবার জন্যে ওভারব্রিজের দিকে অগ্রসর হলাম। করুণাকে শেষ যখন দেখতে পেলাম তখন স্টলের বইগুলোর দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে।

সত্যিই পিসিমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সে কি স্টেশনে এসেছিলো?

জীবনে কোনোদিন সে-কথা জানা যাবে না।

ঠগের ঘর

সুবোধ ঘোষ

ওখানে আলিপুরের আদালতের কাছে পথের ওপর একটি বটের ছায়া। আর এখানে বেহালার এক বস্তির মধ্যে একটি মাটিব ঘবের দরজার কাছে একটি তুলসীর বেদী।

রোজ যেমন, আজও তেমনিই ওই তুলসীর বেদীতে একবার মাথা ঠেকিয়ে কাজে বের হয়ে গিয়েছে রাইচরণ। কাজের মধ্যে হলো ওই এক কাজ। এতদূর পথ হেঁটে এসে আদালতের কাছে এই বটের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকা।

রাইচরণের হাতের কাছে থাকে একটি হস্তরেখা-বিচার, অনেকগুলি কড়ি আর একটি চার আনা দামের পঞ্জিকা। চোখের সামনে মাটির ওপর পাতা থাকে দাবার ছক-এর মতো একটি ছক। সেই ছকের মধ্যে নানারকম অঙ্ক কিলবিল করে। কোথায় শনি, কোথায় রাহু আর কোথায় মঙ্গল অবস্থান করলে অদৃষ্ট চক্রের কোথায় কী যে ঘটে যাবে, তার সব উত্তর ওই একটি ছকের মধ্যে নীরব হয়ে রয়েছে। একবার কেউ এসে রাইচরণের চোখের সামনে তার হাতটা এগিয়ে দিলেই হয় অথবা কেউ এসে শুধু তার রাশিটার নাম বলে দিতে পারলেই হয়। রাইচরণ তখনই একটি শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে দেগে অঙ্ক কষে তার জীবনের অবধারিত পরিণাম, আসন্ন পরিণামের আভাস, এবং আরও অনেক কিছু বলে দেবে।

মানুষের কররেখা আর কপালরেখা দেখে, এমন কি স্বপ্নের একটা বর্ণনা শুনেও রাইচরণ ভবিষ্যতের অনেক ভালোমন্দ সম্ভাবনার কথা বলে দিতে পারে। বেতের খাঁচার মধ্যে একটা তোতা আছে। এই তোতার কেরামতিও অসাধারণ। মামলায় জিত হবে কি হবে না—হ্যাঁ কিংবা না? একআনা পয়সা রেখে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি রাইচরণের সামনে চুপ করে বসে থাকে। একটি কাগজে 'হ্যাঁ' ও 'না'-কে মিশিয়ে দিয়ে তোতার সামনে ফেলে দেয়। তোতার কানে একটি কড়ি কিছুক্ষণ ছুঁইয়ে রাখে রাইচরণ; তারপর বিড়বিড় করে, "দেবীর আজ্ঞা, দেবতার আজ্ঞা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আজ্ঞা। ছুঁয়ে ফেল, নিয়তির পাখি।"

তোতাটি এতগুলি কাগজের পুরিযা নেড়েচেড়ে ঠিক একটি পুরিয়া ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে, হ্যাঁ কিংবা না। 'হ্যাঁ' দেখে খুশি হয় জিজ্ঞাসু, 'না' দেখে বিমর্ষ হয।

স্কুলেব ছেলে চুপিচুপি এসে জানতে চায়, পরীক্ষায পাস আছে না ফেল আছে? রাইচরণ বলে, "তিনটি ফুলেব নাম বলো।" ফুলেব নাম শুনেই বাইচবণ বলে দেয, "পাস।" স্কুলের ছেলে খুশি হয়ে দুটো পয়সা বাইচবণের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই শুধু বসে বসে ঝিমোতে হয়। পথের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে ভিড় যেন স্রোতের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু এই বিপুল জনতার ভেতর থেকে কজনই বা অদৃষ্টের কথা জেনে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়? দু'পয়সা থেকে দু'আনা, এই তো গণনাব দক্ষিণা। সন্ধ্যা হলে যখন পয়সা গোনে রাইচরণ, তখন বুকেব ভেতবটা ভয়ে সিরসির করে ওঠে। মাত্র তেরো

আনা! কী করে দিন চলবে?

বটের ছায়ায় বসে বসে যেমন জীবনটা তেমনই চেহারাটাও ওই বটের ঝুরির মতো শীর্ণ আর রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। রাইচরণের চেহারাটা ফরসা, মুখটা সাদা কাগজের মুখোশ বলে মনে হয়। আস্তে আস্তে এক-একবার উঠে শরীরটা টান করে আর হাই তোলে রাইচরণ। সেই সময় ওর ছেঁড়া গেঞ্জি ভেদ করে বুকের পাঁজরগুলি কাঁটার মতো যেন ফুটে বের হয়।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, একটু ফাঁকা পেয়ে আর গণৎকার রাইচরণকে, একলা পেয়ে কেউ কেউ একাই এগিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকায়। তারপর বলে, "একটা কথা একটু শুনে বলে দেবেন ঠাকুরমশাই?"

"কি?"

"ভালোবাসার মানুষটা ঠকাবে না তো?"

"কতদিনের ভালোবাসা?"

"তা মন্দ দিনের নয়। এ ধরুন এক বছর।"

"সধবা, কুমারী, না বিধবা?"

"বিধবা।"

"নামের প্রথম অক্ষরটা বলুন।"

"প।"

একটু ভেবে নিয়ে রাইচরণ বলে, "যদি দু'আনা দেন তবে নখদর্পণ করে বলে দিতে পারি।"

দু'আনা পয়সা বের করে রাইচরণের হাতের কাছে রেখে দেয় জিজ্ঞাসু লোকটি। রাইচরণও লোকটার হাতটা কাছে টেনে নিয়ে তার একটা আঙুলের নখের ওপর কড়ি ঘষে। তারপর নখের দিকে অপলক চোখ তাকিয়ে থাকে। তারপর খুশি হয়ে বলে, "হাসছেই তো দেখলাম।"

"তার মানে?"

"তার মানে ঠকাবে না।"

অন্যদিনের মতো আজও বটের ছায়ায় মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাইচবণেব গণৎকারিতা। ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে ছোলা চিবোয, আব সামনের টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে আসে।

রাইচরণের বয়স মন্দ হয়নি। চল্লিশ বছর তো নিশ্চয। কিন্তু এত বেশি শুকিয়ে আর পাকিয়ে গিয়েছে বলেই একটু বুড়ো-বুড়ো দেখায়। কিন্তু এই বটের ছাযা থেকে অনেক দূরে বেহালার বস্তির মেটে ঘবেব দবজাব সামনে তুলসীব বেদীব কাছে যে এখন গম্ভীর হযে দাঁড়িযে আছে, সেই মানুষটিব চেহাবা কিন্তু আজও তাজা মাধবীলতার মতো ফুরফুর করে।

রাইচরণের বউ পারুলবালা। যে রাইচরণ গণৎকার, আকাশের রাহু-শনি-মঙ্গলের মতিগতির রহস্য হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে, সে আজ এই বটের ছায়ায় বসে কোন তন্দ্রার মধ্যে এখনও চমকে ওঠেনি। কিন্তু এতক্ষণে বেহালার বস্তিব মধ্যে সেই মেটে ঘরের ভিতরে গণৎকার রাইচবণের অদৃষ্ট ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মণিবাবু নামে এক ব্যক্তি, যে আজ এই তিন মাস

ধরে রোজই রাতে একবার এসে রাইচরণের সঙ্গে তাস খেলে চলে যায়। বড় ফিটফাট চেহারা মণিবাবুর, মানুষটিও বেশ শৌখিন। হারমনিয়াম মেরামতির কাজ জানে, মন্দ রোজগারও করে না। নইলে একমাস ঘনিষ্ঠতা হতেই পারুলকে এমন সুন্দর একটি রেশমী শাড়ি উপহার দেয় কেমন করে? রাইচরণ নিজেও শাড়ি দেখে খুশি হয়ে বলেছিল, "বাঃ, বেশ চমৎকার!"

সেই মণিবাবু বেশ একটু গম্ভীর এবং বেশ একটু ব্যস্তভাবে বলে, "আর দেরি করে লাভ নেই।"

পারুলবালা বলে, "তুমিই তো আসতে অনেক দেরি করে দিলে। আমি তো ভেবেই মরছিলাম, এ আবার কোন্ এক নতুন ঠগের পাল্লায় পড়লুম।"

রাইচরণকে আজ ঠগ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছে পারুল, এবং মনে হয়েছে, এই পৃথিবীর মধ্যে মণিবাবুই একমাত্র মানুষ, যে কখনই ঠগ হতে পারে না, এবং কোনদিনও হবে না।

জ্যোতিষবিদ্যার কারবার করি, কত রাজা-মহারাজা আমার খদ্দের, কলকাতার বাসায় ঠাকুর-চাকর আছে, এইরকম একটি অতি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে পারুল নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে এক গেঁয়ো মামাবাড়ির দাসীপনা থেকে উদ্ধার করেছিল যে, সে হলো ওই রাইচরণ। আজ পারুলবালা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ভাবে, সেই নির্দয় মামাবাড়ির দাসীপনা তবু ভালো ছিল। কিন্তু এ কি সর্বনাশ করল লোকটা! মিথ্যে কথা বলে পারুলেরও মন ভিজিয়ে দিয়ে, অনেক ভালোবাসার কথা বকে বকে পারুলের মনের ভিতরটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়ে, তারপর সত্যি অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করে নিয়ে এসে আজ ও কোন্ দশার মধ্যে পারুলের জীবনটাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে রাইচরণ ঠগ?

রাইচরণকে সহ্য করেছে শুধু, ক্ষমা করতে পারেনি পারুল। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। লোকটার শুধু চেহারাটাই দেখতে ভালো ছিল, আর কথাগুলি মিষ্টি। তাই দেখে পারুলের মন ভুলেছিল নিশ্চয়, স্বীকার করে পারুল, এবং সেই ভুলের জন্যই তো তার আজ এই দশা। আটটা বছর ধরে একেবারে একটানা হাভাতে জীবন সহ্য করতে হয়েছে। কত মুলুকেই না পারুলকে ঘুরিয়ে মেরেছে লোকটা। বর্ধমান, ধানবাদ, রাঁচি, মুঙ্গের। মানুষের ভাগ্য গুনতে গুনতে ছটফট করে দুনিয়ার চারদিকে যেন ছুটে বেড়িয়েছে লোকটা, তবু বিয়ে-করা বউটাকে পেট ভরে ভাত খাওয়াতে পারেনি। এক-আধটা গয়নার সাধ তো দুঃস্বপ্ন। এমন দিন গিয়েছে, যখন শাড়ির অভাবে ঘরের ভিতরে গামছা পরে বন্ধ থাকতে হয়েছে।

ধানবাদে থাকতে একদিন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘরের বাইরে এসে যেচে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে দুরবস্থার কথা বলে টাকা নিয়েছিল পারুল। আজও মনে পড়ে পারুলের, সেই ভদ্রলোক ঠিক সন্ধ্যা হতেই এসে ঘরের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল পারুল। অনেক মাপ চেয়ে তবে রেহাই পেয়েছিল।

আজ মনে হয়, সেই বাজে কাঁদুনির কোন অর্থ হয় না। সেই ভদ্রলোককে দরজা খুলে দিলে কি এমন খারাপ হতো? রাইচরণকে ঘেন্না করতে করতে এ-রকম অনেক কথাই অনেকবার মনে হয়েছে। অনেকবার বলেও দিয়েছে ও-রকম দু-চারটে কথা।

কিন্তু রাইচরণ নির্বিকার।

আজও নির্বিকার মনে অদৃষ্টের একগাদা নোংরা ঝুলি-ঝোলা নিয়ে কোন এক বটগাছের ছায়ার কাছে গিয়ে বসে আছে লোকটা। মিথ্যে কথা বলে লোক ঠকায়। ঠকিয়ে বিয়ে করে। আজ কিন্তু ওর এতদিনের নির্বিকার ঠগিপনার উপর অদৃষ্টের প্রতিশোধ ঘনিয়ে এসেছে। তাই এসেছে মণিবাবু।

এই তিনটে মাস মণিবাবু নামে মানুষটা অনেক মায়া করেছে বলেই পারুলের সাজটা একটু রঙিন হয়েছে। পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মণিবাবুর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল পারুল : "আমার কষ্ট দেখলে আপনি কাঁদবেন কেন? আপনি তো আমার কেউ নন।"

মণিবাবু বলেছিল, "কেউ নই বলেই তো দুঃখ হচ্ছে পারুল, তাই যতখানি সাধ আছে ততখানি করতে পারছি না।"

সেই একটি সন্ধ্যায় এই তুলসীবেদীর কাছে দাঁড়িয়ে মণিবাবুর কথাগুলি শুনে মনে পারুলবালার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। কিন্তু তারপর আব নয়।

মণিবাবু বলেছিল, "যতদিন বাঁচি ততদিন দূরে থেকেই তোমাকে ভালোবাসব। থাক, তুমি যেমনটি আছ তেমনটিই থাক। আমি যেন তোমাকে শুধু মাঝে মাঝে দেখতে পাই।"

পারুলবালার গলার স্বরটা বিভোর হযে বলে, "মাঝে মাঝে কেন, রোজই দেখে যেয়ো।"

রোজই এসেছিল মণিবাবু এবং বাইচরণের সঙ্গে তাস খেলেছে। বাজার করে নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে কপি আর চিংড়ি আর মুগের ডাল।

পারুলবালা আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, আর মনে মনে ঘেন্নায় জ্বলে গিয়েছে, রাইচরণ নির্বিকার মনে সেই কপি-চিংড়ি আর মুগের ডালেব রান্না খেয়েছে। বেহায়াটা যেন নিজের রোজগারের জিনিস গর্ব করে খাচ্ছে।

মণিবাবুকে ভালো লাগে। খুব ভালো করে সেজে মণিবাবুর চোখের সামনে দাঁড়াতে ভালো লাগে। মুগ্ধ হয়ে যায় মণিবাবু। কিন্তু দেখতে পায় পারুল, রাইচরণ নামে যে লোকটা তার স্বামী হয়ে বসে আছে, সেই লোকটা যেন কিছুই দেখতে পায় না।

"আর এভাবে নয় পারুল," যেদিন মণিবাবু পারুলেব হাত ধরে এই কথাটা বলে ফেললো, সেদিন পারুলের মনটাও যেন গলে গেল।

পারুল বলে, "আমিও বলছি আব এভাবে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না।"

"তা হলে যাবে?"

"যাব।"

সেই যাবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। বেহালার বস্তির ভিতরে একটা মেটে বাড়ির অদৃষ্ট আজ আর কিছুক্ষণ পরেই শূন্য হয়ে যাবে। ব্যস্তভাবে বাক্স সাজাতে থাকে পারুলবালা।

মণিবাবুই দিয়েছে, সেইসব রঙিন শাড়িতে বাক্স ঠাসা। মণিবাবুই দিয়েছে দুটো গয়না, কানের আর গলার। সে দুটোও বাক্সের ভিতরে আছে। তবে আর সাজবারও

দেরি করবার কী আছে?'

বাক্সের ভিতরে ছেঁড়া পুরনো আবর্জনার মতো অনেক জিনিস আছে। সেগুলি ফেলে দিলে বাক্সটা একটু হালকা হয়।

মণিবাবু বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরনো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও।"

বাক্স উপুড় করে পারুলবালা। পারুলের দু'হাতে যেন ডাকাতির নেশা পেয়ে বসেছে। চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চকচক করে। নাক আর কান তেতে যেন জ্বলছে, লালচে হয়ে উঠেছে। আট বছরের জীবনের মতো ছেঁড়া নোংরা কুৎসিত স্মৃতিকে এখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাবার জন্য ছটফট করছে এক নারীর ঘৃণাভরা মন।

হাঁপাতে থাকে পারুল। মণিবাবু বলেন, "কী হলো?"

পারুল বলে, "একটা লাল চেলির জোড় রয়েছে দেখছি।"

মণিবাবু চেঁচিয়ে ওঠে, "ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে পারুল। তারপর চেলির জোড়টাকে গুছিয়ে পাট করে তাকের উপর রেখে দেয়। হো-হো করে হেসে ওঠে মণিবাবু।

আবার বাক্স সাজায় পারুল। মণিবাবুরই দেওয়া যত উপহারের সম্ভার—আয়না, পাউডার, সুগন্ধ তেল, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুরী আর ধনেখালির রঙিন শাড়ি। কানের দুল আর গলার হার।

"চলো এইবার। আর দেরি করা ভালো নয়।"

পারুলবালার চোখ দুটো নিথর হয়ে শুধু দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই চমকে উঠে ঘরেরমেঝেটার দিকে তাকায়। মণিবাবু বিরক্ত হয়ে বলে, "কি হলো?"

পারুল বলে, "এইসব ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে পড়ে ঘরটাকে বড় বিশ্রী করে দিল যে। কেমন নোংরা দেখাচ্ছে যে!"

হ্যাঁ, দেখে মনে হয়, চোর ঢুকে একটা একলা অসহায় ঘরে বুকটাকে যেন তছনছ করেছে। পারুল বলে, "একটু দাঁড়াও, যাচ্ছি যখন, তখন ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে যাই।"

"কী আশ্চর্য!" চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু।

ঘর গোছায় পারুলবালা। এখানে-ওখানে বাসনগুলি পড়ে আছে। ঘটিটা এরই মধ্যে গড়িয়ে একটা ভাঙা টিনের পেঁটরার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ঘটিটাকে তুলে নিয়ে দরজার পাশে রেখে দেয় পারুল।

মণিবাবু বলে, "যত সব বাজে যাচ্ছেতাই কাজ আবার শুরু করলে কেন পারুল?"

পারুল বলে, "কিছু নয়, কিছু নয়। লোকটা এস হাত-মুখ ধোবার জন্য ঘটিটা খুঁজে খুঁজে যেন মিছে হয়রান না হয়...তাই।"

মণিবাবু গম্ভীর হয়, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু পারুল।"

পারুল বলে, "এই তো আমি তৈরি। শুধু একটু...।"

আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে থাকে পারুল। একটা ছেঁড়া কামিজ দেয়ালের একটা গোঁজের সঙ্গে ঝুলছে। ময়লা ছেঁড়া কামিজ, তালি ছিল, সেই তালিটাও খুলে গিয়েছে। সেই তালিটাকে সেলাই করে জুড়ে দিতে আর কামিজটাকে একটু ধুয়ে কেচে রাখতে পারেনি পারুল, ভুলেই গিয়েছে। তাই লোকটা কদিন ধরে শুধু

ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কাজে বের হয়ে যায়।

মণিবাবুর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয় যেন, "মনে হচ্ছে, তুমি এখন ওই ছেঁড়া কামিজ সেলাই করতে বসবে।"

যেন একটা খেলা পেয়েছে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলে, "একটু দিই না কেন? কতক্ষণই বা সময় লাগবে?"

"বাঃ!" ভ্রূকুটি করে মণিবাবু।

"আচ্ছা থাক"—ভয় পেয়ে আর অপ্রস্তুত হয়ে মণিবাবুর মেজাজ শান্ত করবার জন্য পারুল টেনে টেনে হাসতে থাকে। "আমাকে তুমি যতটা বোকা মনে করছ, ততটা বোকা আমি নই।"

মণিবাবুও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। বাক্সটাকে নিজেই হাতে তুলে নিয়ে বলে, "চলে এসো। বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।"

পারুল বলে, "তুমি গিয়ে বাইরে দাঁড়াও, আমি এক মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে আসছি।"

বাক্সটা হাতে নিয়ে দরজা পার হয়ে বাইরের তুলসীর বেদীর কাছে ছায়ান্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মণিবাবু। পরমুহূর্তেই দেখে চমকে ওঠে, বুঝতে পারে মণিবাবু, ঘরের ভিতর আলো জ্বেলেছে পারুল। উঃ, কত থিয়েটারী ঢঙ। রাগ চাপতে চেষ্টা করে মণিবাবু।

দাঁড়িয়ে থেকে শুধু ছটফট করে মণিবাবু। অনেকক্ষণ তো হলো। এখনও আসে না কেন পারুল?

আবার এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় মণিবাবু। আবার চমকে ওঠে এবং স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু দেখেও ঠিক বুঝতে পারে না মণিবাবু, এ কী করছে পারুল? উপুড় হয়ে ঘরের মেঝের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যেন প্রণাম করে পড়ে রয়েছে পারুল।

"ও কি হচ্ছে?" গর্জনের মতো স্বরে, আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ডাক দেয় মণিবাবু।

প্রণাম নয়, প্রণামের মতো একটা ঢঙ। উনুনটার কাছে মেঝের উপর মাথা পেতে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পারুল। উনুনের উপর একটা কড়া—কড়ার মধ্যে শুকনো একটা রুটি আর এক ছিটে রান্না-করা শাক।

আস্তে আস্তে মুখ তোলে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকায়। তারপরেই পাগলের মতো চোখ করে যেন একটা প্রলাপ বিড়বিড় করতে থাকে : "তা হলে লোকটা আজ ঘরে ফিরে এসে খাবে কী মণিবাবু? বলতে গেলে কিছুই যে নেই। ওই একটা শুকনো রুটি আর...।"

চিৎকার করে ধমক দেয় মণিবাবু, "তুমি কি এখন তা হলে রান্না আবস্ত কববে, হতভাগী মেয়েমানুষ?"

কোন উত্তর দেয় না পারুলবালা।

মাত্র আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মণিবাবু। তারপরেই বাক্সটাকে বেশ শক্ত করে ধরে নিয়ে দরজার দিকে সরে যায়।

চলে যাবার আগে আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু : "তোমার ওই ঠগ সোয়ামির চেয়ে তুমি আরও ভয়ানক ঠগ। ছিঃ!"

বিষ হয়ে গেছে অমৃত

অন্নদাশঙ্কর রায়

কথাটা হঠাৎ সেদিন মনে পড়ে যায়। কে বলেছিলেন। কবে। কোন উপলক্ষে। স্মরণ করতে গিয়ে উমাপতি ধর দেখেন তাঁর মনের পরতে কোথাও কোনো চরণরেখা নেই। চারদিকে শূন্যতা। মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে ওই ক'টি অক্ষর। "বিষ আমার ভাগ্যে অমৃত হয়ে গেছে।"

এখন তাঁর কাজের চাপ কমেছে। পূজার উপন্যাস শেষ হয়েছে। তাই একটু অবসর পাচ্ছেন ভাববার। সকাল থেকে লেগে আছেন ওর পেছনে। জিগ্‌স পাজ্‌ল যেমন করে আস্তে আস্তে জোড়া লাগে তেমনি করে জুড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো। গড়ে উঠছে একটা স্মৃতিগত ঐক্য। এখানে ওখানে দু'চারটে টুকরো নিরুদ্দেশ। পরে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। তখন যার যার জায়গায় বসিয়ে দিতে পারা যাবে।

না পারলে কল্পনা আছে কী করতে। ফাঁক যদি কোনো মতে না ভরে তবে কল্পনা দিয়ে ভরাতে হবে। মিশ যদি না খায় নিরুপায়।

দুই

ময়মনসিং থেকে কলকাতা আসার পথে যমুনা নদী পার হবার সময় স্টীমারে আলাপ। ভদ্রলোক পরিচয় শুনে বলেন, "কাব্য পড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন নয় গো। নিরাশ হলুম, মিস্টার ধর।"

ধর কাষ্ঠহাসি হেসে বলেন, "আমার দুর্ভাগ্য, ডক্টর ব্রহ্ম।"

ওঁদের ডেকে ওঁরা যাত্রী বলতে তিনজন কি চারজন। ঘুরে ফিরে বার বার দেখা। ধরও ভালোবাসেন হেঁটে বেড়াতে। ব্রহ্মও তাই। ছোট একটা খাঁচায় একজোড়া শার্দুল। মুখোমুখি ও ঠোকাঠুকি অনিবার্য হলেই ইনি বলে ওঠেন, 'সরি।" উনি বলে ওঠেন, "পার্ডন।"

ভদ্রলোকের চেহারা থেকে মনে হয় না যে রাতে ঘুম হয়। চোখের কোল ফোলা। সিগারেট টানছেন তো টানছেন। একটা ফুরোলে আরেকটা। তাও পুরোপুরি ফুরোতে দেন কই! পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন। হুঁশিয়ার করে দিলে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দেন। "বুঝতে পারছি আপনি একটা তত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, ডক্টর ব্রহ্ম।"

"তত্ত্ব না হাতি। আমি মরছি, মশায়, প্রাণের জ্বালায়। দারুণ অশান্তি ভোগ করছি। দাবদাহ জানেন তো। আর হরিণ।"

"ওঃ তাই নাকি। আমার সমবেদনা।" বলে ধর তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দেন।

"ধন্যবাদ। কী খাবেন, বলুন। হুইস্কি আর সোডা। বীয়ার আর—"

—"নো, থ্যাঙ্কস। কোল্‌ড ড্রিঙ্ক।" ধর ও রসে বঞ্চিত।

"তা হলে আপনি একজন ওল্‌ড ম্যান ব্রহ্ম পরিহাস করেন। "ওল্‌ড ম্যান বললে আমি তেমন খুশি হইনে যেমন হই ওল্‌ড ফ্রেন্ড বললে।" ধর তাঁর পিঠ চাপড়ে

দিয়ে বলেন।

"ওল্ড অ্যাডমায়ারার যদি বলি তা হলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন। উমাপতি ধরের কবিতা আমরা ছাত্রবয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। কোথায় গেল সেসব দিন। আপনিও আর কবিতা লেখেন না। আফসোস।"

পাশাপাশি জমিয়ে বসা গেল। দৃষ্টি যমুনার উপরে। সে বেচারি শুকিয়ে এসেছে। মাসটা বোধহয় জ্যৈষ্ঠ। বর্ষণের দেরি আছে। গলাটাও তেমনি শুকিয়ে যাচ্ছে।

কখন একসময় ব্রহ্ম শোনাতে শুরু করেন তাঁর চাকুরি জীবনের দুঃখের কাহিনী। অন্যায়ভাবে বদলি আর সুপারসেসন। অন্যায় রিপোর্ট আর রিমার্ক। বছরের পর বছর কেস সাজিয়ে যাওয়া যাতে এফিসিয়েন্সি বারে আটকায়।

কে কাকে শোনাবে। কে না ভুগেছে। ধর মনে মনে বিরক্ত হন। চাকুরির বিষ তাঁর আস্বাদন করতে বাকী নেই। তবে আকণ্ঠ পান করতে তখনো কিছু বাকী।

"মাই ডিয়ার ব্রহ্ম," তিনি তাকে পরামর্শ দেন, "আপনি একবার আপনার উজির সাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ করুন। শুনেছি সদাশয় লোক।"

"করিনি ভাবছেন। উজির সাহেব আমাকে সিগরেট অফার করলেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং আমার সিগরেট ধরিয়ে দিলেন, তারপর নিজেরটা ধরালেন। কিন্তু তারপর যা বললেন তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। বললেন, আমি মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি, মুসলমানের ভোটের জোরে মন্ত্রী হয়েছি, মুসলমানের কাছেই আমার দায় দায়িত্ব। মুসলমানের জন্যে কী করতে পারি সেই আমার একমাত্র ভাবনা। নইলে পরের বার কেউ আমাকে ভোট দেবে না। আমি আবার সেই ফকির। আপনার চাকরি তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। সামান্য একটা প্রমোশন, তার জন্যে কেন এত মাথাব্যথা।" ব্রহ্ম উত্তেজিত হয়ে বলেন।

ধর দুঃখিত হয়ে উপদেশ দেন ভগবানে বিশ্বাস রাখতে। ব্রহ্ম তা শুনে আরো উত্তেজিত হন। বলেন, "আমার পদবীটাই ভগবানের নামে। অথচ আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক। বায়োলজিতে ওরকম কোনো জীব নেই, ফিজিক্সে ওরকম কোনো পদার্থ নেই, বিজ্ঞান ওঁর কোনো সন্ধান রাখে না। ভগবান! ভগবান থাকলে ত্রিশ লক্ষ মহাপ্রাণী দুর্ভিক্ষে মারা যায়। তাও মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে। আর ওই হিরোশিমার পরমাণু বোমা। আহা, পরমাত্মার অস্তিত্বের কী মহৎ প্রমাণ।"

ধর তাঁর ব্যথা বোঝেন। সমবেদনার সঙ্গে বলেন, "আপনি এখনো যুবক। ইচ্ছা করলে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে পারেন। নিজেই তো বললেন বিয়ে করেননি।"

তিন

প্রসঙ্গটা এবার অন্য মোড় নেয়। জীবিকার কথা ছেড়ে এবার জীবনের কথায় ধ্যান দেন। জীবনই তো বড়ো। জীবিকা তার তুলনায় কতটুকু।

"সেদিক থেকেও আমি হ্যামলেটের মতো দোদুল্যমান। কিন্তু তার আগে সবটা শুনবেন কি! কাহিনীটা মনোহর নয়। কাহিনী না বলে কিস্‌সা বলতে পারি।"

"কিস্‌সা।" ধর চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিস্‌সা শুনতে কার না ভাল লাগে। তিনি

মনে মনে এখনো বলেন, আমি বুড়ো হইনি, ভায়া। গম্ভীরভাবে বলেন, "আচ্ছা।"

"কলকাতায় বদলি হয়ে সেবার এক মাঝারি হোটেলে সাময়িকভাবে বাস করছি। কবে কোথায় ঠেলে দেয় তার স্থিরতা কী। সেখানে থাকতে একটি ফুটফুটে খোকার সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। বরাবরই আমি ছোট ছেলেমেয়েদের ভালোবাসি। ওদের জন্যে বিস্কুট লজেন্স চকোলেট রাখি। খোকার সঙ্গে দেখা হলেই পকেট খালি হয়ে যায়। দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে লুট করে।

ওর মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন আর হাসতে হাসতে শাসান। আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করেন, কিন্তু ধন্যবাদ দেন না। কথা বলেন না। ওর বাপকে বড়ো একটা দেখিনে। কখন আসেন, কখন যান, কতক্ষণ থাকেন তাতে আমার কাজ কী। আমি আমার আপনার ধান্দায় ব্যস্ত। নামধান পরিচয়ও জানিনে। জানতেও চাইনে। তবে একটা আভিজাত্যের আভাস পাই। অভিজাত অথচ অভাবগ্রস্ত।

যা আমি কল্পনাও করিনি তাই একদিন ঘটে। ভদ্রমহিলা একদিন খোকার হাত ধরে আমার ঘরের সামনে এসে টোকা দেন। আমি শশব্যস্ত হয়ে সুপ্রভাত জানাই। তিনি বলেন, "আপনি তো ডাক্তার। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন।"

"আমি ডাক্তার নই, ম্যাডাম। আমি ডক্‌টর। বলেন তো আপনাকে ডাক্তার ডেকে দিতে পারি।"

ভদ্রমহিলা তখন পূর্ণগর্ভা। লেডী ডাক্তারের প্রয়োজন। কিন্তু হোটেলে নয় নিশ্চয়। তিনি আমার ভাব দেখে বলেন, "দেরি আছে। কিন্তু এখন থেকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আমার কর্তাটি প্রায়ই টুরে যান। নির্ভর করতে পারি এমন একজনও নেই। খোকনকে যখন এত ভালোবাসেন তখন আপনিই ভরসা।"

ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। টাকা যা লাগে তিনিই দেন। সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি আমাকে একটি আশ্চর্য কথা বলেন। তাঁর স্বামী একমাস তাঁর কাছে আসেননি, অথচ আছেন কলকাতাতেই! টেলিফোনের ঠিকানা দিয়েছেন, কিন্তু বাসার ঠিকানা দেননি। তাঁর বাসার ঠিকানা খুঁজে বার করা কি সম্ভব। আমি কি পারব এটুকু উপকার করতে।

এমন কিছু নয়! সীলভাম রিট্রীট, রিজেন্টস পার্ক, টালিগঞ্জ খুঁজে বার করতে কতটুকু উদ্যোগ লাগে! তা শুনে ভদ্রমহিলা বলেন, "আমার স্বামীকে টেলিফোন করে সাড়া পাইনে। চিঠি লিখে সাড়া পাব কি না কে জানে! আমাকেই যেতে হবে দেখছি, কিন্তু ওরা যদি আমাকে ঢুকতে না দেয়। যদি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেয়। তা হলে কী হবে, ডক্‌টর ব্রহ্ম। আপনিও চলুন না, লক্ষ্মীটি।"

অদ্ভুত আবদার। আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বলেন, "বুঝেছি, আপনি ভাবছেন এটা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রাইভেট ব্যাপার। এর মধ্যে আপনি নাক গলাবেন কেন। কিন্তু আমার যে কেউ নেই, ডক্‌টর ব্রহ্ম। সবাই আমাকে ছেড়েছে। যাঁর জন্যে ছেড়েছে তিনিও আমায় ছাড়লেন কি না জানতে চাই।"

সেদিন তিনি আমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বৃত্তান্ত বলেন। দেওগড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন তাঁর বাবা। সেসময় রাজবংশের একটি ছেলে তাঁদের বাড়িতে আসত, বাংলা

শিখত, পারিবারিক উৎসবে যোগ দিত। তারপর সে ছেলে বড়ো হয়ে কলকাতায় কলেজে পড়ে, কিন্তু বাল্যসখীকে ভোলে না। দেওয়ানও ততদিনে অবসর নিয়েছেন, নিয়ে কলকাতায় বাস কবছেন। ছেলেটি একদিন বিয়ের প্রস্তাব করে, কিন্তু ক্ষত্রিয়কে কন্যাসম্প্রদান করতে ব্রাহ্মণের আপত্তি। তা ছাড়া রাজ্যের বাইরে বাড়ি নেই, জমি নেই, অন্য কোনো উপার্জনের উৎস নেই। রাজবংশের ছেলে বলে চাকরি যদিবা জোটে তা দিয়ে ঠাট বজায় রাখা দায়। ওদিকের গুরুজনও অসম্মত। ওঁরা নাকি এক ক্ষত্রিয় পরিবারে বিয়ের সম্বন্ধ কবে ফেলেছেন।

আর কিছুদিন দেরি করলে প্রদ্যুম্নকে পাওয়া যেত না। তাই ললিতাগৌরী বাপ মার অমতে ওকে বিয়ে করেন। সিভিল ম্যারেজ। সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় মাসোহারা বন্ধ হযে যায়। শুরু হয় অর্থকষ্ট। টার্ফ ক্লাবে একটি চাকরি জুটে না গেলে পথে বসতে হতো। ছেলেটি যেমন সুপুরুষ তেমনি নিপুণ ঘোড়সওয়ার। আদবকায়দায় অদ্বিতীয়। লেখাপড়ায় গ্র্যাজুয়েট। বিভিন্ন রাজপরিবারের সঙ্গে তার কানেক্‌শন আছে। আর কী চাই?

কিন্তু টার্ফ ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে সমান হতে হলে সমান খরচ করতে হয়। অভিজাত স্টাইলে থাকতে হয়। একজন কর্মচারীর পক্ষে তা সম্ভব হবে কেন? দু'দিক মেলাতে গিয়ে দেখা যায় মিলছে না। ধার-কর্য করতে হয়। অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। প্রদ্যুম্নকে উদ্ধার করেন রাজমাতা অফ বিজয়কোণ্ডা। দূর সম্পর্কের মামী। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি পদ দিয়ে। ললিতাগৌরী ও খোকা থাকে হোটেলে, প্রদ্যুম্ন কলকাতায় এলে হোটেলে রাত কাটান, কিন্তু সারাদিন রাজমাতাব ওখানে ডিউটি দেয়। কলকাতায় তাঁর রেসের ঘোড়া আছে। সেই সূত্রে তাঁকে প্রায়ই কলকাতা আসতে হয়। ঘোড়দৌড়ের মরসুমে তিনি কলকাতা থেকে নড়েন না। ছেলেকে গদিতে বসিয়ে তিনি এখন স্বেচ্ছাপতি।

ব্যাঙ্কে ঢালা হুকুম দেওয়া আছে। মাসে মাসে প্রদ্যুম্নর মাইনে ললিতাগৌরীর হিসাবে জমা দেওয়া হয়। নিজের জন্যে প্রদ্যুম্ন একটি পয়সা রাখেন না। তাঁর যাবতীয় খরচ রাজমাতার পার্সনাল এস্টাব্লিশমেন্টের খরচেব সামিল। এর চেয়ে লোভনীয় বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে। ললিতাগৌরী তো হাতে স্বর্গ পায়। তখন যদি জানতেন এব পেছনে কী আছে! এখন একটু একটু করে জ্ঞান হচ্ছে আর জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতাপ হচ্ছে।

চার

একদিন বেরিয়ে পড়া গেল লালসাহেবের খোঁজে মিসেস লালকে নিযে। সঙ্গে আমার বন্ধু সৈকত। গাড়ীটা তারই। ললিতাদিকে বলি, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি যেন আমাদের সামনে লালসাহেবকে গালমন্দ না করেন। আপনার কাছে আসতে না পাবার গুরুতর কারণ থাকতে পারে। কৈফিয়ৎ না চেয়ে শুধু বলবেন, চল, দরকারী কথা আছে।

বনস্থলীর মধ্যে সীলভান রিট্রীট। আমরা বাইরে দূরে মোটর রাখি, ভিতরে নিতে

সাহস হয় না। ললিতাদিকে বলি মোটরে বসে অপেক্ষা করতে। সৈকত তাঁর প্রহরী হয়। ভিতরে ঢুকতে যাব এমন সময় একটা মোটর আমাকে পাশ করে চলে যায়। ভিতরের দিকেই। আন্দাজে বুঝতে পারি ড্রাইভ করছেন লালসাহেব স্বয়ং। তাঁব পাশে বসেছেন রাজমাতা সাহেবা।

ব্লু ভীনাস। ব্লু ভীনাস। প্রমথ চৌধুরীর বর্ণনা পড়েছেন নিশ্চয়। বয়স তাঁর রূপকে একটুও ম্লান করেনি। নিখুঁৎ ভাস্কর্য আর কী ডিগনিটি। রাজরানী বটে। মোটর গাড়ীবারান্দায় থামে। তিনি লালসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্দরে যান। গাড়ী সেখানেই রেখে লালসাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসেন। বোধহয় স্ত্রীকে লক্ষ্য করেছেন। আরো এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি তাঁকে গ্রীট করে আমার পরিচয় দিই। তিনি এমন সুরে "হ্যালো" বলেন যেন কতকালের চেনা। অবশ্য আমাকে তিনি হোটেলেই দেখেছিলেন, যদিও জানতেন না আমি কে। আমি তাঁকে বললাম আমরা কেন এসেছি। তাঁর স্ত্রীর যে রকম অবস্থা যে কোনো দিন নার্সিং হোমে যেতে হতে পারে। রিজেন্টস পার্ক পর্যন্ত আসা তো রীতিমতো ঝুঁকি নেওয়া। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দেখা না করে তিনি নার্সিং হোমে যাবেন না। কে জানে যদি পরে কখনো দেখা না হয়। যদি না বাঁচেন। তাঁকে অভয় দেবে কে। কার কাজ সেটা। ডাক্তারের। নার্সের। না স্বামীর!

"সব বুঝি। কিন্তু দেখছেন না শোফার নেই, সে ছুটিতে গেছে, আমাকেই ড্রাইভ করতে হচ্ছে। কী করে বলি, আমাকেও ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক! শেষে কি চাকরিটা খোয়াব। আপনিও তো চাকরি করেন। বলুন দেখি, ছুটি কি চাইলেই পাওয়া যায়। একটু পরেই ওঁকে নিয়ে আবার বেরোতে হবে। লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে। ডিনার তো রোজ বাইরে খাওয়া হয়। কখনো হোটেলে, কখনো ক্লাবে, কখনো রাজারাজড়াদের সঙ্গে। ফিরতে রাত এগারোটা থেকে বারোটা। একটু ফুরসৎ পেলেই আমি আসব। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, ডক্‌টর ব্রহ্ম।"

স্বামীকে দেখে স্ত্রীর ও স্ত্রীকে দেখে স্বামীর মুখ আনন্দে উদ্‌ভাসিত। ওরা সত্যি দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে। অদর্শনটা সাময়িক। কারণটা বিশ্বাসযোগ্য।

উভয়েব উপরোধে আমাকেই নিতে হয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার ভার, সেখানে খাবার পৌঁছে দেবার ভার, এদিকে খোকনকে সামলাবার ভার। অবশ্য আয়া ছিল। এসবও করি, সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিও দিই। একটু আধটু গাফিলতি না ঘটে পারে না। তাবজন্যে কী কৈফিয়ৎ দেব? পরার্থে আত্মদান? শত্রুবা রটায় ওটা আমাবই স্বার্থ। বাপ আমিই। শুনে তো আমি থ। কেমন করে বোঝাব, কাকে বোঝাব যে বাপ কলকাতায় থেকেও ভার নিতে অক্ষম। তাঁকে সংসাব চালানোর জন্যে অর্থোপার্জন করতে হয়। মনিবের কাজ আগে।

মেয়ে হয়। নাম রাখা হয় প্রতিমাগৌরী। আমি যদি ওই সৌন্দর্যপ্রতিমাকে নিয়ে মেতে উঠে থাকি তবে সেটা আমি ওর জনক বলে নয়। বাপ থাকতেও বেচারি বাপের আদর পাচ্ছে না, তাই আমি সে ফাঁক ভরিয়ে দিই। লোকে ভুল বুঝবে, বুঝুক। আমার গুরুজনের কাছে খবর যায়। মা নেই, বাবা দ্বিতীয় পক্ষ করাব পর

থেকে আমাদের প্রতি উদাসীন। আমিই ভাইবোনের প্রতিপালক। সেই জন্যে বিয়ে করিনি।

সত্যি একদিন বদলির হুকুম আসে। আমি অবাক হইনে, কিন্তু ললিতাদি অবাক হন। তিনি বলেন, "আপনি থাকতেই আমি এর একটা হেস্তনেস্ত চাই। আমার স্বামীর সঙ্গে। ওসব ওজর আপত্তি আমি শুনব না। হয় ওঁকে আমার সঙ্গে বসবাস করতে হবে, নয় আমাকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বাবার কি টাকা ছিল না যে আমি টাকার জন্যে আমার অধিকার বিকিয়ে দেব! কে চায় ওঁর মাইনের টাকা। আমি চাই ওঁর সঙ্গ। মামী ভাগনের এই রাধাকৃষ্ণ লীলা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমাকে দয়া করে উকীলের কাছে নিয়ে চলুন।

"এসব আপনি কী বলছেন, ললিতাদি।" আমি হকচকিয়ে যাই। "কী করে আপনি জানলেন যে ওটা রাধাকৃষ্ণ লীলা। যেখানে বয়সের এত তফাৎ।"

তিনি গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, "আমারও সেই ধারণা ছিল। সেই ধারণা থেকেই অনুমতি দেওয়া। এখন উনি ধরা পড়ে গেছেন। থাক, ওসব আপনি বুঝবেন না। ব্যাচেলার মানুষ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত নিগূঢ় যে কেউ যদি একদিনের জন্যে অবিশ্বাসী হয় তার পরের বার মিলনের সময় তার ব্যবহার বদলে যায়। তার কাছে আমি যেন আরেকজন। ভেবে দেখবেন কী ভয়ানক শাকিং আর রিভোল্টিং!"

আমি ব্যাচেলার মানুষ। আমি এর কী বুঝি। কিন্তু উকীল বাড়ি যাবার প্রস্তাবে ঘাড় নাড়ি। ঢি ঢি পড়ে যাবে। লালসাহেবরা উল্টে আমাকেই জড়াবেন। ব্যারিস্টাব দেবেন। ওঁদের মানে রাজমাতার, টাকার জোর বেশী। টাকা সত্যকে মিথ্যা করতে পারে, মিথ্যাকে সত্য করতে পারে, দিনকে রাত, রাতকে দিন।

ঝগড়া করতে নয়, মিটমাট করতে এমনি আমরা একদিন রিজেন্টস পার্কের বাড়িতে যাই। রাজমাতা দর্শন দেন না। লালসাহেব এসে অভ্যর্থনা করেন। কথাবার্তা চলছে, এমন সময় দেখি রাজমাতার সহচরী এসে লালসাহেবের সামনে সিগরেটের ট্রে রাখেন। লালসাহেব একটি সিগরেট বেছে নিলে সহচরী দেশলাই জেলে ধরিয়ে দেন। তারপবে যা ঘটে তা আরো বিচিত্র। লালসাহেব শুধু একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে প্রসাদ করে দেন। সিগারেট অন্দরে ফিরে যায়। রাজমাতা প্রসাদ পেয়ে ধন্য হন।

ললিতাদির মুখখানা যদি দেখতেন। কী লজ্জা, কী ঘৃণা, কী রাগ, কী—হ্যাঁ, অনুরাগ। প্রেম যেন আরো বেড়ে যায়। মেয়েরা যে কী চীজ সে আমি সেদিন প্রত্যক্ষ করি। আমি সরে যাই। ওদের দু'জনাকে মোকাবিলা করতে দিই। মিটমাট কবতে চায় ওরাই করবে। আমি কে যে ফপরদালালি করি।

মোটরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করি। কিছুক্ষণ পরে ললিতাদি এসে যোগ দেন, তাঁকে পৌঁছে দেন লালসাহেব। দু'জনের চোখে জল। দু'জনের মুখে হাসি। দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে কলকাতা থেকে বদলির জায়গায় যেতে পারি।

ওমা, কোথায় যাব। ললিতাদি ছুটে এসে আমার ঘরে আমার খাটের উপর ভেঙে পড়েন। আমি যদি বিভাকর ব্রহ্ম না হয়ে নিরাকার ব্রহ্ম হতুম তা হলেও হতভম্ব

হতুম। শয্যাটা তো আমার। লোকে বলবে কী। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আয়াকে ধরে নিয়ে আসি। দেখি সেও কাঁদছে। তারই মুখ থেকে শুনি যে লালসাহেব বিলেত চলে গেছেন।

পরে ললিতাদির কাছে জানতে পাই যে রাজমাতা ইউরোপ পরিদর্শনের সময় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্য চান। প্রদ্যুম্ন কখনো ইউরোপ দেখেননি। এই তার সুযোগ। ওভারসীজ অ্যালাওযান্স হিসাবে তিনি আরো টাকা পাবেন। সে টাকাও ললিতাদির হাতে আসবে। লালসাহেবের ইচ্ছা সেই টাকায় একটি মনের মতো ফ্ল্যাট নিয়ে ঘরকন্না পাতা। ললিতাদিও তাই চান। হোটেলের লোকের সামনে মুখ দেখানো দায়।

পরে যখন কলকাতা আসি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা করি। বালীগঞ্জের মেফেয়ারে আরামে আছেন। ঠিকানাটা এমন লোভনীয় যে হোটেলে যাঁরা কোনোদিন খোঁজ নিতে যেতেন না তাঁরা প্রায়ই আসাযাওয়া করেন ও মাঝে মাঝে থাকেন। তাঁর বৌদি, তাঁর বোন, তাঁর ভাইপো ভাগনের দল। বুঝতে পারি যে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি ফালতো লোক।

এই কথাটা যাঁহাতক ওঁকে বলা উনি গভীরভাবে বিচলিত হন। ঘরে আর কেউ তখন ছিল না। আমার কাছে সরে এসে বসেন ও এত আস্তে আস্তে বলেন যে তৃতীয় প্রাণীর কানে পড়ে না।

"বিভাকর, তুমিও কি আমাকে ছাড়বে? যাকে সবাই ছেড়েছে? এ যে দেখছ এটা তোমার দৃষ্টিবিভ্রম। আমি আরো নিঃসঙ্গ। কারণ তোমার সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনে।"

আমি কল্পনাও করিনি যে তিনি আমাকে ভালোবাসেন ও আমার ভালোবাসা চাইবেন। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া! সেদিন থেকে আমাদের সম্বন্ধটা বদলে যায়। হাঁ, আমিও তাঁকে ভালোবাসি। না ভালোবেসে পারিনে।

এর পরে আমি আবার কলকাতায় বদলি হয়ে আসি ও এক বন্ধুর ওখানে পেযিং গেস্ট হই। ললিতাকে একথা বললে সে অভিমান করে বলে, "পেটিং গেস্ট যদি হলে তো আমার এখানে কেন নয়? আমার ছেলেমেয়েরা তো কাকু বলতে অজ্ঞান! আমি একাই ওদের মা বাবা হতে পারব কেন। পারব কদ্দিন?"

ললিতার ওখানে পেযিং গেস্ট হওয়ার মানে যে কী তা আমি আন্দাজে বুঝেছিলুম। তবু একবার বাজিয়ে নিই। বলি, "যদি আত্মসংবরণ করতে না পেরে হঠাৎ একটু কিছু করে বসি তখন কি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, না আমি আমাকে ক্ষমা করব? না প্রদ্যুম্ন আমাদের ক্ষমা করবে?"

"আমার কথা যদি বল, সে অস্ফুট স্বরে বলে, "আমি প্রাণ ফিরে পাব।"

আমি মহামুনির মতো মৌন দেখে সে আরেকটু মুখর হয়। "আমার পোজিশনটা কী কুৎসিত। আমার স্বামী আরেকটি নারীর বক্ষিত। তার জন্যে তিনি যে শুল্ক পান তাই দিয়ে আমার জীবনযাত্রা চলে। আমাকে এই পাঁক থেকে টেনে তুলবে কে? তোমার মতো নিঃস্বার্থ ও শুদ্ধ কে আছে? তুমি যদি আমাকে নিরাশ কর আমিও

বকে যেতে পারি, বিভাকর। ও আগুন আমাকেও পুড়িয়ে খাক করতে পারে।”

এ এক বিদ্রোহঘোষণা। কিন্তু আমি কেমন করে ও আগুনে হাত দিই? যদি জানতুম যে ডিভোর্সের মামলা ফেস করতে পারব। তারপর বীরপুরুষের মতো বিয়ে করতে পারব।

তা ছাড়া আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ললিতা বা প্রদ্যুম্ন কেউ কাউকে ছাড়বে না। ওদের প্রেম আপাতত রাহুগ্রস্ত হলেও চিরকাল তা থাকবে না। যৌবনজ্বালা সইতে না পেরে ললিতা হয়তো আমাকে ধরা দেবে, কিন্তু প্রদ্যুম্ন ফিরে এলে মিঞা বিবি এক হয়ে যাবে। তখন আমাকে ওরা লাথি মেরে তাড়িয়ে না দেয় তো আমিই মানে মানে সরে পড়ব।

না, ভালোবাসাকে আমি ততদূর যেতে দেব না। ললিতাকে বলি আমি অসম্মত।

পাঁচ

লালসাহেবকে একটি ছোট পাখি খবর দেয় যে তাঁর স্ত্রী চন্দননগরের এক বিশিষ্ট পরিবারের কুলচন্দনের সঙ্গে দিবারাত্র মেলামেশা করছেন। তিনি ললিতাকেও দোষ দেন না, গোকুলকেও না। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে একটি পাঁচিল খাড়া করেন। দেওগড় থেকে সামন্তরানী আসেন কালীঘাটে তীর্থ করতে। ওঠেন পুত্রের ফ্ল্যাটে। বলতে ভুলে গেছি যে ওটা প্রদ্যুম্নর নামেই নেওয়া। ও তাসখানা লালসাহেব নিজের হাতেই রেখেছিলেন।

ললিতা বুঝতে পারে যে শাশুড়ি থাকতে সে যখন খুশি বাইরে যেতে পাবে না, যাকে খুশি বাড়িতে আনতে পারবে না। এরা হলো জাত ক্ষত্রিয়। যাদের ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। সেই মহাভারতের যুগের পর থেকে আজ অবধি এরাই ভারতের শাসকশ্রেণী, যদিও মোগল বা ব্রিটিশের দ্বারা পরাজিত। সামন্তরানী কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেন। দেওগড়ে ফিরে যাবার নাম করেন না। নাতি নাতনিকে নিয়ে তার সময় কেটে যায় মন্দ না। মালা জপ করার বয়স এখনো হয়নি। বিগতযৌবনা, কিন্তু রূপবতী। আর কি সুন্দর নাম নক্ষত্রমালী।

আমি তাঁকে দেখেই চিনতে পারি যে যৌবনে অনেক বাঘ শিখার করেছেন। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় থেকেই বুঝতে পারি যে, এ নারীকে “না” বলার সাধ্য আমার নেই। আর তামাশা দেখুন, আমাকেই ললিতা তাঁর গাইড হবার ভার দেয়। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠের সেইসব জাঁদরেল মূর্তি, এসব কে দেখাবে, কে বুঝিয়ে দেবে আমি যদি প্রদর্শক না হই! আসলে ললিতা চেয়েছিল শাশুড়ীকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে গোকুলকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে। আমারও আপত্তি ছিল না জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিতে। তবে হুঁশিয়ার ছিলুম যাতে ফলস পোজিশনে না পড়তে হয়। চাকরি খুইয়ে এক সামন্তরানীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে আমার রুচি ছিল না।

মাস তিনেক পরে আমি তাঁকে কলকাতার সিনেমা ও থিয়েটারগুলো দেখাচ্ছি, এমন সময় তুচ্ছ একটা ঘটনা ঘটে। অন্ধকাব প্রেক্ষাগৃহে আমার হাতখানা কেমন

করে তাঁর হাতে চলে যায় ও মুখ মদের আস্বাদন পায়। চেপে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিনা আমি শুকদেব, তাই ললিতার কানে তুলি। তখন কি জানতুম যে ওটা ব্ল্যাকমেলের উপকরণ হবে? বেচারি শাশুড়িকে দেওগড়ে ফিরে যাবার জন্যে চাপ দেওয়া হবে। যেদিন তিনি মনে মনে বিদায় হন সেদিন আমার দিকে তাকিয়ে অগ্নিবাণ হানেন। যেন বলতে চান, এটা মর্দানা নয়। প্রণাম করবার ছলে আমি তাঁর পায়ে ধরে মার্জনা চাই। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন ও সেই ছলে সমঝিয়ে দেন যে কোণারকের সেসব মূর্তি এখনো জীবন্ত। নারীর স্তন কাকে বলে তার জন্যে আমাকে মন্দির দেখতে যেতে হবে না।

লালসাহেবের এ চাল ব্যর্থ হবার পর বাকী থাকে সর্বশরীরে আগমন। আমি সেদিন দৈবক্রমে উপস্থিত ছিলুম। গোকুলকে নিয়ে তিনি এমন মজা করেন যে সে বেচারার গৌরবরণ লাল হয়ে যায়। ললিতার নিষ্ঠুর রূপ সেইদিন প্রত্যক্ষ করি। সে ষোল আনা স্বামীর দিকে। এবার সে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করবে। ঘরমুখো গোরা যেমন পেছন ফিরে তাকায় না সেও তেমনি। গোকুলকে আর তার দরকার নেই। এ এখন পুনর্মূষিক। ওই খেলাটা খেলেই সে স্বামীকে সাগর পার থেকে ঘরে টেনে আনতে পেরেছে। উপায়টা হয়তো নীতির দিক থেকে শুচি নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

সে আর ক'টা দিনের জন্যে। প্রদ্যুম্ন একদিন আমাকে বলল, "তুমি যদি তোমার চাকরি ছেড়ে দাও তো আমিও আমার চাকরি ছেড়ে দিই। তাবপর নতুন করে আরম্ভ করা যাবে। কী বল, বিভাকর।"

ললিতাও আমাকে মিনতি করে। "বিভাকর, তুমি আমাদের একমাত্র বন্ধু। ওঁকে আমি রাজী করিয়েছি, কিন্তু ওঁর শর্ত তো শুনলে। তুমি যদি ছাড়ো তো উনিও ছাড়বেন।"

চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি কিছু না হোক এক শো বার বলে থাকব। তার যে এই পরিণতি হবে তা কি তখন জানতুম। সরকারী চাকরি ছেড়ে দেওয়া কি মুখের কথা। তার তুলনা হলো কিনা রাজমাতার চাকরি ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু কেন নয়। রাজমাতা সরকারের চেয়ে কম কিসে। ভদ্রমহিলা এখনো বিশ ত্রিশ বছর বাঁচবেন। প্রদ্যুম্নকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসেন। কোনোদিন তার অর্থাভাব হবে না। সেটার মতো নিশ্চিতি কি সরকারী চাকরিতে আছে। এইসব মন্ত্রীদেব চেয়ে ওই রাজমাতা ঢের ভালো। যদি না থাকত স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে।

সেই থেকেই হ্যামলেটের মতো ভাবছি, মিস্টার ধর, চাকরিটা রাখব না ছাড়ব। যদি ছাড়ি লালসাহেবকেও ছাড়ানো যায়। নয়তো তিনি ফিরে যাবেন বাজমাতার আঁচলে। বাঙ্গালোরে। সেইখানেই ঘোড়া চালান গেছে। বাড়ি কেনা হয়েছে। এবার গেলে লালসাহেবকে ফিরে পাওয়া মুশকিল হবে। বছরে একবার পাওয়া তো ফিরে পাওয়া নয়।"

ধর এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিলেন। বলেন, "এমন অদ্ভুত কথা আমি শুনিনি। প্রদ্যুম্ন পাপ করছে। সে তার পাপ ছাড়বে কি ছাডবে না নির্ভর করছে তাব স্ত্রীর

বন্ধুর চাকরি ছাড়া না ছাড়ার উপরে? কখনো অমন কাজ করবেন না। তবে যদি উপরওয়ালাদের সঙ্গে বনিবনার অভাব হয় সেটা অন্য কথা। সেক্ষেত্রেও দুম করে কিছু করবেন না। চিন্তয়সি।"

ব্রহ্ম চিন্তান্বিত হয়ে বলেন, "তা হলে ললিতার কী হবে? সে কি ওইরকম ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলতে থাকবে? না আবার গোকুলের দিকে ঝুঁকবে?"

"মাই ডিয়ার ব্রহ্ম," ধর হিতোপদেশ দেন, "সেটা আপনার বিজনেস নয়। যদি সত্যি ভালোবেসে থাকেন তো বিয়ে করে ফেলুন। ডিভোর্স কেমন করে কোথায় পেতে হবে সে আমি আপনাদের বলতে পারি। বম্বে ইজ দি প্লেস।"

ছয়

এরপর কুরুক্ষেত্র বাধে। দেশ ভাগ হয়ে যায়। কে যে কোথায় ছিটকে পড়ে খবর রাখা দায়। ব্রহ্মকে ধর ভুলে যান। কিস্‌সাটাও তাঁর মনে থাকে না।

বছর সাতেক পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দিল্লীতে এক বন্ধুর পার্টিতে দেখা। ব্রহ্মই ছুটে এসে আপনার পরিচয় দেন।

"ওঃ আপনি সেই ব্রহ্ম! এখন কি ব্রহ্মবাদী হয়েছেন না তেমনি নাস্তিক।" ধব তাঁর হাতে ঝাঁকানি দিয়ে সুধান। তাঁকে নিয়ে একটু আড়ালে যান।

"এখন আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। আর আমার কোনো সংশয় নেই।"

"যে ভগবান আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছেন, যাঁর রাজ্যে এত অবিচার, সেই ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন। যাঁর জন্যে এক কোটি না দেড় কোটি লোক প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, পাঁচ লাখ লোক পালাতে না পেরে মরেছে, কে জানে ক'হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছে, এখনো তাদের অনেকে বন্দিনী, সেই ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন!"

"করি। আমার জীবনের সব দুর্ভোগ আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে গেছে। আমার ভাগ্যে বিষ হয়ে গেছে অমৃত।" ব্রহ্ম শান্ত সস্মিতভাবে বলেন।

"মিরাক্‌ল! কী করে এটা সম্ভব হলো?" ধর জানতে চান।

"যেদিন দেখলুম আমার সেই উজির ও তাঁর দলবল হাওয়ার সঙ্গে উড়ে গেলেন, যেদিন দেখলুম আমার উপরওয়ালারাই আমার কাছে জোড়হস্তে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সেদিন আমি ভগবানকে ডেকে বললুম, তুমি আছো, তুমি আছো। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে কেউ কোনোদিন জানত। তাঁর পক্ষে সকলি সম্ভব। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।" ব্রহ্ম একেবারে ব্রহ্মবাদী বনে গেছেন।

"তা হলে চাকরিতে আপনি টিকে গেছেন, বলুন।"

"তখনকার মতো। তারপরে দেখি একই সমস্যা ও তার একই সমাধান। চাকবি আমাকে ছাড়তেই হলো। কেন, জিজ্ঞাসা করবেন না। এব সঙ্গে ললিতার কোনো সম্বন্ধ নেই। এটা আমার একার সমস্যা।" ব্রহ্ম অন্যমনস্ক হয়ে যান।

"তারপর বিয়ের খবব কী? করেছেন না করেননি?" ধর তাঁর ঔৎসুক্য দমন করতে পারেন না।

"বিয়ে আমার জন্যে নয়। যে মানুষ কথায় কথায় চাকরি ছাড়ে তাব বিয়ে না

করাই ভালো। যদি কোনোদিন সেটল্‌ড হই ভেবে দেখব। দেখছেন তো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। এখন দিল্লীতে একটা কোম্পানীব অ্যাডভাইজার। চেষ্টা করছি ইউনাইটেড নেশনসে যেতে। যাই হোক, আমার যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। বিষ আমার ভাগ্যে অমৃত হয়ে গেছে।"

"তারপর ওদের কী খবর? ললিতা, প্রদ্যুম্ন ওরা এখন কোথায়?"

"ললিতা কলকাতায় চাকরি পেয়েছে। আর প্রদ্যুম্ন ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করছে। বছরে একবার কি দু'বার দেখা হয়। কেউ কারো আশা ছাড়েনি। পরস্পরের প্রতীক্ষা করছে।"

ধরের হঠাৎ মনে পড়ে যায়। "আর ওই গোকুল না গোপাল?"

"গোকুল ললিতাকে ছাড়তে পারেনি। ললিতাও ওকে ছাড়বে না।" ব্রহ্ম মুচকি হাসেন। "ওদিকে রাজমাতাও তেমনি নাছোড়। প্রদ্যুম্নও তাই।"

"এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনোকালে শুনিনি। বেযোড় দেখছি শুধু আপনি, ডক্‌টর ব্রহ্ম। নক্ষত্রমালীকে অমন করে বিদায় না দিলেই হতো।" ধর রসিকতা করেন, জানতেন না যে কেউ সীরিয়াসভাবে নেবে।

"আমার জীবনে ওইটেই ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ।" ব্রহ্ম গম্ভীরভাবে বলেন।

প্রথম সিঁড়ি

প্রতিভা বসু

আমরা সেই সময়টায় চুঁচুড়া শহরে বাস করছিলুম। বাবা চাকরি থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ব্যবসায় বড়লোক হবার বাসনায় এর ওর তার পরামর্শ গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সরল মানুষ, সৎ মানুষ এবং জাগতিক চাতুর্য বিষয়ে বিশেষভাবে অজ্ঞ। সুতরাং বলাই বাহুল্য কিছুকালের মধ্যেই নিজের সমস্ত অর্থ সমূলে অর্পণ করে ভয়ংকরভাবে প্রতারিত হয়ে ব্যাজার মুখে দিনাতিপাত করছিলেন।

চুঁচুড়ায় আমরা আমাদের পিসিমার বাড়িতে ছিলুম। মা আর পিসিমা গলায় গলায় বন্ধু, আর আমি পিসিমার নয়নমণি। একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য সকল আদরই একা আমার উপর বর্ষিত হওয়ায় আমার দিন বড়ো সুখে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো।

পিসিমার বাড়িটি বেশ বড়ো ছিলো। যদ্দুর মনে পড়ে ঘরের সংখ্যা পাঁচ ছ'খানার কম নয়। এবং সব ঘরেই পিসিমার পুষ্যি। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতবাং সকলের সন্তানই তাঁর সন্তান। ভাগ্নে ছিলো, ভাসুর-পো ছিলো, মা ডাকা একটি ছাত্র ছিলো, আর ছিলাম আমরা। সেই ভরা বাড়িতে সবাই মিলে-মিশে খুব আনন্দে কালাতিপাত করা যাচ্ছিলো।

শুধু একজন মানুষই পিসিমার আশ্রিত না হয়ে বাইরে থেকে এসে হৈ-হল্লা করে মাতিয়ে রেখে চলে যেতেন, তিনি আমার মামা। মামা হস্টেলে থাকতেন কলকাতায়। বিএস-সি পড়তেন। শনি-রবি তো আমাদের সঙ্গেই কাটাতো, অন্যান্য দিনও তাঁর উপস্থিতি বাদ যেতো না। মামার ধরণ-ধারণ বড় সরব এবং নিষ্ঠুর ছিলো। কথায় কথায় আমাকে গাঁট্টা মারতেন মাথায়, আমি যেসব কুকুরছানা বেড়ালছানাকে আদর করতুম সে-সবগুলোকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে কষ্ট দিয়ে মজা দেখতেন, আমাকেও কতো সময় দুহাতে ঝুলিয়ে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে 'ফেলি ফেলি' বলে ভয় দেখাতেন। পিসিমা রাগ কবতেন তাই নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে 'আয় ঠাকুরঝি তোকেও তোর মেয়েব সঙ্গে কুয়োয় ফেলি দি' বলে সারাবাড়ি ছুটোছুটি করতেন তার সঙ্গে। এই ঠাকুরঝি ডাকটা আমার মায়েব থেকে পাওয়া। মা ডাকতেন বলে মামাও ডাকতেন।

মা রাশভাবি মানুষ। বং টকটকে ফর্সা, চোখ টানা টানা, বাগ কবে তাকালে লাল দেখাতো। যথেষ্ট মোটাও ছিলেন। অতিষ্ঠ হলে মামাব নাম ধবে খাদের গলায় একটা ডাক দিলেই মামা ঠাণ্ডা হযে যেতেন।

আমার বয়স তখন দশ-এগারো হবে। খুব বোগা ছিলুম, ছোট্ট হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান কবতুম, পড়তুম একটা মিশনারী স্কুলে। পড়াশুনো কিছু না, ঐ গান গান কবে সবাই পাগল করে খেতো আমাকে। গান আমাব দু'চক্ষের বিষ ছিলো। গানের নামে আমাব পিছনের জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকার বাঞ্ছা হতো। ঐ জঙ্গলটা আমার কাছে এক পবম বহস্য ছিলো। পিসিমা বলতেন, 'ওটা অপদেবতার বাসভূমি। কোনো মানুষ সেখানে যেতে পারে না, গেলেই সাপ হয়ে যায়।' গানেব নামে আমি সাপ হতেও রাজি ছিলুম। মামা যে আমাকে দুহাতে ধরে কুযোয় ঝুলাতেন অথবা বেড়ালছানা

কুকুরছানাকে কষ্ট দিয়ে ছোটো বুকটা ভেঙে দিতেন সেটাও গানের জন্যই। গান করতে না চাইলেই ঐ শাস্তি।

সেই মামার একদিন বিয়ে ঠিক হলো, নীলফামারি থেকে আমার মার বাবার এক লম্বা চিঠি এলো সেই সুখবর বহন করে। মা আনন্দে থইথই করতে লাগলেন। আর আমি তো বটেই।

মামাবাড়ি বলতে যদি শুধু মামাকেই বোঝায় তাঁকে তো রোজই দেখছি। কিন্তু দিদিমা দাদামশায় নামের মানুষ দুটিকে কখনো দেখিনি। ডগমগ হয়ে মাকে বিরক্ত করতে লাগলাম, 'কবে যাবো, কবে যাবো।' মা বললেন, 'যাবেই তো, অস্থির হচ্ছো কেন? বিয়ের দেরি আছে।' আমার কি দেরি সয়? আমি তবু বিরক্ত করি। এই করতে করতেই একদিন সময় হয়ে এলো। মা ট্র্যাঙ্ক বাক্স গুছোলেন; উপহার সামগ্রী কিনলেন, সর্বশেষে দেখি আমার সেই পুঁচকে হারমোনিয়ামটিও যাচ্ছে সঙ্গে। সব সুখে কলসি কলসি জল ঢেলে দিলো কে। চোখের জল মুছতে লাগলাম দরজার কোণে দাঁড়িয়ে।

এতোখানি বয়স পর্যন্ত দাদামশায় দিদিমাকে না দেখার একটা কারণ ছিলো। মাকে কখনো তাঁর পিত্রালয়ে যেতে দেখিনি। অন্তত জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে নয়। আসলে আমার মায়ের নিজের মা ছিলেন না। দাদামশায় বেশি বয়সে যাঁকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি আমার মায়ের বয়সীই এক মহিলা। হয়তো সেই কারণেই অভিমান ছিলো।

কিন্তু ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে দেখা গেলো ঘন ঘন পত্রবিনিময় হচ্ছে, মায়ের বাবা বলতে গেলে মায়ের উপরই অনেক কিছু ভার দিয়ে দিয়েছেন। আর মায়ের সৎ-মা লিখেছেন, তুমি এসে না দাঁড়ালে সবই বন্ধ হয়ে যাবে।' এরপর আব কথা কী?

চুঁচুড়া থেকে নীলফামারি কেমন করে যে গিয়েছিলুম তা মনে নেই। পৌঁছেছিলুম সকালে। আমার একজনই মামা। মামা আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমরা বাবার সঙ্গে গেলাম। পৌঁছে দেখি একজন পিয়নকে নিয়ে মামা দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনে। আমার দাদামশায় সেখানকার পোস্টমাস্টার ছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিগত কাজকর্মে মাঝে মাঝেই ডাক-পিওনেরা ব্যবহৃত হতো।

মা নেমেই বললেন, 'কী রে, বৌ দেখলি? সুন্দব তো?'

মামা বললেন, 'সে তুমিই দেখবে। আমি আমার যা প্রয়োজন তা পেয়ে যাচ্ছি। ভাবী শ্বশুরটির অর্থবল আছে।'

এসব কথার তাৎপর্য আমার বোধের মধ্যে থাকবার কথা নয়। বৌ সুন্দর কি অসুন্দর তার সঙ্গে তার বাবার ধনরত্নের প্রশ্ন কি? পরে অবশ্য বুঝেছিলাম মামা শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাচ্ছে এবং যতো টাকা আমাব দাদামশায়ের দাবী ছিলো সবই মামার শ্বশুর সানন্দে দিচ্ছেন।

ঘোড়ার গাড়িতে মাল চাপিয়ে আমরা স্টেশন ছাড়িয়ে রাস্তায় এলুম। দুপাশে লোকালয়ের চেয়ে ক্ষেতখামারই বেশী। লোকজনেরা মাতলা মাথায় দিয়ে কাজ করছে রোদে বসে। কেমন ফসল ফসল গন্ধ বেরিয়েছে, মামা বললেন, 'বাহেরা খুব কৃষিবিদ্যায়

পটু!' আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'বাহে কী মামা?'

মামা বললেন, 'এখানকার দেহাতি লোকেদের বাহে বলে।'

আমাদের গাড়োয়ান দেখলুম প্রচণ্ড জোরে একটা গান ধরেছে, 'দক্ষিণ ধারের চালাতে তিনটা কদু ফলেছে, দাও বাহে কদু পাড়ায়ে দাও।' গানটার সুরে ভারি মজুর ছিলো। গলার স্বর কেমন ছড়ানো ছড়ানো মত। সুরটা আমার গলায়ও তক্ষুণি উঠে এলো। বাড়ি পৌঁছে দেখি বিয়ে বাড়ি বেশ সরগরম। গাড়ি থামতেই কতো লোক এগিয়ে এলো। মা কাউকে বললেন, "ওমা মেজকাকা কবে এলেন?' কাউকে বললেন, 'ছোটোকাকাও এসেছেন দেখছি।' 'এ কী, বিন্দিমাসি তুমি?'

আমি স্বভাবতই মুখচোরা আর লাজুক ছিলাম। আমার বাবাও তাই। সুতরাং কতোটুকু সময়ের জন্য আমার আর আমার বাবার অবস্থা বেশ করুণ হয়ে উঠেছিলো। তারপরেই জামাই-আদর শুরু হলো। আমি তখনও মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। এক ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এসে হাত ধরে টান দিলেন, 'এই বুঝি তোমার গাইয়ে মেয়ে, যমুনা? এসো এসো তোমাকে দেখি।'

ভদ্রমহিলা এইমাত্র স্নান করে এসেছেন বোঝা গেলো, গা থেকে সাবান আর মাথা থেকে তেল মিশিয়ে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছিলো। আমাকে কাছে নিয়ে তিনি আদর করলেন। ইতিমধ্যে পোস্টাপিশের ভিতর থেকে এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে খুশি গলায় বললেন, 'তোরা এসে গেছিস? আয় আয়, কেমন আছিস সব? প্রফুল্ল ভালো আছে তো? যমুনা দেখছি আরো মোটা হয়েছিস। মোটা হয়েছিস। মেয়ে কই তোর?'

দাদামশায়ের পোস্টাপিশ আর বাড়ি একই সঙ্গে ছিলো। সদর আর অন্দর। পোস্টাপিশের দালানের পেছনেই অন্দরের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের দরজা দিয়ে বেবিয়ে এলেই পোস্টাপিশের সামনে পড়ে যেতে হয়। বুঝলাম উনিই আমার দাদামশায় আর যিনি আমায় কাছে টেনে নিলেন তিনিই আমার দিদিমা।

জিনিসপত্র নামানো হলো। আমরা সব ভিতর-বাড়িতে চলে গেলাম। বাড়িটা বড় না, কিন্তু লোকে লোকারণ্য। বিয়ে উপলক্ষে বহু আত্মীয় পরিজন এসে ভিড় করেছে। আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর রাখা আছে দেখলাম। সে ঘরেও ভিড়। আমার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছিলো। এরই মধ্যে কে একজন প্রস্তাব করলেন, 'খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে নাও তারপর তোমার মেয়ের গান শুনবো যমুনা।'

বলাই বাহুল্য আমার আত্মা তখন চুচুড়ায় আমার পিসিমার জন্য কেঁদে উঠছিলো। ইচ্ছে করছিলো ছুটে পালিয়ে যাই। আমার এই দুঃখ শুধু আমার পিসিমাই বুঝতেন। সব সময় তিনি বলতেন, 'মেয়েটাকে আর জ্বালাস না তো। যখন-তখন কেবল গান। অতই সোজা কিনা?' আর এই কথা শুনেই আমার মামা বলতেন, 'দাঁড়া ঠাকুরঝি, তোকে আর তোর মেয়েকে আজ একসঙ্গে কুয়োয় ফেলি।"

ভাগ্য ভালো, গান আর আমাকে সেদিন গাইতে হলো না। আমার মা গিয়েছেন এতদিন বাদে, দিদিমা প্রাণপাত করে যত্ন করছেন মাকে, বিয়ের সমস্ত কর্তৃত্বের ভার তুলে দিচ্ছেন সৎ-মেয়ের মাথায়, বলছেন, 'বাড়ির বড় মেয়ে—সবই তো তোমার কাজ। তুমি ছাড়া কে করবে? পাকা দেখা এখনো বাকি, তুমি আগে আশীর্বাদ করবে

তবে তো সব। এখন পরামর্শ দাও কী দিয়ে কী করি।'

দিদিমার কথা শুনে মায়ের অভিমান নিমিষে অন্তর্হিত। দুপুরে সভা বসলো সকলের। অনেক কচকচি হলো। দেখলাম সভানেত্রীর আসনটিও যেমন মাকে দেওয়া হয়েছে, সেই আসনের মান রেখে মাও তেমনি যথেষ্ট দার্ঢ্যের সঙ্গে আপন অভিমত ঘোষণা করছেন। সবাই বলছিলেন, তারা অর্থাৎ মালখানগরের বসুরা এতো বড় কুলীন যে ভাবী বধূর পিতা নগেন নন্দী যতো বড়োলোকই হোন না কেন ব্যবসাবাণিজ্য করে, মেয়েকে যখন জাতে ওঠাচ্ছেন তখন তাঁকে ঘুড়ির সুতো আর কিছুটা বেশি ছাড়তে হবে। নগদে তিনি যা দিচ্ছেন দিন, অমুক বাবদ আরো কিছু বাড়াতে হবে, তমুক বাবদ তো দেয়াই উচিত। তা ছাড়া এ-ও-তা।

আমার বাবা চুপচাপ এককোণে বসেছিলেন, শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

বিয়ের মাত্র দুদিন আগে আমরা গিয়েছিলাম। বাবার কাজ ছিলো বলে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো আমাদের। পরের দিন মেয়ের বাড়ি থেকে অধিবাস এলো। রাজ্যের লোক দাঁড়িয়ে গেলো সেই দৃশ্য দেখতে। আমার অনভিজ্ঞ ছোটো বয়সের ছোটো চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসছিলো দেখতে দেখতে। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, ময়দা, গরম মশলা—বোধ হয় সংবৎসরের ভোজ্যবস্তু নিয়ে আসছিলো বাহেরা বাঁকে বাঁকে করে। তারপরে এলো মিষ্টি। রসগোল্লা, পান্তুয়া, প্রাণহরা, ক্ষীরের চপ, ছানার অমৃতি, মিহিদানা, সীতাভোগ—এমন কোনো নাম নেই যা ওরা দেননি। আর সাইজ কী! তারপরে এলো নারকোলের খাবার। কতরকম জিনিস যে তৈরি করেছে তা দিয়ে এখন মনে করলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বেলা দশটা থেকে প্রায় একটা পর্যন্ত শুধু এইসব এলো। উঠোনে আব জায়গা হচ্ছিলো না। পাশের বাড়ির দুটো ঘব নেওয়া হয়েছিলো চেয়ে। বাড়ির লোকজনেরা সেখানে নিয়ে গিয়ে জমা করতে লাগলো। আমার মা, আমার দিদিমারা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা—যারা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফর্দ মিলিয়ে জিনিস নিচ্ছিলেন আমি মধ্যে মধ্যে তাদের মুখে বেশ অসন্তোষ দেখছিলাম। কেউ কেউ বলছিলেন ঘিটা ততো খাঁটি নয়, আধমন তেলের কথা বলা হয়েছিলো, যা দেখছি পনেরো সের আছে কি না সন্দেহ। মিষ্টিব সাইজগুলো বলা যায় মাঝারি। আর কিসমিস কত কম দিযেছে দেখেছো? বলা হয়েছিলো গোবিন্দভোগ চাল পাঠাবেন, এ তো দেখছি বেশ মোটা।

আমি এই সময় আমাব বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জানি না কেন। কিন্তু অজানিতভাবেই আমি আব আমাব বাবা সেই সময় একাত্ম বোধ করেছিলাম। আমার ছোটো মন কেমন করছিলো। আমার বোধ আমাকে ব্যথিত করছিলো। বাবা মাকে নিচুগলায় বলছিলেন, 'এসব কী করছো?' মা বাবার কথায় কান দিচ্ছিলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল পরের দিন। মামীকে আমার এতো ভালো লাগলো, এতো সুন্দর লাগলো যে বলতে পারি না। সবাই কিন্তু বলছিলো, 'মামীর বং কালো, মামীর নাক বোঁচা—' এই সব কথা শুনে আমার কান্না পাচ্ছিলো। আমার মা শুধু বললেন, 'এমন লাবণ্য আর দেখেছো নাকি? আর চোখ? কী সুন্দর বড় বড় চোখ। অল্পবয়সী ভাই এর বৌকে মা আমার মতই ভালবাসছিলেন সেদিন।

প্রথম সিঁড়ি

বাপের বাড়িতে মামীর একটা বিচ্ছিরি নাম ছিলো, সেটার বদল হলো শুভরাত্রির দিন। মা-ই বদলালেন, বললেন, 'সুকৃতি একটা কী বিশ্রী নাম। ওর নাম থাক সুষমা।' সুষমাও বেশ পুরনো নাম, তবু মা বলেছেন এর উপর আর কথা কী। মা অবশ্য কারণ হিসেবে ঐ একই কথা বললেন।

মামী আসার পরে বাড়িটাতে আর ফূর্তি ধরছিলো না। আমি একদণ্ড মামীর কাছ ছাড়া হচ্ছিলাম না। মামার গায়ের সুগন্ধ আমায় পাগল-পাগল করছিলো। জুঁই ফুলের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ, মাথার তেলের গন্ধ, স্নো পাউডারের গন্ধ, নতুন কাপড়ের গন্ধ—সব মিলিয়ে কী যে মাদকতা অনুভব করছিলাম বলা যায় না। আর গায়ে কী গয়না। বাপরে বাপ। এটাই আমার বড় খারাপ লাগছিলো। আমি দেখছিলাম মামীর খুব কষ্ট হচ্ছে গয়নার চাপে। কিন্তু কিচ্ছুটি বলার উপায় নেই। কতো লোক আসছে বৌ দেখতে, গয়নাও তো দেখতে হবে।

মেয়ের বাড়ির সবাইয়ের নেমন্তন্ন ছিলো সেদিন। দুপুরের নেমন্তন্ন। আমি দেখছিলুম বাপেরবাড়ির লোকেদের জন্য মামীর কী ব্যাকুল আগ্রহ। বোনেরা তাড়াতাড়িই এলো। দিদিকে ঘিরে বসলো তারা। আস্তে আস্তে আরো সবাই এসে গেলেন। কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠলো বাতাস। চিৎকার চেঁচামেচি, খাওয়া-দাওয়া, কুকুরের দল ঠেকানো, ভিখিরি বিদায়—এর মধ্যেই কে একজন বলে উঠলো, 'আরে আমাদেব রাজপুত্রই দেখি আসছে না এখনো।'

রাজপুত্র! আমি খাচ্ছিলাম, আমার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠলো। তা হলে এই বিয়ে-বাড়িতে একজন রাজপুত্রও আসছে? সেই রাজপুত্র যারা রাজকন্যাদের ঘুম ভাঙায় সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে, তারপর ভালোবাসে, তারপর বিয়ে করে। একটি রাজকন্যার জন্য একটি রাজপুত্রকে যে কত কষ্ট করতে হয়, কত বিপদ-আপদ মাথায় নিয়ে চলতে হয়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র কত কিছু ডিঙোতে হয় তাব অন্ত আছে? স্বয়ং সেই রাজপুত্র আসছে এখানে? এই বাড়িতে! আমার দাদামশায়েব বাড়িতে? আমি একেবারে স্তম্ভিত।

একটি কালোমত ছেলে, সবাই তাকে 'আকালু' বলে ডাকছিলো, সে বললো, 'রাজপুত্রের পোশাক পছন্দ হয়নি যে, আসবে কী করে।'

'সে তো বটেই।' মনে মনে ভাবলাম আমি। বাজা টাজাদেরতো আব যেমন তেমন পোশাকে যেখানে সেখানে যাওয়া চলে না।

কিন্তু কিরকম পোশাকে আসবে রাজপুত্র? আমি তাকে কেমন দেখবো? সে কোথায় বসবে? কোথায় দাঁড়াবে? বুকটা একেবারে ধক ধক করছিলো। দুর্বল দুর্বল লাগছিলো।

খাওয়া নিয়ে আমার ঝামেলা বরাবরই আমার মার একটা বিরক্তির কারণ ছিলো। সুতরাং আমি খেতে বসলে মা ঠিক হাজির থাকবেন সেখানে। সেদিনও ছিলেন। আমার অন্যমনস্ক ভাব দেখে বকলেন, 'আবার হাত থামাচ্ছিস কেন, আগে মাছটা খেয়ে নে।'

আমি একপলকে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। রাজপুত্র আসবে বলে

সেখানে কোনোই ভাবান্তর ছিলো না। কেন? কেন নেই। কারো তো নেই। সবাই তো বেশ স্বাভাবিক আছে, আমি কেন এমন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি শুধু শুধু।

রাজপুত্রের জন্য প্রাণটা আমার খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। আর কিছুতেই মন রইলো না। খেয়ে উঠে নতুন মামী ভুলে পোস্টাপিশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শুধু তো রাজপুত্রকে দেখলেই চলবে না, সে কেমন করে আসবে, লোক লস্কর, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিতে সারাটা পথ কিরকম একটা অলৌকিক জগতে পরিণত হয়ে যাবে, সবই তো দেখতে হবে। কিন্তু হায়? কত লোক এলো গেলো, দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো, তবু রাজপুত্র এলো না। আসলে আমি আমার কল্পনার ঘোড়াকে বড় বেশী দৌড় করিয়েছিলাম, ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে সে কথাটা বুঝেও বুঝতে ইচ্ছে করছিলো না। আমার কান্না পাচ্ছিলো।

এরপরে হতাশার চরমে পৌঁছে মাকে গিয়ে মনের কথা জানালাম। মা প্রথমটায় বুঝতে পারেননি, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী বলছিস তুই?'

নাকি সুরে বললাম, 'তোমরা যে বললে রাজপুত্র আসবে, আসছে না কেন?'

'রাজপুত্র আসবে?' মা আকাশ থেকে পড়লেন। পাশেই একজন মামা দঁডিয়েছিলেন। হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি, আসলে তিনিই বলেছিলেন, 'রাজপুত্র আসছে না কেন?'

হাসি দেখে আমি ক্রন্দনমুখী হলাম আর মা বললেন, 'ব্যাপারটা কী রে কালু।'

'দেখাচ্ছি এক্ষুণি। আয় আমার সঙ্গে আয়, রাজপুত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে।' আমার হাত ধরে টানলেন আমার সেই কালু নামের মামা। তারপর পাশের যে-বাড়িটায় দু'খানা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো সেখানে গিয়ে হাঁকলেন, 'এই অমল, এদিকে আয়, তোকে দেখার জন্য এই মেয়েটি ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'

অমল নামের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উঠে এলো, 'আমাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি করছে? কে?'

'শ্রীমতী নাইটিঙ্গেল। এর নাম শুনেছিস?'

অমলকে দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। একটা সাধারণস্য সাধারণ ছেলে, সাদা ফ্যাটফেটে রং, অল্প অল্প গোঁফের রেখা গজিয়েছে, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, পায়ে স্যান্ডেল, একগাল হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে দেখতে চাইছো কেন, খুকি?'

খুকি। রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। তুই নিজে একটা জলজ্যান্ত খোকা, নেহাৎ বিয়ে-বাড়ি বলে হাফপ্যান্টের বদলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বুড়োটে ভাব নিয়েছিস, মাকুন্দো মাকুন্দো মেয়েলি গাল আর তুই আমাকে খুকি বলছিস।

তেরিয়া হয়ে বললাম, 'তোমাকে দেখতে চাইবো কেন? তুমি আমার কে?'

'তার আমি কি জানি?' অমলটা দাঁত সিটকিয়ে হাসলো, 'কালুমামাই তো বললেন দেখবার জন্য কান্নাকাটি করছো।'

কালুমামাব হাত ছাড়িয়ে মাথা ঝেঁকে এক ছুটে চলে আসতে আসতে বললাম, 'তোমার মতো একটা পুঁচকে খোকাকে দেখতে আমার বয়ে গেছে।'

কালুমামা হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আরে তুই আসছিস না দেখে আমি বলেছিলাম, 'রাজপুত্র এখনো আসছে না কেন? সেই শুনে ও ভেবেছে সত্যি বুঝি এক রাজপুত্র এসে হাজির হচ্ছে এ বাড়িতে। মেয়েটা বেজায় বোকা।'

'ও কে?'

'যমুনাদির মেয়ে। গান শুনিস, অবাক হয়ে যাবি।'

অমল আসলে আমার সেই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে সুন্দর সব চেয়ে ভালো লাগা ভালোবাসার নতুন মামীর দেড় বছরের বড় ভাই। মামী ষোলো, অমলের সাড়ে-সতেরো। মামীর ভাই, সুতরাং আমারও নিশ্চয়ই কিছুটা প্রিয় হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু অমলটাকে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মার কাছে গিয়ে তক্ষুণি নালিশ করেছিলাম, 'ঐ সাদা ছেলেটা আমাকে খুকি বলেছে।' মা বলেছিলেন, 'এই অন্যায়ের কোনো ক্ষমা নেই। আমি এক্ষুণি ডেকে বকে দিচ্ছি।'

বকুন না বকুন কিছু যায় আসে না। ছেলেটা যে আমার দু'চক্ষের বিষ হলো তা আর গেলো না।

বিয়ের পরে অনেক অনুষ্ঠান থাকে। সেইসব যে আমার কী ভালো লাগছিলো বলতে পারি না। আমি যেন সেইসব সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল খেলা। বিয়ের ঠিক বারোদিনের দিন মামা বিলেত রওনা হয়ে গেলেন। আর বারোদিনের বিবাহিত ষোল বছরের মামীর কান্না দেখে আমারও চোখ মুখ ফুলে গেল। মামা গেলেন জার্মানিতে—এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। শুনলাম তিন বছর বাদে ফিরবেন।

নীলফামারি স্টেশন সেদিন মামার আত্মীয় পরিচিতদের ভিড়েই ভিড়াক্রান্ত ছিলো। বাপের বাড়ির লোক, শ্বশুরবাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী—বিলেত যাওয়া তো বড় সোজা কথা নয় তখন। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে যাচ্ছে যে লোকটা, সে কি একটা অমনি ব্যাপার? বলাই বাহুল্য, তার মধ্যে ঐ ছেলেটাও গিয়েছিলো, ট্রেন ছেড়ে গেলে ছুটে ছুটে রুমাল উড়োচ্ছিলো খুব। আবার সেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলো।

এক সময় কী করে যে ওর সঙ্গে আমি মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম কে জানে। পাকা গলায় বললো, 'বেচারা। ব্যথা দিলাম নাকি?'

আমার মামার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিলো তখন, মামীর কান্না দেখে বুক ভেঙে যাচ্ছিলো, মায়ের হেঁচকির শব্দে ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিলো। ভুরু কুঁচকে ছিটকে সরে গেলাম। কিন্তু ছেলেটা আমার হাত ধরে ফেললো। একটানে সরিয়ে আনলো এ পাশে, রেগে গিয়ে বললো, 'যদি লাইনে পড়ে যেতে কী হতো?' তাকিয়ে দেখলাম ছিটকোতে গিয়ে ঠিক লাইনের কাছে চলে এসেছিলাম। দশখানা ঘোড়ার গাড়ি চেপে তারপর বাড়ি ফিরলাম আমরা। মামার বিচ্ছেদে সবাই খুব শোকার্ত ছিলো। দেখলাম অমলটাই বেশ সরগরম করে রাখার চেষ্টা করছে আবহাওয়াটা।

আমার দাদামশায়ের বাড়ি আর মামীর বাপের বাড়ি খুব কাছাকাছি ছিলো। দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট যাতায়াতও ছিলো। অমল এবং মামী কেউই এঁদের অপরিচিত

তো নয়ই, বরং খুব ঘরোয়া। আমার দাদামশায় ওদের জ্যাঠামশায় আর দিদিমা ওদের জ্যাঠাইমা। বিয়ের পরেও মামী শ্বশুরকে আগের মতো জ্যাঠামশায় ডাকতেন, কিন্তু দিদিমাকে 'মা' বলতেন।

অমলটা এতো সর্দার যে বাড়ি এসেই স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে লেগে গেল। বললো, 'পাঁচটা বাজে চা না খেয়ে পারবো না জেঠিমা। এই সুকু প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদছিস কেন? আয় না আমাকে সাহায্য করবি। এই খুকি, থুড়ি-টুগুরানী না ফুগুরানী, না কি যেন নাম তোমার, দ্যাখো না রসগোল্লার গামলাটা তোমার মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, বার করে আনো না।'

রাগের চোটে বললাম, 'আমি তোমার মত চোর না, আমি তোমার মত অভদ্র না—'

'কেন? চোরই বা হতে গেলাম কেন, অভদ্রতারই বা কী করলাম।'

'লুকোনো খাবার যারা খুঁজে বার করে তারা নিশ্চয়ই চোর। আর যারা একজন ক্লাশ সিক্সের মেয়েকে ঠিকমত নামে ডাকতে জানে না, তারাও নিশ্চই অভদ্র।'

'ঈশ্ শ্ শ্! তাহলে তো খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। ঠিক আছে, মিষ্টির গামলা খুঁজে দরকার নেই, আর ভুল নামে ডাকার জন্যও ক্ষমা চাইছি। তাহলে বুলবুল ডাকবো—কেমন?'

'আমার নাম মোটেও বুলবুল নয়।'

'বা রে, কালুমামা সেদিন নাইটিঙ্গল বললেন না?'

'আমার নাম রাধারানী। সবাই আমাকে রাধা বলে।'

'তাই নাকি? অত সুন্দর নামটাকে আমি তয়ুফুগু করে দিয়েছিলাম? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কী প্রায়শ্চিত্ত করলে তুমি খুশি হও বলো, আমি তাই করবো।'

আমি এতোতেও যখন মুখের ভার একটুও কমালাম না তখন কাছে এসে খুব ভাব দিয়ে বললো, 'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে বুলবুলই ডাকবো এবার থেকে। তোমার গান শুনে না, আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে, বুলবুল ছাড়া ভাবতেই পারছি না।'

এ-কথার পরে আমি ওকে রসগোল্লার গামলাটা খুঁজে দিয়েছিলাম। চা তৈরি করায় সাহায্য করেছিলাম এবং খুব বিশ্রী চা হয়েছিলো। সবাই বলছিলো, 'ওয়াক থু।' বলছিলো বটে কিন্তু মামা চলে যাবার বিচ্ছেদবেদনা অনেক লাঘবও হয়ে গিয়েছিলো অন্য ধরনেব কথাবার্তা ইত্যাদিতে। দিদিমা অমলকে 'নিষ্কর্মার ধাড়ি, অপদার্থ' ইত্যাদি বলে নিজেই শেষে খুব ভালো চা খাওয়ালেন সকলকে।

পরের দিন থেকে বিয়ে বাড়ি আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছিলো। দুচারদিনের মধ্যেই নিঝুম। কে বলবে এই বাড়ি এই কদিন আগে কী মুখর ছিলো। আমার অনেক ধরনের বদস্বভাব আছে। যে কেউই বাড়ি থেকে যাক না কেন, কান্না আমার পাবেই। কাজেই কয়েকটা দিন ধবে আমাকে যথেষ্ট নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে হলো।

দিদিমা আমাদের সহজে ছাড়লেন না। বললেন, 'প্রফুল্ল তো এখন আবার তার

পুরনো চাকরিতে ফিরে যাচ্ছে ঢাকায়, তোমরা থাকো, সে গিয়ে আগে বাড়িঘর ঠিক করুক, তারপর এসে নিয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা মন্দ কথা নয়, এখন গেলে বরং তোমাদের অসুবিধেই হবে। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি ছাড়া তো আর উঠতে পারবে না? একটা পছন্দমত বাসা ঠিক হতে নিশ্চয়ই সময় লাগবে।'

দাদামশায়ও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভালো। এসেছিস যখন কদিন থেকে যা।'

আমার বেশ থাকার ইচ্ছেই ছিলো, মামীকে ছেড়ে আসার কথা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। আর মামীও কিছুতেই আমাদের ছাড়তে চাইছিলেন না। সুতরাং রয়ে গেলাম। কথা থাকলো, বাবা কাজে যোগ দিয়ে বাড়ি ঠিক করে তারপর এসে নিয়ে যাবেন আমাদের। কোথা থেকে অমল এসে বাগড়া দিয়ে বললো, 'না, না, জামাইবাবুকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, আমিই নিয়ে যাবো।'

দিদিমা এক ধমক দিলেন, 'তুই যাবি কী? তোর পড়াশুনো নেই, ফাঁকিবাজ।'

অমল বললো, 'শোনো জেঠিমা, পড়াশুনো হলো একটা চিরন্তন ব্যাপার। এ-বছর না পড়লাম, তো ও-বছর পড়বো। ও-বছর না পড়লাম তো সে-বছর পড়বো। কিন্তু এই যে দিদিদের নিয়ে ঢাকায় যাবো এ সুখ আবার আমার জীবনেও নাও আসতে পারে।' বলে আমার দিকে চোখ নাচাল। তারপর খুব বীভৎস সুরে বাহেদের মত গলায় বদ উচ্চারণে 'যতবার আলো জ্বালাইতে চাই, নিবে যায় বারে বারে, আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।' এই গানটা গাইতে গাইতে চলে গেল। মামী বললেন, 'দাদাটা যে কী না—'

পড়াশুনোয় অমলের সত্যি মন ছিলো না। ওরা বড়লোক বাবা তিনটে মাস্টার রেখে কোনোরকমে সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছিলেন। তারপর ভর্তি হয়েছে রংপুরে কলেজে, কামাই করে করে সীমা দিচ্ছে। বিশেষত এই বিয়ে উপলক্ষে যা করছে না তার কোন কথাই নেই।

করুক। অমলের উপস্থিতি আমার দাদামশায়ের বাড়িতে দেখলুম বেশ একটা আনন্দের কারণ। দিদিমা অমলকে খুব ভালোবাসেন। অমলের বোন, আমার মামীকেও খুব ভালোবাসতেন, আর এখন বৌ-ই হয়েছেন। মামী এ-বাড়িতে বেশ মেয়ের মতই ছিলেন। দিদিমা ছিলেন নিঃসন্তান, সুতরাং কারো সঙ্গে ঈর্ষাদ্বেষের প্রশ্ন না-থাকায় সমস্ত কিছুই বেশ সুন্দরভাবে মিলেমিশে চলছিলো সংসারে। দোষের মধ্যে এই, তিনি অসম্ভব সংগীতপ্রিয় ছিলেন। নিজের গলায় যদিও সুরের স-ও ছিলো না, তবু অন্যের গলায় সুর লোভীর মতো ভালোবাসতেন। অর্থাৎ আমাকে জ্বালিয়ে খেতেন। দিদিমা খুব কর্মঠ ছিলেন। চমৎকার রান্না করতেন, লোকজন খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আচার, আমসত্ত্ব, মুড়ি মোয়া, চিড়ের মোয়া, এসব তৈরী করে করে তাক ভর্তি করে রাখতেন। গানের জন্য সেইসব ঘুষ দিতেন আমাকে। গান করায় আপত্তি আমার ঘুষে পোষাতো না, আমি বলতাম, না, আমি আচার চাই না, আমসত্ত্ব চাই না, কিছু চাই না—আমি গান করতে পারবো না।' অমলটা কোথা থেকে এসে বলতো, 'লক্ষ্মীটি, তুমি না চাও, আমাকে এনে দাও। আমি ভীষণ আচার আমসত্ত্ব ভালোবাসি।'

আমি বলতাম, 'তুমি বাসো তো আমার কী? আমি কেন তোমার জন্য কষ্ট করতে যাবো।'

তখন ও আমার কানের কাছে মুখ এনে ভীষণ জোরে একটা 'কু' দিয়ে পালিয়ে যেতো। দূরে দাঁড়িয়ে বলতো, 'এরপর চিমটি কাটবো। আমি রুষে ফুঁশে ছুটে গিয়ে ওর হাতে কামড়ে দিতাম। কিন্তু ও তাতে একটুও বিচলিত হতো না। আসলে ওব স্বাস্থ্যটা এতো ভালোছিলো যে সহজে কিছু হবার নয়। আর আমিও এমন সাংঘাতিক জোরে কামড়াতাম না যাতে একেবারে মাংসখণ্ড উপড়ে আসে। কিন্তু কামড়ানো উপলক্ষ্য করে ও আমাকে অনেকক্ষণ হাতে ধরে আটকে রাখতো, বলতো, 'শাস্তি নাও, নড়তে পারবে না। প্রতিজ্ঞা কর, গান করবে, জেঠিমার কাছ থেকে আচার আমসত্ত্ব নেবে এবং আমাকে ভাগ দেবে।' আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টায় ঘেমে যেতাম, কেঁদে ফেলতাম। ওকে পাজি, রাক্ষস, হাঙর, কুমির, এসব অনেক কিছু বলতাম, ওর তাতে কিছুই এসে যেতো না। আর এসব কাজ ও একটু বেশ আড়ালে-আড়ালেই করতো, তারপর আমি যখন 'মা-মা' বলে ভীষণ চ্যাচাতাম তখন ছেড়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগতো। ওর দাঁত খুব সুন্দর ছিলো, আমি দেখতে না পারলে কী হবে বাড়ির সবাই ভালোবাসতো ওকে। মা বলতেন, 'অমলটার মত এমন সুন্দর একটা ফুর্তিবাজ ছেলে কাছে থাকলে জীবনে আর কোনো দুঃখ থাকে না।'

ছোটোবেলায লুকিয়ে লুকিয়ে আমার একটু পদ্য লেখার অভ্যেস ছিলো। রেগে গিযে কাঠ-পেন্সিল দিয়ে বড বড় দেওয়ালে লিখে রেখে এলাম।

শোনরে অমল নন্দী
তোর সকল ফন্দি
একদিন ক'রে দেব ফাঁস
দিদিমাকে বলে দেব
তুই আচার চুরি ক'রে খাস।

হাতের লেখাটা একটু অন্যরকম করে লিখেছিলাম, যাতে কেউ দেখতে পেলেও না ভাবে আমি লিখেছি। কিন্তু আমার এ চালাকি খাটলো না। সেই সবচেয়ে খারাপ ছেলে অমলটাই আবিষ্কার করে শুধু যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লাইনগুলো পড়লো তাই নয, দেয়াল নষ্ট করেছি বলে কী নালিশ। মাকে বললো, 'ওকে শাসন করুন দিদি। একদিকে গুরুজনকে অপমান অন্যদিকে দেযাল নষ্ট। আর একি যে সে দেযাল,এ হলো গিয়ে পোস্টাপিশের দেযাল। আমি তো যা দেখছি, এক্ষুণি পুলিশ এসে যাবে। এইটুকু একটা মেয়েকে ধবে নিয়ে গিযে যদি হাজতে রেখে দেয় সে কি ভালো হবে?'

সবাই মুখ টিপে হাসছিলো। আমি যুগপৎ লজ্জা এবং ভয়ে বেশি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। আর ইচ্ছে করতে লাগলো অমলকে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আসি। দিদিমা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাহলে অমল, কী করা যায়?'

'উপায় একটা আছে অবশ্য। অন্তত হাজত-বাসটা তো বন্ধ করা দরকার?

'তা সেটা করো—অমন চুপচাপ থাকলে তো চলবে না?'

অনেক মাথা খাটিয়ে অমল বললো, 'এখন হলো গিয়ে আপনার বিকেল পাঁচটা, ধরুন পুলিশ আসতে-আসতে আটটা কি সাড়ে-আটটা। আমরা বরং চা-টা খেয়ে বারান্দায় পাটি পেতে গান শুনতে থাকি। পুলিশগুলো এসে গান শুনে আর কি কোনো ঝামেলা করবে, আমার তো তা মনে হয় না। আমি দেখছি পুলিশরা ভীষণ গান ভালোবাসে।'

এই সময় আমি ছুটে গিয়ে অমলের পিঠে প্রচণ্ড জোরে একটা কিল মেরে বললাম, 'মিথ্যুক!' বলেই দৌড়ে সেই দেয়ালের কাছে গিয়ে রাশি রাশি থুথু ছিটিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেললাম লেখাটা। আমার মনে কিন্তু সত্যি-সত্যিই একটু পুলিশের ভয় হয়েছিলো কিন্তু গানের কথা বলতেই কোথা থেকে সাহস এসে গেল। অমলও এসেছিলো আমার পিছুন পিছুন চুলের বেণীটা ধরে টানছিলো আর বলছিলো, 'মুছলে কী হবে, আমি ঠিক ধরিয়ে দেবো।'

ঝামটা মেরে বললাম, 'দিয়ো, আমার কচু হবে।'

'আর তারপর যখন ঘন্ট করে খাবে পুলিশেরা, তখন? তখন তো এই অমলকেই ছুটতে হবে বাঁচাবার জন্য।'

'ঘন্ট করে যদি খায় তো খাবে, তোমার তাতে কী?'

'আহাহা কী একটা বললে। আমার নয়তো আবার কার কী? আমার বুলবুলি ঘন্ট হবে আর আমি চুপ করে বসে থাকবো?'

'আমাকে বুলবুলি ডাকা আমি পছন্দ করি না।'

'তবে কী ডাকবো।'

'কেন?'

'ও, তাও তো বটে। তাহলে কী রানী বলে ডাকবো?'

'না, আমাকে সবাই রাধা বলে। হয় রাধা বলবে, নয় রাধারানী বলবে।'

'আমি রানী বলবো।'

—'কেন?'

'যেহেতু আমি রাজা।'

'কী রে আমার রাজা।'

'তাই দেখার জন্যই তো কেঁদে কেটে একসা হচ্ছিলে সেদিন।'

'মোটেই না! কক্‌খনো না!'

'আচ্ছা, বুলবুল—'

'রাধা—'

'আচ্ছা রানী—'

'রাধা—'

'এই জানো, ছেলেবেলায় কে একজন আমার নাম কৃষ্ণ রেখেছিলো, অমলের বদলে তুমি আমায় কৃষ্ণ বলে ডাকো না কেন? তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে রাধা বলে ডাকতে পারি।'

একথা শুনে কেন যেন আমার কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো। আমার বয়স যাই হোক, রাধা আর কৃষ্ণের সম্পর্ক না জানার কথা নয়, বুঝতে পারলাম অমলটাকে

আমি যত পাজি ভাবি ও তার চেয়েও পাজি। জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম, চট করে ধরে ফেলে চুমু খেয়ে নিলো।

কদিন বাদেই বাবার চিঠি এসে গেল, খুব ভালো বাড়ি পেয়েছেন। কাজে যোগ দিয়েছেন, এবার আমাদের নিতে আসছেন দু'চারদিনের মধ্যেই। অমল দাপাদাপি করতে লাগলো, 'ঈশ্। জামাইবাবুটা কী! আবার নিজে আসছেন। আমি বাবাকে কতো বলে কয়ে রাজি করিয়েছিলাম, কতো ভয়ানক জরুরি প্রয়োজন বলে বুঝিয়েছিলাম, নতুন কুটুম নইলে ভীষণ রাগ করবে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করেছিলাম, আমাব সব প্ল্যান ভেস্তে দিল?'

আড়াল বুঝে আমাকে বললো, 'এই, আমি যাবো?'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'তুমি যাবে কি যাবে না তার আমি কী জানি?'

'তোমার কী ইচ্ছে।'

'আমার আবার ইচ্ছে কী?'

'বা বে, আমাকে ফেলে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?'

আমি এর কোনো জবাব দিলাম না। আমার কষ্ট-বাতিক সব সময়েই আমাকে এত কাঁদায় যে তাব মধ্যে মাত্র একজনের বিচ্ছেদেই যে কী ইতরবিশেষ হবে সেকথা আমি ঠিক বুঝতে পাবছিলাম না। বাবার চিঠি পেয়ে থেকেই আমার মন খারাপ চলছিলো। তাব মধ্যে বলাই বাহুল্য মামীই প্রধান কারণ। তারপর দিদিমা দাদামশায় এঁবা তো আছেনই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমল বললো, 'তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না, না?'

এখানেও আমি চুপ! এ-সব কথা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছিলো না। আমার বাঘাব কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। সেই মুহূর্তে বাঘাকেই আমি সবচেয়ে ভালোবাসছিলাম। বাঘা দাদামশায়ের এক পথেব কুকুর। তা হলে কী হবে—ও বাড়িতে বাঘার প্রতাপ অপ্রতিহত। বাঘার চেহারা প্রায় ভীমসেনের মত। সবাই বলতো এটা সরাইলা কুকুর। এখন যেমন ঘরে ঘবে অ্যালসেশান, তখন তো আর তা ছিল না। অ্যালসেশান নামই কেউ জানতো না। অথচ অ্যালসেশনের মতই বড় কুকুর কখনো কখনো দেখা যেতো। বোধ হয সাহেবদের কুকুররা বেবিয়ে বাঙালি কুক্কুরীকে গ্রহণ কবে এই সব বাচ্চার জন্ম দিত। এরা সবাইলা কুকুর নামেই পবিচিত ছিলো। বাঘা আমার ভক্ত হয়ে উঠতে দেবি করেনি। কাঁধে পা দিলে দাঁড়িয়ে উঠে সে যখন আমার মুখ চাটতো মা রাগে পাখার বাঁট দিয়ে তাকে মারতে যেতেন। আমি তখন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতাম, 'নারে বাঘা, কেউ তোকে মাববে না। তবে আমি আছি কী করতে? বাঘার পোকা বেছে দিতাম আমি, লোম আঁচড়ে দিতাম, গলা ধরে আদর করতাম। বলতে গেলে বাঘা আমার প্রাণ ছিলো। সেই বাঘার কথা ভেবেই সেই সময় আমি বেশি ব্যাকুল হয়ে পড়ছিলাম।

হঠাৎ অমল কেন জানি বাগ কবলো, 'যাও, তোমাব সঙ্গে আর আমি কোনোদিন কথা বলবো না। আমি দেখেছি আমার কোনো কথাই তোমার কানে ঢোকে না।'

এই বলে চলে গেল।

তারপর একদিন সকালে বাবা এলেন। এসেই 'চলো চলো।' কী করবেন ছুটি তো নেই। মাত্র এক সপ্তাহের কড়ার। তা যেতেই তো দুদিন। তার মানে মাঝে পাঁচদিন থাকা। সকলেরই মন খারাপ। মামীর তো সবচেয়ে বেশি। দিদিমা যে কতরকম রান্না করছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। দাদু পোস্টাপিশ ছেড়ে বারে বারেই চলে আসছিলেন কোয়ার্টারে। এর মধ্যে অমলই কেন জানি অনুপস্থিত। মামী বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবে ও-বাড়ি? দাদাটার নাকি ফ্লু-মত হয়েছে।'

আমি তো একবাক্যেই রাজি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম ফ্লু না হাতি। কে একটা মেয়ের সঙ্গে বসে পুরোদমে লুডো খেলছে। মামী বললেন, মেয়েটা ওদের পিসতুতো দাদার শালি।

হোক শালি। আমার যে কী ভয়ঙ্কর রাগ হলো বলতে পারি না। মুখটা হাড়ির মতো করেছিলাম, অমল হেসে বললো, 'খেলবে নাকি?'

বললাম, 'না।'

'এসো না।'

'না।'

লুডোটা ঠেলে দিয়ে অন্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ এই পর্যন্ত থাক সীতু, আবার কাল।' দেখলাম সীতু নামের মেয়েটি আমার চেয়ে বেশ বড়। শাড়ি পরেছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা গড়ন—। মামী একটা চোখ ছোটো করে জনান্তিকে বললেন, 'কী রে দাদা, ভাবী বৌয়ের সঙ্গে দেখছি খুব প্রেম জমিয়েছিস।' অমল আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, 'যার সঙ্গে জমাতে চাই সে যে পাত্তা দেয় না।'

অমল বড়লোকের একমাত্র ছেলে, অমলের উপরে অনেকেরই বেশ নজর ছিলো। পিসতুতো বৌদি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বোনকে বেড়াবার অছিলায় আনিয়েছিলেন এখানে। অমলের মা-বাবা নিজেরাও মনে করছিলেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাড়িটা যতখানি খালি হয়ে গেছে, ছেলের বয়সেই বিয়ে দিয়ে তার কিছুটাও যদি ভরে নিতে পারেন।

আমার যে কী হলো সেদিন—কেন যে ঘুমন্ত শান্ত সরল মনটা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। গুম হয়েই বসে ছিলাম, এক সময় ফাঁক বুঝে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমার আর একদণ্ড অমলদের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু রাস্তায় এসেই বুঝতে পারলাম আমি যে রকম ভিতু মেয়ে তাতে এই অন্ধকারে একা একা বাড়ি ফেরা আর সমুদ্র সাঁতার পার হওয়া দুইই সমান। এখন কী করি? মানের মাথা খেয়ে আবার ফিরে যাই, না দাঁড়িয়ে থাকি? ভাবতে ভাবতে যখন পাগল হয়ে উঠেছি, পিছন থেকে এসে কে জাপটে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাগো বাবাগো বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম, সে বললো 'চুপ চুপ। আমি অমল। পালিয়ে এসেছ কেন?'

সাহস বেড়ে যেতেই রাগে অস্থির হয়ে বললাম, 'বেশ করেছি।'

অমল বললো, 'না, মোটেও বেশ করোনি। খুব খারাপ করেছো।'

'আমি খারাপ করি আর ভালো করি, তাতে তোমার কী?' 'তুমি লুডো খেলছিলে খেলো গে যাও।'

'কেন, লুডো খেলা কী দোষ?'

'আমি বলছি দোষ?'

'তবে বকছো কেন?'

'ওমা গো আমি আবার বকলাম কোথায়? যে যার বৌয়ের সঙ্গে লুডো খেলবে, তাতে আমি কেন বকতে যাবো।'

'ও, তাহলে বৌয়ের সঙ্গে লুডো খেলাটাতেই তোমার আসল আপত্তি?'

'মোটেও না, কক্ষনো না।'

'মোটেও না কক্ষনো না—' অমল আমাকে ভ্যাংচালো তারপর সেই বদস্বভাব ছেলেটা বেনী টেনে নিয়ে বললো, 'শিগগির চলো সব্বাই খুঁজছে।'

আমি বললাম 'না।'

'তাহলে কি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবো?'

এই সময় আমি একটা খুব পাকা কথা বললাম। বলেই কান গরম হয়ে গেল। বললাম, 'আমাকে কেন পাঁজাকোলা করবে নিজের বৌকে করোগে যাও। বলামাত্রই অমল সত্যি আমাকে দুহাতে তুলে নিল কানের কাছে মুখ রেখে বললো, 'নিজের বৌকেই তাহলে নিই।'

আমি রোগা ছিলাম খুব, কিন্তু লম্বাও ছিলাম অনেকটা। বই পড়তে শিখেছিলাম ছোট থেকে। বুঝি না বুঝি, ছোটদের বড়দের সব বইই হাতের কাছে পেলে অক্ষর গিলতাম। মামার বিয়েতে সদ্য সদ্য অনেক শরৎচন্দ্র পড়া হয়ে গেছে। তার ফলেই কি সেদিন সেই রাত্রে আমার বুকের মধ্যে অমন একটা অজানা অদ্ভুত কাঁপুনি উঠেছিলো? আমার চোখ দিয়ে নিজে থেকেই জল বেরিয়ে এলো। আমি অন্ধকারেও তা গোপন করতে পারলাম না। কেননা অমলের বুকের গেঞ্জিটা দেখতে দেখতে ভিজে গেল।

তারপরে মাঝখানের দু'দিন, যে দু'দিন আর আমরা নীলফামারিতে ছিলাম, সে দু'দিন বলতে গেলে, অমল সব সময়ই আমার মামাবাড়িতে কাটাতে লাগলো। আমি আর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারলাম না।

চলে আসবার আগের দিন সকালবেলা অমল নিভৃত হলো চেষ্টা করে। বললো, 'কালই তো চলে যাবে। খুব ভালো লাগছে, না?'

সেই রাত থেকে একলাফে এগারো বছরের মেয়ে আমি প্রায় চোদ্দ বছরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার লজ্জা হয়েছিলো, সংকোচ হয়েছিলো, আর বুকের মধ্যে এমন একটা বোধ জন্মেছিলো, যার অনুভূতি পূর্বে কখনো ছিলো না। অমলের কথার জবাব আমি এই কথাটাই বলতে চেষ্টা করলাম, 'তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।' বলতে পারলাম না। সেই নতুন লজ্জা আমাকে ঠোঁট ফাঁক করতে দিল না।

কিন্তু অমল ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বললো, 'যদি তুমি আমাকে একটু ইচ্ছেও দেখাতে, আমি ঠিক মা বাবাকে বুঝিয়ে চলে যেতাম তোমাদের সঙ্গে।'

আমি তখনো চুপ। এবপব অমল আস্তে আস্তে চলে গেল।

যাবাব দিন দিদিমা আমাদেব খাইযে দিলেন তাডাতাডি। অনেক খাবাবও দিলেন পথেব জন্য। ঘোডাব গাডিতে ট্র্যাঙ্ক বাক্স তুলে দেবাব সময চোখ মুছতে লাগলেন। মামীব তো কান্নাব বিবামই নেই। দাদামশাযও কেমন অস্থিব অস্থিব ভাব কবতে লাগলেন। মাও কাঁদছিলেন। আব বাঘাটা যা কবছিলো তা বলাব নয। ঘোডাব গাডিব সঙ্গে সঙ্গে সমানে যে কতদূব ছুটলো তাব ঠিক নেই। আব আমি সব বিষযে সকলেব জন্য ছিঁচকাঁদুনে মেযে, আমিই বসে থাকলাম শুকনো চোখে। আমি কাঁদতে চাইছিলাম, কান্না আসছিলো না।

কাঁদলাম স্টেশনে এসে। দেখলাম একটা পোস্টে ঠেসান দিযে দাঁডিযে আছে অমল, তাকে দেখামাত্রই আমাব ভিতব থেকে একটা ফোঁপানি উঠে এলো। আমাব গলাব আওয়াজ প্রায বেবিযে আসতে চাইলো।

মা চেঁচিযে বললেন, 'ওমা, এই তো অমল। তুমি কোথায ছিলে? যাবাব আগে আমবা সবাই তোমাকে খুঁজছিলাম।'

মৃদু হেসে অমল বললো, 'ভাবলাম স্টেশনে এসেই অপেক্ষা কবি, ওখানে সবাই নিশ্চযই ব্যস্ত থাকবেন।'

অমল আমাব দিকে তাকাচ্ছিলো না।

বাবা বললেন, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমিও আসবে আমাদেব সঙ্গে। ঢাকা তো যাওনি কখনো, দেখে আসবে শহবটা।'

অমল সলজ্জ, 'যাবো নিশ্চযই কোনো একদিন। এখন তো কলেজ খোলা।' এইবাব আডচোখে আমাকে দেখলো, আমাব কান্না দেখলো, তাবপব অন্যদিকে তাকিযে থাকলো।

আমবা ট্রেনে উঠলাম। তখনকাব সেকেণ্ড ক্লাশ কামবা, খুব ফাঁকা ছিলো প্রশস্ত ছিলো। মা জিনিসপত্র গুছিযে নিচ্ছিলেন, বাবা নিচে নেমে কুলিদেব বিদায দিচ্ছিলেন। আমি আব অমল পাশাপাশি বসে ছিলাম চুপ কবে। তাবই মধ্যে হুইসিল বাজলো, নিচেব যাত্রীবা দৌডে দৌডে উঠে এলো। বিদায দিতে-আসা পবিজনেবা দৌডে দৌডে নেমে গেলো, গাডি দুললো, বাবা এলেন, আব অমলও লাফিযে নামলো। আব সেই সময আমি সব ভুলে উচ্ছ্বসিত কান্নায ভেঙে গিযে বলে উঠলাম, 'তুমি যেযো না অমল, তুমি যেযো না।' প্ল্যাটফর্ম দিযে চলন্ত গাডিব সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত অমলেব চোখেব জলে ঝাপসা গলা শোনা গেল, 'একটু আগে কেন বললে না?' আব প্ল্যাটফর্ম ছাডাতে ছাডাতে গাডিব চাকাও ঝিমিযে ঝিমিযে সেই কথাবই প্রতিধ্বনি কবলো, 'একটু আগে কেন বললে না, একটু আগে কেন বললে না।'

হঠাৎ অমল মবীযা হযে হাত বাডিযে ট্রেনেব হাতলটা ধবতে চেষ্টা কবলো আমি ঝুঁকে পডে সেই হাত ছুঁতে চেষ্টা কবলাম, গাডি প্ল্যাটফর্ম ছাডিযে দূবে চলে গেল। প্রতিধ্বনিও মিলিযে গেল। তখন চাকাব শব্দ প্রচণ্ড হযে বলতে লাগলো, 'এ কিছু না, এ কিছু না, কত হবে কত যাবে, কত হবে কত যাবে।'

চকাচকী

সতীনাথ ভাদুড়ী

এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।

ধামদাহা-হাটের 'চকাচকী। চকাচকী নামটি আমারই দেওয়া—যদিও সে নাম পরে জেলাসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দর্শনেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটি। ঠাট্টা করে নয়; ভালবেসে। হয়তো একটু ঈর্ষাও মেশানো ছিল ঐ নামকরণের সঙ্গে। অদ্ভুত অবস্থায়, তাদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে তখন আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই রাজনীতিক কাজের সূত্রে। মুসাফিরলালই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধামদাহা-হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে। তখন সেখানে ঘোড়ার দড়ি নিয়ে, হাসি চেঁচামেচির মধ্যে, পুরোদমে টাগ-অব-ওয়ার খেলা চলছে। দড়ির একদিকে দুবেজী, অন্যদিকে দুবেনী আর অবাধ্য ঘোড়াটি। হেঁইও জোয়ান!...বলেই দুবেজী হঠাৎ দড়ি ছেড়ে দিল। দুবেনী একেবারে চিতপাত। তবু হাসি থামে না।

দুবেজী নির্দোষিতার ভান করে।—'জানোয়ারেরা সুদ্ধ তোর দিকে, তোর সঙ্গে কি আমি পারি। তাই হার মেনে ছেড়ে দিলাম।'...

'দাঁড়াও না। তোমার জানোয়ারগিরি বার করছি!'...

এর জের আরও চলত কিনা জানি না। আমরা গিয়ে পড়ায় তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল। ছারপোকা ভরা দড়ির খাটিয়াটি, আমাদের জন্য বার করতে ছোটে তারা দুজনে।...

দুবেনীর বয়স তখনই বছর ষাটেক। তবু কী সুন্দর দেবীপ্রতিমার মতো চেহারা! যেমন রূপ, তেমনি গায়ের রঙ।...আর কী আপন-করে নেওয়া ব্যবহার! আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরও এই দম্পতি, বিয়ের সময়ের মনের উপছে-পড়া ভাব বজায় রেখেছে দেখে।

তাই নাম দিয়েছিলাম চকাচকী।

বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালের পছন্দ হয়নি নামটি। কুটিলতায় ভরা তার ভাল চোখটি একটু টিপে, ঠোঁটের কোণে একটা ইঙ্গিতের ছাপ ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, 'চকাচকী না বলে, চড়ুই-চড়ুইনী বলুন এদের। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির, এখনও কী ছমক! ছেঁদো কথার কী বাঁধুনি! দেখেন না নেচে চলে। ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুইপাখির মতো। এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে একটা লোটা আর এই দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে, দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল—শুধু দুবেনীর কোমরের লচক দেখে। সে বয়সে দুবেনী...'

মুসাফিরলালকে থামিয়ে দিই। জানি তো তাকে। দুবেনীর সম্বন্ধে ও সুরে কথা বলা আমার খারাপ লাগছিল। সব জিনিসে সে খারাপের গন্ধ পায়!...

এর পর কতবার যে তাদের বাড়িতে গিয়েছি তার ঠিক নেই। না গিয়ে কি নিস্তার

ছিল? ওদিকে গিয়েও তাদের বাড়িতে যাইনি জানতে পারলে চকাচকী দুঃখিত হত। শুধু আমি নই, এ অঞ্চলের প্রত্যেক রাজনীতিক কর্মীর বেলায়ই ঐ এক নিয়ম। দল-নিরপেক্ষভাবে। তার কুঁড়েতে যা জুটবে, চারটি না খেলে রক্ষা নেই। না-খাওয়ার রকম-সকম দেখলে, অতিথির কাপড়-গামছার ঝুলিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে দুবেনী রাখবে রান্নাঘরে। যদি কোনোদিন বলেছি, 'অমুক গ্রাম থেকে এখনই খেয়ে আসছি—আজ আর খাব না,' অমনি দুবেজী অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু দুবেনী চুপ করে থাকবার পাত্রী নয়। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠ থেকে চটের বোরাটা সে নেয় বাঁহাতে; আর ডান হাত দিয়ে আমাকে ধরে টানতে টানতে উঠোনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হুকুম করে, 'বোসো এই বোরাটার উপর। বসে বসে দেখো, আমি কেমন করে রুটি সেঁকি।' তারপর দুবেজীকে লক্ষ্য করে বলে, 'মবদ দেখো! মান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন! থাকো! সবাই কি আর দুবেনী, যে তোমার মানের কদর দেবে।'

কতক্ষণ আর কথা না বলে থাকে দুবেজী। 'রাঁধবার সময় মেলা বকিস না, বুঝলি! মুখের থুতু ছিটকে অতিথের রুটির উপর পড়বে।'

'থামো থামো! অত আর থুতু ছিটকোয় না! এ কি তোমাদের মতো খয়নিগোঁজা মুখ, যে কথা বললে থুতুর ভয়ে বাঘ পালাবে। বুঝলে বাবুজী, আমি এক-এক সময় বুড়োকে বলি যে, আমার সম্মুখে বসে বাজে বকবক না করে যদি হাটের মালিকের তরকারি-ক্ষেতে বসে আকাশের সঙ্গে কথা বলে তাহলে শাকসবজির পোকামাকড় দু-চারটে মরে তামাক-গোলা থুতুতে। তা কি শুনবে। যত গল্প ওর আমারই কাছে।'...

নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্য?

জবাব দিয়েছিল—'আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশী হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খণ্ডন হবে কী করে?'

এমন সরল নিষ্পাপ দম্পতিও পাপের ভয়ে আকুল! তাই রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও রাজনীতিক কর্মীদের জন্য নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে দেয়! শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন চকাচকী জেলে যাবার হুজুগ তুলল। তখন একটি রাজনীতিক আন্দোলনে জেলে যাবার হিড়িক উঠেছে দেশে। ঠাট্টা করে তাদের বলি, 'ভেবেছ যে জেলে গিয়েও তোমরা একসঙ্গে থাকবে? সে গুড়ে বালি। দুবেনীকে যে পাঠিয়ে দেবে মতিহারীর মেয়েদের জেলে।'

'রামজীর মনে যা আছে, তা তো হবেই।'—একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল দুবেজী।

রামজীর মনে কী ছিল তিনিই জানেন; হিসাব গুলিয়ে দিল থানার দারোগা। দুবেনীকে যথাসময়ে পুলিশ জেলে ধরে নিয়ে গেল; কিন্তু বাহত্তুরে বুড়ো বলে দুবেকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করলেন দারোগাসাহেব। সে পরিচিত প্রত্যেকের দুয়োরে গিয়ে মাথা কোটে, দারোগাসাহেবের কাছে একটু তদ্‌বির করে, তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার জন্য।

কিছুতেই কিছু হল না।

দিনকয়েক পর দেখা গেল দুবেনী গভর্ণমেন্টের কাছে মাফ চেয়ে মুচলেকা লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এ নিয়ে একেবারে টিটিক্কার পড়ে গেল। চড়ুইনীর বেহায়াপনায় সবচেয়ে মর্মাহত হল কানা মুসাফিরলাল। তার বিশ্বাস দুবেনী দুবেজীকে ছেড়ে না থাকতে পেরেই বেরিয়ে এসেছে।...এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও?...

দুবেনী কারও ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটি কথারও জবাব দেয়নি। শুধু তার দৈনিক রামজীর পুজো আগের চেয়ে ঘন্টা দুয়েক বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর দুবেজী ছেড়ে ছিল লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা।

আমাব সঙ্গে দুবেজীর অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশি। 'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি'—বাঙালী কবির এই পদটির মানে তাকে বুঝিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'দুবেনীরও কি তাই?'

প্রশ্নের উত্তর না দিযে সে পাল্টা প্রশ্ন কবে—'বামজীরও কি সীতাজীর জন্য এমনি হত নাকি?'

'সে কথা তো বলতে পারি না; তবে শ্রীকৃষ্ণের হত রাধিকার জন্য।'

'আরে কিষুণজী-ভগবানও যা, রামজীও তাই।'

আমি নাছোড়বান্দা। আবারও জিজ্ঞাসা করলাম—'জেলে এঁটোকাঁটার বাছবিচার নেই বলেই কি দুবেনী থাকতে পারল না সেখানে?'

এত অপ্রতিভ দুবেজীকে এর আগে কখনও হতে দেখিনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাচুমাচু মুখে উত্তর দেয়—'আপনার কাছে বলেই বলছি আসল কথাটা। জেলে গেলে পাপমোচন হয় রামজীর চোখে। সেই জন্যই আমাদের জেলে যাবার এত আকাঙক্ষা। দুবেনী বলে যে, জেলে গিয়ে পাপ খণ্ডন করতে হত আমাদের দুজনকেই; কিন্তু তোমার কপালে যে রামজী তা লেখেননি। আমাদের দুজনের জীবন যখন একসঙ্গে গাঁথা, তখন আমার একার পাপমোচনের চেষ্টায় কী হবে? তাই দুবেনী মাপ চেয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

দুবেজীর চোখ ছলছল করছে! হতাশার ছাপ চোখেমুখে সুস্পষ্ট। যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।...রামচন্দ্রজী যে কিছুতেই তাদের দোষ-ক্ষমা করবেন না!...

তাদের মনের এক অজ্ঞাত দুয়ার খুলে গেল আমার কাছে। পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা নেই, অথচ রামচন্দ্রজীকে খুশী করে পাপমুক্তির আকাঙক্ষা প্রবল।...আবার পাপমোচনের অনুষ্ঠানটি হওয়া চাই দুজনেব এক সঙ্গে; একাব চেষ্টা নিস্ফল হবে। অদ্ভুত! আমাদের জটিল মন দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় না তাদের সরল মনের যুক্তির ধারা। তবে তাব বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

দুবেজীর মনমরা ভাব দিন দিনই বেড়ে চলে এর পর থেকে। বয়সের জন্য শরীর ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছিল আগে থেকেই। এখন যেন আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হতে লাগল। রোজগারের কাজে কোনোদিনই বিশেষ মন ছিল না। তার পেটচালানোর জন্য যেটুকু না করলে নয়, কেবল সেইটুকুনি ছাড়া। বেতো টাট্টু ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গ্রামের চাষাদের কাছ থেকে ভ্যারেণ্ডার বিচি, ছোলা, তামাক,

সরষে কিনে এনে হাটের গোলাদারের কাছে বিক্রি করা, এই ছিল তার এতকালকার পেশা। এখন সে বাড়ি থেকে বার হওয়া বন্ধ করে দেয়। গোলাদারকে বলে দিল যে, এই বয়সে ঘোড়ায় চড়ে বেরুনো আমার সামর্থ্যে কুলোয় না। গোলাদার জিজ্ঞাসা করে—'তবে খাবে কী?'

দুবেজী উত্তর দেয় না। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুশকিল হল দুবেনীরই। দুটি পেটের অন্ন যোগানো সোজা নয়। সে দূর গ্রাম থেকে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আসে, আমাদের কাছে দু-চারটে টাকার জন্য। আমরা সাধ্যমতো দিই। যখন নিজেদের সাধ্যে কুলোয় না, তখন চকাচকীর জন্য অন্য লোকের কাছেও হাত পাতি। আমাদের জন্য তারা অনেক করেছে এক সময়ে, তাদের অসময়ে এটুকুও করব না?'...

কিন্তু এ মনের ভাব বেশিদিন রাখা গেল না তাদের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। পরের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে কতদিন আর ভাল লাগে। কিছুদিন পর এমন হল যে, দুবেনীকে দূর থেকে দেখলেই আমরা পাশ কাটাবার চেষ্টা করি। কানা মুসাফিরলাল একদিন বলেই ফেলল তাকে—'এখানে কি টাকার গাছ আছে? আমরা নিজেরাই বলে চেয়ে-চিন্তে কোনোরকমে কাজ চালাই!...তোমাদের দেশ কোন্ জেলায়? কখন বলো বালিয়া, কখন বলো সারন, কখনও বলো ভোজপুর! কিছু বুঝেও তো পাই না। নিজেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য? তিনকূলে কেউ নেই, এমন লোকও হয় নাকি পৃথিবীতে?'

দুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফিরলালের কথা। আমাকে বলে—'আপনাদের দুবেজী কী মানুষ ছিল, কী হয়ে গিয়েছে। আমার কথারও জবাব দেয় না আজ ক'দিন থেকে। কী সব বিড়বিড় করে বকে। মাঝে মাঝে টিনের চালের উপর উঠে বসে থাকে হাতুড়ি পেরেক নিয়ে। বলে বর্ষা আসছে। চাল মেরামত করছি।'..

দুবের চেয়ে দুবেনীর কথাই আমার বেশি মনে হয়, তার বিষাদে ভরা মুখখানি দেখে। তাকানো আর যায় না সেদিকে! বাহাত্তুরে-ধরা বুড়োর জন্য দুটো টাকা দিয়ে তখনকার মতো নিষ্কৃতি পাই।

তারপর মাসখানেক আর দেখা নেই দুবেনীর। টাকা নিতে আসে না দেখে অস্বস্তিই লাগে। প্রত্যাশিত বিপদ না ঘটতে দেখলে হয় না একরকম? মুসাফিরলাল সন্দেহ করল যে, হাটের বুড়ো জমিদারবাবু নিশ্চয়ই টাকা দিচ্ছে ওকে—পুরনো দিনের কথা মনে করে। ভাল চোখটি কৌতুকে ভরা।...তোমরা শুধু দেশ দেশ করেই মরলে—আশপাশের দুনিয়ার পুরনো ইতিহাসের কতটুকু খবর রাখ।...

একদিন দুবেনী এল, চোখে জল নিয়ে।

—দুবেজীর খুব অসুখ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে, দুবেনী বড়ো রোগা হয়ে গিয়েছে।...'তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর উঠে এসে এই কবজিটি আঙুলের বেড় দিয়ে মেপে বলল—তুই দেড় আঙুল রোগা হয়ে গিয়েছিস! দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি পয়সা রোজগার করতে পারি কি না।...ঘোড়ার পিঠে বোরা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কত মানা করলাম। মাথা কুটলাম পায়ে। শুনল না। সে বুঝ কি এখন আর আছে?...বেশি দূর যেতে হয়নি। পাববে কেন! ঘোড়াটাকে সন্ধ্যার সময় খালিপিঠে ঠুক্‌ঠুক্ করে ফিরে আসতে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছে।

গোলাদারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি। সে লোক পাঠাল চারিদিকে! কিছুক্ষণ পরেই পুরানদাহার লোকেরা গোরুর গাড়িতে করে দুবেজীকে পৌঁছে দিয়ে গেল আমার কাছে। তখন বেহুঁশ একেবাবে। ঘোড়া থেকে পড়ে, মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা তখনই আপনাদের এখানে নিয়ে আসি। কিন্তু গোলাদার বিসারিয়ার ডাক্তারকে ডেকে পাঠালে। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন নড়াচড়া করলে রুগী বাঁচবে না।...তারপর থেকে তো চলছেই। চোখ খুলল তিন দিন পরে। জ্ঞানও তেমনি জ্ঞান। ঐ একরকমের জবুথবু অবস্থা। না পারে লোক চিনতে, না পারে কিছু বলতে। শুধু তাকায়। আমার দিকে তাকায় কিন্তু আমাকেও চিনতে পারে না। মুখে দুধ দিলে বেশ ঢুকঢুক করে খায়।...ডাক্তার বলেছে খাওয়াতে বেশি করে। ঘোড়াটাকে বিক্রি করে তো এতদিন ওষুধ-পথ্য চলল।...আপনাদের কাছে আসবার ফুরসতই পাই না রুগী ফেলে।—আজ মুদীর ছেলেটাকে বাবা-বাছা বলে বসিয়ে এসেছি। কে জানে থাকবে কিনা এতক্ষণ।...সেইজন্যই বাস্-এ এলাম এক টাকা খরচ করে।'

দুবেনীর দুঃখের কাহিনী আর শেষ হয় না। বুঝলাম এখন দরকার টাকার। বেশি টাকাব। মেয়েমানুষের চোখে জল দেখলেই আমি কী রকম অভিভূত গোছের যেন হয়ে যাই। দুঃস্থ রাজনীতিক কর্মীদের সাহায্যের জন্য আমার কাছে একটি 'ফাণ্ড' ছিল। তার থেকে দু'শ টাকা আমি দুবেনীকে দিলাম। তাকে বাস-এ চড়িয়ে দিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন মুসাফিরলাল সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে।...পাবলিকেব টাকা এরকম নাহক খরচ করা, আর যে-কেউ বরদাস্ত করুক, সে করবে না। দুবে জেলে যায়নি, তাব স্ত্রী মাপ চেয়ে বেরিয়েছে জেল থেকে—ওরা আবার রাজনীতিক কর্মী হল কবে থেকে?...

মুসাফিরলাল আমায় শাসিয়ে দিল যে, আসছে মিটিঙে সে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

দিন দুই-তিন পরে দুবেজীকে দেখতে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ি মানে তো একখানি ঘর—ঘরের দেওয়াল, চাল সব কেরোসিন তেলের টিন কেটে, দুবে-দুবেনীর নিজ হাতে তৈরি করা। দোকান বলো, শোবার ঘব বলো, অতিথিশালা, ঠাকুরঘর বলো, সব এরই মধ্যে। সেই ঘরখানিকে ঘিরে কুতূহলী দর্শকের ভিড় জমেছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘরের যে কোণায রঙিন কাগজের রথের মধ্যে রামজীর মূর্তি আছে, তারই সম্মুখে একটি গোরু দাঁড়িয়ে। সুন্দর নধর গাইটি। ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় দুবেজী শুয়ে। চোখ বোঁজা। দুবেনী খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুবেব একখান হাত ছুঁয়ে রযেছে; ডান হাত গোরুটিব গায়ে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে। গোদান করছে দুবেনী। দুবেজীকে ছুঁয়ে থেকে বামচন্দ্রজীকে বুঝোবার প্রয়াস পাচ্ছে যে, গোদান করছে তারা দুজনে মিলে।

পুরুত চলে গেলে দুবেনীর কথা বলবাব সময় হল।

...'দুবেজীর আজ দুদিন থেকে কোনো সাড়া নেই : বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গোদান করবার। তাই আপনার দেওয়া দু'শ টাকা দিয়ে গোরু কিনেছিলাম। জানি না এতেও রামজী আমাদের মতো পাপীদের উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন কিনা। ওই মুখে আগেও যেমন হাসি দেখেছি, এখনও তেমনি। মুচকে হাসছেন। ও হাসি দেখলেই

আমার ভয়-ভয় করে—বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। আমাদের দুজনের শাপমোচনের দরখাস্ত উনি নামঞ্জুর করেছেন বলেই বোধ হয় এই দুষ্টুমির হাসি মুখে! বলছেন—পাপীর মুক্তি কি অত সোজা!'...

...দুবেনীরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাপমোচনের চেষ্টা এদের একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। টাকা দিলাম ওষুধ-পথ্যর জন্য, খরচ করে দিল গোদানে। আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ওষুধ-পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল!...এদের মনের নাগাল পাওযা দায়!...

দুবেজীকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে আসতে মন সবল না। থেকে গেলাম সেখানে সেদিন। বুঝলাম যে, দুবেজীর আর দেরি নেই।

সে রাত্রে আমি দুবেজীর মাথার কাছে পাখা হাতে বসে ঢুলছি। আমি থাকায় দুবেনী একটু মনে বল পেয়েছে। সে হাত জোড় করে বসে আছে রামজীর রথের সম্মুখে। ধ্যান করছে চোখ বুজে। পাপীদের দরখাস্ত-নামঞ্জুর-করা হাসিটি পাছে চোখে পড়বে ভেবে, চোখ খুলতে সাহস পায় না। নিশুতি বাতের নিস্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হল, কেরোসিন টিন দিয়ে তৈরি ছাপ্পরের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দতে। রামজীকে প্রণাম করে দুবেনী উঠে এল, খাটিয়ার উপব জল পড়ছে কিনা দেখতে।...বৃষ্টি পড়বাব সময় খাটিয়া মধ্যে মধ্যে সরাতে হয়। এখন বাবুজী আছে। দুজন লোক না হলে খাটিয়া সরানো যায় না। তখন মাটিব ভাঁড় রাখতে হয় খাটিয়াব উপর। ভাগ্যিস ও পাগল কদিন থেকে বেহুঁশ হয়ে আছে, নইলে এই বাত দুপুরেই হযতো বাতিক উঠত, হাতুড়ি পেরেক নিয়ে চালের উপর উঠবার!...

খাটিয়া সরানো হল। কুপীর মৃদু আলোতেও বোঝা গেল দুবেনী কাঁদছে।

'বাবুজী, বিপদের সময় তুমি যা করেছ, সে ঋণ আমাদের গায়ের চামড়া দিয়ে তোমার পায়ের জুতো তয়ের কবে দিলেও শোধ হবার নয়।'..

আচমকা এই অলংকারবহুল কৃতজ্ঞতা নিবেদনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এ তো দুবেনীর স্বাভাবিক ভাষা নয়। অথচ কান্নার ফাঁক দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা কথা! এতক্ষণ ধরে জপে বসেও সে নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি। ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে তার। 'আমাদেব গায়ের চামড়া'।..'আমাদের পাপ'!...'আমার' না বলে 'আমাদের' বলা তাদের চিরকালের অভ্যাস। এখনকার এই বিহ্বলতার মধ্যেও সে অভ্যাসেব ব্যতিক্রম হয়নি!.. খাটিয়ার ওদিক থেকে আমারই দিকে আসছে দুবেনী। শঙ্কা, দ্বিধা চোখের জলেও ঢাকা পড়েনি। আমাব চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।...দ্বিধা কাটিয়ে, চোখের জল ছাপিয়ে, আকুল মিনতি ফুটে উঠল সে চাউনিতে।...বলতে চায় কিছু অনুবোধ জানাতে চায়।

বলো, বলো, ভাই কী।

আশ্বাসের ইঙ্গিত জানাই। তবু বলতে কি পারে। সব কথা কি বলা যায় সকলকে। অচৈতন্য দুবের দিকে আবার একবার দেখে নিল দুবেনী—কে জানে যদি তার কথা বুঝতে পারে!...পাখাসুদ্ধ আমাব হাতখানি সে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে।

'এ কি কাউকে বলবার কথা। তবু বলছি। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে দেখি না বলবার মতো। একজন কাউকে যে বলতেই হবে। চল্লিশ বছর ধরে চেপে চেপে কথাটা একেবারে জমে পাথর হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। তবু রামজী ক্ষমা

করেননি আমাদের।...ডাক্তারবাবু পরিষ্কার না বললেও ঘুরিয়ে বলেছেন যে, রুগী আর দু-চার দিনের বেশি বাঁচবে না। আমিও সে কথা বুঝতে পেরেছি।...সেজন্য একটা কথা বলার দরকার হয়েছে তোমার কাছে। শুনে আমাদের কী মনে করবে তাও জানি। তবু বলছি...আমার কথা রাখতে হবে একটা। রাখবে? আগে কথা দাও, তবে বলব।'...

কথা দিলাম।

'শোনো তবে বলি। যে কথা বলিনি চল্লিশ বছর থেকে। পোড়া মুখ। আমি দুবেজীর নিকট-আত্মীয়া। দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সেসব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও! কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে, তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? ছেলের হাতের জল পেলে সে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে যেতে পারে। আমার মন যে তাই বলছে। নিজের জন্য ভাবি না; আমার বরাতে যা লেখা আছে তাই হবে। কিন্তু ওর যে রাস্তা রয়েছে পাপ খণ্ডাবার। তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে হোক নিয়ে এস বাড়ি থেকে। সাহাবাদ জেলা,—সাসারাম থানা—হরকতমাহী গ্রামের পচ্ছিমটোলা। চিঠি দিলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। আমি আছি জানলে আসবে না; বলে দিও মরে গিয়েছে; তাহলে এক যদি আসে!...না করো না বাবুজী। আমাকে কথা দিয়েছ!'...

সাংসারিক জীবনের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। তবু জড়িয়ে পড়লাম এদের নিভৃত পারিবারিক জীবনের সঙ্গে। দিন তিনেক পর সাহাবাদ জেলার এক গ্রামে গিয়ে দুবেজীর ছেলের সঙ্গে দেখা করলাম। নাতিপুতিওয়ালা ঘোর সংসারী লোক। বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনেও আমলই দিতে চায় না প্রথমটায়। রুক্ষ মেজাজ। তার মা বেঁচে আছেন কিনা, জিজ্ঞেস করায় রুক্ষ স্বরে জানিয়ে দিল যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, তাদের বাড়ির জেনানাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কৌতূহল সে পছন্দ করে না। বাবার কথা তার মনে নেই, তাই তাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না। বুঝলাম যে, এতদিনকার ভুলে-যাওয়া পারিবারিক কলঙ্কটাকে নিয়ে সে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাচ্ছে না। তাদের সেই আত্মীয়াটি মারা গিয়েছে, এই মিথ্যা সংবাদটি পেয়েও তার মন ভিজল না। তখন আমি অন্য রাস্তা নিলাম। দুবেজী সেখানে একজন মস্ত লীডার, এ খবর শুনে একটু যেন তার উদাসীনতা কাটল। তখন ছাড়লাম। ব্রহ্মাস্ত্র।—'দুবেজী সেখানে বাড়িঘরদোর করেছে। বাজারের উপর দোকান। তুমি না গেলে সেসব সাতভূতে লুটেপুটে খাবে। সেগুলো বিক্রি করে আসবার জন্যও তো তোমার যাওয়া দরকার।'

'বাড়ি কি খাপরার?'

'না। টিনের।'

মিথ্যা বলিনি। বাড়ি যে কেরোসিনের টিন দিয়ে তৈরি, শুধু সেই কথাটি খুলে বললাম না। এই ওষুধেই কাজ হল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় যখন ধামদাহা-হাটে পৌঁছলাম, তখন দুবেজীর শবদেহ বার হচ্ছে। কানা মুসাফিরলালের ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। আশপাশের গ্রামের রাজনীতিক কর্মীদের সে ডাকিয়ে এনেছে। বিস্তর লোক জমেছে। নিশান, শোভাযাত্রা, অ্যাসিটিলিন আলো,—যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশি।

আমাদের দেখেই মুসাফিরলাল এগিয়ে এল। তাকে আলাদা দূরে নিয়ে গিয়ে বলে দিলাম যে, এ হচ্ছে দুবেজীর ছেলে,—তাকে যেন কিছু গোলমেলে কথা না জিজ্ঞাসা করা হয়।

'ছেলে?'

মুসাফিরলাল অবাক হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় আমাকে শোনাল দুবেজীর মৃত্যুর চেয়েও চাঞ্চল্যকর খবর।

'দুবেনী পালিয়েছে। আমি এখানে এসেছিলাম পরশু রাতে, তোমার খোঁজে। তখনও দুবেনী ছিল। আমাকে রুগীর কাছে বসিয়ে সে একটা ছুতো করে বাইরে যায়। আর ফেরেনি।...বুঝলে ব্যাপারটা?...বিদেশে এক কানাকড়িও না নিয়ে যে রোজগারের ধান্দায় আসে, সে কি কখনও বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রথমেই?...এসে, মাথা গুঁজবার মতো একটা জায়গা করে নিয়ে তবে না লোকে বউ আনে? আমি চিরকাল বলেছি...'

তার কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার উৎসাহ তখন আমার নেই। বুঝলাম যে, মুসাফিরলাল এখানে আসায় দুবেনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল; সে না এলে রুগীকে একেবারে একা ফেলে বোধ হয় দুবেনী পালাতে পারত না। মুসাফিরলাল এখনও বোধ হয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে কবতে বিরক্ত হয়ে।...কিন্তু আমি তো জানি!...দুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তার বুক ফেটে গিয়েছে। তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে দুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে!...

একটি ছোট্ট নদীর ধারে শ্মশানঘাট। ভাদ্র মাস। শ্মশানঘাটের কাছটুকু ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে ভরা। যেখানে জল নেই, সেখানে কাশের বন। চিতা জ্বলছে! আলো পড়ে ওপারের অন্ধকারের বুকে কাশফুলের চুনকাম বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুবেজীর ছেলে একটিও কথা বলেনি এখন পর্যন্ত; বোধ হয় বাড়ি দেখে হতাশ হয়েছে।...সকলেই চুপচাপ।...হঠাৎ ওপারের কাশবন নড়ে উঠল—চুনকামের মধ্যে যেন একটু ফাঁক—স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই—কাশের সমুদ্রের মধ্যে খসখসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল।...

বুঝলাম।...হয়তো আমার সন্দেহ মাত্র। ভুলও হতে পারে! কে জানে!

সকলেই সেইদিকে তাকিয়ে। দুবের ছেলেও।

মুসাফিরলাল বলে—'শিয়াল-টিয়াল হবে বোধ হয়। তাকিয়ে দেখি তার ভাল চোখটির উপর চিতার আলো পড়েছে! দরদে ভরা! তার পরিচিত কুটিল দৃষ্টি গেল কোথায়?

সেও বুঝেছে, আমি যা বুঝেছি। শিয়ালের কথা তুলেছে, যাতে বাকি সকলে আর ও নিয়ে মাথা না ঘামায়—ওদিকে আর না তাকায়।

এই প্রথম কানা মুসাফিরলালকে খুব ভাল লাগল; তাব ভাল চোখের চাউনিটিকেও।

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর

নদীর চড়ায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উল্টো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়েছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসে ছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে ঝুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল। পুরুতমশাই আর ছোটকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধূ ধূ করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমূলতলায় বসে শিবানীর সৎকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, 'শেষ, হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।' বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে ছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর-একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু'হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সে ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক: শিবানী ওর স্ত্রী। তবু আমার মনে হলো, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই?

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, 'শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপর কি জন্যে যেন রেগে ছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দুঃখ করছিল...'

আমার কথায় অনাদি মুখ ফিরিয়ে দূরে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমরা বোধহয় না এলেই ভাল করতাম।'

আমরা চুপচাপ অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনো পাখি চিকির-চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝে হঠাৎ বলল, 'কেন? আমবা না এলে কি ভাল হত?'

অনাদি ধীরস্থির প্রকৃতির, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, 'ভুবন হয়তো অস্বস্তি বোধ করছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেয়েছিল।'

'ভাবুক, কে তাকে বারণ করেছে—' খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসের গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'আমরা ওর চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনের পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।'

কমলেন্দু শুয়ে শুয়ে বলল, 'বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীর মারা যাবার খবর পাঠানো কেন! না পাঠালেই পারত।'

'কিংবা বলে দিলেই পারত আমরা যেন না আসি,' আমি বললাম।

'খবর না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা করে...'

'আমরাও ভদ্রতা রক্ষা করছি। শিবানী আমাদের বন্ধুর স্ত্রী, তার সৎকারে না আসাই কি ভাল দেখাত!' কমলেন্দু বলল।

'বন্ধুর স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদের...কি বলব...বান্ধবী, যাই বলো...সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মারা গেছে, আমরা শ্মশানে আসব না?' আমি বললাম।

অনাদি আর কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবার সিগারেট বের করল। আমাদের দিল। নিত্যানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। চিতাব ওপর কয়েকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠের টুকরো ফেলল চিতায়।

ভুবন চিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উদাসভাবে নদীর আকাশ আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল; নিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর এই ভঙ্গি আমার ভাল লাগছিল না। মনে হলো, আমাদের যেন সে আর দেখতে পাচ্ছে না; বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা করছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমার রাগ হয়, ভুবনের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমার কেমন রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। আতিশয্য কেন? আমরা কি জানি না শিবানীব সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল? তবে? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছু জানি না, যেন শিবানী তার সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তার বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে!

দুঃখেব মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনেব বোকামিব শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীব ভালবাসা পেতে। শিবানী তোমায় ভালবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায বিয়ে কবেছিল। তুমি স্বামী হযেছিলে বলে যা পাবাব পেযে গেছ, তা ভেব না। ববং শিবানীব ভালবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনেব দমকা বাতাস এলো। দক্ষিণ থেকে নদীব তপ্ত বালিব ওপব দিযে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাস নাচতে নাচতে জঙ্গলেব দিকে চলে গেল। ভুবন আবাব হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আডাল কবে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনেব এত আতিশয্য আব আমাব সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আব কমলেন্দুকে বললাম, 'আমরা একটু আডালে গিযে বসি না হয—' বলে উপহাসেব গলায মন্তব্য কবলাম, 'ভুবনবাবুব আমাদেব হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।'

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে। সে বলল, 'তাতে যদি ভুবন শান্তি পায আমাব আপত্তি নেই। আমাব ববং শিবানীব চিতাব কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খাবাপ লাগছে।'

'তাই বুঝি শুযে আছ, আকাশ দেখছ?'

কমলেন্দু কথাব জবাব দিল না।

অনাদি এবাব বলল, 'আমাবও কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু আডালে দূবে গিযে বসাই ভাল। তাছাডা এবাব এদিকে বোদ ঘুবে গেছে, বসে থাকা যাবে না।'

আমবা আবো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেডে উঠে পডলাম। তাবপব তিন বন্ধু শিবানীব চিতা এবং ভুবনেব দৃষ্টি থেকে সবে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূবে এসে আমবা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড আব ছাযা, মাথাব ওপব নিমগাছ, সামনে কুলঝোপেব ওপব দিযে নদী দেখা যায। মাঝে মাঝে পাখিব ডাক ছাডা আব কিছু কানে যাচ্ছে না। নদীব বালি ছাডা অন্য কিছু চোখেও পডছে না। এখানে যে যাব মতন আবাম কবে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদেব মধ্যে ছোটোখাটো দু-চাবটি কথাব বিনিময হলো, শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মাবা যাওযায আমবা দুঃখিত। শেষে আমবা একে একে কেমন নীবব হযে গেলাম। নদীব দিকে অপবাহ্নেব স্তিমিত ভাব নামছিল। আমবা তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা, কখনো পাযেব তলায ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পবিপূর্ণ নীবব হযে গিযেছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকাব পব হঠাৎ কমলেন্দু কেমন কবে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস নয, তাব চেযেও যেন গভীবতাপূর্ণ কিছু, তাব নিশ্বাসেব শব্দে আমবা ওব দিতে সচকিত হযে তাকালাম।

কমলেন্দু সুপুরুষ। তাব মুখ এখনো দু মুহূর্ত তাকিযে দেখাব মতন। লম্বা ধবনেব কাটাকাটা মুখ, বঙ ফর্সা, নাক ও চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। তাব ফবসা সুন্দব মুখে আমবা কোথায় যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, 'কি হলো?'

কমলেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'না, কিছু নয়।...কই, দেখি একটা সিগারেট...'

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু'জনকে দুটো সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া গলায় নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ দিকটায় পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে। সামহাউ, আমার শিবানীর চিতার সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।...হতে পারে, তখন আমি বোকা ছিলুম, বয়স কম ছিল; তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালবেসেছিল।...আমার চেয়ে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালবাসে নি।'

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম এবং ভুবন, আমাদের চতুর্থ বন্ধুও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালবাসার কথা আমার অজানা নয়; কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবীটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হলো না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, 'আমার তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।'

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হলো। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, 'এ-সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার সঙ্গে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিআসলি যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, আমি সে দাবী সবচেয়ে বেশী করতে পারি।'

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশী হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয়' নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবী করছি সে দাবী ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হলো। আমাদের তিনজনেরই বয়েস হয়েছে, চল্লিশের এপারে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প করার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ ছিল না। তবু, আমরা তিনজনেই এমন এক দাবী জানাচ্ছিলাম যেন সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকাব প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আমার দিকে বার বার তাকাল, তারপর সিগারেটেব টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে শিবানীর ওপর-ওপর মেলামেশা তোমরা দেখেছ; আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বলতাম; চিঠিপত্রও দেখিয়েছি; কিন্তু. ভেতরে আমাদের কি হয়েছিল তোমরা কি করে জানবে?'

'ভেতরে ভেতরে যা হয়েছে তা তো পরে তুই বলেছিস,' আমি বললাম না।

'না আমি সব বলি নি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকরেট...'

'সে-রকম গোপনীয়তা আমারও আছে, কমল।' অনাদি বলল।

আমারও গোপনীয়তা ছিল। আমরা তিন বাল্যবন্ধু পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচর রাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখিনি রাখতে চাই নি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশার সময়ও আমরা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হই নি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীর সঙ্গে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা করেছিল. করে শিবানীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শিবানীর সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার; আমার সঙ্গে শিবানীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বাল্যকালের বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছে তা পরস্পরকে আমরা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতর ঈর্ষা আমাদের থাকার কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয় নি তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিরোধ আমাদের মধ্যে হয় নি; সে জীবিত থাকতে যা হলো না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে নেই—তখন তা হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

আমার কি রকম যেন মনে হলো। কমলেন্দুর দিকে তাকালাম, তারপর অনাদির দিকে। আমার মনে হলো, ওরা নিজেদেব গোপনীযতাকে তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইবকম মনে করছিলাম। যদিও আমার আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, 'একটা কথা বলব?'

ওরা আমাকে দেখল।

'আমাদের সব কথাই সকলের জানা।' ধীরে ধীরে আমি বললাম, 'আমরা কিছুই লুকোচুরি রাখি নি; তবু আমাদের তিনজনেরই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভাল নয?'

কমলেন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল। আমাব মনে হলো ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলল, 'বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভাল।'

অনাদি বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীর চিতা এখন জ্বলছে, আমরা শ্মশানে। এই সময সে-সব কথা বলা কি ভাল দেখাবে।'

'খারাপই বা কি!' আমি বললাম, 'আমার বরং মনে হচ্ছে বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।'

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সেই বলুক প্রথমে। শিবানীর জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

'সব কথা বলার কোনো দরকাব নেই কমল, আমরা জানি। আমরা যা জানি না তুমি শুধু সেটুকুই বলো।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'তাই বলব।'

কমলেন্দু বলল : 'তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকের জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমার কলেজে ঢোকার সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পড়তে যাবার আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা আদরের ঘটা চলছে। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন গলায়-গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবার কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকাব জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসার পর আরো একটু সাহেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওঁরা/দেরী করেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধরেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়।...কই„ আর একটা সিগারেট দাও তো...।'

অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তারপর বলল :

'একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো।...দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যা। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদেব বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘর। আমাব ঘর থেকে শিবানীর ঘরদেখা যায়...কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিযে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছচ্ছিল না।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশারা করে বলছিলাম শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইরকম কবতে করতে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এলো। পেয়ারাগাছেব ডালের পাশ দিযে শিবানীব ঘরেব অনেকটাই চোখে পড়ে আমাব। সে আমায়দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে রঙটা বুঝতে পারি নি।...সন্ধ্যের মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দরজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তাব হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল; হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে। লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। জলের ছাট আসছিল। আমি আলনায় ঝুলানো

আমার একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল খানিকটা ভিজে গিয়েছিল বলে শিবানী তার লম্বা বিনুনি খুলে ফেলেছিল। ওকে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা লণ্ঠনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টার ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভাল গাইত তা তোমরাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আর নয়। ঝড়বৃষ্টি, বাইরের দুর্যোগ আর অন্ধকারের মধ্যে আমার ঘরে বসে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় সে গাইল : 'উতল ধারা বাদল ঝরে...।' ওই গানেরই একটা জায়গায় ছিল, 'ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে...।' বার বার শিবানী ওই চরণদুটি গাইছিল, আর আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পারছিলাম।...গান শেষ হলে আমরা গল্প করতে লাগলাম। এ-গল্প সে-গল্প। শেষে আমরা ছেলেমানুষের মতন হাতের রেখা, কপালের রেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবাণি বলল, তার বুকে নীল শিরার একটা ক্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এরকম যে হয় না, হতে পারে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পারল আমি তাকে অবিশ্বাস করছি। সে বলল, 'হাসছ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?' আমি মাথা নাড়লাম, 'তুমি কি যীশু?'...শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, 'আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না?' আমি তাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'যার কোথাও পাপ নেই তার থাকতে পারে...। মানুষের নয়। যীশুর মতন তুমি মরতে পারবে?'...শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তার বুকের জামার ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সরিয়ে আমায় বলল, 'আলো এনে দেখ।'...আমি দেখলাম। কি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই।...বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে রঙের। সেটা ক্রশ কিনা আমি দেখি নি। আমি অন্য জিনিস দেখছিলাম।...আজ আমার স্বীকার করতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিবানীর সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।'

কমলেন্দু নীরব হলো। তাকে খুব অন্যমনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল।

নদীর চরের ওপারে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে, কোথাও একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃঝুম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'শিশির, তোমার যা বলার...'

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক,

তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতার কথা কমলেন্দুর অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছে থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবার তা বলার জন্যে আমি তৈরী হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিয়ে অপরাহ্নের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, 'আমি খুব সংক্ষেপে সারতে চাই।'

'শুনি...'' কমলেন্দু বলল।

'বলছি...। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দরকার নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল এটা তার শেষেরদিকের ঘটনা—' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'শিবানীর বাবা তখন মারা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আবার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে রয়েছি। শিবানীর সঙ্গে আমাব সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি তাকে বিয়ে করব। লতিকা কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীরও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যেবেলা' ওদেব বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে হত না, সোজা ড্রয়িংরুমের পরদা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পগুজব, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সেরে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন রাত হয়ে গেছে। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। আর প্রায় রোজই ফেরার সময়, ফটকের কবরীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায় চুমু খেত।...শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কখনো মনে হয় নি। তাব গায়ের রঙ, চোখমুখের ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল, তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধরনের রুচি, পরিচ্ছন্নতা, বেশবাসের সৌন্দর্য।...এ-সবের জন্যে, আর শিবানীর তখনকার শরীরের জন্যে তাকে আমার ভাল লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে তোমরা জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে।...একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকা কাকিমা তাঁদের মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ কবেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর শোবার ঘরে বসে আমবা গল্প করছিলাম। জানুয়ারী মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল।...সাধাবণ একটা কথা নিয়ে আমরা দু'জনেই হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তার একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমবেব কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংযের দিকে, মাথার ওপব হাত থাকার জন্যে তার বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমবের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা ভাল—ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানার ওপর সুজনিটা ছিল কালচে-লাল, তাতে গোলাপের মতন নকশা; শিবানীব পরনের শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে পড়া শবীবের দিকে তাকিয়ে আমাব

আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তার গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তাব মাকে কথাটা বলব।...আমি তখন যে-কোনো রকম ধাপ্পা দিতে রাজী। বললাম, কালই বলব, কাল পরশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকারেঃ মধ্যে সুখে আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে গলে যেতে শুরু কবল।...সে কতবার করে বলল, সে আমায় ভালবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালবাসি।...তারপর ঘরের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা রঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম।...তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি...'

আমি থেমে গেলাম। আমার গলার কাছে একটা সীসের ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন করে বলব!

নদীর ওপারে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। সমস্ত জায়গাটা অপরাহ্নের বিষণ্ণতায় ক্রমশই মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবাব অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমরা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ কবল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল :

'শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমরা কেউ বাচ্চা নেই। আমার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় তিরিশ। লতিকা মাসির তখন আর ঠিক বেঁচে থাকার মতন অবস্থায় নেই। সেই আরথারাইটিসেব অসুখে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। আমি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছি নতুন...তোমরা ভাই জানো, মহেশ্বরী যখন কনট্রাকটারী ব্যবসায় নামল তখন আমি তার পেছনে ছিলাম, তাব সঙ্গে আমার ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তাব লাভেব একটা পার্সেন্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাংকে তার সবরকম সুবিধে করে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাছ থেকে বেমক্কা দু'চারশো পেতাম। ব্যাংকে আমি তাব সুবিধে-টুবিধেব মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মামা ম্যানেজার যদিও নিজের মামা নয়। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিশ্রী এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার পক্ষে কোথাও আর আইনের ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন মেলামেশা। সত্যি কথা বলতে কি আমার তখন এমন কাউকে দরকার, যে আমার অর্থ সাহায্য করতে পারে। অন্তত একটা জামিন থাকলেও আমার পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদের নিজের বাড়িঘর, জমি, লতিকা মাসিমার—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলংকার ছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শিবানীদেব শরণাপন্ন হবার কথা ভাবছিলাম। লতিকা মাসিমা মাবা

গেলে সমস্ত সম্পত্তিই শিবানীর হবে। তাছাড়া, লতিকা মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমার তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে-ধরনের সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ করি নি—মানে সেভাবে নয়, আমার তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদের বাড়িতে সারাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি, বিছানায় শুয়েছি, লতিকা মাসিমার জন্যে ডাক্তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা কবেছি, শিবানীর ও তাদের সংসারের তদারকি করেছি।...আমার ওপর লতিকা মাসিমার সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভাবত জানি না, পরে সে আমার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস কবতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে, মামার জোরে তখনো জেলে যাই নি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপের অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমার বাড়ি বলতে এক মা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদেব বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায়, খাওযা নেই, ঘুম নেই, চোখ-মুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকা মাসির খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। ডাক্তার ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে।...সেদিন সন্ধ্যের পব লতিকা মাসির অবস্থা একটু ভাল হলো, আমি বাইরে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু'চারটে কথার পব সে বলল, 'আমি আর কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব?...' আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা মাসিব কাছে সে সব বলবে।...আমরা দুজনেই তখন একটা শিউলিগাছের কাছে দাঁড়িযেছিলাম, অনেক দিন পরে হঠাৎ আমার নাকে শিউলি ফুলেব গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুরের মতন। শিবানী আমায় সান্ত্বনা দিল। পরে বলল, 'এই ঘববাড়ি টাকা—এ-সব মা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছে। যার কাছে আমার আশ্রয় জুটবে এ-সবই তাব। তুমি তো এসবই তোমার নিজের ভাবতে পাব।' আমি সে-বাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। লতিকা মাসিমা আমার তরফে জামিন দাঁড়ালেন, কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায পডল যে তাকে সরিয়ে বাখা টাকা বের করে দিতে হল। আমাব গণ্ডগোলটাও মিটে গেল। লতিকা মাসি অবশ্য আরো কয়েক মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতেব জন্য আমার ওপর নির্ভর কবতে চেয়েছিল; সে-ভার আমি নিই নি, তাকে আশ্রযও দিই নি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে করার মতন মেযে আমার কোনোদিনই মনে হয নি।..'

অনাদি চুপ করল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীর ওপর দিযে গোধূলির আলোব সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, 'লতিকা কাকিমাব টাকাটা তুমি ফেবত দাও নি?'

'পরে মাসিমা মারা যাবার পর শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি।'

আর কোনো কথা হলো না। আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কারো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। আমাদের চারপাশে সেই সীসের মতন ছায়া ক্রমশই জমতে-লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার আমরা নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তার নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়ের রাশিতে জল ঢাললাম। তারপর অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করুণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হলো যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। শুক্লপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু'পাশের জঙ্গল গুটোনো পাখার মতন দু'পাশে নেমে গেছে, সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, ঝিল্লিরব ঘন হয়ে এলো, ফাল্গুনের বাতাস বইছে, গরুর গাড়ির চিকন করুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথার ওপর চাঁদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, 'শিবানীর চিতায় জল ঢালার সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তার কাছে, তার চিতায় জল দেবার সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।'

অনাদি যে কাঁদছিল আমরা খেয়াল করি নি। সে ছেলেমানুষের মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, 'আমিও...'

চাঁদের আলোয় আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিন প্রেমিক চলেছি। আমাদের সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানীর ধুয়ে যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলুম, আমরা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য, নির্ভরতা তো হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তারপরেও আর কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীর, যা ভুবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভুবন যার জন্যে তার এত ব্যথা? চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চার পাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ন ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।

গুণিন

সমরেশ বসু

বহুদিন পরে গাঁয়েব স্টেশনে পা দিয়ে নকুড় অচেনা এক দেশে আসার মত এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইল। যে গ্রামকে সে ছেড়ে গিয়েছিল, এ সে গ্রাম নয়। রেল-লাইনের পশ্চিম দিকটা অবশ্যই বরাবরই খানিক শহর-পানা জায়গা, কিন্তু এখন তো প্রায় আস্ত একটা শহর হয়ে উঠেছে। মেলাই পাকা বাড়ি উঠেছে, কারখানাও উঠেছে দু-একটা।

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার বুক উজাড় কবে মস্ত একটা নিশ্বাস পড়ল। তাব সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক মহাসুখের হাসি। বহুদিন পরে যেন আচমকা গাঁয়ের হাওয়া লেগে তার শরীরটা আনন্দে শিউরে উঠল। ইস্! কতদিন পর! সে দিন-মাসের বুঝি না হিসেবই নেই। তার জন্মভূমি! ওই তো পুবে বেনাহাটি গাঁ। সামনের মাঠটায় গরু চরাচ্ছে হয়তো দাশু রাখালই। কিন্তু রাস্তার ধারে ধাবে অনেকগুলো চালাঘরও উঠেছে। বোধ হয় নতুন দোকান-পাট হয়েছে।

একে একে গাঁয়ের সবার কথাই তার মনে হতে লাগল আব তাকে দেখে সকলে কী বলবে, কেমন করে তাকাবে সে কথাটা ভাবতে গিয়ে তার ঠোঁটের কোণে মজার হাসি খেলে গেল। সেই সঙ্গে নিজের কৌতূহলও তার বড কম নয়। তা ছাড়া মা? মা কি তার বেঁচে আছে? বোনটার হয়তো এতদিনেও কোন গতি হয় নি। কে বিয়ে দেবে? ফুটো চাল, ফাটা হাঁড়ি, কে-ই বা মেয়ে নেবে সে ঘবের। তা বলে এতদিন কি আর বসে আছে, কিছু হয়তো হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি টিনের স্যুটকেসটা নিয়েগেটের দিকে এগুল। ভেবেছিল বোধ হয় তাদের সেই পুরো স্টেশন-মাস্টাবই আছেন। তাই সে হাসতে হাসতে আসছিল। কিন্তু কাছে এসে দেখল একজন অন্য বাবু।

তবু সে টিকিটটা দিয়ে দু হাতে সুটকেসটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, বাবু তো আমাকে চিনবেন না, নতুন মানুষ। কদ্দিন এয়েছেন এখানে বাবু?

স্টেশন-মাস্টার একটু অবাক হয়ে নকুড়কে দেখলেন। কালো কুচকুচে বর্ণ, একহারা অথচ পেটানো শক্ত শরীর। গায়ের চেয়ে কয়েক পোঁচ কালো পাতলা জ্যালজেলে কাপড়ের জামা, একটা সাদা প্যান্ট পরনে। পায়ে কালো জুতো, সেটিও বেশ পালিশকরা। এক-মাথা ঘন কালো বাবরি চুল।

দেখে শুনে স্টেশন-মাস্টার বোধ করি অভক্তিতেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, এসেছি তো অনেকদিন। তা তুমি কে বটে?

নকুড় মুখ ভরে হেসে বলল, আজ্ঞে আমি? আমি আপনার এই বেনাহাটির ননী দিগরের ছেলে ছিরি নকুড়চন্দর। বলতে বলতে সে হঠাৎ থামল। দিগর হল তাদের পদবী। কিন্তু সে পদবী ছেড়ে তো সে নতুন পদবী নিয়েছে। তবু এক ঝটকায় বলতে আটকাল। পরে বলল ছিরি নকুড়চন্দব গুণিন।

দিগরের ছেলে গুণিন?—স্টেশন মাস্টার বিদ্রূপে হেসে বললেন, গুণ-তুক শিখেছ বুঝি?

আজ্ঞে তাই। নইলে—পরম বিনয়ে হেসে বলল নকুড়, এই যেমন আপনার গে, রেলের ইঞ্জিন যারা চালায়, তাদেব বলি আমরা ডেরাইভার। কিংবা ধরেন—

হ্যাঁ, যেমন আমি আর হরেকেষ্ট পাল নই, শুধু স্টেশন-মাস্টার।—বললেন তিনি।

ঠিক ধরেছেন বাবু। তাই হল আর কী।

মাস্টারের মনটা খুশী হয়ে উঠল। বললেন, আচ্ছা গুণিন, তা হলে এস মাঝে মাঝে।

নিশ্চয় বাবু।—আর এক-দফা কপালে হাত ঠেকিয়ে স্টেশন থেকে নকুড় বেরিয়ে এল। মাস্টারের 'গুণিন' আমন্ত্রণে মনটা তার আরও চাঙ্গা হয়ে উঠল! মানে যে তার একটা ছোট কাঁটার খচখচানি ছিল, তা যেন কেটে গেল অনেকখানি। যতই শহুরে হও আর মাথা চাড়া দাও, গুণিনের কেরামতি মারতে পারে না কেউ।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখল কয়েকটা সাইকেল রিক্সা। একটু দূরে দুটো ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। রিক্সাওয়ালাদের কাউকেই সে চিনতে পারল না, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানও চেনা দেখা গেল না। এক পাশে একটা গরুর গাড়িতে সে দেখল পালদীঘির কাশেম সওয়ারীর জন্য অপেক্ষা করছে।

কাশেম! শালা উল্লুকের মতন দেখছে, তার ল্যাংটাকালের বন্ধু নকড়েকে চিনতেও পারছে না। কাশেমেরও চেহারাটা অনেক বদলে গেছে।

সবাই তার দিকে তাকিয়েছিল। তাতে নকুড়ের বুকটা উঁচু হয়ে উঠল আরও খানিক, ঠোটের কোণে কষ্ট করে সে হাসিটা চেপে রাখল। গম্ভীর হয়ে বোধ করি তার বেশ-বাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সে সকলের দিকে দেখে কাশেমের দিকে এগিয়ে গেল।

কাশেম তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বলল, কোথা যাবেন কত্তা?

নকুড় চোখ পিট-পিট করে হেসে উঠল খিলখিল করে। কাশেমের বোকাটে মুখটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, এই দেখ্, দেখ্ শালা আমাকে চিনতে পারলি নি। কাশেম তাড়াতাড়ি কাছে এসে আধা পরিচযের হাসি হেসে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে নিচ্ছিল বটে যে—

আমি তোব সোয়াবী, কত্তামানুষ?—নকুড় বলল।

কাশেম তবু দ্বিধা কবে বলল, না নকুড় তো তুমি?

বলতে বলতে তারা দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

নকুড় বলে উঠল, চিনি চিনি মনে লয়, তুমি কি কুবজার কাল বট হে?

কাশেম বলল, ইস, একটা যুগ গেল যে! সেই কবে গেছ!

আট বচ্ছর!—বলল নকুড়।

সেই কি কম?—বলতে বলতে কাশেমেব গলা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, কত কী গেল, এল। কী দিন দেখে গেছলে, কী দিন হয়েছে। পাকিস্তান হিন্দুস্থানের ব্যাপার।

তাতে কী হয়েছে। তোমরা থাক না, কার কী বলাব আছে। বেশ ভারিক্কি গলায়

বলে উঠল নকুড়। যেন সে-ই থাকতে দেওয়ার মালিক।

কাশেম একটু অবাক হয়ে নকুড়ের মুখের দিকে দেখল। না ঠাট্টা নয়, তবে নকুড়ের এ কথায় বিশেষ মনও নেই। বলতে হয় বলেছে।

ইতিমধ্যে আরও দু-চারজন এসে ভিড় করেছে তাদের কাছে। কিন্তু সকলেই নকুড়ের কাছে অচেনা।

কাশেম কয়েকজনকে দেখিয়ে বলল, এই তো, এরা তোমার বেনাহাটির লোক। ওই তো, তোমাদের পাড়ার কান্ত বাগদীর ছেলে ললিত। চিনতে পারবে না এখন, বড় হয়ে গেছে রিস্‌কা চালায়।

বটে, কান্ত খুড়োর ছেলে। ভারী জোয়ান হয়ে গেছে দেখছি।

ললিত বিস্মিত হেসে দেখছিল নকুড়কে। 'আপনি বলবে, না 'তুমি' বলবে বুঝতে না পেরে বলল, শুনে আসছি ছোটকাল থেকে, অমুকে বিবাগী হয়ে গেছে। লোকে বলে নানান কথা। কেউ বলে লড়াইয়ে গে মরে গেছে, কেউ বলে, ওই তো অমুক জায়গায় দেখে এয়েছি।

নকুড় হো-হো করে হেসে উঠল।

সকলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাব প্যান্ট, জামা, জুতা, বাবরি, তার কথা বলার ঢঙ। টিনের নতুন স্যুটকেসখানিও বেশ। সকলেই ভাবল, বেশ দু-পয়সা কামিয়ে এসেছে নকুড়। সম্ভ্রম এবং সম্মানের পাত্র মনে হল। সকলেই তাকে নানান প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলল। সবই কাজের কথা। বাইরে কী রকম সুবিধা, কিছু করা-টরা যাবে কি না ইত্যাদি।

নকুড় প্রায় এক কথায় সবাইকে জবাব দিল, কাজ, সে তো ভাগ্যেব কথা। যেখানেই যাবে, কপাল তো আর রেখে যেতে পারবে না। তবে বাইরে গেলে মনে এট্টা জেদ আসে, বুইলে তবে আমি, আমি তো ওসবের দিকে বড় এট্টা নজর দিই নি। আমি তোমার গে এক গুরুব কাছে কিছু মন্তরতন্তব শিখেছি। মানে আসলে এক গুণিনের শাকরেদি করেছি।

কেউ কেউ ভড়কে গেল, কেউ কেউ হতাশ হয়ে গেল একেবারে নকুড়ের কথায়। কেউ কেউ তাকে রীতিমত একটা গুণিন ভেবে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে বইল।

নকুড় আবার বলল, তবে কাজও কবেছি। করেছি ভাই অনেক কিছু, সে সব পরে হবে। এখন আমি বাড়ি যাই।

বলতে বলতে বেশ খানিকটা ভয়ে ও আগ্রহে জিজ্ঞেস কবল, আচ্ছা, আমার মা-বোনের খবরটা এট্টু বল তো তোমরা। সব বেঁচে-বর্তে আছে তো?

ললিত বলল, হ্যাঁ, বেঁচে আছে। মা তো বুড়ি থুত্থুড়ি। কোন-কোনদিন দুটো কলমি হিংচে শাক বিক্কিরি করে, রেল নাইনে কয়লা কুড়োয়, ঘুটে দেয়। আর—

ললিত থেমে গেল।

নকুড় বড় বড় চোখে হাঁদার মত চেয়ে রইল।

ললিত বলল, রাধা চলে গেছে, তোমার বোন।

কোন কথা বেরুল না নকুড়ের মুখ দিয়ে। কেমন একবকম হতভম্ব হয়ে বেনাহাটির

রোদভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশ্য এখানে আসার আগে কেবলই তার ভাবনা হয়েছিল, হয়তো গিয়ে দেখবে মা-বোন দুটো মরে গেছে। ফিরে গেলে গাঁয়ের লোকে বলবে, আহা, এতদিনে এলি, সে দুটোকে দেখতে পেলি নে। আর ঘর তো নকুড় সহজে ছাড়ে নি। ঘরে ছিল না খুদ-কুড়ো। অতবড় দামড়া ছেলে নকুড় দু-পয়সা পারত না রোজগার করতে। কাজের আকাল সেদিনে এদিনে একই রকম। নকুড় তার নিজের খেয়ালে ঘুরত ওঝা-সাপুড়ের পিছে পিছে। ওই ছিল তার এক বাই। মা বলত, দূর দূর, বোনটার ছিল না বড় ভাই বলে একটা মান্যি। তা ছাড়া বয়সকালে যা হয়। মনটা পড়ে গিয়েছিল হরিমতির উপর, এই ললিতেরই দিদি, কান্ত খুড়োর মেয়ে। সে নিয়ে কত কথা। কত কথা কেন? না, দু-পয়সা রোজগার ছিল না নকুড়ের তাই তো। নইলে হরিমতি আজ (কে জানে কার ঘরে আছে) নকুড়ের ঘর করত কিনা।

না, রোজগার নেই, সবাই টিটকারি দিত, মা দিত ধিক্কার। একফোঁটা হরিমতিও ঠোঁট উলটে বলত, না-কামানোর নোক কেন আবার বে করবে?

সত্যি, একটা পোড়া বিড়ির জন্য হাত পাততে হয়। ধু-র শালার জীবন, মরি-বাঁচি করে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

আজ যদি বা ফিরল ভরাট হয়ে, অন্য দিকে সবটাই প্রায় খালি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দু-পয়সা, নিয়েই ফিরছে নকুড়, গুণতুকও শিখেছে অনেক। সেটা লাভ হিসাবে অবশ্য অনেকখানি। কিন্তু আর কী আছে, বোনটাও ঘর ছেড়ে গেছে।

সে হঠাৎ রাগে চোখ পাকিয়ে বলল, কোন্ শালার সঙ্গে গেছে একবার বল দিকি নি, তাকে আমি কাটা পাঁঠার মত আমার পায়ের তলায় এনে মারি।

যেন জানতে পারলে এখুনি বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলবে সে।

কিন্তু সে হদিস কেউ জানত না। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিল, বলল, রাগ সামলাতে।

সে কথাও ঠিক। গুণিনের আবার যখন তখন মেজাজ গরম করতে নেই। গুরুর বারণ। তবু বুকটার মধ্যে ভারি টাটাতে লাগল নকুড়ের। ফিরে আসাটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ললিতের মনটা বিস্ময়ে ও সম্মানে অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছিল নকুড়ের উপর। সে বলে উঠল, দাদা অত ভাবনার কুল নেই। ঘরে মা তো রয়েছে। অ্যাদ্দিন বাদে এলে, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। চল, গাঁয়ে চল।

বলে সে স্যুটকেসটা নিয়ে তুলে ফেলল তার রিক্‌শায়।

মনটা আবার নকুড়ের এদিকে ফিরে এল। আবার একটু গুণিনের হাসি হেসে বলল রিস্‌কাতে যাব নাকি? মস্ত বড তিনটে খানা রয়েছে যে পথে।

ললিত বলল, সে কবে বুজে গিয়েছে, পুল হয়ে গেছে না?

বটে! ভারিক্কি চালে সবাইকে 'আসি ভাই' 'চলি গো' ইত্যাদি বলে রিক্‌সায় উঠে বসল নকুড়। বসল বেশ পায়ের উপর পা দিয়ে।

শহরকে পশ্চিমে রেখে পুবে কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে রিক্‌শা চলল।

রোদ ভরা সকাল, পরিষ্কার আকাশ। ঝিরঝিরে হাওয়ার দিন যেন মন্থর মনোরম।

নকুড় বলল, কান্তখুড়ো কেমন আছে হে?

ওই আছে আর কি! থাকে থাকে যায় যায়। গেলেও তো হয়—প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বলল ললিত।

বুড়ো রুগী ঘরে থাকলে অমনি কথাই বলে লোকে।

নকুড় কয়েকবার কাশল, ঢোক গিলল, পা দোলালো, তাকিয়ে দেখল ললিতের ঘাড় আর মাথাটা। তারপর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার দিদি—মানে হরিমতি, ওকে বে দিলে কোথা?

ললিত সামনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই জবাব দিল, বে তো দিয়েছিলাম পালদীঘির কালী মোড়লের ছেলের সঙ্গে। তা—

হঠাৎ কথা পালটে বলল, এই, এই হল সেই খানা, এখন পুল হয়ে গেছে। জানলে দাদা সেই বেনাহাটি আর নেইকো।

হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে নকুড় বোকার মত হাসতে হাসতে পুলটার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক পালটে গেছে।

কিন্তু সমস্ত বেনাহাটি যেন হারিয়ে গেছে নকুড়েব কাছে। তাদের কথাও যেন হারিয়ে গেছে।

নকুড় কয়েকবার তাল ঠুকল রিক্শার গদিতে। বোধ হয় গুণগুণও কবল একটু। তারপর আবার বলল, তা কালী মোড়লের অবস্থা তো—

আর অবস্থা। বলে উঠল ললিত, মোড়লেব ছেলে মরে গেল, দিদি তো এখন আমাদের ঘাড়ে। ছেলে একটা হয়েছিল, সেটা মরে গেছে।

নকুড়ের মনটা 'আহা' করে উঠতে গিয়েও হঠাৎ প্রাণটায় কোথায় যেন খুশিব বাজনা বেজে উঠল। হঠাৎই বেনাহাটির আকাশ-বাতাস বড় মিষ্টি হয়ে উঠল। মনে হল, হ্যাঁ বহুদিন বাদেই সে ফিরে আসছে গাঁয়ে। মায়ের জন্য ব্যাকুলতা, বোনটার জন্য দুঃখে ভরে উঠল মনটা।

পাড়ায় ঢুকতে-না-ঢুকতে রাষ্ট্র হয়ে গেল, বিবাগী নকুড় গাঁয়ে ফিরেছে। আধকানা বুড়ি নকুড়ের মা তো ডুকরে চেঁচিয়ে কান্নাই জুড়ে দিল। একদিন যাকে দূর দূব করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকেই আজ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আব আশ মেটে না।

মুহূর্তে এ-কথাও রটে গেল, নকুড শুধু দু পযসা কামিযেই আসে নি, এসেছে এক মস্ত গুণিন হয়ে।

পাড়াটা ভেঙে পড়ল নকুড়দের উঠনে। সোমত্ত মেয়ে-বউরাও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে নিল নকুড়কে।

আশ্চর্য, নকুড় এত সুন্দর, এত গুণবান, এত বড মানুষ।

কান্তখুড়ো মনে মনে কপাল ছাপড়ে বলল, কে জানত, এমন দিনও আসবে। একেই বলে বরাত।

বরাত বলে! নইলে মতি মোড়ল অমন নকুড়ের গা ঘেঁষে অত খাতিব করে। মতির ঘরে আছে আইবুড়ো মেয়ে। নকুড়কে যদি রাজী করানো যায়, তা হলে আর পায় কে?

নানান জনে নানান কথা বলল। কেউ কেউ তো তর্কবিতর্কেই গেল লেগে।

নকুড়ও কিছু অর্বাচীন নয়। সে রীতিমত দুরন্তভাবে জোড় হাতে হেসে নরম গলায় সবাইকে আপ্যায়ন করল এবং ঘোষণা করে দিল, এই দেখেন কান্তখুড়ো আছেন, মতিখুড়ো আছেন, আপনারা সবাই জানেন, জাতে তুমি দিগর হলে কী মস্তান হলে, সেটা বড় কথা নয়। গুণের একটা নাম আছে। আমাকে কিন্তুন পিখবীর লোকে গুণিন বলেই জানে, নকুড় গুণিন।

সবাই বলল, নিশ্চয়, গুণিনকে আমরা গুণিন বলব। ভাল ভাল।

কিন্তু হরিমতি, হরিমতি কোথায়? আশেপাশে এত বউ ঝি হরিমতি তো আসে নি। লজ্জায়ই হয়তো আসে নি সে। সেদিনের নকুড় একেবারে অন্য মানুষ হয়ে এসেছে, লজ্জা তো হবেই। শত হলেও সেদিনের অচ্ছেদাটা কী কম ছিল?

পরদিন সকালের ভিড় কাটলে দুপুরের ঝোঁকে এল হরিমতি।

নকুড় তখন খাওয়া শেষে বসে বসে পান চিবুচ্ছে। পরনে একখানি নতুন ধুতি। তেলে জলে ধোয়া চকচকে খালি গা, মাঝখানে সিঁথি কেটে বাবরি চুল আঁচড়েছে পাতা পেড়ে।

হরিমতিকে দেখে এক মুহূর্ত কথা সরল না নকুড়ের। আধা পরিচয়ের হাসিতে থমকে গেল সে।

মাজা মাজা রঙ হরিমতির সেই কিশোরী শরীরটা লম্বায় চওড়ায় বেড়ে উঠেছে শুধু নয়, শক্ত পুষ্ট গায়ে তাব রূপেরই বা কি বাহার হয়েছে। গায়ে জামা নেই, শাড়ির বেখায় রেখায় শুধু শ্রী নয়, প্রাণ-ভুলানো গমকের ওঠা নামায় তা অপূর্ব। মুখে ঠাসা পান, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুক করছে! সেই ঠোঁটে ও স্থির চোখে তার বিচিত্র হাসি। একে বিধবা, তার বাপের বাড়ি। মাথায় তার ঘোমটা নেই, টান করে বাঁধা আলগা চুল। কে বলবে এ মেয়ের বিয়ে হয়েছিল?

হরিমতিই হেসে বলল, চিনতে পারলে নি?

চকিতে থম্-ধরা ভাব কাটিয়ে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল নকুড়। বলল, খুব, খুব চিনেছি। এস এস, বোস এসে।

হাসলে পরে বেঁকে ওঠে হরিমতির ঠোঁট। বলল্, থাক্ থাক্, কুটুম তো লই, তুমি বোস।

নকুড় বসল, কিন্তু মনটা বসল না। আচমকা সব গুছনো বস্তু হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার মত মনটা এলোমেলো হয়ে গেল তার। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, মা মা, হরিমতি এসেছে গো।

সে কথা শুনে মায়ের পিত্তি জ্বলে গেল ঘরের মধ্যে। একদিন যে ধিক্কার দিয়েছে নকুড়কে, আজ সেই ধিক্কারেই সোয়ামীখাগী হরিমতিকে মনে মনে গাল দিয়ে উঠল বুড়ি। শুধু রাগ নয়, ভয়ও হল, তার অমন ছেলের মাথাটা না আবার খারাপ করে ছুঁড়ী।

হরিমতি বসে পড়ল নকুড়ের অদূরেই। বলল, তুমি নাকি মস্ত গুণিন হয়ে এয়েছ।

নকুড় হরিমতির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি এবং বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে রইল। কোথায়

লজ্জা হরিমতির মুখে। দিব্যি ঠোঁট টিপে বাঁকা হেসে কথা বলছে। চোখের কোণে দৃষ্টি অপলক। জড়তাহীন স্বচ্ছন্দ ভাব।

নকুড় বলল, মস্ত আর কী, তবে একটু আধটু শিখে-টিখে এয়েছি।

হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে হরিমতি বলে উঠল, আমিও কিন্তু মস্ত গুণিনী হয়েছি, সত্যি।

ঠাট্টা না সত্যি, নকুড় বুঝতে পারল না হরিমতির মুখ দেখে। হ্যাঁ সেদিনের কিশোরী হরিমতির মুখে চোখেও অনেক কথা ফুটে বেরুত। আজও তার সারা মুখে চোখে যেন কত কথা, কিন্তু সবই ধাঁধার মত রহস্যময়ী মনে হল নকুড়ের। টিপে টিপে হাসে, ঠেরে ঠেরে দেখে।

নকুড় তাড়াতাড়ি বলল, সে তা'লে আমারই কপাল। গুরু ছেড়ে এয়েছি, নতুন গুরু পেলাম। তোমার শিষ্যি করে নিও আমাকে।

হরিমতি বলল, গুরু যেমন আপনি পাওয়া যায়, শিষ্যিও তেমনি আপনি হবে, অবিশ্যি শিষ্যির মতন শিষ্যি হলে।

বটে। তবে পরখ করে নেও।

করব।—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল হরিমতি। বলল, পেরায় আগের মতনই আছো বাপু।

তুমি কিন্তু বদলে গেছ—নকুড় বলল।

তা গেছি।—বলে চকিতে যেন নকুড়ের বুকের শেষ অবধি হরিমতি বলল, তা'পর বে-টে করবে তো?

কেবলই কথা আটকায় নকুড়ের গলায়। বলল, তা মেয়ে পেলে—

ও মা। মেয়ের কি এ সমসারে অভাব?

না। কিন্তু মনের মানুষের অভাব।

আবার হরিমতি হেসে উঠল খিলখিল করে। মনের মানুষ।

কিন্তু হরিমতিও হঠাৎ চুপ করে গেল।

নকুড় সমস্ত আড়ষ্টতা কাটিয়ে স্থির দৃষ্টিতে হরিমতির দিকে তাকাল।

হরিমতি বলল, কী দেখ?

দেখি তোমাকে।

এক মুহূর্তে সমস্ত হাসি মস্করা উবে গেল হরিমতিব মুখ থেকে। পরে হেসে বলল, তুমি তেমনি আছ। কেন লোকে বলে তুমি পালটেছ?

লোকে বলুক। তোমার কাছে তো পালটাই নি।

এবার হরিমতি হাসতে হাসতে উঠে পড়ল। কিন্তু বাড়ির বাইরে এসে এলোমেলো মনটা নিয়ে সে ফাঁপরে পড়ে গেল। দ্রুত নিশ্বাসে বুকটা দুলে উঠল, চলার গতিতে আর উদ্ধত স্তব্ধ যৌবন যেন আচমকা আজ নেচে উঠল।

দম ভারী হয়ে গেল নকুড়ের। আচমকা ঝড়ের মত এসে হরিমতি তার আঁট-ঘাট-বাঁধ মনটাকে খুলে ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দিয়ে গেল। হরিমতির আশা নিয়ে সে ফেরে নি গাঁয়ে সত্যি, কিন্তু তাকে এসে এমনটি দেখবে তাও আশা করে নি। আর যদি দেখল, তবে হরিমতির মনের হদিস পেল না শুধু নয়, তার হাবভাব

দেখে তার বুকটাতে জমাট বেঁধে উঠল ব্যথা আর অস্বস্তি। মন তার হরিমতির পিছে পড়ে রইল। কিন্তু লোকজন বন্ধুবান্ধবের হাত থেকে তার রেহাই নেই। সকালে বিকালে তাকে অনেকে ঘিরে থাকে। সে যে গুণিন। বহুজনের বহু প্রার্থনা। এ এটা চায়, সে ওটা চায়।

সে কাউকে মাদুলি দেয়, জলপড়া দেয়। তবু রোগের ঝামেলার চেয়েও বেশী আসে সব অন্য ফিকিরে। বলে, বশীকরণ শিখিয়ে দাও। আর বশীকরণের ব্যাপারটা এমনই ছোঁয়াচে যে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, মহকুমা জেলায় পর্যন্ত যেন বাতাসের আগে খবর ছড়িয়ে পড়ে।

ছেলে বুড়ো নেই, মেয়ে পুরুষ নেই, সকলের সব কথা শোনে নকুড়। বিধি-ব্যবস্থা বাতলে দেয়। হরিমতির ভাই ললিতও বশীকরণের বিধি চায়।

গুণিন গম্ভীর হয়ে ব্যবস্থা দেয়, পেথমে ছোট পেতলের বাটিতে একটু তেল নেবে। সে তেল আমি দেব, গুণ তেল। নেয়ে শুদ্ধ হয়ে না খেয়ে ভোরবেলা পুবমুখো বসবে। সামনে তেল রেখে, সূর্যের দিকে চেয়ে এক হাজার আটবার এই বলবে—

বলে এক মুহূর্ত থেমে হাত পেতে বলে, সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দাও। পয়সা পেলে বলে, বলবে—

শিবঠাকুরের পাথর ঘষে,
গৌরী ছোটে কৈলাসে।
বাঁশী বাজায় কেষ্ট বসে,
আয়ানেব বউ ছুটে আসে।
আমি ভূতের মাথায় ঘিলু নিয়ে,
ছিটা দিলাম অমুকের গায়ে।

অমুক মানে যাকে বশীকরণ করবে। তবে দেখো, কারুর সব্বোনাশ কোর না, ঘর ভেঙো না কারুব। এই হল গুরুর আদেশ আর হাজার আটবার গুনে সেই তেল নে-গে ছিটিয়ে দেবে তার গায়ে।

যদি কোন ভুলটুল হয়, তা হলে আর জীবনে হবে না। অর্থাৎ গুণ তেলে আর হবে না।

শুধু তেল নয়, কাউকে কাউকে সে সিঁদুর দেয়। সে সিঁদুর-টিপ দেখলেই জন্মশত্রুও নাকি বশ মানবে।

ফলের চেয়ে অফল বেশী। তবু আশ্চর্য বকমেই দু-একটা লোক ফল পেয়ে যায়। তাতেই বিশ্বাস আরও বেড়ে যায় লোকের।

যাদের ফলে না, তারা জীবনভোর ভুলের মাশুল দেওয়ার জন্য মন ঠাণ্ডা করে বসে থাকে। গুণতুকের চারপাশে এত ফাঁক যে হাজার আঁটঘাট বাঁধলেও ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

যখন কোন কিছুতেই হয় না, তখন ব্যবস্থা নকুড় শেষ কথা বলে। বলে, অমাবস্যার দিন মাঝরাতে মাটি খুঁড়ে মানুষের হাড় তুলতে হবে। সে তোমার মুসলমানের বা হিন্দু বোষ্টমের গোর থেকেই হোক, হ'লেই হল। গায়ে কিন্তুন বস্তুর থাকবে না।

যেমনি হাড় তুলবে, অমনি এক দমে ছুটে নিয়ে হাড়শুদ্ধ জলে ডুব দিয়ে উঠবে। খবরদার, দম ছেড়ো না, পেছন থেকে কতজনা ডাকবে, কিন্তুন ফিরে তাকাবে না, সাড়া দেবে না। সামনে কেউ দাঁড়ালে থুথু দিয়ে এগিয়ে যাবে। ভয় পেয়ো না। তা'পর সে হাড় নে যদি একবার উঠতে পাব, সোজা চলে আসবে আমার কাছে। যা করবার আমি করব।

শুনেই সকলের বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসে। এ প্রচেষ্টার দুঃসাহস কারুব নেই।

অবিশ্বাসীও অনেক আছে তার বন্ধুদের মধ্যে। তারা বলে, এসব ছাড় নকুড়ে, অন্য কিছু কর।

নকুড় অমনি বলে, জানিস কলকাতায় এসব কাজে এক-একজন লক্ষপতি হয়ে গেছে। রাজামহারাজা তাদের দরজায় বাঁধা, সারা পৃথিবীর লোক আসে তাদের কাছে।

বন্ধুরা বলে, তবে এত যখন জানিস তো দে শালা হারাণ কায়েতকে বাণ মেরে। ব্যাটা চল্লিশ টাকা মন চাল বিক্কিরি করে।

নকুড় তাড়াতাড়ি জিভ কেটে চোখ বুজে হেসে বলে, ছি, যখন তখন্ এসব করলেই হল?

তবে দে বশীকরণ করে হারাণ কাযেতকে, শালা ধামা ধামা চাল মাগনা নে আসি।—বলে বন্ধুরা। এসব কথার কোন মূল্য নেই নকুড়ের কাছে। সে এদের গম্ভীর গুণিনের মতই মিষ্টি হেসে ঠাণ্ডা করে।

ঠাণ্ডা হয় না হরিমতি। হায়, সে গুণিনী কিনা কে জানে, কিন্তু সে গুণ কবেছে গুণিনকে। কাজে ভুল, মন্তরে ভুল, সব গোলমাল হয়ে যায়। এক এক সময় বিবক্ত হয়ে ওঠে লোকজনের উপব। এমন কি মতি মোড়লেব তোষামোদও বোঝে না সে।

হরিমতি তেমনি আসে। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায। টিপে টিপে হাসে। তাব শবীরেব বন্য ঢেউয়ের উত্তরঙ্গ জলে ফেলে দেয় নকুড়কে। আর কথায কথায় কেবলই বলে, আমিও কিন্তন গুণিন, মাইরি বলছি।

নকুড় জোড়হাতে ব্যথিত অস্থির গলায় বলে ওঠে, মানি আমি তো হরিমতি। তুমি আমার গুরু এট্টুসখানি নজর দাও তোমার শিষ্যিব পরে।

অমা গো।—বলে ছুটে পালিয়ে যায় হবিমতি। তারপব দেখা যায়, ঝোপে ঝাড়ে তার হাসিভরা চোখে জলের বন্যা। নকুড গুণিন বলে কি বোঝে না কিছু? কেবলই গুরু শিষ্যি কথা। কেন প্রাণ খুলে কথা বলুক, যা প্রাণ চায করুক। কে বা জানত তার পোড়া মনে আবার এমন পোড়ানি আসবে, আসবে নকুড় ফিরে জোডহাতে তাবই প্রাণের দরজায। এল যদি বা, তবে এত আনকথা কেন? নিজের কপালকেও দূষে সে। সবই যদি গিয়েছিল, তবে আর সাধ কেন প্রাণে?

কিন্তু হরিমতি বোঝে না নকুড়কে, ধাঁধা লাগায় সে-ই। সে ভাবে, নকুড় কি আগের দিনের শোধ তুলতেও জানে না। না, এ জন্মবিধবার দুঃখ সে বোঝে না। এ সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই এক সময় মনে হয় হবিমতিব, তার সারা গায়ের মধ্যে যেন শির শির করছে। অজানতে বুকের কাপড় সবিযে কোল গুছিযে বসে

সে। যেন তার সেই মবা ছেলেকে সে স্তনপান করাচ্ছে।...তারপর আচম্বিতে হাওয়া লেগে গা ঢেকে ডুকবে ওঠে সে।

হবিমতি শুকোয়। চোখেব কোল বসে যায়। তবু হা-পিত্যেশে বসে থাকা, নকুড়ের কাছে এসে আবার তেমনি হাসে। নকুডেব মা তো হাড়েমাসে জ্বলে যায়। ছেলেকে বিয়ের তাড়া দেয়।

নকুড় অন্য লোককে জিজ্ঞেসবাদ করে, হবিমতিব কোন দোষটোষ আছে নাকি? জবাব পায়, চাল দেখে বুঝতে পাব না?

চাল দেখে? হ্যাঁ, তা সন্দ তো খানিকটা লাগেই নকুড়ের মনে।

কয়েক মাস কেটে গেল। নকুড় ঘোরে এখানে সেখানে। স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে ভারি ভাব জমেছে। সেখানে নানান কথায় সময় কাটায়। মাস্টারের বন্ধ্যা বউ আবার তার কাছ থেকে মাদুলি নিয়েছে।

মাস্টার বলেন, সবই বুঝলাম গুনিন। তা একটা গুরু ঠিক কর মানে প্রাণের গুরু হে। নইলে সব যে ভেস্তে যাবে।

মাস্টার তাব বউকে দেখিয়ে বলেন, এই যে আমার গুরু। এ গুরু যদি না ঠিক ধবতে পাব, তবে গুনিনের মন যে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে।

বাঃ, মাস্টার এত গুণেব কথাও বলতে পারে। শুনে নকুড়েব মনটা আরও বেদনায় যন্ত্রণায় ব্যস্ততায় ভবে ওঠে। সে স্থির কবে ফেলে, এবাব বলেই ফেলবে হরিমতিকে তাব প্রাণেব কথাটা।

সেদিনও যখন হবিমতি এল, নকুড মন স্থিব কবে ভাল করে তাকাল তার দিকে। শবীরটা ভাবি শুকিযে গেছে হবিমতিব কিন্তু হাসিব ধাব তাতে কমে নি, বরং বেড়েছে। তার বাঁকা ঠোঁটেব পাশে হাসি যেন তিক্ত হযে উঠেছে খানিকটা। তার অপলক চোখে, কথায় লাঞ্ছনাব ছাযা।

নকুড বলল, ভাবি শুক্কে গেছ।

যাব না। তোমাদেব মত গুনিন গাঁযে থাকলে আব কী হবে?

কেন কেন?

হবিমতি বলে ফেললে, আমাকে এট্টুস্ মন্তব শিখিযে দাও না।

কিসের?

বশীকবণেব।

চকিতে নকুডেব বুকটা পাথরেব মত জমে গেল। কথা বেরুল না তার মুখ দিযে। যেন চোখেব সামনেই কেউ তাব হৃৎপিণ্ডটা খুলে নিযে ঘেঁটে চটকে ফেলেছে। বলল, বশীকবণেব কেন?

হবিমতি তেমনি হেসে বলল, মবণ আমাব। পীবিত হয়েছে, বুঝেছ? সে মিনসের কোন রীতি বুঝি না আমি, দাও দিনি এট্টু কিছু।

হরিমতির পীবিতের সে বস্তু আবার দিতে হবে নকুড়কেই। নকুড় বলল, তুমিও তো গুণিনী।

আমি তো পারলাম নি বাপু।—হাসির ছটায় যেন দপদপ করে জ্বলে উঠল হরিমতির মুখ।

সব—সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেছে নকুড়ের, ছিঁড়ে গেছে মনের সব আঁটঘাট। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। আর চোখে হঠাৎ রক্ত উঠে এসেছে, দপ্‌দপ্‌ করছে মাথার শিরাগুলি। মনের গুমবানি ফুটে উঠল তার শক্ত পেশীতে। বলল চিবিয়ে ফিসফিস করে, দেব, দেব মন্তর। থাকল আমার মনে, তুমি যাও।

নকুড়ের সে মুখ দেখে ভয় পেল হরিমতি। বলল, রাগমাগ করলে নাকি বাপু?

রাগ?—হেসে বলল নকুড়, আমার কাছ থেকে বশীকরণ শিখবে, রাগ করব কেন?

তবু মনটায় ভারি অস্বস্তি নিয়েগেল হরিমতি। গুণিনদের মাথায় কী আছে? এ সমসারের মানুষদের কি ওরা চোখ চেয়ে একটু দেখতেও পায় না। গুণতুক ছাড়া কি আর কিছু নেই? পোড়াকপাল, বশীকরণের গুণই যদি কিছু ঠাওর না পেল।

কিন্তু অদ্ভুত উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল নকুড়। তারই দেওয়া বস্তু দিয়ে নিজের জীবন ভরবে হরিমতি? না, তার আগে নকুড় নিজের জন্যই সে বস্তু আনবে। তার আগে সেই-হরিমতিকে বাঁধবে আষ্টেপৃষ্টে। সে আর হেলাফেলাব জিনিস নয়। একেবারে আসল অস্ত্রই ছাড়বে সে। যক্ষ রক্ষ দত্যি দানো, যে-ই হও, কেউ ঠেকাতে পারবে না নকুড়কে।

দু দিন বাদেই অমাবস্যা এল।

নকুড় বেশ খানিকটা সিদ্ধি খেয়ে বুঁদ হয়ে রইল। তারপর মাঝরাত্রি নিশ্চুপে কোদালখানা নিয়ে গাঁয়ের বাইরে পথ ধরল।

ঘুটঘুটে কালো রাত। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় প্রতি মুহূর্তের যেন কারো আশেপাশে উপরে নিচে যাওয়া আসা করছে। গাছগুলো যেন ওত-পাতা ভূতের মতন আছে দাঁড়িয়ে। বিদ্‌ঘুটে নৈঃশব্দ্যকে ছাপিয়ে থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে।

নকুড় হনহন করে এসে হাজির হল বেনাহাটি ও পানদীঘি গাঁয়ের সীমানায়। পানদীঘির কোল ঘেঁষে গোরস্থান। অদূরেই মস্ত দীঘি। দুদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত তেপান্তর অন্ধকার প্রেতের মত ঘাপটি মেরে পড়ে আছে।

মুহূর্তে নিজেকে বিবস্ত্র কবে নকুড় একটা মাস কযেক আগে গোরে কোপ দিল। অমনি মনে হল, কারা যেন দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল ছুটে।

কিন্তু নকুড় থামল না। সে কুপিয়ে চলল ঝপ ঝপ করে। আব কী সব বিড়বিড় করতে লাগল। তার সারা গায়ে ঘাম ফুটে বেরুল।

শেয়াল ডাকছে, কাঁদছে বুঝি বা শকুনেব বাচ্চা।

কোদাল ঠক্‌ করে উঠল। পাওয়া গেছে। তাডাতাডি নকুড দু হাতে সরিয়ে ফেলতেই কী যেন ঠেকল হাতে নরম আব ভেজা।—এঃ, একটু টুকরো মাংস লেগে থাকা কঙ্কাল। কিন্তু কঙ্কাল যেন নীরবে হাসছে।

কে যেন হেসে উঠল উপর থেকে খিলখিল করে। হরিমতি। হরিমতি হাসছে। মাটি তুলতে তুলতে চকিতে ফিরে দেখল নকুড়। না, কেউ নেই।

সে প্রাণপণ শক্তিকে কঙ্কালের কবজিতে চাড় দিল। কিন্তু চকিতে তাব মনে হল, এ কী করল সে? ফিরে তাকাল। তবেকি সব পণ্ডশ্রম হল?

এবার কঙ্কালও হা-হা করে হেসে উঠল। উপর থেকে বার বার ডাকতে লাগল হরিমতি।...নকুড় দাদা, নকুড় দাদা। এ কী করল সে। বারবার খালি একই কথা মনে হতে লাগল। তবু মট করে হাড় ভেঙে ফেলল সে কঙ্কালের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত।

কিন্তু তার চারদিকে বিচিত্র হাসির কলরোল। কান্না যেন তাকে ঘিরে ফেলে নাচছে।

সে লাফদিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু পা হড়কে যেতে লাগল, আছাড় খেতে লাগল বার বার।

কোন রকমে যেই উঠল, অমনি হরিমতি তাকে পেছন থেকে স্পর্শ করে ডাকল। চমকে সে পিছন ফিরল। ...কিন্তু কোথায় হরিমতি। ...আবার...আবার ভুল। তাড়াতাড়ি দম আটকে সে ছুটে গেল দিঘির ধারে। নিস্তরঙ্গ কালো জল, তারার ছায়ায় চকচক করছে।

আবার ডাকছে হরিমতি।...জলে লাফ দিতে মুহূর্ত চমকাল নকুড়। তখন আর দম থাকছে না। তার ভয় করছে। তার ভুল হয়েছে, সে পিছন ফিরছে।

দত্যি-দানোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসে সে নিজেই অন্ধকারে একটা উদোম ন্যাংটো প্রেতমূর্তি যেন।

ঝপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল নকুড় হাড়শুদ্ধ। কিন্তু সেখানেও হাসি, সেখানেও হরিমতি। নকুড় পাড় খুঁজতে লাগল। যত খোঁজে তত তলিয়ে যায়। কোথাও পাড় নেই।

কিছুক্ষণ বাদে দীঘির জল স্থির হয়ে গেল। কেবল এক জায়গায় কতগুলি বুদবুদ উঠে গেল মিলিয়ে।

নকুড় আর উঠল না।

পরদিন খানিক বেলায় গুণিনের মৃতদেহ যখন ভেসে উঠল দীঘির জলে, তখন লোকজন ছুটে গেল সেখানে। দেখলে সবাই অদূরে মাটি-খোঁড়ার কবরের পাশে পড়ে আছে একটা কোদাল।

সবাই বলল, দানোয় মেরেছে চুবিয়ে গুণিনকে।

কেবল হরিমতি জলভরা চোখে ঘরের ছেঁচে আকাশের দিকে মুখ করে হাহাকার করে উঠল, গুণিন, তুমি হরিমতিব মন বুঝলে নি। ও ছাই বস্তু কে চেয়েছিল। আবার যে জীবনে বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি তা দিলে নি—দিলে নি।

আর এক দিন

আশাপূর্ণা দেবী

ওদের ভালোবাসাটা তা'বলে এমন কিছু নভেলি ভালোবাসা ছিল না। উভয় পরিবারের বন্ধুত্ব বন্ধনের সূত্রে, প্রায় পারিবারিক প্রথার মতোই—দু'বাড়ীর ছেলেমেয়েদেব মধ্যে ছেলেবেলা থেকে সে সহজ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সেইটুকুই।

তার বেশী নয়।

এদের ছেলেরা ওদের ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে গেলে, অথবা ওদের ছেলেরা এদের উঠোনে মার্বেল খেলতে এলে, কেউই যেমন দোষের বলে গণ্য করতো না, তেমনি গণ্য করতো না এ বাড়ীর অলকা ও বাড়ীর অশোককে দুখানা রুমাল সেলাই করে দিলে, অথবা ও বাড়ীর অশোক এ বাড়ীর অলকাকে একখানা বই 'প্রেজেন্ট' করলে।

শুধু এই। এইটুকু সুযোগের অবসরে যতোটুকু, আর যেমন ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

উপহারের বইতে ক্ষিধের চাহিদা মেটে না।

অশোকের ডিউটি ছিলো 'যেন তেন প্রকারেণ' অলকাকে বই জোগান্ দেওয়া। কিন্তু বইয়ের পোকাকে বই জুগিয়ে কুলিয়ে উঠতে কে পারবে?

অশোক বলে,—'তোর জন্যে দেখছি আরো দু'চারটে লাইব্রেরীর মেম্বার হতে হবে! মাত্র দুটো লাইব্রেরীর বইতে কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা মেটা শক্ত।'

অলকা রেগে বলতো—'কুম্ভকর্ণ টর্ণ' যা খুশি বলবে না বলছি অশোকদা! তা'হলে আর তোমাদের বাড়ী জন্মে আসবো না।

অশোক হেসে বলতো—না এসে পারবি?

—কেন পারবো না? বাড়ীতে কালীসিংহীর মহাভাবত আছে, তাই পড়বো বসে বসে।

—ভালো ভালো! অশোক কৌতুকহাস্যে মন্তব্য করতো—খুব ভালো! ঈশ্বর তোকে সুমতি দিয়েছেন দেখে বড়ো আনন্দ হচ্ছে। সত্যিই তো, কেন মিথ্যে কতকগুলো নভেল নাটক পড়ে উচ্ছন্ন যাবি। 'পরিণীতা' 'পবিণীতা' করে হত্যে হযে যাচ্ছিলি, এনেছিলাম! যাক গে—ফেরৎ দিয়ে দেবো।

ব্যস আর রক্ষে থাকতো না। হৈ হৈ করে উঠতো অলকা।

—ও মা গো! কী সাংঘাতিক ছেলে তুমি অশোকদা। এনে লুকিয়ে রেখেছো—বলে বাড়াবাড়ি রকমের কাড়াকাড়ি শুরু করে দিতো একেবারে। সম্ভব অসম্ভব এমন সব জায়গা তচ্‌নচ্ করে খুঁজতো যে, গুছিয়ে দিতে তাকেই আবার একঘন্টা খাটতে হতো।

এসব ঘটনা যে অভিভাবকদের অসাক্ষাতেই ঘটতো এমনও নয। কাবণ তাঁরা এতে কৌতুক উপভোগ করা ছাড়া সন্দেহের কিছু দেখতেন না।

অবিশ্যি অসাক্ষাতেও যে একেবারে কিছুই ঘটানো হ'তো না তা নয়।

ধরো—সেই একটি দিনের কথা!

বোধ হয় সে একটা প্রথম বৈশাখের এলোমেলো বিকেল।

অশোক সসব্যস্ত হয়ে এসে অলকার মাকে প্রশ্ন করে—অলকা কোথায় গেলো মাসীমা? আহা কালকে বেচারা অনেক খেটেখুটে একগাদা বইয়ের এক লিষ্ট করে দিয়ে এলো আমায়, আর আমি সেটি—বুঝলেন মাসীমা—সোজা পকেট সুদ্ধু ধোপার বাড়ী! উঃ শুনলে যা হাত পা আছড়াবে!... গেলো কোথায়?

অলকার মা আক্ষেপের স্বরে উত্তর দেন—আর কোথায়! বিকেল হ'লে কি আর মেয়ের টিকি দেখবার জো থাকে! সেই ছাতে উঠে বসে আছে!

অশোক বললে—'মাটি' করেছে! ছাতে এখন কে যাবে বাবা! থাক, ওর বই আর আসছে না! রেগে মরবে আর কি!...অলকা! এই অলকা!

বলা বাহুল্য অলকার কান অবধি পৌঁছায় না সে ডাক।

অশোক বলে—তা এ সময় ছাতে উঠে বসে থাকবার ওর দরকারটাই বা কি? এই রান্নাটান্না, তরকারি কোটা, সব আপনাকে একা করতে হয় তো? কাজটাজ কিছু শেখান মেয়েকে?

—কাজ করবে অলকা? তা'হলেই হয়েছে!

সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মেয়েকে ডাকাডাকি করেন অলকার মা।

—অ মুখপোড়া মেয়ে, নাব্‌না ছাত থেকে! এই অশোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কি লিষ্টি ফিষ্টি দিয়ে যাবি যা না?...অলকা! কালা হয়ে বসে আছিস না কি?

অশোক বলে—আহা, ওরও দোষ নেই মাসীমা! ঠেলে খানতিরিশ চল্লিশ বইয়ের নাম লিখে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে, মনে জানে, আসতে যা দেরী। দিনে দু'খানা করে বই গেলে যে কি করে!

অলকার মা বলেন—জোগান পেলে আর গিলবে না কেন? তোকেও যেমন ভূতে পেয়েছে বাবা!...বলি—অ অলকা!...রোস তোর ছাতের টঙে উঠে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকা বার করছি আমি।

অশোক বলে—আপনার ও ক্ষীণকণ্ঠ তিনতলা অবধি পৌঁছবেনা মাসীমা! বৃথা চেষ্টা! বিনুনি ধরে হিড়হিড় করে টেনে না আনলে আর নামানো যাবে না।

বিনুনী ধরে টানবার জন্যেই অগত্যা উঠতে হয় ওকে ছাতে।

অলকা অপ্রত্যাশিত খুশিতে চমকে গিয়ে বলে—ওমা! একি। তুমি হঠাৎ ছাতে যে?

—কি করবো—অশোক গম্ভীরভাবে বলে—আমাকে যে 'ভূতে পেয়েছে।'

—ও আবার কি কথা!...অলকা বলে—যা তা বলছো কেন?

—মাসীমা তো তাই বললেন। ঠিকই বলেছেন। বুদ্ধি আছে, দৃষ্টি আছে, তাই বলেছেন। তবে হিসেবে 'একটু' ভুল করে ফেলেছেন, 'ভূত' নয় 'পেত্নী'।

—যাঃ!—বলে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অলকা।...এই নিতান্ত সহজ সামান্য

পরিহাসেও কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। অশোকের মুখের কথার সঙ্গে চোখও যে কথা কইতে চাইছে!

চোখের ভাষাকে বড়ো ভয়! ও 'সামান্য'কে একদণ্ডে অসামান্য করে তুলতে পারে। তাই না, চোখকে এড়াতে অকারণ এতো মুখের কথার সৃষ্টি করা। কথাই হচ্ছে আশ্রয়।

তা ভয় অশোকেরও ছিলো বৈকি। তা নইলে অমন 'বলি বলি' চোখ কিছু না বলেই থেমে থাকে?

ছাতে মাদুর পেতে বসে—আর কিছু নয়, বইই পড়ছিলো অলকা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই কোল থেকে পড়ে গেলো বইটা। রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা।

—কি, পড়া হচ্ছিল কি? ইস্ কাব্যি!

কুড়িয়ে নিয়ে মাঝখান থেকে একটা কবিতা খুলে ধরে অবজ্ঞার সুরে বলে—পড়লেই হয় না শুধু বোকার মতো। মানে বুঝতে পারিস কিছু?

—কেন পারবো না? খুব পারি। ভগবান একা তোমাকেই সব বুদ্ধিগুলো দিয়ে দিয়েছেন না কি?

—আমার তো তাই ধারণা। পারিস যদি, তো—পড় এটা! পড়ে মানে বল। দেখি কেমন বোধশক্তি।

খোলা পাতাটার দিকে চেয়ে অলকার মুখটা লাল হয়ে ওঠে, কথা বলার শক্তি বড়ো বিশেষ থাকে না।

—কই কি হলো?...পড়তে পারলি না? সত্যি কি পণ্ডিত! পড়তেই পারেনা আবার মানে বোঝার গুমোর। দিনে দু'খানা বই শেষ করার রহস্য এবার বুঝেছি। শুধু চোখ বোলাস, এই তো? শুনবি তবে?...শোন্—মানে বুঝিয়ে দিচ্ছি—! কবি বলেছেন—

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে—"

শেষ পর্যন্ত মানে বোঝাবার জন্য দাঁড়িয়ে শোনার সাহস অলকার অন্ততঃ ছিলোনা। বেচারা চোদ্দ বছরের অলকা! ছুটে পালিয়ে গেলো নীচে!

না, চোদ্দ বছরের নায়িকা শুনে হাসবাব কিছু নেই।

ঘটনাটা এ যুগের নয, সে যুগের। তখনো তোরো বছরেব 'ললিতা' সগৌরবে আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে পাঠকেব চিত্ত জয় করে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্যি এমন সুযোগ সুবিধে বড় বেশী পাওয়া যেতো না।

"এ জীবনে দু'জনের মিলন না হ'লে জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে"—এমন আজগুবি কথা দু'জনের একজনও ভাবেনি কোন দিন।...দু'জনে দু'জনের বিরহে সারা জীবন ব্যর্থ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে, এমন ডাহা মিছে কথা গল্প লেখকেরও লিখতে বাধবে।

আসল ঘটনা এই—তারপর থেকে ওদের আর দেখাই হয়নি।

সংসারের জটিল ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া—একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে,

আর একটি আঠারো বছরের ছেলে, নিজেদের চেষ্টায় আর কখনো মুখোমুখি হ'তে পারেনি।

দু'টো বাড়ীব একই বাড়ীওলা, বাড়ী দু'খানাকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের কবলে ফেলে দিয়েছিলো মোটা টাকা মূল্য ধরে নিয়ে। দুই ভাড়াটে ছিটকে চলে গিয়েছিলো—শহরের সম্পূর্ণ দুই প্রান্তে।

অশোকের খবর আর রাখি না।

অলকাকে জানি। ওর বাবা উঠে এসেছিলেন খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি একটা ছোট্ট বাড়ীতে। সেখানে এসে কপাল খুলে গেলো ভদ্রলোকের।...জলের দরে নাকি কিনে ফেললেন এক জলে-ডোবা জাহাজ। শেষ পর্যন্ত জলেই জল বাধলো।

বাড়ী করলেন, গাড়ী করলেন, মেয়ের ঘটা করে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের রাত্রে 'ওরা'এলো দমদম থেকে নেমন্তন্ন খেতে। শুধু অশোকের আসা হলো না! তার তখন নাকি সামনে বি.এ. একজামিন। 'নেমন্তন্ন খাওয়ার' মতো বাজে কাজে সময় নষ্ট করবার সময় কোথায়? চব্বিশ ঘন্টাই তো পড়ছে—ঘরে খিল দিয়ে।

'বিয়ের দিন নিশ্চয়ই অশোকদার সঙ্গে দেখা হবে—' এমনি একটা সহজ আশার আলোয় মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ছিলো অলকার—বিয়ের দিন পর্যন্ত।

"অশোকদার সঙ্গে দেখা হ'লো না"—এই নৈরাশ্যেব মেঘ নিয়ে দাম্পত্য জীবনের শুরু।

সুন্দর স্বভাব স্বামী।

স্নেহে প্রেমে ক্ষমায় মহান, হাসি-খুশি চঞ্চল। সদ্যোন্মেষিত কিশোরী-হৃদয় দ্বিধাগ্রস্ত হবার অবকাশই পেলোনা। সুখে সৌভাগ্যে আলোকিত হয়ে উঠলো সে জীবন।...শুধু নীল আকাশের কোণে একখণ্ড হালকা মেঘের মতো লেগে রইলো ওই নৈরাশ্যের মেঘটুকু।

বছরের পর বছর কাটে।...

কৈশোর ভরে ওঠে যৌবনের উজ্জ্বলতায, যৌবন শান্ত হয়ে আসে অনিবার্য্য পরিণতির গাম্ভীর্য্যে।...আজকের চল্লিশ বছবের বিজ্ঞ অলকার মধ্যে চোদ্দবছরের সেই বুদ্ধিহীন মেয়েটাকে আবিষ্কার করতে যাওয়া পাগলামী। ওর নামটা যে 'অলকা' অ কথাও আর সহজে মনে পড়েনা। ওর নিজেরও নয়। নামের দরকারই বা কবে পড়েছে?

তবু রয়ে গেছে একটা হাস্যকর পাগলামী। দীর্ঘকালের অর্থহীন অভ্যাস। সময়ে অসময়ে অকারণে একবার মনে করা—"আর কখনো দেখা হ'লো না।"

কিন্তু এও এক অদ্ভুত!

ভাবলে কি যে আশ্চর্য্য লাগে অলকার! এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দৈবাৎ কখনো কোনোদিনও কি দেখা হয়ে যেতে নেই? ভাষাজগতে ত'হলে 'অপ্রত্যাশিত' 'আকস্মিক' 'সহসা' এসব শব্দগুলো আছে কেন? 'সহসা দেখা হয়েও কি যায় না কারুর সঙ্গে?'

আর এক দিন

বহুদিনের অদেখা, পরিচিত, স্বল্প পরিচিত, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কতো লোকের সঙ্গেই তো দেখা হয়ে যায় যখন তখন—পথে ঘাটে ট্রামে বাসে, সিনেমায় বারোয়ারীতলায়, দোকানে, স্টেশনে দেশে বিদেশে।

শুধু সেই লোকটাই এতো দুর্লভ? কোথাও তার ছায়ামাত্র চোখে পড়লো না এই ছাব্বিশটি বছরের মধ্যে? আর সব থেকে আরো অদ্ভুত যে, একই শহরে বাস করে আসছে দু'জনে। হয়তো ঠিকানা জোগাড় করাও খুব শক্ত নয়। ঠিকানা জোগাড় করে যে কোনোদিন আচম্‌কা গিয়ে পড়া যায় অশোকেব বাড়ী। বলা যায়—'কি গো অশোকদা, একেবারে যে ভুলেই গেলে?'

ক্ষতি কি?

"সত্যিই তো ক্ষতি কি? গেলেই হয়? অশোকের বৌ তোমাকে ধরে মারবেনা নিশ্চয়?"

এ অভিমতটা অলকার স্বামী দেবেশের। অলকার 'অশোকঘটিত' হৃদয় দৌর্বল্যের খবর তার অজানা নয়। কম বয়সে একদা অতিবিশ্বস্ততার ছেলেমানুষী মোহে, স্বামীর কাছে গল্প করেছিলো।

অলকা 'প্রথম প্রেমের' রঙিন কাহিনী।...'আক্ষেপ করেছিলো আশ্চর্য্যি আর কক্‌খনো দেখা হলো না'! এখনো মাঝে মাঝে কথা উঠলেই বলে—'যাই বলো বাপু, আর একবার দেখা হওয়ার ইচ্ছে আমার এখনো খুব আছে।'

তা কথাটা ওঠেই যখন তখন।

কৌতুকপ্রিয় দেবেশ ইচ্ছে করে ওঠায়, অলকাকে রাগাতে। 'অশোকদা' নামটা দেবেশের কাছে যেন প্রচলিত প্রবাদ। বারবার চলে আসছে। কখনো জানলায় কি বারান্দায় একটু বেশীক্ষণ যদি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো অলকাকে, অমনি বলবে—'কি গো, রাস্তায় অশোকদা না কি?' 'বাতায়ন পানে দু'আঁখি তুলিয়া'?

অলকা রাগ দেখিয়ে উত্তর দেয—হ্যাঁ তাই তো। রোজ এই সময় সে এসে ঠায় রদ্দুরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে যে! তাই বিগলিত করুণায় একবার করে দর্শন দিই।

পথে-ঘাটে বাসে-ট্রামে যেখানে সেখানে অলকাকে ক্ষ্যাপানো এক মজা দেবেশেব। কথায় অবিশ্যি এঁটে উঠতে পাবে না অলকাকে, তবু বলতে ছাড়ে না। ওদের এই স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অশোকেরও একটা স্থান আছে। বিশিষ্টও নয়, অপরিহার্যও নয়, তবু আছে—ভাতেব সঙ্গে থালাব আগায নুনের মতো, পানের সঙ্গে ডিবের কানায় চুণের মতো। আছে শুধু আলাপ-আলোচনার স্বাদে আব একটু আস্বাদ দিতে। যতোটুকু প্রয়োজন তা'র বেশী খানিকটা ব্যবহার করে ফেলবার মতো স্পষ্টভাবে নেই।

হয়তো ট্রামে চেপে যাচ্ছে অলকা আলিপুরে ননদের বাড়ী বেড়াতে। হয়তো ওদিকে গাড়ীর ভীড় একটু পাতলা হয়ে গেছে, দেবেশ হঠাৎ নিম্নস্বরে বলে বসে—দেখো দেখো, ও পাশের ওই ভদ্রলোকটি তোমাব 'অশোকদা' নয় তো? সেই থেকে দেখছি 'হাঁ' করে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে।

অলকা চমকে তাকায়। বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে একটা আশার ঢেউ।...তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে—কথাবার্ত্তায় একটু সভ্য হতে শেখ দিকি।

—বেশ! মজা মন্দ নয়। আমি হলাম অ-সভ্য। আর ওই ব্যক্তিটি যে সেই ইস্তক তোমার মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পাচ্ছেনা, তার কি? আমি ভাবলাম—হয়তো বা তোমার "সে"! তা'নইলে কেন এমন করে চেয়ে থাকবে?

অলকা হাসিচাপা মুখ গম্ভীর কবে বলে—আমি পথে বেরোলে 'হাঁ' করে চেয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না যে লোকের! সভ্যতা বজায় রাখে কি করে? তা' বলে আমার 'সে' অমন নয়।

—এতোদিনে যে 'সে' কি হয়ে উঠেছে জানো তুমি?

—থামো তুমি, মেলা বক্‌বক্ কোরোনা। লোকটা তাকাচ্ছে।

বারোয়ারীতলায় কি কোনো কিছুব মেলায়, হয়তো ভীড়ের ঠ্যালায় একটু চোখ ছাড়া হয়ে গেছে অলকা। দেবেশ এগিয়ে গেছে সামনে, নয়তো পড়ে আছে পিছনে, দু'জনেই খুঁজছে দু'জনকে। দেখা হতেই দেবেশ স্বচ্ছন্দে বলে বসলো—উঃ! রক্ষে পাই! ভাবলাম হয়তো বা মেলাব ভীড়ে হঠাৎ "হাবানো প্রথম প্রেম"কে খুঁজে পেয়ে আমাকে ভুলে সট্‌কালে তাব সঙ্গে।

অলকা উত্তর দেয়—চমৎকার! কল্পনাশক্তি কী প্রখর! আমার প্রথম প্রেমকে আমি যদি বা ভুলে নিশ্চিন্দি থাকি, তুমি আর ভুলতে পারলে না দেখছি।

—কি করে পাববো!...দেবেশ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—মনের মধ্যে যে, কাঁটা বিঁধেই আছে।

বিঁধে নেই বলেই হয়তো বলতে পারে। থাকলে পারতো কি?

নিজের থেকে বছর আষ্টেকের ছোটো, চিরদিন অনুপস্থিত একটা ছেলেকে, নিজেব প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে এমন পাগল দেবেশ নয়। পাগল অলকাও নয়। তবু, সত্যিই কি অলকা মেলার ভীড়ের হাজারখানা মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখে না?...পথ চলতে—থমকে দাঁড়ায়না? সিনেমায থিয়েটারে গিয়ে ফেরার সময়—"রোসো বাবু, ভীড় কমুক" বলে দাঁড়িয়ে থাকে না সিঁড়ির একধারে, শেষ দর্শকটি চলে যাওযা পর্যন্ত?...

দেবেশ অনুযোগ কবলে বলে—'হোকগে, দু'চার মিনিটে কি রাজ্য বয়ে যাবে! ঠেলাঠেলি দেখতে পাবিনে।'

এ একটা নেশা।

বোধকরি অভ্যাসের নেশা! তা' ছাড়া' আর কি? ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজাব মতো!

হয়তো সংসারের সহস্র বন্ধনের পাকে পড়ে গেলে এ নেশা কবে ছুটে যেতো, কিন্তু সে অবসর হ'লো কই? নিঃসন্তান জীবন। জীবনের চেহারা আর বদলাতে পেলো না, বরাবর একই রকম থেকে গেলো।

নিঃসন্তান দম্পতি, সর্বত্রই প্রায় এক সঙ্গে ঘোরা ফেরা! দেবেশের মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে সকালের গাড়ীতে চলেছে দুজনে চন্দননগর। সেকেণ্ড ক্লাস একখানি

কামরায় উঠে গুছিয়ে বসে দেবেশ প্রথম কথা কয়—হ্যাঁ গো, ওদের বিয়েতে দেবার শাড়ীখানা ভুলে ফেলে আসোনি তো?

—এসেছি।

—কী সর্বনাশ! তা'হলে উপায়?

—উপায়ের অভাব কি? চন্দননগর তাঁতের শাড়ীর জন্যে বিখ্যাত।

—তার মানে, গিয়ে আবার একটা কিনতে হবে?

—ভুলে ফেলে এলে অবিশ্যি হতো!...কিন্তু থামো তো তুমি!...খবরের কাগজখানা সঙ্গে নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিলে? তা' নাওনি! জানতাম আগেই। যতো ভুল সব আমিই করি যে।

নবদম্পতি নয় যে কেউ ওদের কথোপকথনে কর্ণপাত করবে, সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে কেউ কৌতুহলী দৃষ্টি ফেলবে। তাকিয়ে দেখেও না কেউ।

শুধু, বোধ করি 'খবরের কাগজ' কথাটা উচ্চারিত হ'তেই একেবারে কোণের দিকে যে ভদ্রলোক একখানা খোলা খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসেছিলেন, তিনি কাগজখানা আর একটু বাগিয়ে ধরে নড়েচড়ে কিছু গুছিয়ে বসেন।

বোধ হয় মনে মনে আশঙ্কিত হন, 'এইরে বাবা, চাইবে না তো!' মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাই মুখের ভাব বোঝা যায় না। কাগজের ওপব জেগে আছে শুধু ভুরুর ওপর থেকে তেল চকচকে টাকওলা মাথাটি।

কর্ত্তা গিন্নীতে নীচুগলায় সাবধানে কথা চলে।

—লোকটাকে যেন কোথায় 'দেখেছি দেখেছি'!

—'লোকটার' আর কতোটুকু দেখতে পাচ্ছো? মুখচন্দ্র তো কাগজেব আড়ালে।

—তা'হলেও, হাত পা কপাল ভুরু সবটা মিলিয়ে কেমন যেন 'চেনা চেনা' লাগছে!

—দেখো, আবার তোমার অশোকদা কি না!

চিরাচরিত ধরণে মিটিমিটি হাসে দেবেশ।

অলকাও নীচুগলায় হেসে ওঠে—সত্যি, যা বলেছো! ওই টেকো বুড়োটা নইলে আর অশোকদা কে হবে! দেখাতে তো আর পারলাম না কখনো। কপাল আমাব! কী ফাইন্ চুল তা'ব জানো? বেশম হার মানে। প্রেমে পড়েছিলাম কি আব অমনি?

—আহা সেই কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম এখনো টিকে থাকবে তা'ব মানে কি?

—নাঃ একেবাবে গড়েব মাঠ হয়ে যাবে! তুমি হিংসেব জ্বালায তাই চাও আব কি।

একটু চুপচাপ।

ছটফটে দেবেশ আবার কথা কয়ে ওঠে—আচ্ছা, কাগজখানা চেয়ে দেখবো একবাব?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আচমকা এ কথায় চমকে ওঠে অলকা। কে জানে এতোটাই বা চমকায় কেন? প্রায় বিবক্তভাবে বলে—কেন, কি এতো রাজকার্য্য পড়েছে কাগজে?

—আহা বুঝছোনা, কাগজ সবালে মুখটা পবিষ্কাব দেখা যেতো!

আসল কথা চুপ করে থাকতে একদণ্ডও পারেনা দেবেশ। অলকার নিস্তব্ধতাও

ওর অসহনীয়। গল্প করবার মতো কিছু যখন মিলছে না হাতের কাছে, পুরনো ঠাট্টাই চলুক।

অলকা রেগে বলে—যাবে তার কি? কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে তোমার ওর মুখ দেখে?

দেবেশ কৃত্রিম করুণ মুখে বলে—আমার আর কি! তোমারই যদি কিছু লাভ হয়। বলছিলে কিনা—ওকে 'চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি'—ভাবলাম—

—খবরদার বলছি, ওই বিদঘুটে কথাগুলো বলবেনা আর। যখন তখন যেখানে সেখানে বললেই হ'লো ওই আজেবাজে কথা। এতো হাড় জ্বালাতেও পারো!

অবশ্য সব কথাই অপরের কান বাঁচিয়ে।

সংবাদপত্র-পাঠক ভদ্রলোক তখন কাগজখানা উল্টে ছোটকরে ভাঁজ করে নিয়ে পড়তে শুরু করছেন। অবনত মুখের সবটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে।

অলকা একনজর দেখে নিয়ে মুখটা অন্য দিকে ফেরায়। একখুনি দেবেশ হাসাহাসি সুরু করবে। সত্যিই যে একটু ভালো করে দেখে নিয়ে মনে পড়াবে কোথায় দেখেছে লোকটাকে, সে আর দেবেশের জ্বালায় হবার জো নেই। অথচ দেখেছে যে কোথাও তাতে সন্দেহ নেই!

কিন্তু কবে? কখন? কোথায়?

কোথায় দেখেছে, এরকম গোলগাল নেওয়া-পাতি নেওয়া-পাতি গড়ন, এমন চুকচুকে টাক?...কই? অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারে না।

তবু মনে খটকা থেকে যায়। ভুরুর ওপর দিকে, ফর্সা কপালে কালো কুচকুচে ওই তিলটা? কেমন যেন পরিচিত নয়? ওরকম আর কার দেখেছে কবে?

দেবেশের আবার উস্‌খুস সুরু হয়।

—পানের কৌটোটা এসেছে তো?

—নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখো।

—জর্দ্দাটা?

—জানিনা। নিজের জিনিস নিজে ঠিক করে আনতে পারো না?

—উঃ একেবারে যেন মিলিটারী! হ'লো কি?...দেখো—তুমি আমার কথা শুনলে না, ওই ভদ্রলোকের সুটকেসে কিন্তু লেখা রয়েছে—'এ মুখার্জ্জি।'

মুখার্জ্জি।

অলকা একবার সামান্যতম চমকায়।...তারপর গম্ভীরভাবে আউড়ে যায়—অজিত, অমল, অবনী, অসিত, অপূর্ব্ব, অনিমেষ, 'অখদ্যে', 'অগা'!

অর্থাৎ কি না এতোগুলো নামের মধ্যে যে কোনো একটা নামের অধিকারী যে কোনো মুখুয্যে পরিবারে জন্মালেই সুটকেসে 'এ মুখার্জ্জি' লিখে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারে।

গাড়ী শ্রীরামপুরের কাছ বরাবর আসতেই বহু-আলোচিত ভদ্রলোকটি কাগজখানি পাট করে নিয়ে উঠে দাঁড়ান। সুটকেসটি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডানহাতে পাটকরা কাগজখানা দেবেশের দিকে বাড়িয়ে ধবে সম্পূর্ণ দেবেশের দিকে তাকিয়েই স্মিতহাস্যে

আবেদন করেন—পড়বেন?

ভদ্রতার বদলে ভদ্রতা। দেবেশও স্মিতহাস্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে—দরকার হবে না, এই তো নেবে যাবো এখুনি।

চওড়া ডাঁটিওলা কালো সেলের চশমা পরা ভারী-সারি পুরন্তমুখে অমায়িক হাসিটি বেশ মানানসই। দেখলে আবার যেন দেখতে ইচ্ছে করে।

অমায়িক হাসি আবার প্রশ্ন করেন, যাচ্ছেন কোথায়?

—চন্দননগরে। মামার বাড়ী।

—মামার বাড়ী! ভালো জায়গায় যাচ্ছেন তা'হলে?

সহসা অন্ধকার যবনিকার গায়ে আছড়ে এসে পড়লো হঠাৎ জান্‌লা খুলে দেওয়া আলোর ঝলক।...বিস্মৃতির পর্দায় স্মৃতির বিদ্যুৎ রেখা।

না, সন্দেহের অবকাশ নেই।

অশোকই।

ডান ভুরুর ওপর কালো কুচকুচে তিলটি এখনো তেমনি নির্ভুল। স্পষ্ট!

একটি তিল কি তুচ্ছ? পুরনো মুখকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এই তিলটাকে অনবরত দেখতে পাচ্ছিলো, তবু অশোককে চিনতে পারেনি অলকা।...এতোক্ষণ সামনাসামনি বসে থেকে পারেনি, পারেনি পরিষ্কার মুখোমুখি তাকিয়ে।

অশোক পেরেছে।

কিন্তু জগতে কার কি ক্ষতি হ'তো যদি অশোক অলকাকে চিনতে না পারতো। অলকার সঙ্গে নিতান্ত স্থূল এই রসিকতাটুকু না করলেই বা তার ভাগ্যবিধাতার কি এমন এসে যেতো?...অশোককে দিয়ে এই কথাটুকু না বলালে কি চলছিলো না তাঁর—

—কে, অলকা না কি?

—'অশোকদা'! মৃদু অস্ফুট উত্তর।

রেলগাড়ির অসুবিধা সত্ত্বেও নীচু হয়ে নমস্কার করে অলকা।

'অশোকদা'!

দেবেশ চোখ বড়ো করে বলে—অ্যাঁ। সত্যিই তা'হলে সেই বিখ্যাত অশোকদা?

—বিখ্যাত না কি? কি ব্যাপার!

—বিলক্ষণ! আপনাকে নিয়ে তো আমাদের—ছি ছি অলকা, শেষ পর্যন্ত তুমিই হেরে গেলে!...বুঝলেন মশাই, আপনার বাল্যবান্ধবী এতোক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন 'অশোকদার কক্‌খনো অতো টাক হতে পারে না', আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো—

—তাই নাকি?...হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক—আপনি তো আমাকে দেখেনই নি? দেবেশ অভ্যস্ত রসিকতার ভঙ্গিতে বলতে যাচ্ছিলো—'দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,' কিন্তু বলা হ'লো না গাড়ির বাঁশী বেজে উঠলো।

ট্রেন শ্রীরামপুর স্টেশনে 'ইন্‌' করেছে।

মাত্র এক মিনিটের স্টপেজ। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক নড়ে ওঠেন।

তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করে বলেন—নমস্কার! এসে গেলো আমার গন্তব্যস্থল।...আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম...অলকা, চললাম তা'হলে? অনেক দিন পরে দেখা হ'লো, কি বলো?...

নেমে গেলেন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি করে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে সুরু করলো।...আর সেই চলার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো একটি মধুর বেদনার সঙ্গীত। থেমে গেলো একটি সুর।

অভিনয়ের পিছনে আবহসঙ্গীতের মতো, অলকার জীবনের নেপথ্যে ঝঙ্কৃত যে অনাহত মৃদু সুরটি তা'র সমগ্র জীবনকে গেঁথে রেখেছিলো একটি সুষমার ছন্দে, চিরদিনের মতো থেমে গেলো সে সুর, ভেঙে গেলো সে ছন্দ।

না, সে সুর আর বাজবে না, সে ছন্দ আর ফিরে আসবে না।..."আর একবার দেখা হ'লো না" বলে নিঃশ্বাস ফেলবার মধুর সুখটুকু গেলো ফুরিয়ে—"হয়তো আবার আর একদিন দেখা হবে" এই আবেশময় আশাটুকুর হ'লো সমাধি।

হায়! কী প্রয়োজন ছিলো আর একবার দেখা হ'বার! কী ক্ষতি ছিলো আর একদিন দেখা না হ'লে?

তবু—মনের ভিতরটা কেউ কারুর দেখতে পায় না এই রক্ষা। বিধাতা পুরুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, সমস্ত অসৌজন্য ক্ষমা করে আসছে মানুষ বোধ করি শুধু এই এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়। মনের ভিতরের খবরটা মানুষের নিজের হাতের মুঠোয়।

তাই হাত বাড়িয়ে দেবেশের ওপাশ থেকে পানের কৌটোটা তুলে নিয়ে একটা পান বার করতে করতে অলকা বলে—এই ভুঁড়ি ওই টাক! ছি ছি! চিনতে পারিনি বলে খুব তো লজ্জা দিলে, চেনবার কোনো উপায় রেখেছে?

—তা কি জানি—দেবেশ হাসে—আমি তো আর আগে দেখিনি।...ও কি পানটা ছিঁড়ছো যে ছেলেমানুষের মতো? খাবে না?

—নাঃ! শুকিয়ে গেছে।

তা' গেছে বৈকি—নেহাৎই শুকিয়ে গেছে। নইলে তুচ্ছ একটু কাজের ক্ষতি করে কিছুক্ষণের জন্যও কি সহযাত্রী হওয়া যেতো না? যাওয়া যেতো না অলকার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত?

জরুরী কাজ?

কাজ কতো জরুরী হওয়া সম্ভব?

নিশীথে সুকুমার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় পঁচিশ বছর আগে সুকুমার হাফপ্যান্ট পরত। এখন সে সরু পাজামার ওপর কলিদার পাঞ্জাবি পরে ড্রেসিং টেবিলেব সামনে দাঁড়িয়ে। রাত বারোটা। বউ পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

এই ড্রেসিং টেবিলটি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মেয়ের। তারা সম্প্রতি শাড়ি ধরেছে। পিঠোপিঠি ওরা। আয়না সমেত ওটি কিনতে সুকুমারের একশো কুড়ি টাকা লেগেছে। দক্ষিণের এক চাকুরে বাসা তুলে দিয়ে ত্রিবান্দ্রমে বদলি হওয়ার সময় যা-ইচ্ছে দামে নানান জিনিস ঝেড়ে দিয়ে যায়। তখন সুকুমারের বউ বেলা গিয়ে কিনে আনে।

আয়নার পাশেই মেয়েদের খাট। দুজনেই মশারিব ভেতর ঘুমোচ্ছে। ছোটোটি শাড়ি খুলে এখন ইজেরে আছে। ওপরে ব্লাউজ। বড়টির কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয়া অভ্যেস। তাই তার মুখ দেখতে পেল না সুকুমার। তখন আয়নায় নিজের মুখে তাকাল। এই মুখখানি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব প্রিয়। বহুদিন ধরে দেখে আসছে। এখন ওই মুখের দু'পাশে দু'খানি স্থায়ী পাউরুটি। মাত্র দশ বছর আগে ভাগ্যিস ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়ানো বন্ধ করেছিল। তখন থেকে সিঁথি কেটে আঁচড়ানোর ফলে এখনো তার সমবয়সীদের মত মাথার চুল অতটা পিছিয়ে যায়নি। সব মিলিয়ে একটা নির্বোধ তৃপ্তভাবে গোল মুখখান সব সময় ভাসছে। এই জিনিসটি সুকুমারের সাইন বোর্ড।

পাঞ্জাবির ওপর শরীরের বিষুবরেখার জায়গাটি যে কিছু উঁচু আয়নাতেও তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। ওখানে তার পেট এখন আস্ত একটি তরমুজ। বেড়েই চলেছে। দম বন্ধ করে পেট কমিয়ে নিয়ে আয়নার সামনে ভাল করে দাঁড়িয়ে সে পরিষ্কার বুঝলো—এরকম যখন ছিলাম—তখন যুবক ছিলাম।

পা টিপেটিপে সুকুমার নিজের ঘরে ঢুকলো। ইদানিং বাইরে খাওয়া-দাওয়া করলেই তার অম্বল হয়ে যায়। তাই শাদা কাপে ঝাঁঝালো যোয়ানের আরক জল মিশিয়ে খেয়ে নিল। তারপর কয়েক সেকেন্ডের ভেতর মশারির ভেতরে চলে গেল।

বউকে হাতড়ালো। বউ বলল, উঁহু। আঃ! বলে তারপর তার সেই ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শুলো যাতে কিনা সুকুমারের শরীর আরও খারাপ হয়।

সম্মান বলে একটা কথা আছে। বিয়ের সতের বছর পরে এই পাশ ফিরে শোয়াটা তার বড় অপমান লাগল। সে খানিকক্ষণ চিৎ হয়ে থাকল। তারপর মাথার নিচের জোড়া বালিশ থেকে একটি কমিয়ে পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। উঁচু বালিশে শুয়ে শুয়ে একটা অসুখ তাকে ধরে ফেলেছে। আর কিছুদিন পরেই গলায় বগলস লাগিয়ে ঘুরতে হবে। এখনো সাবধান হওয়ার সময় আছে। তার ঘার কাৎ হয়ে যাচ্ছে। গর্দানে অনেক মাংস হয়ে গলাটি হারিয়ে গেছে। এখন তার ধড়ের ওপর মাথাটি স্রেফ কাটামুণ্ডর মতন জুড়ে দেওয়া বলে মনে হয়।

খালি গায়ে পাজামা পরে পাশের ঘরে গেল। আবার সুইচ টিপে আলো করে নিল ঘরখানা। মশারি তুলে ঘুমন্ত ছোট মেয়ের গালে একটা চুমু দিল। মুশকিল বাধালো বড় মেয়ে। কাঁথা টেনে মুখ খুঁজতে যেতেই ঝাঁঝিয়ে উঠল, রোজ খেয়েদেয়ে রাত করে ফিরবে। ঘুমোও না গিয়ে—

চুমু দেবার জন্য সুকুমারের মুখ নিচু হয়ে এসেছিল। মুখ জায়গামত তুলেনিয়ে বলল, কেন? গন্ধ পেলি?

এখন জ্বালিয়ো না যাও। বলে মেয়ে পাশ ফিরে শুলো। আবার কাঁথা দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সেই চুমুটা বউয়ের গালে দিল। অঘোরে ঘুমুচ্ছিল বলে কিছুই টের পেল না। আবার ভাল করে দেখল সুকুমার। ভগবান যে কি করে মেয়েলোক বানায়। একটু বেঁকে শুলেই অন্যরকম। তখনই পাওয়ার ইচ্ছে হয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করল। এভাবে অপমান সহ্য করে বউয়ের ঘুম ভাঙিয়ে আদর করতে তখন রাজি ছিল না সুকুমার। বিয়ের পর এত বছর হয়ে গেল—কই? কোনদিন তো বেলা তাকে নিজে থেকে দু হাতে গলা জড়িয়ে একটা চুমু দেয়নি। একবারও ওগো বলে ডাকেনি। এত সংযত কেন? এরই নাম কি অহংকার? না, ফ্রিজিড?

দু-একবার জিজ্ঞাসাও করেছে সুকুমার। তুমি এ-রকম কেন?

কি রকম?

একদিনও তো নিজে থেকে একটা চুমু খেলে না আমায়!

ওগো হ্যাঁগো ওসব বাড়াবাড়ি আমার একদম আসে না।

সুকুমার নিজেকে প্রশ্ন করল একটা। তোমার কি এসবের আর বয়স আছে?

আলবৎ আছে।

না। নেই।

কেন নেই?

কারণ, তুমি বুড়িয়ে গেছ। তুমি জোরে হাসতে পারো না। হাসলে ঠিকই আওয়াজ হয়। আর হা করে হাসলে খুনীর মত লাগে।

কিন্তু আমি তো একটা পোকাকেও কোনদিন ব্যথা দিইনি। সিলিং থেকে টিকটিকি নিচে পড়লে আলগোছে তুলে দিই।

তবু তোমাকে খুনীর মত দেখায় হাসলে।

আমি তো বেশিরভাগ সময় গম্ভীর থাকি।

তখন তোমাকে গরুর মত নির্বোধ লাগে।

কোনো ব্যক্তিত্বই ফুটে ওঠে না? মানে যাকে বলে পার্সোনালিটি। চার্ম?

একদম না। গম্ভীর অন্যমনস্ক অবস্থায় তোমাকে আরও খারাপ লাগে। মনে হয় কোন মতলব ভেজে চলেছো।

তা সত্যি। আমার লাকটাই এরকম। বেশিরভাগ লোক আমাকে ডিসলাইক করে। অথচ দেখি দু' একজনকে—তাদের কোন চেষ্টা ছাড়াই বেশিরভাগ লোক তাদের খুব লাইক করে।

তবে।

নিজের সঙ্গে এরকম কথোপকথনের পর সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—হাইট পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, উমর তিতাল্লিশ, ছাতি একচল্লিশ—আলমারির আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে পাজামা ছেড়ে ফেলল। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কোথাও মনে হল না শ্যাওলা পড়েছে। বাঁ উরু এবং গাল বেশ গরম। এসবের ভেতর দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল। চর্বি থাক থাক জমে ছিল। প্রায়ই পান করা সত্ত্বেও ব্লাড ক্লোরেস্টাল খুব নর্মাল।

প্রতিবেশীদের দোতলার জানালাগুলি খোলা। অন্ধকার। সুকুমার একতলা ফ্ল্যাটের টানা খোলা লাল বারান্দার আলো জ্বালিয়ে নিল। নিশুতি রাতে পরিত্যক্ত বিয়ে বাড়ির চেহারা। সেখানে নিজের মনোমত স্টাইলে সুকুমার নিজের আবিষ্কৃত মুদ্রায় নাচতে শুরু করে দিল।

ফাঁকা বারান্দায় আলোর নিচে নিজের নাম সুকুমারের খুব ভাল লাগতে লাগল।এক একটা পাক দিয়ে কোমরের ওপরের দিকটা ঘুরিয়ে নিয়েই মনে হয়—আমি পারি। ঠিক উদয়শংকরের মত। চিবুকের নিচে বা হাতের পাতা পাত্রের মত ধরে' মাথাটি নাড়াল। একেবারে একদম কথক ভঙ্গী। নিজেকেই সুকুমার বলল, কী গ্রেস!

এমন সময় সুকুমারের মনে হল উল্টোদিকে দোতলার ঝুলবারান্দায় আলোর একটা লালফলক রেলিংয়ের বাইরে ঝুলছে। অর্থাৎ বেশি রাতে বাড়ি ফিরে গণেশ ডাক্তার সিগারেট টানচে। ঘুম আসছে না।

সুকুমার তার নাচের স্পীড বাড়িয়ে দিল। নিজেরমুদ্রায় সুকুমার যখন বিভোর—তখন ঝুলবারান্দা থেকে প্রশংসার তিনটি হাততালি পর পর ভেসে এল। অন্ধকার অডিটরিয়ামে দর্শক একমাত্র গণেশ। শর্টে গেণু ডাক্তার। তবু সুকুমার যেন বিরাট হলঘরের বিশাল দর্শকপুঞ্জকে কৃতার্থ করে দিচ্ছে—নাচ থামিয়ে সেই ভাবে নুয়ে পড়ে বাও করল।

কতটা হয়েছে আজকে? গেণুর একদম মাজা গলা। বাড়ি গিয়ে দেখালে আট টাকা ভিজিট। চেম্বারে ষোল। ভিড় লেগেই থাকে। নিজের গাড়িতে পাখা এবং চিক লাগিয়েছে। ফ্রিজে ছানা রেখে খায়। চোখদেখাতে গিয়ে সুকুমার একদিন খেয়েছিল। তার আজকাল খালিচোখে ক ব য খ—সব সমান লাগে। পড়তে গিয়ে মনে হয় প্রতিটি হরফের গা থেকে ছাল উঠে গেছে।

তোমার কতটা?

আজকাল বেশি পারি না। দু'টো বড়—একটা ছোট। তাই মাথা ভার লাগে।

একটু নেচে নাও না। হাল্কা হয়ে যাবে।

নাচার মত অতটা খাইনি। তুমি তো বেশ নাচো।

খারাপ নাচবো কেন? নাচ আমাদের ধর্ম এখন।

কলকাতার বাড়িগুলো পাশাপাশি। গেণু ডাক্তারের ঝুলবারান্দা থেকে ফিতে ফেলে মাপলে সুকুমারের লাল বারান্দা দশ ফুটের ভেতর। নাচ আমাদের ধর্ম এখন—বলেই সুকুমার আবার নাচতে শুরু করে দিয়েছে। নিওনের আলো পড়ে তার উরু দু'খানি তরুণ শালতরুর মাংস মাখানো কাণ্ড হয়ে অন্ধকারে আলোয় একবার ঝলকাচ্ছিল,

একবার হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই সদ্য সদ্য নিজের আবিষ্কৃত সব মুদ্রার দুঃসাহসিক শরীর ঘোরানো পা মেলে দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে সুকুমার আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। আমি যে এত সুন্দর নাচি কোনদিন জানতাম না তো।

একথা ভেবেই একটা বিশ্বাস আসছিল মনে। সেই জোরেই বলল—অনেক আগেই আমাদের নাচা উচিত ছিল।

আর নেচো না। গা ব্যথা করবে। অভ্যেস নেইতো।

তা কেন। তোমার মত অল্পেই গলে যাই না আমরা। চেমবারে এয়ারকুলার বসিয়েছো।

সে তো তোমাদের মত পেশেন্টদের জন্যে।

সারা দিনে ভিজিট কত পাও?

গুনে দেখিনি।

না গুনেই ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছো।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ঘরে গিয়ে একটা লুঙ্গি পাজামা যা হয় পরে ফেল।

তাতো বলবেই নাড়ী টিপে এখন অঢেল পয়সা।

পরিশ্রম করে পাই।

কচু পরিশ্রম। ডাক্তারী শাস্ত্রটাই আন্দাজী।

মাঝ রাতে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আর তর্কে যাব না সুকুমার। কলম পিষে কী এমন হাতি ঘোড়া করছ শুনি?

একথায় সুকুমার তেবিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আমার মাইনে কত জান?

কত?

মাসে ন হাজার টাকার মত।

কি রকম!

আমার ওপরওয়ালা যিনি কাজ দেন তার দিনে মাইনে সত্তর টাকার মত। আমি সে-কাজটা করি। আমাব দিন মাইনে পঞ্চাশ টাকার মত। সে-কাজটা যিনি চেক করেন—তার দিন মাইনে তিরিশ টাকা। এসব কাজ যিনি অবহেলায় ফেলে দিয়ে সন্ধ্যায় ক্লাবে যান তার দিন মাইনে দেড়শো টাকার মত। সব মিলিয়ে তিনশো টাকার মত আমার কাজের জন্যে খরচ হয়। তার মানে মাসে ন' হাজার টাকার মত খরচ। তারপর সে সব কাজ ফেলে দেওয়া হয়।

বেশ আছো!

কোথায় ভাই! এর চেয়ে যখন আমরা দু'জনে স্কুলে পড়তাম—তখন সব কাজের একটা মানে ছিল। তাতে যত অল্প পয়সাই লাগুক। এখন কত খরচ হয়। অথচ কোন কাজের কোন মানে হয় না। যত বছর যাচ্ছে—তত মাইনে বাড়ছে। অথচ কোন কাজ নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, পূর্ব ভারত, ব্রজেন শীল নিয়ে কী সুন্দর আলোচনা করে যাচ্ছি। বলতে বলতে সুকুমার আবার নাচতে শুরু করে দিল।

ভেতরে শুতে যাবার আগে গণেশ ডাক্তার চেঁচিয়ে বলে গেল, আলোটা নিভিয়ে নাচো। এখন বয়স হয়েছে তোমার। কে কোনদিক থেকে দেখে ফেলবে।

নিশীথে সুকুমার

সুকুমার আলোটা নিভিয়ে দিল। সে-জায়গায় রাত করে পাঠানো চাঁদের আলো এসে সুকুমারের সঙ্গে নাচে জয়েন করলো। একটু তামা মাখানো আলো। তাই ময়লা মতো। তার ভেতরে সুকুমারের ভালই লাগছিল নাচতে।

অফিস। সংসারের প্রয়োজনের গর্তগুলোয় নানারকমের নোট জোগাড় করে এনে গুঁজে দেওয়া ইত্যাদি করার পর সে আর কোনদিন নিজেকে এমন করে পায়নি। পাওয়ার মধ্যে নাচের মত ঘাম ঝরানো একটা ব্যাপার থাকায় সুকুমার রীতিমত সুকুমারকে টাচ করতে পারছিল।

এই সময় বেলা বারান্দায় উঠে এসে নাচিয়ে সুকুমারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু কুঁচকে গেল। কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে কলঘরে চলে গেল। ফি রাতে মোট তিনবার যায়। বড় পাতলা ঘুম হয়ে গেছে ইদানীং। ফিরে এসে বলল, কি হচ্ছে শুনি? এসব কি! এভাবে একটা ধাড়ি লোক—

আমার কেউ নেই বেলা—তাই—একা একা দেখছিলাম।

কি করে কেউ থাকবে শুনি। রোজ যদি খাওয়াদাওয়া করে ফেব।' না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। খাও কেন বলতো?

খাবার পর ঠোঁটের নিচে বাঁদিকে একটু কাঁপতে থাকে। ঝিমুনি একদম থাকে না। তখন সিগারেট টেনে কত সুখ? খিদে বেড়ে যায়—

তবে খাও না কেন বাড়ি এসে?

আগেই অনেক কিছু খেয়ে ফেলি তো। তাছাড়া—

কি?

একা একা কোন্ শালা ভাত খায় বল। লাইট জ্বালিয়ে—

তোমার এখন থেকে একাই কাটবে। যাও। দেখতে ভাল লাগছে না। আমি কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকব বলতে পার?

তখনই সুকুমার আবার নাচ শুরু করে দিল। বেলার কাছাকাছি এসে পাক খেয়ে পিছিয়ে গেল। যাবার সময় বলল—নাচ আমাদের এখন ধর্ম। তুমি এই ধর্ম নেবে? নাচতে নাচতে ফিরে এসে বেলার কাছে চিবুকটা কথকেব ভঙ্গিতে দুলিয়ে আবার বলল, এই ধর্ম তুমি নেবে? স্বামীর ধর্ম?

বেলার মুখে এসেছিল শুয়োর। কিন্তু স্বামীকে কোনদিন এসব কথা বলেনি বলে আস্তে বলল, বিচ্ছিরি। কালই আমি সালকে চলে যাব।

সালকে সুকুমারের শ্বশুরালয। সেখানে বর্ষাকালে গেলে তার পাম্পসু আমসত্ত্ব হয়ে যায়। নাচ না থামিয়েই সুকুমার আবার বলল, তোমার স্বামীর ধর্ম নেবে?

অসভ্যতা? তাই নিতে হবে? যে কোন বাড়ির আলো জ্বললেই তোমায় এ অবস্থায় দেখতে পাবে। ভেতরে এস।

কেউ এখন আলো জ্বালাবে না। নিজের উপর মুদ্রায় হাতের আঙুলগুলো ঘোরালো সুকুমার। বিশেষ ঘোরে না। গাঁটে গাঁটে চর্বি। তরমুজ সমেত কোমরটি বেঢপ। চাঁদের ময়লা লাইটে প্রাচীন মূর্তি হয়ে বেলা দাঁড়ানো।

জামাকাপড় পরে এসো যাও।

এরকম কি তুমি আমায় আগে আর দ্যাখোনি?

'অনেকবার দেখেছি। নেশা কেটে গেলে গা ব্যথা হবে খুব।

ব্যথা মনে থাকে। ভালবাসা মনে থাকে। তুমি আমায় আর ভালবাস না কেন?

বন্ধুদের ভালবাসা তো পাচ্ছো অনেক।

হ্যাঁ খুব মেশামেশি হচ্ছে।

যাও পাজামা পরে এসো। আব নেচো না। মেয়েরা হঠাৎ জেগে উঠতে পারে।

ওরা এখন জাগবে না। এই দ্যাখো ওরিয়েন্টাল ড্যান্স। এরকম পারবে?

হাঁপাচ্ছো তো। একটু জিরিয়ে নাও বরং।

একথায় সুকুমার বারান্দার বেঞ্চটায় বসে পড়ল। কোমরে দুটো বড় ঘামের ফোঁটা। হাসতে হাসতেই আস্তে বলল, কাছে এসে বোসো না।

বসবো। কিন্তু ছোঁবে না বলে দিলাম।

কেন বলতো? ছুঁলে পুড়ে যায়!

বসতে বসতে বেলা বলল, ওকি অসভ্যের মত বসেছো। বাবু হয়ে বোসো। পা ভাঁজ করে বসতে জান না?

সে তো ট্রাউজার পরলে বসি। এখন তো দিব্যি চাঁদের আলোয় আছি। বলে সুকুমার বেলার কাঁধে ডান হাতখানা রাখল। যেন বিয়ের আগেকার তারা দু'জন সন্ধ্যের কোন পার্কে বেঞ্চে বসে আছে। পার্থক্য শুধু : বেলা চার রকমের চারটি জিনিস পরে আছে। শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার। আলো থাকলে দেখতে পেত, কাজলও আছে চোখে। কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে লোহা, শাঁখা এবং চুড়ি। কানে নতুন কানপাশা।

সুকুমারের গায়ে কোনবকমের কিছু নেই। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল তার। মোটর-মিস্ত্রির ওভারঅলের মত শুধু একখানা চামড়া দিয়ে সারা গা মোড়া। এখন তা গরম। এখানা নিয়েইজন্মেছিল। ইলাসটিক। তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে বেড়ে বেড়ে সবসময় তার মাংস, চর্বি, হাড়, রক্তের ওপর এই চামড়াখানি লেগে আছে। তাতে কোথাও কোথাও ফুটো। সেখানে চোখ, নাক, কান ইত্যাদি সব বসানো।

লোকে বাজার করে সংসার করে। ছেলেমেয়ে পড়ায়। রেশান আনে। তার কোন ঝঞ্ঝাট তোমাকে পোহাতে দিইনা আমি।

একটা ঝক্কি আমি পোহাই কিন্তু। টাকা আনি। অফিসে গিয়ে ঘর ঝাঁট দিই। বাসন মাজি। কাপড় কাচি। বাবুদেব গা টিপি। তাদের মত বুঝে কাশি। তাতে ভালবাসা আসে না। মেশামেশি হয় না। সব বাসি গন্ধ বেরোয়। তার নাম কাজ। কতকগুলো মরা কাজ। সেজন্য মাঝে মাঝে টাকা দেয়। তাই নিয়ে আমাদের সংসার হয়।

কি বাজে বকছো সেই থেকে। সবাই তো এরকমই করে।

আমিও তো তাই বলছি। তুমি আমার ধর্ম নেবে?

কিসের ধর্ম?

এই নাচের ধর্ম। নাচ আমাদের ধর্ম এখন। এতে মিশে যেতে হয়। তাতে ভালবাসা-

বাসি হয়। পুরনো ভালো ভালো দিন তাতে ভেসে চলে আসে। একদম তীরে। দাঁড়ালেই দেখা যায়।

কতটা খেয়েছো আজ? কে কে ছিলে বলতো?

সবাই ছিল। সবাইকে চিনবে তুমি। ছুঁতে পারবে না কিন্তু। আমাদেব ধর্ম নিলে তবেই না টাচ করা যায়। এসো নাচি। লজ্জা কিসের? এসো না—

উহু। আমার হয় না। আমার আসে না।

তুমি আসতে দাও না বলে আসে না। গান জানো তবু গাও না। তুমি গাইলে আমি তোমায় কত টাচ করতে পারি। ভালোবাসতে পারি। আমি জানলে তো নিশ্চয় তোমাকে শোনাতাম।

চেষ্টা করলে পার।

সুকুমার তখন নাচতে নাচতে বলেছিল আমার হয় না। আমার দেখছি—আজই রাতে দেখছি—আমি কত সুন্দর নাচতে পারি। বলতে বলতে সুকুমার প্রবাহিত স্রোতের প্রথম ঢেউটির ধারায় বাঁ পা-খানা এগিয়ে প্রায় ভেসে বেলার কাছে চলে এল। তখন দু'খানা হাতের পাতা দুটি ছায়াসত্রের মত তাব মাথা ও চিবুকর নিচে। সেই অবস্থায় পাকা কথক শিল্পীর স্টাইলে সে তার আস্ত মাথাটা বেলার মুখেব কাছে নিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে ফিরে এল।

তখন বেলার চোখে যে-দৃষ্টি তার অর্থ মবণ।

তাতে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে নাচতে নাচতেই সুকুমার বলল, তুমি আমার ধর্ম নেবে?

কোন জবাব না পেয়ে এবার সুকুমার তাব নিজস্ব তৈরি স্রোতধারাব ভেতবে ভাসতে ভাসতেই বলল, আমার গান শিখতে ইচ্ছে কবে। গুন গুন কবে।

শিখলে পার।

হারমোনিয়াম নেই। সরগম জানি না।

কিনে দেব। শিখিয়ে দেব। বলেই বেলা সবে টের পাচ্ছিলো, সে কতকাল পরে আবার সুকুমারের সঙ্গে মেশামেশি করতে পাবছে। প্রায় ভালোবাসাবাসির মত। এখন বোধহয় সে সুকুমারেব ধর্ম নিতে পারে। তাই ভেবে যেই না নিজস্ব মুদ্রায় প্রবাহিত হতে গেল—অমনি অন্ধকার বারান্দায গণেশ ডাক্তাবদেব আলো এসে লাফিয়ে পড়ল। সেই ঝোঁকেই বেলা একলাফে ঘবে। গেণুব বউ শেষবাতে অনেক ফেনা কবে বোজকাব মত বারান্দার বেসিনে দাঁত মাজতে শুরু কবেছে। তাবই আলো।

ভেতরে এসো বলছি।

সুকুমার যেতে পারল না। মাত্র একটা লাফ দিলেই ঘবে যাওয়া যায়। সেটা কিছুতেই টপকাতে পারল না। সে তখন স্বচ্ছন্দ শবীবে তারই নিজের বানানো স্রোতে আবলীলায় এগোচ্ছিল পিছোচ্ছিল।

তোমার বন্ধুর বউ দেখতে পেলে কিন্তু একটা কেলেঙ্কাবি হবে। সারা পাডায় টিটি পড়ে যাবে।

সুকুমার তার প্রবাহে ভাসতে ভাসতেই বলল, ওকে আমাব ধর্ম নিতে বলব।

তালাক

রমাপদ চৌধুরী

লোকে বলে গাঁ-ঘরে এমনটি দেখা যায় না। বড় ঘরের মেয়ে না হলে কি এমন রূপ হয়। কোরা ধুতির মতো চাঁপা-চাঁপা রঙ, আঁটোসাঁটো চেহারা, মাথায় একটু খাটো হলে কি হবে, মুখ-চোখের গড়নে খুঁত নেই এতটুকু। বারো বছরের চাঁদবানু যখন নাকছাবির চুনী আর পায়ে রুপোর মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়, চোখে না দেখতে পেলেও মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে কাসেমের, শুধু মলের ঝুনঝুন ঝুনঝুন আওয়াজ শুনে।

রসুলগাঁয়ের মাথা হলো লতিফসাহেব। এই লতিফসাহেবের মেয়ে চাঁদবানু।

বাপের তিরিশ বিঘে জোতজমি, মিঠাসায়রের চার আনি অংশ, আর আছে মৌলানার ডাঙায় আম-খেজুরের বাগান। এমন ঘরের মেয়ে বলেই না অমন রূপ। ঘরের মেঝে যে বিলিতী মাটিতে বাঁধানো, পায়ে তো কাদা লাগে না। আর করোগেটের চালে চাঁদনীর আলো ঠিকরে এসে মুখে পড়ে বলেই তো চাঁদের মতো রূপ চাঁদবানুর।

লতিফসাহেবের ছোট বিবিও দেখতে-শুনতে মন্দ ছিলো না বয়সকালে। তারই তো মেয়ে, হবে না কেন পরীর মতো দেখতে? তবে বয়েস কম হলো না, বারোয় পা দিয়েছে। গড়নে-বাড়নে চৌদ্দ বলেই মনে হয়।

তাই ছোট বিবি মাঝে মাঝে ধমক দেয়। বলে বয়সটা কম হয় নাই তোর, বিয়াশাদি হলে ছেলের মা হতিস চাঁদি।

চাঁদবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, হোক বয়স, তা বলে বুরকার ভিতর—দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। লতিফসাহেব শুনে হাসে। বলে, চাঁদি ঠিকই বলেছে, সদরের আবদুলসাহেবের মেয়েরা সব্বার চোখের সমুখ দিয়ে ইস্কুলে যায়, কাছারির মামলায় গিয়ে দেখে আসছি।

ছোট বিবি রেগে গিয়ে বলে, এটা সদর নয় তোমার, রসুলগাঁয়ের মাথা তুমি, ইজ্জতের কথাটা ভাবতে হয়।

লতিফসাহেব বলে, রাখো তোমার ইজ্জতের কথাটা। মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে যে লাজশরম হবে চাঁদির।

কথাটা সত্যি।

মানুষ আছে নাকি রসুলগাঁয়ে। পঁচিশ ঘর মুসলমানের ছোট্ট গাঁ। জাতেই মুসলমান, আদব-কায়দায় নয়। গরিবের গাঁ, কেউ ডিঙিতে মাছ ধরে বেড়ায়, কেউ তাঁত বোনে। আর বেশির ভাগই লতিফসাহেবের জমি চযে, ধান ভানে, আর নয়তো খেজুর-রসে জ্বাল দিয়ে গুড় বানায়।

একটাই লোক আছে—বাচ্চা করিম। বাপ মারা গেছে, এখন পাটোয়ারী কারবারটা করিম নিজেই দেখে। আশপাশের গাঁ থেকে ঘি, ডিম আর গুড় কিনে চালান দেয়

সদরের হাটে। পয়সা হয়েছে, তার প্রমাণ দু-টো বিবি করিমের। নামটা কিন্তু সেই বাচ্চা করিমই রয়ে গেছে।

করিমের চেহারাটা বেশ ছিমছাম। পাকা দালান তুলবে বলে ইটের পাঁজা পোড়াচ্ছে সদর থেকে রাজমিস্ত্রী এনে। দু-দুটো বিবি, দুজনেরই গলায় রূপোর হাঁসুলি, মিনে-করা বাজু-বন্ধ। নকশাকাটা ফুলবাহার শাড়ি বানায় তাঁতী ঘরে বায়না দিয়ে। এ ঘরে চাঁদির বিয়ে দিলে মেয়েটা সুখী হবে, ভাবে ছোট বিবি। আর তাই চাঁদবানু যখন-তখন খিড়কি পার হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে গেলে রেগে যায় সে।

চাঁদবানু কিন্তু অতশত বোঝে না, হাতে লণ্ঠন নিয়ে গোয়াল দেখে, খড়ের জাবনায় হাত ডুবিয়ে দেখে জল আছে কি না, তারপর গুনে গুনে মুর্গিগুলোকে ঝাঁপিতে ভরে।

একটা কম চীৎকার করে ডাক দেয়।—অ কাসেম, মুর্গিগুলিকে গুনতি করে দেখো ফের, একটা খাটাশে ধরলো না তো!

আঠারো বছরের জোয়ান কাসেম তাতেই খুশী, চাঁদবানুর কাছ থেকে কাজ পেলে আর কিছু চায় না ও। মিঠাসায়রের পাড় খুঁজে খুঁজে মুরগিটা ধরে আনে, মুখ-চোখের ভাব যেন, কত বড় একটা কাজ করেছে।

কিন্তু হাসে না কেন চাঁদবানু? কেন জিজ্ঞেস করে না, কোথায় পেলো কাসেম দলছুট মুরগিটাকে, কাদায় কাদায় কত ঘুরতে হয়েছে তাকে, সামনে দিয়ে সড়াৎ করে গোখরো গেছে কিনা ফনা দুলিয়ে!

হোক কাজের কথা, কথা শুনতে পেলেই কাসেম খুশী। কথা বলতে পেলে হযতো আরো খুশী হতো। কিন্তু তেমন সুযোগ বড় একটা হয় না। বাবাটা দিন ক্ষেতে লাঙল টেনে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসে।

—এক ছিলিম তামুক দেবেন গোমস্তাসাহেব।

গোমস্তাসাহেব এ সময়টা এক গেলাস চায়ের লোভে পাটোয়ার-বাচ্চা করিমের বাড়িতে আড্ডা জমায় জেনেও, গোমস্তাসাহেবের নাম ধরেই ডাক দেয় কাসেম। বার দুই ডাক দিলেই বেরিয়ে আসে চাঁদবানু।

বলে, ও কাসেম এই নাও তোমার তামুক।

আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারে হাতড়ে আঙিনাটার সামনে যায় কাসেম। দু হাতের আঁজলা এগিয়ে দেয়। আর উঁচু আঙিনার ওপর থেকেই ওর হাতের ওপর তামাকটা ফেলে দেয় চাঁদবানু।

—একটু আঙার দিবে না?

চটে যায় চাঁদবানু।—কাজ-কামের চেয়ে তোমার ফরমাশটাই বেশী বেশী কাসেম। বলে দপ্-দপ্ করে পা ফেলে যায় উনোন থেকে আগুন আনতে।

ও তো বোঝে না আসলে কাসেমের ফরমাশটা কেন। মোট কথা চাঁদবানুর দিকে তাকিয়ে থাকতে, চাঁদবানুর হাঁটাচলা—সব—সব কিছুই যেন ভালো লাগে। আর ঘরে ফিরে ঘুম আসে না ওর চোখে। শুধু চাঁদবানু, চাঁদবানু। স্বপ্নে দেখে, অনেক টাকা

জমিয়েছে কাসেম। জমিজমা না থাক, খেজুরের গাছ আছে বারোটা, খেজুরের গুড় আর পাটালি বানিয়ে সদরে বেচে এসেছে চড়া দরে। তারপরসেই টাকা নিয়ে শুরু করেছে করিমসাহেবেব মতো পাটোয়ারী কারবার। করোগেটের ঘর হয়েছে, বিলিতী মাটি অর্থাৎ সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে ঘরের মেঝে।

তারপর?

তারপর লতিফসাহেব যেন এসে বলছে, অ কাসেম, সবই তো হলো, জমিজমাও কিনলে, এবার বিয়াশাদি না করলে ঘর যে আঁধার সেই আঁধারই রয়ে যাবে।

কাসেম তখন বলবে, বিবি আনার মতো মেয়ে কই লতিফসাহেব, আপনিই কন দেখি?

—কেন, আমার চাঁদিকে তো ছোটকাল থেকে দেখছো তুমি।

সত্যি! তা যদি কোনো দিন সম্ভব হয়! ভাঙা চালের খড়ের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে কাসেম। মুখটা তো দেখতে পায় না অন্ধকারে, আর আলো থাকলেওতো নিজের মুখ নিয়ে দেখতে পাবে না, তবু কাসেম বুঝতে পারে, তার মুখে যেন হাসি লেগে রয়েছে।

নিজের মনেই কখনো হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ময়লা গামছাটার খুঁটে চোখ মোছে। জন খাটার নসীব যার, সে কিনা স্বপ্ন দেখে চাঁদবানুকে বিয়ে করার! বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে কাসেমের।

চাঁদবানু কিন্তু অতশত বোঝে না। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন কাসেমের ওপর দয়া হয় ওব। যেদিন বেগাব দিতে আসে কাসেম, চাঁদবানু ডেকে কথা বলে।

কাজের শেষে কাসেমের হাতে তেল ঢেলে দেয়, বলে ডুব দিয়ে এসো মিঠাসায়রে, তোমার ভাত হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়ে এসে মরাইয়ের পাশে এনামেলের থালা-ঘটি নিয়ে বসে পড়ে কাসেম। চাঁদবানু নরম ভাত ঢেলে দেয় থালায়, আর ডাল। তরি-তরকারিও থাকে কোনো কোনো দিন।

বসে বসে পেট ভরে খায় কাসেম, আর সামনে দাঁড়িয়ে গল্প কবে চাঁদবানু। বলে অ কাসেম, বুড়া হতে চললে, বিয়াশাদি করবে না?

—বিয়াশাদি? হাসে কাসেম। বলে, আমাদের কে বিয়া করবে, নিজের পেটটাই কথা শোনে না।

বলে বটে, কিন্তু সন্দেহ যায় না। বিয়েব কথা কেন বলে চাঁদবানু? তবে কি কাসেমের স্বপ্নটা ওর মনেও উঁকি দেয়!

মনের ভেতর গুনগুনুনি শুরু হয়। নিজের মনেই একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে করিম সাহেবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

হিসাবের খাতা দেখতে দেখতে চোখ তুলে তাকায় করিমসাহেব।—কি কাসেম, খবব আছে নাকি কিছু?

—একটা কিছু বাণিজ্য বাতলে দেন সাহেব। জন-মজুর খেটে তো পেট চলে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে করিমসাহেব।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, বাণিজ্য আছে একটা করবে তুমি?

ঘাড় নাড়ে কাসেম।

করিমসাহেব মৃদু হেসে বলে, বিশটা টাকা পাবে নগদ, বিয়া করতে হবে।

—বিয়া? চোখ কপালে তোলে কাসেম। করিম সাহেব হেসে বলে, এ বাণিজ্যটা খুব ভালো কাসেম। সদরের মহাজন বাবু মিঞা তার এক বিবিকে তালাক দিয়ে নিজের হাতে নিজেই কামড় দিচ্ছে এখন।

কাসেম তবু বুঝতে পারে না, তেমনি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

করিমসাহেব ধীরে ধীরে বলে, আমাদের মুসলমানের ধর্মটা বড় কড়া কাসেম! হিন্দুর ঘরের বউকে বাপের বাড়ি তাড়িয়ে আবার ফিরে লওয়া যায়। আমাদের একবার তালাক দিলে সে বিবিকে ঘরে আনা যায় না।

কাসেম তবু কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

করিমসাহেব আবার বলে, হ্যাঁ, সে বিবিকে অন্য কেউ বিয়া করে তালাক দিলে তবেই তালাক-দেওয়া বিবিকে আবার বিয়া করা যায়, ফিরে আনা যায়, এটা আমাদের কানুন।

কাসেম বলে, হাঁ সাহেব, মুসলমান ঘরের কানুন মানতে হয়।

—তাই তো বলছি কাসেম। বাবু মিঞার বিবিটাকে তুমি বিয়া করে তালাক দাও, কুড়িটা টাকা পাবে, আর ঘরের বিবি তার ঘরে ফিরবে।

লাফিয়ে ওঠে কাসেম।—ছি ছি, এ কি কন সাহেব! গরিব মানুষের কি ইজ্জত নাই?

—ইজ্জত! হো হো করে হেসে ওঠে করিমসাহেব। বলে, কুড়িটা টাকা পাবে, ভেবে দেখো কাসেম।

ভেবে দেখেছে কাসেম, অনেক ভেবেছে। গরিব হলেও অমনভাবে ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না সে। তার চেয়ে মাছ ধরার নাম করে নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে একদিন, ফিরবে না আর। তা হলে তো চাঁদবানু বলবে না, কাসেম তালাক বেচে পেট ভরায়।

কাজ করতে করতে কেবলই ভয় হয় কাসেমের। চাঁদবানুর কানেও পৌঁছে যাবে না তো কথাটা! করিমসাহেব মিছে করে বলবে না তো, কাসেম রাজী হয়েছে! এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছিলো কাসেম। চাঁদবানু বলেছে, অ কাসেম, সদরে হাট বসেছে,আমার জন্যে চার গাছা রঙিন জলচুড়ি এনে দেবে?

কাসেম হেসে বলেছে, চুড়ি? তুমার জন্যে চাঁদ আনতে পারি, কও তো আনি। বলে কোমরে পয়সা গুঁজে নদীতে ঝাপ দিয়েছিলো কাসেম।

কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন, বোধ হয় জলসাপে, কাটলো কাসেমকে। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে এলো সে ডান হাতটায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে।

চীৎকার শুনে কেউ কেউ ছুটে এলো। লতিফসাহেব হেকিম আনলো মনিরপুর থেকে। কিন্তু যন্ত্রণা কমলো না।

হেকিম বললে, সদরের হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিসে কামড় দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

মাস কয়েক পর সদরের হাসপাতাল থেকে যখন ফিরে এলো কাসেম, গাঁয়ের লোক দেখে চমকে উঠলো। কনুইয়ের ওপর থেকে ডান হাতটা একেবারে কাটা।

হাসিটা কান্নার মতো দেখালো কাসেমের। বললে, ডাক্তাররা বললেন, হাতটায় পচন ধরেছে, কেটে বাদ দিতে হবে। তা বাদ দিয়ে দিলেন তাঁরা।

কিন্তু কাসেম তখনো বুঝি জানতো, না, সত্যিই একখানা হাত কাটা গেছে তার। তার যে রঙিন মন হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে চাইতো, সেই হাতটাই কাটা গেছে।

লতিফসাহেব বললে, একটা লোকের ভাত তো আর খরচ হবে না কাসেম, তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে। চাঁদ তো নেই কাসেম, আমার ঘরটা আঁধার করে চলে গেছে চাঁদি, বাচ্চা করিমের ঘর আলো করেছে।

চলে গেছে চাঁদবানু? করিমসাহেবের ঘর আলো করতে চলে গেছে? ঝরঝর করে দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো কাসেমের। বাঁ হাতটা মাথায় রেখে বসে পড়লো সে।

লতিফসাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলে,কি হলো কাসেম?

—হয় নাই কিছু বড় কাহিল লাগছে শরীরটা। উত্তর দিলো কাসেম। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হনহনকরে করিমসাহেবের বাড়ির দিকে চলে গেল। কাটাখালের কাছে পৌছে বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলো কাসেম।

রাতারাতি যেন ভোল পালটে গেছে বাড়িটার। ক'টা মাস হাসপাতালে পড়ে ছিলো কাসেম, আর তারই মধ্যে এত সব ঘটে গেল? চাঁদবানুর বিয়ে হয়ে গেল করিমসাহেবের সঙ্গে। তা হোক, করিমসাহেব না হোক, কোনো উঁচু ঘরে যে বিয়ে হবে চাঁদবানুর তা সে জানতো। কিন্তু এমন উঁচু ঘরে!

দূর থেকে তাকিয়ে রইলো কাসেম। দেখলে, ইটের দেয়াল উঠেছে পাকা দালান হয়েছে করিমসাহেবের। দোতলায় একটা চিলেকোঠাও যেন হবে বলে মনে হলো। সামনের সারকুঁড়ের পাশের জমি টুকুন ভরে আছে পালং শাকে। আর সারের গাদায় চরে বেড়াচ্ছে অগুন্তি মুর্গি। গোয়ালে চার-চারটে গাই।

সত্যি, এমন বাড়িতে যখন বিয়ে হয়েছে চাঁদবানুর তখন সুখী হবে সে নিশ্চয়ই। তাই যেন হয়, মনে মনে কাসেম বললে, তাই যেন হয়। চাঁদবানুর জন্যে পীরের দরগায় মানত করে আসবে কাসেম।

কিন্তু চাঁদবানুকে একটুক্ষণের জন্যে দেখে আসতে ইচ্ছে হয় তার। ইচ্ছে হয় আগের মতোই গিয়ে তামাক চাইতে, দুটো কড়া কথা শুনে একমুখ হাসতে। অথচ তা বুঝি আর সম্ভব নয়। যে মেয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ছুটে বেড়াতো, জল-কাদায় নালাটা পার হবার সময় যার পায়ের গোছা চোখে পড়েছে কাসেমের কতবার, সে বোধ

হয় এখন আর দেখাও দেবে না।

তবু করিমসাহেবের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো কাসেম। লতিফসাহেবের গোমস্তা আর আরো জনাকয়েক লোক বসে বসে মোসায়েবি করছে তখন।

কাসেমকে দেখে সবাই চমকে চোখ তুললে কপালে।—কাসেম ভাই যে! হাতখানা কি হলো ভাই কাসেম?—কে যেন প্রশ্ন করলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে কাসেম।—ডাক্তার কইলেন, হাতটায় পচন ধরেছে, তাই...

করিমসাহেবও দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, শোনো কাসেম, শোনো।

কাছে এগিয়ে গেল কাসেম।

করিমসাহেব বললে, আমি তো মাসের বিশটা দিনই সদরে থাকি, তা দালান তুললাম, ঘরটা দেখাশুনার লোক লাগবে। তুমি আমার কাছে থাকো কাসেম!

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। সেইজন্যেই তো এসেছিলো করিমসাহেবের কাছে। মনের মধ্যে গুনগুন করলো চাঁদবানু—চাঁদবানুর দেখা পায় না একবার? তা হলে দেখতে পেতো চাঁদবানুর চোখে জল টলমল করে কি না তার কাটা হাতখানা দেখে।

অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেম, তারপর তামাকের ছিলিমটা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো। 'যাই করিমসাহেব, গাঁ-ঘরগুলো দেখে আসি একবার।

আনমনে করিমসাহেবের বাড়ির পর্দাঢাকা জানালাটার দিকে একবার চোরা চোখে তাকিয়েই মাঠের পথ ধরছিলো কাসেম।

হঠাৎ মেয়েলী গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো।

—অ কাসেম!

চাঁদবানুর গলা না? ফিরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো সে। দেখলে খিড়কির দরজার পাশে বোরখায় মুখ ঢেকে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে যেতেই মুখের পর্দাটা সরিয়ে ফেললো চাঁদবানু। তারপর কাসেমের কাটা হাতটার দিকে তাকিয়েই শশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

—অ কাসেম, হাতটা তোমার কোন্ বিবিকে দিয়ে এলে?

কাসেম চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর ফিসফিস করে বললে, যে হাতে তোমাব ফরমাশ খাটছি সে হাতে অন্য কারও ফরমাশ খাটবো না তাই...

খিলখিল করে আবার হাসলো চাঁদবানু। তারপর বললে, এই বেলা এইখানেই ভাত খাবে, গোসল করে এসো।

সারাটা গাঁ ঘুরে ঘুরে ফিরে এলো কাসেম। একটা কলার পাতা তুলে এনে ধানগোলার পাশে আগের মতোই বসলো।

চাঁদবানু জল ঢেলে দিলো ঘটিতে। গবম ভাত পড়লো পাতার ওপর। কি সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এলো পাতায় গরম ভাত পড়তেই। ভাতের ওপরেই ডাল ঢেলেদিলো চাঁদবানু। আর তাকিয়ে দেখলে। আহা, বেচারী—বাঁ হাতে খেতে কষ্ট হচ্ছে কাসেমের। ডাল গড়িয়ে পড়ছে পাতা থেকে। ভাতের আড়া দিতে পারছে না।

চোখ ছলছল করে উঠলো চাঁদবানুর।

ছুটে পালালো সে সেখান থেকে। এ দৃশ্য বুঝি দেখা যায় না।

কাসেম কিন্তু মাথা হেঁট করে খাচ্ছে তো খাচ্ছে। বুঝতেই পারলো না চাঁদবানু কেন চলে গেল।

খাওয়া শেষ করেও যখন চাঁদবানুর দেখা মিললো না, তখন ঘটির জলটা ঢকঢক করে শেষ করে পাতাটা মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

করিমসাহেবেব কাছেই তো কাজ পেয়েছে কাসেম, আজকে না আসুক চাঁদবানু, আবার তো দেখা পাবে।

দেখা সত্যিই হতো, কথাও। চাঁদবানু কাছে এলেই যেন কথা আর শেষ হতে চাইতো না কাসেমের। আর চাঁদবানুও যেন ঐ সময়টুকুর জন্যেই হাসতে, কথা বলতে উন্মুখ হয়ে উঠতো। দুজনেই বুঝতে পারতো না, ওদের হাবভাব দেখে করিমসাহেবের অন্য বিবিদের মধ্যে কি ফিসফিসানি চলে।

যেদিন সদরে চলে যেতো করিমসাহেব, সেদিন বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে বাইরের বারান্দাটায় শুতো কাসেম। আর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলতো চাঁদবানু। বাপ-মায়ের খোঁজ-খবর নিতো। যত দুঃখের কথা বলতো কাসেমের কাছে। অন্য বিবিরা কত দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে, কি গালাগালি দেয় বড় বিবির মেয়ে, একদিনের তরেও বাপের কাছে কেন যেতে দেয় না করিমসাহেব।

তাদের কথা কেউ শুনতো কিনা, আর কেউ দেখছে কি না তাদের, সে হুঁশ থাকতো না কারও। আর থাকবেই বা কেন? চাঁদবানুর বাপের কাছে জন খাটতো কাসেম। তা কাসেমেব কাছে সুখদুঃখের কথা বলবে না তো, মন হালকা করবে কার কাছে সে?

করিমসাহেব কিন্তু অতশত বুঝলো না। চাঁদবানু নাকি কাসেমের কাছে আসতো বাত হলেই। বিবিরা নাকি নিজের চোখে দেখেছে সব।

বাগের মাথায় করিমসাহেব হাতের ছড়িটা বসিয়ে দিলে কাসেমের পিঠে। দুজন লোককে বললে, বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে কাসেমের পিঠে চাবুক বসাতে।

সমস্ত পিঠে কালশিটে দাগ নিয়ে লতিফসাহেবের বাড়িতে ফিরে এলো কাসেম। লতিফসাহেবকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। তারপর সব কথা খুলে বললে। বললে, চাঁদবানু কোনো গুনা করে নাই সাহেব।

দোষ করুক বা না করুক, কবিমসাহেব ভেবে দেখলো না। রাগের মাথায় মৌলবীকে সাক্ষী রেখে তালাক দিয়ে দিলো চাঁদবানুকে।

তালাক তালাক তালাক।

চাঁদবানু কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো বাপের কাছে। লতিফসাহেবের ছোট বিবিও শুনে চোখ মুছলো আঁচলে।

গাঁয়ের মৌলবী বললো, তা তালাক দিয়েছে করিমসাহেব, ভালোই হয়েছে। মেয়ের তোমার নিকা দাও সদরের কোনো ভালো লোক দেখে। দু বছর ঘর করেছে করিমের, কোলে একটা বাচ্চাও দিতে পারেনি আহাম্মকটা।

লতিফসাহেব উত্তর দিলো, তালাকের ক'টা মাস যাক, চাঁদির মন হয় তো সদরের আব্দুল উকিলের ছেলের সাথেই নিকা দেবো।

চাঁদবানু কিন্তু রাজী হলো না। না-হয় বেওয়ার মতোই থাকবে সে, তা বলে নিকা করবে না চাঁদবানু।

বাপ-মা বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বুঝতে চাইলে না সে।

কাসেমও ভয়ে ভয়ে বললে, আব্দুর উকিলের ছেলেটাকে দেখেছি আমি। বাপের মতোই বুদ্ধি ছেলেটার, তিন-তিনটা পাস দিয়েছে...

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো চাঁদবানু।

কাসেমও বুঝলো না, কি চায় মেয়েটা। এমনি বিধবার মতো থাকবে নাকি চিরকাল? নাকি মনে মনে করিমসাহেবকেই ভালোবাসে ও। তাই হবে হয়তো!

হঠাৎ একদিন করিমসাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলো কাসেম। বললে, চাঁদবানুকে ঘরে ফিরিয়ে আনো করিমসাহেব, ও গুনা করে নাই কিছু। কু-লোকের কথা শুনে তালাক দিলে মিছিমিছি।

করিমসাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঠিক কথা কাসেম, কু-লোকের কথা শুনে তোকেও শাস্তি দিলাম, নিজের বুকটাও কাঁদে এখন। চাঁদবানু, তুই জানিস না কাসেম, বড় ভালো মেয়ে চাঁদবানু।

—তবে ফিরায়ে আনো না কেন?

করিমসাহেব হাসলে।—মুসলমান ঘরের কানুনটা বড় কড়া কানুন কাসেম, ইচ্ছা হলেই তালাক দেওয়া বিবিকে ফিরায়ে আনা যায় না।

কাসেম বললে, মৌলবীকে বললে উপায় বাতলে দিবে।

করিমসাহেব ফিশফিস করে বললে, উপায় আছে কাসেম, তুই পারিস চাঁদিকে ফিরায়ে আনতে! তুই নিকা করে চাঁদিকে তালাক দে কাসেম। পঞ্চাশ টাকা দেবো তোরে, 'না' করিস না কাসেমভাই!

মৌলবীও সেই কথাই বললে।—ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তুই বাদ সাধিস না কাসেম। লতিফসাহেবও রাজী হয়েছেন।

—আর চাঁদবানু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে কাসেম।

মৌলবী বললে, চাঁদবানু যে নিকা করলো না সে তো ঐ করিমের তরেই। নিকা হয়ে ফের তালাক না হলে করিমের ঘরে আসতে পাবে না চাঁদি, এ কথা মুসলমান ঘরের কানুন, তাই রাজী হয়েছে চাঁদি।

কাসেম বললে, তবে আমিও রাজী হইলাম, কিন্তু তালাক বিক্রির টাকা দিবেন না আমারে।

টাকাটা তো বড় কথা নয়। চাঁদিকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে কাসেম, তার দোষেই তালাক দিয়েছিলো করিমসাহেব, ঘরের বিবি ঘরে ফিরবে, তার জন্যে টাকা নেবে কেন কাসেম।

চাঁদবানুকে সব কথা খুলে বললে লতিফসাহেব। জিজ্ঞেস করলে,তোর মতটা কি

চাঁদি! রাজী আছিস তো? লজ্জায় হাসি হেসে মাথা নাড়লো চাঁদবানু।

হাতকাটা কাসেমের সঙ্গেই নিকা হয়ে গেল চাঁদবানুর।

সত্যি, এমন দিনটার জন্যে কত স্বপ্নই না দেখেছে কাসেম। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে শুধু আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে। অথচ, সত্যিই যখন তার ঘরে এলো চাঁদবানু, কাসেমের মনটা হু-হু করে কেঁদে উঠলো। মনে হলো গা-সুদ্ধ লোক যেন হাসছে তাকে দেখে। বলছে, কাসেম তালাক বিক্রি করেছে। কাসেমটা চশমখোর, টাকার লোভে তালাক বিক্রি করেছে করিমসাহেবকে।

চাঁদবানুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতেও সাহস হয়নি। চাঁদবানুও হয়তো হাসছে মনে মনে, কাসেমের নসীব দেখে।

নিজের মনেই নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো কাসেম। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল তার। চমকে উঠলো কাসেম। পায়ের ওপর কি ওটা, বেড়াল নাকি?

উহু। পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে চাঁদবানু। আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে যেন কাসেমের পায়ের ওপর।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো কাসেম। ডাকলে, চাঁদি, অ চাঁদি!

সশব্দে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো চাঁদবানু।

তার মুখটা এক হাতে তুলে ধরার চেষ্টা করলে কাসেম। বললে, কি হলো চাঁদি, কাঁদছো কেন?

জলে-ভাসা এক জোড়া চোখ তুলে কাসেমের মুখের দিকে তাকালো চাঁদবানু। বললে, আমাকে তালাক দিবে না কও!

দীর্ঘশ্বাস ফেললে কাসেম। বললে, না চাঁদবানু, দিব না তালাক, তালাক দিব না তোমারে। বলে চাঁদবানুকে বুকের কাছে টেনে নিলো কাসেম। একটাই তো হাত, চাঁদবানু নিজেই যেন তার বুকের কাছে সরে এলো। কাসেম কাটা হাতটা রাখলো চাঁদবানুর মাথায়। বললে, কিন্তু নিমকহারাম কইবে সকলে, তুমার আব্বাজানের কাছেও নিমকহারাম হইতে কয়ো না চাঁদি।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকাল চাঁদবানু। অবোধ্য ঠেকলো যেন কাসেমের কথাগুলো। ও কি কোনোদিন বোঝেনি কাসেমের গোপন স্বপ্ন, নাকি ও নিজেই স্বপ্ন দেখেনি!

তবু কাসেম বললে, পাটোয়ারেরবিবি হবার রূপ তুমার, আমার ভাঙ্গা ঘরে কি চাঁদরে ধরা যায়। তালাক আমাবে দিতেই হবে, তুমার ভালোর জন্যেই দিতে হবে চাঁদি।

তালাক, তালাক, তালাক।

তা হোক, গলার হার গলায় পরে খুলে দিয়েছে কাসেম। সেই স্বপ্ন তো সবচেয়ে মিঠে, কি হবে তাকে তার দেয়ালের বাক্সে ভবে রেখে।

সম্পর্ক

প্রফুল্ল রায়

অফিস ছুটি হতে কয়েক মিনিট বাকি। এখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে সাত। আধ ঘণ্টা আগে আজকের সব কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন অবনীশ। তখনই বেরিয়ে পড়তে পারতেন। কিন্তু সারা জীবন তিনি ডিসিপ্লিন মেনে এসেছেন। অফিস আওয়ার্স দশটা থেকে পাঁচটা। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে আসেন, বেরোন ঠিক পাঁচটায়। তিরিশ বছর এই নিয়মেই চলে আসছে।

অবনীশ সান্যাল একটা মাল্‌টিন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। বয়স চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন। চওড়া কপালের ওপর থেকে ব্যাক-ব্রাশ করা চুল, বেশির ভাগটাই কুচকুচে কালো, ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে রুপোর তার হয়ে গেছে। নিখুঁত কামানো মুখ অবনীশের, থুতনির মাঝখানে অল্প একটু ভাঁজ। পুরু লেন্সের চশমার পেছনে উজ্জ্বল চোখ। অ্যাভারেজ বাঙালিদের চেয়ে তার হাইট বেশ ভাল, প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ব্যক্তিত্বের একটা কোটিং, তবে সেটা দুর্ভেদ্য নয়। আলাপ হলে বোঝা যায় মানুষটি ভদ্র, মার্জিত এবং সহানুভূতিশীল। ব্যবহার চমৎকার।

এই মুহূর্তে চেম্বারে অবনীশ ছাড়া আর কেউ নেই। রেয়ারাকে দিয়ে অ্যাটাচি কেস আগেই গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর সাত মিনিট পর তিনি উঠবেন। শোফার অফিসের পার্কিং জোনে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

অবনীশের চেম্বারটি বড়ো মাপের। ফ্লোর নীল কার্পেটে মোড়া। দেওয়ালের প্লাস্টিক পেইন্ট থেকেও নীলাভ দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। সীলিং ধবধবে সাদা।

ঠিক মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে বিরাট গ্লাস-টপ টেবল। সেটার পেছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন অবনীশ। সামনে টেবিলটাকে ঘিরে গদীমোড়া ফ্যাশনেবল দশটি চেয়ার। ফাইন, কোম্পানি ল, লেবার ল এবং ইনকাম ট্যাক্স, ট্রেড এবং ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে বিভিন্ন বই, ইয়ার বুক, ম্যাগাজিন ইত্যাদি রাখার জন্য দেয়ালের ভেতর ক্যাবিনেট বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। সামনের দিকে শুধু টানা কাচের পাল্লা। আরেকটা দেয়াল কেটে অ্যাকুরিয়াম বসিয়েছেন, সেখানে লাল-নীল মাছেদের খেলা। একটি দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের, অন্য দেয়ালে যামিনী রায়ের বড় দুটি পেইন্টিং। তাঁর সামনের টেবলে নানা রঙের চারটে ফোন, পেন-স্ট্যান্ড, টেবল ক্যালেন্ডার ইত্যাদি। গোটা চেম্বারটিতে সুরুচির ছাপ রয়েছে।

এটা যে মে মাস, এই বিকেলেও যে কলকাতার ওপরদিয়ে প্রায় লু-বাতাস ছুটছে অবনীশদের এয়ার কন্ডিসান্ড অপিসে বসে টের পাওয়া যায় না। এখানে রয়েছে আরামদায়ক শীতলতা।

পাঁচটা বাজতে যখন কয়েক সেকেন্ড বাকি সেই সময় ফোন এলো। 'হ্যালো'— বলতেই লাইনের ওপার থেকে চেনা গলা ভেসে আসে, 'আমি বুবুন—'

বুবুন এবার অনেক দিন বাদে ফোন করল। তার ফোন এলে কিংবা কচিৎ কখনও সে নিজে এসে পড়লে খুবই খুশি হন অবনীশ, সেই সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে এক ধরনের আড়ষ্টতা বোধ করেন। তার সঙ্গে বুবুনের সম্পর্ক অদ্ভুত। রীতিমত জটিলই বলা যায়, কিন্তু সে কথা পরে।

অবনীশ বললেন, 'তিন উইক পর তোমার গলা শুনলাম। কেমন আছ?'

বুবুন বলল, 'ভাল না। আমার—আমার—' তার গলা ধরা, জড়ানো। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেছে সে।

এরকম আগে কখনও হয়নি। চমকে উঠলেন অবনীশ, 'কী হয়েছে বুবুন?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা মাখানো।

টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে বুবুনের কান্নার আওয়াজ ভেসে এসো। সে সমানে ফোঁপাচ্ছে।

অবনীশের উদ্বেগ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বলেন, 'কী হয়েছে বুবুন? বল—বল'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুবুন বলে, 'আমার বাবা, আমার বাবা—'

ফোনটা প্রায় মুখের ওপর চেপে ধরে অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবার কী হয়েছে?'

'আজ সকালে মারা গেছেন।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন অবনীশ। তারপর খুব আস্তে, কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার বাবা অসুখে ভুগছিলেন বলেতো শুনিনি। কী হযেছিল?'

বুবুন বলল, 'স্ট্রোক!' এরপর সে যা বলে তা এই রকম। সকালে সোমনাথ ঘুম থেকে উঠে বাসিমুখে মিনিট পনেরো ফ্রী-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতেন। শরীরে যাতে এক্সট্রা ফ্যাট না জমে সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ম নজর ছিল। ব্যায়ামের পর পনেরো মিনিট জিরিয়ে, শেভ-টেভ করে ঠাণ্ডা জলে স্নান। স্নানের পর চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়া। তারপর সাড়ে আটটা থেকে ন'টার ভেতর অফিসে বেরিযে পড়তেন। সকালের দিকে এটাই ছিল তার প্রতিদিনের রুটিন। অবশ্য ছুটির দিনগুলো এই রুটিনের বাইরে। সে সব দিনে তিনি একটু আধটু অনিয়ম করতেন।

আজ সকালে স্নান-টানের পর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্ট্রোকটা হয়। ম্যাসিভ অ্যাটাক। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কিছুই করা যায়নি। তার আগেই সব শেষ।

সোমনাথ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না অবনীশ। বুবুনকে যদিও বছর দশেক দেখছেন তবু তার বাবার ব্যাপারে কোনদিন একটি কথাও হয়নি। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে সামান্য কিছু খবর আজই প্রথম জানা গেল। যিনি স্বাস্থ্য এবং বাড়তি মেদ সম্বন্ধে এতটা সতর্ক, হঠাৎ তাঁরই কিনা স্ট্রোক হয়ে বসল। কোন মানে হয় না।

অবনীশ ভারী গলায় বললেন, 'ডেড বডি এখন কোথায়?'

'হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবার পর কিছুক্ষণ আগে বাড়িতে নিয়েএসেছি। আধ ঘণ্টার ভেতরে শ্মশান নিয়ে যাওয়া হবে।'

'এমন একটা সাডেন আন-এক্সপেক্টেড ডেথ, ভাবাই যায় না। তোমাকে কী যে বলব, বুঝতে পারছি না। এ সময় ভেঙে পড়লে চলবে না বুবুন। মনে জোর আনো।' খুব আন্তরিকভাবেই বললেন অবনীশ। তাঁর কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি মাখানো।

বুবুন উত্তর দিল না, টেলিফোনের লাইনের ভেতর দিয়ে তার চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

সস্নেহে ভারী গলায় অবনীশ বললেন, 'কেঁদো না বুবুন। এখন বল, শ্মশানে যাবার ব্যাপারে আমাকে কি কিছু করতে হবে?'

বুবুন ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'না। জ্যেঠামশায় আর কাকারা সব ব্যবস্থা করছেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'মাকে কি খবরটা দেব?'

হকচকিয়ে গেলেন অবনীশ। বুবুনের বাবার মৃত্যুর সঙ্গে অন্য একটা দিক যে জড়িয়ে আছে তা খেয়াল ছিল না। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকার পর রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খবর দেবে। আমাদের বাড়িতে ফোন কর।'

'আচ্ছা।' বুবুন লাইন কেটে দিল।

আস্তে আস্তে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন অবনীশ। নিচে শোফার যে গাড়ি নিয়ে তাঁরজন্য অপেক্ষা করছে, তা একেবারেই ভুলে গেলেন।

বুবুনের মা অর্থাৎ শোভনা একসময় ছিল সোমনাথের স্ত্রী। বারো বছর আগে তার ডিভোর্স হয়ে যায়। এর বছর দুই বাদে অবনীশের সঙ্গে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। আগের পক্ষের একটি ছেলে রয়েছে শোভনার—বুবুন। অবনীশের সঙ্গে বিয়ের সময় বুবুনের বয়স ছিল দশ। এখন সে কুড়ি বছরের টগবগে যুবক। প্রেসিডেন্সি থেকে এ-বছর ইকনমিক্স অনার্স-এ পার্ট টু দিয়েছে। ডিভোর্সের সময় কোর্ট থেকে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, তাতে ছেলের অধিকার পেয়েছিলেনসোমনাথ। বুবুন তাঁর কাছেই থাকে। তবে শোভনার বা বুবুনের ইচ্ছে হলে পরস্পরকে দেখে আসতে পাবে। পূর্বতন স্বামীর বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসার প্রশ্নই নেই। প্রথম প্রথম দু-তিন বছর ড্রাইভারকে দিয়ে বুবুনকে শোভনার কাছে পাঠিয়ে দিতেন সোমনাথরা। একটু বড় হবার পর বুবুন একা একাই আসতে শুরু করে।

শোভনার সঙ্গে অবনীশের আলাপ পহেলগাঁওয়ে। সেবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন অবনীশ। রোজই তাঁর চোখে পড়ত লিডার নদীর পারে বসে একটি অত্যন্ত শুশ্রী তরুণী ছবি আঁকছে। দূর থেকে তাকে অবাঙালী মনে হয়েছিল।

দু-তিন দিন লক্ষ করার পর নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করেছিলেন অবনীশ। প্রথমে, ইংরেজিতে। তারপর নাম এবং পদবী শুনেই জানা গিয়েছিল মেয়েটি বাঙালী।

পহেলগাঁও-এর সেই আলাপ কলকাতায় এসে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, শোভনা কিছুই লুকোয়নি। সে ডিভোর্সী এবং তার একটি সন্তান আছে—সবই অসঙ্কোচে জানিয়ে দিয়েছে। শোভনার স্বভাবটি খুবই নরম, তবু তারই মধ্যে কোথায় যেন দৃঢ়তা আছে।

সে যে নিজের অতীত গোপন করেনি, এই অকপটতা ভাল লেগেছিল অবনীশের, তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল।

এমন একটি নম্র ভদ্র স্নিগ্ধ স্বভাবের মেয়ের সঙ্গে কারো যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। সোমনাথের সঙ্গে কেন বনিবনা হলো না, কী কারণে সম্পর্কটা চিরকালের মতো ছিঁড়ে গেল—এ বিষয়ে কখনও কিছু বলেনি শোভনা, অবনীশও জানতে চাননি। বুবুন না থাকলে জানাই যেত না আগেও তার একটি বিবাহিত জীবন ছিল। সোমনাথের সঙ্গে আদৌ তার শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্ক ঘটেছিল,এটা কোনদিন বুঝতে দেয়নি শোভনা। অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে জড়ানো জীবনের কয়েকটা বছর একেবারে মুছে দিয়ে অবনীশের কাছে এসেছিল শোভনা।

বিয়ের আগে শোভনা শুধু জানিয়েছিল, বুবুন যদি মাঝে মধ্যে আসে বা ফোন করে, অবনীশের আপত্তি হবে কিনা। অবনীশ তক্ষুণি জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। শুধু তা-ই না, বুবুন ইচ্ছা করলে তাদের কাছে এসে থাকতে পারে। কোনো দিক থেকে বাধা না এলে বুবুনের সব দায়িত্ব নিতেও যে তিনি রাজী, এটাও আভাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বাধা আসার কথা সোমনাথের দিক থেকে। তাঁর নাম না করেই ইঙ্গিতটা দিয়েছিলেন। অবশ্য এ ব্যবস্থায় সায় ছিল না শোভনার। কেননা বুবুনের ব্যাপারে কোর্টের রায় সোমনাথের পক্ষে।

প্রথম প্রথম বুবুন এলে খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে যেতেন অবনীশ। কিন্তু ছেলেটা পুরোপুরি মায়ের স্বভাব পেয়েছে—তেমনি মধুর, কোমল এবং নম্র। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে চমৎকার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। সেটা বুবুনের গুণে। কোনো কিছু বলেই তাঁকে ডাকে না বুবুন। মায়ের দু'স্বর স্বামীকে কী বলে ডাকা যায়, সে জানে না। অবনীশও অবশ্য জানেন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন, সম্বোধনটা খুবই কৌশলে এবং সতর্কভাবে এড়িয়ে যায় বুবুন। মজাই পান অবনীশ।

বুবুন তাঁর সম্পর্কটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক করে দিয়েছে। তবু কোথায় যেন অল্প একটু জট থেকেই গেছে। সেটা হয়তো থাকত না, যদি তাঁর নিজের একটি ছেলে কি মেয়ে হতো।

কতক্ষণ বসে ছিলেন, খেয়াল নেই অবনীশের। হঠাৎ একটা ভীরু গলার ডাক কানে আসে, 'সাব—'

চমকে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ে শোফার এবং তাঁর নিজস্ব বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।

শোফার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সাব, আপকা তবিয়ত আচ্ছা নেহি?'

শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ান অবনীশ, 'না না, আমি ঠিক আছি।' দ্রুত ঘড়ি দেখে বলে, 'সাতটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। তোমাদের আটকে রেখেছি।' বলতে বলতে এগিয়ে যান। বেয়ারা সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দেয়।

বাড়ি ফিরে অবনীশ খবর পান, একটা ফোন পেয়ে বিকেলে বেরিয়ে গেছে শোভনা। ফোনটা কার তিনি জানেন। কিন্তু সে কোথায় গেছে, সোমনাথের বাড়িতেই কিনা,

এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন।

বেডরুমে গিয়ে অফিসের পোশাক ছেড়ে সোজা বাথরুমে চলে যান অবনীশ। স্নান-টান করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে একটা সোফায় বসতে না বসতেই কাজের মেয়েটি চা এবং খাবার নিয়ে আসে। বাড়িতে থাকলে এসব শোভনাই নিজের হাতে করে।

কাজের মেয়েটি অর্থাৎ কমল বলল, 'বৌদি আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছেন।'

অবনীশের খাওয়ার ইচ্ছা নেই। অন্যমনস্কর মতো চাযেব কাপটা তুলে নিয়ে বলেন, 'কখন ফিরবে, বলে গেছে?'

'না।'

একটু ভেবে দ্বিধান্বিতভাবে এবার অবনীশ জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় গেছে, জানো?'

'না।' কমলা মাথাটা সামান্য কাত করে বলে, 'কিছু বলে যাননি।'

অবনীশ আর কোন প্রশ্ন না করে বললেন, 'খাবারগুলো নিয়ে যাও।'

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কমলা। তারপর ভয়ে ভয়ে বলে, 'খাবেন না? বৌদি শুনলে—'

তার মনোভাব বুঝতে পারেন অবনীশ। তিনি খাননি জানতে পারলে শোভনা কমলার ওপর বিরক্ত হবে, হয়তো বকাবকিও করবে। অল্প হেসে বললেন, 'ভয় নেই। বৌদিকে যা বলার আমি বলব—'

কমলা খাবারের প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে যায়। আর অবনীশ চা খেয়ে দু-তিনটে ম্যাগাজিন নিয়ে বিছানায় এসে আধশোয়া ভঙ্গিতে পাতা ওল্টাতে থাকেন। কিন্তু একটা লাইনও পড়া হয় না। চোখের সামনে অসংখ্য কালো হবফ একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে আছে যেন।

এই ঘরের দেয়ালে শোভনার কয়েকটি ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিযে রাখা হয়েছে। ওয়াশের কাজ করা ছবিগুলো.এক কথায় চমৎকার।শোভনা একজন দুর্দান্ত আর্টিস্ট। আর্ট কলেজের ডিগ্রি আছে তার।

ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে দেয়ালের দিকে তাকান অবনীশ। কিন্তু ছবিগুলো তাঁর কাছে ঝাপসা লাগে। এই শোবাব ঘর, খাট, ডিভান, ফ্যাশনেবল ক্যাবিনেট, জানালার বাইরে রাতের কলকাতার দৃশ্যাবলী—কিছুই যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দূরমনস্কর মতো শোভনার কথাই ভাবতে থাকেন। এখনও ফিবে আসছে না কেন সে?

বাইরে একটা ওয়াল ক্লক হারমোনিয়ামের মতো আওয়াজ কবে বেজে যায়। মিউজিক্যাল ঘড়িটায় যখন দশটা বাজে সেই সময় হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকান অবনীশ। দরজার ফ্রেমের মাঝখানে স্থির একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে শোভনা। তার চোখ লালচে এবং ফোলা ফোলা, চুল উষ্কখুষ্ক, পরনের শাড়িটা আগোছালো। উগ্রভাবে কখনোই সাজে না সে, তার সাজের মধ্যে থাকে রুচির ছাপ। কিন্তু এই মুহূর্তে শোভনার পোশাকে-টোশাকে পবিপাট্য নেই। বোঝা যায় তার ওপব

দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

অবনীশ কয়েক পলক শোভনার দিকে তাকিয়ে থাকেন.তারপর আস্তে আস্তে উঠে আসেন। বলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে—বুবুনদের বাড়ি?'

চোখ নামিয়ে নেয় শোভনা। আস্তে মাথা নাড়ে অর্থাৎ সেখানে যায়নি।

অবনীশ জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে?'

কাঁপা গলায় শোভনা বলে, 'শ্মশানে গিয়েছিলাম।'

'ওখানকার কাজ শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

অবনীশ লক্ষ্য করেন, কথা বলতে গিয়ে শোভনার ঠোঁট দুটি ভীষণ কাঁপছে।

গভীর সহানুভূতিতে স্ত্রীর কাঁধে একটি হাত রেখে তাকে কাছে টেনে আনেন অবনীশ। কোমল স্বরে বলেন, 'ঘরে এস।'

অবনীশের স্পর্শে শোভনার মধ্যে বিপর্যয়ের মতো কিছু ঘটে যায়। স্বামীর বুকে মুখ রেখে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে সে।

স্ত্রীর কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে অবনীশ টের পান, অতীতটা পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি শোভনা। সোমনাথের জন্য তার বুকের কোথাও অনাবিষ্কৃত গোপন একটি দিকও ছিল।

কাগাবগা গীতিকা

মহাশ্বেতা দেবী

[illegible]ক গেলাম চা আর একটা ছোট পাঁউরুটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে মোহিনী বললেন, কাগা বগারে কই। চা দিয়ে গেলাম, পরে যেমুন না শুনি ঠাণ্ডা কইরা [illegible] দিছিল। আরো কই, গেঞ্জি লুঙ্গি যেমুন না কাচে, সাবান দিয়া দিমু।

[illegible] বলেন, তিনি বলতে গেলে মোহিনীর জন্মজন্মান্তরের স্বামী। মোহিনীর [illegible] তিন বছর, তখনিন নাকি তিনি উৎক্রনির মেলায় গলার পুঁতির মালাটি সদানন্দের [illegible] পরিয়ে দেন। ধলেশ্বরী নদীতীরে মাঘের প্রভাতে সে দৃশ্য দেখে এযোজনে [illegible]ড়ি পড়ে যায়। দেখ দেখ। মাইয়া বুঝি অর পূর্ব জনমের বউ, মালাখান কারেও [illegible] না, দিল আমাগো সদার গলায়।

—[illegible]ত কুল দেইখ্যা দিছে গো!

বড়দের কথার মর্ম না বুঝে আট বছরের সদানন্দ মালাটি আবার মোহিনীকেই [illegible]য়ে দেয়। তাতে বুড়িরা অবধি গালে হাত দেয়।

—দ্যাখ দ্যাখ! কলিতে নাকি দৈবী নাই? নাই যদি তয় এমুন বছরকার দিনে...

মহিলা ভাবাবেগে কেঁদেকেটে মোহিনীর মাকে ধরে বলেন, মিস্ত্রিরের বেটি বসুর পোলার গলায় মালা দিল। বয়সেও মিলে। আবাগী লো! তর মাইয়ার বিয়া এহানেই [illegible]।

ছেলের মা একসময়ে বলতে গিয়েছিল, পোলাপানের কাজ দেইখা বিয়া ঠিক হয় নাকি?

কিন্তু মেয়েরা বড় হলাহুলি করে। উৎক্রনির স্নানের মেলায় এ যেন দেবতার [illegible]। কেউ বলে, ফুল ছিটাও! কেউ বলে, চিনির মঠ ভাইঙা এ-ওর মুখে [illegible]। কেউ বলে,জোকার দে গো!

মোহিনী আর সদানন্দ কিছুই বোঝেনি।

কিন্তু অনেক পরে, সদানন্দর যখন বিশ বছর, যখন সে জমিদারের কাছারিতে [illegible] গাঁট গোনে, তখন সে মাকে বলেছিল,বিয়া বিয়া কর কেন? কন্যা আমি [illegible] দেইখা থুছি। আমি দেখছি স্বপনে, তুমি দেখছ চক্ষে। মোহিনীর কথা কই!

বাপও আপত্তি করেনি। মোহিনীর বাবা এই জমিদারেরই আরেক কাছারিতে নায়েব। [illegible], কেরোসিন, চিনি ও কাপড় ছাড়া কিছুই কেনে না।

মা বললে, মাইয়া সাজাইয়া দিব। নাকখান যা চাপা নয়তো মাইয়া সোন্দর। হটর [illegible] হাটে না। ফটর ফটর বাক্য নাই, পাকসাক জানে।

এমনি করেই বিয়ে হয়েছিল। পাড়াপড়শী বলেছিল, এই বিয়া ত অরাই ঠিক কইরা রাখছে। এই বিয়া হইতই।

মোহিনীর এখনো মনে পড়ে, কাঁঠাল কাঠের চাকি-বেলনা থেকে বাসন, কাপড় [illegible], দই, মিষ্টি, ফল, তরকারী, দশটা মানুষ বাঁকে বইতে পারে না এত জিনিস।

জমিদার বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতেও মাছ এসেছিল, শ্বশুরবাড়িতেও। উৎকৃষ্ট ন্যাপ্থলিন গন্ধ তাঙ্গাইল শাড়ি, সিঁদুর মাখানো টাকা।

এখন সে সব আশকেলে বাস কথা। একথা বাড়িতে ফনফনে অ্যালুমিনিয়ামের গলাসে জল খেতে খেতে মোহিনী নিজেকেই বলে, তহন এক গেলাস জল উঠাতে হাত ভারাত। একেক খান বাসন আছিল ফুল কাসার। তেমুন একখান গেলাস আছে তোদের?

কেউ যদি বলে, কাকে বলো?

—কাগা বগারে কই।

স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ আজ ষোল বছর। বাক্যালাপ ওই অলক্ষ্য কাগা-বগাকে সাক্ষী মেনে।

কথা বন্ধ হত না। ছেলেরা হল দেশান্তরী, সেই দুঃখে মোহিনীকে ধরল আপনমনে বকা রোগে। আপন মনে ও বলে যেত কথা। তা নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক ঝগড়া।

সদানন্দ বলেছিল, চল, ডাক্তারের কাছে লই। এমুন বকা ধরছ, মানুষে ভাবে পাগল বা হইলে বুঝি।

মোহিনী জ্বলে উঠেছিল।

সব কি হল তার দোষে? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতে দেশ ছাড়তে সে বলেছিল? সদানন্দের উপযুক্ত ভাগনার হাতে সম্পত্তি বেচাকেনার ভার দিতে মোহিনী বলেছিল? কলোনিতে সবাই উঠল এসে। সকলের অবস্থা ফিরল, মোহিনীর অবস্থা কেন ফিরল না? আর, ছেলেরা দেশান্তরী হল কেন, জবাব দাও?

সদানন্দের মাথা হেঁট।

সম্পত্তি ভাগ্নে বেচেছিল। সদানন্দ তার কথায় ভুলে ব্যবসা করতে যায়। কাজেই ভাগ্নের এখন রানাঘাটে পাকা বাড়ি, সদানন্দ আজও ধুবুলিয়া ছাড়িয়ে এক কলোনিতে।

ছেলেরা লেখাপড়া শেষ না করেই চাকরি পেল, ঘর ছাড়ল। বড়জন চটকলে, ভালই রোজগার করে। বউ, মেয়ে, নাতি নৈহাটিতে বাড়ি।

ছোটটা ছিল বোম্বেটে। এক সময়ে সে বোমা বাঁধত, পয়সা নিত। বাপরে বলত, বিজনেস করত্যাছি।

বোম্বেটে ছেলে ঘরের ট্রানজিস্টর, সদানন্দের ঘড়ি, মোহিনীর কানফুল চুরি করে বোম্বাই পালায়।

সেখানেও সে "বিজনেস" করছে। সে দেশের মেয়ে বিয়ে করেছে। বাপ-মাকে একবার টাকা পাঠিয়েছিল।

ছোট ছেলে ছিল মোহিনীর প্রাণ। সদানন্দ বাসে চেপে কেষ্টনগর যেত, এখনো যায়, কোর্টের সামনে বসে ফর্ম লেখে আর তেমন অজ মক্কেল পেলে জমির মামলার তদারকি করে।

বাপ বেরিয়ে গেলে ছোট ছেলে মাকে স্বপ্ন দেখাত। এমন মন্দ ব্যবসা সে করবে

না। বাপের মতো সজনে ডাঁটা কিনেও ঘরে ফিরবে না। বাবা একেক মক্কেল ধরে বটে! কেসের তদারকি করল, মামলায় জিতল মক্কেল। নামিয়ে দিয়ে গেল একঝুড়ি তেঁতুল, নয়তো একখানা পাটালি গুড়।

—তুই কেমুন বেবসা করবি?

—বাঙাল কথা ছাড়ো তো!

—কয়, মায়ের দুধ আর মায়ের ভাষা!

কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, সেই তখন মোহিনী তার ছোট ছেলেকে যা বলত, এখন দেখ, সরকারই সে কথা দিকে দিকে প্রচার দিচ্ছে। মায়ের দুধ আর মাতৃভাষা দুই সমান সম্মানের।

তা ছোট ছেলের নাম মনোরঞ্জন, বর্তমানে সে নাকি মনোজকুমার। আর বড় ছেলে সুখরঞ্জন এখন শুধুই রঞ্জন।

ছোট ছেলে বলত, ভটভটিয়া চালাব, চোখে কালো চশমা, মানিব্যাগ খুলে তোমায় হাজার টাকা দেব।

—তাই দিস। ঘরখান সারাই। তর বাপেও আর পারে না। এতদিন বাবদ খাটাখাটনি। দ্যাশে তো এমুন...আমিও করাতকলের ঘেস আইনা গুল পাকাইতে পারি না আর।

—পাকাও কেন?

—যা পাই! লবণটা, তেলটা...

কিন্তু মুড়াগাছায় কোন ব্যাপারীর দোকানে বোম মেরে ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে মনোরঞ্জন ওরফে ড্যানি, ওরফে বোম্বেটেকে ব্যাপারী চিনে ফেলে। বিচলিত মনোরঞ্জন একপাল ছাগলের মধ্যে বোমা ফেলে পালায়। এদিক-ওদিক ক'দিন গা-ঢাকা দিয়ে এক রাতে ঘরে এসে শুয়ে থাকে। সকালে ছেলে, ট্রানজিস্টর, বাপের ঘড়ি, মায়ের দুল, সবই হাওয়া হয়ে যায়।

সদানন্দ ছেলের জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে দাবোগাব কাছে কয়েকবাব ও হো হো হো শোনে।

—ও হো হো, আপনার মত সৎ সজ্জন মানুষের ছেলে বম্বেটে হয়ে গেল, ও হো হো, ছেলেকে মানুষ করতে হলে শাসনও দরকার, ও হো হো হো...

সদানন্দ ঘরে এসে বসে থাকে।

আর মোহিনী বিলাপ করে পাড়া জাগায়।

—যাও, কলকাতা যাও! তার ফটো কাগজে দেও। পোলা চইলা গেল, বাপের বুকে বাজে না? সদানন্দ ঈষৎ হেসে বলে, সে তার পথ খুইজা নিছে। আমি সে পথের লাগাল পাইতাম না মনোর মা! অহন খুইজা দেখ, ঘরে কিছু মাল রাইখা গেছে কি না। তাইলে কচু বনে ফালাইতে হইব, ডোবার জলে।

—তার উদ্দেশ করবা না?

—লাভ নাই।

—যাইবা না কলকাতা?

—কেমুন কইরা? বুঝ না তুমি, ধরতে পারলে পুলিসে মারতেও পারে। যেখানে থাকে, বাইচা থাকুক।

—আমার বুক যে পোড়ায়!

মোহিনী সেই যে বকতে শুরু করল, রাতদিন বকত। ছেলে ওকে স্বপ্ন দেখাত গো! দুপুরে বড়ির ঝাল আর ভাত খেয়ে মা ছেলে কত কথা বলত। মোহিনী জানত কথাগুলি অবাস্তব। তবু ভাবতে ভালো লাগত, ঘরদোর নতুন হয়েছে, সদানন্দ আর মোহিনী অত খাটে না। বস্তায় চাল থাকে, তেল-মশলা-লবণ-কেরোসিন!

ছেলে আর স্বপ্ন দুই নিরুদ্দেশ।

ওর ভাবগতিক দেখে সদানন্দ বলেছিল, মাইনষে পাগল বলবে তাই চাও? চল ডাক্তারের কাছে লই।

আধ ঘন্টা মোহিনী যাত্রার নায়িকাদের মতো উচ্চগ্রামে ঝড়ের মতো বকে গিয়েছিল।

—হিন্দুস্তান-পাকিস্তান আমি করছিলাম? দ্যাশ ছাড়তে আমি বলছিলাম? ভাগ্নার হাতে সর্বস্ব ছাইড়া আইলা বা ক্যান্? আইলা যদি, সগলের আবুস্থা ফিরে, আমার কেন এমুন হাল? কি আমার দৈব নির্দাশী বিয়া রে। আইবার সময়ে বাসন-তৈজস, সব ফালাইয়া, অহন কও আমি পাগল। কথা কইলে পাগল হয়?

সদানন্দ কাতর গলায় বলেছিল, আমি সইতে পারি না রে বউ। আমারে তুমি কাছিমকাটা কইরো না। অহন তুমি ছাড়া কেও নাই যে কথা কই, সেই তুমি আমারে আর কত বিঁধবা!

মোহিনী বলেছিল, বেশ! আমার কথায় যদি এমুন দহন, তয় আমি কমু না কথা।

সেদিনই রাতে মোহিনী বলেছিল, মাইনসেরে কই না, কারাগারে কই, ত্যাল ফুরাইছে, আর হেরিকেনডা সারাইতে হইব।

বড় দুঃখে সদানন্দ বলেছিল, উৎকুনির মেলায় আমারে গলায় মালা দিছিল কি কাগাবগা? এই আমি নৌকায় ফিরি কি না দ্যাখতে জামির গাছের নিচে আইয়া পড়ত কি কাগাবগা? এই সেদিনও আমার জ্বর হইতে হেরিকেন নিয়া ডাক্তার আনছিল কি কাগাবগা?

মোহিনী নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, কাগাবগারে কই, এমুনই ভালো। মুখ খুললে আমি থামতে পারি না। বুক হুতাশে পুড়ে। আর কওন বলনের আছে বা কি?

সেই থেকে মোহিনী চুপ হয়ে যায়। সদানন্দ এ ব্যবস্থা ক্রমে মেনে নেয়। এমনি করে ষোল বছর কাটল। সদানন্দও সন্ধ্যায় ফিরে বলে, কাগাবগারে কই। চালের দাম কিন্তুক বাড়ত্যাছে খুব। তা ক্লাবের বীরেন কয়, কাকা। পাঁচ কাঠা রাইখা কি করবেন? দেন তিন কাঠা বেইচা।

—কাগাবগা জানে না, এ কাজ বেআইনী নয়?

—কাগাবগা এও জানে যে, যখন বীরুর নজর লাগছে, জমি ও এমুনি নিতে পারে। অহন তাদের রাইজ্য। যা দেয় হেই লাভ। দেউক, যা হয় দেউক।

—কাগাবগার যা মন লয় করুক। দ্যাশের রাজ্যপাট গেল তাই কিছু কই নাই।

সদানন্দ বলতে পারত, দেশে ছিল বিশ বিঘা জমি, মাটির চারচালা ঘর চারখানা, হাল-বলদ-গাই, যেমন অনেকের ছিল। তাকে "রাজ্যপাট" বলে না।

বরঞ্চ আস্তে বলে, কাগাবগারে কই, চুয়াত্তর চলত্যাছে, আমি আর কতকাল। দুটি পয়সা থাকলে থাকব। ঘরখানি সারিসুরি কইরা নিলে একখান ভারাও দিতে পারে। অরা কইরা নিলে থানাও দেখত না।

মোহিনী বলে, কাগাবগারে কই। টাকা যেমুন পোস্টাপিসে থোয়, আমিও সই দিমু।

—তাই হইব।

বীরু চক্রবাজ ভটভটিয়া চেপে চলে আসে। বড় রাস্তার প্রায় ওপরে জমি। বীরু দোকান করে ছেড়ে দেবে। ওর বাবা এবং ও, এভাবে অনেক জমি সংগ্রহ করেছে। এরা তো বুড়োবুড়ি, ডরপোক মানুষ, ছেলেরা দেশান্তরী। বুড়োটা জানে, এমন জমিও এখানে আট হাজার টাকা কাঠা। তবে তা চাইতে সাহস করবে না।

—কাকা! বলেন কত নিবেন?

—তুমি তো জানই দর।

মোহিনী বলে, ক্যান্? যেমুন দরে বেচলা তোমার দুই কাঠা, তাই দাও। পাল তো ষোলো হাজার দিছে। বীরু হাসিতে গলে পড়ে। এখন কৌতুক করে বলে, কাগাবগা কি বইলা গিছে কাকী? মোহিনী মাথা নাড়ে।

—কাগাবগার কথা, ঘরের কথা। ওই কথা আর কেউর জন্য নয়। টাকা যদি না দাও বীরু, বুড়াবুড়িকে মাইরা সগলটি লইয়া লও। টাকা লাগত না।

—তা কই না কাকী। তয় কাকা-কাকী সম্বোধন। বিবেচনা করতে কই। অত তো পারতাম না। বীরুর হিসেব ছিল পাঁচ হাজার। মোহিনীর জেদাজেদিতে শেষ অবধি ওকে দশ হাজার এক টাকা দিতে হয়। মনুষ্যস্বভাবের নিয়মে, বীরু ওদের চোদ্দ হাজার টাকা ফাঁকি দেয়, তবু নিজেকে মনে হয়, "ঠকে গেলাম গো!"

দিনে দিনেই ওরা পোস্টাপিসে গিয়ে টাকা জমা দেয়। যুগ্ম সাক্ষর। ডাকবাবুও চেনা। এখন মোহিনী বড় ব্যাবুঝ জেদ ধরে।

—কাগাবগারে কই, ঘরখান সারুক।

—কত টাকা লাগব তা কাগাবগা জানে না?

—হিসাব নিছি আমি, দ্যাড় হাজার লাগব।

—কাগাবগা কি পরে কি হইব তা ভাবে না?

—কাগাবগারে কই, বড় ইচ্ছা আস্তা ঘরে থাকি, বড় ইচ্ছা চৈকি নূতন কিনি, বড় ইচ্ছা কাসার গেলাসে জল দেই, জল খাই। সকল হতাশ রাইখা মরলে আবার জনম লইতাম। আর না। হতাশ মিটলে আর জনমাইতে হয় না।

—কাগাবগারে এ কথা কে কইছে?

—কাগাবগারে কই, হরিসভায় কুনোদিন যায় নাই, গেলেই শুইনা আইত। বীরুর বাপের হতাশ আছিল, রেডিওর দোকান দিব। বীরু সেই হতাশ মিটাইতেছে।

—কাগাবগারে কই, হতাশ আমি রাখতাম না।

—কাগাবগারে কই, ঘর সারলে নূতন চৌকিতে লক্ষ্মী বসামু। কুনোদিন ছাওয়ালদের...

—অমঙ্গল হইব না।

—কাগাবগারে কই, কালই যেমুন মলন্দিরে খবর দিয়া তয় কিষ্টনগর যায়। সে জনা পুরানা মিস্তিরি।

"কাগাবগারে কই" কথাটি এখানে সকলে জানে। কিন্তু এ জায়গার মানব মানবীরা খুবই পুরনো। নতুন নতুন মানুষজন দূরে ঘর বেঁধেছে। পুরনো কলোনির মানুষজন তেমনই আছে।

মলন্দি এসে দাঁড়ায়।

—ঘর কি ফালাইয়া নয়া তোলবেন?

—তাই কি পারি?

—আমিই তোলছিলাম। দ্যাখেন, মাটির দ্যাল দিছিলাম বইলা আজও কেমুন...এ দ্যাশে মাটির ঘর দ্যাখলে শোনলে দিন যায়, শক্ত হয়।

—পুরানা টিন দ্যাখ মলন্দি।

—পুরানারও তো...

—দ্যাহ তুমি। বারিন্দা এবার বাড়াইমু।

—ছাওয়ালরা আসব?

মোহিনী হাসেন। বলেন, কাগাবগা ডিম ফোটায়, ছা' পালে, সগল পক্ষীর কথা কই। চক্ষু ফুটল, উড়তে শিখল, তখন পক্ষীর ছা'উড়াল দেয় গো মলন্দি। বাসায় ফিরে না।

মলন্দির মনে হয়, বুড়োবুড়ির শেষ জীবনে শুধু নিজেদের জন্যে ঘর পাকাপোক্ত করতে চাওয়াটা বড় বেহিসেবী কাজ হচ্ছে। কতদিন ভোগ করবেন?

ওর মনের কথা বুঝে মোহিনী বলেন, মনুর বাপ দুঃখ তো কবল কত বৎসর। তোমরা আমাদের গরিবই দেখছ। বলতেও ইচ্ছা যায় না। এক সময়ে ওই মানুষ কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে ঘুমাইছে, মাঘ মাসে সার্জের কোর্ট আর শাল গায়ে দিছে, ভাতের পাতে নিত্য পরমান্ন খাইছে। সগলই-নাও, লও, ঘর দেখ, বুইঝা শুইঝা সারাইয়া বেঙের আধুলি।

—জমি বেইচা মা কত পাইলেন।

—হ, লক্ষ টাকা পাইছি।

—আমারে কত দিবেন?

—সে জনা আসুক। কথা কইয়া লইও।

মলন্দিও নিশ্বাস ফেলে।

—ঘরের বাসন তৈজস তো দেখত্যাছি। ঠাইকরেনের ঘরেও চোর পড়ে না, আমার ঘরেও না। অহন তো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানায়ও কইতরের খাঁচা। আমি কাম পাই না। বীরুবাবুরা ক্লাব ঘরটা বানাইয়া লইল, ছিল যা-ঘর আমি লৈভন কইরা

দিমু। পাকা খুঁটা দিছিলাম, দু'খান পালটাইতে হইব। পুরানা টিন...দেখি সারগাছির বাবু যদি...

বড় আতিপিতি ধায় মলন্দি এদিক-ওদিক। বড় তাড়া দেন মোহিনী। সদানন্দ বর্তমানে বসেন লাটারির টিকিটেব দোকানে। এখন লটারির দিন। মোহিনী কাঠের ঘেঁসের গুল দেন। কেমন করে যেন ওঁদের ব্যবধান ঘুচতে থাকে। মোহিনীর কথাবার্তা যেন অন্য রকম হয়।

—কাগাবগারে কই। চাউলের দাম যখন কম, তখন যদি কিনা থোয়, একখান ঘরে বইয়া তো চাউলই বেচা যায়।

—কাগাবগারে কই, এই বয়সে চাউলের জন্য ঘরে ডাকাত পড়লে ঠেকাইতে পারতাম না।

—তয় খাতা পিনচিলের দোকান দিতে বলি কাগাবগারে। এই বয়সে কিষ্টনগর আর কেন?

—কাগাবগারে কই, ভাইবা দেখুম।

বীরুর দোকান ধাঁ ধাঁ করে ওঠে, উদ্বোধনের দিন সদানন্দের ঘরেও মিষ্টির বাক্স আসে। দোকানের নাম "লালী" এবং সারাদিন সেখানে রেডিও মেরামতির আওয়াজ চলে ও দূরদর্শনে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম দেখতে ভিড় জমে।

মোহিনীর ঘর সারাই হয় ধীরে ধীরে। মলন্দি তার সম্বন্ধীকে নিয়ে আসে এবং এমন সযত্নে ঘরটিকে নতুন চেহারা দেয়, যেন ওরা তাজমহল বানাচ্ছে, যা ও'দের অমর করবে।

দেড় হাজারে হয় না, দু' হাজার মতো লাগে। কিন্তু বারান্দা চওড়া হয়, সেও মাটির দেয়ালে ঢাকা, তাতেও কপাট আছে, খুপরি দুটি জানলা। মাটির দেয়ালই চুনকাম হয়। পুরনো টিন মলন্দি অনেক চেষ্টায় যোগাড় করে।

উঠোনে তুলসীমঞ্চ।

মোহিনী এই প্রথম একটি স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখেন। বড় নবম গলায় বলেন, কাগাবগারে কই। চৈত্রে-বৈশাখে তুলসীতে ঝারা বাধুম। বাবিন্দাব কোলে জবা, গেঁদা, অতসী, দোপাটি, পূজার ফুলে আর অন্যেরবারি হইতে...

সদানন্দ ক্ষীণ হাসেন।

—কাগাবগারে কই, একদিন হরিসভায় শীতল দিক।

—কাগাবগা বলুক, লক্ষ্মী পাতুম, চৈকি।

—আর কাসার গিলাস?

—কাগাবগারে কই। সে হুতাশ আব নাই। ঘর মনের মতো হইছে, সগল হুতাশ শান্তি।

—আর লক্ষ্মী পাইতা?

—আবাইগারা কাছে থাউক, দূবে থাউক, তাগারো যেমুন অমঙ্গল না হয, তাগারো বাপ যেমুন এট্টু শান্তি পায়, আমার সিন্দুর যেন থাকে।

—কাগাবগারে কই। আমার দেহ তো আর বয় না। কিষ্টনগর আইতে যাইতে নাভিশ্বাস! না গেলেও নয়।

মোহিনী ঘরটি নতুন করার পর যেন অপার ক্ষমতাশালিনী দেবী। তিনি অশেষ করুণায় বলেন, হেই দুঃখ বেশিদিনের নয়। কাগাবগা বইলা দিক।

—কাগাবগা কি স্বপ্নাদেশ শুনাইছে?

—কাগাবগা বইলা দিক, হেই কষ্ট বেশি দিনেব নয়।

তুলসীমঞ্চ বাঁধতে বাঁধতে মলন্দি ভাবে, স্বামী স্ত্রী! সরাসরি কথা বলে না কেন?

বউকেও ও শুধোয়। মলন্দি যদিও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত নিভুঁই নিচাষী লোক, তবু ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনে এ একজন নেতা। ভারত-ভূমিকে এ এগারোটি সন্তান উপহার দিয়েছে। করকরে টাকার লোভে অপারেশন না করালে ও আরো ফসল ফলিয়ে যেত। ওর মন কৃষিকাজ জানে না, শরীর জানে।

বউ বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিকই করে। তোমার মত রাত্রিদিন "কই গেলা হলার মা? কই গেলা, ধলার মা, বইলা চেচায় না।

মলন্দির হলা-ধলা-নলা-মলা-রাণী-মেনি-মুচুকুন্দ, এরা সাতজনই ছটকে পড়েছে। শেষের চারজন দোকানে-বাজারে সাট্টার ঠেকে করে খাচ্ছে।

মলন্দি সহসা গভীর জ্ঞানে আলোকিত হয়।

—ঠাইকরেন বুঝি কি পাইছে স্বপ্ন। অহন কথাও কেমুন, সগলডি যেমুন পরিবর্তন। নিত্য "কাগাবগা আয আয়" ডাইকা ভাত ছিটায় উঠানে, আবার সকড়ি মুক্ত করে।

বউ নিশ্বাস ফেলে বলে, পাউক, শান্তি পাউক। দু পোলা থাইকাও নাই, বুড়াবুড়ি বড় কষ্ট পাইছে।

বস্তুত ঘরটি করতে পেরে মোহিনী এক অবাস্তব আত্মবিশ্বাসে ভোগেন। ঘর হবার কথা নয়, হল। পোস্টাপিসে আট হাজার টাকা থাকার নয়,আছে। তাহলে সদানন্দ যাতে এখানে কোনো কাজ পান, তাও হবে। মনুর বাপ একশত টাকাই আনুক, আমার ঘেঁষের গুলের তো বান্ধা খরিদ্দার। বারিন্দার এক কোনা ভইরা রাখছি। আমরা চালাইয়া নিব অরি মধ্যে। এই বয়সে কিষ্টনগর! বাসে তো লাচাইতে লাচাইতে যায়। অই হাড় ক'খান। দেহে আছে কি!

বীরু চট্টরাজ এম-আর-শপ, কেরোসিন, সব কিছুর ডীলার। তদুপরি সে পঞ্চায়েত প্রধানকে পরিচালনা করে।

তার কাছেই যান মোহিনী।

—বীরু! তোমার লিগ্যা আমার ঘর হইল! আজ জল পড়ে, কাল সাপ পড়ে, সে হইতে মুক্তি পাইলাম, অহন...

—কি, বলুন?

—মনুর বাপরে একটা দোকানের কামও যদি দিতা।

—আপনি চাইলেই হয়।

—চাইত্যাছি তো।

—কাকার বয়সে-বসতে পারে দোকানে..."লালী"তেই বসুক না, আমি তো লটারির টিকিটের দোকানও করুম "লালী লটারি"। তা কাকিমা, টাকা ফেলেন কিছু, কাম হইব।

—টাকা কোথা, বীরু?

—আরে। ডাক ঘরে থোন নাই?

—সেই টাকা!

—সঙ্গে লইবেন না কি?

বীরু খুব হাসে। যাক্, কৃষ্ণনগব যাক আর আসুক। বুড়ো মরলে বুড়িব কাছ থেকে...মোহিনীও হাসেন।

—না বীরু! সঙ্গে আমরাও লইব না, তুমিও লইবে না। যাউক গা, বইলা গেলাম, দেইখ।

—দেখুম অবশ্যই। কথা দিতে পাবত্যাছি না। যুবাবাই ব্যাকার, বুড়াদেব কাম কি হয়? আমিদেখেন না, কতগুলানবে কামে লাগাইছি। আমার কাববাব, অরাও কইরা খাউক।

—হ্যাঁ বীরু, চলি।

সন্ধেবেলা আদা-চা আর মুড়ি নামিয়ে দিযে মোহিনী বলেন, কাগাবগাবে বলি, গরম গরম খাউক। আর বলি, কিষ্টনগরে যাওন ছাইবা দিক। বাবিন্দায় বইসা গুল বেচুক। আমি মলন্দির এট্টা পোলারে পাইলে ডবল গুল দিতে পারি।

সদানন্দ জবাব দেন না। চা-টুকু তারিয়ে তারিযে খান। তারপব বলেন, কাগাবগাবে কই, নতুন চৈকি আনতাম কবে?

—কেন, বুধবার?

—তয় বুধবার। কাগাবগাবে কই, কিষ্টনগর যামুই না ওই মাস হইতে। কোম্পানি বলছে, হপ্তায় একবার আইয়েন, টিকিট লইয়া যান। আপনার হাতেব টিকিটে পাঁচ হাজার টাকা, দুই হাজার টাকা, দু'বার উঠছে। ঘবে বইসা বেচেন।

মোহিনী অবাক হয়ে যায। তিনি যা চান তাই হচ্ছে?

—কাগাবগারে কই, এই বুধবারই আনুক।

বুধবারই নতুন চৌকি আসে। বাবদোলের মেলায কেনা লক্ষ্মী, কাঠেব পেঁচা, মৃতা শাশুড়ীর পায়ের আলতা ছাপ, সকলেবই জায়গা হযে যায। জীবনে এই প্রথম, পোকায় কাটা তসর পরে মোহিনী প্রতিবেশিনীদেব ডেকে আনেন। লতুন চৈকিতে লক্ষ্মী বসাইলাম। যাইয়েন দিদি। মায়েব একটু রান্না ভোগ দিমু, গাঙ্গুলী বউ রান্‌ব।

জমি বেচা, ঘর সারানো, ইত্যকার কারণে ঈর্ষায় জ্বলে থাকা প্রতিবেশিনীরা বলেন, যামু দিদি। সদানন্দ বিষ্যুৎবার আর বেবোন না।

—কাগাবগারে জিগাই, দেহগতিক ভাল তো?

—কাগাবগারে বলি, কেমন জানি লাগে।

মোহিনী কপালে হাত রাখেন। না, জ্বব নয়।

—কাগাবগারে কই। আজ শুইয়া থাউক। কাল তারে লইয়া যামু ডাক্তারের কাছে।

—কাগাবগা বলুক, ডাক্তার দেখানোর কি হইছে?

—কাগাবগারে কই, আজ শুইয়া থাউক। বিশ্রাম তো হয়ই না। বয়স অহন বাড়ত্যাছে।

—ধইন্য কাগাবগা! বাড়ির নামই হইছে কাগাবগার বাড়ি। তারা নাকি রোজই খাইয়া যায়।

—কাগাবগারে কই। তাগারো নাম লইতেছি লক্ষবার, পাতের ভাত এক মুষ্টি।

—কাগাবগারে কই, পুজার যোগাড়ে যাউক।

বড় সুন্দর পুজো হয়। সস্তা ধূপকাঠির গন্ধে, প্রদীপের আলোয়, পুরনো লক্ষ্মীর মুখ বড় প্রসন্ন দেখায়।

গাঙ্গুলী বউ বলে, এবার ইলেকট্রিক নিন মাসিমা।

—অনেকটি টাকার কাম মা।

—কিসের টাকা? সামনে পোল। শুধু তার টানবেন।

গাঙ্গুলী গিন্নি বলেন, পুজোর বাসনও কিনুন দিদি। জমি বেচলেন, ঘর সারালেন, টাকা রেখেছেন, অমন ফঙ্গবেনে বাসনে লক্ষ্মী পুজো হয়? আমি তো স্টীলের বাসন কিনেছি।

মনোরঞ্জনের বাল্যবন্ধুর মা বলেন, এই তো বেশ। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা, কথায় বলেছে।

মোহিনী নম্র হেসে বলেন, যে যেমন পারে দিদি।

সদানন্দও পিছনে বসে পুজো দেখেন, প্রসাদ খান। রাতে শুয়ে শুয়ে বলেন, কাগাবগারে কই, খিচুড়ি যেমুন দ্যাশের মতো খাইলাম। বড় ভালো পাক করছে বউটা।

মোহিনী বলেন, কাগাবগা জানি আরেক জনরে ঘুমাইতে বলে। আমারও ঘুম ধরছে মা! দেহ যেমুন সাপের বিষে অবশ।

—তয় ঘুমাক।

মোহিনী ঘুমে ঢলে পড়েন। কি ঘুম, কি ঘুম! যেন লোহার বাসরে বেহুলার চোখের কালঘুম। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বেহুলার কথা মনে হল কেন?

বেহুলার ঘুম কখন ভেঙেছিল?

মোহিনীর ঘুম ভেঙেছিল, গোঙানির শব্দে। লাফিয়ে মশারি তুলে নেমে হ্যারিকেন উসকে দেখেছিলেন সদানন্দ বুকে হাত রেখে গোঙাচ্ছেন। কাকের ডাকে বুঝেছিলেন কাকভোর। উতলা, বিহুল মোহিনী বলেছিলেন, কাগাবগারে কই, কোথায় ব্যাদনা? অমন করে ক্যান্?

তারপর দরজা খুলে বেবিয়ে "লালী" দোকানের পাহারাদারকে ডেকেছিলেন। তারপর ছুটেছিলেন ডাক্তারের বাড়ি। শীঘ্র চলেন গো ডাক্তারবাবু! সে মানুষ জানি কেমুন করত্যাছে।

ডাক্তার আসতে আসতে পাশের বাড়ির লোকজনও এসে পড়ে। মোহিনী বলেন, দ্যাখেন, দ্যাখেন ভাল কইবা।

তারপর ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন, কাগাবগাবে কই না, তোমারে কই, শুনত্যাছ? কথা কও না কেন? কাবে খুঁজ?

ডাক্তার বলেছিলেন, সবে যান, দেখতে দিন।

মোহিনী মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন।

—এ রকম ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক...

কার কথা বলছে ডাক্তার?

—প্রেসার দেখাতেন না?

—একবার দেখাইছিল।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। ঘবের চাবদিকে তাকান। তাব পরে বলেন, সঙ্গে কেউ আসুন।

—কেন?

—সার্টিফিকেট দেব। কাল কি খেয়েছিলেন?

—ঠাকুরের ভোগ..

ডাক্তাব মাথা নাড়েন।

—প্রেসার হঠাৎ বেড়ে, না কি বাড়ছিল

—সে নাই?

সবাই খুব বিব্রত, অপ্রস্তুত।

গাঙ্গুলী গিন্নী বলেন, পুণ্যবান গো। পড়ে থাকলেন না, সেবা নিলেন না। কেমন নিমেষে...

মোহিনী এখন হা হা করে কেঁদে বসে পড়েন।

—আমি কেন বা নিয়ম ভাঙলাম? কাগাবগারে মধ্যস্থ বাইখা কথা কই কত কাল, কেন সে কথা ভোললাম? কেন বা মধ্যস্থ রাখছিলাম? কাগাবগা রে। তাবা ত উডাল দিবি, ডাইকা ফিরবি, তদের মাঝখানে রাইখা আমি কাব লগে কথা কমু? কাব লগে?

সকলে মনে করে এটা শোকেব প্রলাপ। কেউ পাড়াব ছেলেদেব ডাকতে যায়। ঘব ভরে যায় মানুষে।

—কাগাবগাব পাঁচালী শ্যাষ কইবা দিলে, আমি কি লইযা থোলব?

এ কথাব উত্তর হয না। সকাল হয।

পাখপাখালি ডাকে।

মোহিনী কানে হাত চাপা দেন।

—আর ডাকিস না রে কাউয়া। কাগাবগা ধইবা বলাব মানুষ চইলা গিছে, অহন তব ডাক আমারে বিন্ধে।

কাক ডেকে চলে, ডাকাই তার কাজ।

কাগাবগার গীতিকা এমনি কবে ফুরায়।

অথচ সকালটি বড় সুন্দব ছিল।

মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ

দিব্যেন্দু পালিত

দু'দিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর আজ বিকেলে কৃষ্ণা হঠাৎ অফিসে ফোন করল। নিজের চেম্বারে আমি তখন একটা জরুরী ড্রাফট নিয়ে ব্যস্ত। মন ভালো না থাকায় যা ভাবছিলুম ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলুম না। সামনে স্টেনো ব'সে, ওর চুল থেকে শ্যাম্পুর গন্ধ উড়ে এসে নাকে লাগছে, চোখ নামিয়ে নোটবুকে আলতো পেনসিল ঠুকছে মেয়েটি—এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

খুব স্বাভাবিক কারণে আমি বিরক্ত বোধ করলুম। কাজে বসার আগে অপারেটরকে ব'লে দিয়েছিলুম ফোনটোন এলে রিসিভ কোরো না, ব'লে দিও, নেই। তা সত্ত্বেও লাইন দেওয়ায় ক্ষুণ্ণ হয়ে একটা ধমক দিতে যাব, ওদিক থেকে মিহি গলায় ক্ষমা চেয়ে অপারেটর বলল, 'ইট্‌স্ ফ্রম ইওর ওয়াইফ, স্যার।'

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না, 'হ্যালো' বলতে সময় নিলুম। কৃষ্ণা কেন! দু'দিন কথাবার্তা বন্ধ থাকার পর এমন কি জরুরী দরকার পড়ল ওর, এখনই যে জন্যে ফোন করতে হলো। তেমন কিছু বলার থাকলে ও বাড়িতেই বলতে পারত। কারণ, খুব ভালো করেই জানে কৃষ্ণা, সব কিছুর পরেও আমি বাড়ি ফিরি; ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কর্তব্য বা করণীয় যা-কিছু সবই করি। ও স্বীকার না করুক, আমি তো জানিই আমার মধ্যে একটা ভালো মানুষ আছে, এখনো বেঁচে আছে!

এইসব চিন্তা সত্ত্বেও আমি কেমন কাতর হয়ে পড়লুম। যতো অসময়েই হোক, কৃষ্ণা আমার স্ত্রী, আমাকে ফোন করছে ভেবে খুশিই হলুম আমি। আমার খুব লোভ হলো কৃষ্ণা কী বলে শুনি।

এরপর আমাদের কথাবার্তার ধরন দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কী-রকম আছি।—

'হঠাৎ ফোন করতে বাধ্য হলাম।'

'বলো!'

'তোমার গাড়িটা কি এখন পাওয়া যাবে? পেলে ভালো হয়।'

'হঠাৎ!'

'নিজের দরকারে বলছি না। মিসেস নন্দী চাইছিলেন ঘণ্টা তিনেকের জন্যে। ওঁদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'এভাবে বলছ কেন। তোমাকে কি দিই না।'

'পারবে কি না সেটাই বলো?'

'আমি তো ফিরবই কিছুক্ষণের মধ্যে। ভেবেছিলুম তোমাকে নিয়ে একবার নার্সিং হোমে যাব। ন'কাকার অপারেশন—'

'তাহ'লে পারবে না?'

'হ্যাভ পেসেন্স।' আমি প্রায় চিৎকার ক'রে বললুম, 'তুমি কী ভাবো, কৃষ্ণা, আমি একটা...'

ওপাশ থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার কঠিন ধাতব শব্দ এলো। শব্দটা কিছুক্ষণ আমার কানের পর্দায় লেগে থাকল, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল আমার মাথায়, আমার শরীরের সর্বত্র। অপমানে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে ফোনটা নামিয়ে রাখলুম আমি।

জুলি তখনো চোখ নিচু ক'রে আমার সামনে ব'সে রয়েছে। কৃষ্ণা নামটি ওর খুব চেনা। একবার অসুখে প'ড়ে আমি ক'দিন শয্যাশায়ী ছিলুম; সেই সময় অন্যান্যদের মতো জুলিও মাঝে মাঝে আমার খবর নিতে যেত। কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করত। একদিন ওর মুখে 'কিস্‌নাডি' শুনে মনে মনে খুব হেসেছিলাম আমি। সে প্রায় চার পাঁচ বছর আগেকার কথা।

আপাতত আমার গলার স্বর শুনে জুলি নিশ্চয়ই বুঝেছে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং আমার এই ক্ষোভের কারণ কৃষ্ণা ছাড়া আর কেউই নয়। ফলে লাজুক ও নম্র মেয়েটিব মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। আমার ব্যাপারে ও খুবই লজ্জিত।

রাগে ও উত্তেজনায় আমার কানের পাশে শিরা দবদব করছিল। সহজ হবার জন্যে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দেশলাই জ্বালালুম, আগুনের শিখায় অসাবধানে নখ পুড়ে গেল আমার। আমি পারলুম না, চেষ্টা সত্ত্বেও একাগ্রতা আনতে পারলুম না। ড্রাফ্‌টের প্রথম অংশটা ততোক্ষণে ভুলে গেছি। পরবর্তী বিষয় সম্পর্কেও কিছু মনে পড়ছে না। সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আরো বেশি বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্যে ছুটি দিলুম জুলিকে। জুলি চ'লে যাবার পর বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলুম। বেয়ারা এলে স্বাভাবিক অথচ বিরক্ত গলায় বললুম, 'দ্যাখো তো হে, রতন ড্রাইভার আছে কি না। থাকলে বলো আমাব গাড়িটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে। এই নাও চাবি। আর, হ্যাঁ, শোনো, আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকো।'

আমি জানি, বাধ্য ও বশংবদ বেয়ারা এক্ষুণি আমাব হুকুম তামিল কববে। ওরা আমাকে চেনে, ওরা সকলেই আমার কদর বোঝে, তাই আমার কোনো কথাতেই মাথা চুলকায় না। যতোই দেরি হোক বা ছুটোছুটি করতে হোক, ট্যাক্সির দুর্ভিক্ষেব সময়ও ও ঠিক আমার জন্যে ট্যাক্সি ধ'রে আনবে। ঘবে যেমনই থাকি না কেন, বাইবে আমি খুব সুখী। এই বয়সেই আমার কপালে কতগুলো অবাঞ্ছিত ভাঁজ পড়েছে, খুঁটিয়ে দেখলে যে ঠোঁটের পাশে কুঁকড়ে-ওঠা মাংস চোখে পড়ে, বা, চোখের কোলে বিষণ্ণতাব ছাপ, ওপরওয়ালারা সেগুলোকে অতিবিক্ত পবিশ্রমেব ফল বলেই জানে। আমাকে খুশি কবার জন্যে টপ-টু-বটম এখানে সকলেই সদা তৎপর। ফলে ট্যাক্সি আসবেই, আমি উঠে বসব। তারপর মন থেকে রাগ ও অপমান সম্পূর্ণ মুছে ফেলাব জন্যে প্রায়ই যা ক'বে থাকি, আজও তাই করব।

ভাবতে ভাবতেই ট্যাক্সি এসে গেল। আমি উঠে পড়লুম। ট্যাক্সির পিছনের নরম গদিতে হেলান দিয়ে ব'সে চতুর্দিকের হট্টগোল, ট্রাম কি বাসের শব্দ এবং শশব্যস্ত ছুটোছুটির ওপর চোখ বুলিয়ে এ-সবের মধ্যে আমি কোথায় আছি, আদৌ আছি কি না, বা থাকলেও কেমন আছি—এক মুহূর্তে সব কিছু পরখ ক'রে নিলুম। আমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা নিঃশ্বাস হৈ-চৈ ক'রে উঠল। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। তখন চোখ বন্ধ ক'রে, গতি আগলে, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আমি ভাবলুম, আমি নায়ক, আমার

দুঃখটা বড়োই আধুনিক, আজকের যে-কোনো লেখক আমাকে নিয়ে দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিকে গল্প লিখতে পারে।

এমন সময় ঝাঁকুনি খেয়ে ন'ড়ে বসলুম আমি। হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে। ট্যাক্সিওলা বোধহয় ফাঁক তালে বেরিয়ে যাবাব মতলবে ছিল, পারেনি, জেব্রা ক্রশিংয়ের প্রায় আধা-আধি ঢুকে পড়ে থেমে গেছে। আমাব সামনে দিয়ে মানুষের অবাধ পারাপার, ট্যাক্সিটার অনধিকার প্রবেশ কেউ কেউ হয়তো তেমন সহ্য করতে পারছে না, ভুরু কুঁচকে দেখে নিচ্ছে আমাদের। আমায় দোষী কোরো না, বললুম মনে মনে, দু'চোখ বন্ধ ক'রে আমি এতোক্ষণ গতি আগলে রাখার চেষ্টা করেছি। খুব ইচ্ছে ছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব, সুখী দম্পতির মতো নাসিং হোমে দেখতে যাব ন' কাকাকে। হলো না। ফলে এখন আমি খুব আলাদা, সকলের চেয়ে আলাদা। ট্যাক্সিতে ব'সে আছি বলেই দুর্দান্ত সুখী নই। আমি জানি বাড়ি ফেরার চেয়ে বড়ো সুখ এই মুহূর্তে আর কিছুতে নেই। এইসব ভাবনার মধ্যে দেখলুম একটি পুষ্ট যুবতী এক যুবকের গায়ে গা লাগিয়ে রাস্তা পার হতে হতে ঈষৎ ঝুঁকে তাকাল আমার দিকে, আলগোছে হাত তুলে নমস্কার কবল যেন। আমিও মাথা নাড়লুম, কিন্তু মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলুম না। ওবা দূরে, ময়দানের ভিড়ে মিশে যেতে মনে পড়ল হঠাৎ, মেয়েটি ক'দিন আগেই ঢুকেছে আমাদের অফিসে। ইন্টারভিউয়ে অত্যন্ত সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে ঘেমে উঠেছিল—কেমন মায়া হওয়ায়, প্রায় জেদেব বশেই আমি ওকে পাঁচজনেব একজন মনোনীত করেছিলুম। আমার ইচ্ছে হলো, মানে খেয়াল হলো, ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করি ওকে, তুমি সেদিন মিথ্যে বলেছিলে কেন?

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতে আমি আবার মেয়েটির কথা ভাবলুম। কে কে আছে এর উত্তরে মেয়েটি বলেছিল বাবা, মা ভাই বোন। কিন্তু তোমাব যে একজন প্রেমিক আছে, যাকে পেলে বাবা-মা-ভাইবোনকে অনায়াসে ভুলে থাকতে পারো, ছুটির পব গায়ে গা লাগিয়ে হেঁটে যাও ময়দানেব দিকে, সে-কথা তো বলোনি। ভয় পেয়েছিলে? না কি লজ্জা! পবে মনে হলো কী আবোল-তাবোল ভাবছি, এ-সব কেউ বলে নাকি! ববং সুযোগ পেলে একদিন মেয়েটিকে ডেকে বলব, প্রেমিক সঙ্গে থাকলে কাউকে নমস্কার করার দরকাব নেই, মাথা উঁচু কবে হাঁটবে।

বাধ্য হয়েই নিজের সঙ্গে এই সব বগড, বসিকতা কবছিলুম আমি। আসলে আমি একটা কিছু ধরতে বা ভুলতে চাইছিলুম। ট্যাক্সিটা বাব বাব বাধা পাচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম।

ট্যাক্সি থামল। ভাড়া মিটিয়ে আমি বাবেব দিকে হাঁটি। আর একটু, আর একটু; আমাব ভিতরেব আমি ব'লে উঠল, ধৈর্য ধবো, আব একটু পবেই ভুলে যাবে বিকেলে কে তোমাকে ফোন করেছিল, তোমাব স্মৃতিতে ফোন-রিসিভার নামিয়ে রাখাব বিশ্রী, ধাতব শব্দ পীড়ন করবে না আর।

ভিড় কাটিয়ে বারের সিঁড়িতে পা দেবো, হঠাৎ আমার জামার হাত ধ'রে কে যেন টানল। দু'দণ্ড চোখকে বিশ্রাম দিলুম আমি।

'আরে লাটুদা। কোথায় যাচ্ছেন।'

দেখি মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে, চিমটি কাটার মতো ক'রে ওর ফর্সা নিটোল আঙুল টেনে রেখেছে আমার সার্টের হাতা। ওর পাশের কিশোরীটিকেও দেখলুম। মুন্নির চেয়ে বয়সে কিছু বড়োই হবে, যুবতী হতে আর দেরি নেই। ওর পাশে বলেই মুন্নি আমার চোখে তীব্র হয়ে ধরা দিল।

'মুন্নি যে!' অবাকভাব কাটিয়ে আমি হাসলুম। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'এই তো, সিনেমা দেখতে।'

দাঁত বের ক'রে হাসল মুন্নি। আমি বুঝতে পারলুম না ওর পাতলা ঠোঁটের রঙটুকু ওর নিজস্ব, না ন্যাচারাল কালার ব্যবহার করেছে ও। দ্বিতীয়টি ভাবতে ভালো লাগল না। কতো বড়ো হয়ে গেছে মুন্নি। মনে করার চেষ্টা করলুম শেষ কবে দেখেছি ওকে। নীলার বিয়ের সময় কি? সেও তো দেড় দু'বছর আগের কথা। না, অতো দিন নয়, অতো দিন নয়।

'গীতশ্রী আমার বন্ধু।' মুন্নি ওর বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'আর এই লাট্টুদা।'

লাট্টুদা! নামটা মনে মনে উচ্চারণ করলুম, লাট্টুদা, লাট্টুদা। কতোদিন পরে শুনলুম। নামটা পুরনো অথচ মনে হচ্ছে যেন নতুন শুনছি। মুন্নির কণ্ঠ আমার কানে মধু বর্ষণ করল। হাত বাড়িয়ে আমি ওর ঘাড়ের কাছে চুলের গোছা নেড়ে দিলুম।

'মুন্নি, খুব ফাজিল হয়েছ!'

'দিলেন তো নষ্ট ক'রে!' আদরে কাঁধ ঝাঁকাল মুন্নি, চোখ ফিরিয়ে চুল দেখল। ওর বান্ধবী বোধহয় আমার সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল। সত্যিই তো, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা ফুটপাথ। বলল, 'মুন্নি, আমি চলি রে। কাল দেখা হবে।'

'কেন!' মুন্নি প্রথমে বলল তারপর দূরে তাকিয়ে কী দেখল যেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসল। 'আচ্ছা, যা। সোজা বাড়ি যাবি।'

মেয়েটি দাঁড়াল না। মুন্নির দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমি দেখলুম দূরে লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে প্যান্ট-পরা টেরিমাথা যে-ছেলেটি এতোক্ষণ আমাদের দেখছিল গীতশ্রী তার সঙ্গ ধরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মুন্নি, তুমি বাড়ি যাবে কি ক'রে?'

'কেন বাসে!' মুন্নি অবাক ভাব দেখাল, 'যাবেন আমাদের বাড়ি? চলুন না? মা প্রায়ই বলে। আপনি কৃষ্ণাদি কেউই তো আজকাল যান না!'

'তোমার মা ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা?'

পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন ধাক্কা দিল মুন্নিকে। ইচ্ছে করেই। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মুন্নি আমার খুব কাছে সরে এলো। হাত বাড়িয়ে আমি ওকে আমার গায়ের কাছে টেনে নিলুম। ভাগ্যিস লাগেনি! আমি দেখেছি, গুঁতোটা জোরেই মেরেছিল, লাগতে পারত। মুন্নির হাড় বড়ো কচি।

'চলো।' ফুটপাথে দাঁড়ানো ভালো নয় ব'লে আমি হাঁটার চেষ্টা করলুম, 'তোমাকে

কি বাসে তুলে দেবো? বড়ো ভিড় যে এখন! তুমি যাবে কি করে!'

'আপনি কোথায় যাবেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুন্নি।

'কেন, তুমি কি একটু থাকতে পারবে আমার সঙ্গে? তোমাকে পেয়ে খুব ভলো লাগছে? থাকবে? দেরি হয়ে যাবে না?'

'আপনি আমায় পৌঁছে দেবেন? বলব, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি গেলে মা খুব খুসি হবে!'

'বেশ, পৌঁছে দেবো।'

'তাহ'লে একটা পাইন অ্যাপেল খাওয়ান!'

মুন্নির চোখে চোখ পড়তেই আমার খুব হাসি পেল। হাসি চাপবার কোনো চেষ্টাই করলুম না আমি। মুন্নি যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছে, রাগবে কি হাসবে ভেবে পেল না। ঈষৎ ভুরু তুলে বলল, 'হাসছেন যে বড়ো?'

'এমনি। তুমি আমাকে এতো প্রশ্ন কোরো না।' একটু থেমে আমি বললুম, 'শুধু পাইন অ্যাপেল খাবে? আর কিছু না? চলো, আমার খুব খিদে পাচ্ছে। তুমি খেলে আমিও খাব।'

মুন্নি দু'পা পিছিয়ে পড়েছিল। খুব দ্রুত হেঁটে এসে অনুযোগের গলায় বলল, 'এতো তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন! বাব্বা, কী তাড়া! আমি পারব না ব'লে দিচ্ছি।'

'এই নাও। আমি আস্তে হলাম।'

মুন্নির সুবিধের জন্যে আমি পা টিপে হাঁটতে লাগলুম। গরম লাগছিল। জুতোটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে হলো। কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। আমি জানি, এখন আমার পাশে মুন্নিকে খুব বেমানান লাগছে। বয়স যতোই হোক, আমার কপালে পরিশ্রমের ভাঁজ, আমার চোখেব কোলে স্পষ্ট বিষণ্ণতা, আমার লম্বা ভারী শরীর আমাকে বয়স্ক ক'রে তুলেছে। মুন্নির কতো হবে। চোদ্দ কি পনেরো বেশি হ'লে ষোল। যে কেউ ওকে আমার মেয়ে বা ছোট বোন ভাবতে পাবে। এই চিন্তায় আমার মনের ভিতর একটা আবেগের আলোড়ন শুরু হলো। এখন আমি খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলুম।

'চলো মুন্নি, এই দোকানটায় ঢুকি। এখানে খুব ভালো আইসক্রীম পাওয়া যায়।'

'ওঃ, লাভলি!' মুন্নি হ্যাংলার মতন মুখ ক'রে বলল, 'আপনি কি খাবেন? দো পেঁয়াজি?

শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠলুম আমি। মুন্নি ভুরু কোঁচকালো, 'হাঁসছেন কেন। আমাকে খুব হ্যাংলা ভাবছেন নিশ্চয়। তাহ'লে কিন্তু যাব না আপনার সঙ্গে।'

'না চলো। তোমাকে আমার খুব দরকার এখন।'

'কেন?'

আমি চুপ করে থাকলুম। কেন-র উত্তর আমার জানা নেই।

আইসক্রীম খেতে খেতে মুন্নি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন দরকার বললেন না তো। কি করবেন আমাকে নিয়ে?'

'অনেকক্ষণ আটকে রাখব। তোমার কি খারাপ লাগছে?'

'নাঃ। খুব ভালো লাগছে।' মুন্নির ঠোঁটের কোণায় আইসক্রীমের দুধ লেগে আছে।

খুব আস্তে আঙুল বাড়িয়ে আমি সেটা মুছে দিলুম। ওর নরম শরীরের হাল্‌কা সুবাস আমার নাকে লাগলো। মনে পড়ল, ওর অন্নপ্রাসনের দিন ওকে কোলে নিয়ে আমি একটা ছবি তুলিয়েছিলুম। ছবিটা এখনো আমার অ্যালবামের মধ্যে। মুন্নি এখন শাড়ি পরে, একা ম্যাটিনী শোয়ে সিনেমা দেখতে যায়। ভাবতেই কেমন অবাক লাগে!

'আচ্ছা, লাট্টুদা—', যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ছে এইভাবে চোখ তুলে আমাকে দেখল মুন্নি, 'আপনি বুঝি মদ খান?'

'কেন!'

'তাহ'লে ওই দোকানটায় ঢুকছিলেন কেন!' হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট মুছল মুন্নি। 'ওটা তো মদের দোকান। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাবা একদিন ওখানে ঢুকেছিল। বাবাও তো খায়।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়লুম। মনে হলো এই প্রশ্নটা আমার সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আমি জানি না, ব্যাপারটা মুন্নি কোন চোখে দেখবে। যদি খারাপ ভাবে! না, মুন্নিকে আমি আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে দেবো না। কৌশলে এড়িয়ে গেলুম আমি।

'তুমি একা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে কেন? ভয় করে না?'

'একা!' অবাক চোখে দেখল আমাকে মুন্নি। 'আহা, একা কেন হবে! ওই তো গীতু ছিল।'

'ওই ছেলেটাও বুঝি সঙ্গে ছিল?'

'কোন ছেলেটা!' এক পলক আমার চোখে চোখ রেখে কী ভাবল মুন্নি। তারপর হেসে ফেলল। 'ওঃ, আপনি দেখে ফেলেছেন বুঝি! ও দীপকদা, গীতুর লাভার। বিচ্ছিরি!'

'কে!'

'ওই ছেলেটা। অ্যালবার্ট কাটে, পয়েন্টেড শু পরে। ওই তো রোগা, প্যাংলা চেহারা। আমার একদম ভালো লাগে না!'

'তোমার কোনো লাভার নেই?'

'যাঃ!' মুন্নির চোখেমুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। ও কেঁপে উঠল অল্প, একটু ন'ড়ে বসল। ওর গলার পিছনে সোনালি রোমগুলো আমার চোখে পড়ে, সদ্য গজিয়ে-ওঠা পাখির রোমের মতো ফুরফুরে, ইচ্ছে হলো উড়িয়ে দিই ফুঁ দিয়ে। কিন্তু বুঝতে পারছি এখন এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ও আরো নুয়ে পড়ে। বড্ডোই সরল এই মেয়েটা, কেমন অনায়াসে সব কথা বলে ফেলে একটুও দ্বিধা না রেখে।

মুন্নি চোখ তুলল না অনেকক্ষণ, আইসক্রীমের প্লেটে গলা দুধের দিকে তাকিয়ে থাকল। মজা করার জন্যে টেবিলের ওপর রাখা ওর হাত, হতের বালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমি বললুম, 'মুন্নি, আমি তোমার লাভার হতে পারি না? দ্যাখো, আমি টেরিও কাটি না, পয়েন্টেড শু-ও পরি না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না?'

'যাঃ!' সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক পলক দেখে মুন্নি হেসে ফেলল, 'তা কী করে হয়! আপনি তো লাট্টুদা!'

'দোষ কি!' আমি বললুম, 'দীপকদা লাভার হতে পারে লাট্টুদা কেন পারে না!'

'জানি না বাবা!'

ছুট করে জবাব দিয়ে খানিক কী ভাবল মুন্নি। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা মুখের ভিতর পুরে দিয়ে, দাঁতে নখ কাটতে কাটতে আড়চোখে দেখল আমাকে।

'আপনার তো কৃষ্ণাদি আছে! আপনি কোন দুঃখে আমার লাভা্র হবেন!'

মুন্নি আমার ঠিক সেই ব্যথার জায়গাটায় ঘা দিল। সেই নাম উচ্চারণ করল, ও জানে না, যে-নাম ভুলবার জন্যে আমার মূল্যবান সময়, আমার ভয়ঙ্কর গম্ভীর মন আমি মুন্নির কাছে সমর্পণ করেছি। মুন্নি জানে না এই মুহূর্তে আমি কি ভীষণ অসহায়, আমি যা বলছি, সবই বলছি বানিয়ে। বলছি জোর করে। আমার কোনো কথাই কথা নয়।

'কী হলো! লাট্টুদা, আপনি ঘামছেন কেন? এবার যাবেন তো?'

'যাব।' নিশ্বাস সামলে আমি বললুম, 'বড্ড গরম লাগছে, মুন্নি। তুমি টাই খুলতে পার? দাও না খুলে?'

মুন্নি দ্বিধা করল না। আমার বুকের কাছে মাথা নিয়ে এসে টাইয়ের নট্ খোলার জন্যে হাত বাড়াল। ওপরে চোখ তুলে আমি দেখলুম, সিলিং পাখাটা ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ ক'রে ঘুরে চলেছে অবিরাম। রেস্টুরেন্টের নানা শব্দ আমার কানে এলো। আমি চোখ বন্ধ করলুম। আমার কানে আমার নিজেরই কণ্ঠস্বর গুঞ্জন তুলল, হ্যাভ পেসেন্স, হ্যাভ পেসেন্স মুন্নির সিল্কের চাদরের মতো নরম চুলসুদ্ধ মাথাটা আটকে আছে আমার চিবুকের কাছে। গলায়, বুকে আমি ওর গরম নিশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি। আমি একটা অবাস্তব সুখের কথা ভাবলুম।

'মাকে যেন বলবেন না আমি সিনেমায় গিয়েছিলুম।'

'কেন বলব না।' টাইটা ভাঁজ করে পকেটে ভরতে ভরতে বললুম, 'মুন্নি, আজকে যেমন হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়, তোমাকে বাড়িতে নিয়েগিয়েছিলুম।'

'ইস্, মা'র সঙ্গে যদি হঠাৎ কৃষ্ণাদির দেখা হয়ে যায়! তাহলে কৃষ্ণাদিকেও শিখিয়ে দেবেন।'

কৃষ্ণাদি! কৃষ্ণাদি! আমার ইচ্ছে হলো ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিই মুন্নির গালে। মুন্নি, তুমি এতো বাচাল কেন! এখন তুমি আমার সামনে আছ, শুধু কি আমার কথা ভাবতে পারো না! যদি না পারো, চুপ ক'রে থাকো। আমাকে ভাবতে দাও।

নিজেকে গোপন করে আমি বললুম, 'মুন্নি, আজকে যেমন হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তেমনি রোজ হতে পারে না?'

'ওরেব্বাস, তাহ'লেই হয়েছে। রোজ রোজ!' মুন্নি যেন কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারল না, 'রোজ দেখা হয়ে কী হবে?'

'এমনি। আমরা বেড়াব, আইসক্রীম খাব। তারপর ধরো, সিনেমাতেও যেতে পারি। তোমাকে আমার খুব দরকার কিনা।'

চোখ বড়ো ক'রে মুন্নি আমার পাগলামি-মার্কা কথাগুলো শুনল। কী ভাবল একটু। তারপর বলল, 'রোজ হবে না। এক-একদিন আসব।'

'ভেরি গুড।'

মুন্নির ফর্সা, নরম হাতটা আমি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলুম। ইচ্ছে হলো গুঁড়িয়ে ফেলি। সেই অবস্থায় দেখলুম মুন্নির চোখে কেমন একটা ছায়া পড়েছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা কবল না মুন্নি।

'একটা কথা বলব?' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বললুম আমি, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে এখন। একটা চুমু খেতে দেবে?'

'যাঃ, অসভ্য!' মুন্নি সরে গেল একটু, ওর ঠোঁট কাঁপল। 'আমি কিন্তু চ'লে যাব।'

'তাহলে থাক।' আমি বললুম, 'তোমার যখন ইচ্ছে কবছে না! তুমি আমাকে একেবারেই পছন্দ করো না দেখছি!'

'আপনার খুব ইচ্ছে করছে?' দূর থেকেই হঠাৎ বলল মুন্নি, গলার স্বরে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। তারপর, একটু অপেক্ষা করে আমি জবাব দিচ্ছি না দেখেই বোধহয় বলল, 'শুধু একবার তো? ঠিক বলছেন?'

'বেশ, একবারই।' লঘু গলায় বললুম আমি। মুন্নির কথা শুনে হঠাৎ হো হো কবে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল আমার। কোনোরকমে হাসি চেপে মুন্নিকে দেখলুম আমি। ও কিছু ভাবছে।

পর্দা সরিয়ে কেবিনের বাইরে উঁকি দিয়ে কী দেখল মুন্নি। ক' মুহূর্ত। মুখটা আবার ভিতরে টেনে নিয়ে বলল, 'এখানে নয়। তাহ'লে আপনাকে ট্যাক্সিতে যেতে হবে।'

'কেন, ট্যাক্সি কেন!' মুন্নি আমাকে অবাক ক'রে দিল। 'কেউ বুঝি তেমায় ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়ে চুমু খেয়েছিল?'

'আহা, আমাকে কেন!' হাত দিয়ে আমাকে ঠেলল মুন্নি। 'গীতু বলেছে, দীপকদা একদিন ওকে ট্যাক্সিতে...'

'ও বুঝেছি, বুঝেছি।' আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'তাহ'লে চলো। ট্যাক্সিতেই না হয হবে। তারপর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

আমি বেয়ারাকে ডাকলুম। সিগারেট ধরিয়ে বিলের টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলুম বাইরে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কতো তাডাতাড়ি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায তাই চিন্তা কবতে লাগলুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে, মুন্নির তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

তখন আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়-মাখানো মৃদু গলায় মুন্নি বলল, 'আপনি কিন্তু কৃষ্ণাদিকে বলবেন না কিছু।'

'দূর, পাগলি! এ-সব কেউ বলে।'

আলতোভাবে হাতেব আডাল দিযে মুন্নিকে আগলে বাখলুম আমি। আর মনে মনে বললুম, ভিতু মেয়ে। অতো ভয়ের কি আছে। আমি কি সত্যি সত্যিই তোকে চুমু খাব নাকি। বরং এখন অনেকক্ষণ তোকে নিযে ঘুরব। যেখানে ইচ্ছে, যেখানে খুশি। আমি জানি, ঘুরতে ঘুরতে আবার আমি সেই একই জায়গায় ফিরে আসব। আমার পবিত্রাণ নেই। জানি, আজকের এই দেখা হওয়াটাও মিথ্যে। তোর সরল, নিষ্পাপ জগৎ থেকে আমি যে অনেক দূবে সরে এসেছি, মুন্নি!

দেবেশ রায়

বিছানায় শুয়ে এক কাপ চা খাওয়া সারা দিনের পবিশ্রমের প্রথম বিলাসী ভূমিকা। স্ত্রী যদি উঠতে তাগাদা না-ও দেয়, নিজের তাগাদাতেই বিছানা ছাড়তে হয় বেলা আটটার মধ্যে। হাত-মুখ ধোয়া, পায়খানা ও বাজার সারতে সারতে সাড়ে আটটা। বাকি আধঘণ্টা সময় হাতে রাখতে হয় কয়লা ওষুধ কিংবা লনড্রির জামা-কাপড় ইত্যাদি কিছু না কিছুর জন্য। তারপর আট ঘণ্টা—বেশ্যা যেমন করে তার মেয়েত্বকে এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টার জন্য বেচে—নিজের ইংরেজিতে চিঠি লিখবার বা ঠিকে যোগ দেবার ক্ষমতাকে বেচে, নিজ মেরুবেখার চারপাশে আবর্তিত হতে পৃথিবীর আরো যে-বারো ঘণ্টা সময় লাগে তা ঝিমিয়েই কাটিয়ে দেয়া যায়। জীবনের জন্য জীবিকা—এই ধরনের প্রচারিত একটি সিদ্ধান্ত যখন নিজ অভিজ্ঞতার জোরে জীবিকার জন্যই জীবনধারণ এই প্রকার বিপরীত সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁকে, তখন যে-সকাল আটটায় ঘুম থেকে না-ওঠার কোনো উপায়ই নেই, সেই কালে স্ত্রী বা কন্যার ডাকাডাকি, সাধাসাধি, চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে এনে কাকুতি-মিনতি নিজেকে বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করায়। সেই ধাক্কাতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত চলে যায় বেশ। প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে-টাকা রেখে মারা যাওয়ার সুযোগ ঘটে, তাতে ঋণ বাদ দিয়ে দাহ-খরচ ও শ্রাদ্ধ ভালোভাবেই চুকে যায়। পঞ্চভূতে নির্মিত দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবার আগে শবহীন স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গোটা দুনিযা, আর "লোকটা বেশ গোছানো ছিল, টুকটুক করে জীবন চালিয়ে মরাটা পর্যন্ত রাইট টাইমে মরল"—এই প্রকার শোকবার্তা স্মৃতি বহন করে। সন্তানসন্ততিরা জানান দেয় লোকটার বেশ শক্ত মূল ছিল, বহুদূর প্রসারিত, আর কখনোই লোকটি নিজের জমি ছাড়িযে অন্য জমিতে শেকড় চালায়নি।

কেবোসিন কাঠের তক্তাপোষে সাড়ে চার টাকা দামের এক তাঁতের মশারির নিচে সত্যব্রত সেদিন এই রকম একটি আত্মনির্ভর স্বত্বাধিকারীর মতই ঘুমোচ্ছিল। নিঃসংশয়ে তারই যে স্ত্রী, সেই মহিলা সত্যব্রতকে এসে ডাকাডাকি করছিল—"শুনছ, এই শুনছ, শুনছ, এই।" আপ্যায়িত সত্যব্রত অনাবশ্যক পাশ ফিরে শুলো। যেন ওপর দিকের কানের গর্ত দিয়ে অণিমার ডাকগুলো খুব ভালোভাবে ভেতবে গলে যাবে। কিন্তু অণিমা বলল—"বাইরে তোমাকে কারা ডাকছেন।"

সুতরাং সত্যব্রত চোখ খুলে—"কে?"

'কী জানি? জানি না। বসতে বললাম, বসল না, দাঁড়িয়ে আছে" বলে ঘব থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অণিমা যোগ করল—"চা হয়ে গেছে, খেয়ে যাও, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

.ততক্ষণে চৌকির কানায় পা ঝুলিয়ে বসে সত্যব্রত নিজেকে স্বত্বাধিকারী ভাবার বদলে যেন চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তার বাড়িতে যেসব জিনিস থাকবে ধরে নিয়ে লোক দুটি এসেছে, তা আছে কি না। যেন, আদালত থেকে তার বাড়ি নিলামে চড়াতে এসেছে—এমনভাবে কয়েক সেকেণ্ড ঘরের চারিপাশে তাকাল। তারপর অপর

চৌকিতে অঞ্জুকে শোয়া দেখে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাল। দু-টাকা চার আনা দামের লুঙি, রঙ উঠে গেছে, সত্যব্রত আণ্ডার-ওয়্যার পরে না, অর্থাৎ লুঙিটা যেন দেবীদের শাড়ির মতো, আছে অথচ নেই। বালিশের পাশে গেঞ্জিটা পড়েছিল, সেটা গায়ে দিল। তারপর নিজের চেহারাটা কল্পনা করল—পাতলা লুঙি, ছেঁড়া গেঞ্জি, সদ্যোনিদ্রোত্থিত—অচল। যেন বাইরের লোক দুটো সত্যব্রতকেই নিলামে তুলতে এসেছে। অণিমার পায়ের শব্দে চমকে দাঁড়িয়ে, কয়েক মিনিট আগে যে-লোকটা একটা মালিক মালিক ভাব নিয়ে ঘুমোচ্ছিল, দু-হাতের তালুতে মুখ ঘষতে ঘষতে যে এমনভাবে বাইরে গেল যেন সে তার নিজের নামটাই অস্বীকার করবে। অণিমা "এই" পর্যন্ত বলে চায়ের কাপ টেবিলের ওপর ডিশ চাপা দিয়ে রেখে অঞ্জনাকে ধাক্কা দিতে শুরু করল—"এই অঞ্জু, ওঠ, অঞ্জু, এই দেখো, কীরে, চড় খাবি নাকি?"

লোক দুজন সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যব্রত গিয়েই বলল—"ভেতরে বসুন।"

"না না, দরকার নেই, একটা খবর দিতে এসেছি, এক্ষুণি চলে যাব।"

লোকটার হাসি থেকে সত্যব্রত অমুমান করার চেষ্টা করতে লাগল কাছাকাছি কোনো দিনে নিমন্ত্রণ পাবার কথা আছে কি না।

"ভেতরে এসেই বসুন না—"

"না। শুনুন, আপনাকে আজ বা কাল যে-কোনো সময় থানায় গিয়ে একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। যখন আপনার সুবিধে—"

"থানায়! আমাকে?"

একজন বলল—"আজ্ঞে।" আর-একজন পকেট থেকে নোট বই বের করে কয়েকটা পাতা উলটে পড়ল—"আপনার নাম তো শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী, পিতার নাম মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ী, হোল্ডিং নাম্বার দুই শ তিরিশ বাই এ বাই সিক্স।" তারপর নোট বইটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল—"আজ্ঞে আপনিই।"

অপরে সাইকেল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—"যখন আপনাব সুবিধে হয় যাবেন, এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই, একদিন গেলেই হলো—"

লোক দুটো সাইকেলের প্যাডেলে পা দিচ্ছিল। সত্যব্রত তাদেব ডেকে থামাল—"আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন একটু, কেন?"

লোক দুটো ওখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াল, আর-একজন বলল—"আরে কিছু না, কিছু না। বলেন কেন আর। গভর্নমেন্ট থেকে অর্ডাব এসেছে, তোমাদের দেশে—মানে শহরে, আবাব সীমান্ত শহর কিনা—আমবা খবব পেযেছি তোমাদের ওখানে অনেক লোক আছে, যারা আসলে সে-লোক নয়।" তারপব যেন সত্যব্রতকে অভয় দেবাব জন্যই লোক দুটো দেখে বা শুনে মহড়া-দেওয়া মনে হয় এমনি এক হাসি হেসে বলল—"আর বলবেন না মশাই সেন্ট্রালের কাণ্ড, যারা আছে, তারা তারা নয়। ভাবুন দেখি আমরাই বা কী করি, চাকরি তো রাখতেই হবে। আচ্ছা চলি, যাবেন একদিন, একটু আলাপ করে আসবেন।" লোক দুটি সাইকেল চেপে চোখের বাইরে চলে যাবার আগেই সত্যব্রত পেছন ফিরে ঘরে ঢুকে পড়ল, যেন সে লোক দুটোকে দেখাতে চায় যে সে তাদের যাবার আগেই ঘরে ঢুকেছে। তাছাড়া নিঃসন্দেহে অণিমা ভেতর থেকে কথাবার্তা শুনেছে।

বারান্দায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে অণিমাকে ভাবতে দিতে চায় না যে থানায় যাবার নামে সে ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু অণিমা কোনো কথাই শোনেনি। সত্যব্রত টেবিল থেকে চা-টা তুলে নিয়ে চুমুক দিলে, এমন সময় রুটি কামড়াতে কামড়াতে অঞ্জুর প্রবেশ, তার পেছনে অণিমা। অর্থাৎ অণিমা এতক্ষণ, অঞ্জুকে নিয়ে রান্নাঘরে ছিল, এটুকু ভেবেই সে মনে মনে হেসে উঠল— সে কি, আমি কি চুরি না ডাকাতির দায়ে ধরা পড়েছি যে অণিমাকে জানতে দিতে চাইছি না।

"জানো, আমরা আমরা কি না—তার খোঁজ-খবর নেবার জন্য গভর্ণমেন্ট নাকি থানায় অর্ডার দিয়েছে, তাই থানায় যেতে হবে।"

"থানায় যেতে হবে, তোমাকে, কেন?"

"আমি যে আমি, এটা প্রমাণ দিতে।"

"কেন?"

"গভর্নমেন্টের হুকুম" বলে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে সত্যব্রত খুব দ্রুত কুয়োর পাড়ের দিকে গেল। হাত-মুখ ধোয়া সেরে বাজারে যেতে হবে।

বাজার থেকে ফেরার পর যে-আধ ঘণ্টা সময় টুকিটাকি কাজের জন্য আলাদা করে রাখা, তারই ফাঁকে সত্যব্রত থানা থেকে ঘুরে আসবে স্থির করল। সেজন্য বাজারটাও ধীরে সুস্থে করল না। খানিকটা দৌড়েই যা পেল তা কিনল। অথচ লোক দুটো বলে গিয়েছিল যে যখন সুবিধে তখন গেলেই হবে। থানায় কাজ থেকে ফেরার পথে গেলেই সবদিক থেকে সুবিধে। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এ-খবর শুনে ইস্তক থানায় যাবার জন্যই যে সে ছটফট করছে তা তার নিজের কাছেও লুকনো থাকল না যখন বাজার ফেলেই সে বেরিয়ে পড়ল। অণিমা একবার বলেছিল—"এতো ছটফট করে যাবার দরকারটা কি, বিকেলে গেলেই তো হয়।" অঞ্জুও একটা অঙ্ক দেখিয়ে নেবার জন্য পিছু পিছু ঘুরছিল। সত্যব্রত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে থানার দিকে হাঁটা শুরু করল।

আর ফিরল সূর্যাস্তের পর। অণিমা দুপুর থেকে ওঠা-বসা, ঘর-বারান্দা করছে। দশটার পর পাড়াতে বয়স্ক ছেলেপুলে পর্যন্ত নেই যে তাকে থানায় খবর নিতে পাঠাবে। বিকেল পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে শেষে একজনকে থানায় পাঠিয়েছিল। ছেলেটি এসে সংবাদ দিল সত্যব্রত ওখানে আছে। পাড়ায় ঘুরে অণিমা শুনে এসেছে একবার সবাইকেই নাকি থানায় যেতে বলেছে এবং ঐ একই কারণে, সে-যা সে-তা কি না সেটা চূড়ান্তভাবে যাচাই করতে এবং আত্মপরিচয় দিতে। যে-মাটিতে শেকড় চড়িয়ে সে গাছ, সেই মাটি ছেড়ে; যে-পরিবারের মধ্যে সে স্বীকৃত, সেই পরিবার ছেড়ে; আজ বা কাল থানায় গিয়ে প্রমাণ দিতে হবে—তার আত্মার প্রমাণ, আজ অথবা কাল, তার অস্তিত্বের প্রমাণ, আজ অথবা কাল।

সত্যব্রত হাঁটছিল সমস্ত গা ছেড়ে দিয়ে পা টেনে টেনে। ঘাড়-ভাঙা মুরগির মতো গলাটা ঝুলছে, ভেজা কুকুরের মতো চুলগুলো বিশৃঙ্খল, কণ্ঠার আশ্রয়ে মৃত্যুর মতো শীতলতা, আঙুলগুলো চামড়ার গ্লাভসের মতো যেন পাঞ্জার অনুকরণ। বাইরের দরজা থেকে কথাটি না-বলে পায়ে পায়ে অনুসরণ করেছে অণিমা। একবার পিঠের ওপর হাত রেখেছিল, সহসা অনধিকারবোধে আক্রান্ত হয়ে সে হাত তুলে নিয়েছে। ভেতরের সিঁড়ির

ওপর শ্মশান-প্রত্যাগতের মতো বসে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ বুজে হেলান দিয়েছে। পেছনে থাম না-থাকলে হয়তো শুয়ে পড়ত। অণিমা নায়নি, খায়নি। সত্যব্রতর সমস্ত শরীরে উত্তর খুঁজে অণিমা বসে পড়ল, বোধহয় তার বসার শব্দেই চোখ মেলে শুধু মণিটাকে চারপাশে ঘুরিয়ে সত্যব্রত কিছু একটা সন্ধান করল। এতক্ষণে অণিমা বলল— "অঞ্জু ওর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে।" শুনে সত্যব্রত চোখটা যখন অণিমার মুখের ওপর স্থির করল, তখন অণিমার মনে হলো সেই দৃষ্টির বহু অভ্যন্তরে বুঝিবা কিছু দেখা গেল যাতে সত্যব্রতকে সত্যব্রত মনে হলো। সত্যব্রত পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে অণিমার হাতে দিয়ে আবার চোখ বুজল। চারপাশ থেকে ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নামছে। ক্ষণেক আলো পাবার আশায় আকাশের আলোয় গিয়ে দাঁড়াল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত।

১৯৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, তার একটা সুসম্পাদিত ও সুসংগৃহীত তালিকা না-থাকায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের দেশ, জাতি, ভাষা, বংশ ইত্যাদি চিহ্নিত করার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। সব দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এত গুরুতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে যে, কে যে কে, সে-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা এক তথ্যসংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে পৃথিবীগ্রহে বর্তমানে বহু ফেরারী ও বেনামা ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েতনাম-দক্ষিণ ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব-জার্মানী-পশ্চিম-জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলিতে। সে-কারণে খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান নাম রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মসূচীব ভিত্তিতে আমরা সমস্ত দেশেই যে-যা বলে পরিচিত, সে-তা কি না, তা পরীক্ষা করছি। এবং বিশ্ববাসীকে অনুসরণ করছি তারা যেন স্ব স্ব আত্মপরিচয় নিয়ে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দেন।

বল্লভপুর থানার বিবরণ

এক।। শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী, পিতা মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ী, আদি নিবাস পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে ২৩০।এ।৬ হোল্ডিংস্থ মোকানে বাস করেন। এই হোল্ডিংয়ের জন্য দেয় মিউনিসিপ্যাল কর গত বারো বৎসর যাবৎ তিনি দিয়ে আসছেন। ও ইংরেজি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে ঐ হোল্ডিংয়ের তৎপূর্ব মালিক শ্রীবনবিহারী মল্লিকের স্বাক্ষর-যুক্ত বিক্রয়-দলিল পরীক্ষার পর উক্ত হোল্ডিং শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর নামে বল্লভপুব রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা যায় শেখ মনসুর আলি, পিতা মৃত কদম শেখ, হালসাকিন রায়চর, জিলা পাবনা, ঐ হোল্ডিংয়েব বর্তমান ন্যায়সঙ্গত মালিক। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর মৃত কদম শেখ তাঁর পুত্র মনসুর, কন্যা আমিনা ও স্ত্রী নুরাকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার পূর্বে তার বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও পাড়ার তিন পুরুষের অধিবাসী শ্রীবনবিহারী মল্লিকের ওপর দিয়ে যান। এবং ঐ বৎসবই শ্রীবনবিহারী মল্লিক ঐ হোল্ডিংয়ের মালিক হিসাবে শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ীর নিকট বিক্রয় করেন। পাবনা অন্তর্গত রায়চরে শেখ মনসুর আলির নিকট ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের মূল দলিলের নকল আছে।

সুতবাং শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নামক কোনো ব্যক্তি বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩০।এ।৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিক নন। বা বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির

২৩০/এ/৬ নং হোল্ডিংস্থ মোকানের মালিকের নাম শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী নয়।

দুই।। মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র বলে কথিত শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৪৭ সালের পর ভারত ইউনিয়নের বহু জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ইস্কুল মাস্টারি, কেরানিগিরি ইত্যাদি কাজ করেন। সব জায়গাতেই তিনি শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী, পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিন কাজের পর যখনই তাঁর কাছে বি-এ মূল ডিপ্লোমা প্রভৃতি চাওয়া হয় তিনি বলেন যে পরীক্ষা দেওয়ার পর দাঙ্গার ভয়ে দেশত্যাগ করায় তিনি বি-এ মূল ডিপ্লোমা সংগ্রহ করতে পারেননি ও দেশভাগের পর এখন তা সম্ভব নয়। দু-একটি ক্ষেত্রে এর পরেও কর্তৃপক্ষ চাপ দেওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দেন।

তদন্তে প্রকাশ : মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী নামধেয় ব্যক্তি ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু পর পৎসরই তিনি খুলনা যাবার পথে ট্রেনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহত হন।

এমন হতে পারে বর্তমানে যে বা যারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর আত্মপরিচয় গাপ করেছে, তারা মৃত সত্যব্রত লাহিড়ীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিত ও সেই কারণেই মৌলিক সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকেও নিজেদের কাজে লাগাতে পারছে। মৃত সত্যব্রত মরেও জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং বর্তমানে জীবিত সত্যব্রত লাহিড়ী বস্তুত মৃত।

মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর এক খুড়তুতো ভাই স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই কলকাতায় চাকরি করেন। তদন্ত-কমিশনের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয়ে চাকরির চেষ্টা হয়েছে এমন দশটি ক্ষেত্রের কথা তিনি জানেন। তাঁর জানা দশটি ক্ষেত্রের বিবরণ শোনার পর বোঝা গেল তাঁর অজ্ঞাতে বহু বহু জায়গায় চাকরির চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু চাকরিই নয়, সত্যব্রত লাহিড়ীর পরিচয় দিয়ে এমন কি বিবাহের চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছে এবং একটি বিবাহ যে সংঘটিত হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেট আলোচনা করে দেখা যায়, ১৯৪৫ সালে দুইজন সত্যব্রত লাহিড়ী ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। এই দ্বিতীয় লাহিড়ীই সমস্ত সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। নইলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ' এই পরিচয়দানকারী যে-কোনো ব্যক্তিকেই নিশ্চিন্ত মনে গ্রেপ্তার করা যেত।

বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, সব শুদ্ধু এ-পর্যন্ত মোট সাতাশি জন 'সত্যব্রত লাহিড়ী' ১৯৪৭ সালের পর বিবাহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কজন '১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ' তা জানা যায়নি।

দ্বিতীয় ঐ আর-একজন সত্যব্রত লাহিড়ী ঐ একই বৎসর বি-এ পাশ করেছেন বলে কে জীবিত আর কে মৃত সত্যব্রত তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। এমন হতে পারে 'মৃত' সত্যব্রত (বা জাল সত্যব্রত) নিজের সুবিধা অনুযায়ী কখনো মৌলিক মৃত সত্যব্রতের, কখনো মৌলিক জীবিত সত্যব্রতের বাবার নাম নিজের বাবার নাম হিসেবে বলে।

১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ—এই পরিচয়টিই জাল সত্যব্রতের নিজেকে

অন্য পরিচয়ে পরিচিত করার একমাত্র কারণ বলে ঐ তথ্যটি সে কোনো ক্ষেত্রেই বদলায় না। এবং সেখানে তাকে অবিশ্বাসও করা যায় না, কারণ, সত্যিই এক সত্যব্রত লাহিড়ী, ১৯৪৫ সালে বি-এ পাশ করেছেন। পিতৃ-পরিচয়ে জাল সত্যব্রত লাহিড়ীর প্রয়োজন নেই বলেই তা পরিবর্তনশীল।

ফলে (ক) মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র (খ) ১৯৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং (গ) শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী—এই তিনটি পরিচয় একত্রে পাওয়া যায় না।

পরন্তু সমস্যা আরো জটিল হয় মৌলিক সত্যব্রত লাহিড়ীর মৃত্যুর অনিশ্চয়তায়। সংবাদে প্রকাশ ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে খুলনা যাবার পথে একবার এক গুণ্ডার দল ট্রেন আক্রমণ করে, ফলে বহুলোক হতাহত হয়। এই নিহতের তালিকায় 'সত্যব্রত লাহিড়ী' এই নাম পাওয়া যায়। এই নাম ভুল ছাপা হতে পারে। এই সত্যব্রত লাহিড়ী অন্য কেউ হতে পারে। কিন্তু ঐ খুলনা রওনা হবার পর ১৯৪৫ সালের বি-এ ও পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী আর ফিরে আসেনি বলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়।

সুতরাং সমস্যা নিম্নপ্রকার। (১) মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সালের বি-এ, খুলনা ট্রেন আক্রমণে নিহত বলে ধরে নেওয়া কি অযৌক্তিক? অর্থাৎ মৌলিক সত্যব্রত জীবিত হওয়া সত্ত্বেও কি তাকে মৃত বলে ধরা হচ্ছে? (২) যদি মৌলিক সত্যব্রতের সত্যে সত্যই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে তার পরিচয় কে কে আত্মসাৎ করেছে?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর মাত্র একজন দিতে পারেন। 'সত্যব্রত লাহিড়ী' এই নাম নিয়ে যে-কজন একজন হয়েছেন। সেই কারণেই এই প্রশ্ন ঘরে ঘরে, ১৯৪৭-এর পর যাঁরা বিবাহ করেছেন, যাঁদের সন্তান হয়েছে, যাঁরা চাকরি-বাকরি নিয়ে ঘর-সংসার করছেন—তাঁদের প্রত্যেককে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

যতদিন এই দুই প্রশ্নের উত্তর না-পাওয়া যায়—ততদিন কোনো সত্যব্রত লাহিড়ীই নিজেকে নিঃসংশয়িতরূপে সত্যব্রত লাহিড়ী বলে ভাবতে পারবেন না, কোনো স্ত্রীই তাঁর স্বামীকে মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী বলে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন না, কোনো সন্তানই তার পিতাকে অকৃত্রিম ও আদি সত্যব্রত লাহিড়ী বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।

নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয় সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করুন আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।

তিন।। শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুলাই চব্বিশ পরগণা জিলার মুখের' গ্রামের শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীঅণিমা সান্যালকে হিন্দুশাস্ত্রমতে শালগ্রাম শিলা ও অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ করেন। মৃত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উভয়েই এই বিবাহে পৌরহিত্য করেন ও তাঁদের উভয়ের সাক্ষ্য থেকেই এ-বিবাহ যে শাস্ত্রমতে নিষ্পন্ন হয়েছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রী সত্যব্রত লাহিড়ী ও শ্রীঅণিমা লাহিড়ী উভয়ে গত দশ বৎসর যাবৎ বল্লভপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২০৩।এ।৬ নং হোল্ডিংস্থিত মোকানে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বল্লভপুর সদর হাসপাতালে শ্রী অণিমা সান্যাল একটি কন্যা সন্তান প্রসব

করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবাহের সাত মাস পরে হলেও শিশু পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল এবং প্রসবও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। এ-বিষয়ে বল্লভপুর সদর হাসপাতালের খাতায় দেখা যায় যে ভর্তি হবার মাত্র পাঁচদিন পরই অণিমা লাহিড়ী খালাস হয়ে যান। এই সন্তানই শ্রী অণিমা লাহিড়ী ও শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর একমাত্র সন্তান শ্রীঅঞ্জনা লাহিড়ী।

'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' নামক বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর আহ্বানে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক জনাব এনামুল হকচৌধুরীর স্বতোপ্রণোদিত এক বিবরণে জানা যায়ঃ পাকিস্তানে অণিমার পিতা শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের বাড়ি তাঁদের পাড়ায় ছিল। ইং ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল সপরিবারে জনাব এনামুল হকচৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন এনামুল হকচৌধুরীর পিতা জনাব মইনুল হকচৌধুরী জীবিত। তিনি ও এনামুল অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত হেমচন্দ্র সান্যালের পরিবারকে রক্ষা করেন। দিন পনের-বিশ পর হেমচন্দ্র ভারত ইউনিয়নে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর কন্যা অণিমা পাকিস্তানে এনামুল হকচৌধুরীর বাড়িতেই থেকে যায়। হেমচন্দ্র সান্যালের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীঅণিমা সান্যাল পাকিস্তানে থেকে তো গিয়েইছে, পরন্তু ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সে 'কুমকুম' এই নামে মইনুল হকচৌধুরীর পুত্র এনামূল হকচৌধুরীকে রেজিস্ট্রেশন বিবাহ করে। জনাব এনামূল হকচৌধুরী তাঁর এই বিবরণের সঙ্গে সেই বিবাহের সার্টিফিকেটের একটি নকল পাঠিয়েছেন। সে-দলিলে পাত্রীর নাম আছে কুমকুম, পিতার নাম এইচ-সি-সান্যাল।

এই বিবরণের সপক্ষে নিম্নপ্রকার পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য পাওয়া যায় : শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল যখন ভারত ইউনিয়নে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে কেউই তাঁর দ্বিতীয় কন্যা অণিমাকে দেখেনি। এমন কি মুখেরা গ্রামে আসার পর হেমচন্দ্র প্রতিবেশীদের বলেন যে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা অণিমা তাঁর প্রথমা কন্যা অঞ্জলীর কাছে আসামের এক চা-বাগানে আছে। আসামের এক চা-বাগানে হেমচন্দ্র সান্যালের বড় জামাতা কাজ করতেন। কিন্তু তাঁদের সাক্ষ্যে জানা যায়, অণিমা সেখানে কোনোদিনই যায়নি। অর্থাৎ এই সাক্ষ্যগুলি পরোক্ষভাবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে যে, ১৯৫০ সালে যখন শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল পাকিস্তান ত্যাগ করেন, তখন অণিমা তাঁর সঙ্গে ছিল না।

তবে কি অণিমা কুমকুম নাম গ্রহণ করে এনামুলকে সত্যিই বিবাহ করে? কিন্তু এইচ-সি-সান্যাল—নামের আদ্যাক্ষর ঘটিত এই সামান্য মিল ছাড়া আর কোনো প্রমাণই নেই যে কুমকুম ও অণিমা একই ব্যক্তি।

কিন্তু তাই যদি না-হবে, তাহলে অণিমা পাকিস্তানে থেকে গেল কেন?

এই বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে।

প্রথম মতঃ জনাব এনামুল হকচৌধুরী ও অণিমা সান্যালের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই প্রণয় ছিল। উভয়ের বাড়ি একই পাড়ায়। আট-ন বছর বয়স পর্যন্ত তারা একই পাঠশালায় পড়ত। অণিমার মাকে এনামুল মা বলে ডাকত। এনামুলের পিতা মইনুল হকচৌধুরী ছিলেন ঐ অঞ্চলেব অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। সাতচল্লিশ সালের পর থেকে এনামুল ও অণিমার হৃদয়-সম্পর্ক এবং এই দুই পরিবারের যোগাযোগ শ্রীহেমচন্দ্র সান্যালের পাকিস্তান ত্যাগ না-করার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এনামুল একদিন সান্যাল

বাড়িতে না-গেলে অণিমার বাবা তাকে ডেকে পাঠাতেন। এনামুলের খাবার জন্য আলাদা কাপ-ডিশ-থালা-গেলাস ছিল।

এই প্রকার অবস্থায় ৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে এনামুল তখন সান্যাল বাড়িতে চলে আসে। এনামুলের পিতা জনাব মইনুল হকচৌধুরী এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত হতে একেবারেই চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র যখন এই বিপদের সম্মুখীন হলো তখন তিনি আব স্থির থাকতে না-পেরে সপরিবারে হেমচন্দ্রকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং শহরের ঐ এলাকার শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ ও সরকারের সাহায্য আদায় করেন।

একটি মাত্র ঘরে সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে সান্যাল পরিবার ছিল। দরজার বাইরে প্রতিটি শব্দকেই তাঁরা আশঙ্কার কানে শুনতেন। যখন তাঁরা ভেতর থেকে টের পেতেন যে এনামুল বেরিয়ে গেল, তারপর এনামুলের ফেরা সম্পর্কে নিশ্চিত না-হয়ে কেউ স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারতেন না। সেই মরণপুরীতে একমাত্র ভরসা ছিল এনামুল। তারই স্রোতে ভেসে এসেছে এই হকচৌধুরী পরিবার। এনামুল সহই কেবল এঁদের বিশ্বাস করা যায়। দিনে চারবার করে দরজা ঠেলে খাবার দিয়ে যেত। এবং সান্যাল পরিবারের জন্য এখানে আলাদা বাসন-কোসনের ব্যবস্থা ছিল না। সর্বক্ষণ চারদিকে হত্যাকারী ও আহতের উল্লাস ও আর্তনাদ, আগুনের নিঃশব্দ লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষের চীৎকার—এক-এক ধাক্কায় সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে দিচ্ছিল; ভূমিকম্প যেমন এক-এক ধাক্কায় পৃথিবীতে কী চিরস্থায়ী তা যাচাই করে নেয়। আর সেই মৃত্যুপরিবৃত অবস্থাতে সবাই বুঝছিল যে অণিমা আর এনামুলের প্রেম সেই প্রেম তরণী যাতে এই তুফানের দরিয়া পার হবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অণিমা-এনামুলের প্রেম না থাকলে এ-বাড়িতে সান্যাল পরিবার আসতে পারত না ও সরকারকে এনামুলের বাবা এ-অঞ্চলে শান্তিরক্ষার কাজে বাধ্য করতেন না ও এনামূল শান্তিবাহিনী তৈরি করে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আগুন নেবানো ও আহতের উদ্ধার সাধন করতে যেত না। এগুলো অঙ্কের মত এত প্রমাণিত ছিল যে সেই অবস্থায় সান্যাল পরিবার আর হকচৌধুরী পরিবার সমবেতভাবে এই ভালোবাসাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, ধোঁয়া বা ধুলো থেকে চোখের মণি দুটোকে রক্ষা করার জন্য যেমন আমাদের স্নায়ু অচেতনেই কাজ করে। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণগুলি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচছিল, তাদের কাছে এ-ছিল আলোর মতো স্বচ্ছ।

আর এ-কথা সেদিন সব চাইতে বেশি করে বুঝেছিল অণিমা। আগে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি বা অণিমার সঙ্গে এনামুলের আলাদা দেখা-সাক্ষাৎ হত, দাঙ্গার অবস্থায় তার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দিনে রাতে এনামুল তিন-চারবার মাত্র এদের ঘরে ঢুকত।

স্নেহ প্রেম ইত্যাদি প্রমাণ করা অসুবিধাজনক ঘটনাগুলিকে আইনগত অনুসন্ধানের কাজে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত করা সমীচীন না হলেও, এনামুলের সঙ্গে অণিমার অবিচ্ছিন্ন দেখা-সাক্ষাৎ না-হওয়া অথচ বাইরে ঘোরাঘুরির পর পরিশ্রান্ত এনামুল যখন ও-ঘরে ঢুকত তখন ঘাম মুছবার জন্য গামছাটা বা হাওয়া খাবার জন্য পাখাটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অণিমার এগিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে, যদি এনামুলের প্রতি অণিমার প্রেম পরিণতিমুখী হয়েই থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এই সময়, আর কোনো সময়ই নয়। কারণ সংস্কারগুলো

তখন খানখান হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল আর সেই মৃত্যু পরিকীর্ণ অবস্থায় সান্যাল পরিবারের অতগুলি লোকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডধ্বনি অনিমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তার প্রতি এনামুলের ভালোবাসার শক্তি দর্শাচ্ছিল। নইলে পনর-বিশদিনের অনবরত চেষ্টায় যখন মইনুল হকচৌধুরী সান্যাল পরিবারের ভারত ইউনিয়নে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন অণিমা ভারতে যেতে অস্বীকৃত হলো কেন।

অণিমাকে পাকিস্তানে রেখে আসতে হেমচন্দ্র সান্যাল নিশ্চয়ই একবারে সম্মত হননি। কিন্তু এনামুলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীতই মেয়ের আত্মঘোষণায় তাঁরা হয়তো ভয় পেয়েছিলেন, আবার তাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য এনামুলের পরিশ্রম দেখে হয়তো তাঁরা অসম্মত হতে লজ্জা পেয়েছিলেন। সে যা-ই হোক, অণিমা পাকিস্তানে থেকে যায়।

এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পর অণিমা স্ব-ইচ্ছায় ও স্ব-চেষ্টায় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি 'কুমকুম' নামে জনাব এনামুল হকচৌধুরীকে বিবাহ করে। কুমকুমের সঙ্গে এনামুলের বিবাহের রেজিস্ট্রিদলিল আছে। কিন্তু নাম-পরিবর্তন কেন?

এনামুল ও অণিমা দুজনই নাকি মনে করে যে এ-কথা জানাজানি হলে ভারত ইউনিয়নে সসম্মানে বসবাস করা সান্যাল পরিবারের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে, এবং সে-কারণেই পিতার পুরো নাম ব্যবহার করা হয় নাই।

দ্বিতীয় মত : পাকিস্তান হবার পূর্ব থেকেই এনামুল অণিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর এনামুল প্রথমে অণিমাকে বেশ কিছু পত্র দেয়। তার কোনো জবাব না-পাওয়ায় পথেঘাটে অণিমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝেই সে অণিমাদের বাড়িতে এসে অণিমার মাকে মা বলে ডেকে জোর-জবরদস্তি করে চা ইত্যাদি খাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে যেদিন সে এক চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে অণিমাকে বলে যে তার বিবি হতে রাজি না-হলে সান্যাল পরিবারের সবাইকে কুচিকুচি করে কাটা হবে, সেদিন থেকে অণিমাব বাইরে বেরুনো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। তার শুরুতেই এনামুল দলবল সহ সান্যাল বাড়িতে চড়াও হয় ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে অণিমাকে তার সঙ্গে বিয়ে না-দিলে সান্যাল বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে হত্যা করা হবে। সান্যাল মশাই এনামুলের বাবা মইনুল হকচৌধুরীকে এ-কথা জানালে তিনি পুলিশকে জানিয়ে দেন যে, এনামুল তার দলবল নিয়ে ঐ পাড়ায় শান্তিরক্ষা করছে। ফলে ঐ এলাকায় আসে না এনামুল ঐ এলাকার একমাত্র কর্তা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন রাত্রি গোটা দশেকের সময় প্রথমে বাড়িতে ভীষণ ঢিল পড়তে থাকে। সান্যাল বাড়ির সবাই দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে বসে। ঘণ্টাখানেক পরে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি দিতে দিতে একদল লোক সান্যাল বাড়ি ঘিরে ফেলে, এবং বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলে দরজা না খুললে সেই মুহূর্তে আগুন দেয়া হবে। সেই সময়েই এনামুল এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে—"দরজাটা একবার খুলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বাধ্য হয়ে দরজা খুলতে হয়। এনামুল বলে, যদি তারা সপরিবারে হকচৌধুরী পরিবারে আশ্রয় নেয় তবেই একমাত্র বাঁচার সম্ভাবনা। অনন্যোপায় সান্যাল পরিবারকে

বাধ্য হয়ে এনামুলদের বাড়িতে এসে উঠতে হয়। সেখানে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁদের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচতে হয়েছে।

মাঝে মাঝেই এনামুল ঘরে ঢুকত ও সবাব সামনেই অণিমাকে বাতাস করতে কী ঘাম মুছিয়ে দিতে বলত। তখন সান্যাল পরিবারের পরিবারত্ব নেই, আত্মরক্ষাই একমাত্র সমস্যা, দেব-মন্দিরের পূজার্থীর যেমন প্রয়োজন শুধু নিজের প্রার্থনা পূরণের। সেজন্য বলিদানের রক্তও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। এবং অণিমাব প্রতি এনামুলের এই অশিষ্ট ও অশ্লীল ব্যবহারে এরা প্রত্যেকে আত্মরক্ষার স্বস্তি পেত। যেন অণিমা নামক প্রতিরোধক না থাকলে ঐ অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা হত্যার নেশা হয়ে উঠত। যেন অণিমার শরীরের ওপরকার চামড়া এনামুলকে তার শরীরের ভেতরকার রক্তের প্রতি দৃষ্টি হানবার সময় দেয়নি। যদি ঐ চামড়াটিকে রক্ষা করবার কোনো চেষ্টা করা যেত তাহলে ভেতরের রক্ত দিয়ে সে-চেষ্টার দাম শোধ করতে হত।

আইনগত অনুসন্ধানের কাজে কাম, লোভ, অত্যাচার, বলাৎকার ইত্যাদি যে-সমস্ত বিষয়ের উৎস ও উদ্দেশ্য থাকা স্বাভাবিক—তাকে যথেষ্ট মূল্য না-দিলে ঘটনার সত্যতা যাচাই হয় না। অণিমার শরীরের প্রতি এনামুলের লোভ স্বীকার না-করলে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না কেন দশ-পনেরদিন হকচৌধুরী বাড়িতে থাকার পর এনামুল যখন প্রস্তাব দিল অণিমাকে রেখে গেলে সে তাদের ভারত ইউনিয়নে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে, তখন সান্যাল পরিবার সম্মত হলো। দাঙ্গার কয়েকদিন হত্যা করার জন্য ও নিহত হবার ভয়ে মানুষের উল্লাস ও আর্তনাদ, আগুনের নীরব লেলিহানতাকে ঘোষণা করে মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বর, সংস্কারগুলোকে খানখান করে ভেঙে ফেলেছিল।

অণিমাকে পাকিস্তানে রেখে আসতে হেমচন্দ্র সান্যাল নিশ্চয়ই একেবারে সম্মত হন নাই। কিন্তু এতগুলি লোকের প্রাণ নষ্ট আর অণিমার কুল নষ্ট—এর মধ্যে যোগ বিয়োগ করে তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন কোনটা লাভজনক। এবং তিনি অণিমাকে পাকিস্তানে রেখেই ভারত ইউনিয়নে চলে আসেন।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী অণিমাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত ও কুমকুম নামে নামান্তরিত করে এনামুল হকচৌধুরী রেজেস্ট্রি বিবাহ করে।

তখন এই প্রকার আশঙ্কা ছিল যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবার পব এইসব ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হতে পারে। সেই কারণে অণিমার নামান্তর ও পিতৃপরিচয় গোপন রাখবার জন্য আদ্যাক্ষর ব্যবহার।

পাকিস্তানে অণিমার থেকে যাওয়া সম্পর্কে এই দুটি মত ছাড়া সম্ভাব্য তৃতীয় একটি মত কিন্তু পাওয়া যায় না যে অণিমা ও কুমকুম আসলে এক ব্যক্তি নয়। হেমচন্দ্র সান্যালের মুখেরাস্থিত প্রতিবেশী ও আসামস্থিত বড় জামাতা ও তদীয় পত্নী অঞ্জলিব সাক্ষ্যে অণিমার ভারত ইউনিয়নে না-আসা এমনভাবে প্রমাণিত যে, সেই কারণেই কুমকুম ও অণিমার দুই ব্যক্তিত্বের যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি অণিমা ও কুমকুম এক ব্যক্তি নয় এই মত প্রচলিত থাকত তবে সমস্যাও এইখানেই থাকত। তারা দুইজন না একজন এর মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু সে-প্রশ্ন না-ওঠায় এরা যে একই ব্যক্তি তা পরোক্ষে সর্বসম্মত।

১৯৫২ সালের ৩০শে জুলাই এই অনিমা সান্যালের সঙ্গেই যদি সত্যব্রত লাহিড়ীর

বিবাহ হয়ে থাকে, তবে অনিমা সান্যাল ওরফে কুমকুম হক চৌধুরী পাকিস্তান ছেড়ে ভারত ইউনিয়নে এল কবে এবং কেন? এ বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে : প্রথম মত : ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রথম বোঝা যায় যে অণিমা গর্ভবতী। বমি, মাথাঘোরা, অরুচি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক লক্ষণও ইতিমধ্যে দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বেই এনামুলের বাবা মইনুল হকচৌধুরী মারা যান। বাড়িতে শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ মহিলারও একান্ত অভাব। তাছাড়া শারীরিক কারণেই অণিমা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ে ও বারবার বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদির কথা বলতে থাকে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অণিমা তার বাবা মার সঙ্গে ভারত ইউনিয়নে যেতে অস্বীকার করায় এনামুল এতদূর পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল যে তাদের বিয়ের পর পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজে খাপ খাইয়ে নিতে ও অণিমাকে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ দিতে সে দীর্ঘদিন বাইরে বাইরে ছিল। কেননা এনামুল জানত - অণিমা যে হিন্দু ও সে মুসলমান, এ-চিন্তা-সংস্কার দুজনের মনেই এত সুদূরে মূল প্রসারিত করে আছে যে ভেতর থেকে ক্ষয়ে না-গেলে শুধু বাইরের টানে তা উৎপাটন করা যাবে না। তাছাড়াও, তার জন্যই স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে থেকে যাওয়ায় অণিমাকে এনামুল বোধহয় এক প্রকারের সশ্রদ্ধ দূরত্বে রাখতে চাইছিল। বোধহয় সে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল যাতে কোনো প্রকারেই সে অণিমার ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি না-করে। মইনুল হকচৌধুরীর মৃত্যুর ফলে বাধ্য হয়ে এনামুলকে অণিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হয় এবং তখন সে আবিষ্কার করে তারই মতো অণিমাও এতদিন এনামুলের কথা ভেবেই দূরত্ব রক্ষা করেছে, অতঃপর তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন। এবং এই কারণেই বিবাহের এক বৎসর পর অণিমার গর্ভসঞ্চার।

অণিমার শারীরিক অবস্থায় বাপ-মায়ের কাছে থাকলে ভালো হবে ও শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে বিবেচনায় এনামুল অণিমাকে মুর্শিদাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অথচ সে গেলে শ্বশুরবাড়ির সামাজিক অসুবিধা হতে পারে ভেবে নিজে যাবে না স্থির করে।

এবং এনামুলের সক্রিয় ইচ্ছায় উৎসাহে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তির জন্য অণিমা ভারত ইউনিয়নে আসে। সে যে নিরাপদে ভারত ইউনিয়নে এসেছে ও তার বাবার কাছে আছে এ-সংবাদ জানিয়ে অণিমা এনামুলকে একখানি পত্র দেয়। নাম লেখা ছিল অণিমা।

পাকিস্তান ছাড়ার পর এটিই তার একমাত্র চিঠি। তারপর এনামুল ঘনঘন তিন চারটি পত্র দেয়, অভিমান করে পত্র দেয়া বন্ধ করে, আবার পত্র দেয় ও অবশেষে টেলিগ্রাম করে।

এদিকে অণিমা মুর্শিদাবাদে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই হেমচন্দ্র সকলকে বলেন যে অণিমার বিবাহ স্থির হওয়ায় সে বড়দির কাছ থেকে চলে এসেছে এবং পর গর্ভবতী অণিমাকে প্রায় রুদ্ধ কক্ষে আটক রেখে, এনামুলকে চিঠিপত্র দেবার সমস্ত পথ বন্ধ করে ও এনামুলের সমস্ত চিঠি গাপ করে হেমচন্দ্র যে-কোনো মূল্যে একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য ব্যতীত অন্য গোত্রের একটি পাত্র, খুঁজতে লাগলেন। মইনুল হকচৌধুরী ও এনামুলের চেষ্টায় যে-টাকা-পয়সা গহনাপত্র আসবাব সমস্ত সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, তাতে

মুখেরা গ্রামে জমি সহ বসতবাটি, ব্রাহ্মণত্ব ও ধর্মবোধ একই সঙ্গে তিনি ভারত ইউনিয়নে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। মাঝখানের কয়েকটা দিন তিনি মুছে দিতে চাইছিলেন।

এবং অবশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০-এ জুলাই, অর্থাৎ অনিমা পাকিস্তান থেকে আসার মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই, মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ীর সঙ্গে হেমচন্দ্র দুই মাসের গর্ভবতী অনিমার বিবাহ দেন। ও সেই বিবাহের সাত মাস পরে সে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বল্লভপুর হাসপাতালে একটি পূর্ণাঙ্গ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সন্তান প্রসব করে। এ-সন্তানের গর্ভসঞ্চার হয়েছে এনামুল হকচৌধুরীর স্ত্রীরূপে, প্রসব হয়েছে সত্যব্রত লাহিড়ীর স্ত্রীরূপে।

দ্বিতীয় মত : ভারত ইউনিয়নে চলে আসার পর দীর্ঘদিন হেমচন্দ্র অনিমার কোনো খবর পান না। অথচ তাঁর আশা ও আশঙ্কা ছিল কোনোদিন হয়তো অনিমা ফিরে আসতেও পারে। তাই তিনি সবাইকে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন ও বলেছেন যে সে তার বড়দির কাছে আসামের চা-বাগানে আছে। অবশেষে হঠাৎ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনিমা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় মুখেরায় এসে উপস্থিত হয। সে নাকি বলে যে হেমচন্দ্র সান্যাল পাকিস্তান ছাড়বার পরদিনই সে এনামুলের হাত থেকে পালায় ও তারপর বহু কষ্ট ও যাতনার পর পাকিস্তান থেকে বেরুতে পারে ও তারপর নানা সূত্রে চেষ্টা করে হেমচন্দ্র সান্যালের ঠিকানা বার করে।

হারানো সন্তান ফিরে পেয়ে হেমচন্দ্র প্রথমে তাঁর ভগ্নশরীর সারিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন ও সেই কারণে সব সময় সে ঘরের মধ্যে থাকত ও বাইরের কারো সঙ্গে মেশাব সুযোগ পায়নি। মাসখানেকের মধ্যেই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয়। এবং যে-ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন, তাঁর চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার আগেই মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র শ্রীসত্যব্রত লাহিড়ী বি-এর সহিত অনিমার সম্বন্ধ আসে। কন্যার প্রতি কর্তব্যের তাড়ায় ও নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর রাখতে না-পেরে হেমচন্দ্র এ-বিবাহে সম্মত হন। এবং ১৯৫২ সালের ৩০-এ জুলাই সত্যব্রতের সঙ্গে অনিমার বিবাহ হয়।

বিবাহের মাসখানেক-মাসদেড়েক পরে অনিমা যখন বাপেব বাড়িতে আসে, তখনি তার গর্ভের লক্ষণ দেখা যায়। এ-বিষয়ে মুখেরার প্রতিবেশীরা সাক্ষ্য দিতে পারেন। চার মাসের মাথায় অনিমাকে বল্লভপুর পাঠানো হয়। এবং সাত মাসের শেষে ১৯৫৩ সালেব ১৭ই মার্চ অনিমার একমাত্র সন্তানের জন্ম হয। এ-গর্ভসঞ্চাব সত্যব্রতেব সঙ্গে বিবাহের পরে ও এ-সন্তানের একমাত্র পিতা সত্যব্রত।

যদি এনামুল অনিমাকে ব্যবহার করার সুযোগ পেত, তবে কি আর অনিমা ছাড়া পেত, আব সেই লম্পট গুণ্ডার সঙ্গেই যদি সে থাকত, তবে এক বৎসর পব তার গর্ভসঞ্চারের কারণ কি?

সমস্ত মতামত বিবেচনা করলে দেখা যায়—(ক) অনিমা এনামুলকে ভালোবাসত, নাকি এনামুল জোর করে অনিমাকে আটকে রেখেছিল (খ) অনিমা এনামুলকে নামান্তরিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল, নাকি বাধ্য হয়ে (গ) অনিমা সত্যব্রতকে গোত্রান্তরিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিল, নাকি বাধ্য হয়ে (ঘ) অঞ্জনা কার কন্যা, এনামুলেব না সত্যব্রতেব— এই চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর অনিমার প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করছে, এবং

অঞ্জনার। এবং প্রশ্নগুলি মানুষ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের কাছাকাছি নিয়ে যায়, অতি দ্রুত ও অতি সোজাসুজি।

যতদিন এই সোজাসুজি প্রশ্ন চারটির সত্য জবাব পাওয়া না-যাচ্ছে, ততদিন যাঁকে আপনি স্ত্রী বলে জানেন, তিনি আপনার স্ত্রী নন; যাকে আপনাদের সন্তান বলে জানেন, সে আপনাদের সন্তান নয়।

সুতরাং নিজেব আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয় সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিতে প্রমাণ করুন আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।

খিড়কিতে সদরে দাওয়ায় সিঁড়িতে তুলসীকোণায় ঘরের আনাচে কানাচে অন্ধকার। দ্রুতবিস্তারী বন্যার মতো, প্রাণান্তিক মহামারীর মতো, আত্মপরিচয়হীন উদ্বাস্তু অণিমা আর সত্যব্রত সে অন্ধকারকে তপ্ত তরল লোহার ফুটন্ত সমুদ্র ভেবে বিলীন হতে চাইল।

পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেগুলি সংসার ছিল, এখন সেগুলি আলোহীন চোখের গর্ত—যেন মিথ্যা পল্লব তুলে উঠোনে অণিমা আর সিঁড়িতে সত্যব্রতের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই ঘর, সেই বাড়ি, সেই পরিবার, সেই সুখ, পা-গজানো রাক্ষসের মতো সত্যব্রত-অণিমার চারিদিকে আচ্ছন্ন করে তোলে এবং সেই ক্রমঘনিষ্ঠ অন্ধকারের আকাশে নিঃশব্দ ঘোষণা—"তুমি, তুমি নও সত্যব্রত। তুমি, তুমি নও অণিমা।"

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুটি আত্মা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে—বাইরে কচি করুণ একা-কণ্ঠে তীরের মতো তীব্রস্বরে অন্ধকারকে ভেদ করে অঞ্জু তাদের আত্মার তর্পণের মন্ত্র হাঁকবে : "বাবা" "মা"—তারই অপেক্ষায়।

রেশমি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সত্যি শেষ পর্যন্ত মহাফাঁপরে পড়ে গেলাম।

কে সে! চিঠিতে জানতে চাইছে আমি তাকে চিনতে পারি কি না। আমার লেখা অনুরাগীদের চিঠি প্রায়ই আসে। আজকাল আব কারো চিঠিরই উত্তব দিই না। সংসারে বেঁচে থাকাটাই প্রাণান্ত, আবার রোজ বসে বসে সব চিঠির জবাব দেওয়া কঠিন কাজ। চিঠির জবাব দিয়েও কম ফ্যাসাদে পড়তে হয়নি। উত্তরে আবার চিঠি পাঠিকারা একটু বেশি চিঠি দিতে ভালবাসে।একবার কী কারণে, তখন বয়স কম, বেশ যত্নের সঙ্গে একজন পাঠিকাকে চিঠির জবাব দিয়েছিলাম, তার ফল এতদূব গড়িয়েছিল যে সংসারে বড় রকমের ঝড়ের মুখে পড়তে হয়।

তারপর থেকেই ভেবেছিলাম, না আর না। সংসারী মানুষ। ছেলেরা বড় হচ্ছে, আমরা তো আর বড় মাপের মানুষ নই যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু লেখালিখি সার করে বেঁচে থাকব। সংসার থাকল কী ভেসে গেল—এমনও ভাবতে পারি না। আসলে লেখালেখির সবটাই আমার কাছে অর্থ উপার্জনের বিষয়, সংসাবকে সুশ্রী করে তোলার জন্য, অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আব দশটা প্রফেশনেব মতো আমার এটা প্রফেশন। যে সংসারের জন্য লেখালিখিতে ডুবে থাকছি, সেখানেহ যদি ঝড় উঠে খুঁটি আলগা করে দেয় তবে আর লিখে কাজ কী।

আরও ফ্যাসাদ, গল্প-উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে এমন সব প্রশ্ন তোলে, কিংবা গল্পেব কোনো ঘটনার মধ্যে তারা জীবনের এমন সব তাৎপর্য পেয়ে যায় যে, আমি লেখাব সময় কিংবা পরে নিজেও সেটা আবিষ্কার করতে পারি না। ফলে চিঠিব জবাবে দু'চার লাইনে, এবং যত সংক্ষেপে সম্ভব দিয়েছি, এতে দেখেছি অনেক পাঠকপাঠিকাই পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছে, এত অহংকার ভাল নয়। একজন লেখক এভাবে চিঠি লিখতে পারে আমরা ভাবতে পারি না। আসলে তারা আমার চিঠিতে গল্প-উপন্যাসের মতো আবেগ চায়, ফুল-ফলের সৌন্দর্য আশা করে। এত সাদামাটা চিঠি তাদের খুশি করতে পাবে না। এবং এই বয়সে বুঝেছি, এই বয়সে কেন আরও অনেক আগেই, যত বেশি আত্মগোপন করে থাকা যায় ততই মঙ্গল। একজন পাঠিকা তো এই কিছুদিন আগে চিঠির জবাব না পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে লিখেই ফেলেছে, আসলে আপনি অত্যন্ত বাজে লেখক। শিষ্টতাব অভাব থাকলে বড় লেখক হওয়া যায় না। সব মহান লেখকই জীবিতকালে পাঠক-পাঠিকাদের অগ্রাহ্য কবতে পাবেননি। তাঁবা কত সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেছেন, পত্রসাহিত্যে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল।

তাকে লেখার ইচ্ছে হয়েছিল, এ-দলিলে আমাব পেট ভববে না। আব ভুলে যাচ্ছেন কেন, লেখাটা তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভবত আদর্শ ছিল, আমাদ ক্ষেত্রে জীবিকা। আমরা নদীর এ-পার ও-পারের মানুষ। আমার সঙ্গে তাঁদেব তুলনা করে নিজেকে আর খাটো করবেন না। অবশ্য পরে ভেবে দেখেছি—এটাও আর একটা বোকামি হয়ে যাবে, চিঠিতে সে আবার এমন সব তর্কের অবতাবণা করবে, যে আমাকে ক্ষোভে দুঃখে এবং বিরক্তিতে আবার চিঠি লেখাতে বাধ্য করবে।

চিঠির জবাব না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ—কিন্তু এবারে যিনি চিঠি দিলেন, তার প্রথম চিঠিটি ছিল এ রকমের—

তুমি আমাকে চিনতে পারছ কি না দ্যাখ।একটা কাগজে তোমার ঠিকানা ছাপা রয়েছে দেখলাম। এখন আমরা নারাণগঞ্জে আছি। তুমি যে আমাদের মামার বাড়ির দেশের ছেলে, সেটা জানতে পারলাম গত বছর। নরেশকাকা এসে বললেন, জানিস রেশমি, আমাদের মেজঠাকুরের ছেলে, তোর মনে আছে, আরে তোর মামার বাড়ির দেশের লোক। তুই ঠিকই বলতিস, এ-লেখক আমাদের অঞ্চলের মানুষ। খংসারদির পুল, দামোদরদির মঠ, আলিপুরার বাজার, বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারী—কী না আছে তার লেখায়। তুমি আমাদের বড় চেনা। আমি কে এটা তোমাকে এবার আমার ঠিকানায় জানাতে হবে।

আমার উপর কোন বড় রকমের অধিকার না থাকলে, সে এ-হেন চিঠি লিখতে পারে না। শেষে লিখেছে, আমার নাম রেশমি।

রেশমি! সে কে? তাকে কিছুতেই যে চিনতে পারছি না। রেশমি, কে রেশমি। তা শৈশবে আমাদের গাঁয়ের কোন কোন মেয়ের মামার বাড়ি ছিল, এতটা মনে রাখব কী করে।

আমার স্ত্রী এবং ছেলেরা আমার সব চিঠিই দেখে থাকে। পাঠিকারা চিঠি দিলে, তারা নিজেরা খুলে পড়ে। স্ত্রী পড়েন—এ স্বাধীনতা আমি তাদের দিয়েছি। তারা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে, বিশেষ করে বড় ছেলে, সোনা বলবে, আবার একটা মেয়ে বাবা তোমাকে চিঠি দিয়েছে।

রেশমির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

তবে স্ত্রী বলেছিল, আমার মনে হয় রেশমি তোমার বাল্যসঙ্গী।

আমি বললাম, ধ্যাৎ, রেশমি বলে কাউকে আমি চিনিই না। স্ত্রী প্রথম চিঠিটি হাতে দিয়ে মুচকি হেসে চলে গেছিল। যেন আমি সত্য গোপন করছি। এত রাগ হচ্ছিল যে কী বলব!

যাকে চিনি না তাকে নিয়ে স্ত্রীর আড়চোখে তাকানো আমার ভাল লাগে না। সারাটা দিন মনে করার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আবু শোভা, সুকেশের দিদির মেয়ে, কিরণী এমন সব বাল্যসঙ্গিনীরা চোখের উপর ভেসে উঠল। কিন্তু রেশমি বলে কাউকে আমি আবিষ্কার করতে পারলাম না।

এরপর ক'দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাববার চেষ্টা করেছি—স্ত্রী একটু অন্যমনস্ক দেখলেই বলেছে, রেশমি দেখছি তোমাকে খুবই ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।

আর দশটা চিঠির মতো একদিন রেশমির চিঠির কথা ভুলে গেলাম। এমন রহস্যময় চিঠি আরও যে না এসেছে তা নয়। আর দশটা চিঠিব মতোই এ চিঠিরও কোন গুরুত্ব দিলাম না। একটা মানুষ তো শুধু লেখে না, বিশেষ করে আমার মতো সামান্য লেখককে অফিস, বাজার বাড়িঘর, অসুখবিসুখ সবই ভাবায়। কে না কে রেশমি তার জন্য আমার অত ভাববার সময় নেই আর সেই বয়সও নেই যে কোন বাল্যসঙ্গিনীর প্রেমের কথা ভেবে কিছুদিন উদাসীন থাকব। সত্যি বলতে কী, চিঠিটা পেয়ে পরেরদিকে বিরক্ত বোধ করেছি। আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলার কী অর্থ বুঝতে পারি না। সব খুলে লিখলেই হত।

এর ঠিক মাস দুই বাদে আবার রেশমির চিঠি। লিখেছে, আমার প্রথম চিঠির জবাব দাওনি। মনে হয় তুমি আমাকে ভুলে গেছ। তোমাদের কড়ুই গাছের নিচে একবার আমার তুমি কান মলে দিয়েছিলে। আমি তোমার হাত কামড়ে ছুটে পালিয়েছিলাম। মনে পড়ছে? মনে পড়লে জানিও, রেশমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকবে।

এ তো ভারি ঝামেলা হল দেখছি। মনে পড়লে জানাতে বলছে। আমি যে মনে করতে পারছি না, আর ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর আগে কার কান মলে দিয়েছিলাম, কে আমার হাত কামড়ে ছুটে পালিয়েছিল, মনে করি কী করে। কিন্তু চিঠিতে আমাদের বাড়ির গাছপালা আর বাড়ির এমন বর্ণনা দিয়েছে, এমন কী ঠাকুরঘরের পাশে লেবু গাছটির কথা লিখতেও ভোলেনি—অথচ পরিষ্কাব করে লিখছে না আমাদের গাঁয়ের কার বাড়ি তার মামার বাড়ি! সে কে! দেখতে কেমন! কী করে!

এমন নয় যে সে আত্মগোপন করতে চায়। শীতলক্ষ্যার পারে শহর। নদীর এ-পারে বন্দর বলে একটা জায়গা আছে।লিখেছে সেখানে থাকে। ঠিকানা দিযেছে। নাম, একটা কলেজের নাম এবং শহরটির নাম। বাস এই পর্যন্ত। লিখেছে এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই পাব।

সকালবেলায় লেখালিখির অভ্যাস। একবার ভাবলাম—চিঠি লিখে জানিয়েই দিই, রেশমি তোমাকে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। তোমার মুখ মনে পড়ছে না। তাছাড়া রেশমি বলে কাউকে আমি সত্যি জানি না। অথচ তুমি আমাদের দেশ গাঁয়ের বাড়িঘরের এমন হুবহু বর্ণনা দিয়েছ, যে না চিনতে পারায় আমি নিজেই অস্বস্তিতে পড়ে গেছি। লিখেছ বাস্তু পুজোর সময়, 'তুমি ঠাকুরকাকার সঙ্গে আমাদের গাঁযে আসতে।' সবই ঠিক। আমাদের বংশ পুরোহিতের বংশ। আমাদের বাবা জ্যাঠা কাকাবা পুজা-আর্চা করতেন। আবার মুড়াপাড়ার জমিদারদের বাড়িতে তাঁরা আমল'রও কাজ করতেন। বড় বড় পুজার সময় ঠাকুরদা একা পেরে উঠতেন না। বাবা কাকারা চলে আসতেন— আমরা চার পাঁচ ভাই এক একজন সঙ্গে—আমি ঠাকুরকাকাব সঙ্গেই বেশি যেতাম। বাস্তু পূজায় চরু রান্না করতে হয়। চরু বান্নার ভার থাকত আমার। যারা ছোট ছিলাম তাদের উপর এই ভার। যে বাড়িব চরু রান্না আগে, সে বাড়ির পূজাও আগে। সমবয়সী মেয়েরা তখন ঘিরে থাকত, ঠাকুর আমাদেব বাড়ি আগে। ওরা ফ্রক পরে কেউ শাড়ি পরে বসে থাকত—কতক্ষণে নিয়ে যাবে। তুমি কী তাদেরই একজন? সব খুলে না লিখলে বুঝব কী করে বেশমি তুমি কে?

এই পর্যন্ত। ভাবাই সার। চিঠি লেখা আর হয় না। তা ছাড়া জীবনেব অনেকটা পথ পেছনে ফেলে এসেছি। এতটা পথ পেছনে ফিবে যাবাব মতন আর তাগিদও অনুভব করছি না। আসলে ভেতরের মানুষটা কোনো এক অপরাহ্নেব দবজায় হাজিব। তার আর রেশমির কথা ভেবে কী হবে। এইতো, বড় ছেলে আজই চলে যাচ্ছে হস্টেলে। ওর কলেজ খুলে গেছে। ছোট ছেলে স্কুলে যাবে, ভাড়ার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী সকালে স্কুলে চলে গেছে। রান্নাব মেযেটি বলছে, কাকা আপনার আলাদা ঝোল করতে বলে গেছে কাকিমা। করব?

মুখটা আমার গোমড়া হয়ে গেল। কাল বিকেলের দিকে সামান্য অ্যাসিড হয়েছিল, জেলুসিল খেয়েছিলাম,—কেন যে খেতে গেলাম, না খেলেও তেমন কিছু হত না,

একটু অসুখবিসুখ হবে না মানুষেব! অ্যাসিড হয়েছে, আলাদা রান্না। সে যে কী রান্না হবে বুঝতে পারছি, তেল মশলা ছাড়া রান্না। অখাদ্য। ঐ খেয়ে যেতে হবে। না খেলেই অশান্তি।

বললাম, কর। না করলে বাড়ি মাথায় করবে। বলবে সবাই মিলে তোমরা মানুষটাকে মেরে ফেলতে চাও। সবাই মিলে কথাটার অর্থ খুবই ব্যাপক।আমরা সংসারে চারজন মানুষ, আমি ও স্ত্রী উভয়েই কাজ করি। ওতেই সচ্ছল সংসার। আমার লেখালিখির জন্য মগজের মধ্যে তোলপাড় চলে, কী দরকার এত লিখে, আমার লো প্রেসার আছে, একবার মাথা ঘুড়ে পড়ে যাওয়ায়, সোজাসুজি স্ত্রীর জবাব, লিখচ শুনলেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আসলে সে বোঝে আমার আলাদা অনেক দায় আছে। হয়তো এ-সব দায় আমার না নিলেও চলত। কিন্তু কপাল। আমি খাচ্ছি, আমি সচ্ছল, ভাইরা অভাবে থাকবে, দু'বেলা পেট ভরে তাদের ছেলেমেয়েরা খেতে পাবে না, এ-সব আমাকে ভাবায়। সবার ভার যেন আমি স্বেচ্ছায় মাথায় বহন করে চলেছি—আমার পিঠে ক্রুশ, আমার স্ত্রী হয়তো ভাবে, লোকটা এই ক্রুশ পিঠে নিয়ে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রুশটা আমি নিজেই পিঠে বহন করছি। এটি আমার শখ—শখের দায় মেটাতে সকাল হলেই উবু হয়ে লিখতে বসা। সে বোঝে, আসলে এই লোকটার একটা হিসেব আছে, এই লেখার টাকাটা এর, এই লেখার টাকাটা ওর। কাজেই লিখতে বসলেই ভাবে, কবে না আমার কিছু একটা হয়ে যায়। মানুষটার তো তখন হুঁশ থাকে না। সেরিব্রালটাল কিছু না হয়ে যায়। সবাই মিলে লোকটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। কারোর উপরই সে খুশি নয়। কারণ কেউ তো তার শরীরের খোঁজখবর নিতে আসে না, আসে কেবল অভাবের কথা বলতে। টাকা নিতে। তার উপর এই চিঠির উটকো ঝামেলা কে সহ্য করে!

আমি এ-সব বুঝি বলেই, ছুটির দিনে লিখি না। ও স্কুলে চলে গেলে লিখতে বসি। ও টের পায় না। লেখা বের হলে বলবে, লেখ কখন! আমি চুপ মেরে যাই। অর্থাৎ আমাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখাব জন্য স্ত্রীর ভাবনার শেষ নেই। এ-সব চিঠি এলেও তার এক কথা, বলি তোদের কী খেয়েদেয়ে কাজ নেই, লোকটাকে ব্যাতিব্যস্ত না করে রাখলে চলে না। রেশমির দ্বিতীয় চিঠির কথা বাধ্য হয়ে গোপন করে গেলাম। কী জানি, সে হয়তো নিজেই লিখে দেবে, তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে অযথা এ-ভাবে চিঠি লিখে বিব্রত করবেন না।

অবশ্য এ-সব চিঠিতে আমি এক ধরণের মজাও পাই। কত দূরে বসে, কেউ আমার কথা ভাবে। আমার সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামায়। আসলে সব চরিত্রের ঈশ্বর আমি, এটা ভাবতেই বেশি ভাল লাগে। কাজেই পাঠক-পাঠিকাদেব চিঠি আমাকে ভেতরে এক ধরণেব প্রেরণা যোগায়। এবা আছে বলেই আমি লিখতে সাহস পাই—তারাই আমার সব অনুপ্রেবণা। অবশ্য এ সব কথা প্রকাশ করি না। বরং এদের চিঠি এলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার একটা মুখোশ সংসার ঠিক রাখার ভয়ে পরে থাকি। কিছুই গোপন করি না। এই প্রথম আমি রেশমির দ্বিতীয় চিঠিটা যাতে কারো হাতে না পড়ে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলি।

ক'দিন আবার উচাটনে গেল। চিঠির উত্তর দিইনি। আমি জানি রেশমি আবার চিঠি দেবে। কারণ সে আমার জন্য এখনও হয়তো কোনো মুহূর্তে খুব দুর্বল হয়ে

পড়ে। আমার সব সে মনে রেখেছে—আর আমি তার সব ভুলে গেছি।

রেশমির চিঠি আসার আবার সময় হয়ে গেছে। আমার অফিস বিকেল বেলায়। ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা হয়ে যায়। শুতে শুতে রাত বারটা—খুব সকালে উঠি। সকালেই লেখার অভ্যাস। স্ত্রী স্কুল থেকে ফিরে এলে একসঙ্গে দুজনে টেবিলে খেতে বসি। তারপর সামান্য দিবানিদ্রা—দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি—এমনই অভ্যাস গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা এখন কেবল মাথায় পাক খাচ্ছে। রেশমির তৃতীয় চিঠিটা বাড়ির আর কারো হাতে পড়ে আমি চাই না। ঠিক দুটো আড়াইটের সময় রোজ পিওন আসে। সুতরাং আমি উপরে থাকলে কাজের লোকের হাতে চিঠি পড়তে পারে। স্ত্রীর হাতেও। খেতে বসে বললাম, নিচেই শোব। আমার বসার ঘরে একটা ডিভান আছে। ওতে শুয়ে পড়লে স্ত্রীর মুখব্যাজার হয়ে গেল। বলল, এখানে ঘুম হবে। পাশের বাড়ির মানুষজন ঘরটার পাশ দিয়ে যায়। তাদের বাড়ির চেঁচামেচিতে আমার ঘুমের বারটা বাজবে, না ঘুমোলে আমার মগজ বিশ্রাম পাবে না, স্ত্রীর এমন একটা আশংকা আছে। মগজে পোকা ধরে যেতে পারে, মগজ বস্তুটি স্ত্রীর কাছে খুবই মূল্যবান—সে জেনে রেখেছে, এবং ডাক্তারের পরামর্শ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায়। একবার অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ডাক্তার বলে গেছিলেন—ওর খুব বিশ্রামের দরকার। নিচে শুলে সেই বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে এমন ভেবেই তার এক কথা, না, ওপরে গিয়ে শোও। নিচে শুতে হবে না।

রেশমি যদি বুঝত, 'একজন লেখকের কত রকমের পারিবারিক ঝামেলা থাকে। তা হলে সে এ-ভাবে চিঠি লিখত না। বললাম, খেয়ে আর সিড়ি ভাঙতে ইচ্ছে হয় না। নিচে দুটো বালিশ পাঠিয়ে দাও। ওতে কাজ হ'ল। দোতলার সিঁড়ি ভাঙা এ-বয়সে খুব একটা যে ভাল না সে বোঝে। লো-প্রেসারের মানুষ, কাজের মেয়েটাকে দিয়ে নিচে দুটো বালিশ পাঠিয়ে সে উপরে শুতে চলে গেল।

আমি এখন আর দিবানিদ্রা যাই না। চোখ থাকে রাস্তায়।

পিওন আসা মাত্র জানালার গ্রিলের ফঁকে হাত বাড়িয়ে দিই। চিঠি বলে সে আব হাঁকে না। দু'জনের মধ্যে একটা গোপন ব্যবস্থা হয়ে যেতেই কিছুটা নিশ্চিন্ত এবং এ-ভাবেই একদিন রেশমির তৃতীয় চিঠিটিও আমার হাতে এসে গেল।

গোটা চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারলাম তার ক্ষোভের অন্ত নেই। লিখেছে,না হয় তুমি বড় লেখকই হয়েছ, তাই বলে এ-ভাবে তুমি আমাকে ভুলে থাকতে পার। তুমি এত বড় বেইমান। তোমার হৃদয় বলেই কিছু নেই! আমি তো তোমার কিছুই কেড়ে নিতে চাই না। কেবল জানতে চাইছি, তুমি আমাকে মনে বেখেছ কি না। আমি তোমাকে ডুরে শাড়ি সেদিন বের কবে না দিলে, ভিজে জামা কাপড়ে তোমাকে পচতে হত। সেদিন তো মরতে বসেছিলে!

চিঠিটা বার বার পড়লাম।

আমি মরতে বসেছিলাম! সেটা কবে।

এত ভুলে গেছি সব!

সংসার আমাকে তবে কোথায় নিয়ে এসেছে। লেখা আমাকে তবে কোন ভিন্ন গ্রহে এনে পৌছে দিল।

অফিসে গেলাম। কাজে মন বসল না।

আজ আমার যে সুদিন, আমি যে আজ এত দূরের চিঠি পাই, এবং আমি যে এখন নামি মানুষ, সব তবে রেশমির জন্য। সেই আমাকে বাঁচিয়ে ছিল। সে না বাঁচালে, আমি কবেই নিঃশেষ। নিজেকে ভারি স্বার্থপর মনে হল। ভাবলাম, এই রহস্যের মধ্যে পড়ে থাকলে আমার শুধু লেখার ক্ষতি হবে না, মানসিক ভাবেও আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

অফিসে চিঠিটি নিয়ে গেলাম। সেখানে বসেই লিখব ভাবলাম, সুচরিতাসু, তোমার তিন তিনটি চিঠি আমি পেয়েছি। তুমি অনেক সঙ্কেত চিঠিতে দিয়েছ, যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি কিছুতেই তোমাকে মনে করতে পারছি না। আশা করি এ-জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

সহকর্মী নন্দবাবু বললেন, কী ব্যাপার ক'দিন থেকে আপনি কেমন গুম মেরে গেছেন। কী হয়েছে?

বললাম, না কিছু না তো!

বাড়িতেও এ-অভিযোগ! তোমার হয়েছে কী। সারা সকাল নাকি জানলার ইজিচেয়ারে বসে থাক। লেখাটেখা মাথায় উঠেছে।

বললাম, কী জানি, কে বলল তোমাকে সারাদিন দোতালার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকি।

আসলে চিঠির উত্তর দিতে পারলে বেশমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম। এত বার ভেবেও চিঠির উত্তর দিতে সাহস পাইনি। যে এত বড় সত্যের কথা লিখেছে, সেদিন তো মরতে বসেছিলে, এমন লিখেছে, তাকেই আমি ভুলে গেছি—না বুঝতে পারছি না, মাথায়কোনো গণ্ডগোল দেখা দেয়নি তো। স্মৃতি বিলোপ হয়, ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর আগেকার অনেক ঘটনাই আর মনে পড়ে না, কিন্তু রেশমি তো চিঠিতে একটা না একটা সঙ্কেত রাখছে, যাতে আমার স্মৃতি ফিরে আসে, তাকে আমি চিনতে পারি। আব তাকেই যদি লিখি, না আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। আমি কবে মরতে বসেছিলাম,তাও জানি না। এমন চিঠি পেলে রেশমি খুবই ভেঙে পড়তে পারে— আবাব মনে হল কোনো পাগলেব কাণ্ড নযত। তাই কি করে হয়, আমাদের ঘরবাড়ি গাছপালা পুকুর, গোয়াল এবং অদূরে সেই ছোট নদীর কথা এমন সুন্দর করে লিখেছে যে মনে হয় কোনো কবিতা।

রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না।

আমি কবে মবতে বসেছিলাম, কে সেই মেয়ে যে তার ডুবে শাড়ি বের করে দিয়েছিল। শেষ চিঠিতে লিখেছে, আমারও বয়স হয়েছে। আমিও আর বালিকা নেই। সারাটা দিন ছাত্রীদের নিয়ে কাটে। রাতে যখন নিজের কোয়ার্টারে বসে থাকি, যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন তোমার লেখা পড়ি। বিশেষ করে তোমাব আত্মজীবনীমূলক লেখাটি। সেখানে সবাই আছে—কেবল দেখতে পাই আমিই নেই। খুব কষ্ট হয়। একটা গাছ তো একাই বড় হয় না। সে সবাইকে নিয়ে বড় হয়। সবাইকে নিয়ে বড় হয় বলেই তার শেকড়বাকড় সহজে আলগা হয় না।

ঘুম আসছিল না। ভাবলাম সত্যি মিথ্যে যা হয় একটা চিঠি কাল ওকে লিখব। লিখব, তুমি সেই রেশমি, হ্যাঁ, চিনতে পারব না কেন। তুমি আমায় ডুরে শাড়ি দিয়েছিলে পরতে। তোমাদের গঞ্জের। গঞ্জ! গঞ্জ কেন। গঞ্জের দোকানে...এ-সব আমি

কি ভাবছি, গঞ্জের দোকান হবে কেন। গঞ্জেরদোকানে রেশমি...স্মৃতির অতল থেকে কারা সব কিলবিল করে ভেসে উঠছে।আমার সব মনে পড়ছে। সব সব। চিৎকার করে উঠলাম,আমার সব মনে পড়েছে রেশমি।

স্ত্রী সহসা উঠে আমার পাশে এসে দেখছি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে।—কী হয়েছে তোমার! কী তোমার সব মনে পড়ছে।

সত্যি ছেলেমানুষী হয়ে গেছে বড্ড। আমি বললাম, না এমনি। একটা গল্পের প্লট মাথায় এসেছে। শেষটা মনে করতে পারছিলাম না। চরিত্ররা শেষটা কী হবে বলতে পারছিলাম না।এইমাত্র বলে গেল—শেষটা এই হবে। মনে করতে পারছ না বললাম, হ্যাঁ, সব মনে করতে পারছি।

স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, যাও শোওগে। দুপুর রাতে উনি উঠে গল্পের প্লট মাথায় করে বাড়ি তোলপাড় করছেন। আমি যদি কাল তোমার লেখাপত্র সব ছিঁড়ে না ফেলি, আমার নামে কুকুর পুষো। তারপরই হাউ হাউ করে কান্না, তোমার লেখাই সব। আমাদের কথা তুমি ভাব না। তোমাব কিছু একটা হলে আমাদেব কী হবে।

পরদিন গোপনে রেশমিকে চিঠি লিখলাম—

রেশমি, নদীতে সহসা ঝড় উঠে গেল। ঝড় শিলাবৃষ্টি। শেকড়বাকড়েব মতো আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।কোথাও কড়াত করে বাজ পড়ল পর পর দুটো। নদীর জল প্রবলভাবে ফুলে ফেঁপে গেল। বর্ষাকাল, চারপাশ জলে থৈ থৈ করছে। গঞ্জের মতো জায়গায় হলধর আমাকে টানতে টানতে তুলে এনেছে কোনোরকমে। হাড়ে মজ্জায় শীত ঢুকে আমাকে কাবু করে ফেলেছে। নৌকোটা চবের মাথায় তুলে দিয়ে ভিজতে ভিজতে সাঁকো পার হয়ে এলাম। সাঁকোর নিচে কোনো কুটিব হবে। অন্ধকারে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পুজোর ছুটি পড়তেই নৌকায হবধর আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। অনেকটা রাস্তা। সকালে রওনা হয়েছি। আহার এবং উত্তাপের বড় প্রয়োজন। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি।

হলধর হাঁকডাল, কে আছেন গো ধরায়। আমাগ বাঁচান। দু'জন মানুষ ঝড়ে পড়েছে। বাঁচান।

দরজা খুলল একজন প্রৌঢ় মতো মানুষ।

বুঝতে পারলাম একটা মশলাপাতির দোকানে আমাকে টেনে এনেছে হলধর। লম্বা টিনের ঘর। মশলাপাতিব গন্ধে সারা ঘব ভুরভুব কবছে। দোকানীকে দেখেই হলধর চিনেছে। বলল, চন্দমশাই এ-হল গে ধন কর্তাব ছেলে। পূজাব ছুটিতে বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছি। মাঝ-রাস্তায় এই বিপত্তি। লম্বা সাড়ে ছ-ফুট মানুষটা গড হযে পড়ল আমাব পায়ে। ভাবি অস্বস্তি আমাব। বললেন, একেবারে জাত সাপের বাচ্চা নিয়ে ঘবে ঢুকলে হে হলধব। কী যে কবি। ও বেশমি এদিকে আয। ঠাণ্ডায কাই হয়ে গেছে। তোর একটা ডুরে শাড়ি বাক্স থেকে বের কবে আন। কী ঠক ঠক কবে কাঁপছে দ্যাখ।

রেশমি, আমাব সব মনে আছে বুঝতে পারছ।

সব কিছুই আমার ভিজে গেছিল। বই, পুঁটলির জামা প্যান্ট সব। গামছা এনে চন্দমশাই নিজেই আমার মাথা শরীব মুছিয়ে দিলেন। দেখি তখন এক শ্যামলা মেয়ে নাকে নথ, লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে যাচ্ছে. ডুরে শাড়ি দিয়ে গেল। ভেজা জামা

প্যান্ট নিয়ে কোথায় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা লুঙ্গি পেয়ে বর্তে গেল হলধর। ডুরে শাড়ি পরে বামুনের বাচ্চা ফণা তুলে গদিতে বসতেই রেশমি সেদিন ফিক করে হেসে দিয়েছিল। কোথায় যেন দেখেছি। তারপরই মনে হল, আমাদের গাঁয়ে ওর মামার বাড়ি। রেশমির বড় এঁটো পাতা চাটার স্বভাব। গ্রীষ্মের ছুটিতে গাছতলায় সবাই আমরা আচার খাচ্ছি। রেশমিও খাচ্ছে। নিজের পাতা চেটে কার কোন পাতায় কি লেগে আছে চেটে চেটে খাচ্ছিল। আমার কেন যে রাগ হল বুঝলাম না। কান টেনে বলেছিলাম, এই কীরে এঁটো পাতা চাটার স্বভাব। সঙ্গে সঙ্গে রাগে ক্ষোভে আমার হাত কামড়ে দিয়েছিলে!

কী, ঠিক ঠিক সব মনে করতে পারছি তো রেশমি। তুমি কে আমি ঠিক চিনতে পারছি তো।

সেদিন সেই মশলাপাতির দোকানে দেখলাম, সেই ছোট্ট মেয়েটিই বালিকা হয়ে গেছে। দুটো বর্ষা না যেতেই ফণা তুলতে শিখে গেছে।

চন্দমশাই বললেন, কখন বের হয়েছ হলধর?

হলধর বলেছিল, সেই সকালে।

—বাদলায় যাবে কী করে! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, চাল ডাল বসিয়ে দিক রেশমি। নেড়ে শুধু নামাবেন। গঞ্জের মানুষ, পেসাদ পেলে জীবন ধন্য। আমার চোখের সামনেই রেশমি তুমি মুখ কুঁচকে ফেললে। নাকের বাঁশি গেল ফুলে। নথটা তির তির করে কাঁপছে। ভারি অবজ্ঞা চোখে মুখে।

কী রেশমি, মনে করতে পারছি! চিনতে পারছি তো!

উনুনে মাজা হাঁড়ি বসিয়ে চাল ডাল জলে ছেড়ে ডাকলে—ও কত্তা আসেন। আদাবাটা দিন। এই নুন থাকল। দুটো শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে দিন। হলুদ দিন। সম্বারে আদা লঙ্কা পাঁচফোড়ন দিন। বামুন মানুষ, শুধু চরু রান্না করতে শিখেছেন। আর কিছুই জানেন না দেখছি। তোমার কথামতো সব করছি। যখন পারছি না হা হা করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছ। কখনও গোঁসা।—ও মা ভাজা তো সব পুড়িয়ে ফেললেন গো। নামান নামান! হাতে স্যাঁকা লেগে গেল। আহা রে! কাঠের ধোঁয়ায় আমার তখন চোখ লাল।আমার নাচার অবস্থা দেখে খুব মজা পাচ্ছিল রেশমি। ভেতরে ভেতরে রাগ হচ্ছিল। বাগে পেয়ে এক হাত দেখে নেওয়া হচ্ছিল।

চন্দমশাই গদিতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন আর রাজ্যের গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন, বাইরে প্রবল বৃষ্টি। ঝম ঝম করে বাজছে। তিনি বলেছিলেন, তীর্থে যাই না, পুণ্য করি না, কেবল দোকান আগলে বসে থাকি খদ্দেরের আশায়। আর মা মরা মেয়েটাকে এনে এখানেই রেখেছি। মাথা বড় সাফ। গঞ্জের স্কুলে সকালে পড়তে যায়। হাতের কাছেই দেবতা হাজির, ছাড়ি কেন।

হলধর বলেছিল, তা ঠিক। তবে ছেলেমানুষ হাতফাত না পুড়িয়ে ফেলে।

—রেশমি আছে না। মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হলধর।

সব হতেই বড় আসন পেতে দিলে রেশমি। কাঁসার গ্লাসে জল। বগি থালায় খিচুড়ি, পাথরের বাটিতে লাবড়া, বেগুনভাজা। বাদলা রাতে গঞ্জের সাড়ে ছ'ফুট মানুষের মচ্ছব। বড় আসনের সামনে সব কিছুই সাজিয়ে নিতে বললেন চন্দমশাই। তারপর করজোড়ে বললেন, খান। দেখি, দেখলেও পুণ্য। চার পাঁচ জনের খাবার। বলে

কি না খান। খাওয়া আমার মাথায় উঠেছে। অদূরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। বাপের কাণ্ডকারখানা দেখে গুম মেরে ছিলে।

চন্দমশাই ফের বললেন, হাত লাগান ঠাকুর।

হলধর বলল, যা পারেন খান,আমরা তো আছি।

এভাবে করজোড়ে বসে থাকলে কেউ খেতে পারে কিনা জানি না, আমি অন্তত পারিনি। এটা থেকে ওটা থেকে জোরজার করে তুলে নেবার জন্য অনুবোধ করছেন। সামান্য খেয়ে উঠে পড়েছি। চন্দমশাই হলধরকে নিয়ে আমার পাতেই উবু হযে খেতে বসে গেল। ডাকল, রেশমি আয়। পেসাদ খাবি মা। কিন্তু তোমার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চন্দমশাই আর কী করেন। জামবাটিতে তোমার জন্য আলাদা কবে তুলে রাখলেন। বললেন, ভোগের পেসাদ মা, তাচ্ছিল্য করতে নেই। বললেন, কী সুঘ্রাণ। যেন তিনি অমৃত ভক্ষণ করছেন।

গদিতে বসেই দেখলাম, রেশমি তুমি আমার ভেজা জামা প্যান্ট মেলে দিচ্ছ।শুতে যাবার সময দেখলাম গোপনে জামবাটিটা তুলে নিয়ে গেলে। কিছুই স্পর্শ কবলে না। সব খাবার বাইরে ফেলে দিলে। কোত্থেকে দুটো কুকুব এসে তা খেয়ে চলে গেল। জানালায় এসে বলে গেলে খুব আস্পর্ধা ঠাকুর। এত আস্পর্ধা ভাল না।

আমার বড় খারাপ লাগছিল। বলেছিলাম, সব ফেলে দিলে।

আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকালে। তারপর মুচকি হেসে বলেছিলে, এঁটো আবার কেউ খায় নাকি। বলেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছিলে।

কী ঠিক মনে করতে পারছি তো রেশমি।

বাইরে তখনও প্রবল বৃষ্টিপাত। ঘন ঘন মেঘ গর্জাচ্ছে। ব্যাঙের গুরুগম্ভীর ডাক। কীটপতঙ্গের ঝিমিঝিম শব্দ কানের কাছে পাঁঠাবলির বাদ্য বাজাচ্ছিল। রেশমি, সে রাতে তুমি কিছু খেলে না। সারারাত অভুক্ত থাকলে। সাড়ে ছ'ফুট মানুষও টের পেলনা, তার অন্নপূর্ণা না খেয়ে আছে। কান মলে দিয়েছিলাম বলে এত রাগ তোমার।

জীবনে সেই প্রথম এক বালিকার অভুক্ত থাকার কষ্টে সারারাত দু চোখ এক করতে পারিনি। তোমার জন্য কেমন একটা সুন্দর কষ্ট ভেতরে রিন রিন করে বাজছে। শেষ রাতে দেখি কখন আগুন জ্বেলে আমার জামা প্যান্ট শুকোচ্ছ। বুঝতে পারলাম, সারা রাত তুমিও ঘুমোওনি। বুঝলাম, দুটো ফুলের কুঁড়ি তাপে ভাপে ফুটে উঠছে। টের পেলাম প্রকৃতির প্রথম কূট খেলা শরীরে। আগুনের আভায় তুমি কেমন জ্বলছ—রহস্যময়ী এক নারী বসে আছে দেখতে পেলাম। সেই আগুনের আঁচেই আমি এতদূরে এসে ঠেকেছি। খর উত্তাপ যখন শেষ হয়ে আসছিল, আবার তুমি মরা আঁচকে খুঁচিয়ে দিলে। কী, আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি তো।

সাইডিং

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

টিফিনের সময় সোমনাথ বললে, 'আমার মনে হয় যূথিকা তোর প্রেমে পড়েছে।' যূথিকা আমাদের নতুন টাইপিস্ট। এই মাসখানেক হল চাকরি পেয়েছে। শ্যামবর্ণ কিন্তু মুখটি ভারি মিষ্টি। দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা, না বেঁটে। মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি করে। চোখে সোনালী ফ্রেমের ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিয়ে চলে গেলে হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আরও মেয়ে আছে, তবে তাদের কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। যেমন সোমনাথ রেবাকে। একমাত্র যূথিকাই ফ্রি আছে। আর অপর পক্ষে আমরা দুজন, আমি আর বিধান। বিধানের সম্প্রতি ফ্লু হয়েছে। অফিসে আসছে না।

'কি করে বুঝলি?'

'টাইপ করতে করতে মাঝে মাঝেই তোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পিছনেই বিশাল একটা জানালা। সেই জানলায় হাওড়ার পোল আটকে আছে। যূথিকা হয়ত পোলটাই দেখে। মেয়েরা অত সহজে প্রেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে তবে প্রেম। প্রেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

'আমার দিকে তাকায় না, আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়।'

'তোর দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।'

'ঠিক বলছিস?'

'ডেড সিওর।'

হতেও পারে সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেমকা কাচ্চে। হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়ে-ছেলে এক্সপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় বলে, এই সংসার সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আমার চাবে ভেড়াতে না পারি। বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যূথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

'আমার এখন তাহলে কি করা উচিত!' প্রশ্নটা করে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল! মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, 'নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মকর্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বি এ সোডা ওয়াটার বট্‌ল। মুখ খুললেই ভাব আর ভাষার গ্যাঁজলা বুজবুজ করে বেরোতে থাকবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ত এখনও মুখোমুখি হয় নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।'

'দ্যাটস ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।'

'ছি ছি ছি চোখ মারা খুব গর্হিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিনু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ খোলা রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজান।'

'আরে সে চোখ মারা নয়। এ হল নজরো কা তীর মারে কষ কষ কষ, এক নেহি, দো নেহি আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমিকের পাওয়াব ফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মনজুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানাটমি।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে আমাদের আলোচনার সাবজেকট উল্টো দিকের দু সার টেবিলের ওপারে বসে খুটুস খুটুস করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে তাকাই নি। যূথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সব মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোর ড্রেসটাও পালটাতে হবে। এই মালকোঁচা মারা ধুতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কেমব্রিজের পাঞ্জাবি গোটা চারেক বানা। স্ট্রিম লন্ড্রিতে কাচাবি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না?'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু থাকবেই। বিনা পয়সায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব, ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রশ্ন শুনে রাগরাগ মুখে তাকাল।

'তুমি শালা জান না কি দেবে? যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস। লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়; কিন্তু বিয়ে! যূথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেরে দূর করে দেবে। ত্যাজ্য পুত্তুর করে দেবে। আমার কোষ্ঠিটাও আবার তেমন ভাল নয়। বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ, শুধু প্রেম হয় না ভাই, বিয়ে ফিয়ে বড ঝামেলাব ব্যাপাব। ওটা এভয়েড করা যায় না।'

'যায়, তবে কিছু স্টিকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছাড়ান যায় না।'

যূথিকাকে তোর কি মনে হয়!'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে বাখ, প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে! হাতে গোনা যায়। আমাদের ইনসিওরেন্সের মত। প্রিমিয়াম

ল্যাপস করবেই। কেস ক্যাঁচ। ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে ধাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে খেলা করে, তৃতীয় দাগা দেয়। তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায়, তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বিয়ের ভয়ে পেছিয়ে যাসনি। সিমটম যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ড্রিবল কর।'

'কি ভাবে করব, বলবি ত?'

'তুইও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি! চোখে চোখ ঠেকলে উদোবক্কার মত করে চোখ নামিয়ে নিবি না। ধরে রাখবি। আস্তে আস্তে সময় বাড়াবি। চোখে হাসবি।'

'চোখে হাসব কি রে। লোকে ত মুখেই হাসে।'

'আজ্ঞে না স্যার। প্রেমিকের হাসি চোখে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি।'

'ভয় করে।'

'কি ভয় করে? কাকে ভয় করে? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর রণে ভয় পেলে চলবে না।'

'আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মুচকি মুচকি হাসত।'

'মধু ইডিয়েট।'

'ইডিয়েট! কেন ইডিয়েট!'

'প্রথমে চোখে চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক ঠোকা। প্রথমে ঠুকুর ঠুকুর তারপর ঠকাস ঠকাস।'

'যদি আবার ঠকে যাই।'

'ঠকে যাই মানে?'

'এই ত তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলটো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মুখ চেনা। হঠাৎ হাসল। আমিও হাসলুম। আমি হাসতেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে। পেছন ফিরে তাকালুম। আমাকে দেখে হাসে নি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল তাকে দেখে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি হয়েছিল! মেয়েটা এত নিষ্ঠুর! কুকুরের মত। ওয়ান মাস্টার ডগ।'

সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মাঝে শিকার ফসকে যায়। প্রেমেব পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের রাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জহবব্রতেব মত, জয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুনে।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। যূথিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। একদিন আমার সঙ্গেও হয়ত হেসে হেসে ওই ভাবে কথা বলবে? জলজ্যান্ত একটা মেয়ে। চুল, খোঁপা, আঁচল। ভাবা যায় না। ভেতরটা কিরকম গুড়ুগুড়ু করে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবাব সত্য হবে। হবে তো?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে ধরে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে রে বাবা? লোকে হাত দেখলে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিল না। সোমনাথ অ্যাসট্রলজি করে শুনেছি। অবশ্য নিজে কখনও সামনে হাত ফেলে পরীক্ষা করে দেখিনি, অ্যাসট্রলজি না হোয়ারোলজি।

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার চুলে ঠেকিয়েই চাটনি চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস ছি ছি, তুই চুলে তেল মাখিস? থার্ডক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হবি! নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল ফুরফুরে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে যাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। ক্রীতদাস হয়ে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে যূথিকার দিকে তাকালুম। না আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নীচু করে টাইপ করছে। কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়েছে। আমি যূথিকার না যূথিকা আমার। ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল। ছোট্ট লেডিস রুমাল বেরকরে ঠোটের ঘাম মুছতে মুছতে যূথিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকাঠুকিব মত চোখে চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মনঘুড়িটা যূথিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরেছে। সাদা ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে। এক পলকের দেখা? কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পিছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙ কবা ঝলমলে মাথা ? সোমনাথ বলে যায় নি কতক্ষণ অন্তর দেখা উচিত। পরের বার যখন চোখ তুলে তাকালুম যূথিকা নেই। শূন্য চেয়ার। ধার তেরিকা, গেল কোথায়! এখন তো সবে তিনটে। ছুটি হতে পাকা দুঘণ্টা বাকি। এর নাম প্রেম। গঁদের আঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না রইল তাহলে আর প্রেম হল কি। বড় অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি। সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধুর, প্রেম ফ্রেম সব ফল্‌স। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো। মেয়েরা হয় হিরোব প্রেমে পড়ে, না হয ভিলেনেব। আমি ত কোনোটাই নই। মাছি মারা কেরানি।

দুই

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে-ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যূথিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নৃপেনবাবু টেবিলে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে উট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সাবা মাসের ঘুসেব হিসাবে ব্যস্ত।

আড়চোখে যূথিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখব না। কালকের ঘটনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। যদি না বলে বেঁচে গেল।

যূথিকা নিচু হয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা ধরে টানাটানি করছে। সরকারী টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রয়ার আটকে যায়। আমাদেরও আটকায়। লাথালাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারী চাকরিও করা যায় না। সবে একমাস চাকরি হয়েছে মহিলার। এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল, এই সুযোগ। নাও অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'কি, খুলছে না? আটকে গেছে?'

উঃ! যূথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাঁড় বেঁকিয়ে খোঁপা লতপতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ।

'দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অথচ...'

'একেই বলে কলের গাঁড়াকল।' বাঃ বেশ বলেছি। স্ট্রেট বলেছি, একটুও আটকায়নি। 'দেখি, সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার কায়দা আছে।'

যূথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেট হয়েছিল। আহা মুখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেয়ারের পাশে বসে পড়লুম। ধুতি পরার ঐ সুবিধে। আমার মুণ্ডুর একেবারে পাশেই যূথিকার জোড়া কল। সেন্টের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোবে শাড়ির ঘের ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সে সব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেল্লা। যূথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

'কই দেখি।'

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই ঝটাস করে মেরে দেয়। প্রথম প্রথম ডি সি। তাবপর কনভার্টারে পড়ে এ সি। আঁকড়ে মাঁকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল তো। জয় মা, দেখো মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বেইজ্জত করে দিও না। খুলতে পাবলেই হিরো। ডানদিক ঘোরাচ্ছি আর কায়দা করে টানছি। আমাব ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা। ওয়ান, টু, থ্রি। কি গুরুবল। খুস করে খুলে গেছে।

'এই নিন।' আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দবী, গলায় ববমালা পবিযে দাও। এত বড় একটা দুরূহ কাজ কবে দিলাম। হরধনু ভঙ্গেব মত ব্যাপাব।

'খুলেছে?' যূথিকা ঝুঁকে পড়ল। ডান গালটা আমার মুখেব কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করাব জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাত টাইপিস্ট। কোথায় প্রেম? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আব দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন বেখাপাত কবল না। কি মন রে বাবা! মা কালীর মত পাষাণী। এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যূথিকাব চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমাব কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'বুঝলেন, আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।'

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, 'কি আটকে ছিল?'

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যূথিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, 'ড্রয়ারের চাবি।'

বকুল বললে; 'মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দে না?'

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি। সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটার আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাগজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশন চাই। বলা যায় না, যদি ফেঁসে যাই, বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে সংসার চলবে না।

সোমনাথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শুরু করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এইবার? হোয়াট নেকসট'। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, 'কত আছে?'

'কি কত আছে?'

'হার্ড ক্যাশ?'

'সে আবার কি! হার্ড ক্যাশ দিয়ে কি হবে? দু-দশ টাকা পড়ে আছে। মাস শেষ হতে চলেছে।

'গোটা পনের টাকা পড়ে আছে। কোন রকমে মাসটা চলবে।'

'ওতে হবে না রে! তোর একটা প্রেম ফাণ্ড তৈরি করতে হবে। মিনিমাম পাঁচশো নিয়ে নামতে হবে।'

'পাঁচশো! অত টাকা পাব কোথা থেকে?'

'কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারান্টার দাঁড়াচ্ছি।'

'ধার করে প্রেম!'

'শাস্ত্রেই আছে ঋণ করে ঘি। প্রথমে পাঁচশো তারপর কেস বেশ জমে গেলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে! তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে।'

'হ্যাঁ আছে।'

'মেমবার?'

'এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকী পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা।'

'লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক। লেখা-পড়া করতে হবে না কি।'

'আজ্ঞে না। অফিসের মেয়েরা বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। কালকে তুই...'

'কালকে তুই কি করবি!'

'তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যূথিকাব সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি।'

'তারপর?'

'তারপর বইটা হল টোপ। কি বই দেখি? ব্যাস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি নিবি আর দিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে।'

'ভীষণ ভয় পাই রে! ছাত্র জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই, ফেরত আর পাই না। সাহস করে চাইতেও পারি না। বই পেয়ে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কি রকম আনন্দ পায় ভাব! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায়। সেই ভয়ে মাইবি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে। হাতে তেমনি পয়সাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম। একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেধড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর আমার কুমকুম!'

'কুমকুমটা কে?'

'আরে সেই বই মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরি। পরে জেনেছিলুম ওই মেয়েটা আমাদের মত এক একটা বোকা ছেলে ধরে ধরে বই মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করছিল, একটু মিষ্টি হাসি, সুর করে টেনে টেনে কথা, উয়ুঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর, ব্যাস, আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বে হেড।'

সোমনাথ ফুস্ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে;

'তোর প্রেম নেই। তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনেদের মত মেন্টালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মনের মানুষ। একজন মেয়ে-পাগল আর একজন ব্রহ্ম-পাগল। দুজনেই পাগল। পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যান পাগল বুঁচকি আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মুতো কাঁথা।'

'তুই বুঝছিস না, আমার এখন একস্ট্রা খরচ করবার মত টাকা নেই ভাই। এক একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।'

'তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।'

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোনো বস্তা পচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসে খেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। বাজ্যেব আরজি। পশ্চিমবঙ্গেব সমাজ চিত্র দুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনায় যূথিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্রাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা! দেশের উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসূন গিয়ে যূথিকার টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। মুলোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যূথিকাও হাসছে। কোনও মানে হয়! প্রসূন আবার ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা, প্রেমেও তেমনি। কোন মেযেব সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই। ফোড়ে ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান গেয়ে কেল্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যূথিকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, ব্যাস,

সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। ধ্যুত প্রসূনটা আচ্ছা হারামজাদা। কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

'সোমনাথ!'

'বল।'

'গান শিখবি?'

'গান শিখে কি করব?'

'ওই দেখ, প্রসূন ব্যাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।'

'যাক না, তাতে তোর কি? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস? ফেউ, এর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিজতে হবে। রোপ ওয়াক। গেল গেল, এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস? তুমি ত শালা জীবনে কিছুই করনি। শুধু জন্মে বসে আছ, প্রেম হল ঘুড়ির প্যাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক, একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুলে ওড়া নীলাকাশের সঙ্গে প্রেম।'

সোমনাথ আবার খসখস করে চিঠি লিখতে শুরু করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। ননপ্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ সেনস বেড়ে যায়। প্রসূন বলছে, 'এ মনিহার আমার নাহি সাজে রেকর্ডটা আমার কাছে। কালই এনে দেবো। ঢং করে একটা সিকি পায়ের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক! যূথিকার পয়সা ব্যাগ থেকে ছিটকে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দুবার ফুঁ মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম।'

'আপনার পয়সা।'

প্রসূন হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে,

'ধন্যবাদ। হাঁ হাঁ, আকাশ ভরা সূর্য তারাটাও আছে। কি নেই আমার কাছে।'

যাঃ শালা। কি বরাত। প্রসূনের পয়সা জানলে কে তুলত! পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম। প্রেম তুমি আমাকে উদার কর। বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় এক তরফা। প্রেমেগলি কি ওয়ান ওয়ে? হৃদয়ের গাড়ি ঢোকে। ঢুকে আটকে যায়। বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয়। আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায় চলে যাই। মাথায় কিছু আসছে না। সোমনাথই ভরসা।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বুঝে গেছে।

'প্রসূন লাইন দিয়েছে। দেখেছি। তোর চেয়ে ভাল ক্যানডিডেট। শীতকালে কাশ্মীরী শাল গায়ে দেয়। পাঞ্জাবিটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা। ভাল গান গায়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেশ শক্তিশালী। বেশ কায়দা করে লড়তে হবে রে! মেয়েছেলের মন পদ্মপাতায় জল। যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি। এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয়। বলবি ডবল স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন। আর ফট করে জিজ্ঞেস করবি, বিকেলে কি করছেন?'

'যদি বলে কেন? কেনটা যদি আবার খুব চিৎকার করে বলে! পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায়।'

'আ মোলো।' সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল। 'রাশকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে। যদি ফদি আবার কি! জীবন হল, ধর তক্তা মার পেরেক।'

'যদি বলে কেন'।

'আবার শালার যদি। বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে!'

'একেবারেই জামপ করে অতদূর!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেই বলে বলিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ। সেকরার ঠুকঠুক কামাবের এক ঘা। যা যা।' যূথিকাকে চিঠিটা টাইপ কররা জন্যে দিতেই, সোমনাথের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ ইশারায় হতের ভঙ্গী মুখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ। যূথিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'কি সাংঘাতিক হাতের লেখা!'

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললুম, 'আমার হাতের লেখা খুব ভাল। মুক্তোর মত। বলে ফেলেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম। প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায়! অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে। ভেরি ব্যাড।

যূথিকা বললো, 'দেখেছি। শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা, মানানসই লেখা।'

যূথিকার কথা শুনে পা কাঁপছে। উরে বাবা, প্রেমের ঘণ্টা বেজেছে ঢং করে। মুখে কথা সরছে না। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিবে এলুম।

সোমনাথ বললে, 'কি হল? জিজ্ঞেস করেছিস? কি বললে? বিকেলে কি করছে?

দাঁড়া এক গেলাস জল খাই।

'কেন? খিস্তি করেছে?'

জলের গেলাসটা নামিয়ে রেখে, হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ফিস ফিস করে বললুম,

'মরে গেছি, ফিনিশ। বুকটা কেমন করছে।'

'পেটে উইন্ড হয়েছে। একটা পান খা।'

'ভাগ শালা। বুকে হিল্লোল বইছে, হিল্লোল।'

'কেন রে। চোখ মেরেছে!'

'মোর দ্যান দ্যাট। তীর মেরেছে। তোর হাতের লেখাব নিন্দে করে আমায় বললে, যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা, ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা।'

'এতেই তোর বুক ধড়ফড়। ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি! তোর গালে হাত দিলে কি করবি। দম ফেল করে মরে যাবি। শোন, কোনটা মেয়েদেব কথা আর কোনটা কথার কথা আগে, বুঝতে শেখ। যা জিজ্ঞেস করে আয়।'

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি। নদী বইবে কুলু কুলু। পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা। গডগডিযে চলে গেলুম।

'আজ বিকেলে কি করছেন?'

'ক্লাস আছে।'

'কিসের?

'স্টেনোগ্রাফির।'

'ও।'

সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম, 'ওরে স্টেনোগ্রাফির ক্লাস আছে।'

'বলে আয় ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা।'

আবার যেতে হল, 'ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা। কোরবানী।'

'কোরবানী।' যেন লাফিয়ে উঠল। 'কে বললে?'

'গ্রেট সোমনাথ।'

'ঠিক আছে।'

সোমনাথকে এসে বললুম, 'ঠিক আছে।'

সোমনাথ বললে, 'সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে, জানবি সে অসুস্থ। স্ত্রী-রোগে ভুগছে।'

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া। বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না, হলে বসে প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার একশেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্লাডিয়েটার কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউবয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দু প্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায় সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার এক কদম পিছনে যূথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যূথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ লাগছে না। হাতে ফোলডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা হাতে তেমন রোম্যানটিক লাগে না। যাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব বলে ত আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে আগে গটগট করে চলেছে। স্টিম-ইঞ্জিনে চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছন পেছন চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে, বগিও সেই দিকে যাবে। ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাতা রেস্তরাঁর অন্ধকার গর্ভে গিয়ে ঢুকল। বেশ মনোরম পবিবেশ। প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই পাখা মুড়ে বসতে পারে। ফিসফাস, খুসখাস ঘেঁষাঘেঁষি। দুল, চুড়ি, গোঁফ, দাড়ি, ঘাড় গলা চিবুক সব একাকার।

সোমনাথ ত খুব গ্যাটগেটিয়ে মেযে বগলে ঢুকল। মেযে ঢুকল ছাতা বগলে। আমি ঢুকলাম কোঁচা বগলে। কিন্তু! কিন্তু আর যদিতেই আমার জীবনটা শোঁযাপোকার মত কুঁকড়েই রযে গেল। প্রজাপতি আর হল না। কত বিল হবে কে জানে। টাকা কে দেবে। আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে।

সোমনাথের বাঁ পাশে যূথিকা। আমি বসেছি উল্টো দিকে একা। সোমনাথ মেজর জেনাবেলের মত হাঁকল 'ওয়েটার'। বাব্বা কি দাপট। 'মেনু প্লিজ'। মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে, 'জিরাপানি'। সেটা আবার কি রে বাবা। মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার, 'বোগনজুস। নাস। স্যালাড। আইসক্রীম ভ্যানিলা। মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল। হাতটা নিস্‌পিস্‌ করে উঠল। একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, ক'টাকার ধাক্কা। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না। নেভি ব্লু সুট পরা ময়ুব

ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়া ঘেরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'তারপর ম্যাডাম!' সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে। এটাই হল ওর টেকনিক। বিরাট পার্সোন্যালিটি, সেগুলো ম্যানিয়াক। ম্যাডাম বলে যূথিকাকে দেওয়াল ঠাসা করে বসল। ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে আঙুলে কিলবিলি খেলছেন। নাকছাবি, দুল, চশমা, আলো পড়ে চিক চিক করছে। স্বপ্ন, স্বপ্ন।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যূথিকার কোল থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ফরেন?'

'হ্যাঁ ফরেন। আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে।'

সোমনাথ ছাতাটা আবার যূথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল। মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠল। উঃ ভাবা যায় না। সোমনাথের কি সাহস রে বাবা। মেয়েদের বোধহয় এই রকমই হাতকেই বলে অ্যাগ্রেসিভ হ্যান্ড। আমি একটা ভ্যাবাচ্যাকা জরদগবের মত উল্টো দিকে বসে আছি। প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক।

ঢক ঢক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল। সোমনাথ বললে, 'নে খেতে থাক অ্যাপেটাইজার।'

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শুধু ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চুমুক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মুখ ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেয়েদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না। মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।

খাবার এসে গেল? সে এক এলাহি ব্যাপার। ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি যেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শুরু করল। যূথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দুজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে যূথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপকিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাণ্ড দেখে আমার মুখ শুকিয়ে আসছে। হয়ে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে।

আইসক্রীম এসে গেল। মাঝখানে আবার কায়দা কবে পাতলা পিচবোর্ড গোঁজা। সোমনাথ বললে পিচবোর্ড নয় রে, ওটা বিসকুট। ওকে বলে ওয়াফার। যূথিকা আদুরে গলায় বললে, 'আইসক্রিম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমনাথ বললে, কিচ্ছু হবে না ম্যাডাম। ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খেলে গলায় ঠাণ্ডা লাগে না।'

সোমনাথের কথা যেন বেদবাক্য। যূথিকা হেসে হেসে খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল। হাত ধোবার গরম জল এল বাটিতে এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিলুম গুরুপাক খাওয়া হল ত, তাই জিরাপানির মত লেবুপানি এসেছে। সোমনাথ

বললে, 'মূর্খ একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটাকে হাতে চটকে দে। ইট কাটস দি গ্রিজ।' পেছনের দিকে মুণ্ডু ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বেয়ারা, বিল।'

কি আদেশের সুর! এ সব ছেলে পৃথিবী শাসন করতে পারে, যূথিকা ত সামান্য মহিলা। বিল এল। আমার জিভেতে তালুতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘড়ি খুলে দিতে হবে। না সোমনাথই পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোটে সিগারেট বাঁকা। নাক ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে। নাকের কাছটা কোঁচকান। চোখ দুটো হয়ে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের তাসের চাল দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তরাঁ থেকে বেরোবার সময় যূথিকার পিঠে তবলায় তেহাই মারার মত করে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বলল, 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। কত কায়দাই জান? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যূথিকা যে ভাবে তোমার বক্ষলগ্ন, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেক্ট স্বামী স্ত্রী।

রেস্তোরার উল্টো দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফেব চামড়ার ওপর হলদে হলদে পান পাতা শোয়ান। বিশাল দোকান। বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মঘাই পান। একটায় কিলপাতি জর্দা। আর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আয়।'

বুঝলাম এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট। সাড়ে তিন টাকা খসে গেল। যূথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাথের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন আমার কাছে দুটো টিকিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করে এনেছি, বাকিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। একটু ইজি না করে দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি, কাল তোকে সব বলব। হয়ে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। পেছনে এবাব একটা বগি। আর একটা বগি সাইডিংএ পড়ে রইল। সেই বগির ভেতব কে একজন হই হই করে হেসে উঠল, মূর্খ মূর্খ! প্রেম বলে কিছু নেই। আছে লটকালটকি, আছে শানটিং।

বাবা হওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

ডাকবাংলোটা থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছিল। সামনে একটা খোয়ার পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। পথের দুপাশে সারি করে লাগানো আকাশমণি গাছ। মার্চের প্রথমে আগ্নিশিখার মত ফুটেছে ফুলগুলো। আকাশপানে মুখ তুলে আছে। বাংলোর হাতায় পনসাটিয়ার ঝাড়। লাল পাতিয়া বলে মালি। পাতাগুলোর লালে এক পশলা বৃষ্টির পর জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ খোয়ার রাস্তাটা মেরামত করছে সামনেই।

আমার ছেলে রাকেশ আর মেয়ে রাই নদীর সবুজ মাঠটুকুতে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। রাকেশ যথেষ্ট বড় হয়েছে। ক্লাস এইটে পড়ে সে। তাছাড়া বয়স অনুপাতে সে অনেক বেশী জানে। বোঝে। কত বিষয়ে সে যে পড়াশুনা করে, তা বলার নয়। পড়াশুনাতে খুব ভাল সে ত বটেই, কিন্তু শুধু স্কুলের পড়াশুনাতেই নয়।

নিজের ছেলে বলে নয়, তার ভালত্বে আমি মাঝে মাঝেই গর্ব বোধ করে থাকি।

এই গর্বের কোন সঙ্গত কারণ আমার থাকার কথা নয়। কারণ ছেলে ও মেয়ের যা কিছু ভালো তা আমার স্ত্রী শ্রীমতীরই জন্যে। বাবার কর্তব্য হিসেবে একমাত্র টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুই প্রায় করার সময় পাইনি আমি। আমি আমার দোষ স্বীকার করি। আমি অত্যন্ত উদার মানুষ বলেই আমার বিশ্বাস। তবুও খারাপটুকুর দায় শ্রীমতীর উপর অবহেলায় চাপিয়ে আমার ছেলেমেয়ের ভালোত্বের আনন্দটুকু আমি এই মুহূর্তে এই বাংলোর চওড়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছি।

শ্রীমতী ঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভে আমার কালোরঙা ডব্লু-এম-ডি নম্বরের ঝক্‌ঝকে গাড়িটা শাদা সীটকভার পরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি একজন সেলফ-মেড মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ করিনি, মানে ইন্টার মিডিয়েট অবধি পড়েছিলাম। ইংরিজীতে বেশ কাঁচা ছিলাম। পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয় আর্থিক কারণেই। কিন্তু নানা রকম চাকরি এবং ফিরিওয়ালা থেকে জীবন শুরু করে আমি এখন একটা কারখানার মালিক। স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রী হিসেবে রেজিস্টার্ড। লোহার ঢালাই করা জিনিস নানা দেশে এক্সপোর্টও করি। আমার ব্যবসা যে ভালো সে সম্পর্কেও ছেলে-সম্পর্কিত গর্বের মতোই গর্ব আছে আমার।

হাওড়াতে আমার কারখানা। সল্ট-লেকে হাল-ফিল ডিজাইনেব বাড়ি। সুন্দরী স্ত্রী। আর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। বেশ কিছু লোক আমাকে স্যাব স্যার করে। ভালো লাগে। কোলকাতার একটা বড় ক্লাবে আমি বছরখানেক হল মেম্বার হয়েছি। ইদানিং ক্লাবে এবং ব্যবসার জগতে আমি আকছার ইংরিজী বলে থাকি। আমি এখন জানি যে এ-সংসারে টাকা থাকলে ইংরিজী বাংলা কিছুই না জানলেও চলে যায়। টাকার মত ভাল ও এফেক্টিভ ভাষা আর কিছুই নেই। তাছাড়া টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যাই আপনা আপনিই বাড়ে।

লক্ষ্মীর মত সরস্বতী আর দুটি নেই।

ক্লাবে আমাকে লোকে "ম্যাক চ্যাটার্জী" বলে জানে। আমার আসল নাম মকরক্রান্তি। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের কাছে, আমার বাবার কাছে, চাকরি-জীবনের বিভিন্ন মালিকদের কাছে আমার নাম ছিল "মক্‌রা"। সে ডাকটা এখন ভুলেই গেছি। কেউই ডাকে না সে নামে। ডাকলে আমি রেগেও যাব।

এই মুহূর্তে আমি একজন সুখী লোক। সংসারে সুখী হতে হলে যা-যা থাকতে হয়, থাকা উচিত, আমার তার প্রায় সবই আছে। আমি একজন কপিবুক সুখী লোক। কিন্তু নদীর সামনে, দূরে খেলে-বেড়ানো আমার ছেলে রাকেশ এবং মেয়ে রাই-এর কারণে আমি ঠিক যতটা সুখী তেমনি সুখী অন্য কিছুর জন্যেই নয়।

ছেলে-মেয়ে ভাল হওয়ার সুখ, কৃতী হওয়ার সুখ বাবাকে যে কৃতিত্বে এনে দেয়, তা তার ব্যবসা, অর্থ, মান-সম্মান কিছুই এনে দিতে পারে না। অবশ্য ছেলে-মেয়েকে তাদের জীবনে অনেক কিছুই দিয়েছি আমি, আমাকে যা আমার মা-বাবা দিতে পারেন নি।

আমি একজন কৃতী কেউ-কেটা, যোগ্য বাবা। ভাবছিলাম আমি। বড়লোক হওয়া সোজা, পণ্ডিত হওয়া সোজা, সব কিছু হওয়া সোজা, কিন্তু ভাল বাবা হওয়া বড় কঠিন। এই শান্ত দুপুরে আলসের কবুতরের ডাকের একটানা ঘুমপাড়ানি শব্দে, ছায়ায় স্নিগ্ধ হাওয়াতে, আদিবাসী কুলি-কামিনদের রাস্তা সারানো ছন্দোবদ্ধ খট্‌খট্‌ আওয়াজে বসে আমি ভাবছিলাম আমি একজন সার্থক বাবা।

২

বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। চোখের পাতা বুঁজে গেছিল। এমন সময় একটা গাড়ির শব্দে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি, আমার কারখানার ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে, সেই ব্যাঙ্কেরই এজেন্ট এসে হাজির। মিঃ রায়। হঠাৎ? এখানে?

উনি বললেন।

ওঁকে দেখেই আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।

বললাম, আরে? আপনি কোত্থেকে স্যার?

সব স্যারেরই স্যার বলার লোক থাকে? বাবারও বাবা থাকে। লিমিট বাড়ানো নিয়ে গত তিন মাস ধরে বড় রমদা-রমদি চলছে। কানাঘুষোয় শুনেছি, সোজা রাস্তায় হবে না। কিন্তু তেমন জানাশোনা হয় এমন সুযোগও হয় নি। এ একেবারে গড্‌-সেন্ট ব্যাপার!

রায়সাহেব তাঁর বিরাট এয়ার-কন্ডিশানড অফিসে বসে এমন একটা 'এয়ার' নিয়ে থাকেন যে মন খুলে কথাই বলা যায় না।

আমি রায়সাহেবকে ইমপ্রেস করার জন্যে ইংরিজীতেই কথাবার্তা চালু করলাম। আমি তো হাওড়ার একজন সামান্য ঢালাইওয়ালা নই, ডাবু ধরাই যে আমার শেষ গন্তব্য নয়, টাকা যে নোংরা আর পাঁকের মধ্যেই জন্মায় না, পদ্মফুলের মধ্যেও জন্মায় এ-কথাটা এ-হেন আপন-গন্ধে কস্তুরিমৃগসম পাগল ব্যাঙ্কারকে বোঝানো দরকার।

এমন সময় রাকেশ ও রাই ফিরে এলো।

আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রায়সাহেবের আলাপ করিয়ে দিয়ে রায়সাহেবদের

সবাইকে মহাসমারোহে বসালাম। রাইকে বললাম শ্রীমতীকে দিবানিদ্রা থেকে তুলতে। টিফিন-ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে কী নেই কে জানে? চৌকিদারকে ডেকে চা করতে বললাম।

রায়সাহেব বললেন, রাঁচী যাচ্ছি। বাংলোটা দেখে ভাবলাম একটু রেষ্ট করে যাই। আমার স্ত্রী ও শালী সঙ্গে আছেন। ওঁরা একটু...যাবেন।

নিশ্চয়। নিশ্চয়ই! বলে আমি রাইকে বললাম, রাই, মাসিমাদের বাথরুমে নিয়ে যাও। রায়সাহেব ইমপোর্টেড সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। আমাকেও একটা দিলেন। আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু ওভারড্রাফট-এর লিমিটটা বাড়লে আরো বেশী কৃতার্থ হতাম।

তারপর বাংলোর সামনে কাজ-করা কুলি-কামিনদের দিকে আঙুল তুলে বললেন, দীজ পিপল আর ভেরী অনেস্ট অ্যান্ড নাইস ইন্ডীড। আই মীন দীজ জাংগলী লেবারার্স্।

তারপরেই বললেন, বাট দে আর রিয়্যালি নেভ্।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ইয়েস্। রাইট উ্য আর। দে আর রিয়্যালি নেভ্।

রাকেশ সিঁড়িতে বসেছিল। হঠাৎ উঠে এসে বলল, কাদের কথা বলছ বাবা?

আমি একটু হেসে, বিদগ্ধ কৃতী বাবার মত মুখ করে ঐ কুলি কামিনদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরিজীতেই বললাম, উই আর টকিং অ্যাবাউট দেম। দে আর নেভ্।

রাকেশ তার ক্লাসের সেরা ছাত্র। তার স্কুলও শহরের সেরা স্কুল।

সে অবাক গলায় বলল, নেভ্?

রায় সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌতুকের স্বরে বললেন হোয়াই, সান্?

রাকেশ বলল, ওরা অনেষ্ট কিন্তু নেভ্ দুটোই একসঙ্গে কী করে হবে? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে বলল, আই ডোন্নো হোয়াই উ্য কল দেম নেভ্।

রায়সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নেভ্ বানান জানো?

রাকেশ অপমানিত হল।

আমি, মানে রাকেশের বাবা, নেভ বানান এবং মানে দুটোর একটাও জানতাম না। রায়সাহেব বলেছিলেন বলে ওঁর কথার সায় দিয়েই বলেছিলাম! তাই রাকেশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে বাবার সম্মান রাখতে পারে কী না দেখার জন্যে।

রাকেশ কেটে কেটে বলল, K n a v e। আপনি আর বাবা এই Knave-এর কথাই বলছিলেন ত?

একজাক্টলি! বললেন মিঃ রায।

রাকেশ বলল, আমি ত তাই-ভাবছি। তাহলে আমি ঠিকই বলছি, Knave-এর মানে ত অন্য।

মিঃ রায আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে আমিই ভুল বলেছি, কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

আমি বললাম, কী যে বলেন স্যার? আপনি কখনও ভুল বলতে পারেন! আজকালকার ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন। সব অসভ্য। অভদ্র।

রাকেশ হঠাৎ আমার দিকে একবার তাকাল। এমন চোখে? আমার ছেলে? যে নবজাত ছেলেকে আমি নার্সিং হোমে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি! দু'পা একসঙ্গে করে ধরে

গামলায় চান করিয়ে নার্স যাকে তুলে ধরে বলেছিল, এই যে মকরবাবু, দ্যাখেন আপনার ছাওয়াল। বাবা হইলেন গিয়া আপনে।

সেই ছেলে এমন ঘৃণা ও হতাশা-মেশা অবাক হওয়া চোখে কখনও আমার দিকে তাকায়নি। কখনও তাকাবে বলে ভাবিওনি।

একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাকেশ। তারপর মিঃ রায়ের দিকে মাথা নিচু করে বলল, আই অ্যাম সরি।

আমি বললাম, সরি নয় শুধু রাকেশ, ইনি কে জানো? কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো?

বলেই, ভাবলাম, ও কী করে জানবে? স্টুপিড, ইনোসেন্ট ইডিয়েট। স্কুলের পরীক্ষাই ত পাশ করেছে। জীবনের পরীক্ষায় ত বসতে হয়নি। ও জানবে কী করে? ব্যাঙ্কের লিমিট না বাড়লে যে ব্যবসা বাড়ে না, গাড়ি চড়া যায় না, আরো ভালো থাকা যায় না, ভাল স্কুলে পড়ানো যায় না ছেলেমেয়েকে; তা ও কী করে জানবে। গাধা!

আমি বললাম, স্বীকার করো ওঁর কাছে যে তুমি অন্যায় করেছ। বলো যে, তুমি ভুল বলেছ। ক্ষমা চাও, তর্ক করেছ বলে।

আমি...

বলেই, রাকেশ আমার দিকে চেয়ে রইল।

ইতিমধ্যে রায়সাহেবের স্ত্রী ও শালী বারান্দায় চলে এলেন।

আমি আবহাওয়া লঘু করে বললাম, বসুন বসুন, এক্ষুনি চা আসছে।

ওঁরা বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু রায়সাহেব রুক্ষ গলাতেই বললেন, চায়ের ঝামেলার দরকার নেই, রাস্তায় অনেক পাঞ্জাবী ধাবা আছে। সেখানেই খেয়ে নেবো।

বলেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে বললেন, চলি মিঃ চ্যাটার্জী।

শ্রীমতীও ঘর থেকে বাইরে এসেছিল। ওর সঙ্গে মহিলারা ভালই ব্যবহার করেছিলেন। তাই মিঃ রায়ের এই রকম হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ ও বুঝতে পারল না।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রাকেশ নেই। কখন সরে গেছে বারান্দা থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। মিঃ রায় সামনের সীটে উঠতে উঠতে বললেন, আপনার ছেলেটি ভাল। কিন্তু ওকে ভাল করে ম্যানারস্ শেখান। এখনই যদি সব কিছু জেনে ফেলে তবে পরে কী জানবে আর?

আমি হাত জোড় করে বললাম, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধ নেবেন না।

মিঃ রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, অপরাধের কী আছে।

তারপর একটু থেমে, আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, অপরাধ ক্ষমা করাই ত আমাদের কাজ।

গাড়িটা চলে গেল।

আমি ডাকলাম, রাকেশ। রাকেশ।

আমার ম্যাক চ্যাটার্জীর মধ্যে থেকে মুণ্ডিতলা বাই-লেনের মকরা বেরিয়ে এলো বহুদিন পর। আমি হুংকার দিলাম, কোথায় তুই ছোকরা! তোর পিঠের চামড়া তুলব আজ।

রাকেশ যেন মাটি ফুঁটে উঠল। একটুও উত্তেজনা নেই। শন্ত ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার চোখে চোখ রাখল।

ও দেখে আমার মনে হল. এ আমার ছেলে নয়। এ আমার শত্রু। আমার ধ্বংসকারী। বিষবৃক্ষ।

আমি বললাম, তুমি ভেবেছোটা কি?

রেগে গেলে ছেলেমেয়েদের আমি তুমি করে বলি।

রাকেশ শান্ত গলায় বলল, কি বাবা?

আবার কি বাবা?—বলে আমি চটাস্ করে এক চড় মারলাম ওকে।

বললাম বাবার মুখে কথা বলা, তুমি বাবার চেয়েও বেশী জানো? তুমি জানো মিঃ রায় কত বড় অফিসার? আমাদের ব্যবসার ভাগ্যবিধাতা উনি। আর তুমি তাঁর চেয়েও বেশী জানো? বড়দের মুখের উপর কথা! মুখে-মুখে কথা।

শ্রীমতী দৌড়ে এল।

আমি বললাম, তুমি সরে যাও। আমি ওকে আজ মেরেই ফেলবো। আমার আজ মাথার ঠিক নেই।

শ্রীমতী রাকেশকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু রাকেশ নড়ল না। দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুখের ভাব শান্ত; নিরুত্তাপ।

আমি কী কবে ওর মনের দৃঢ়তা ভাঙব বুঝতে না-পেরে ওর নরম গালে আরেক চড় মারলাম।

ওর গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল।

ওর চোখেব দিকে চেয়ে হঠাৎ এই প্রথমবার আমার মনে হল এ ছেলে সাংঘাতিক ছেলে। বড় হলে এ বোধ হয় নক্‌শাল হবে। অথবা ঐ রকমই কিছু। নিজের বাবাকেই খুন করবে। এক সময়ে রাকেশের মত পড়াশোনায় ভাল ছেলেরাই ত ঐ সব করেছিল।

আমি ভাবলাম, ওকে চণ্ডীমাতা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করালেই ভাল করতাম। ঢালাইওয়ালা মক্‌রার ছেলেকে ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট করার স্বপ্ন দেখতে গিয়েই এই বিপত্তি!

শ্রীমতী নিরুত্তাপ, উদাসীন গলায় বলল, অনেক বেড়ানো হয়েছে, পিক্‌নিক হয়েছে; এবার ফিরে চলো। রাতটা মামাবাড়িতে ঘড়গপুরে কাটিয়ে কালই কোলকাতা যাব।

৩

বাইরে থেকে ফিরে এসেছি দিন দশেক হল। এসে অবধি ভারী খাটুনি যাচ্ছে। লোড-শেডিং-এর জন্যে রাতে ঢালাই প্রায় বন্ধ। একটা জেনারেটর কেনা নিযে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হয়রান হয়ে গেলাম।

সল্ট লেকে বড় মশা। শুয়েছি মশারির মধ্যেই তবু এখনও ঘুম আসছে না। কেন জনি না, বারে বারে রাকেশের কথাই মনে হচ্ছে।

রাকেশ যখন ছোট ছিল, যখন আমার অবস্থা এত ভালো ছিল না; তখন আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে শ্রীমতীর সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ও পড়ত। আমি অফিস থেকে ফিরলেই, বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠত। ঐ বয়সটাই ভালো ছিলো।

নিচের তলায় রাকেশের পড়ার ঘর। আমরা কী ছোটবেলায় এত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি? কত কষ্ট করে পড়েছি, বাজে স্কুলে; বইপত্র ছাড়া। এরা এত কিছু পেয়েই কী এত উদ্ধত হয়ে গেল? অমানুষ হয়ে উঠল কী?

ঘুম আসছিলো না।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর আমি আলাদা ঘরে শুই। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে অন্য ঘরে। রাকেশ আলাদা ঘরে। সারা বাড়ির আলো নিবানো। নীচের পর্চে শুধু একটা আলো জ্বলছে, গ্যারেজের সামনে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। পায়চারি করতে করতে কখন যে আমি দরজা খুলে, সিঁড়ি ভেঙে রাকেশের পড়ার ঘরে চলে গেছি, আলো জ্বালিয়েছি, জানিও না।

ঘরের এ-পাশ ও-পাশ সব ঘুরে বেড়ালাম। ড্রয়ারে চাবি দেওয়া। ড্রয়ারে কি আছে কে জানে? ড্রয়ার খুলে আবার কী নতুন আতঙ্ক হবে তা তো জানা নেই! ড্রয়ার বন্ধ থাকাই ভালো।

রাকেশের লেখার টেবিলে একটা খাতা। বুক-র‍্যাকে অনেক বই। মাস্টার মশাইয়ের বসার জন্য টেবিলের উল্টো দিকে একটা চেয়াব। দেওয়ালে ব্রুস-লীর বড় পোস্টাব।

যা খুঁজছিলাম, দেখলাম আছে। দুটি ডিকশনারী আছে।

প্রথমটি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারী। পাতা উল্টে উল্টে Knave কথাটা বেব করলাম। লেখা আছে : আনপ্রিন্সিপলড্ ম্যান, রোগ, সাবভেন্ট।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওই লেবারদের যদি মিঃ রায় ভেরী নাইস বলে থাকেন এবং ভাল চাকর-বাকর বলে থাকেন তাহলে ভুল কি বলেছেন?

অন্য ডিকশনারীটা টেনে নিলাম। জুনিয়র স্কুল ডিকশনারী ফার্ষ্ট, এডিশন, ১৯৬৯। তাতে শুধুই লেখা : এ পার্সন হু লিভস বাই চিটিং, আ ডিসঅনেস্ট ক্যারাকটব।

এছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।

আমি রাকেশের চেয়ারে বসলাম। দুহাতের পাতায় মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম।

ভেরী নাইস-এর সঙ্গে এই মানেটা খাপ খায় না। কিন্তু মিঃ রায় এত বড় একজন অফিসার ও লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কখনও ভুল করতে পারেন না।

বড্ড মশা কামড়াতে লাগল। গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলাম অন্ করে।

হঠাৎ রাকেশের টেবিলে রাখা খাতাটার উপর চোখ পড়ল আমার। মলাটে রাকেশেব নাম, ক্লাস রোল নম্বার সব লেখা। এটা পুবানো ক্লাসেব খাতা। আজেবাজে লেখার জন্যে ব্যবহার করে নিশ্চয়ই।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই দেখি বাকেশ লিখেছে, "নেভাব স্টপ লানিং"। এই কথাটা বার বার লিখেছে। লিখে, নিচে আন্ডাব লাইন করেছে। আব সেই পাতারই নীচেব দিকে লিখেছে, "ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যা কারেজ অফ ইওর কনভিকশান"।

এর নীচে যে লাইন টেনেছে বার বার তা এত জোবে চাপ দিয়ে দিয়ে টেনেছে যে, কাগজ নিবের চাপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে।

খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার মাথায় কার হাতের স্পর্শে, চমকে উঠলাম ভয় পেয়ে। এত রাতে? কে? রাকেশ?

কে? বলে উঠলাম আমি।

আমি। বলল, শ্রীমতী।

আমি শুধোলাম, রাকেশ ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, আমাকে তুমি কিছু বলবে?

শ্রীমতী বলল, না।

বলেই, ঘরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার ব্যবসা, আমার টাকা-পয়সা, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমার বাড়ি গাড়ি সবই ত রাকেশ আর রাই-এরই জন্যে। যদি ওরাই...। যদি আমি...। ওরাই যদি...।

কী লাভ? কেন এত খাটুনি, এত দৌড়াদৌড়ি, হাওড়ার বাঁশবনে শেয়াল রাজা হবার এই তীব্র আকাঙ্খা আমার? কেন? কাদের জন্যে?

আমার একার জন্যেই কি?

৪

সকালবেলাটা যে কী করে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। মোল্ড নিয়ে আজ মহা গোলমাল হল। লয়েডস ইনসপেকশনের একজন লোক কেবলই পাসিং-এর সময় বায়নাক্কা লাগাচ্ছে। এই রেটে রিজেকশান হলে আর ব্যবসা করতে হবে না। ঘোষালের নতুন-হওয়া বাচ্চাটা নার্সিং হোম থেকে আসতে না আসতেই মারা গেছে। কারখানায় আসতেই পারছে না সে। সব ঝক্কি আমার একারই সামলাতে হচ্ছে কদিন থেকে।

দুপুরের দিকে একবার কোলকাতা আসি রোজই। কোনোদিন ক্লাবে খাই, কোনোদিন বা শ্রীমতী বাড়ি থেকে হট-বাক্সে কিছু দিয়ে দেয়।

ক্লাবে গেলাম, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না। শরীরটা ভাল লাগছে না। সুগারটা চেক্ করতে হবে। বেড়েছে বোধ হয়। একটা ই সি জি-ও করা দরকার। এই বয়সে ইসকিমিয়া হতেই পারে। বাঁদিকের বুকেও মাঝে মাঝে ব্যথা করে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, কলেজ স্ট্রীট যেতে। রাকেশের খাতায় লেখা কথাগুলো কাল থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী বলতে চেয়েছে ও? রাকেশের বাবা কী আমি? না, আমিও ওর শত্রু?

সেইদিন দুপুর থেকে ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকাবার সময় গত কয়েক বছরে বেশি পাইনি আমি। কিন্তু যে মুখে তাকিয়েছি সে মুখ এ মুখ নয়।

একটা বড় বইয়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললাম ড্রাইভারকে।

ঢুকে বললাম, ভালো ডিকশনারী কি আছে?

দোকানদার দুটি বের করে দিলেন। ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্লড ডিকশনারী, সেকেন্ড এডিশান, রিপ্রিন্ট ১৯৭৬।

তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ৪১৪ পাতা—Knave মানে (১) আর্কেয়িক, (ক) এ মেল সারভেন্ট, (খ) এ ম্যান অফ হামবল স্ট্যাটাস (২) এ ট্রিকী রাসকাল, বোগ, (৩) এ জ্যাক (প্লেইং কার্ড)।

আমার মনে হল বাকেশকে শাসন কবে ঠিকই কবেছি। মিঃ বায় নিশ্চযই ১(খ) বুঝিযেছিলেন। ওখানকাব সরল ভালো লোকেবা ত men of humble status-এরই। কিন্তু মিঃ বায মধ্যে একটা but ব্যবহাব কবেছিলেন। এই but-টাই সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্য ডিকশনারী দেখলাম। শর্টাব অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনাবী ১৯৭০, ১০৮৯ পাতা। (ক) এ মেল চাইল্ড বয়। ১৪৬০, (গ) এ বয এমপ্লযেড অ্যাজ সারভেন্ট, মিনিযাল, ওযান অফ লো কন্ডিশান, (গ) অ্যান আনপ্রিন্সিপলড্ ম্যান, এ বেজ অ্যান্ড ক্রাফটি বোগ (1) JOC—১৫৬৩ (খ) কার্ডস।

One of low condition-এর অর্থে মিঃ বায কথাটাকে নিশ্চযই ব্যবহাব কবেছিলেন বলে মনে হল আমাব।

আমি তবুও, পাশের দোকানে গেলাম। সেখানে লিটল অক্সফোর্ড ডিকশনাবী, ফোর্থ এডিশান ১৯৬৯, ২৯৪ পাতাতে বলেছে—আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, বোগ লোযেস্ট কোর্ট (অরিজিনালি নয—সাবভেন্ট)।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ কবতে লাগল। কফি হাউসে উঠে গিযে এক কাপ কফি আব একপ্লেট পাকাড়ো নিযে বসলাম। বহু বছব পব কফি হাউসে এলাম। কফিতে চুমুক দিযেছি, দেখি শবৎ এসে হাজির। শবৎ আমাব ছেলেবেলাব বন্ধু হেমন্তেব একেবাবে ছোট্ট ভাই শুনেছি পড়াশোনায খুব ভাল হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে।

আমাকে দেখে বলল, কি মকরদা? কেমন আছেন?

আমি অন্যমনস্কের মতো বললাম, ভালো।

তারপর বললাম, Knave মানে জানো?

ও চমকে উঠল, বলল, আমাকে বললেন?

আমি বললাম, না। না। কফি খাবে?

ও বলল, কফি খাবো না। কিন্তু আমি ত ফিজিক্সেব ছাত্র। ইংবিজীতে ত অত ভালো নই।

আমি বললাম, এখানে তোমাব ইংবিজীব বন্ধুবান্ধব কেউ আছে? সাম ওযান হু ইজ রিযেলি গুড?

শবৎ বলল, ঊ্যনিভার্সিটিব বেষ্ট ছেলেকে নিযে আসছি। ও নির্ঘাৎ ফার্ষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হবে এবাব ইংরিজীতে।

বলেই, শবৎ চলে গেল।

একটু পরে লাজুক লাজুক দেখতে ফর্সা বোগা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিযে এল শবৎ। বলল, এই যে।

আমি কোনো ভূমিকা না কবেই বললাম, আমাকে Knave কথাটাব মানে বলতে পাবেন? বানান কবে শব্দটা বললাম।

ছেলেটি বসে পড়ে আমাব দিকে অবাক চোখে তাকিযে থাকল।

আমি লজ্জা পেযে বললাম, কী খাবেন?

ছেলেটি বলল, বিষ ছাড়া যা খাওযাবেন। খিদেও পেযেছে।

ছেলেটি বেশ পাকা। ভালো ছেলেবা আজকাল বুঝি পাকাই হয। বাকেশেব মতো?

আমি ওদেব দু'জনেব জন্যেই খাওযাব অর্ডাব কবলাম।

ছেলেটি হাসল, একটা কথাব ত অনেক মানে হয।

না, যে মানেটা সব চেয়ে বেশী মানে। আমি বললাম। সেটাই বলুন।

ছেলেটি হেসে বলল।

বলল, তাব মানে?

বললাম, যদি কথাটাব একটাই মানে হত আজকে, তবে সেই মানেটা কী হত?

ছেলেটি হাসল, এক ফালি। ওব কপালে স্কাইলাইট দিয়ে বোদ এসে পড়েছিল। তাবপব একটু চুপ কবে থেকে বলল, "চিটিংবাজ"। এক কথায বললাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ কবে বইলাম। বললাম। আপনি শিওব?

ছেলেটি সিগাবেটেব প্যাকেট বেব কবে বলল, অ্যাবসলুটলি।

আজকালকাব ছেলেমেযেদেব মধ্যে দ্বিধা বড কম।

'শিওব' কথাটি ছেলেটি যেমন কবে বলল, তাতে ভালো লাগলো আমাব খুব। ওদের চবিত্রে একটি সোজা ব্যাপাব আছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওদেব মধ্যে সংশয, দ্বিধা ব্যাপাবটা কম। আমাদেব ছোটবেলায, ছাত্রাবস্থায আমবা ঐ বকম ছিলাম না।

তাবপব বলল, অন্য অনেক মানে আছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রচলিত ও প্রযোজ্য মানে এই।

আমি উঠে পডলাম। শবৎ-এব হাতে একটা দশ টাকাব নোট দিযে বললাম তুই দামটা দিয়ে দিস শবৎ। আমাব বিশেষ তাডা আছে। কিছু ম.. বিস না।

যাওযাব সময ছেলেটিকে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

যেতে যেতে শুনলাম, ছেলেটি শবৎকে বলছে, কিবে? এ যে মেন্টাল কেস।

আমি তাডাতাডি কাবখানাতে ফিবে এলুম। এসেই অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডেকে পাঠালাম। বিমলবাবু আমাব বহু পুবনো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চাটার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্সী পবীক্ষাব একটা গ্রুপ ফেল। কিন্তু কাজে অনেক পাশ কবা অ্যাকাউন্ট্যান্টেব চেযেই ভালো।

বিমলবাবু এসে বললেন, বলুন স্যাব। বিমলবাবুব চোখ দুটো চিবদিনই স্বপ্নময। এ বকম কবি-কবি ভাবেব মানুষ অথচ এফিসিযেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কমই দেখা যায।

বললাম, বিমলবাবু এক্ষুনি একটা ক্যাশ—ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈবি করুন। আমাদেব ব্যাঙ্কেব ওভাবড্রাফট আমি এক্ষুণি শোধ কবতে চাই। কি অবস্থা জানান আমাকে। ইমিডিযেটলি সব কাজ ফেলে বেখে।

বিমলবাবু হাতেব বল পেনটা গডাতে গডাতে বললেন, স্যাবেব মাথায কি গণ্ডগোল হল? এ্যাকাউন্ট বন্ধ কবাব কথা ছেডেই দিন। এক্ষুনি লাখখানেক টাকাব বিল ডিসকাউন্টিং ফেসিলিটি বাডিযে আনতে না পাবলেই নয।

আমি দৃঢগলায বললাম, যা বলছি, তাই করুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বললেন, কাবখানা বন্ধ হযে যাবে স্যাব তা হলে।

হলে হবে। আমি বললাম।

আমিই কী বললাম?

মক্‌বা বলল? না ম্যাক চ্যাটার্জি? না বাকেশেব বাবা?

জানি না, কে বলল।

বিমলবাবু চলে যাওয়ার আগে আমি আবারও বললাম যে, কত স্টক আছে দেখুন। সমস্ত স্টক ক্যাশ-সেল করবো।

কি হয়েছে স্যার?

বিমলবাবুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো।

বললেন, ব্যবসা কী সত্যিই বন্ধ করে দেবেন? আমরা এতগুলো লোক কোথায় যাবো এই বয়েসে। কি হল, একটু জানতে পেতাম? বড়ই চিন্তা হচ্ছে আপনার কথা শুনে।

আমি হাসলাম।

আমি বোধ হয় অনেক বছর পরে হাসলাম। এমন নির্মল হাসি।

বললাম, না বন্ধ করব না। শুধু ব্যাঙ্ক বদলাবো। তাতে যা ক্ষতি হয় হবে। অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাবে লক-স্টক্-এন্ড-ব্যারেল। এই চেঞ্জওভার পিরিয়ডে যা ক্ষতি হবার হবেই। কিছুই করার নেই।

ক্যাপিটলই লস্ট হয়ে যাবে স্যার অনেক। এমন তাড়াহুড়ো করলে।

আমি এবার শক্ত হয়ে বললাম, হলে হবে। বললামই ত।

তারপর বললাম যে, আমি চলে যাচ্ছি এখন। আজই সব কিছু কমপ্লিট করে রাখবেন। রাজেন আর রামকেও ডেকে নিন। কাল আমি সকাল ন'টায় এসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবো মিঃ রায়ের কাছে। কাগজপত্র সব রেডি করে টাইপ করে রাখুন। দরকাব হলে রাতেও থেকে যান। বাড়িতে খবর পাঠাবেন তাহলে। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবেন সকলে।

কাগজ রেডি করলেও সব শোধ করবেন কী করে? স্টক ক্যাশ-সেল করলেও হবে না।

বিমলবাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

আমি বললাম, অন্য সম্পত্তি, এক বসতবাড়িটা ছাড়া বিক্রী বা মর্টগেজ করে দেবো। যা হোক করে হয়ে যাবে। আর কথা বলার সময় নেই আমার আজকে।

৫

বহুদিন, বহু বছর পর আমি দিনেব আলো থাকতে থাকতে কারখানা থেকে বেরোলাম। এত সময় হাতে নিযে আজ কী করব জানি না। নিউ মার্কেটে গিযে কেক কিনলাম। রাকেশ খেতে ভালবাসে। চকোলেট কেক।

তারপর কলেজ স্ট্রিটের দিকে গাড়ি চালাতে বললাম। পথে যে নার্সিং হোমে রাকেশ হয়েছিল সেই নার্সিং হোমটা পড়ল। এখন কত বদলে গেছে সব। রাকেশ, আমাব সেই ছোট্ট উলঙ্গ, দুগ্ধপোষ্য ছেলেও কত বদলে গেছে।

কত বদলে গেছি আমি!

কলেজ স্ট্রিটে নেমে অক্সফোর্ডের সব চেয়ে ভালো যে ডিকশনারী, যা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে মাইক্রোস্কোপিক অক্ষর দেখতে হয়; তা কিনলাম একটা। তারপর বাড়ির দিকে চললাম।

গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম যে, কালকে মিঃ রায়কে কী বলব। বাবা হয়ে

অন্যায়ভাবে যে চড় মেরেছিলাম রাকেশকে, সেই চড় দুটো ওঁর গালে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। ছোটবেলায় বহু মারামারি করেছি পাড়ায়। 'মক্‌রা গুণ্ডা' বলতো অনেকে। কিন্তু আজকে তা আর হয় না। আজকে রাকেশের বাবা আমি। আমার নিজের পরিচয়টাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়।

কাল কেমন করে ধীরে সুস্থে মিঃ রায়কে বলব যে, মিঃ রায় আপনি ইংরিজীটা আমার ছেলের চেয়ে খারাপই জানেন। যেই উনি ভুরু কুঁচকে আমার অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে কথা বলতে যাবেন, আমি সঙ্গের টাইপ করা, সই করা চিঠিটা এগিয়ে দেবো! আর...

বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন লোডশেডিং। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গেছিল। পর্চ-এর সামনে ল্যান্ডিংয়ে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই সিঁড়িটা আলো হয়েছে একটু। দেখলাম রাকেশের ঘরেও মোমবাতি জ্বলছে। আমার হাত থেকে নগেন বইয়ের আর কেকের প্যাকেটটা নিতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। বললাম, থাক্।

রাকেশ দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে পড়ছিল। মোমবাতির আলোতে। এপ্রিলে ওর পরীক্ষা। এর আগে কখনও আমি জানি নি বা জিজ্ঞেস করি নি লোডশেডিং-এর মধ্যে আমার ছেলেমেয়েরা কী ভাবে পড়াশুনা করে। কারখানায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ করে জেনারেটর লাগিয়ে ফেললাম, কিন্তু বাড়িতে পেট্রোম্যাক্সও কিনি নি একটা ওদের জন্যে।

টেবিলের পাশের দেওয়ালে সেই বড় পোস্টারটা ব্রুস্-লীর। মোমবাতির আলোটা নাচছে পোস্টারটার ওপরে। কুং-ফুর রাজা এই হতভাগ্য দেশের হতভাগা মানুষদের প্রতিভূ হয়ে যেন এদেশীয় ন্যক্কারজনক রাজনীতিকদের নির্লজ্জ আরশুলাসুলভ অস্তিত্বকে জুডোর প্যাঁচে গুঁড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। আমি দেখলাম, আমার রক্তজাত, আমার যৌবনের স্বপ্নের, আমার বার্ধক্যের অভিভাবক রাকেশ, হাতকাটা গেঞ্জী গায়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করছে। মোমের সঙ্গে ওর চোখও জ্বলছে এবং গলছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বই বগলে করে আমি ভাবছিলাম, কী হবে? এত পড়াশুনা করে, ভালো হয়ে সত্যবাদী হয়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কী হবে এই দেশে?

মনে মনে বলছিলাম, তুই যে ধনে-প্রাণে মরবি রে বাবা।

চমকে উঠে, রাকেশ মুখ ফেরালো। দেওয়ালে ওর সুন্দর গ্রীবা আর মাথাভরা চুলের ছায়া পড়ল।

রাকেশ বলল, কে?

আমি। বললাম আমি।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল।

বলল, বাবা; কিন্তু মুখ নিচু করে রইল।

আমি বইয়ের দুটি খণ্ড ওর টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। বললাম, তোর জন্যে এনেছি রে।

—কেন বাবা?

রাকেশ অবাক হয়ে শুধালো। মাথা নিচু করেই।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল এ পর্যন্ত হাতে করে আমি নিজে আমার ছেলেব জন্যে কিছুই আনি নি। সময হয়নি। মনেও হয়নি।

আমি অস্ফুটে বললাম, তুই...

তারপব গলা পরিষ্কার করে বললাম, রাকেশ, তুই-ই ঠিক বলেছিলি।

কী বাবা? রাকেশ আবারও বলল, অস্ফুটে।

—সেদিন মিস্টার রায় ও আমি দুজনেই তোর প্রতি অন্যায় করেছিলাম।

তারপর হঠাৎ আমিই বললাম কী না কি জানে, কিন্তু নিশ্চয়ই বললাম; তুই আমাকে ক্ষমা করিস। আমার অন্যায় হয়েছিল রে।

রাকেশ আবারও বলল, বাবা'

আমি রাকেশের দু'কাঁধে আমার দুটি হাত রাখলাম।

ভাগ্যিস লোডশেডিং ছিল। নইলে রাকেশ দেখতে পেত আমার দু'চোখের দু'কোণায জল চিকচিক করছে।

রাকেশ কিছু বলার আগেই বললাম, ওপরে আয। তেব জন্যে কেক এনেছি। চকোলেট-কেক। তোর মা একদিন বলেছিলো, তুই ভালোবাসিস। তোব মা ও বাই আসার আগেই চল আমরা দুজনেই এটাকে শেষ করে দিই।

রাকেশের মুখে সেদিন ডাকবাংলোয় যে হঠাৎ অপবিচিতিব রঙ লেগেছিল, তা আস্তে আস্তে ধুয়ে এল। ওর সুন্দর মুখটা মিষ্টি, সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে ভরে এল। ও বলল, তোমার না ডায়েবেটিস্!

—তাতে কী? একদিন খেলে কিছু হবে না। চান করে নিচ্ছি আমি। তুই ওপবে আয়।

—আসলে, মা আর রাইও চকোলেট কেক খুব ভালোবাসে বাবা। মা আর রাই ফিরুক, তারপব একসঙ্গে খাবো।

ওপবে চলে এলাম। জামাকাপড় ছাড়লাম মোমেব আলোয়। নগেনকে বললাম, মোমবাতিটা নিযে যেতে। মোমবাতিটা নগেন নিযে গেলে ঘরের দরজাটা বন্ধ কবে দিলাম।

এদিকটা বেশ ফাঁকা। সল্ট লেকে এখনও সব জমিতে বাড়ি হয নি। দুদিন বাদে দোল। তাই চাঁদ উঠেছে সন্ধ্যে হতে না হতেই। ভাবী সুন্দব দেখাচ্ছে চারিদিক। আমি বারান্দায় ইজি-চেযাবে বসে বাইবে চেযে বইলাম। গেটেব দু'পাশে লাগানো হাস্নুহানার, ঝোপ থেকে গন্ধ উড়ছে। হু-হু কবে ঝড়েব মত হাওযা আসছিল দক্ষিণ থেকে। মনে হচ্ছিল, ধ্রুব-তাবাটা কাঁপছে বুঝি হাওযায়।

বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে বাইবেব আলো-ছাযাব বাতেব দিকে চেযে আমাব মনে হল, যেদিন নার্সিং হোমে বাকেশ জন্মেছিল; সেদিন আমি শুধু ওব জন্মদাতাই ছিলাম। এতদিন, এত বছর পরে; আজ এক দেবদুর্লভ ধ্রুব সত্যাব সিঁড়ি বেযে উঠে আমি ওব বাবা হয়ে উঠলাম।

বাবা!

সন্ধ্যেবেলা রক্তপাত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগেব দিন সন্ধ্যেবেলাতেই একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল, সকালবেলা উঠে দেখলুম, আমার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ উঠেছে। সাদা টুসটুসে, ব্যথা কি! আয়নায় দেখা গেল আগুনের শিখার মতন, কাছাকাছি হাত নিয়ে যেতে ভয় হয়। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

হয এরকম আমার মাঝে মাঝে। গালে, থুতনিতে। সবচেয়ে বিবক্তিকব লাগে ঠোঁটের কোণায় হলে। সেই চৌদ্দ-পনেরো বছর থেকে শুরু হয়েছে। বড় পিসীমা সে সময় বলতেন, ও কিছু না, বয়েস ফোঁড়া, সময়কালে সেরে যাবে। কি জানি বড় পিসীমা সময় বলতে কি বুঝিয়েছিলেন, সাতাশ বছর বয়েস হলো, এখনও আমার নিষ্কলঙ্ক মুখের সময় আসেনি? বড় পিসীমা যেদিন মারা যান, সেদিন দাড়ি কামাতে গিযে একটা ব্রণ কেটে ফেলায় রক্তই বেবিয়েছিল আমার, খুব মনে আছে।

ব্রণ আমার গা সহ্য হয়ে গেছে। সাদা হয়ে এলেই আমি দেশলাই জ্বেলে একটা সেফটি-পিন পুড়িয়ে প্যাট করে গেলে দিই। ভেতবের সাদা জিনিসটা টিপে বার করে দিলে চুপসে যায়, তখন আর অতটা চোখে পড়ে না। নইলে, মুখের ওপর পাকা ব্রণ থাকলে অনেকে ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকাতে চায় না— কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয। আমি তো দেখেছি—অন্য কারুর মুখ ভর্তি ব্রণ দেখলে আমার গা বমি বমি করে, তাকাতে ইচ্ছে করে না।

কপালের ওপব ব্রণ, এতে একটা সুবিধে হয়েছে অবশ্য, দাড়ি কামাতে অসুবিধে হবে না, কেটে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ব্রণ গেলে দেওয়াও যাবে না। কপালেব ওপব ক্ষত তৈবী কবতে নেই—এটা শুধু কুসংস্কাব নয—দারুণ সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে। ইরিসিপ্লাস না এই ধরনের কি যেন একটা অসুখ আছে—অরুণেশ দাস মজুমদার বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো, তিনদিনের ছুটিতে মেদিনীপুরেব দেশেব বাড়িতে গেল—আর ফিবলো না, বৌদির সেলাইয়েব সুঁচ দিয়ে কপালের ব্রণ গেলেছিল। অরুণেশ হঠাৎ মবে গেল বলেই সেবাব আমি ম্যাগাজিন এডিটব হতে পেরেছিলাম। যতই খারাপ দেখাক, কপালেব ব্রণ আমি গালতে পাববো না। কিন্তু আজ গায়ত্রীর বুকে আমার কপাল সমেত মুখখানা একবাব চেপে ধববো ভেবেছিলাম।

গায়ত্রী ব্রণ দেখলে কখনো ঘেন্না করে না, অন্তত সে বকম কোনো ভাব কখনো দেখায়নি। বরং গায়ত্রী আমাব জন্য নিত্য-নতুন ওষুধ কিনে আনে। শাঁখেব গুঁড়ো হজমের ওষুধ হবেক রকম মলম। গায়ত্রীব মসৃণ চামড়া, একটা দাগ নেই, কোনোদিন একটা ঘামাচিও হতে দেখিনি—তবু ব্রণেব ওষুধ ও কাব কাছ থেকে এবং কোন্ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস কবে, আমি জানি না। বলেও না কখনো। গায়ত্রী ওব পাতলা স্বচ্ছ হাতখানি আমাব মুখে বুলোতে বুলোতে কতদিন বলেছে, ছেলেমানুষ, তুমি এখনও একটা ছেলেমানুষ।

চন্দন কিংবা চুন কিংবা স্টিকিং প্লাসটাব লাগাবাব কথা আমি ভাবতেই পাবি না।

তাহলে প্রথমেই চোখে পড়ে, চোখের সামনে ক্যাট ক্যাট করে। কপালের ঠিক মাঝখানে ঐ দৃশ্যমান কলঙ্ক নিয়ে নিয়ে রাস্তায় হাঁটা আমার সম্ভব নয়। চোদ্দ বছর বয়স থেকে যার ব্রণ উঠছে, সেই লোকেরও আজ কপালের ওপর একটা মাত্র ব্রণ ওঠায় সত্যিকারের মন খারাপ হলো। আমি গোটা তিনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অন্তত আজকের দিনটা ওটা না উঠলে হতো না! দেড় মাস পর আজ গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। হঠাৎ দেবনাথের কথা মনে পড়ায় আমার বেশ রাগ হলো। বন্ধুদের মধ্যে দেবনাথকেই সবচেয়ে সুন্দর বলা চলে। কোঁকড়ানো চুল, ধারালো নাক আর ঠোঁট ঝকঝকে চামড়া, সব কিছুর সঙ্গে দামী কাঁচের গ্লাসের মিল আছে। ঐ রকম সুন্দর মুখ নিয়ে এখন দেবনাথ খবরের কাগজের অফিসে যুদ্ধের ইংরেজি খবরের বাংলা অনুবাদ করছে। অন্তত আজ বিকেলে ঐ কাজের জন্য দেবনাথের অমন সুন্দর মুখের কোনো দরকার ছিল না। আমার ছিল।

চৌরঙ্গীর ওপর, লিন্ডসে স্ট্রীট ছাড়লে বাইবেল সোসাইটির বাড়ি—যেখানে একটা কাচের বাক্সের মধ্যে বাইবেল খোলা অবস্থায় রাখা থাকে—প্রতিদিন কে বা কারা তার একটি করে পাতা উল্টে দেয়, সেই বাড়ির বারান্দার নিচে গায়ত্রী এসে দাঁড়াবে ঠিক ছ-টার সময়। আমি একটু আগেই বেরিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গায়ত্রী কোনোদিন আসে না, সুতরাং ওখানে আমাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেই—তাই বাসে ওঠার আগে আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। সেই আমার প্রথম ভুল। ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে যারা মরে, তাদের অনেকেরই বোধহয় আগের ট্রেনে যাবার কথা থাকে।

সিগারেটটা মুখে রেখে দেশলাই জ্বেলেছি, কে যেন ফুঁ দিয়ে সেটা নিবিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি কেউ না। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠেছে, পাক দিয়ে ঘুরছে ধুলো। চোখ আড়াল করলুম আমি ধুলো আটকাবার জন্য। বিকেলবেলা এরকম হাওয়া ওঠা ভাল নয়, বিকেলটা না নষ্ট করে দেয়। কিছুতেই সুযোগ হয় না, গায়ত্রী অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারে না, লুকিয়ে দেখা করতে হয়। আজ দেড় মাস পরে আমি গায়ত্রীকে সান্ত্বনা দেবো এবং সান্ত্বনা চাইবো। একটু পরেই চোখ খুলে দেখি, সেই ঘূর্ণী ঝড়টা উঠে গেছে শূন্যে, রাস্তা আবার আগের মতন শান্ত এবং রাস্তার উল্টো দিক থেকে আমারই জন্য একজন হেঁটে আসছে। সিগারেটটা ধরিয়েই আবার ফেলে দিতে হলো; কেননা, বাবার বন্ধু প্রতাপ-কাকা। প্রতাপ-কাকা বললেন, রাস্তার ওপার থেকে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলুম, তুই দেখতে পাসনি সন্তু?

আমি বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললুম, না তো আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, তোদের বাড়িতে আমাকে যেতে হতো—ভালোই হলো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোব মা-কে বলিস্...কপালের ওপর তোর ওটা কি হয়েছে? অতবড় ফোঁড়া?

—ফোঁড়া না, ব্রণ, এমন কিছু নয়—

—না, না কপালের ওপর ওরকম প্রকাণ্ড একটা, শোন্ আঙুলে রুমাল পেঁচিয়ে তারপর টিপে দে এমনি করে—

—না, না, প্রতাপ কাকা বিষম ব্যথা—

—আচ্ছা শোন, তোর মাকে বলিস...

প্রতাপ কাকা যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণে দুটো বাস চলে গেল বেশ ফাঁকা ফাঁকা। তখন বুঝতে পারিনি—সেই দুটি বাসই আমার সমস্ত সৌভাগ্য নিঃশেষ করে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ দুটোর যে-কোনো একটায় উঠলে—।

তৃতীয় বাসে বেশ ভীড়, কিন্তু না উঠে উপায় নেই—এরপর দেরী হয়ে যাবে। পাদানিতে সিঁড়ির কাছে। একজন পাঞ্জাবি গোয়ালা সিঁড়ির নিচে দুধের বালতিটা রেখে আমার পাশে। সম্রাটের মতন তাঁর দাড়িময় মুখের সৌষ্ঠব। কিন্তু গায় খুব বদগন্ধ। দুটি মেয়ে নেমে যাবার আগে আমার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকায়। বস্তুত ওরা আমার ব্রণের জন্যই তাকিয়েছিল, কিন্তু ওদের সেই চাহনিই আমাকে ব্রণের কথা ভোলাবার পক্ষে যথেষ্ট এবং আমাকে অমনোযোগী করে। কিছুক্ষণের জন্য গায়ত্রীর কথাও আমার মনে থাকে না। সেই অবসরকালে, কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলে, আমার তো পয়সা হাতেই ছিল, অন্যমনস্ক হাত দেওয়া-নেওয়া সেরে নেয়, পাঞ্জাবী গয়লাটি কোমরের গেঁজের গিঁট খোলার চেষ্টা করে। হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে আমি মুখ ঘুরিয়েছিলাম, কিংবা তার হাত পিছলে গিয়েছিল, অব্যর্থভাবে গয়লাটির কনুই আমার কপালে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ প্রথমেই আমার মনে হলো আমি অন্ধ হয়ে গেছি—এমনই তীব্র যন্ত্রণা এর থেকে বেশী শারীরিক যন্ত্রণা আমি আগে কখনো পাইনি। অস্পষ্ট ভাবে কানে এলো, মাফ কিজিয়ে, নেই দেখা, বিলকুল...খুন গিরতা। মনের মধ্যে বিদ্যুৎভাবে খেলে গেল গয়লার ময়লাসঙ্গী হাত, কতরকম বীজাণু, সেপটিক, ইরিসিপ্লাস, অরুণেশ দাশ মজুমদার। কপালে রুমাল চেপে আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম।

ব্যথা একটু কমতেই চিন্তা স্বাভাবিক হয়ে আসে, মনে হয়, মৃত্যু অত সোজা নয়। এখন চাই একটা আয়না কপালের ক্ষত কতখানি। সিগারেট কেনার জন্য এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে পানের দোকানের মহাভারতের ছবি আঁকা ক্যালেন্ডারের পাশের ঝাপসা আয়নার সামনে আমার মুখ। একেবারে থেঁতলে গেছে ব্রণটা, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। এক একটা ব্রণ এই রকম অভিমানী—অসময়ে ফাটালে কিছুতেই রক্তস্রোত বন্ধ করতে চায় না। পানওয়ালা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাবু, ধূপকাঠি কিনবেন। আমার কাছে ভাল ধূপকাঠি আছে—

আমি ধরা গলায় বললুম, না না—

—খুব ভালো গন্ধ। রিফুজি মেয়েদের তৈরী করা, দু'প্যাকেট নিন, সাত আনায় হবে—

—না, না,

—গরীব মেয়েগুলো রোজগারের চেষ্টা করছে একটু সাহায্য করুন।

আমি কাতরভাবে জানালুম না ভাই, আমি ধূপকাঠি নেব না। এখানে ডাক্তারখানা কোথায় বলতে পার?

—ও কিছু না, একটু চুন লাগিয়ে নিন্—

—না, চুন লাগাবো না—ডাক্তারখানা

লোকটি নির্লিপ্তের মতন জানালো, কি জানি, ডাক্তারখানা কোথায়?

কী নিষ্ঠুর লোকটা। এই কি আমার ধূপকাঠি কেনার সময়। আমি ধূপকাঠি কিনিনি বলে আমাকে ও ডাক্তারখানা দেখাবে না। রাস্তাটার দু'ধারে শুধু পোশাক আর মনোহারী

জিনিসের দোকানই চোখে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান একটা কোথাও থাকবেই লুকিয়ে।

কাপড়ের দোকানে সিঁড়িতে এক ধাপ উঠে এতক্ষণে আমার গায়ত্রীর কথা আবাব মনে পড়ে। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে। সুতরাং গলায় সোনার চেন-পরা মখমলের পাঞ্জাবী গায়ে লোকটিকে ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করার আগে আমি প্রশ্ন করলাম, এখন কটা বাজে।

লোকটি আঁৎকে উঠে বললো, এ কি, আপনার সারা মুখে রক্ত! মাথা ফেটে গেছে বুঝি? ওরকম রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছেন? হাসপাতালে যান—ট্যাক্সি ডেকে দেবো?

অবিচলিতভাবে পুনরায় আমার প্রশ্ন, এখন কটা বাজে?

—এমারজেন্সি সব সময় খোলা। কি করে ফাটলো?

—কটা বাজে আগে বলুন!

—সাড়ে পাঁচটা।

—আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? শ্লো নয় তো?

লোকটি গলা ছেড়ে কাকে ডাকলো, হেরম্ব, এদিকে এসো তো একবাব, বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এসো!

এখনও সময় আছে। ব্যথার জন্য মনে হয়েছিল অনেক সময় কেটে গেছে। বললুম, আমার বিশেষ কিছু হয়নি, একটা ফোঁড়া ফেটে...এখানে ওষুধের দোকান কিংবা ডাক্তারখানা আছে?

—বাঁ-দিকে চলে যান, পাঁচ সাতখানা বাড়ি পরে একজন ডাক্তার থাকেন। এঃ হে, মেঝেতে রক্ত পড়লো, হেরম্ব, জল নিয়ে এসো—বললুম না—বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এক্ষুনি একবার এদিকে এসো—

কপাল থেকে রুমালটা সরাতেই রক্ত আবার গলগল করে বেরুতে চায়। পুনরায় রুমাল চাপা। কাপড়ের দোকানের মেঝেতে পাতা দু ফোঁটা রক্ত। যাক্ ছটা বাজতে এখনো দেরী।

পাঁচখানাও না, সাতখানাও না, আমি গুনতে গুনতে আসছিলাম, ঠিক একুশখানা বাড়ির পর এক বাড়িতে এক ডাক্তাবের নেম প্লেট। বেল টিপতেই আর্দালি। আসুন ভেতরে। এখানে একটু বসুন। আমাব খুব তাড়াতাড়ি আছে। আর্দালি সুইং দরজা ঠেলে অপর কক্ষে ঢুকে গেল, তখুনি বেবিযে এসে বললো, আসুন।

২

টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ডাক্তারটি কোনো বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে আমাকে দেখেই বললেন, কি? স্ট্যাবিং?

আমি বিনীতভাবে বললুম, না হঠাৎ একটা ব্রণ ফেটে গেছে—

বিনীত, কেননা, এর আগের মুহূর্তেও ডাক্তারের ফি'র কথা মনে পড়েনি। আমার দরকার শুধু অ্যান্টিসেপটিক মলম—কিন্তু এই ডাক্তারের সময় নষ্ট করার জন্য যদি। কত? আট, ষোলো বত্রিশ? পকেটে তিন টাকা। ঘরখানায় আলো খুব জোরালো নয়, এত বেশী চামড়া বাঁধানো বই যে ডাক্তারের বদলে উকিলের ঘব বলে ভুল

হয়। আরো চোখে পড়ে, তিনদিকের দেয়ালে প্রায় পনেরো-ষোলোটা টিকটিকি, বেশ কেঁদো সাইজের।

ডাক্তার এবার বেশ ধীরে সুস্থে তিনটে ড্রয়ার খুঁজে একটা মলমের টিউব বার করলেন। সেটা হাতে রেখেই একটা আলমারি খুললেন। আলমারি ভর্তি থাকে থাকে সাজানো কাচের স্লাইড। অন্তত হাজার দুয়েক। তার থেকে একটা স্লাইড নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে। কাছে আসাব পর আমার মনে হলো, এই ডাক্তারকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কোথায়? মনে নেই। হুকুমের সুরে তিনি বললেন, রুমাল সরান। সরে গেল। কাচের স্লাইডে তিনি আমার কপাল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিলেন। তারপর রক্তটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। যেন ওর খুব দুঃখ। এইভাবে মানুষ কখনো কখনো প্রথম দেখা নদীর দিকে তাকায়। ডাক্তারের হাতের কব্জির ঘড়িতে দেখে নিলাম—পাঁচটা চল্লিশ, আর বেশী সময় নেই। বাসে এখান থেকে পনেরো মিনিট লাগবেই মেরে কেটে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। খালি চোখে রক্তে আবার কে কি দেখতে পায়। ভড়ং! ফি-তো দিচ্ছি না! এই ডাক্তারকে আগে কোথায় দেখেছি? ডাক্তার এবার মুখ ফিরিয়ে আবার হুকুম, আঙুল দেখি!

আঙুলগুলো ছড়িয়ে হাতের পাঞ্জাটা এগিয়ে দিলাম। ডাক্তার টিউব টিপে একটুখানি মলম আমার তর্জনীতে লাগিয়ে ডান দিকের একটা হেলানো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, যান, ঐখানে ব'সে কপালে মলমটা লাগান।

চেয়ারে বসার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার, সময় নেই, অতএব আরও বিনীত, বিগলিত হাস্যময় মুখ, না, আমি আর বসবো না, আমাকে এক্ষুণি একটা কাজে যেতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, মানে একটাও ওষুধের দোকান নেই কাছাকাছি, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হলো, মলমটা—

—বসুন ঐ চেয়ারে!

অবাক। হুকুম? কেন, কি এমন ব্যাপার হয়েছে? ভারী তো একটু মলম, এ ডাক্তারের কাছে তেমন পেসেন্টও তো আসে না। রথীনের মামার চেম্বারে দেখেছি সব সময় কানা খোঁড়ায় গিসগিস করে। বসলুম না, দাঁড়িয়েই রইলুম। ডাক্তার চলে গেছেন টেবিলের ডান পাশে, মাইক্রোস্কোপের নিচে আমার রক্তমাখা স্লাইড, মাইক্রোস্কোপের ওপরে ডাক্তারেব মনোযোগী চোখ। চোখ না তুললে কথা বলতে পারছি না। এবারের কথাটা ডাক্তারের চোখের দিকে চোখ রেখে নির্ভীকভাবে বলতে হবে উপকার করেছেন ঠিকই কিন্তু এমন কিছু নয়, যার জন্যে আপনার হুকুম শুনতে হবে! এর জন্যে ফি আশা করাও আপনার অন্যায়।

নাকের কাছটা হঠাৎ ভিজে লাগলো। একটা ফোঁটা টলটল করছে। হঠাৎ সর্দি হয়ে গেল? ছিটেফোঁটাও তো ছিল না সকালে? আঙুল ছোঁয়ালুম। আঙুলের ডগা রক্ত মেখে ফিরে এলো। এখনও রক্ত। এবারে আঙুল গেল কপালে, খুব সাবধানে ছুঁল। ভিজে ভিজে। মলম লাগিয়েও রক্ত বন্ধ হয়নি। রুমালটায় ছাপ ছাপ রক্ত। আমার হাতে। তাহলে নিশ্চিত মুখেও। ভালো করে না ধুয়ে তো যাওয়া যাবে না। এক একটা ব্রণ এরকম তেরিয়া ধরনের হয়, কপালের ব্রণ তো কোনো নিয়মই মানে না। অনেক ডাক্তারের ঘরে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন থাকে। এঁর নেই। আয়নাও

নেই। এই প্রথম আমার মন খারাপ লাগলো। গায়ত্রীর কাছে এরকম রক্তমাখা হাত আর মুখ দিয়ে কুৎসিত ভাবে কি করে যাবো? আর কপালের রক্তপাত বন্ধ করতেই হবে।

ডাক্তার মাইক্রোস্কোপে তন্ময়। আমি ক্রমশ অধৈর্য। মলমের টিউবটা কোথায় গেল? আমি একটু জোরে বললুম, মলমটা আর একটু দেবেন? আমার রক্ত বন্ধ হয়নি। মাইক্রোসকোপ থেকে চোখ উঠলো না, উত্তর এলো বেশী মলম লাগলে বেশী কাজ হয় কে বলেছে?

—কিন্তু আমার রক্ত পড়া তো বন্ধ করতে হবে।

—বললুম তো, ঐ চেয়ারটায় বসুন!

ঘরের ভেতর দিকে আর একটা দরজা আছে, আগে লক্ষ্য করিনি। খোলার পর চোখে পড়লো। খোলা দরজায় একটা মেয়ের শরীরের এক অংশ দাঁড়ালো। মুখ ঝুঁকালো ঘরের মধ্যে, কোঁকড়া চুল, চিবুক দেখলে উনিশ বছরের বেশী বয়েস মনে হয় না। ভারী চমৎকার দাঁত, সেই দাঁতের ঝিলিকে প্রশ্ন, বাবা, তুমি এখন চা খাবে?

—না।

—খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

—এখন না একটু পরে।

মেয়েটিকে দেখেই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। রক্ত মেখে আমার কপালের চোহারাটা এখন কি রকম হয়ে আছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটি ঘরের দ্বিতীয় প্রাণী: উপস্থিতি ভ্রূক্ষেপই করলো না, সম্পূর্ণ শরীরটা নিয়ে ঘরে এলো, দোহারা চেহারা, তুঁতে রঙের শাড়ি, আমি আড়-চোখে দেখছি, সে টেবিল থেকে দুটো আলপিন তুলে নিয়ে আবার পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার চোখ তুলে সাড়ম্বরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখখানা কিন্তু সত্যিকাবের বিষাদময়। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, জানতুম! আমি আগেই জানতুম।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এতক্ষণ ধরে আমার রক্তে কি দেখছিলেন। কি হয়েছে আমার? রক্ত পড়া থামছে না কেন? নাঃ এসব বাজে ভয়। 'জানতুম'। কি জানতেন? দরকার নেই জেনে। মলমটা বিনা পয়সায় হলেও রক্ত পরীক্ষার জন্য ফি দিতেই হয়।

—দেখুন, আমার রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না। দয়া করে এর একটা ব্যবস্থা করবেন?

—এই রক্ত শরীরে থেকেই বা লাভ কি? যতটা বেবিয়ে যায় যাক।

—তার মানে? আমি রাস্তা দিয়ে এভাবে যাবো কি করে?

—যেতে হবে না। সেইজন্যই তো ঐ চেয়াবে বসতে বললুম।

—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে যে।

—কোথায় যাবেন?

অচেনা লোককে কেউ এ প্রশ্ন করে না। ডাক্তারটা আসল তো? নাকি কোনো পাগল? একটা ব্রণ ফাটার রক্তও তো বন্ধ করতে পারে না। জলের ঝাপটা দিতে পারি বরং।

আমার রক্তে কি দেখলেন?

আমার এই ক্যাবিনেটে সাতশো রক্তের স্লাইড আছে। ওর সব কটাতে যা দেখছি

আপনারটাও তাই। দূষিত, পচা রক্ত।

—অসম্ভব, আমার কোনো অসুখ নেই।

—আসল অসুখটাই বাধিয়ে বসে আছেন। ঐ সাড়ে সাতশো—প্রত্যেকেরই বয়েস তিরিশের নীচে—সকলেরই এক রোগ।

অস্বীকার করতে পারবো না, ভয়ে বুকটা ছমছম করছে। অজান্তে কোনো মারাত্মক অসুখ শরীরে দানা বেঁধেছে? কখনো তো টের পাইনি। হঠাৎ একদিন মূল ধরে নাড়া দেবে? মরে যাবো? মৃত্যুর কথা ভাবলে বুক মোচড়ায়। না, মরতে চাই না। একটুও মরতে ইচ্ছে হয় না।

পূর্ব নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আমার শরীর। মুখ প্রশ্ন করে, কি অসুখ?

—এক্ষুণি যেতে হবে বলছিলেন যে?

—অসুখটা কি বলুন। পরে এসে আপনার কাছে চিকিৎসার ব্যাপার...

—কি নাম?

—সনৎ দাশগুপ্ত।

—বয়েস?

—সাতাশ।

—অসুখটার নাম কাপুরুষতা।

ডাক্তারের ঠিক দু'চোখের ওপর আমার দু'চোখ। দেখছি। দেখা হয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই বাতিকগ্রস্ত। কিংবা আদর্শবাদী-টাদী কিছু একটা হবে। গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য হেসে বললুম, আচ্ছা চলি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, রক্তটা ধুতে হবে। কপালে, নাকে, হাতে। এইরকম ভাবে রাস্তায়—।

ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছেন, প্রায় হুংকারের মত বললেন, অস্বীকার করতে পারবেন, কাপুরুষতার কথা। আমার বয়েস সাতচল্লিশ, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সাহস আছে?

পাঞ্জা লড়ার ভঙ্গিতে নিজের কব্জি মুচড়ে দিলেন তিনি, ঘড়িটা একেবারে আমার চোখের সামনে। ছটা বাজতে পাঁচ। আঃ কেন তিনটে বাস ছেড়েছিলাম। কেন প্রতাপ কাকা। কেন গয়লাটার কনুই। এখনও ট্যাক্সি নিতে পারলে—। চঞ্চল হয়ে বললুম, দেখুন, আজ আমায় এক্ষুনি যেতে হবে, পরে আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। এখন একটু যদি।

—এক হাত পাঞ্জা লড়ারও সাহস নেই?

—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। যদি একটু...।

—কতক্ষণ আর লাগবে? এক মিনিট

—কিছুতেই আর পারবো না। যদি একটু জল

—কোথায় যেতে হবে?

—একটি মেয়ে ছটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে, ভীষণ দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু রক্তটা বন্ধ হলো না।

—মেয়েটির সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

পিছনের দরজা ঠেলে আবার সেই মেয়েটি। সেই তুঁতে রঙা শাড়ি, দোহারা উনিশ। এবারও ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করা গলায়, বাবা, তোমাকে মা ডাকছে।

—এখন না, একটু পরে।

—খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

এবার মেয়েটি আমার দিকে ফিরে, আপনি একটু বসুন, বাবা এক্ষুনি ঘুরে আসছেন। হঠাৎ আশা পেয়ে আমি মেয়েটিকে অনুনয় করি, দেখুন, আপনার বাবার সঙ্গে আমার আর কোনো দরকার নেই, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? আমি একটু মুখটা ধুতাম।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন, তার আগে একটা কথার উত্তর দিন। মেয়েটির সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

—আট-নয় বছর।

—নিশ্চয়ই মেয়েটি বিবাহিত?

—না, না,

—আবার মিথ্যে কথা? কাপুরুষ, কাপুরুষ। চোখের পাতা ফেলা দেখে বুঝতে পারছি মিথ্যে কথা।

আমি মেয়েটিকে সনির্বন্ধ অনুরোধে, বাথরুমটা যদি দেখিয়ে দেন।

—একতলার বাথরুম তো বন্ধ। পিসীমা গেছেন। দোতলায় আসুন—

—না, না, থাক দোতলায় না। যদি একটু জল।

—শুধু জল চাই? বাইরে তো বৃষ্টি পড়ছে, তাতে ধুয়ে নিন না।

—বৃষ্টি পড়ছে?

—খুব জোরে। বেরুলেই ভিজে যাবেন।

—তা হোক, আমি চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ডাক্তার তাঁর মেয়েকে বললেন, রিস্টু, ঐ লোকটার অসুখ কোনদিন সারবে না।—আমি আর ডাক্তারের কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে এলাম সুইংডোর ঠেলে। বসবার ঘর পেরিয়ে। বাইরে সত্যিই বৃষ্টি।

কিছুক্ষণ আগে যে ঘূর্ণী হাওয়া উঠেছিল, তারই অনুসরণকারী এই বৃষ্টি! বেশ ঝেঁপে এসেছে। আমি ভিজতে ভিজতে রাস্তার মাঝখানে। দু'হাত পেতে জল নিয়ে হাত দুটো রগড়ে নিলাম। আকাশের দিকে মুখ রাখতেই কিছুক্ষণ সচ্ছলভাবে জলবর্ষণ হলো, ব্রণ থ্যাৎলানো জায়গাটা জ্বালা করে উঠলো। একটা ট্যাক্সির জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল।

৩

অফিস ছুটির পর যে রাস্তাঘাট মানুষে ছেয়ে যায়, সেসব মানুষ এখন কোথায়? খাঁ খাঁ করছে চৌরঙ্গি। জলে ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া গাড়ির চিটচিটে শব্দ। অন্য দু একটা গাড়িবারান্দার নীচে কিছু লোক জমে আছে, কিন্তু বাইবেল সোসাইটির বাড়ির বারান্দার নীচেটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। কেউ নেই। সাড়ে ছটা বাজে। গায়ত্রী এসে চলে গেছে? এই বৃষ্টির মধ্যে গেল কি করে? বুকের মধ্যে একটা বিষম উত্তেজনা। কোনোদিন গায়ত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করিনি। কিন্তু আজ গায়ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিতে বললাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম ফুটপাতের ধার ঘেঁষে গায়ত্রী হাঁটছে। বসন্তকালের আকস্মিক বৃষ্টি, কেউ ছাতা বা বর্ষাতি নিয়ে বেরোয়নি, সুতরাং

পথে লোক নেই। গায়ত্রী একা হাঁটছে ভিজতে ভিজতে—মিউজিয়ামের পাশের প্রশস্ত ফুটপাতে মন্থর, অভিমানী তার পদক্ষেপ। কষ্ট হলো, গায়ত্রী আমাকে ভুল ভেবেছে। বৃষ্টির ভয়ে আমি আসিনি। তাই ও ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজছে। ট্যাক্সিওয়ালা, রোখকে। গায়ত্রী!

দরজা খুলে আমি অতি ব্যস্ততায় নেমে পড়েছি। এবার সে ঘুরে তাকালো। গায়ত্রী নয়। লম্বাটে ধরনের মুখ, অতিরিক্ত ফর্সা, কিন্তু সেই মুখ বিষণ্ণ ছিল। অন্য মেয়ে কিন্তু একটু একটু চেনা মনে হলো। ডাক্তারটিকেও একটু চেনা মনে হয়েছিল, কোথাও যেন আগে দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারিনি। এরও নাম মনে এলো না। কিন্তু মেয়েটি আমাকে চিনতে পেরে বললো, সনৎবাবু? আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন? আমাকে একটু বেকবাগানের মোড়ে পৌঁছে দেবেন? একটাও ট্যাক্সি পাচ্ছি না—সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছুবার কথা।

আমি খিদিরপুরের জন্য রওনা হয়েছিলাম, বেকবাগান অন্যদিকে। কিন্তু না বলা যায় না। আসুন। সঙ্কুচিতভাবে আমি সরে বসলাম। মেয়েটি হাতব্যাগের মধ্যে থেকে শুকনো রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হলো। সাড়ে ছ'টা এখানেই বেজে গেছে!

আমার একমাত্র সৌভাগ্য, আমি একটা ট্যাক্সি অধিকার করতে পেরেছি—মেয়েটিকে তার ভাগ দিতে হবে। কিন্তু কে এই মেয়েটি? বেকবাগানের দিকে দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটির কাছ থেকে—আমার যে ওর নাম মনে নেই সে কথা বুঝতে না দিয়ে, ওর নাম কি করে জানা যায়। জিজ্ঞেস করি, গায়ত্রীর সঙ্গে আপনার দু'চারদিনের মধ্যে দেখা হয়েছিল?

—কে গায়ত্রী?

—গায়ত্রীকে চেনেন না? গায়ত্রী সান্যাল?

—না তো।

—আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

—ও না, আপনি বুঝি আমায় চিনতে পাবেন নি?

—না।

—তাহলে একটা অচেনা মেয়েকে ট্যাক্সিতে তুললেন কেন?

—আপনি তো আমার নাম ধরে ডাকলেন।

—শুধু সেইজন্যই? আপনি-কোনদিকে যাচ্ছিলেন?

—খিদিরপুর।

—তাহলে বেকবাগানে যাচ্ছেন কেন?

—তাতে কি হয়েছে, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

—না, আমি যাবো না, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।

—আরে না, না, তা কি হয়? চলুন না, বেকবাগান আর কতদূর।

—না, আমি কিছুতেই যাবো না। আপনি আমার নাম জানেন না?

—আপনি কি করে জানলেন যে আমার নাম সনৎ?

—সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। ট্যাক্সি, এখানে বেঁধে দিন!

—আরে একি করছেন। চলুন না, এইটুকু তো পৌঁছে দেওয়া।

মেয়েটি দরজা খুলতে গেলে, আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করি। মেয়েটি হিংস্রভাবে মুখ ঘুরিয়ে, আপনি আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন যে? লজ্জা করে না? একটা অচেনা মেয়ের...

—আরে ছি, ছি, তা নয়। আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে চাইছিলাম।

—একটা অচেনা মেয়েকে পৌঁছে দেওয়ার অত গরজ কিসের আপনার?

—অচেনা কোথায়? আপনি তো আমাকে চেনেন।

—দু'জনে দুজনকে না চিনলে চেনা হয় না। আপনি হাত সরান, আমি নেমে যাব। আমাকে অপমান করতে চাইছেন আপনি।

আমার হাসিও পাচ্ছিল, আবার বুকের মধ্যে একটু কান্না ভাব। এই এক ধরনের অভিমান। ধৈর্য্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে আমি নেমে যেতে দিলাম। নেমে গিয়ে মেয়েটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। কথা বলতে গেলেই কথা বাড়বে। মেয়েটি তিক্ত গলায় বললো, এই নিন, এই রাস্তাটুকুর ভাড়া। আমি হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, চলিয়ে। মেয়েটি এবাব একটু হাসলো, বললো আপনার কপালে কেটে গেছে বোধহয়। বক্ত পড়ছে। মুছে ফেলুন।

৪

দূর থেকে দেখেছি, এ বাড়িতে কোনোদিন ঢুকিনি। দরজা ধাক্কা দিতেই সুব্রতদা নিজেই খুললেন। আমাকে দেখে মুখে চোখে হাসি, বললেন আবে সন্তু, কি ব্যাপার, এসো এসো, ভাবতেই পারিনি—কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। ইস্, একেবাবে ভিজে গেছ যে—তোয়ালে দিচ্ছি, মুখটুকু মুছে নাও!

সাদা তোয়ালের মাঝে মাঝে লাল ছাপ পড়তে লাগলো। ইস্, কি বিরক্তিকর! সুব্রতদা কোনো ভনিতা করলেন না, পুলকের ছোঁয়া লাগা মুখেই বললেন, গায়ত্রীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছো তো? কিন্তু সে কি আর তোমার সঙ্গে আজ দেখা করবে? যা রাগ করে বসে আছে সারাদিন।

—কেন রাগ করেছে কেন?

—কি জানি। সন্ধেবেলা বেরুবে বলেছিল, আমি এত বললুম, কিছুতেই আর বেরুলো না। সকালবেলা খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে তো।

—কি নিয়ে ঝগড়া?

সুব্রতদা সস্নেহে আমার কাঁধে দু'হাত রাখলেন। বললেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয়, তা কি জিজ্ঞেস করতে আছে ভাই?

—সুব্রতদা, আপনি ওকে আবার মেরেছেন?

—ছিঃ, ওসব কথা জিজ্ঞেস করে না!

কাঁধ থেকে সুব্রতদার হাত সরিয়ে আমি একটু দূবে দাঁড়ালাম। চোয়াল কঠিন। বললাম, সুব্রতদা, আপনি জঘন্যভাবে অসভ্যের মতন গায়ত্রীব ওপর অত্যাচার করেন, আমি সব জানি। এর একটা শেষ হওয়া দরকার।

—সব শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না।

—তার মানে?

—গায়ত্রী আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করবে না, আমাকে কথা দিয়েছে।

—আমার সঙ্গে দেখা করাটা কোনো ব্যাপার নয়। বিয়ের পর দেড় বছর আমরা একদিনও দেখা করিনি। কিন্তু আপনি পশুর মতন...সুব্রতদা আপনি গায়ত্রীকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন কেন?

—নিজে কষ্ট পাবার জন্য। এই ছ'বছর আমার জীবনটা তো জ্বলে পুড়ে গেল।

—গায়ত্রী আপনার সঙ্গে গোড়ার দিকে অনেক মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। গায়ত্রীর মত ভালো মেয়ে—

সুব্রতদা পরম আহ্লাদ পেয়ে হাসার মতন মুখ করে বললেন, কিন্তু তার যে একটা উকিল ছিল তোমার মতন—

—আমি কি করেছি?

—তুমি আর কি করবে? তুমি কিছুই করোনি, তোমার কিছু করার সাধ্যও নেই, তুমি শুধু শখের প্রেমিক সেজে থেকেছো। গায়ত্রীর মাথাটা তাতেই বিগড়েছে।

—সুব্রতদা, আমি গায়ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবো ওপরে।

—খুব ভালো কথা। তার আগে একটা কথা শুনবে ভাই? মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। গায়ত্রীর সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে। সে আর আমার অবাধ্য হবে না। তুমি আর মাঝখান থেকে উৎপাত করতে এসো না। ডাক্তার এসে বলে গেছেন, গায়ত্রীর বাচ্চা হবে। চারমাস চলছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াই। এইজন্যই সুব্রতদার সারা শরীর ভরা খুশী। পুনশ্চ আমার কাঁধে বন্ধুর মতন সুব্রতদার হাত। ফিসফিস করে বললেন, বিয়ে তো করোনি এসব বুঝবে না। আমি বরাবরই গায়ত্রীকে বলেছিলাম, আমার দিক থেকে কোন দোষ নেই, ডাক্তার বলেছেন—

—আপনি সত্যি বলছেন?

এ প্রশ্নটা বলার জন্যই বলা! সুব্রতদার চোখ ঝিকঝিকে, লম্পট পাষণ্ডটা আমার দিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন তাকিয়ে বললো, এ-সব কথা কেউ মিথ্যে বলে? একটা সিগারেট দাও তো। আছে?

—দোতলা বাড়িটার কোথাও কোনো শব্দ নেই। চাকর-টাকরও কারুকে দেখা যাচ্ছে না। সুব্রতদার কানের কাছে একটুখানি সাবানের ফেনা। এইমাত্র দাড়ি কামিয়েছেন।

—নেই, সিগারেট নেই।

—যাকগে তুমি তাহলে ওপরে যাবে গায়ত্রীর কাছে? ভেবে দ্যাখো, সে এখন মা হতে যাচ্ছে—এখন কি আর তোমাদের ওসব ছেলেমানুষী মানায়?

—শুধু একবার দেখা করবো—

চলো। সুব্রতদা আমার হাত ধরে সিঁড়ির কাছে এলেন। দু-ধাপ উঠে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলবে ওকে?

—জানি না।

—আর কোনদিন আসবে না বলো?

—ও যদি না চায়, ও যদি বারণ করে...

—ও কি বোঝে? তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে—পুরুষ মানুষের ব্যাপার, মেয়েরা এসবের কি বোঝে?

—সুব্রতদা, আমাকে একবার ওপরে যেতে দিন।

আরও কয়েক ধাপ উঠে সুব্রতদা আবার দাঁড়ালেন। কি যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। মুখটা একটু বদলে গেল। খরগোশের মতন চোখ। তারপর আবার হাসলেন—ও কিছু না। সন্তু একটা কথা সত্যি করে বলো তো? তুমি কোনদিন গায়ত্রীর সঙ্গে...

—ছাড়ুন ছাড়ুন আমাকে। ঠেসে ধরেছেন কেন?

—সন্তু, তোমাকে যদি এই সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিই?

—কেন, আমি কি করেছি?

—তুমি কিছু করোনি। সেটাই তো তোমার দোষ। তুমি একটা ন্যাকা—

—আমার কাঁধ ছাঁড়ুন। ভালো হবে না বলছি!

—ইয়ার্কি করছি, তাও বোঝো না? তোমার কপালে রক্ত কেন? ব্রণ ফাটিয়েছো তুমি? দেখি, দেখি,—

—খবরদার, আপনি আমার কপালে হাত দেবেন না। না, বলছি—

—হাত দেবো কেন? রক্ত ছুঁতে আমার ঘেন্না করে। দেখছিলাম–

নীচের দরজায় শব্দ হলো। সুব্রতদা আবার উৎকীর্ণ, সারা বাড়ির স্তব্ধতা ফাটিয়ে বিকট গলায় চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে? দরজায় আবার শব্দ। আমাকে ছেড়ে বিদ্যুতের গতি, সুব্রতদা, লাফিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে ছুটলেন। পিছনে পিছনে আমিও। দরজার সামনে গায়ত্রী দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে, নতমুখ, চুল থেকে টপটপ করে জল গড়াচ্ছে। সিঁথির সিদুর গলে একটুখানি গড়িয়ে এসেছে নীচে। অনেকটা আমারই মতন রক্তাক্ত কপালের দৃশ্য। দরজায় হাত রেখে গায়ত্রী স্থির চোখে দেখলো দুজনকে। আমার চোখে চোখ রাখলো না। শরীরটা কাঁপছে ওর। আমি গায়ত্রীকে ডাকতে ভয় পেলাম। একদম মরতে ইচ্ছে করে না আমার। আমার খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

পৃথিবীতে যত বিষ, গলায় সব মিশিয়ে সুব্রতদা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি আবার ফিরে এসেছো? লজ্জা করে না? গায়ত্রী আমার দিকে তাকালো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কাঁদতেই লাগলো, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে—গায়ত্রীর দিকে আমার দু-চোখ। গায়ত্রী চোখ মুছলো, আমাকে দেখলো না, সুব্রতদার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, আমাকে ক্ষমা করো, না ফিরে আমার উপায় নেই, আমাকে ক্ষমা করো।

রাগ অনুরাগ

শক্তিপদ রাজগুরু

হরিমাধব বাবুর এমনিতে বেশ সাজানো সংসার। দুই ছেলেও কৃতি। একজন কোন কলেজের অধ্যাপক, ছোট ছেলে এলাকার নামী ডাক্তার, ভালো পশার।

হরিমাধববাবু নিজে এখানের বারের নামকরা উকিল। নিজের চেম্বার এদিকে। মক্কেলের ভিড় লেগেই আছে।

ফৌজদারী কেসের বিশেষজ্ঞ। ফাঁসির আসামীকে তার সওয়াল জবাব আর নিপুণভাবে সাক্ষীকে পড়ানোর জন্য তিনি খালাশ করে আনতে পারেন এটা বেশ কয়েকবারই দেখেছে অনেকে।

এজলাসে দাঁড়ালে তরুণ হাকিমরা হরিমাধবকে সমীহ করেন। ভরাটি কণ্ঠস্বর, ইয়া গোল মুখে একজোড়া পুষ্ট বিড়ালের ল্যাজের মত গোঁফ, তার কণ্ঠস্বরে গম গম করে এজলাস।

আদালতে তিনি যেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। চেম্বারেও সেই মূর্তি।

মক্কেল এসেছে চারাভাঙ্গানীর মামলা করতে অন্য পক্ষের নামে। তার ভাইপো নাকি জোর করে কাকার জমি দখল করতে চায়। তার রোয়া ধানগুলি তছনছ করে গেছে। তাই ভাইপোর নামে মামলা করতে এসেছে শশী মোড়ল, বলে, ভাইপোকে ফাটকে পুরতে হবে উকিলবাবু। এই দুশো টাকা আগাম রাখেন, ভাইপোকে ফাটকে পুরতে পারলে আরও পাঁচশো—

তারপর হরিমাধব বলে—ভাইপোকে ফাটকে পুরতে হবে? তাহলে এদিকে আয়—আয়!

শশী মোড়ল উকিলবাবুর ডাকে এগিয়ে আসতেই এবার উকিলবাবু টেবিল থেকে জম্পেশ রুল কাঠটা তুলে নিয়ে শশীর কপালেই এক মোক্ষম ঘা মারতে শশী আর্তনাদ করে বসে পড়ে কপালে হাত দিয়ে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে টপ্ টপ্ করে।

নিজের হাতের এহেন কাজ বেশ মন দিয়ে দেখছে হরিমাধব।

শশী বলে, মারলেন, কপাল ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটালেন কেন? কি করেছি?

—চোপ! হরিমাধব গোঁফ নেড়ে ধমকালেন—চোপ।

তোর মামলা পাকা করার জন্যই করেছি। ওহে মুহুরী।

নিবারণ মুহুরী জানে এরপর তার ডাক পড়বে। সে জানে তারও কিঞ্চিৎ আমদানী হবে। সে জানে কি করতে হবে এরপর। কারণ ফৌজদারী মামলা সাজাবার জন্য উকিলবাবু এসব কাজ করেন। নিবারণ বলে—একে থানায় নে গিয়ে ডাইরী করিয়ে আনবো?

—উকিলবাবু বলেন শশী, একটা মিথ্যা সাক্ষীও আমি যোগাড় করে দোব—খরচা দিয়ে যাও থানায় ডাইরী করিয়ে এসো।

রক্তপাত-হত্যার চেষ্টা একবার উল্লেখ থাকলে তোমার ভাইপোকে হাজতে পোরা যাবে না। এবার সব ঠিক করে দিয়েছি। ফাটকে পুরছি তোমার ভাইপোকে।

আর হরিমাধব উকিল তাই করেছে। তিনচারজন জুনিয়ার উকিল আদালত বাড়ির চেম্বারে নথিপত্র নিয়ে হরিমাধবের নোট নেয়। মামলা সাজায়। সাক্ষীদের তালিম দেয় কি কি বলে যেতে হবে দিনকে রাত করার জন্য।

বিপক্ষের উকিলদের আনা সাক্ষীদের জেরার মুখে ধমক দিয়ে হরিমাধব ওদের সব কথাকে তালগোল পাকিয়ে দেয়।

মামলা উলটে দেয়, হুংকার আর ধমকে হরিমাধব উকিল।

কিন্তু এহেন পুরুষ সিংহ বাড়িতে গিন্নী হরিপ্রিয়ার কাছে একেবারে কেঁচো। হরিপ্রিয়ার বাবা মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামের জমিদার। বিশাল চকমেলানো বাড়ি দেউড়ি, ঠাকুর দালান, কাছারিমহল, বাড়িতে জুড়ি গাড়ি সবই ছিল।

বাবার আব্দারে মেয়ে—ছোট ভাই-এর চেয়ে তার আব্দারই বেশী। জমিদারবাবু দেখে শুনে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

হরিমাধবের বাবাও ছিলেন জমিদার। তবে হরিমাধব কলেজে পড়ে এখন নামকরা উকিল।

জমিদারী চলে গেছে, হরিপ্রিয়ার ছোট ভাই এখন ধানকল করে ভালো ব্যবসা করছে তবে জমিদারী না থাকায়ও জমিদারী মেজাজটা রয়ে গেছে হরিমাধবের শালা বাবুর। রয়েছে দাপটও।

তার তুলনায় হরিমাধব বাড়িতে নিরীহ নিপাট একটি মানুষ, আর সেটা হয়েছে ওই স্ত্রী হরিপ্রিয়ার দাপটে। জমিদারী মেজাজ তার।

দশাসই চেহারা, এককালে সুন্দরীই ছিল, ফর্সা গায়ের রং। সেই সুন্দরী মেয়েটি এখন জেল দারোগা। হাকিম সামলাতে জানে হরিমাধব কিন্তু দারোগা সামলাতে অক্ষম, বিশেষ করে বাড়ির এই দারোগাকে।

হরিমাধব বিকালে গাড়ি থেকে বাড়ি ঢুকেছে। উঠোনে কলতলায় কাজের মেয়ে সাবিত্রী একরাশ বাসন নিয়ে মাজতে বসেছে। বাড়ি ঢুকে হরিমাধব নিচে দাঁড়িয়েছে উপর থেকে হরিপ্রিয়ার চড়া গলা শোনা যায়।

ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? উঠে এসো। এসো!

হরিমাধববাবুর মেজাজ চড়ে ওঠে। আদালতে আজকে হাকিমের এজলাসে বেশ তর্ক হয়েছে একটা ল'পয়েন্ট নিয়ে—মন মেজাজ ভালো নেই।

গিন্নীর এই হাঁকডাকে বলে হরিমাধব—যাচ্ছি।

—উঠে এসো, এক্ষুনিই।

হরিমাধববাবু জুতো খুলে উঠে গেলেন দোতালার ওদিকের ঘরে। গিন্নীর হাঁকডাকে ওদিকে বড় বৌ শেফালী আর বড় ছেলে চাইল। শেফালী স্বামীকে বলে—এত খোঁজ করে এই কাজের মেয়েটিকে আনলাম বাবার বাড়ি থেকে ; মা এবার একেও তাড়াবে। কি সন্দেহ বাতিক যে মায়ের।

হরিমাধবের বড় ছেলে অধ্যাপক মধুসূদন পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে বলে—তাই দেখছি। মায়ের কি যে রোগ।

ওদিকে ছোট বৌও দেখেছে ব্যাপারটা। তার ডাক্তার স্বামী চেম্বারে যাবার জন্য পোশাক বদলাচ্ছিল। সে বলে—মায়ের এটা একটা মানসিক রোগ। ছোট বৌ আইভি

স্বামীকে বলে—মায়ের রোগ আবার তোমার মধ্যে সংক্রামিত হয়নি তো? দেখো বাপু...।

ডাক্তার হরগোবিন্দ স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—সে ভয় তোমার নেই।

আইভি বলে—একটা কিছু না করলে বাড়িতে কাজের মেয়ে তো থাকবে না। মায়ের একি বিশ্রী রোগ। তুমি তো ডাক্তার, দ্যাখোনা ওষুধপত্র দিয়ে।

হরগোবিন্দ বলে—এ রোগ সারানোর ক্ষমতা বাবা মহাদেবেরও নেই। আমি তো তুচ্ছ।

ওদিকে হরিমাধব তখন গিন্নীর জেরায় জেরবার। হরিপ্রিয়া মুখে পানের ওপর একছিটে খুশবুদার জরদা ছিটিয়ে জেরা করে।

উঠানে হাঁ করে ওই সাবিত্রীর দিকে চেয়েছিলে কেন?

হরিমাধব দেখেছে, ছোটছেলের গাড়ি রয়েছে, বড় ছেলেও ফিরেছে কলেজ থেকে। বৌমাও রয়েছে।

হরিমাধব বলে স্ত্রীকে, আস্তে, কি যা তা বলছ। ছেলে-বৌমারা রয়েছে—শুনতে পাবে।

হরিপ্রিয়া খাটে গদিয়ান হয়ে গলা আরও চড়িয়ে বলে—শুনুক। ওদের বাপের গুণের কথা শুনুক। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখনও ছোঁক ছোঁক স্বভাব গেল না। স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।

হরিমাধব চাপা স্বরে বলে—কি হচ্ছে! জুতো খুলছিলাম নীচে, ফিতে খুলতে দেরী হচ্ছিল।

থাক। আর সাফাই গাইতে হবে না। শেষবারের মত বলে দিলাম এদিক ওদিক চাইবে না।

তারপর গলা তুলে হাঁক পাড়ে কাজের মেয়ের উদ্দেশ্যে—এই সাবিত্রী, বাসন মাজা হলে রান্নাঘরে গিয়ে আনাজ কোট গে।

অর্থাৎ হরিমাধব এবার চা খেয়ে চেম্বারে নামবে তার আগেই সাবিত্রীকে উঠোন থেকে সরিয়ে দেবার কথাই বলা হলো।

হরিমাধবের বয়স এখন ষাট পার হয়েছে। ওর নামে শত্রুতেও কোনদিন কলঙ্ক, অপবাদ দিতে পারেনি। চরিত্রবান সৎ মানুষ।

ভোরে উঠে স্নান করে গুরু-বন্দনা, পূজা, গীতাপাঠ করেন, সন্ধ্যাতেও আধঘণ্টা গুরুপূজা ভজন করে চেম্বারে নামেন।

বাকী সময় কাটে মক্কেল, কেস কাছারি আর আদালত নিয়েই।

তবু গিন্নীর চোখে তার মত ভ্রষ্ট পুরুষ আর যেন কেউই নেই। ফিরতে দেরী হলে কৈফিয়ৎ চায় হরিপ্রিয়া—কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

হরিমাধব বলে—এজলাসে দেরী হয়ে গেল।

—এজলাস? না অন্য কোন মহিলা মক্কেলের বাড়িতে? শুধচ্ছি নিবারণকে।

হরিমাধব বলে—দোহাই তোমার, এসব ছাড়োতো। কি যে ভাবো? ছিঃ ছিঃ, এসব কথা বলতে বাধে না?

—বাধবে কেন? তোমাকে বিশ্বাস নেই।

এই নিয়ে বৌদের মধ্যেও হাসাহাসি হয়।

—কি কাণ্ড।

ছেলেরা বলে—কাজের মেয়েটা আছে তো? মা শুরু করেছে আবার।

হরিমাধববাবুর উপর গিন্নীর কড়া নজর। রাতে হরিমাধববাবু কোনদিন বাথরুমে যাবেন। হরিপ্রিয়ার ঘুমও সজাগ, দেখে কর্তা ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছে।

হরিপ্রিয়ার মনে হয় নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো নয়। সেও পা টিপে টিপে কর্তার পিছু পিছু বের হয়ে আসে। এবার হাতেনাতে কর্তার কুকীর্তি ধরবে।

সেকেলে আমলের বিরাট বাড়ি। দোতলার বাথরুম বারান্দার ওদিকে। হরিমাধব বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে। দেখে থামের আড়ালে গিন্নী সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

—তুমি।

হরিপ্রিয়া বলে—বাথরুম যাবে, বলে যাবে তো। রাতদুপুরে কোথায় যাচ্ছো দেখব না? সেই ফাঁকে দেখে হরিপ্রিয়া একতলায় নামার গেটটা সঠিক তালাবন্ধই রয়েছে। ঝি চাকররা অবশ্য একতলাতে থাকে রাতে।

হরিমাধব বলে—এত ঠাকুর নাম করো, মনের এই ময়লা তবু মুছতে পারলে না।

এই নিয়েই অশান্তি বাড়িতে। হরিমাধব যেন বাড়ির ছেলে বৌদের সামনে একটা ক্লাউনে পরিণত হয়েছে।

হরিমাধবের ব্যাপারটা ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে ওঠে। হরিমাধবের নীচের তলায় নামার সময় হরিপ্রিয়াও নেমে আসে বাতের শরীর নিয়ে।

চেম্বারে ঢুকিয়ে তবে উপরে উঠে যায় হরিপ্রিয়া। খবরটা দু-চারজন মক্কেলও জেনে ফেলে।

সেদিন হরিমাধবের শ্যালক জমিদার তনয় এসেছে হরিমাধবের বাড়িতে। হরিপ্রিয়াও ভাইকে পেয়ে খুশী।

হরিমাধবের অনেক দিনের বন্ধু ও শ্যালক। কমলবাবু রসিক ব্যক্তি। সন্ধ্যার পর তার একটু পানদোষ-এর অভ্যাস আছে। জমিদারী চলে গেলেও সেই অভ্যাসটা বজায় রয়েছে কমলবাবুর।

হরিমাধব নিজে ওসব খায় না। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সে, তবু শ্যালকের জন্য বিলাতী মদ, কাজু বাদাম, কাটলেট এসব আনিয়েছে।

হরিমাধব কমলকেই পেয়ে আজ বলে হরিপ্রিয়াব ওই সন্দেহ বাতিকের কথাটা। বলে, তোমার দিদি তো আমার মানসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ঘরে বাইরে। যা সন্দেহ বাতিক ওর।

কমল তখন সবে গ্লাসে চুমুক দিয়েছে। সে কথাটা শুনে বলে—সেকি! তুমি তো একদম নিরিমিস্যি লোক, মদ মেয়েছেলে কোন বাতিকই নেই, তোমাকে সন্দেহ করে দিদি!

—সন্দেহ বলে সন্দেহ, ছেলে বৌদের সামনে যা তা বলে। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বাড়ির কাজের মেয়ে—

ওই বুড়িকে নিয়ে সন্দেহ। হেসে ওঠে কমল।

হরিমাধব বলে—তুমি হাসছ! এদিকে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। এক এক সময় মনে হয় সংসার ছেড়েই কোথায় চলে যাই। যেদিকে দুচোখ যায়।

কমল বলে—জল অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি। এক কাজ করতে পারো? ফল হবে।

—কি। হরিমাধব আশান্বিত হয়ে শুধোয় সেই পরিত্রাণের পথের কথাটা। কমল গলায় এক ঢোক মদ ঢেলে বলে—একদিন আচ্ছাসে প্রহার করো। বেদম প্রহার। দেখবে মারের চোটে ওই সন্দেহের ভূত কোনদিকে পালাবে।

আমি শুধু এদিক ওদিক করি হরিমদা, এই নিয়ে কথা বলতে দিলাম মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে একদিন। ব্যস—তারপর থেকে ঠাণ্ডা। তাই বলছি—হরিদা, তুমিও একদিন মুষ্টিযোগ দিয়ে দাও দিদিকে বেশ কড়া ডোজেই দেবে।

হরিমাধব শ্যালকের এহেন পরামর্শে চমকে ওঠেন, বলছ কি হে নীলকমল। এ্যাঁ নিজের স্ত্রীকে প্রহার মারধোর করতে হবে! ছেলেরা বড় হয়েছে বৌমা, নাতি-পুতি রয়েছে। কি ভাববে তারা? না—না এ হতে পারে না। পাঁচজন শুনলে কি বলবে? ছিঃ ছিঃ করবে যে।

কমল মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিজ্ঞের মত রায় দেয়—তাহলে তোমার বাঁচার পথ আর নেই। ওই সব পাঁচালী শুনে যাও। তোমাকে বাঁচাবার আর কোন পথই দেখি না।

কমল বেশ কৃতি পুরুষ। ব্যবসাতে ভালো করেছে। নানাজনকে চড়িয়ে খায়। সদরের নেতাদেরও সকলে কমলবাবুকে সম্মান করে। তার কাছে নানা পরামর্শ নিতে আসে আপদে বিপদে।

হরিমাধব বলে—কমল তোমার মাথায় অনেকরকম মতলব খেলে শুনেছি। আমাকে পরিত্রাণের এক পথ বাতলাও ভায়া। নাহলে শেষমেষ সংসার ছেড়েই চলে যাবো কোথাও।

কমল তখন কয়েক পেগ চড়িয়েছে। নেশাটা গোলাবী রং ধরেছে। কমলের মাথায় এবার আইডিয়াটা আসে। বলে সে—হরিদা, একটা পথ আছে।

মারধোর করতে হবে না তো? হরিমাধব ওইসব অপ্রিয় কাজ করতে পারবে না। তাই ওই কথা বলে।

—না না, এ একেবারে অন্য পথ। ঠিকমত চাল দিতে পারলে দিদি একেবারে মাৎ হয়ে যাবে। তোমার পূজার ছুটিতে কোর্ট কতদিন বন্ধ থাকে?

—তা ধরো মাসখানেক। হরিমাধব জানায়।

—তাহলে ক'টা দিন মুখ বুজে দিদির থ্যাতলানি খাও। তারপরই ব্যস। কুমোরের ঠুকঠুক, কামারের এক ঘা। একেবারে মোক্ষম ঘা।

—তা কি করতে হবে বলবে তো। হরিমাধব শুধোয়।

কমল বলে, সময়েই বলবো।

হরিমাধবের জীবন যেন বিষিয়ে উঠেছে গিন্নীর ওই বাতিকে। সাবিত্রীর কাজ চলে গেছে—ছেলেরা কদিন চেষ্টা করে ছোট বৌ-এর গ্রাম থেকে এক বয়স্কা বিধবাকে

এনেছে কাজের জন্য। ছোট ছেলে মাকে বলে—সারা পাড়ার লোক, কাজের লোকেরা জেনে গেছে তোমার কথা। আর পাগলামী কোরো না।

হরিপ্রিয়া বলে—তোরা আমার দোষই দেখলি, তোদের বাপ! তার গুণের কথা জানিস? আদালতে এক মানুষ আর ঘরে পাড়ায় নজর দোষ গেল না।

ছেলে সরে পড়ে। বৌরা আড়ালে হাসাহাসি করে। হরিমাধববাবু সেদিন না খেয়েই আদালতে চলে যান। কাজে মন লাগে না। পূজার ছুটিও পড়ে গেল।

রাতের বেলায় উঠে বাথরুম যাবেন, দেখেন তার ধুতির সঙ্গে গিন্নী জম্পেশ করে শাড়ির আঁচল বেঁধে রেখেছে। অর্থাৎ হরিমাধববাবুকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। গিন্নীও জেগে গেছে। শুধোয়, কোথায় যাওয়া হচ্ছে চুপে চুপে। এ্যাঁ—নতুন মেয়েটার দিকে নজর পড়েছে এরমধ্যে।

—থামবে।

—কেন থামবো। হরিপ্রিয়াও গর্জে ওঠে।

ছেলে বৌমা জেগে গেছে। বড় ছেলে বলে মা কি পাগল হয়ে গেল!

ছোট বউ বলে ডাক্তারকে—কি ব্যাপার গো! রাত দুপুরেও বুড়োবুড়ির নাটক।

হরিমাধববাবু চুপ করে যান। অবশ্য হরিপ্রিয়া তখনও গজগজ করছে, স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।

হরিমাধবের মনে পড়ে এবার কমলের কথাগুলো। এবার সেও তৈরী।

পুজো আসছে। বাড়িতে সমারোহ শুরু হয়েছে, হঠাৎ সকাল থেকে হরিমাধবকে পাওয়া যাচ্ছে না। আদালত বন্ধ। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

হরিপ্রিয়াও ভাবনায় পড়ে। বলা নাই কওয়া নাই পূজার মুখেই লোকটা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল!

বড় ছেলে, বড় বৌমা, ছোট ছেলে, ছোট বৌমা এবার মাকেই দায়ী করে।

লোকটা শিবের মত সৎ, দিনরাত খেটেছে, পয়সা এনেছে, তাদের মানুষ করেছে, আর মা তুমি সেই সম্মানীয় লোকটাকে দিনরাত শুধু শাসন করেছো আর যা তা কথা বলেছো। ছোট ছেলে জানায়।

সারা শহরের মানী লোকটাকে তুমি পদে পদে অপমান করেছো। আর তাই অতিষ্ঠ হয়ে লোকটা ঘর ছেড়েই চলে গেল।

পুজো এসেছে, হরিপ্রিয়া এখন একেবারে নীরব। বাড়িতে যত ঝগড়া হোত তার স্বামীর সঙ্গেই। আজ সেই লোকটা নেই। উৎসব আনন্দের দিনে কোথায় রইল কে জানে।

অবশ্য ছেলেরা পরামর্শ করে অন্যদের জানিয়েছে বাবা কেদারবদরী গেছেন। তারা আসল খবরটা জানে না।

হরিপ্রিয়া নাওয়া খাওয়া ছেড়ে এবার চোখের জলই ফেলে, মানুষটাকে হারিয়ে আজ বুঝেছে যে সত্যিই স্বামীকে সে অকারণে লাঞ্ছনা অপমানই করেছে। এবার দেবতার চরণে মাথা ঠোকে—মানুষটাকে ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুর।

কিন্তু পূজা কেটে গেল হরিমাধবের কোন খবর নাই। ছেলেরাও ভাবনায় পড়ে। কোন বিপদআপদ হল কিনা বাবার কে জানে।

হরিপ্রিয়া ক'দিনেই আধখানা হয়ে গেছে। আর কথা বলে না সে। শুধু চোখের

জল ফেলে ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা ঠোকে। কিন্তু হরিমাধবের দেখা নেই।

কমল এ খবর পেয়ে আসে দিদির কাছে। দিদির সেই তেজ দাপট আর নেই। এখন সব ঠাণ্ডা। ভাইকে দেখে বলে, আমার কি সর্বনাশ হল রে। লোকটা বিবাগী হয়ে গেল। কোথায় গেল।

কমল বলে, তোমারই সন্দেহ বাতিকের জন্যই সংসার ছেড়ে চলে গেছে। গুরুদেবের আশ্রমে খবর নিয়েছো?

—হ্যাঁরে। সেখানেও যায়নি।

—তাহলে গেল কোথায়? কমল ভাবছে।

হরিপ্রিয়া বলে—আমারই দোষ। যা তা বলেছি ওকে। আর কোন দিন ওসব কথা বলব না। তুই লোকটাকে খোঁজ কমল।

কমল বলে—কাশীপুর শ্মশানে অনেক বড় সাধু আসে। তারা ভূত ভবিষ্যৎ সব জানে।

—সেখানেই নিয়ে চল। যদি তাঁরা ওর সন্ধান দিতে পারে। চল ভাই। হরিপ্রিয়া এখন অন্য মানুষ।

কমল বলে—সেখানে গিয়ে কি পাবে তাকে? তা এতকরে বলছ, কাল সকালে গাড়ি পাঠাবো, যাবে।

কমল বাড়ি ফিরে দেখে হরিমাধব কাগজ পড়ছে। তার বাগানবাড়িতে হরিমাধব কমলকে দেখে বলে—ও বাড়ির কি খবর হে, তোমার দিদি।

একেবারে নেতিয়ে পড়েছে ঠাকরুণ। মনে হয় ওষুধ ধরেছে।

হরিমাধব বলে, এভাবে আর তোমার বাগান বাড়িতে ক'দিন গাঢাকা দিয়ে থাকবো?

কমল বলে—ওই তোমার দোষ, বিয়ের পয়লা রাতে বৌ-এর কাছে হম্বিতম্বি দেখাতে পারোনি আমার মত, ওই ভুগছ। এবার একটা দিন বেশ জমিয়ে অভিনয় করতে হবে ব্যস। তাহলেই কিস্তি মাৎ।

অভিনয় করতে হবে?

কমল বলে—বার লাইব্রেরির নাটকে বাল্মিকী, বিশ্বামিত্রের পার্ট তোমার একচেটিয়া—কাল কাশীপুরের শ্মশানে সাধুর রোল করতে হবে। লাস্ট সিন। মেকআপ করার লোকও এনেছি। যা-যা বলবো করে যাও। ব্যস, তারপর দেখবে আমার দিদি ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।

হরিপ্রিয়া ব্যাকুল হয়ে এসেছে কমলের এখানে।

কমল বলে চলো মহাশ্মশানে। শ্মশানে এক নতুন সাধু এসেছেন। কে জানে হরিদা মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে গেল কি না।

ওকথা বলিসনি কমল। তার কিসের দুঃখ যে সন্ন্যাসী হবে?

কমল বলে—মনের দুঃখে। দুঃখ তো তুমি তাকে কম দাওনি।

আর ওসব বলিস না। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে। চল যদি সন্ধান পাই তার।

কাশীপুর শ্মশানে একটা নদীর ধারে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে শিরিষ, শেওড়া, নিম, আকাশমণি আর নিচে ঘন লতার জঙ্গল। ওরই এখানে ওখানে দু'একজন সাধু ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। হরিপ্রিয়ার দামী শাড়ি ধুলায় লুটোচ্ছে। কাঁটা ঝোপ, আকন্দ

বনের ভিতরে সে খুঁজছে একজনকে ব্যাকুলভাবে।

কমল অবশ্য স্টেজ রেডি করে রেখেছিল। সকালে হরিমাধবকে মেকআপ দিয়ে এখানে একটা বড় শেওড়া গাছের নীচে চালা করে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

ইয়া দাড়ি, পরনে রক্তাম্বর, গলায় অনেক হাবিজাবি, গায়ে ছাইও মাখানো। হরিমাধবের দাড়ি কুটকুট করছে। হঠাৎ হরিপ্রিয়াকে দেখে চাইল।

হরিপ্রিয়া দেখেই চিনেছে। পিছনে কমল। হরিপ্রিয়া এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে কান্না ভিজে গলায় বলে—একি হাল হয়েছে তোমার? এই শেওড়া গাছের নীচে বসে আছো নিজের ঘর সংসার ছেড়ে। ওগো ঘাট হয়েছে বাড়ি চলো।

হরিমাধব এবার বাল্মিকীর সেই ডায়লগ বলে—সংসার। ওসব মায়া। অনিত্য। সেই মায়ার সংসার ছেড়ে মহামায়ার কৃপালাভের জন্যই এখানে এসেছি। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

—ছেলেরা বৌমারা কত ভাবছে তোমার জন্যে, দাদুভাই কত কাঁদছে।

—দুদিন কাঁদবে, তারপর ভুলে যাবে। একবার যখন অনিত্যকে ছেড়ে এসেছি আর ওখানে যাবো না। ওঁ হরি ওম্—বলে হরিমাধব নীরব হয়ে যায়। যেন সমাধি লাভই করেছে।

হরিপ্রিয়া এবার পায়ে মাথা ঠোকে। আমার ঘাট হয়েছে, আর ওসব পাপ কথা কোনদিন মুখে আনবো না। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—ওগো ঘরে চলো। তপস্যা সেখানেই করবে। কাজকর্ম করবে, এসবও করবে শান্তিতে। আমি কোন কথা বলব না আর। পোড়া জিব আমার খসে যাবে।

কমল বলে, হরিদা, দিদি এতকরে বলছে, ঘরেই চলুন। সংসারই তো স্বর্গ, ঘরই তো মন্দির।

হরিমাধব বলে—তুমি বলছ কমল? শেষে আবার সেই অশান্তি।

হরিপ্রিয়া বলে—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমার ভুল ভেঙেছে। যে এককথায় ঘর সংসার ছাড়তে পারে—তার মনে কোন পাপ নেই। তুমি ঘরে চলো।

হরিমাধব অস্ফুট স্বরে বলে—হরি ওম্ তৎ সৎ, চলো।

তবে কথার খেলাপ হলে এবার হিমালয়ে চলে যাবো।

কমল বলে, দিদি তুমি বাড়িতে যাও। আমি হরিদার দাড়িফাড়ি কাটিয়ে ধোপ দুরস্ত করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

যদি না যায়! হরিপ্রিয়া বলে।

কমল বলে—আমি তো আছি, ওকে নিয়েই বাড়ি ফিরবো। ভয় নেই।

পাড়ার সকলে জানে হবিমাধব কেদারবদরী থেকে ফিরেছে। বাডিতে আজ আনন্দেব পরিবেশ। সন্ধ্যায় কমল আজ বিলাতী মদ নিয়ে এসেছে। হরিমাধব কাটলেট খাচ্ছে। কমল বলে—কেমন বুঝছো হরিদা।

হরিমাধব বলে—অল কোয়ায়েট ইন দি হোম ফ্রন্ট। তোমার দিদি এখন একেবারে অন্য মানুষ হে। আর কোন কথা নেই। বেশ শান্তিতে কাজটা হয়েছে—ঘরেও শান্তি নেমেছে।

কমল বলে—তাহলে আমার এলেম আছে বলো। হরিমাধব আজ কমলের কেরামতিকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভালবাসার জাগরণ

সুব্রত সেনগুপ্ত

অফিস থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম, আজ কপালে দুঃখ আছে। কত দিন ট্রাম-বাসের জন্য আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আজ স্টপেজে পৌঁছতেই একটা স্পেশ্যাল বাস এবং আশ্চর্য পেছনের দিকে একটা বসার জায়গাও আছে। দু-জনের একটা সিট এক মহিলা দখল করে আছেন। আমাকে দেখেও তিনি সরে বসতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। ফলে তার কাঁধে কাঁধ চেপেই বসতে হল, আমি কি করতে পারি। ট্রামে-বাসে মেয়েরা খুব সহজেই কোন ছেলেকে বলতে পারে, একটু সরুন তো। কিন্তু কোন মেয়ে একবারে গাঁ ঘেঁষে দাঁড়ালেও তাকে বলা মুশকিল, আঃ ঠিক করে দাঁড়ান না। পাশের স্লিভলেস-মহিলার খোলা ও পুষ্ট বাহুর চাপ আমার শরীরে লাগছে। উনি ইচ্ছে করলেই এতটা স্পর্শ এড়িয়ে সরে বসতে পারেন। কিন্তু উনি তা করছেন না। উল্টে মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয়, আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। কি দিনকালই পড়েছে।

বাস তো চলছেই। কি হল আজ। রাস্তায় মিছিল নেই। অন্য কোন কারণেও জ্যাম নেই। আজ আমার দুর্ভাগ্য কেউ ঠেকাতে পারবে না। বাস একেবারে উড়ে চলেছে। ওভারটেকের পর ওভারটেক। তেমনি ড্রাইভারের হাতেও পড়েছি। এ কারও পেছনে যেতে রাজি নয়। যতই বিপজ্জনক হোক। সবার আগে যাবে। রাস্তার ট্রাফিক পুলিস তো ওকে থামিয়ে একটু বকুনি দিতে পারে? বাসের যাত্রীরাও খেপে উঠে বলতে পারে, এত তাড়াতাড়ি চালাতে হবে না। অ্যাকসিডেন্ট হলে তখন কে দেখবে?

অফিস থেকে বেরুনোর সময় কি অফিসে যাওয়ার সময় আমাকে মোটামুটি দেড়ঘণ্টা হাতে নিয়ে বেরতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ দিন দেড় ঘণ্টায় কুলোয় না। দেরি হওয়ার হাজার কারণ আছে। বেশি দেরি হলে অশান্তি। কিন্তু আজ যে এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে যাচ্ছে তার ফলাফল ভেবে আমি মোটেই আনন্দ পাচ্ছি না।

কথা আছে, আমি আর বনমালা অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরব। কোথাও আড্ডা না, মজা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়া নয়, এবং—দুজনের মধ্যে যে আগে ফিরবে, তার দায়িত্ব স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দেওয়া। খাবার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। পরে যে আসবে সে পায়ের ওপর পা তুলে চা-খাবার খাবে। অবশ্য কাপ-প্লেট দুজনকেই ধুয়ে মুছে রাখতে হবে। এত তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। আজ আর নিস্তার নেই।

বাস থেকে নেমে ঘড়ি দেখলাম। মাত্র পৌনে ছ'টা। বনমালা ছ-টার আগে কিছুতেই আসবে না। অগত্যা মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে বসতে হয়। কয়েকদিন আগেই বনমালা একেবারে চমৎকার চা কিনে এনেছে। যেমন ফ্লেভার, তেমনি লিকার। এখন পয়সা খরচ করে এই বাজে চা খেতে হবে। তাও খালি পেটে। কিন্তু করারই বা কি আছে। বনমালার আগে আজ আমি কিছুতেই বাড়ি ঢুকছি না।

সকালের কাগজটা কে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে রেখেছে। বহু হাত ঘুরে ঘুরে খবরগুলোর ধারও যেন কমে গেছে। খবর ছেড়ে আমি বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাই। অবশ্যই কাগজ দেখার

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকেও নজর রাখতে হয়। এখানে ছোট ছোট হরফে একজন আর একজনের কাছে বাড়ি ফিরে আসার আকুল আহ্বান জানিয়েছে। কলকাতায় সিনেমা, যাত্রা, নাটক, মুকাভিনয়, ম্যাজিক—কত কিছু হচ্ছে। কত কাল কিছুই দেখিনি। এবার একটা বিজ্ঞাপনে আমার চোখ থেমে পড়ে। ক্রেশের বিজ্ঞাপন। একেবারে দুধের বাচ্চা থেকে শুরু করে আর একটু বড়সড় বাচ্চা খুব যত্ন করে রাখা হয়। আজই নয় কিন্তু শিগ্গির আমাদেরও এরকম একটা জায়গা দরকার হবে। বন্ধু অরুণ গাঙ্গুলী অবশ্য গড়িয়াহাটার কাছে এরকম একটা জায়গার খোঁজ দিয়েছিল। এটাই বা কিরকম! আচ্ছা, বাচ্চা হওয়ার আগেই কেউ এসব খোঁজ নেয়? হঠাৎ আমার দুই চোখ খবরের কাগজ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হেলতে দুলতে আসছেন শ্রীমতী বনমালা। একবার দেখেই খবরের কাগজে মুখ ঢাকি। ও কিছুটা এগিয়ে যাক তারপর বেরুবো।

দোকান থেকে বেরিয়ে দু-পাশে তাকালাম। বনমালাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে হুট করে বাড়ির দরজায় উপস্থিত হলে চলবে না। একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়াই। বনমালাও কিছু সরলা অবলা নয়। কে জানে আমার বউও হয়তো কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর আমার সন্দেহ হল, সত্যি এমন তো হতে পারে, আমি একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে লুকিয়ে আছি, বনমালাও আর একটার পেছনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, ও আসুক দরজা খুলুক তারপর যেই চা-টা তৈরি হয়ে যাবে হঠাৎ বাড়ি ঢুকব? তাহলে তো হয়ে গেছে। দুজনই দুজনের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করব? চাকরি করা বউ নিয়ে হয়েছে ভারি ঝামেলা। কি বলে, সমান দায়—সমান অধিকার ধ্যাৎ।

নিজের বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। বনমালার চাপা গলার গান ভেসে আসছে। ইস কী অসভ্যর মতন লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দী সিনেমার গান গাইছে, রাস্তা হো হো—তুম নাচ-ও। পা টিপে টিপে ঘুরে ঢুকলাম। চায়ের জল বসান হয়ে গেছে। মাই ডিয়ার বনমালা ম্যাক্সি পরে সেকা পাউরুটিতে জেলি মাখাচ্ছে। আমার দিকে না তাকিয়েই আমার হৃৎপিণ্ডেশ্বরী—না, হৃদয়েশ্বরী বলে উঠলেন, ওমা, তুমি এসে গেছ। আমি ভাবলাম, তোমার দেরী হবে।

•

যাক তা হলে ধরা পড়িনি। ধরা না পড়ায় বড় আনন্দ হল। আনন্দ প্রকাশ করতে আমি ওর ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে আদর করে নিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার দ্বিতীয় আমি আমাকে সতর্ক করে দিল, বেশি আহ্লাদ প্রকাশ করো না—তাতে বনমালার সন্দেহ হবে। বনমালা আঙ্গুলে লেগে থাকা জেলি চেটে খেয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ শুনলাম, এসপ্ল্যানেডের দিকে রাস্তা জ্যাম। তুমি জ্যামে পড়নি?

বললাম, জ্যামের কি সাধ্য আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখবে—বলেই মনে মনে জিব কাটলাম, আবার বাচালতা?—এবং সর্বনাশ, আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তুমি দেখছি, আজ খুব মুডে আছ!—খেয়েছ। এবার উত্তর দাও। মুখ ফসকে বেরল, এই যে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছ। আমার জন্য—চোপ, মনে মনে নিজেকে শাসন করলাম, চোপ। কিন্তু বনমালা চটল না। বলল, আমারও তো তাই ইচ্ছে করে গো। বেশ মা-জেঠিদের কালের মতো বিকেলে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, সেজেগুজে

জানালার সামনে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। সে তো এখনকার বাজারে হবেই না। চাকরি তো করতেই হবে। অফিস থেকে যে একটু আগে বেরবো তো শালা এমন এক বস জুটেছে—

আমি বাধা দিয়ে বলি, এই খবরদার মেয়েদের মুখে শালা আব সিগারেট আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

বনমালা জিব কেটে বলে, ভুল হযে গেছে। যাও তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুযে এস। হঠাৎ আমার বিবেক চোখ রাঙিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা এত ভাল—আমার জন্য এত ভাবে আর আমি ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি? ছিঃ। এখান থেকে বেরিয়ে ওকে খুব ভাল ভাল কথা বলতে হবে। কিন্তু আমি বেরুনোর আগেই বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বনমালা বলল, জান, বাবা রুবির বিয়েতে দশ ভরি সোনা দিতে রাজি হয়েছে।

জল ঢালতে ঢালতে আমি বললাম, তাই নাকি?—কিন্তু মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এতে আমার ভূমিকাটা কি? কান খাড়া রাখতে হল। বড় জামাই হিসেবে এ ব্যাপারে আমার ঘাড়ে কোন দায় চাপলে তো সর্বনাশ। একে তো মাসে মাসে টি ভি-র ইনস্টলমেন্ট। তার ওপর বনমালার জন্য ডাক্তার আর ওষুধের নিয়মিত খরচ, এ ছাড়া নার্সিং হোমের কথা ভেবে মাসে মাসে কিছু টাকা জমিয়ে রাখা। বনমালা বলল, এর ওপর ছেলের বাবা আবার নগদ টাকা চেয়েছে, ভাবতে পার?

কিন্তু আমাকে ভাববার সময় না দিয়েই বনমালা বলে, একটা লেখাপড়া জানা ছেলে কি করে পণ চায়?

নিজেকে বেশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জীব মনে হয়। শ্বশুরমশাই আমাকে মানে আমার বউ বা তাঁর বড় মেয়েকে সোনাদানা প্রায় কিছুই দেন নি। নগদ টাকার প্রশ্নও ওঠেনি। বনমালার চোখে এতে আমার মর্যাদা বাড়ারই সম্ভাবনা। আমি আন্ডারওয়্যার মাত্র সম্বল করে দ্রুত বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি। বনমালা তখনও বলছে, বাবা এখন এত টাকাই বা কোথায় পাচ্ছেন কে জানে। আর আমার সময় তো—

বলতে বলতে দু ফোঁটা চোখের জল বনমালার ফুলে ওঠা নাকের পাটার দিকে নামতে থাকে। অসময়ে অশ্রুপাতের কারণ বুঝে উঠতে আমার একটু সময় লাগে। তারপর মনে পড়ে, কে যেন বলেছিল, মেয়েদের আর এক নাম, ঈর্ষা। বাবা-মা-বোন-স্বামী কারও ক্ষেত্রেই ছাড় নেই। এ ব্যাপারে মেয়েরা আয়কর বিভাগের ওপব এক কাঠি। কোন রকম রেহাই নেই।

আজ চাযেব স্বাদ বড় ভাল লাগে। পাঁউরুটিতে মাখন জেলি অন্য দিনেব চাইতে বেশি মিষ্টি মনে হয়। সুখী গৃহ কোণে টি ভি চলতে থাকে। তাবপর পর্দার ছবি এক সময ছোট থেকে আরও ছোট হতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায—লোড শেডিং।

যথারীতি আমরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিযে দু-চারটে কথা বলি। অন্ধকারেই বনমালার মাথায হাত বুলিযে দিতে দিতে জিজ্ঞেস কবি, সে আজ সব ওষুধ ঠিক মতো খেয়েছে কি না? বনমালা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের চাইতে নিজেব খেযাল খুশি মতো ওষুধ

খেতে ভালবাসে। ফলে টনিকটা দু-বারের বদলে একবার খেয়েছে। এরকম ও প্রায়ই করে। আমিও জেনে গিয়েছি, ভাল কথায় বা রাগারাগি করে কোন লাভ নেই।

ঘবের মধ্যে তবল অন্ধকার। এই সময় কে কড়া নাড়ছে। বনমালা উঠে গিয়ে দরজা খোলে। কার সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলে। তারপর দরজা বন্ধ করে টেবিলেব ওপব কি একটা রেখে এসে আগেব জায়গায় বসে। রাস্তার আলো ঘবের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। কে গো?—বনমালা জানাল, পাশের বাড়ির মহিলা কিছুটা পায়েস দিয়ে গেলেন। বনমালার ভেতর আর একটি প্রাণের আবির্ভাবেব পর থেকেই ভদ্রমহিলা মাঝে মধ্যে এটা-ওটা দিয়ে যান। আমি জানি, সন্তান ধারণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। তা নিয়ে কাব্য করাব কোন মানে হয় না। তবু ঘরের আবছা আলো-অন্ধকারে বনমালা যেন বিরাট হয়ে ওঠে। বনমালার ঈর্ষা, বনমালার কোমলতা, স্বার্থপরতা আর উদাবতা সব কিছুতে ঘর ভরে যায়। এব ওপব তার মধ্যে চলছে সৃষ্টিব কাজ। বনমালা আমার এত কাছে আছে, তার সব কিছুই আমার জানার কথা কিন্তু আমি সব জানি না। যেমন জানি না, তার মধ্যে যে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার ভেতর বনমালার নীচতা ও উদারতা কতটা সঞ্চারিত হচ্ছে।

বনমালা হঠাৎ হাই তুলে বলে, বসে সময় নষ্ট করব না গো। লণ্ঠনটা জ্বালবে, খেয়ে শুয়ে পড়ব। কাল আবাব মুক্তোর মা আসবে না। থালাবাসন সব মাজতে হবে। আর কাল তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। চায়ের দোকানে যেন লুকিয়ে থেক না আবার।

বনমালা হাসে। কিন্তু আমার বুক কেঁপে ওঠে। ও আজ অফিস থেকে ফেরার সময আমায় খবরের কাগজে ঢাকা অবস্থায দেখতে পেয়েছে। আমার ইচ্ছে করে দেরিতে বাড়ি ঢোকার কথা জানতে পেরেও এতক্ষণ চুপ করে ছিল! কিন্তু বনমালার কাছ থেকে আমাকে আড়াল করার মতো কিছুই এখন হাতের কাছে নেই। ঘরের অন্ধকারও যথেষ্ট নয়।

বনমালা আবার বলল, আমি সব দেখেছি তবু তোমাকে বলতে কেমন মায়া হল। অন্ধকারেও বিশ্রী মুখটার বিভিন্ন রেখা, চোখের কপাট দৃষ্টি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আবার বনমালা বলল, জান আমাদের ডিপার্টমেন্টের মণিকাদি আজ বলছিল, ভাল কিছুর জন্য ভাল পরিবেশ দরকার। শুধু শরীব নয়, মনেও একটা ভাল ভাব রাখতে হয়। মন ভাল, ভালবাসা চাই।

কিন্তু ভাল ভাব তো নিউ মার্কেট বা শেয়ালদাব চোরা বাজারে কিনতে পাওযা যায না। ভেতবের ও বাইরের যে পরিবেশ দূষণ থেকে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি না এক অনাগতব জন্য সেই পরিবেশ দূষণ মুক্ত কবাব দায়িত্ব নেব? নিজের অজান্তে আমাব আধ বোজা গলা থেকে বেরিয়ে এল, কি হবে?

বনমালা উঠে এসে যেন স্নেহের সঙ্গে তার কোমল বুকে আমার মাথাটা চেপে ধরে। একটা অদ্ভুত কথা আমার মনে হয়। বনমালাব শরীব থেকে আমিই যেন নতুন করে জন্ম নিতে চাইছি। কিন্তু কোন যাদুতে এই ঘরে ভাল পরিবেশের নম্র আলো ফুটে উঠবে,, আমি জানি না। গাঢ় স্বরে বনমালা ডাকে, ওঠ।—কিন্তু আমি একই ভাবে বসে থাকি। যেন চোখ খুলতেও সাহস পাই না।

বাকি জীবনও সুখের

শেখর বসু

পার্থসারথি আর মন্দিরার বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওদের বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন এসেছিল। ভালমন্দ খাওয়াদাওয়া হল, গল্প হল, গান হল। আর, মজার গলায় একটা কথা ফিরে এসেছিল বারবার : বিয়ের গোল্ডেন জুবিলিতে যেন আরও ঘটা করা হয়।

উত্তরে পার্থসারথি আর মন্দিরা সামান্য লাজুক মুখে একটা কথাই ধরতে গেলে প্রতিবার বলেছে : পাগল! অদ্দিন টিকবই না!

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এই ধরনের কথার জবাবে মুখে মুখে অঙ্ক কষতে বসে যায়। এখানেও তাই হল শেষে। একজন বলল, "কেন টিকবে না? সুবর্ণজয়ন্তিতে পার্থর বয়েস হবে আশি আর মন্দিরার ছিয়াত্তর। এটা কোনও বয়েসই নয়। আশি বছর বয়সে অনেক সাহেব নতুন করে বিয়ে করে।"

পার্থসারথি মুখে ছদ্মগাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, "অদ্দিন পর্যন্ত টিকে থাকলে আমিও আবার বিয়ে করব।"

জবাবে হাসতে হাসতে মন্দিরা জানাল, "করো না, এখনই করো, কে বারণ করছে তোমাকে?"

বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনরা প্রায় সমবয়সী, সুতরাং, ঠাট্টা-ইয়ার্কিগুলো মাঝেমাঝেই বিপজ্জনকভাবে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে, যার অর্থ হলঃ ভাত হজম হলে আর স্ত্রী বৃদ্ধা হলেই লোকে প্রশংসা করে। তা, আজকেব এই আসরের অধিকাংশ স্ত্রীই বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ়া, আর সরু চালের ভাত গল্পগুজবে, হাসিঠাট্টায় হজম হওয়ার মুখে। এই অবস্থায় মাঝেমধ্যে পারস্পরিক প্রশংসা বিনিময়ের সঙ্গে একটু-আধটু আদিরস কারুরই তেমন খারাপ লাগছিল না।

পার্থসারথি আর মন্দিরার একমাত্র সন্তান শুভ্র ওড়িশাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল ইযারের ছাত্র। মা'র খুব ইচ্ছে ছিল ছেলেকে এই উপলক্ষে বাড়িতে নিয়ে আসে একবার, কিন্তু ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে বাবা রাজি হয়নি।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিরাও বিদায় নিচ্ছিল এক-এক করে। অতিথিব শেষ ঝাঁক সওয়া এগারোটার সময় চলে যেতেই বাড়িটা হঠাৎ ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে গেল।

মন্দিরা আজ একেবারেই সাজতে চাযনি, কিন্তু কয়েকজন নাছোড় অতিথির পাল্লায় পড়ে সাজতে হয়েছে। পার্থসাবথিও রেহাই পাযনি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হয়েছে ঘরোয়া পোশাক পালটে।

সব অতিথিই প্রচুর ফুল নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, সেইসব ফুলের ছোট্ট একটা পাহাড় এখন ঘরের মধ্যে। ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ফাঁকা ফ্ল্যাটের সব জায়গায়।

ফুলগুলোর ওপর এই প্রথম আলাদা করে চোখ পড়ল পার্থসারথিব, ফুলের ঝিমঝিম-করা গন্ধ এই প্রথম বোধহয় ওর নাকে ঢুকল আলাদা করে। ঝলমলে পোশাক-পরা মন্দিরার দিকে একটু আলাদা চোখে তাকিয়ে পার্থসারথি বলল, "একসঙ্গে একটানা পঁচিশ বছর! মনে হচ্ছে এই তো সেদিন তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে এলাম, না?"

জবাবে মন্দিবা বলল, "অনেকটা মাংস বেঁচে গেছে, ফ্রিজে তুলতে হবে, ধরবে একটু?

শুধু মাংসই নয়, বেঁচে-যাওয়া সব খাবার-দাবার এক-এক কবে ফ্রিজে ঢোকাল মন্দিরা। ফ্রিজেব তিনটে মাত্র তাকে এত খাবাব কায়দা কবে ঢোকানো সহজ কাজ নয়। মন্দিবা যতক্ষণ কসবত কবল ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিজেব দবজা ধবে দাঁড়িয়ে থাকল পার্থসাবথি। ভবা পেটে তালগোল-পাকানো খাবাব-দাবারেব গন্ধ ওব একেবাবেই সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু কিছু করাব উপায় নেই। আজ সন্ধেতেই অন্তত বাবদশেক 'সহধর্মিণী' শব্দটা ওব কানে এসেছে।

মন্দিবা ফ্রিজ গোছাবার পরে ছুটে এল পার্থসাবথি। দ্বিতীয় দফা দাযিত্ব কাঁধে চাপাব আগে ও লম্বা পাযে চলে এল শোবাব ঘবে। ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি পবে একটা সিগারেট ধরাতেই আগেব সেই সহজ-স্বাভাবিক ভাবটা ফিবে এল আবাব। বড় মাপের বেতের চেয়াবটায় বেশ ছড়িয়েছিটিযে বসল পার্থসারথি, সিগারেটেব গন্ধ আর ফুলেব গন্ধে ধাক্কা লাগছিল বারবার। কিন্তু রাতেব এই ফুবফুবে হাওয়ায় রজনীগন্ধা আব গোলাপকে থামিযে রাখা অসম্ভব।

মিনিট-পনেরো পবে ঘবে ঢুকল মন্দিবা, ঢুকেই বলল, "ওহ্! সারা দিন আজ যা ধকল গেছে না।"

ধকল গেলে লোকে বসে কিংবা শোয়, কিন্তু মন্দিবা সে-সবেব মধ্যে না গিযে ড্রেসিং-টেবিলেব আয়নার সামনে দাঁড়িযে ঘুরিযে-ফিরিযে দেখতে লাগল নিজেকে। পার্থসাবথি যেখানে বসেছে সেখান থেকে এই মুহূর্তে দুজন মন্দিরাকে দেখা যাচ্ছে। একজন আযনায, আর একজন আয়নার বাইরে।

সেদিকে তাকিয়ে পার্থসারথি হাসতে হাসতে বলল, "এইবকম একটু সেজেগুজে থাকলে পাবো, সাজলে তো মন্দ দেখায় না।"

আয়নাব ভেতব আর বাইবে থেকে জবাব এল একসঙ্গে —"যখন সাজাব বযেস ছিল তখনই সাজলাম না, আর এখন এই বুড়ো বযসে—।"

"বুড়ো কোথায়, তোমাব তো মাত্র একান্ন।"

"তুমি সব সময আমার বয়েস এক বছর বাডিযে দাও কেন বলো তো?"

"কোথায বাড়ালাম। তোমাব একান্ন আব আমাব পঞ্চান্ন, চাব বছবের ডিফারেন্স না?"

"জানি না।"

আযনার কাছ থেকে সরে এসে শাড়ি পালটে নিল মন্দিবা।

পার্থসাবথিব হাতের সিগাবেট শেষ। ফুলের গন্ধ এখন বেশ জাঁকিযে বসেছে ঘবেব মধ্যে। বাত প্রায় বাবোটা বাজে, আশেপাশেব এলাকা আশ্চর্য বকমেব শান্ত। কী যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় পার্থসাবথি সামান্য চঞ্চল হযে বলল, "স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্ক দীর্ঘকাল সুন্দর রাখার আসল বহস্যটা কী জানো?"

রহস্য জানাব বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে মন্দিবা দ্রুত হাতে বেডশিটের ঢেউগুলো সমান কবাব কাজে লেগে গেল। পার্থসারথি ছিটকে উঠে বাইরের র‍্যাক থেকে চকচকে মলাটেব একটা ইংরেজি পেপারব্যাক বার করে বলল, "এ বইটা দেখেছ?"

মন্দিরা এক মুহূর্তে বইয়ের দিকে তাকিয়ে পাউডারের লম্বা কৌটোটা টেনে নিল হাতের মধ্যে।

পার্থসারথি মহামূল্যবান কিছু-একটা আবিষ্কার করার গলায় বলে উঠল, "এটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন সাইকোথেরাপিস্ট ডক্টর স্মিথের 'সেক্স ডেট্স'। একটা কাগজে রিভিউ পড়ে বইটা কিনেছি—আজকেই। অনেকটা পড়েও ফেলেছি, দারুণ বই।"

মন্দিরা পিঠে-বুকে খানিকটা পাউডার ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে।

যে-কোনও শ্রোতার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার ঢঙে পার্থসারথি বলল, 'কয়েকটা কেস-হিসট্রি যা দিয়েছে না—দুর্ধর্ষ, শুনবে?"

জবাবে মন্দিরা লম্বা একটা হাই তুলল।

পার্থসারথি মুখ খুলল আবার—"দাম্পত্যজীবন বুড়ো বয়স পর্যন্ত সুখে রাখার পেছনে আছে সেক্স।"

অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম কথা বলল মন্দিরা, "আমার অসম্ভব ঘুম পেয়ে গেছে।"

"ন্‌না, সেক্স মানে মার্কামারা সেক্স নয়, এর মধ্যে বেশ একটা মজা আছে।"

মজার ঘটনা শুনতে চাওয়ার কোনোরকম চিহ্ন ফুটে উঠল না মন্দিরার চোখেমুখে। কিন্তু বেশ জমিয়ে গল্প বলার ভঙ্গিতে কথা শুরু করল পার্থসারথি। "এক বুড়ি ঠাকুমা ডক্টর স্মিথকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, ডাক্তারের থেরাপিতে উনি খুব ভাল ফল পেয়েছেন। ওঁর ম্যারেজ লাভমেকিংয়ের বয়েস কত বছর জানো? ফিফ্‌টি-প্লাস। চিঠির শেষে ঠাকুমা লিখেছেন, শি ইজ স্টিল অ্যাট ইট। বাব্বা। থুত্থুড়ে বুড়ো-বুড়ির এনার্জি আছে বটে।"

মন্দিরার খোলা চোখ এখন বন্ধ। তবে চোখ বন্ধ হলেই কান বন্ধ হয় না। পার্থসারথি নতুন আগ্রহে কথা শুরু করল আবার—"ডক্টর স্মিথের থেরাপি মানে ওষুধপত্তর নয়, এক্সারসাইজও নয়; যে কেউ এটা প্র্যাকটিস করতে পাবে। করলে সুফল পাওয়া যাবে, কারণ ব্যাপারটা তো সায়েন্টিফিক। দাম্পত্যজীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু কী বলো তো?"

কান খোলা, চোখ বন্ধ মন্দিরার দিক থেকে কোনও উত্তর ভেসে এল না।

তবে এ-প্রশ্নটা সত্যি-সত্যি উত্তর পাওয়ার জন্যে নয়। আবার মুখ খুলল পার্থসারথি। "দাম্পত্যজীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হল একঘেয়েমি। জীবনে একঘেয়েমি এলে কিছুই তখন আর ভাল লাগে না, এমনকি সেক্সটাও তখন ডাল্ হয়ে যায়। ডক্টর স্মিথ বোধহয় একটু নীতিবাগীশ গোছের। একঘেয়েমি কাটাবার সহজ রাস্তাটা ধরার কথা উনি একবারও বলেননি। সহজ রাস্তা মানে একটা ছেলে ছেড়ে আর একটা ছেলে ধরা, কিংবা একটা মেয়ে ছেড়ে আর একটা মেয়ে। বরং ধমকে দিয়ে বলেছেন, তাতে একঘেয়েমি কাটার বদলে বেড়ে যেতে পারে আরও। বলেছেন, সত্যিকারের ভাল একটা দাম্পত্যজীবনের পেছনে থাকে ভালবাসা, বিশ্বাস, আনুগত্য—এইসব। তবে এ-সব থাকলেও একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। একঘেয়েমি হচ্ছে দুধের মধ্যে একফোঁটা চোনার মতো, পুরোটাই বারোটা বাজিয়ে দেয়। এই একঘেয়েমি কাটাব উপায়টা কী?"

এবারের প্রশ্নটা সত্যিই প্রশ্ন, কিন্তু মন্দিরার তরফ থেকে কোনও উত্তর এল না।

"ঘুমোলে নাকি?"

প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল মন্দিরা।

আওয়াজটা জেগে-থাকা প্রমাণ করে না, তবে অজানা তথ্য জানাবার ঝোঁকে আবার

কথা শুরু করল পার্থসারথি। "একঘেয়েমি কাটাবার একমাত্র উপায় হল সেক্সলাইফের জায়গা বদল করা। পাত্র-পাত্রী একই থাকল, শুধু বদলে গেল জায়গাটা। পরিবেশের মস্ত একটা প্রভাব আছে মানুষের ওপর। ওই বুড়ি ঠাকুমা ডক্টর স্মিথকে জানিয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শমতো দুই বুড়ো-বুড়ি নানা জায়গায় সেক্স ডেট করে বেড়ায়। কখনও ট্রেনের কুপেতে, কখনও জাহাজের কেবিনে, কখনও অচেনা হোটেলের ঘরে। এর ফল নাকি দারুণ। মনেব আনন্দে একঘেয়েমিহীন দাম্পত্যজীবন কাটিযে যাচ্ছে বুড়োবুড়ি। চলো আমরা দিন দুয়েকের জন্যে কোথাও গিয়ে থেকে আসি। যাবে?"

এবার আগের ওই অস্ফুট আওয়াজটাও ভেসে এল না মন্দিবার দিক থেকে।

ডক্টর স্মিথের চমকপ্রদ তথ্যে ঠাসা বইটা এলোমেলোভাবে কিছুক্ষণ পড়ার পরে উঠে পড়ল পার্থসারথি। ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে। দরজা বন্ধ কবে আলো নিবিযে শুয়ে পড়ল ও, আর তারপরেই মনে হল—এই রে। ওটা দেখা হয়নি তো!

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ শুয়ে থাকার পরে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল পার্থসারথি। ঘরের অল্প পাওয়ারের নীল আলোটা জ্বালল। গাঢ় নিশ্বাস পড়ছে মন্দিরার, তাব মানে নিশ্চয়ই ও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে খুব ভাল করে খাটের তলাটা দেখে নিল পার্থসাবথি, তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

হালে এই বাতিকটা হয়েছে ওর, কিন্তু মন্দিরা জানে না। জানতে সঙ্কোচ বোধ কবে। আসলে, দিনকাল তো খারাপ। চুরি-ডাকাতি যা বাড়ছে। একটু সাবধান হওয়া দোষের নয়। দুজনমাত্র থাকে এ-বাড়িতে। চোখ এড়িয়ে যে-কেউ এসে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকতে পাবে। তারপর খাটের ওপরের দুজন ঘুমিয়ে পড়লে চুরি করে পালাতে কতক্ষণ।

এই তো সেদিন অফিসে ঠিক এই ধরনের একটা ঘটনা শুনেছিল। কিন্তু মন্দিরা ব্যাপারটাকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি। হাসতে-হাসতে বলেছিল, যাদেব ঘরে অনেককিছু আছে তাদের খাটের তলায় চোরদের বসে থাকা মানায়। আমাদেব খাটের তলায় ঢুকতে চোরের ভারী দায় পড়েছে।

কথাটা পার্থসারথির একেবারেই ভাল লাগেনি। কথায বলে, সাবধানেব মাব নেই। চোখকান একটু খুলে চলাটা তো দোষের নয়। সেই থেকে ও রাত্তিরে ঘুমোবাব আগে খাটের তলাটা দেখে নেয় একবার।

আজ সন্ধেয় বয়েস নিয়ে কথা উঠেছে অনেকবার। তখন কিছুই মনে হয়নি, কিন্তু এই মুহূর্তে পার্থসারথির হঠাৎ একটা খটকা লেগে গেল। খাটের তলায় এ-ভাবে উঁকি মারাটা কি বার্ধক্যের লক্ষণ?

খটকাটার সামনে রুখে দাঁড়াল পার্থ। ন্‌না, এ হতেই পাবে না। আসলে জীবনে নির্ঘাত একঘেয়েমি বেড়ে উঠেছে। তবে ঘাবড়াবাব কিছু নেই, সঙ্গে আছে ডক্টব স্মিথ। একঘেয়েমি কাটাব অর্থই হল যৌবন আবার পুরোদমে ফিরে পাওয়া।

দুই

পরদিন সকাল হতে না হতেই কর্মব্যস্ত দিন শুরু হয়ে গেল পার্থসারথির। সেই ব্যস্ততা শেষ হল সন্ধেয় অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পরে। ফিবে এসে প্রতিদিন ও এককাপ লেবু-চা আর একটা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট খায়। সেই সঙ্গে চলে সকালের বাসি কাগজ

খুঁটিয়ে পড়া। রাত্তিরে এইভাবে কাগজ পড়ার অভ্যেসটা আগে ছিল না, ইদানীং হয়েছে। আজ কিছুক্ষণ কাগজ পড়ার পরে আর একটা খটকা তৈরি হল ওর মধ্যে। রাতে এ-ভাবে সকালের কাগজ পড়া তো বুড়োদের একচেটিয়া ব্যাপার!

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পার্থসারথি সন্ধ্যেবেলায় ইংরেজি সাপ্তাহিক পড়ত। কিন্তু আজকাল দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় পত্রিকা কেনা ছেড়ে দিয়েছে। তবে পত্রিকার বিকল্প সকালের বাসি কাগজ হওয়া উচিত নয় কখনও। কাগজটা ফেলে দিয়ে টি ভি খুলে দিল পার্থসারথি। হিন্দি সিনেমার একটা গান চলছে এখন। অদ্ভুত পোশাকেব নায়ক-নায়িকা নেচে, ডিগবাজি খেয়ে, গাছে উঠে গান গাইছে। অসহ্য! এ দেখা যায় না। কিন্তু পার্থ দেখতে লাগল। আসলে ডক্টর স্মিথের একটা উপদেশ এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেছে ওর।

স্মিথসাহেব বলেছেন, মন সবসময় খোলা রাখা উচিত। দিনকাল পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে রুচিও পালটায়। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। মন খোলা রাখলে কিছুই তখন আর মনের ওপর চাপ ফেলতে পারে না। আর মনেব ওপর চাপ না পড়ার অর্থই হল অনন্ত যৌবন।

যৌবনকে বরাবরেব জন্যে ধবে রাখার গোপন বাসনাতেই বিদঘুটে নাচগান মুখ বুজে দেখে যেতে লাগল পার্থসারথি। মন্দিরা রান্নাঘরে ছিল, ওখান থেকে এখানে এসে হাসতে হাসতে বলল, "ওমা। এ-সব কি দেখছ তুমি?"

পার্থসারথি যুবকদের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "কেন কী হযেছে!"

"তুমি তো নিউজ ছাড়া আর কিছুই দেখ না।"

"এবার থেকে দেখব।"

"দেখ।"

নাচগান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে নিউজ শুরু হল, আর ওটা শুরু হতেই বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল পার্থ। দার্জিলিং আর পাঞ্জাবের ভায়োলেন্সের স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ওর মধ্যে—"ইশ্। কোন্‌দিকে যাচ্ছে দেশটা!"

নিউজ শেষ হওয়ার পরেই খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে 'টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিজ'-এর ওপর লেখা সম্পাদকীয়টা পড়ে ফেলল। এবারও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ওর মধ্যে—"শুধু গরম-গরম কথা লিখলেই তো আর সমস্যা দূর হয় না। আসলে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভাল লিডারশিপ, কিন্তু তেমন লিডাবশিপ কোথায়!"

রাত্রে খাওয়ার টেবিলেও ওই প্রতিক্রিয়াব জের টানল পার্থসারথি। কিন্তু একতরফাই বকে যেতে হল ওকে, কেননা পৃথিবীর কোনও গৃহবধূই বোধহয় সম্পাদকীয় নিয়ে কচকচানির মধ্যে নাক গলায় না।

খাওয়ার পরে শোবার ঘর। শোবার ঘরের দৃশ্যটা হঠাৎই কেমন যেন বৈচিত্রহীন ঠেকল পার্থসারথির। মন্দিরা ঘরের মধ্যে অকারণে বারতিনেক পাক খাওয়ার পর পাউডারের লম্বা কৌটোটা তুলে নিল। এমন সময় ডক্টর স্মিথ ছায়াশরীরে এসে জীবনকে রঙে-রসে রঙিন করে তোলার জন্যে উশ্‌কে দিলেন পার্থসারথিকে। পার্থ অমনি বলে বসল, "এই, আজকে বসার ঘরে শোবে?"

শুনে খুব অবাক হয়ে গেল মন্দিরা। "বসাব ঘবে! কেন?"

"কেন আবার, এমনি। রোজ-রোজ সেই এক শোবার ঘর, এক শোবার খাট— ভাল লাগে!"

মন্দিরার অবাক ভাবটা আরও বেড়ে গেছে। আর, এতখানি অবাক হলে কারও মুখেই বোধহয় কথা সরে না চট করে।

পার্থসারথি হাসতে-হাসতে বলল, "ডক্টর স্মিথের যে-কথাগুলো কাল বলেছিলাম সেগুলো কানে ঢুকেছিল, নাকি তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"স্মিথ কি বসার ঘরে গিয়ে শুতে লিখেছে?"

"নানা তা নয়, আসলে জীবন থেকে একঘেয়েমি দূর করতে গেলে মাঝেমধ্যে শোবার জায়গা পালটানো দরকার।"

"তুমি শোও না গিয়ে।"

"আরে! আমার একা শুয়ে কী লাভ। তুমি আসল ব্যাপারটাই ধরতে পারছ না।"

ছোট্ট একটা হাই হঠাৎ বড় হয়ে গেল মন্দিরার মুখে। "আমার আর ধরে কাজ নেই।"

পার্থসারথি উঠে গিয়ে বইয়ের র‍্যাক থেকে স্মিথসাহেবকে নিয়ে এল। তারপর দ্রুত হাতে বইয়ের কিছু পাতা উলটে গিয়ে বলল, "এই দেখ, সাহেব পরিষ্কার লিখেছে, দাম্পত্যজীবনকে সুখী করার জন্যে কিছু অ্যাডভেঞ্চারের দরকার। তার সঙ্গে দরকাব সাম ডিগ্রি অব ফ্যান্টাসি। সাহেব একটা উদাহরণ দিয়েছে। কিছুই না, খুব ছোটখাটো ব্যাপার। বাচ্চারা হয়তো খেলতে গেছে, বাবা-মা হঠাৎ তাদের পড়ার ঘরে গিয়ে বেয়াড়া সময়ে—। শুধু জায়গা বদলই নয়, বেয়াড়া সময়ের ওপর জোর দিয়েছে সাহেব। বেযাড়া একটা সময় বেছে নিলেও কিন্তু বৈচিত্র্য আসে জীবনে—!"

"তোমার আজকাল কী হয়েছে বলো তো। টিভি-তে বিদঘুটে নাচগান দেখচ, আজেবাজে বই পড়ছ।"

"আজেবাজে বই। এই দেখ, বইয়ের প্রথম পাতায় ডক্টর স্মিথের পবিচয় লেখা আছে। পৃথিবীর নামকরা একজন সাইকোথেরাপিস্ট। বইটা চমৎকার। খুব হেল্পফুল। পড়ে দেখ না? দাম্পত্য জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার সব রাস্তা বলে দেওয়া আছে।"

"আমি খুব পুরনো হযে গেছি না?" মন্দিরার গলায খুব সূক্ষ্ম একটা অভিমানের সুর যেন খেলে গেল।

"আরে! এর মধ্যে তুমি আবার আমাকে-তোমাকে জড়াচ্ছ কেন! একটু পুবনো হয়ে গেলে সবার জীবনেই একঘেয়েমি আসে। কোথাও কম, কোথাও বেশি—এই যা তফাৎ।"

"কী আশ্চর্য, এটা তো অন্য ব্যাপার। পৃথিবীব যে-কোনও এলাকাব যে-কোনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই একঘেয়েমি আসতে পারে। তবে হ্যাঁ, সাহেবদের দেশে প্রচুর ডাইভারশান আছে। নানা রাস্তা, নানা উপায়। ওই যে বুড়োবুড়ি ট্রেনে, জাহাজে, হোটেলে ডেট করে বেড়াচ্ছে—আমাদের দেশে কটা বুড়োবুড়ির সেই সঙ্গতি আছে। আমাদের মতো গরিব দেশে ও-সব বিলাসিতা চলে না। তবে এটাও সত্যি, মাথা সামান্য খাটালে একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় অনেকখানি।"

ছোট্ট একটা হাই উঠল মন্দিরার।

পার্থসারথি এখন বক্তৃতার মাঝখানে। ছোট্ট হাইটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে কথা শুরু করল আবার—"একঘেয়েমি কী ভাবে আসে দেখ। ডক্টর স্মিথ চমৎকার বিশ্লেষণ

করেছেন। সাড়ে-নটায় রাতের খাবার খেলে স্বামী-স্ত্রী। দশটা পাঁচের সময় সেই পুরনো ঘরে পুরনো খাটে শোওয়া। পুরনো ভঙ্গিতে ভাব-ভালোবাসা। দশটা তেরোয় ক্লাইম্যাক্স। তারপর একদফা মার্কামারা 'গুড নাইট'! তারও পবে পুবনো ঢঙে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'দরজায় খিল দিয়েছ তো?' ব্যাস!"

হঠাৎই মন্দিরা ঘুমজড়ানো গলায় বলে উঠল, "এই আমাদের সদর-দরজা বন্ধ করা হয়নি বোধহয়!"

কী কথার মধ্যে কী কথা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পার্থসারথি গম্ভীর গলায় বলল, "বাড়ি ঢোকার সময় রোজই তো আমি বন্ধ করে আসি।"

"ননা, তুমি আজ আসাব পরে কাগজওলা এসেছিল। দরজা দিয়েছি কি না মনে পড়ছে না। তুমি একবার দেখ না—প্লিজ্।"

মন্দিরার কথাটা শেষ হওয়ার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল পার্থসারথি, তারপর নিচে গেল। শুধু শুধু যাওয়া, দরজা বন্ধ করাই আছে।

নিচে নামতে আর উঠতে কতক্ষণই বা, কিন্তু ফিরে এসে দেখল, মন্দিরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বেডসাইড টেবিলের ওপর ডক্টর স্মিথ পাখার জোরালো হাওয়ায় ঝিরঝির কবে উড়ছেন।

ফুলদানিতে কালকের কিছু বাসি ফুল। গন্ধও কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। ওই গন্ধ কিছুক্ষণ নাকের মধ্যে টানার পবে পার্থসারথির হঠাৎ মনে হল, জীবন সত্যিই বেশ একঘেয়ে হয়ে গেছে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল ও, আর শোবার পরেই মনে হল, আজকেও কালকের সেই ভুলটা হয়ে গেছে।

একটু বাদে ঘরের ছোট আলোটা জ্বলে উঠল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে মন্দিরা, নিশ্বাসের তালে তালে পিঠটা ওর সামান্য দুলছে। নিচু হয়ে খাটের তলাটা ভাল করে দেখে নিল পার্থসারথি, তারপর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল আবার।

তিন

সকালে শুরু হয়ে গেল আবার একটা কর্মব্যস্ত দিন, তার পরদিনও তাই, তার পরের দিনেও একই রুটিন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এবং অবসরের প্রায় পুরো সময়টা ধরেই পার্থসারথি ভাবল, জীবন বিরক্তিকর রকমেব একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

ডক্টর স্মিথের বইটা ইতিমধ্যে ওর আগাগোড়া পড়া হয়ে গেছে। পড়তে পড়তে আণ্ডারলাইন করেছে। মূল্যবান কথাগুলোর আড়ালে কত রুপোলি আলোব রেখা। বারবার মনে হয়েছে, সাহেবেব কিছু-কিছু পরামর্শ মেনে চললেই ওই আলোব রেখাগুলো ওব জীবনেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু জীবন তো একজনকে নিয়ে নয়। সাহেবেব লাগসই পরামর্শগুলো মন্দিরা একেবারেই পাত্তা দেয় না।

কিন্তু পাত্তা না দিলেও প্রসঙ্গ তোলা যায়। ফাঁক পেলেই সাহেবেব কিছু-কিছু উপদেশ পার্থ শুনিয়ে দেয় মন্দিরাকে।

সেদিন খেতে বসে মন্দিরা বলল, "আজ ছাত থেকে নামার সময় পা-টা বিচ্ছিরিভাবে মচ্‌কে গেছে। আচ্ছা, পায়ের হাড় ভাঙলে পা ফেলা যায় না, না?"

"উহুঁ।"

"সেই স্প্রেটা লাগিয়েছিলাম, ব্যথা কমেছে অনেক তবে এখনও একটু-আধটু খোঁড়াচ্ছি।"

হঠাৎই গম্ভীর মুখে পার্থসারথি বলে বসল, "এক কাজ করো না—।"

"কী?"

"নার্সিংহোমে।" রীতিমত অবাক হয়ে গেল মন্দিরা।

"হ্যাঁ, অসুবিধাটা কোথায়! আমার এক চেনাশোনা ডাক্তার এন্টালিতে একটা নার্সিংহোম খুলেছে। ভর্তি হবে?"

সহজ-সরল বাংলায় বলা, কিন্তু পার্থসারথির কথার মানে মন্দিবার কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হল না। অবাক হয়ে বলল, "কী যা-তা বলছ!"

হা-হা করে হেসে উঠল পার্থসারথি, তারপর বলল, "দাম্পদ্যজীবনে একঘেয়েমি কাটাবার এটাও একটা রাস্তা। আসলে কোনও রাস্তাই সে-অর্থে রাস্তা নয়, তবে রাস্তা তৈরি করে নিতে হয়। ডক্টর স্মিথ এই ধরনের একটা কেসেব কথা লিখেছে বইতে।"

"আবার ডক্টর স্মিথ।"

খাবার-টেবিলে আজ প্রধান পদ কিমাকারি, পার্থসারথিব ওই কারির বাটিটা একটু সরিয়ে রেখে শুরু করল স্মিথসাহেবের কেসহিস্ট্রির কথা। "পায়ের আঙুলের খুব ছোট্ট একটা অপারেশনের জন্যে স্ত্রী ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। দিন-তিনেক থাকতে হবে। রাত্রের দিকে ডাক্তার একবার রাউন্ডে আসে। তৃতীয় দিন ডাক্তার একটু বেশি রাতেরদিকে এল। ঘরে নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। ডাক্তারের গায়ে অ্যাপ্রন, মাথায় টুপি, বোধহয় ওটি থেকে বেরিয়েছে সবে। নাড়ি দেখার জন্যে ডাক্তাব রোগিনীর হাত হাতেব মধ্যে টেনে নিল। তারপর হঠাৎই এমনকিছু ঘটল যার ফলে নাড়ির গতি বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। দাম্পত্যজীবনের একঘেয়েমি কাটাবাব জন্যে ওই ভদ্রমহিলার স্বামী ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যাপ্রন আর টুপি ধার করে স্ত্রীকে একটু চমকে দিতে এসেছিলেন। চমকের ওপর খুব ঝোঁক দিয়েছেন ডক্টর স্মিথ। এইভাবে স্বামী স্ত্রীকে, কিংবা স্ত্রী স্বামীকে চমকে দিতে পারলে দাম্পত্যজীবনেব একঘেয়েমি অনেকটা কেটে যায়।"

বেশ কৌতূহলী হয়ে ঘটনাটা শোনার পবে মন্তব্য করল মন্দিবা—"পাগল!"

"পাগল! কে পাগল?"

"তিনজনেই। বউয়ের পায়ে অপাবেশন হয়েছে, ডেলিকেট ব্যাপাব। আব ওর বব ওই সময ওকে চমকে দেওয়ার জন্যে ডাক্তার সেজে এসল। তোমাব স্মিথের মাথাব দোষ আছে, এটাকে আবার একটা উদাহরণ হিসেবে দাঁড করিয়েছে লোকটা।"

পার্থসারথি ভেবেছিল, কেসহিস্ট্রিটা শুনে মন্দিরা মজা পাবে। তবে হেলে যাওয়াব পাত্র নয় পার্থ। খাওয়ার পরে শোবার ঘরে গিয়ে প্রসঙ্গটা আবাব তুলে বলল, "আমাদের দেশে সেক্সটাকে দু-ভাবে দেখা হয়। হয খুব খারাপ, নয় খুব সিরিয়াস। কিন্তু এর মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক মজা আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে—এটাই কেউ বুঝতে চায় না।"

হেসে উঠল মন্দিরা—"তুমি বুঝলেই হবে।"

পার্থসারথির কিন্তু একদম হাসি পেল না। হঠাৎই মনে হল, মন্দিরা রোজ শোবার সময় মার্কামাবা একটা শাড়ি পরে। শাড়িটা পুরনো, কেচে কেচে রঙ ফিকে হয়ে গেছে

একদম। গায়ে পাউডার দেওয়ার ভঙ্গিটাও এক, মাথার ওপর দিয়ে হাত তুলে লম্বা পাউডারের কৌটোটা ঘাড় গুঁজে দেয় ব্লাউজের পেছন দিকে—অসহ্য।

ঘরের সবকিছুই বিরক্তিকর। কবেকার বিছানা, কবেকার খাট, খাটের পালিশও চটে গেছে কবে। ক্লান্তি থেকে হতাশা আসে, আর সেই হতাশাই বোধহয় জীবনকে একঘেয়ে করে তোলে। হঠাৎ তীব্র এক একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হল পার্থসারথি।

এ-পাড়ায় রাত মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি নামে। ছড়ানোছেটানো বাড়ি ঘর, অধিকাংশ বাড়িই আবার আদ্দিকালের। বাড়ির এলাকা যতটা, ঘর সে-তুলনায় বেশ কম। কম ঘরে কম মানুষ থাকে, মানুষগুলো আবার বেশিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়। তার ফলে সন্ধে হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রাত নেমে যায়, সেই রাত একটুখানি গড়াতে না গড়াতেই গভীর রাত। সেই রকমেরই এক গভীর রাত এখন নেমে এসেছে এ-বাড়ির চারপাশে।

মন্দিরা শুয়ে পড়েছে, হাতে একটা মেয়েদের ম্যাগাজিন। সেই ম্যাগাজিনের কয়েকটা পাতা ওলটাবার পরেই বলল, "এই কালকে একটু বিষ এনো তো।"

ভয়ংকর এক একঘেয়েমিতে আক্রান্ত যে-কেউ বিষের কথা শুনলেই চমকে উঠবে, পার্থসারথিও চমকাল। "বিষ।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ইঁদুর মারার বিষ। কাল ঘরের মধ্যে একটা নেংটি ইঁদুর দেখেছি। খাটের তলার বাক্সের মধ্যে শীতের জামাকাপড় আছে। বাক্সের ডালাটা আবার ভালভাবে আঁটে না, ওর মধ্যে ইঁদুর বাসা বাঁধলেই কেলেঙ্কারি। কাল অফিস থেকে ফেরার সময় মনে করে এনো।"

কথাটা বলার পরেই মন্দিরার চোখ আবার চলে গেল পত্রিকার পাতায়। পার্থসারথির হাতের কাছেই সিগারেটের প্যাকেট, কিন্তু প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাবার উৎসাহটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। সবকিছুই বিচ্ছিরি রকমের ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

মন্দিরা শোবার পর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না, ঘুম বোধহয় আরও তাড়াতাড়ি চলে আসে চোখের সামনে পড়ার কিছু-একটা থাকলে। একটু পরেই পত্রিকাটা ওর হাত থেকে খসে পড়ল মুখের ওপর, তারপর মুখ থেকে বিছানায়।

পার্থসারথি ঠিক করল ওই বিছানায় শোবে না। ওর একঘেয়েমি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে এতই বেড়ে গেল যে একঘেয়েমির ধার কমে গেল শেষে। ধার কমলে ভার বাড়ে। সেই ভারে একসময় দু চোখের পাতা ভার-ভার ঠেকল ওর। পার্থসারথি ঠিক করল, ওই বিছানাতেই শোবে—তবে এক ধারে।

এক ধারেই ও শুল, আর শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্মিথসাহেবের কথা ভেসে এল কানে। সাহেব বলছেন, 'নটি সেনসিবিলিটি' দারুণ জিনিস। আর 'লিটল টাচেস' কী কাণ্ড ঘটাতে পারে, কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। শুধু একটু কৌশল দরকার, সেই সঙ্গে সামান্য অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু দুজনের একজন সাহেবের উপদেশ গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলে অন্যজনের কী করা উচিত, সে-সম্পর্কে একটা কথাও লেখা নেই বইতে। পার্থসারথি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে কোনোমতে পাশ ফিরে শুল, আর তারপরেই ওর হালের বাতিকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

আজকের শোবার আগে খাটের তলাটা দেখা হয়নি। একবার ভাবল, না—দেখব না। এত সতর্ক চোখে সংসারটা আগলে রাখার সব দায়িত্ব কি ওর একার। বেশ, রাখা

না হয় গেল, কিন্তু কেন? ক্লান্তিকর, একঘেয়ে এই জীবনটার জন্যে? কোনও দরকার নেই। একঘেয়ে জীবনে চুরি-ডাকাতি হলে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু বাদেই আস্তে আস্তে উঠে পড়ল পার্থসারথি, তারপর খাটের তলাটা দেখে নিয়ে বিছানায় ফিরে এল আবার।

চার

জীবনকে বিষময় মনে করার সঙ্গে সত্যি-সত্যি বিষের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরদিন পার্থসারথি অফিস থেকে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরা জিজ্ঞেস করল, "বিষ এনেছ, ইঁদুর মারার বিষ?"

দুদিকে মাথা ঝাঁকাল পার্থসারথি।

"এমা, আনোনি। আজকেও একটা নেংটি ইঁদুর দেখেছি ঘরে। খাটের তলার বাক্সের ডালাটাও হয়েছে তেমন। চেপেচুপে বন্ধ করলেও কিছুক্ষণ বাদে খুলে যায়। একগাদা গরম জামাকাপড় আছে বাক্সে। ওর মধ্যে ইঁদুর ঢুকেছে কি না কে জানে! দেখতে হবে একবার। কাল কিন্তু ভুলো না। শিয়ালদার মোড়ে পাওয়া যায়, প্যাকেট-করা—দেখনি?"

পার্থসারথি এবার আর ইঙ্গিতেও উত্তর দিল না।

একটু বাদে চা আর বিস্কুট নিয়ে এল মন্দিরা।

চা খেতে খেতে পার্থসারথির একবার টি.ভি. খোলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু উৎসাহ পেলো না একটুও। সকালের বাসি খবরের কাগজ পড়ার ইচ্ছে ছিল না একদম, কিন্তু অভ্যাসের চাপে সেটাই টেনে নিল এক সময়। এখন প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে মন্ত্রীদের ঝগড়া, পার্টি থেকে বহিষ্কারের ঘটনা আর বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর গালাগালি। হালে এম এল এ-দের মারামারিও বেশ একটা নিয়মিত খবর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এ-সব পড়লে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন নাগরিকেরই মাথা গরম হয়ে উঠতে বাধ্য। পার্থসারথিরও হল। অন্যান্য দিনের মতো আজও একবার বিরক্ত হয়ে ভাবল, দেশটা সত্যিই গোল্লায় গেছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা হাসতে হাসতে বলল, কী অত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছ, তোমার সেই ডক্টর স্মিথের কথা?"

পার্থসারথি আগেই ঠিক করে রেখেছিল ও-নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না, সুতরাং চুপ করে থাকল।

মন্দিরা আর হাসছে না, তবে ওর মুখে হাসির ভাবটা রয়ে গেছে এখনও। আবার মুখ খুলল মন্দিরা—"তোমার মাথায় কিছু -একটু ঢুকে গেলে চট করে আর বেরোতে চায় না। কোন্ এক পাগলের বই পড়ে এ-কদিন ধরে সমানে বকবক করে গেছ। এ কথা অনর্গল বলে-যাওয়া কিসের লক্ষণ জানো?"

লক্ষণ জানতে চাওয়ার কোনও আগ্রহ দেখাল না পার্থসারথি।

মন্দিরা আর একবার হেসে নিয়ে বলল, "এটা বয়েস বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ।"

বয়েস বাড়ার কথা উঠতেই পার্থসারথি সকালের বাসি কাগজটা সরিয়ে রেখে টি ভি খুলে দিল। টি ভি-র কাঁচে খুব সুন্দরী একটি মেয়ের ছবি ভেসে উঠেছে। শুধু ভেসে ওঠাই নয়, মেয়েটি সত্যি-সত্যি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। পাহাড় থেকে সমুদ্রতীরে, সমুদ্রতীর থেকে স্পিডবোটে। প্রতিবার জায়গা বদল করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির পবনে

শাড়িও পালটে যাচ্ছিল। শাড়ির বিজ্ঞাপন। এমন বিজ্ঞাপন আর আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ছবির মধ্যে নতুন একটু তাৎপর্য খুঁজে পেল পার্থসারথি। প্রতিবার শাড়ি বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কেমন যেন নতুন হয়ে উঠছে।

কিন্তু, শুধু শাড়ি পালটালেই কি একটি মেয়ে নতুন হয়ে উঠতে পারে? আর একটু মাথা খাটাতেই রহস্যটা ধরে ফেলল পার্থ। ওর শরীরে খুব মৃদু একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল। ঠিক বলেছে ডক্টর স্মিথ। পরিবেশ পালটে গেলেই মানুষ একটু অন্যরকম হয়ে যায়। অন্যরকম এবং আকর্ষণীয়। একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এই জন্যেই মাঝেমধ্যে জায়গা বদল করা দরকার।

শাড়ির বিজ্ঞাপনের পরেই মশলাদার পাঁপড়ের বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেল টি ভি-তে। পার্থসারথির চোখ টি ভি-র দিকেই, কিন্তু দৃষ্টি যেন অন্য কোথাও। বিষণ্ণ হয়ে ভাবছিল, জীবনটা কী একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। একে বাঁচা বলে না, অথচ একটুখানি চেষ্টা করলেই বেঁচে থাকাটা কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

মন্দিরা আপন মনে গল্প করে যাচ্ছিল। গল্পের মধ্যে সংসার আছে, সাধ-আহ্লাদের কথা আছে, পিসিমার অসুখ আছে। একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পরে ও হঠাৎ বলে বসল, "এই, দীক্ষা নেবে?"

"দীক্ষা!" পার্থসারথি রীতিমত চমকে উঠে মন্দিরার দিকে তাকাল।

ও-ভাবে তাকাবার জন্যে মন্দিরা বোধহয় একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আমাদের দুজনেরই পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, এবার একটু পবকালের চিন্তাভাবনা কবতে হবে না। আগে তো রেওয়াজই ছিল, পঞ্চাশ পেরুলে বনে যেতে হয়।"

পার্থসারথি থমথমে গলায বলল, "বনেই তো আছি, তবে খোলামেলা বনে নয়—সাফারিতে।"

মন্দিরা আগের কথার জের টানল আবার। "পরশুদিন অনুদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, এক সাধু ভাগবত পাঠ করলেন—আহ্! কী অপূর্ব সব কথা। সত্যি, সংসারে আমরা কত ছোটখাটো জিনিস নিযে মাবামারি করি; অথচ জীবন হচ্ছে—।"

"জীবন কী?"

"জানো তো, পরের বেস্পতিবাব উনি সংসারের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিয়ে বলবেন। সন্ধ্যেবেলায়—যাবে তুমি? চলো না।"

বিরক্ত মুখে পার্থসারথি বলল, উনিই কি তোমাকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন?"

"ওঁর বলতে ভারী বয়ে গেছে। ওঁরা অনেক ওপরের মানুষ। পাঠ শুনতে শুনতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল—এই নেবে, দীক্ষা?"

মন্দিরা এমন গলায় বলল, যে পার্থসারথির মনে হল, হাত বাডালেই এক্ষনি ওব হাতে জীবনের সারবস্তুটি চলে আসবে। আব একটাও কথা না বলে গম্ভীর মুখে বসে থাকল পার্থ।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে মন্দিরা বিছানায় শুযে শুয়ে পুরনো একটা বই পড়ছিল। বইয়ের মলাটে এক সাধুর ছবি। বইটা নির্ঘাত অনুদের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে।

পার্থসারথির আজ আর ডক্টর স্মিথ পডার একটুও ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মন্দিরার হাতের ওই বইটার প্রতিক্রিয়াতেই ও বোধহয় র‍্যাক থেকে সাহেবকে টেনে নিল। খাটেব

একদিকে ভোগের জীবন, অন্যদিকে পরমাত্মার সন্ধান; মধ্যিখানে বেশ কিছুটা শূন্য বিছানা।

রাত গভীর রাতের দিকে গড়াতে লাগল, কিন্তু একটুখানি গডাতে না গড়াতেই মন্দিরার ধর্মগ্রন্থ গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। ওই দৃশ্যের এবারও একটি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। পার্থসারথি আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ডক্টর স্মিথকে।

বইটার আগাগোড়া বার দুয়েক পড়া হয়ে গেছে, আন্ডারলাইন করা অংশগুলো বেশ কয়েকবার; কিন্তু জানা তথ্যগুলো কেমন যেন নতুন করে টানতে শুরু করে দিল পার্থসারথিকে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা কয়েকটা ছবিও ভেসে উঠছিল। পার্থসারথি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে খুব কম গিয়েছে, কিন্তু ওর চোখের সামনে অ্যাটলান্টিকের গাঢ় নীল জল ভেসে উঠল। সমুদ্রের তীরে ছবির মতো শহর। পঞ্চাশতলা, একশোতলা বেশকিছু বাড়িও চোখে পড়ল। এইসব বাড়িরই কোনও একটা ঘরে আছেন ওই বুড়ি ঠাকুমা।

বুড়ি ঠাকুমার চেহারার কোনো বর্ণনা দেননি ডক্টর স্মিথ, কিন্তু পার্থসারথির হঠাৎ মনে হল, আর একটু চেষ্টা করলেই ঠাকুমাকে ঠিক দেখা যাবে। নিশুতি রাত নানা মায়া তৈরি করতে পারে, এখন সেই মায়াময় সময়। নীল সাগর আর সাগরপারের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর যখন দেখা গেছে, তখন বাকিটাই বা কেন দেখা যাবে না?

কেমন দেখতে ছিলেন ওই ঠাকুমা? এ-দেশের ঠাকুমা আর ও-দেশের ঠাকুমার মধ্যে নিশ্চয়ই আকাশপাতাল তফাত। মেমসাহেব ঠাকুমার চুল সাদা, সোনালি না লাল? মুখে কি বয়েসের ছাপ ধরেছে? শরীর-স্বাস্থ্য?

অসম্ভব দৃশ্যকে দেখার জন্য কল্পনাকে লাগামছাড়া করতে হয়, আর তা করতে হলে ঝকঝকে টিউবলাইটটা নিবিয়ে দেওয়া দরকার এই মুহূর্তে। উঠে আলো নিবিয়ে দিল পার্থসারথি।

ঠিক আগের ভঙ্গিতেই শুয়ে পড়েছে ও, কিন্তু পুরনো দৃশ্যের সুতোটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে তিনটে বড়-বড় জানলা, জানলার বাইরে তারাভর্তি আকাশ। পুর্নিমাটুর্নিমা হবে বোধহয়, হলুদ আলোর ঢল নেমেছে ঘরের মধ্যে। চারদিকের সবকিছু কী পরিষ্কার!

পার্থসারথির চিন্তা-ভাবনা থেমে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই ওর চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগল। সব ছবিই পুরনো সব চাঁদনি রাতের। কী অসাধারণ ছিল সেই রাতগুলো। মনে মনে পেছনদিকে ছুটতে শুরু করে দিল পার্থসারথি। পেছনদিকের মনোরম ওই রাস্তা ধরে বেশ-কিছুটা একনাগাড়ে যাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়ল ও। বেশ আরামের ঘুম।

কিন্তু ঘুম যতই আরামের হোক না কেন, ইদানীং মাঝেমাঝে মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে একবার ঘুম ভেঙে যায় ওর। আজকেও ভাঙল। ভাঙতেই প্রথমে মনে হয়েছিল সকাল হয়ে গেছে। তারপর আকাশে বিশাল এক চাঁদ দেখে বুঝতে পারল, না সকাল হতে দেরি আছে। কিন্তু কত দেরি? কটা বাজে এখন?

তারপরেই সেই বাতিকটা নড়ে উঠল ওর মাথায়। এইরে! আজকেও তো শোবার আগে খাটের তলাটা দেখা হয়নি। পাশ ফিরতেই শূন্য বিছানা চোখে পড়ল। মন্দিরা

কোথায়? বোধহয বাথকমে, ঘবেব লাগোয়া বাথকমে। ওখান থেকে ও ফিবে আসাব আগেই খাটেব তলাটা দেখে নিতে হবে চট কবে।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে পড়ল পার্থসাবথি, তাবপব হামাগুড়ি দিযে খাটেব তলায উঁকি মেবেই আঁতকে উঠল—"কে?"

"এই দেখ না, বাক্সেব ডালাটা—।" খাটেব তলা থেকে কেমন যেন অপবাধী অপবাধী গলায উত্তব দিল মন্দিবা।

পার্থসাবথি প্রথমে অন্যকিছু ভেবেছিল, এখন সেই অন্যকিছুব জাযগায মন্দিবাকে দেখে আশ্বস্ত হল কিছুটা। বুকেব কাঁপুনিটা কমে গেল আস্তে আস্তে।

মন্দিবা বলল, "আমি তোমাকে বলেছিলাম না ইঁদুব বেশ বেড়ে গেছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই শুনি খাটেব তলায খসখস কবে শব্দ হচ্ছে। বাক্সেব ডালাটা খুলে গেছে আবাব, ভেতবে একগাদা গবম জামাকাপড, কী কেটেছে না কেটেছে ভগবান জানে। লাগাতে পাবছি না, লাগিযে দেবে একটু—।"

খাটটা বিযেতে পাওযা, আব আজ থেকে পঁচিশ বছব আগেব প্রায সব খাটেবই পাযা লম্বা। এই খাটটাব পা বোধহয় একটু বেশিই লম্বা, অত উঁচু বাক্সটা দিব্যি আছে খাটেব তলায।

মন্দিবা আব একবাব বলতেই হামাগুড়ি দিয়ে খাটেব তলায ঢুকে পড়ল পার্থসাবথি। তাবপব বাক্সেব ডালা ধবে একটু চাপাচাপি কবতেই বুঝতে পাবল, ডালাব কোনও দোষ নেই। চেপেচুপে একগাদা জামাকাপড ঢোকানো হযেছে বাক্সে। অনেক কসবত কবে ডালাটা বন্ধ কবলেও ভেতবেব চাপে সেটা আবাব ছিটকে উঠছে ওপবে।

মন্দিবা ব্যস্ত গলায বলল, "দাঁড়াও-দাঁড়াও ও ভাবে নয, বাইবে বেবিযে আসছে সব। এবাব, হ্যাঁ এবাব চাপো।"

বেশ গায়েব জোবে বাক্সেব ডালায চাপ দিল পার্থসাবথি, কিন্তু মন্দিবা সামান্য চেঁচিযে উঠে বলল, "এ মা! সোযেটাবেব অর্ধেকটা যে বেবিযে গেছে!"

বাক্সেব ডালা খোলা হল আবাব। খোলাটাও সহজ কাজ নয। কিন্তু ফেব যখন বন্ধ হল ওদিকেব সোযেটাব ঢুকলেও এদিকেব শাল বেবিযে পড়ল কিছুটা।

চাঁদেব আলোয যেন বান ডেকেছে। খাটেব তলাতেও চমৎকাব হলুদ আলো। সবকিছু দেখা যাচ্ছিল পবিষ্কাব। চমৎকাব ওই আলোব সঙ্গে ফুবফুবে হাওযাও ঢুকছিল ঘবেব ভেতব। গোটা পবিবেশটাই এখন যেন অন্যবকম।

ধুলোয মন্দিবাব অ্যালার্জি, সুতবাং দু-বেলা খাটেব তলাটাও বেশ পবিষ্কাব কবে মোছানো হয়। পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন খাটেব তলায আধশোযা অবস্থায হঠাৎ একটা বিভ্রম তৈবি হল পার্থসাবথিব। মনে হল, নতুন কোনো জাযগায বেড়াতে এসেছে ওবা। আব ঠিক তক্ষুনি ভেতবেব জিনিসপত্র ভেতবে বেখে বাক্সেব ডালাটা বন্ধ হযে গেল চমৎকাব ভাবে।

খাটেব তলা থেকে বেবিয়ে যাওযাব মুখে মন্দিবাব হাতটা চেপে ধবল পার্থসাবথি।

মন্দিবা একটু অবাক হযে জিজ্ঞেস কবল, "কী?"

বহস্যময হাসি হেসে পার্থসাবথি বলল, "বাকি বাতটা এখানেই শুযে থাকলে হয না?"

"এখানে! কেন?"

"জায়গাটা বেশ নতুন-নতুন ঠেকছে। ডক্টর স্মিথ তো মাঝেমধ্যে এইরকম বেয়াড়া জায়গায়—"

"খাটের তলায় শুতে বলেছে?"

"না, খাটের তলা বলে কিছু বলেনি, তবে যে-কোনো অচেনা জায়গায়—।"

"খাটের তলা কি অচেনা জায়গা?"

"এমনিতে অচেনা নয়, শুলে অচেনা।"

মৃদু গলায় মন্দিরা বলল, "ছাড়ো, সকাল হয়ে গেছে।"

হেসে উঠল পার্থসারথি। "সকাল কোথায়, এ তো চাঁদনি রাত।"

একটা সময় খাটের তলা থেকে খাটের পাশের চকচকে মেঝেয় চলে এসেছিল ওরা। চাঁদের আলো এখন আরও গাঢ়। হাওয়া আরও ফুরফুরে।

ছোট্ট একটা হাই তুলে মন্দিরা বলল, "তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে?"

"কমছে, কমিয়ে দিয়েছে।"

"কে?"

"ডক্টর স্মিথ।"

মন্দিরার হাইটা এবার বেশ লম্বা। "তোমার ওই সাহেব সত্যিই পাগল। বই লেখার আর বিষয় পায়নি।"

"কেন, বিষয়টা কি বাজে?"

"বাজেই তো।"

"না পড়ে বলছ?"

"পড়েও বলব।"

পার্থসারথি বেশ খুশির গলায় বলে উঠল, "বইটা সত্যি পড়বে তুমি?"

এবার আব কোনো উত্তর এল না। ঘুমিযে পড়েছে মন্দিবা। হঠাৎই ঘুমিয়ে পডার আশ্চর্য এক ক্ষমতা আছে ওর।

অলস, বিহ্বল চোখে জানলার দিকে চেযে ছিল পার্থসাবথি। বাইবে তারাভর্তি আকাশ, মধ্যিখানে বিশাল এক হলুদ চাঁদ। হলুদ আলো কেমন যেন বেণু-রেণু হয়ে ছড়িযে পড়েছিল সব জায়গায়। চোখেব পাতা বুজে যাওয়ার আগে আবার একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছিল পার্থসারথির। মনে হয়েছিল, জানলাব ওপর নীল সমুদ্রেব ঢেউ আছড়ে পড়ছে একটাব পর একটা।

আমি গোপাল

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজ-ক্যাম্পাসের মেন গেট পর্যন্ত বাবাকে পৌঁছে দিয়ে গেল মীরা। গেটের পাশে পাম গাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ফুটপাথের ভিড়ে হারিয়ে যাবার আগে বাবা পেছনে ফিরে একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। চশমার কাচে বোধহয় ধুলো পড়েছে মীরার। মাথা নিচু করে আঁচল দিয়ে কাচ মুছতে মুছতে বুকের ভেতরটা গুমরে উঠল। 'চিঠি দিয়ো বাবা, চিঠি দিয়ো। মা আর দাদাকে বোলো চিঠি দিতে।'

কথাটা অনিলবাবুর কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না। মীরা চোখ তুলে দেখল, দু পাশের ফুটপাথে ভিড় বয়ে যাচ্ছে। বাবা নেই।

হোস্টেলের তিনতলায় মীরা ওর নিজের ঘরে ফিরে এল। মাঝারি সাইজের ঘর। চার কোণে চারটে চৌকি। আরও তিনজনের সঙ্গে মীরাকে এই ঘর ভাগ করে নিতে হবে। এই প্রথম সে বাড়ির বাইরে থাকবে।

লাভপুর গ্রামে মেয়েদের স্কুলে বরাবরই সে প্রথম হত। লাভপুর নামেই গ্রাম। আসলে ছোট্ট একটা শহর। স্কুল, কলেজ, রেজিস্ট্রি অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কয়েক বেডের হাসপাতাল, ছোট্ট লাইনের ট্রেন ও স্টেশন, বি ডি ও অফিস—কী নেই এখানে। দরদালান, মরচে-পড়া টিনের চালাঘর আর তার চেয়েও বেশি সুন্দর সব মাটির কোঠাবাড়ি নিয়ে তবু একা মনেপ্রাণে গ্রাম। মীরাদের বাড়ি এই লাভপুরে। মীরার বাবা অনিলবাবু বি ডি ও অফিসে কাজ করেন। পরীক্ষায় তার মেয়ে ভালো রেজাল্ট করে এটা তিনি জানেন। পড়শি ও অফিসের সহকর্মীরা যে মীরার প্রশংসা করে তাও তাঁর কানে আসে। কিন্তু তিনি কখনও ভাবেননি মেয়েকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে হবে। ভেবেছিলেন গ্রামে তো কলেজ আছেই। সেখান থেকে পাশ কবার পর না হয় কলকাতা বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েকে ভর্তি করে দেওয়া যাবে।

কিন্তু সব হিসেব বদলে গেল মীরার রেজাল্ট বেরুনোর পর। এত ভালো রেজাল্ট করল মীরা যে, ওকে কলকাতার কোন নামী কলেজে ভর্তি না করে দিলেই নয়! এই এক ক্লান্তিকর অসুবিধা মফস্বলের। ভালো পড়াশুনো আর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা—দুটোর জন্যই কলকাতায় ছুটে আসতে হয় মফস্বলের মানুষকে।

মীরা এসেছিল। ট্রেনে জানলার ধারে বসে থাকতে থাকতে হাওয়া এসে চুল এলোমেলো করে দিয়ে গিয়েছিল ওর। বাবাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। মাইলের পর মাইল অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কলকাতার রাস্তার হঠাৎ দেখা আলো, স্টেশনের ভিড়, ট্রেনের ঘণ্টা, সবুজ লণ্ঠন—আলাদা আলাদা ভাবে এ সবের কোন অস্তিত্বই থাকল না ওর কাছে।

কয়েকদিন হল মীরার ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাসের দু-একজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাবসাবও হয়েছে ইতিমধ্যে। হোস্টেলের রুমমেটদের মধ্যে মীরাই সবচেয়ে জুনিয়র। তিন রুমমেটকে সে দিদি বলে ডাকে। ওর ক্লাসেরও একটি মেয়ে আছে হোস্টেলে। নাম মালা। তবে সে থাকে একতলায়। মীরার ইচ্ছা হলেও সব সময় ওর দেখা পায় না। মালা কলকাতারই মেয়ে। বাড়ি আলিপুরে। বরাবরই হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া

করেছে। আগে ছিল ডাউহিলে। ফাস্ট ইয়ার অনার্সের ছাত্রী হলে কী হবে, এর মধ্যে উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও মালাব দারুণ বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। সকালবেলা খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায় মালা। ফেরে একেবারে রাত নটায। নটাব মধ্যেই হোস্টেলে ফেরার নিয়ম। আরও দেরি করে ফেবার নিয়ম থাকলে মালা নিশ্চয় সেই সময়েই ফিরত।

একটা কথা মীরা বুঝতে পেরেছে। এখানের আবহাওয়াটাই আলাদা। লাভপুবে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল মাটির উপর দিয়ে যে হাওযা বয়ে যায, যে আলো ওঠে, সেই হাওয়া, সেই আলো এখানে নেই। হারিয়ে-যাওয়া সেই আলো-হাওয়ার খোঁজে পাগল হওয়াও বোধহয় কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু মীরাব অসুবিধাটা এখানেই। যে স্বপ্ন বুকে পুষে রাখতে হয়, যে স্বপ্নের কথা মুখ ফুটে কাউকে বলা যায় না, সেই স্বপ্ন আর ভালোলাগাগুলোকে সে কেন এখানে খুঁজে পেতে চাইছে? কে শুনবে ওব কথা? ওকে বুঝতে পারবে কি?

নতুন একজন অধ্যাপক ক্লাস নিচ্ছেন কযেকদিন হল। সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। বয়স বেশি নয়। মুখেচোখে একটা ছেলেমানুষী ভাব। তাতে বযসটা আরও কম দেখায়। পড়ানোর ভঙ্গিটাও চমৎকার। সপ্তাহে মাত্র দুটো ক্লাস নেন। কিন্তু ওই দুটো ক্লাসের জন্যই মন পড়ে থাকে মীরাব। সেদিন সে একটু বেশি সাজগোজও কবে। ক্লাসে গিয়ে উসখুস করে। প্রশ্নের ছলছুতোয় নতুন স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণেব সুযোগ খোঁজে। দু-একবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতেও চায়। কিন্তু আর হয়ে ওঠে না। সবকিছু গুলিয়ে যায়। সবার অজান্তে হাত পা কেঁপে ওঠে।

তারপব সত্যিই মীরা একদিন একটা প্রশ্ন কবে বসে। আমেবিকা-ফেবত যুবক সৌম্যেন্দু প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলেন—তুমি তো একেবারে এলিমেন্টাবি প্রশ্ন কবেছ। স্কুলের প্রশ্ন...

হাসির ঝড় বযে গেল ক্লাসে। সে-ঝড়ের ধুলোবালি গাযে লাগল মীরার। বেঞ্চে বসে পড়ার মুহূর্তে ওবই মধ্যে সে দেখল, বেশি হাসছে মালা। এরকম হাসিব কথা যেন সে আগে কখনও শোনেনি। মীরা আরও দেখল, নতুন স্যাব হাসি সামলে নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই যে তিনি মালার দিকে তাকিযে আছেন, চোখ আর ফেরাতেই পাবছেন না। সে-চোখে স্পষ্ট একটা ভাষা খুঁজে পেল মীরা। নিজেব ওপব ঘৃণা হল। নিজেকে হাস্যকর করে তোলাব এরকম একটা সুযোগ কেন সে কবে দিল? চেয়ার টেবিলেব কাঠগড়ায় নতুন স্যারকে দাঁড় করিয়ে সে শুধু মনে মনে বলল—কেন এমন কবলেন? ভাবতাম আপনার ভালোলাগাটাও অন্যদের মতো নয়। যা কিছু সস্তা ও সহজ তাতে আপনার মন ভরে না।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। তারপবেও অনেকক্ষণ মাথা নিচু কবে বসে থাকল মীবা। দূব থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের গলাব শব্দ। বুকেব ভিতবের নৈঃশব্দ্য—তাতে আরও বেশি করে বেড়ে যাচ্ছে। মীরা এবাব হোস্টেলে ফিবে যাবে। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে উঠে যাবে তিনতলার ঘরে। বাবান্দায একটা চেযার এনে বসবে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে শেষ চৈত্রের বিকেল। চোখেব সামনে মস্ত বড আকাশটা জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে যাবে। অন্ধকার নামবে। লাভপুব গ্রামের খোয়াই আর কোপাই নদীর তীবের শান্ত নরম অন্ধকাবের চেয়েও এই অন্ধকারের বঙ গাঢ়।

অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ মীরা ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে নেহাত অভ্যাসবশে লেটারবক্স খুলল। পরশুই তো বাবার চিঠি পেয়েছে। তার আগের দিন পেয়েছিল মা ও দাদার চিঠি। বাবা অফিসে বসেই চিঠি লেখেন। লেখার পরই ডাকঘরে পাঠিয়ে দেন বেয়ারার হাতে। দাদা বরং চিঠির শেষে মায়ের জন্য জায়গা রেখে দেয়। না, আজ মীরার কোন চিঠি আসার কথা নয়। লেটার বক্সে তিন চারটে পোস্টকার্ড আর নীল একটা খাম। অবাক হল সে, নীল খামটা ওর নামেই এসেছে। যে পাঠিয়েছে খামের উপরে বা পিছনে তার নাম নেই। লেখা আছে—কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়। তারপর ঠিকানা। হাতের লেখাটা খারাপ নয়।

আবার কে চিঠি লিখল আমাকে? সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় [illegible], খাম সাবধানে ছিঁড়তে ছিঁড়তে মীরা ভাবল। আকাশে সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে আগেই। সিঁড়িতে পড়েছে তারই ম্লান দাগ। তিনতলার বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মীরা। চিঠিটা খুলল। আগে দেখে নিল কার লেখা। ইতি, তোমার গোপাল।

কে গোপাল? গোপাল নামে কাউকে সে চেনে বলে মনে পড়ছে না। ঠিকানাটা দেখল—গ্রাম ও ডাকঘর—লাভপুর। লাভপুরে ছেলেদের ভিড়ে কার নাম গোপাল? বিল্টু অনিরুদ্ধ সোমনাথ—এদের মুখগুলোই তো ভেসে উঠছে এখন। অন্য আর কাউকে সে চেনে না। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথের ধারে বেশ কিছু ছেলে সকালে বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের সকালে কিংবা ম্লান বিকেলগুলোয় তবে কি এই গোপাল তার আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত? গার্লস স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়ত মীরা। প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যেও গোপাল বলে কাউকে এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে না। আর গোপাল নামে কোন প্রাক্তন সহপাঠী যদি থাকেই তাহলে এতদিন পরে সে তাকে চিঠি লিখবে কেন?

মীরা,

তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমাকে মনে রাখার কোন কারণও অবশ্য নেই। তবে আমি জানি একসময় আমি তোমার কতটা কাছাকাছি ছিলাম। তোমাকে চিঠি লেখার সেটাই আমার অধিকার। কিন্তু উপলক্ষ কিছু নেই। একটা কথাই শুধু বলার আছে। ভালোভাবে পড়াশুনো করো। আর আনন্দে থেকো। জীবনে আনন্দের চেয়ে দামী আর কিছু নেই। আমার নিজের জীবন থেকে আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে বলেই, তোমার মধ্যে তার সার্থকতা দেখতে চাই।

কাকাবাবু, কাকীমা আর সমীরণদা ভালো আছেন। ভালোবাসা জেনো। ইতি তোমার গোপাল।

চিঠিটা বারবার পড়ল মীরা। ক্লাসের বিশ্রী অভিজ্ঞতার পর এই চিঠিই সন্ধ্যাবেলা তার গায়ে ছড়িয়ে দিল দূর কোপাই তীরের হাওয়া। কিন্তু যত মুশকিল এই গোপাল নামটা নিয়ে। চিনি না, চিনি না, চিনি না—মীরা বারবার বলল। অভিভাবকের ভঙ্গিতে চিঠি লিখেছে গোপাল। স্নেহ ও মমতাটুকু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। লিখেছে তোমার কাছাকাছি ছিলাম। ঠিক বোঝা গেল না। একটা কথা অবশ্য বোঝা গেল। গোপাল আমাদের বাড়ির সব খোঁজখবর রাখে। আমার ঠিকানা জানে। নাহলে এই চিঠি সে লিখবে কী করে? মীরা ভাবল।

নীল খামের চিঠি আবার এল, ঠিক এক সপ্তাহ পর।

আমি গোপাল

মীরা,

আমার আগের চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়। একটা কথা অন্তত বুঝতে পারবে। তোমার চলার পথের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। গ্রামেব মানুষ ও আমি। এটাই তোমাকে সাহস যোগাবে দুর্দিনে।

লাভপুরের ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাবো। কিন্তু আমি চাই না তুমি আমাকে কোন চিঠি লিখো। চিঠি লিখে বলার কথাটাকে নষ্ট করে ফেলো না। হয়ত আমিও আর চিঠি লিখব না তোমাকে। মুখ ফুটে তুমিও হয়ত কোনদিন কিছু বলতে পারবে না আমাকে। সম্পর্কটা হয়ত এভাবেই থেকে যাবে চিরদিন। থাকুক। অব্যক্ত ভাষার চেয়ে সুস্পষ্ট আর কিছু নেই। আমাকে তোমার যা কিছু বলার থাকবে তা আমি দূর থেকেই বুঝতে পারব। আগে যেমন তোমার কাছাকাছি ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। বরং বেশি কবে আছি। সকলের সঙ্গে মিশে আছি। আমি জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমাব সব ভালোবাসা থাকল তোমার জন্য। ইতি তোমার গোপাল।

মীরার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না। যখন একা থাকে, তখন বেশি করে তার সান্নিধ্য পেতে চায়। তাকে প্রত্যাখ্যান কবতে হলেও তো একবার চোখে দেখা দরকার। আব যদি তাকে ভালোবেসে ফেলি?

সেই মীরা আর নেই। দুটি নীল খাম তার জীবন বদলে দিয়েছে। তাকে একজন ভালোবাসে, সব সময় সে তার কাছে আছে—ঘনিষ্ঠতার এই উপলব্ধিটুকু মীরাকে শিখিয়েছে কীভাবে নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হয়, কীভাবেই বা উপেক্ষা করতে হয় ক্ষুদ্রতাকে। মীরা মনে মনে বলে, আমিও তোমার কাছে আছি। তোমাকে ভালোবাসার সুযোগ দাও। তারপর যদি তোমাকে ফিরিয়েও দিই, আমাব মনে কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু তোমার মনে আমি কোন দুঃখ দিতে চাই না। ভালোবাসতেই চাই তোমাকে। যদি না পারি সেটা আমারই ব্যর্থতা।

গরমের ছুটিতে লাভপুরে গিযে গোপালকে খুঁজে বের করতে হবে। মীরা আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে এসেছে। হাটতলা, থানাপাড়া, বিরামমন্দির, ফুল্লরাতলা—বন্ধুদের সঙ্গে বেডাতে বেড়াতে ছেলেদের লক্ষ্য কবেছে মীবা। কাউকেই তার গোপাল বলে মনে হয়নি। এ এক অদ্ভুত ব্যথা-ভরা রহস্য। সাহস করে মীরা কথাটা বন্ধুদেরও বলতে পারেনি। কে জানে, ওরা হাসাহাসি করবে কিনা?

কোপাই নদীর ব্রীজ পেবিয়ে সাঁওতাল পাড়ায় বেড়াতে বেডাতে মীবার কেমন যেন মনে হয়—হঠাৎ যদি গোপাল আসে এখানে? গোপালেব বদলে হুড়মুড় করে এসে পড়ে ছোট লাইনের ট্রেন, ধোঁয়া উড়িয়ে ব্রীজ পেরিযে চলে যায়। ওই ট্রেনে কি গোপাল আছে?

লাভপুরের স্কুলগুলোতেও এখন গবমেব ছুটি। আসা-যাওযার পথে ছেলেমেযেদেব ভিড় নেই। আচ্ছা, সেই ছেলেটার নাম কী? মীরা মনে মনে ভাবল—রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে যে ওকে শোনাত, কালো হলে কী হবে, কালো গোলাপের মতো সুন্দর। হ্যাঁ মনে পড়েছে, ওর নাম তো তিমির।

আর একটি ছেলে মীরাকে একদিন বলেছিল—তোমাব কিছু হারিয়েছে? আমি সেটা খুঁজে পেয়েছি।

না, আমার গোপাল ওভাবে কথা বলে না।

শেষ পর্যন্ত মীরা একদিন দাদাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কথাটা।

দাদা, গোপাল নামে কাউকে চিনিস? আমাদের গ্রামেই বাড়ি।

কিছুক্ষণ ভেবে সমীরণ বলল—কোন্ পাড়ায় বলতে পারিস?

তাহলে তো আমি নিজেই চিনতে পারতাম। না, গোপাল নামে কেউ নেই এখানে।

বিকেলে আবার ছোট লাইনের স্টেশনে গিয়ে বসে থাকল মীবা। ট্রেন চলে যাবার পর বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেল। উদ্ধারণপুরের বাস থেমে আছে। সিউড়ি যাবার বাসটাকেও দূরে দেখা যাচ্ছে। পান বিড়ির দোকান। পাইস হোটেল। খড়ের চালাঘরে সেলুন। জীর্ণ হৃৎপিণ্ডের মতো একটা হ্যাস্কিং মেশিন চলছে টিপ টিপ শব্দে। পীচ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল মীরা। তারপর মোরামের ডাঙায় নেমে পড়ল। তালবাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাজার হাজার তালগাছ। ছায়াচ্ছন্ন মাটির পথ। নীল সবুজ মেঘ যেন নেমে এসেছে মাটিতে। কিন্তু কোথায় গোপাল?

না রে, আমি তোকে ভুল বলেছি। বাউরি পাড়ায় একজনের নাম গোপাল। ডোম-পাড়াতেও একজন গোপাল আছে। বুড়ো গোপাল। গোপাল-বাউরিরও বয়স কম নয়। গতবার তো আমাদের খড়ের চাল গোপাল বাউরিই ছেয়ে দিয়ে গেছে।

ছুটি ফুরিয়ে গেল মীরার। ভোরবেলার বাসে আমোদপুর স্টেশন আর বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার। বাস ও ট্রেন দুটোতেই খুব ভিড় হয়। এবার মীরার সঙ্গে বাবা যাচ্ছেন না। মীরা একা এসেছে। ফিরবেও একা। বাবা ও দাদা ওকে লাভপুরে বাসে চাপিয়ে দিতে এসেছে। ঘুম জড়ানো চোখে ট্রেন ধরানোর তাড়া থাকে ড্রাইভারের। লোক উঠতে না উঠতেই কন্ডাকটাব ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ছাদের উপর থাকল মীরার বাক্স-বেডিং। কিন্তু কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা? ওই ব্যাগেই তো প্র্যাকটিক্যাল খাতাগুলো ছিল, ছিল দরকারী নোটিস। কলেজ খুললেই পরীক্ষা।

আমেদপুরে যাত্রীদের নামিয়ে মর্নিং কোর্টের প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাস সিউড়ির পথে উধাও হয়ে গেছে। ট্রেনেব ঘণ্টা হয়েছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে দেখা যাচ্ছে কালো মেঘ। বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার আসছে। স্টেশনে থইথই ভিড়। ঠিক এই সময়েই কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার কথা মনে পড়ল মীরার। বাসে পড়ে থাকল না তো? নাকি শেষ মুহূর্তে মা বাক্সের মধ্যে ব্যাগটা ভরে দিয়েছেন? বাক্স খুলে দেখবে সে-সময়ও তো নেই। তবেকি এই ট্রেনে যাবে না মীরা? বাড়ি ফিরে যাবে?

গমগমে ভিড়ের মধ্যেই মীরা স্পষ্ট শুনল একটা মোটর বাইক এসে থামল স্টেশনের দরজায়। পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছিপছিপে এক তরুণ তাড়াতাড়ি মোটর বাইকটাকে পাশে ঠেলে রেখে ছুটে চলে এল প্ল্যাটফর্মে। কাঁধে খদ্দরের ঝোলানো ব্যাগ। ব্যাগটাকে চিনতে পারল মীরা। এতক্ষণ এই ব্যাগটারই সে খোঁজ করছিল।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়েছে। ছেলেটি মীরার হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে বলল—আমি গোপাল। ব্যাগটা তুমি লাভপুর বাসস্ট্যান্ডে ফেলে এসেছিলে।

ট্রেন নড়ে উঠল। মীরা কোনরকমে উঠতে পেরেছে। এই গোপালকে কি সে কখনও চোখে দেখেছে? চেনে কি ওকে? মনে পড়ে না।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোপাল আর তার মোটর বাইকটাকে দেখতে পেল না মীরা।

ভালোবাসার স্বাদ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্তিরে কিছুতেই ঘুম আসে না বিভুর। চোখ বুজলেই দেখতে পায় সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা।

ধড়ফড করবে উঠে বসে সে। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যায়। ক্র্যাচটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ফাঁকা রাস্তা। যতদূর চোখ যায় বিভুর চোখে পড়ে শুধু স্ট্রিটলাইটগুলো। দূরে পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার ঘন হয়ে বসেছে। ওপরে তারাভরা আকাশ। চাঁদ যে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। গভীর রাতের নির্জন নীরবতা অক্টোপাসের মতো বিভুকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

বিভুর ভীষণ একা লাগে। ভয় করে। যে আতঙ্কটাকে ও গলা টিপে মারতে চায় সেটাই যেন তাকে চারপাশ থেকে চেপে ধরতে চায়। সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটা চোখেব সামনে ভেসে ওঠে। কেঁপে ওঠে বিভু। শিরশিরে অথচ-ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত,ওব গোটা শরীরে দাপিয়ে বেড়ায়। বিভুব মনে হয়, ভয়ের মুখোশ পবে সেই মুহূর্তটা তার চোখেব সামনে বুঝি নেচে বেড়াচ্ছে। ছটফট করে ওঠে বিভু।

রণধীরের এখন টানা নাইট ডিউটি। শুধু এই শহর নয়, গোটা অঞ্চল নিযে যা চলছে। রণধীর খেয়েদেয়ে একটু তাড়াতাড়ি অফিসে চলে যায়। বিভুও ওর সঙ্গে খেযে নেয। রণধীর অফিসে চলে যেতেই বিভু একা। আজকাল একা থাকতে বিভু ভয পায কিন্তু উপায় নেই। বাড়ি যে যাবে তাও সম্ভব নয়। কৃত্রিম পাটা এখনো সডগড় হয়নি। মা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ও চায় না ওর জন্যে মা মনে কষ্ট পান। কিন্তু এতবড় সত্যটা আর কতদিন যে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে তাই বা কে জানে। একদিন না একদিন মা তো জানতে পারবেনই। তখন.....

বড় অসহায় লাগে বিভুব। কৃত্রিম পা আব নিজেব পা তো এক জিনিস নয়। ও কি পাববে আগেব মতো পাহাড়ে চড়তে, কিংবা ছুটে গিয়ে পোজিশান নিয়ে গুলি চালাতে? আর্টিফিসিয়াল লিম্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেছেন, ওর কোনো অসুবিধা হবে না। ও আাগের মতোই থাকবে। বিভু জানে তা কিছুতেই সম্ভভ নয। আগে হলে অবসব নিতে হতো। এখন সেটা হয় না—এই যা।

জানলার ধারে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। বিছানায এসে বসলো। মন বড আনচান করছে। কিন্তু কেন? ওব মনে হলো, একা থাকতে থাকতে ও বোধহয হাঁপিযে উঠেছে। খানিকক্ষণ কথা বলতে পাবলে ভালো হতো। কিন্তু কাব সঙ্গে এই গভীব রাত্তিবে কথা বলবে। লোকে তো ওকে পাগল ভাববে। বিভু ঠিক কবলো বণধীবকেই অফিসে ফোন করবে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পাবলে ওব মনেব ভারটা কমে যাবে।

টেলিফোনটা বিছানাব ওপব টেনে নিয়ে এসে বিভু ডাযেল করলো।

হ্যালো...

বিভুব মনে হলো জলতরঙ্গে যেন ঢেউ খেলে গেল। এমন মিষ্টি গলাব স্বব সে কখনো শোনেনি। কিন্তু রণধীবদেব অফিসে এ কাব গলা? ওপাশ থেকে আবাব ভেসে এলো জলতবঙ্গের সুরে সুর তোলা গলা. .হ্যালো .

বিভু একটু ইতস্তত করে নম্বরটা বললো।

রং নাম্বার। ভদ্রমহিলা লাইনটা ছেড়ে দিলেন।

বিভু আবার ডায়েল করলো। ভেসে এলো সেই মিষ্টি মধুর গলার স্বর। একবার, দু'বার, তিনবার। প্রত্যেকবারই একই জায়গায়—রং নাম্বার। এবার ভদ্রমহিলা অত্যন্ত মিষ্টি করে বললেন, এখন আর করবেন না। খানিকক্ষণ বাদে ডায়েল করুন। মনে হয় তখন লাইনটা পেয়ে যাবেন।

ফোনটা নামিয়ে রাখে বিভু। ও অবাক হয়, ওর তো বিরক্ত লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। মিনিট কুড়ি বাদে ডায়েল করতে করতে বিভু ভাবলো, আবার রং নাম্বার ভদ্রমহিলার কাছে গেলেই ভালো হয়। ভাবতে ভাবতে ভেসে এলো সেই মিষ্টি গলা।

বিভু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, আবার রং নাম্বার। ফোনটা ছাড়বেন না প্লিজ।

হাসির ঝর্ণা ভেসে এলো, এত রাত্তিরে কাকে ফোন করছেন?

আমার বন্ধুকে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। একা বাড়িতে ভালো লাগছে না তাই...

কেন ঘুম আসছে না?

আমি রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য বার বার ভেসে ওঠে চোখের সামনে।...একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

কি ?

মনে হচ্ছে, আমার মতো আপনারও রাত্তিরে ঘুম হয় না।

ঠিকই ধরেছেন। তবে ঘুম হয় না বলাটা ঠিক হলো না। আমার মা খুব অসুস্থ। তাঁকে দেখাশুনা করার জন্যে আমায় রাত জাগতে হয়। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

আমি যে বকবক করছি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

না। তাহলে কী আর কথা বলি। আমার ভালোই লাগছে।

বিভু অনেকটা স্বচ্ছন্দ। জিজ্ঞেস করে, আপনার মার কী হয়েছে?

সে আর বলবেন না। মা অনেকদিন ধরে ভুগছেন। এখন প্রায় কোমার স্তরে।

সে কী! বিভুর মন খারাপ হয়ে যায়। একটু ইতস্তত করে বলে, আপনাকে যদি আমি মাঝে মাঝে ফোন করি—আপনি রাগ করবেন?

ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। বিভুব খারাপ লাগে। ওর মনে হয়, ভদ্রমহিলা ওকে কী ভাবছেন কে জানে। কেন যে কথাটা বলতে গেল। ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো সেই মিষ্টি গলা, ঠিক আছে ফোন করবেন।

কেন?...ও হো, এটা তো ক্রস কানেকশান। ঠিক আছে লিখে নিন।

ভদ্রমহিলা নম্বরটা বলে বললেন, আজ কিন্তু আর ফোন করবেন না।

বিভু হেসে ফেললো। বললো, তাই হবে। কাল কিন্তু করবো। গুড নাইট।

তাই করবেন। গুড নাইট।

ফোনটা নামিয়ে রেখে পা ছড়িয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসলো বিভু। তার মুখে হাল্কা হাসি। যার গলার স্বর এত মিষ্টি না জানি সে দেখতে কত সুন্দর। বয়েসও নিশ্চয় বেশি নয়। বেশি বয়েস হলে ঝর্ণার মতো হাসি হতো না। বিভুর মনে হয়, খুব বেশি হলে ভদ্রমহিলার বয়েস কুড়ি-একুশ হবে। না, তার বেশি কিছুতেই নয়। বিভুর মনটা

খুশি খুশি লাগে। ও ঠিক করলো, কাল রাত্তিরে আবার ফোন করবে। উনি তো বলেছেন, কিছু মনে করবেন না।

অনেকদিন পর সেদিন রাত্তিরে বিভু ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে রণধীর যখন ফিরলো বিভু তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওকে ডেকে তুললো রণধীর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল রাত্তিরে তাহলে ঘুমিয়েছিস?

হ্যাঁ রে। বেশ ফ্রেশ লাগছে।

ওরা মুখটুক ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসলো। রণধীর বললো, অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না।

কেন, এ কথা বলছিস কেন? কার্গিলে লড়াই তো থেমে গেছে।

তারপর থেকে দেখছিস না রোজই একটা না একটা ঘটনা ঘটছে। কোনোদিন ব্লাস্ট, কোনোদিন ছাউনিতে অ্যাটাক। এতদিন ওরা আর্মিকে এড়িয়ে চলতো, এখন তো তাদেরও ছেড়ে কথা বলছে না। একজন কর্ণেল মারা গেলেন, ভাবতে পারিস?

বিভুর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বলে, আমাদের আরও শক্ত হওয়া দরকার। মনে হচ্ছে, উগ্রপন্থীর ছদ্মবেশে ওদের রেগুলার আর্মির লোকজনই এই সব কাজ করাচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়।

হুঁ, এই শহরের একটা মানুষের নিরাপত্তা নেই। পরমুহূর্তে কী হবে কেউ জানে না। এ কিন্তু সহ্য করা উচিত নয়।

ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রণধীর উঠে পড়লো। ও এখন ঘুমোবে। রণধীর ওর জন্যে দু'দিন অন্তর লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসে। একটা বই নিয়ে জানলার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো বিভু। পর্দাটা সরানো। সকালের মিষ্টি রোদ একটু আগে লম্বালম্বিভাবে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন সরে গেছে। বিভু আয়েস করে বসে বাইরের দিকে তাকায়। রাস্তায় এখন অনেক লোক। গাড়ি, ঘোড়া। সেনাবাহিনীর গাড়ি ছুটছে। তারই পাশে পুলিশের টহল। সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা ব্যস্তভাব। বিভু অবাক হয়ে তাই দেখে। ব্যস্ততা নেই শুধু তারই। দূরের ঐ সারি সারি পাহাড়ের মতো সেও যেন স্থির, অচল।

অন্যদিন কথাটা মনে হলেই ওর ভীষণ কষ্ট হয়। কান্না পায়। তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে গল্পের বই-এ মন বসাতে পারে না। তবু চেষ্টা করে। আজও ওর পড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু মন তো তার খারাপ নেই। ভরে আছে। ও অপেক্ষা করে আছে সূর্য কখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে তার জন্যে। ওর চোখ বার বার টেলিফোনটার দিকে যাচ্ছে। নম্বরটা তার জানা। ডায়েল করলেই হয়তো শুনতে পাবে সেই অপূর্ব-মিষ্টি কণ্ঠস্বর। ওর ভীষণ লোভ হয়। নিজেকে শাসন করে বিভু। ঠিক করে, কালকের মতো রাত গভীর হলে তবেই ফোন করবে।

সারাটা দিন কেটে যায় একটা ঘোরের মধ্যে। ওর মধ্যে সামান্য হলেও একটা পরিবর্তন এসেছে, রণধীরের চোখ তা এড়ায় না। খুশি হয় সে। রাত্তির বেলায় অফিসে যাবার আগে বলে, কালকের মতো আজও ঘুমোবার চেষ্টা করিস। কাল রাত্তিরে ঘুমিয়েছিস বলে আজ তোর মন, মেজাজ, শরীর অন্য দিনের চেয়ে অনেক ভালো। রণধীর ভাবে, বিভু ঘুমিয়েছে বলেই তার শরীর ভালো আছে।

রাত এগাবোটা নাগাদ বিভু ফোন করলো। ও প্রান্ত থেকে উত্তব আসতেই বললো, আজ কিন্তু রং নাম্বার নয়। আপনার নম্বরেই ফোন করেছি।

বেশ করেছেন। আজও ঘুম আসছে না?

বিভু উৎসাহিত গলায় বলে, জানেন কাল রাত্তিরে আমি ঘুমিযেছি। কতদিন পর যে ঘুমোলাম।

আজও তো ঘুমোতে পাবতেন।

ঘুমোব বলেই তো ফোন কবলাম।

মানে?

আপনার সঙ্গে কথা বলাটা আমাব কাছে টনিকের মতো কাজ করেছে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

স্বচ্ছন্দে।

কাল বললেন, আপনি বাড়ি যেতে পারছেন না বিশেষ কারণে।

বিভু একটু চুপ করে থেকে বলে, আমি আর্মিতে আছি।

কার্গিল যুদ্ধ করার সময়...আচ্ছা, আপনি কাগজে যুদ্ধের খবর রোজ পড়তেন,

নিশ্চয়ই। আমার খুব ভালো লাগছে আমি একজন বীর ভীরতীয় সৈনিকের সঙ্গে কথা বলছি। তা কোন খবরটাব কথা বলছেন?

সেই পাহাড়ের চূড়ায পায়ে গুলি লাগায একটা ছেলে পড়ে যায়। পাথরে মাথা লাগায় সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার সঙ্গীরা ভাবে সে মৃত। তারা চলে যায়। ছেলেটির যখন জ্ঞান ফেরে তখন আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ। পাহাড়ের চূড়ায় সেই ম্লান আলোতেই অনেক কিছু দেখা যায়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাব মধ্যে ছেলেটি দেখে কয়েকটি মৃতদেহেব মধ্যে সেও পড়ে আছে। ওদিকে পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থায সে পাহাড় থেকে প্রায় শুয়ে শুয়ে নামতে থাকে।

মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি ঠাণ্ডাব মধ্যে সে এক মুহূর্তও থামেনি। কমাণ্ডো ট্রেনিং-এর সময় খুব রাগ হতো। ইনস্ট্রাকটারদের ধরে পেটাতে ইচ্ছে করতো। এখন বুঝলো, ঐ ট্রেনিংটার দরকার কতটা। সে যখন প্রায় নিচে নেমে এসেছে তখন সকালেব বোদ উঠে গেছে। সঙ্গী সাথীদের সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ডাকাব ক্ষমতা নেই। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে জ্ঞান হারায়।

কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা তাকে দেখতে পেয়েছিল। তাবা ছুটে এসে তুলে নিয়ে যায। তাবপর ফার্স্ট এড, হাসপাতাল, পা কেটে বাদ...

সেই ছেলেটি তাহলে...

হ্যাঁ, আমিই। আমি ক্যাপ্টেন বিভু রায়। কৃত্রিম পা লাগানো হযে গেছে। বাডি যেতে বলেছিল। যাইনি। ছেলের কাটা পা...মা সহ্য করতে পাববেন না। সামনের মাসে চেকআপ। ততোদিনে মনে হয় সড়গড় হয়ে যাবে। মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি।

অভিনন্দন...আপনি আমাদের দেশের বীর সৈনিক। আপনার মনের জোর যে কতটা তা বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চয়ই কৃত্রিম পা নিয়ে সড়গড় হযে যাবেন শীগগিরই।

হোপ সো। এই দেখুন, শুধু আমার কথাই বলছি। আপনার কথা তো কিচ্ছু জানি না।

হাসি ভেসে এলো...

আর একবার হাসবেন?

সে কী! কেন?

যেমন মিষ্টি আপনার গলাব স্বর তেমনি মিষ্টি হাসি।

কী পাগলামি হচ্ছে। ভদ্রমহিলা হেসে উঠলেন।

বিভু কান পেতে শুনলো। বললো, এড়িয়ে যেতে পারবেন না। এবাব বলুন আপনার কথা।

কী হবে শুনে—আপনার ভালো লাগবে না।

আমার কথা শুনতে কি খারাপ লাগলো?

ও তো বীরত্বের কথা, গর্বের কাহিনী। আমি আগেই কাগজে পড়েছিলাম। আপনারা, ভারতের প্রতিটি সৈনিক যে আমার বড় আপনজন।

ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। বিভুর মনে হয়, উনি বোধহয় অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলাচ্ছেন। বিভু বলে, আজ থাক, অন্য কথা বলুন। আপনার মা কেমন আছেন?

ভালো না!

আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?

একদম না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যেন একান্ত আপনজনের সঙ্গে কথা বলছি।

সত্যি? বিভুর গলায় চাপা উত্তেজনা। চাপা গলায় বলে, জানেন আপনার গলা শুনেই আমি আ...আমি না...

কি?

বলবো?

হ্যাঁ, বলুন না!

আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

কথাটা বলে ফেলেই বিভু থতমত খেয়ে গেল। মনে হলো, কথাটা বলা ওব উচিত হযনি। ও প্রান্তের নীববতা বিভুকে অস্থির করে তোলে। বলে, আমি কি অনুচিত কিছু বলে ফেলেছি?

তাই তো মনে হচ্ছে। আপনাব র‍্যাঙ্ক, আব আপনাব কথা শুনে মনে হচ্ছে। আপনার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়।

ঠিকই ধরেছেন।

আমার বয়েস কতো জানেন?

কত—উনিশ?

না। চল্লিশ। আপনার থেকে আমি পনেব-যোল বছবের বড়।

আমি বিশ্বাস করি না।

হাসলেন ভদ্রমহিলা। খুব ধীরে ধীরে বললেন, আপনাকে আপনজন কেন বলছি জানেন? আমার ছেলে...কুড়ি বছর বয়েসে দেবাদুনের মিলিটারি কলেজ থেকে পাশ করে বেরোয়। তার প্রথম পোস্টিং শ্রীলঙ্কায়। সেখান থেকে সে আব ফিরে আসেনি। মৃত্যুর পরে তাকে বীরচক্র দেওয়া হয়েছে।

বিভু কথা বলতে পারে না। ভদ্রমহিলার বয়েসেব কথা ও বিশ্বাস করতে পারে না।

অবিশ্বাসও করতে পারছে না। একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে হঠাৎই বাস্তবে নেমে এসে সে যেন হতবাক হয়ে গেছে। নিজের দুঃখ-কষ্টটাকে সে বড় করে দেখছিল। সহানুভূতি পাবার জন্যে নিজেব কথা বলেছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখী তা তো সে ভাবতেও পারেনি। তাব মুখ দিয়ে কথা সরে না। ও প্রান্ত থেকে চাপা গলার স্বর ভেসে আসে, কী হলো—ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

না।

তাহলে কথা বলছেন না যে।

বুঝতে পারছি না—কি বলবো।

আবার সেই ঝর্ণার মতো হাসি ভেসে এলো, বেশ তো আমরা গল্প করছিলাম। তাই করি না! পাগলামিটা আর নেই তো?

জানি না। আপনার গলার স্বর, আপনার হাসি—আমাকে কিন্তু এখনো সত্যি পাগল করে দিচ্ছে।

বললাম না, আমি আপনার চেয়ে পনের-ষোল বছরের বড়।

সো হোয়াট।

ছেলে যখন ছিল বুঝতেই পারছেন আমি বিবাহিতা।

আজ থাক। আমি আবার কাল কথা বলবো।

আবার ভেসে এলো সেই হাসি, সেই ভালো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলো বিভু। ভদ্রমহিলা কি সত্যি কথা বলছেন? মিথ্যেই বা বলবেন কেন। উনি বিবাহিতা। ছেলে ছিল। শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছেন। তাহলে ভদ্রমহিলা মাকে নিযে আছেন কেন? তবে কী উনি স্বামীর সঙ্গে থাকেন না?

দোটানায় দোলে বিভুর মন। সে রাত্তিরে বিভু দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

সকালে রণধীর ফিরে এলো চিন্তিত মুখে। বিভু মুখটুখ ধুয়ে বসেছিল। ওর চোখমুখের চেহাবা দেখে রণধীর বললো, মনে হচ্ছে কাল রাত্তিবে একদম ঘুমোসনি।

না।

অন্যদিনের মতো রণধীর ওকে বোঝাতে গেল না। চিন্তিত মুখে বললো, শহরের আবস্থা মোটেই ভালো নয। অনেক উগ্রপন্থী ঢুকে পড়েছে। ফুল্‌লি আর্মড। লেটেস্ট সব ওযেপন। আমাদের পাশেই আছে। আমবা বুঝতেও পারছি না। যখন পারছি তখন ক্ষতি যা হবার হযে গেছে। দেখছিস তো একটাব পব একটা ছাউনি অ্যাটাক করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীবের মতো নয, ভারতেব বীর সৈনিকরা প্রাণ দিচ্ছে উগ্রপন্থীদেব হাতে। অসহ্য। তুই দিল্লিতে মার কাছে চলে যা।

বিভুব চোয়াল শক্ত হযে ওঠে। বলে, মৃত্যুর স্বাদ আমি একবাব পেয়েছি। আর ডরাই না। এখনো এই এক পায়ে ওদের সঙ্গে লড়ে যাবার হিম্মত আমার আছে।

বিভু তুই আমায় ভুল বুঝিস না। তোর মার কথা ভেবেই বলেছিলাম।

আচ্ছা, তুই বল, এখন বাড়ি গেলে মা আমায় দেখে বুঝতে পারবেন না, ছেলে পা কার্গিলে রেখে এসেছে। মার হার্টের অবস্থা জানিস। দিদি জামাইবাবু মাকে কিছু জানাননি। তাছাড়া, এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে যেতে পাববো না।

বিভু মুখ নিচু কবে। বণধীব ভাবে, মাসিমাব কথা ভেবে বিভু এখান থেকে যেতে চাইছে না। বলে, এক মাসেব মধ্যেই তুই দেখবি অনেক স্বাভাবিক হযে যাবি। ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটাব অভ্যেস কবছিস তো?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধবে।

সেদিন শহবে আবাব একটা ব্লাস্টে বেশ কযেকজন নিবীহ মানুষ মাবা গেলেন। শহবে টেনশান বাডছে। সেনাবাহিনীব ছাউনি, বি এস এফ ক্যাম্প পর্যন্ত যখন বেহাই পাচ্ছে না তখন সাধাবণ মানুষেব নিবাপত্তা কোথায। সবকাব বড বড কথা বলছে। নিবাপত্তা নাকি বাডানো হচ্ছে। কিন্তু লাভ তো কিছু হচ্ছে না।

সেদিন বাত্তিবে ফোন কবে বিভু প্রথমেই বললো, এই শহব ছেডে কিছুদিনেব জন্যে বাইবে চলে যান না।

কেন, একথা বলছেন কেন? আমাব জন্যে কি আপনাব .

কথা শেষ হলো না বিভু বলে উঠলো, ছি ছি ও কী কথা, আমি আপনাব নিবাপত্তাব কথা ভেবে বলছিলাম।

হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, নিবাপত্তা। দেখুন, আমাব মা মৃত্যুশয্যায। আব জীবনেব কোনো মূল্য নেই। আমাব তো কেউ নেই। বেঁচে থাকা যা, না থাকাও তাই।

বলতে পাবলেন এ কথা। আমি আছি না।

ও প্রান্ত থেকে কোনো সাডা নেই। বিভু ব্যস্ত হযে ওঠে, কী হলো, কথা বলছেন না যে।

কী বলবো বলুন। আপনাব পাগলামি এখনো যাযনি। আমি আপনাব চেযে কত বড কাল বলেছি না।

আই ডোন্ট কেযাব।

আমি যে কবি।

কাব .ও হো আপনি তো বিবাহিতা, আপনাব স্বামী আছেন।

ও প্রান্ত থেকে ছাডা দীর্ঘনিঃশ্বাসেব শব্দ ভেসে এলো এ প্রান্তে। তাবপব বিভুব কানে এলো চাপা গলা, আমি ডিভোর্সি। ভালোবেসে বিযে কবেছিলাম। তখন আমাব আঠাবো উনিশ বছব বযেস। মা বাববাব বাবণ কবেছিলেন। শুনিনি। একবাবও ভাবিনি তাব সঙ্গে মনেব মিল হবে কিনা। বিযেব এক বছবেব মধ্যে আমি মা হলাম। ভুল ভেঙে গেল তাবপবই। ভীষণ ড্রিঙ্ক কবতেন তিনি। মদেব ঘোবে গাযে হাত পর্যন্ত তুলতে আটকাত না। তাব জন্যে কিন্তু কোনো অনুশোচনা ছিল না। আমি গান ভালোবাসি, পডতে ভালোবাসি। উনি তাব ঠিক উল্টো। ফলে ভুল বোঝাবোঝি বাডতে লাগলো। বাডতে লাগলো ড্রিঙ্ক কবাব মাত্রা। আমায মাবত। সহ্য কবতে পাবলাম না। এক বছবেব ছেলেকে নিযে মাব কাছে চলে এলাম। মা বললেন, আমি জানতাম এমনটা হবে।ওব সঙ্গে যে কোনো দিক দিযেই তোব মিল নেই। ডিভোর্স হযে গেল। ছেলেকে মানুষ কবলাম। একদিন সেও চলে গেল। এবাব বলুন, আমাব জীবনেব কি কোনো দাম আছে?

আছে। আমার কাছে। আমি আপনাকে ভালোবেসেছি। বিশ্বাস করুন আমি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসি।

লোভ দেখাবেন না প্লিজ। জীবনে অনেক দুঃখ পেযেছি। নতুন কবে দুঃখকে ডেকে আনতে চাই না।

দুঃখ নয়, আনন্দে-সুখে আমি আপনার জীবন ভরিয়ে দেবো। আমাকে এতোটা স্বার্থপর ভাবছেন কেন। আমার জীবন শেষের দিকে, আপনার সবে শুরু। আমি কি তাকে নষ্ট হতে দিতে পারি।

নষ্ট হতে? কী বলছেন আপনি। আপনি জানেন না, আপনাকে আমি কতোটা ভালোবাসি।

একে কী বলবো...পাগলামি, বোকামি, না.....

যা ইচ্ছে বলুন। একটা অনুরোধ করবো, শুনবেন?

কি?

আপনাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

কী দরকার। এই তো বেশ। দূরভাষের আলাপ দূরেই থাক।

না, তা হতে দেবো না। আপনার কথা, আপনার হাসি শুনে মনে মনে আপনার যে মানস প্রতিমা গড়েছি, দেখতে চাই তার সঙ্গে মিলিয়ে...একবার, শুধু একবার।

যদি না মেলে। সহ্য করতে পারবেন?

ভুলে যাবেন না আমি সৈনিক! মৃত্যুর স্বাদ পাওয়া সৈনিক। আমরা সব সহ্য করতে পারি।

কথাটা আর বলবেন না। আমার বড় ভয় করে।

বিভু হাসলো। বললো, সৈনিকদের কাছে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। কথাটা জানেন না?

জানি না আবার। আমিও তো ভুক্তভোগী। একার হাতে তিলে তিলে যাকে মানুষ করেছিলাম, হঠাৎ জানলাম সে আর নেই। আর কোনোদিন তাকে দেখতে পেলাম না। জলজ্যান্ত ছেলেটা আমার ছবি হয়ে গেল।

অ্যা'ম সরি। আমি আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি।

সে আমি জানি। এও জানি, এত বড় পৃথিবীতে অন্তত একজন আছে, যে আমার কথা ভাবে, আমার জন্যে চিন্তা করে।

সত্যি বলছেন?

এর চেয়ে বড় সত্যি আর কী কিছু আছে। বিভু...

উঃ...নিজের নাম ওঁর গলায় শুনে কেঁপে উঠলো বিভু। আস্তে আস্তে বললো, আর একবার বলুন...

বিভু...এবার ছাড়ি কেমন...গুড নাইট...

বিভু কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ও বারবার ওঁর গলায় নিজের নামটা শুনছে। ভদ্রমহিলা ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। ওরও সে শুভরাত্রি বলা উচিত ছিল—কিছুই মনে পড়লো না। বিভু ফোনটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বিভু বুঝতে পেরেছে, সে একা নয়, তার ভালোবাসার ছোঁয়া ওঁর মনেও লেগেছে। ফোনটা নামিয়ে রেখে খুশি হয়ে শুয়ে পড়ে বিভু। আর কোনো বাধা সে মানবে না। মা দুঃখ পাবেন, দিদিরা বিরক্ত হবে। সে অপারগ। তার বাবা তো মায়ের চেয়ে পনেরো বছরের বড় ছিলেন। ছেলেরা বড় হলে কিছু হয় না, মেয়েরা বড় হলে কেন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

সে রাত্তিরে বিভু ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখের সামনে আর ভেসে উঠলো না পাহাড়ের মাথায় মৃতদের মধ্যে তার শুয়ে থাকার দৃশ্যটা!

পরদিন সকালে রণধীর এসে দেখলো, বিভু ঘুমোচ্ছে। রণধীর লক্ষ্য করে বিভুর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। দেখে খাটে একটা গল্পের বই রয়েছে। বইটা সেই লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছিল। বোধহয়, বইটা পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভু। কোনো ঘটনা হয়তো এনে দিয়েছিল তার ঠোঁটের কোণের হাসিটা। বিভুকে ডাকলো না রণধীর। দাড়ি কামিয়ে চান কবতে গেল। চান করে এসে ডাকলো বিভুকে।

এ কী, তোর চান-টান হয়ে গেছে। আমায় ডাকিসনি! কত বেলা হয়ে গেছে।

হোক, তুই ঘুমোচ্ছিস—এটা দেখলেই যে আমার মন ভরে যায়।

হাসলো বিভু। বললো, এবার থেকে দেখবি আমি রোজ ঘুমোব।

গুড। এই তো চাই।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে রণধীর বললো, ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট ভালো নয় রে।

কেন, কী হয়েছে?

ইনডিপেনডেন্স ডের আগেই বড় ধরনের আঘাত হানবে উগ্রপন্থীরা। শহরের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

প্রোটেকশান বাড়ানো হচ্ছে না কেন?

হচ্ছে তো! কিন্তু এতো বেশি উগ্রপন্থী ঢুকে পড়েছে যে তাদের খুঁজে বেব করাই মুশকিল।

তা তো বটেই।

সেইজন্যেই তো তোকে দিল্লি যেতে বললাম। তুই কথাই শুনলি না।

আমার এখন যাওয়ার উপায় নেই রে।

জানি, তুই কেন বাড়ি যেতে চাইছিস না। তবু আমি বলবো, তোর এখন দিল্লিতে মাসিমার কাছে চলে যাওয়া উচিত।

বিভু হাসলো। বললো, তোকে আগেই বলেছি না, আমাব পক্ষে এখন এই শহব ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব।

অসম্ভব...কিন্তু কেন?

জানতে পারবি।

রণধীর চুপ করে গেল।

সারাদিন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করলো বিভু। আর সে কোনো বাধা মানবে না। ওঁর মনের নাগাল যখন পেয়েছে তখন আব কিসেব পবোযা। মা প্রথমটায দুঃখ পাবেন, তার পরে ছেলের মুখ চেযে মেনে নেবেন।

রাত্তিরে ফোন কবলো বিভু। বললো, আমি কিন্তু ডিসিশান নিযে ফেলেছি?

কিসের?

বিভু একটু চুপ করে থাকে। কথা বলতে বাধে। যদি উনি এক কথায না কবে দেন। বিভু সৈনিক। কম্যান্ডো ট্রেনিং নেওয়া ছেলে। কোনো বাধা সে মানবে না। দরকাব হলে জোর করবে। বললো, বিয়ের।

বিয়ের? বিস্ময় ঝরে পড়ে ভদ্রমহিলার গলায।

হ্যাঁ, আমি কোনো বাধা মানবো না।

হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, সাধে কী আব আপনাকে ছেলেমানুষ বলি।

না. .না, ও সব কথা বলে আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এতোদিনে যার আমার নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না—সে আমায় বিয়ে করবে? পনেরো বছরের বড় ডিভোর্সিকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমার নাম ধাম, পরিচয়, আমি কেমন দেখতে কিচ্ছু জানা নেই...

কোনো দরকার নেই। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনিও...

আমি কি?

আমি জানি আপনি আমাকে...আপনি আমাকে...

দেখলেন তো...আপনি নিজেই নিশ্চিত নন।

না, আমি নিশ্চয়ই জানি আপনিও আমাকে...

বিভুর কথা শেষ হলো না হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। বিভুর মনে হলো, হাসির সেই ঝর্ণাধারায় কেমন যেন ছন্দপতন ঘটেছে। হাসির মধ্যেই যেন চাপা কান্না ফুটে উঠছে। একটু সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, ঠিক আছে বিভু, তুমি বাড়ি যাও। মাকে, দিদি-জামাইবাবুকে বলো। দ্যাখো ওঁরা কী বলেন। ফিরে এসে আমায় বোল।

আমি তুমি বলতে পারি?

তোমার ইচ্ছে।

ঠিক আছে আমি দিল্লি যাবো। যাবার আগে আমার একটা কথা তোমায় শুনতেই হবে।

কি কথা?

আমি একবার...অন্তত একবার তোমায় দেখতে চাই।

ও প্রান্তে সাড়া নেই। তারপর মৃদু স্বর ভেসে এলো, আমার টেলিফোন নম্বর যখন তোমার কাছে আছে তখন ইচ্ছে করলেই টেলিফোন এনকোয়ারি থেকে অ্যাড্রেস জেনে নিযে তুমি আসতে পারতে। তুমি তা করোনি। আমি তোমার মনোভাব অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আমি বুঝেছি তোমার নেচারের সঙ্গে আমার মিল আছে। ঠিক আছে কবে দেখা করতে চাও?

কালই। কাল বিকেলে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে।

আমায় চিনবে কি করে?

ঠিক চিনে নেবো।

আবার পাগলামি। শোন, আমি আকাশী নীল রঙের শাড়ি পরে থাকবো। আমার হাতে একটা লাল রঙের রুমাল থাকবে।

আমার হাতে থাকবে একটা গোলাপ ফুল। আমার উপহার।

হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা, আমি গোলাপ ফুল পছন্দ করি জানলে কি করে।

বিভু জানতো না। কায়দা করে বললো, আমার মন দিয়ে...

ছাড়ি তাহলে। কাল বিকেলে তো দেখা হচ্ছে...

হ্যাঁ, চারটের সময়...গুড নাইট।

বিভু ফোন নামিয়ে রাখলো। ও আনন্দের সাগরে ভাসছে। কাল সে তার মানস প্রতিমাকে দেখতে পাবে। পরশুই সে দিল্লি যাবে। মা আপত্তি করবেন, কাঁদবেন, দিদিরা ক্ষেপে যাবে। একমাত্র ভাই—সে বিয়ে করবে কিনা তার চেয়ে বড় একটা মেয়েকে। ডিভোর্সি। ছেলে পর্যন্ত ছিল। বিভু জানে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলেই

রাজী হবে। তারপর হাসি খেলে যায় বিভুব মুখে। সুখস্বপ্নে ভাসতে ভাসতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিনটা যে বিভুর কীভাবে কেটে যায়। বিভুব খুশি খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে রণধীরকিছু বলে না। তার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো...বিভু তা খেয়ালও করে না। দুপুর বেলায অফিস থেকে ফোন এলো—এমারজেন্সি কল। এক্ষুণি তাকে অফিসে যেতে হবে। শহরের কোথায নাকি সাঙঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। বিভু নিজের মনে ছিল। কোনো কিছুই আজ তাকে যেন স্পর্শ করছে না। সে শুধু ঘড়ি দেখছে আর ভাবছে চারটে বাজতে এতো কেন দেরি হচ্ছে।

ছটফট করে বিভু। পরিচিত নম্বরে দু'চারবার ফোন করতে গিয়েও করলো না। দিনের বেলায় কোনোদিন তো ফোন করেনি। ওর মনে হয় ঘড়ির কাঁটা যেন নড়ছে না। রণধীরটা বাড়ি থাকলে ভালো হতো। কথা বলে খানিকটা সময় কাটানো যেতো। বারবার ঘড়ি দেখে বিভু।

তিনটের সময় সে জামা-প্যান্ট পরে রেডি। কৃত্রিম পা লাগিয়েই ও যাবে। ক্র্যাচ নেবে না। ক্র্যাচ নিলে হয়তো উনি চিনতে পারবেন না। কৃত্রিম পায় ও মোটামুটি চলতে পারে। আস্তে আস্তে হাঁটে। হাতে একটা লাঠি নেয়। লাইব্রেরিটা ওদের বাড়ির খুব কাছে। আস্তে আস্তে যাবে বলে ও সাড়ে তিনটের সময়ই বেরিয়ে পড়ে। বাগান থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে নেয়। গোলাপ ওর হাতে থাকবে। ওকে চেনাব উপায়। ওঁকে আব কষ্ট করে ওকে চিনে নিতে হবে না। আকাশী নীল রং শাড়ি আর লাল রুমাল দেখে ওই চিনে নেবে।

পাঁচ মিনিটের পথ বিভুর পনেরো মিনিট লাগলো। লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে বিভু অধীর অগ্রহে তাকিয়ে রইলো। ও খেয়ালও করলো না পথঘাট অনেক ফাঁকা ফাঁকা। কোনো মেয়ে আসছে দেখলে বিভু সাগ্রহে তাকায়। হতাশ হয়, আকাশী রং নীল শাড়ি কারো পরনে নেই। লাল রুমালও কারো হাতে দেখছে না।

বারবার ঘড়ি দেখে বিভু। চারটে বেজে গেছে কখন। ওর মনের মধ্যে উত্তেজনাব যে স্রোত বইছিল তা অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে। ভীষণ হতাশ লাগছে। আশাভঙ্গেব জ্বালার সঙ্গে তীব্র অভিমান ওব মনকে গ্রাস কবতে চাইছে। ও বিশ্বাস করতে পাবছে না, ওর মানসী ওকে ভাওতা দেবেন।

তবে কি উনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নাকি, মার কিছু হলো। শঙ্কিত হযে ওঠে বিভু। অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিভুর মনপ্রাণ আনচান কবে ওঠে। অস্থির হয়ে ও যতটা দ্রুত সম্ভব পা চালিয়ে গিযে ঢোকে টেলিফোন বুথটায়। যতবাব ডাযেল করে এনগেজড টোন আসে। ও বুঝতে পারে না কী করবে। কার কাছে যাবে।

বিভু বাড়ি ফিরে আসে। ছ'সাতবার ফোন কবে। একই অবস্থা। সেই এনগেজড টোন। বিভু টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে। নিজের পরিচয় দিযে অনুরোধ করে ফোনটা খারাপ কিনা জানাতে। একটু পরেই উদ্বিগ্ন গলায় ভদ্রমহিলা বলেন, ঐ এরিযায আজ দুপুরে প্রচণ্ড ব্লাস্ট হযেছে। দুটো মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং স্ম্যাশড হয়ে গেছে। অনেক সিভিলিয়ান মারা গেছেন। ঐ এরিয়ার সব ফোন ডেড।

হ্যালো, ছাডবেন না—ওটা কোন এরিযা বলতে পারেন?

ওর কথা পুবো শোনার আগে ভদ্রমহিলা লাইন কেটে দিলেন।

বিভু আর্মি এক্সচেঞ্জে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলো।

বিভুর পরিচয় পেয়ে ওরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলো।

বিভু একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে গেল। প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। বিভুর পরিচয়পত্র দেখে ওরা যেতে দিলো। দুটো অত বড় বাড়ি গুড়িয়ে গেছে। এই বাড়িতেই কি ও থাকতো? বিভু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্ধার কাজ চলছে পুরো দমে। রণধীর সেখানেই ছিল। ওকে দেখে এগিয়ে এলো, তুই এখানে?

তোর মোবাইল ফোনটা দে তো?

বিভু টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করে নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করলো, অ্যাড্রেসটা কাইন্ডলি বলুন না।

ওরা বাড়ির নম্বর বলে দিলো। রাস্তার নাম।

রণধীর, এই রাস্তায় এত নম্বর বাড়ি কোনটা বলতে পারিস?

কেন?

দরকার আছে।

এইখানে আজ দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল যে বাড়িটা—সেটাই।

বিভু দু'হাতে মুখ ঢাকে। ও পড়ে যাচ্ছিলো। রণধীর ওকে ধরে ফেলে একটা চেয়ার আনিয়ে বসিয়ে দেয়। বলে, কী হয়েছে—কেউ ছিল এই বাড়িতে?

হ্যাঁ। কেউ বেঁচে নেই না?

না।

সব বডি উদ্ধার হয়েছে?

না, এখনো পর্যন্ত তিরিশটা...

কোথায় সেগুলো?

কেন?

একবার নিয়ে যাবি?

রণধীব কোনো কথা বললো না। রণধীরের ইশারায় একটা জিপ এগিয়ে এলো। বিভুকে নিয়ে রণধীর চলে এলো হাসপাতালে।

একটা ঘরে সার সার তিরিশটা বডি সাদা কাপড়ে ঢাকা।

বিভু অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখ ভরে আসে জলে। ওর হাতে তখনো গোলাপ ফুলটা ধরা ছিল।

আস্তে আস্তে গোলাপ ফুলটা সে নিচে নামিয়ে রাখে। দু'ফোটা চোখেব জল পড়ে ফুলটাব ওপব।

ভালোবাসার সংলাপ

আশিস ঘোষ

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিন্দু হঠাৎ বলে বসল, একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?
—কী প্রশ্ন?

আড় চোখে চেয়ে বিন্দু বলল, সত্যিই কী আমাকে ভালবাসো?

—কেন বল তো? এসব জানতে চাইছ কেন?—

হাত ছেড়ে দিয়ে বিন্দু বলল, বলই না—

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারলাম না। দু'দিকে হাত ছাড়িয়ে বললাম, এই এতটা ভালবাসি।

ঠোঁট উল্টে বিন্দু বলল, ছাই ভালবাসো—আমার মতো আবও কত জন আছে তোমার—

ওর কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আমি তো সবাইকেই ভালবাসতে চাই। কিন্তু আমাকে তো কেউ ভালবাসে না—

বিন্দু থমকে দাঁড়ায়। এ'কথা বলতে পারলে?

ওর হাত ধরে টানলাম।—থামলে কেন?

বিন্দু আবার চলতে শুরু করল। আমিও হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে আমবা মিউজিয়ামেব সামন এসে পড়লাম। বন্ধ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে, বিন্দু অদ্ভুত চোখে আমাব দিকে চেয়ে রইল। ওপাশে ময়দান জুড়ে সবুজ ঘাস। গঙ্গাব দিক থেকে একখণ্ড কালো মেঘ উঠে আসছে। গায়ে আঁচল জড়াতে জড়াতে বিন্দু বলল, তোমার হাতে আর কতটা সময় আছে?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—আজ আর কোন কাজ নেই। কিন্তু কেন বল তো?

—একটা কাজ করবে?

—বল না, কী করতে হবে—

একটু এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বিন্দু বলল,—চল, আমরা ভালবাসা খুঁজে দেখি। যদি না পাই তো—

বিন্দুর আরও কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালাম।—না পাওয়াব প্রশ্ন পবে। আগে দেখাই যাক না।—কিন্তু একী! আমার ছাতাটা?

—ছাতা?

—হ্যাঁ গো, ছাতা।—এতক্ষণ আমার হাতে ছিল—

অবিশ্বাসের চোখে আমাকে দেখল বিন্দু। কী যেন ভাবল।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—এতক্ষণ যে যে জাযগায় দাঁড়িযেছ, খেয়াল আছে?

—খুব আছে—

তবে চল, সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখি। ছাতা যদি ফেরত পাওযা যায়, তবে বুঝতে হবে, যে ছাতা ফেরত দিল সে তোমাকে ভালবাসে—

ঘুড়ে দাঁড়িয়ে আবাব ধর্মতলাব দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গঙ্গার দিক থেকে উঠে

আসা খণ্ড মেঘটা কখন যে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, খেয়াল করিনি। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে।

লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে পান-সিগারেটের দোকান। কিছুক্ষণ আগেই এখান থেকে সিগারেট কিনেছি। দু'জনেই কোল্ড-ড্রিংক্‌স্ খেয়েছি। পুরনো খদ্দের আমি! লোকটা আমাকে দেখে হাসল। কোনো রকম ভনিতা না করেই জিজ্ঞেস করলাম—এখানে একটা ছাতা ফেলে গিয়েছি?

—নেহি বাবু, কই ছোড় যানেসে তো, হামি রাখ্‌দেতা।—

—কেউ নিয়ে যায়নি তো?

—নেহি বাবু—

বিন্দু আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। আর কথা না বাড়িয়ে রাস্তা পেরুলাম। পেছনে আসতে আসতে বিন্দু বলল—দেখলে তো, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।—ভালবাসা তো বহুদূরস্ত।

মনটা একটু দমে গেল। কয়েক কদম এগিয়ে এবার একটা বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়ালাম। লোকটা যে আমার খুব চেনা, তা নয়। তবে বহুবার এখানে এসেছি। বই দেখে কতদিন কত সময় কাটিয়েছি।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার এখানে কোনো ছাতা পেয়েছেন?

—ছাতা? কই না তো—

—অটোমেটিক একটা ছাতা দেখেননি?

হাসল লোকটা।—দেখলে তো রেখেই দিতাম—

কথা বাড়ালাম না। এভাবে খুঁজে লাভ নেই। ছাতা কেউ পেয়ে থাকলেও এই বর্ষার মরশুমে ফেরত দেবে না।

বিন্দু কিছু বলল না। একটু যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে। কী ভাবছে, কে জানে। ছাতা হারিয়ে মনটা বেশ দমে গেছে। শখ করে কিছুদিন আগে বিন্দুই কিনে দিয়েছিল। মন খারাপ তো হবেই। ছাতাটাকে আমি কী ভালবেসে ফেলেছিলাম? ছাতা নিয়ে হাঁটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। হাতটা এখন খালি থাকায়, কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। আসলে বিন্দু পাশে থাকায়, আমি কী ছাতাটাকে ভুলে গিয়েছিলাম? বিন্দুর সঙ্গে যদি আজ দেখা না হত, তা হলে কী রকম হত?...হাঁটতে হাঁটতে আমরা মেট্রো সিনেমার সামনে এসে পড়লাম। এ বৃষ্টিতে হাঁটা সম্ভব নয়। চলো কোথাও বসা যাক। বৃষ্টি থামলে দেখা যাবে। বিন্দু মাথা নাড়ল। ওকে নিয়ে মেট্রো গলির একটা রেস্তোরায় ঢুকলাম।

কেবিনে না বসে, বাইরেই বসলাম। ছোট সোফায় দু'জন বসা যায়। সামনে টেবিল। খোলা দরজা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। একটু আগেও ফুটপাথে লোক গমগম করছিল। এখন ফাঁকা। ময়দানের দিকটা কালো হয়ে এসেছে।

বিন্দু ব্যাগ খুলে রুমাল বের করল। মুখ-গলা মুছল। রুমালটা ব্যাগে রেখে, একটা রঙচঙে বই বের করল!

—কী বই ওটা?

—দেখতেই পাবে—মুচকি হেসে বিন্দু বইয়ের পাতা ওল্টাতে শুরু করল। বেয়ারা চা দিয়ে গেছে। শুধুই চা। এখন আর কী-ই বা কবাব আছে? চায়ের কাপে চুমুক দিতে

দিতে বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে। বিন্দু তবু একটা কাজ জুটিয়েছে। বইয়েব পাতা উল্টে যাচ্ছে। কিন্তু আমি কি করি? কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে? খুব মনোযোগ দিয়ে বইটা দেখছে বিন্দু। প্রতিটি পাতাব প্রতিটি লাইনেব ওপব আঙুল বোলাতে বোলাতে কী যেন খুঁজছে। এত তন্ময় হযে কী দেখছে? বইটাতে কী আছে? আমি যে চুপচাপ পাশে বসে, তা যেন ওব খেযালই নেই। ছাতা হাবানোব অস্বস্তি তাব চাইতে, এটা তো আবও বিশ্রি লাগছে। আব থাকতে না পেবে বললাম,—কী ব্যাপাব, কী খুঁজছো বইতে? লাজুক চোখে চোবা চাউনি দিল বিন্দু। মুচকি হাসছে। একবাবও মুখ তুলে তাকাল না। বইয়ের পাতা উল্টেই চলল।

চা শেষ করে সিগাবেট ধবালাম। মুখ ভর্তি ধোঁযা ছুঁড়ে দিলাম ওব দিকে।

—এই, কী হচ্ছে?

আবার ধোঁয়া ছুঁড়লাম। বই বন্ধ করে, বিন্দু আমার দিকে চাইল। হাতেব বইটা আমাব দিকে ঠেলে দিল।

—নামটা দেখছ?

—মলাট দেওয়া বইয়ের নাম দেখব কী কবে? আমাব দিকে আবও ঠেলে দিল বইটা।—দ্যাখোই না—

বিবক্ত হয়ে বললাম, দূব ওসব বই-টই ছাড়ো—এমন একটা বৃষ্টিব বিকেলে তুমি বই নিয়ে পড়লে—

খানিকটা গা ঘেঁসে এল বিন্দু।—বাগ কবো কেন? একটা শব্দ খুঁজছিলাম।—-

বইটা সামনে এনে প্রথম পাতাটা উল্টোলাম।—কী শব্দ? আমাব দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বিন্দু বলল—'ভালবাসা'—

না হেসে পারলাম না।—শেষ পর্যন্ত বইতে 'ভালবাসা' খুঁজতে হবে?

—দ্যাখো না। আমি তো তিবিশ পৃষ্ঠার মধ্যে শব্দটা একবাবও পেলাম না। মুখ নিচু কবে বিন্দু আস্তে আস্তে বলল,—দেখি কে প্রথম শব্দটা খুঁজে পায—

মন্দ নয় খেলাটা। মলাট খুলে বইযেব নামটা দেখলাম ঃ—'ভালবাসাব সংলাপ'। নাম দেখে তো মনে হচ্ছে, 'ভালবাসা' শব্দটা বইতে অন্তত তিনশ তেত্রিশবাব আছে। পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। কিন্তু কই 'ভালবাসা' কোথায? পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বইয়ের প্রায় অর্ধেকটা শেষ হয়ে যেতেই, বিন্দু বইটা আমাব হাত থেকে নিযে নিল।—এবার আমি দেখি—

বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে বিন্দু। হাওয়াব ঝাপটায পাতাগুলো যত এলোমেলো হযে যাচ্ছে, ওব চোখে মুখে অস্বস্তিব ভাবটা তত স্পষ্ট হযে উঠছে।—আশ্চর্য বইতে এত শব্দ—কিন্তু যে শব্দটা খুঁজছি তা নেই—

বেগে যাচ্ছে বিন্দু। আমারও বাগ হচ্ছে। হাজাব হাজাব শব্দ আছে বইতে। কিন্তু 'ভালবাসা' শব্দটাই নেই। সব ক'টা পাতা উল্টে, হতাশ হযে বইটা একপাশে সবিযে বাখে বিন্দু। অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

আলতো কবে বইটা তুলে নিই। বিদেশী বই। প্রেম কবতে হলে বা কাউকে প্রেম নিবেদন কবাব সময, কী ভাবে কথা বলতে হবে, বইতে সে ধবনেব কিছু সংলাপ দেওযা আছে। বিভিন্ন নাটক ও উপন্যাসেব উদ্ধৃতি আছে। এ ধবনেব বইতে অসংখ্যবাব 'ভালবাসা' শব্দটা থাকা উচিত। নেই কেন? নাকি, ঠিক মতো খুঁজিনি আমবা? বিন্দুব

দিকে চাইলাম। চোখাচোখি হতেই উঠে দাঁড়াল।—চলো, বৃষ্টি থেমে গেছে—খুব তাড়াতাড়ি বইটা ব্যাগে পুরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ফুটপাতে রাস্তায় আবার ভিড়। এখনো মাঝে মাঝেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়েছে। আমাদের দু'জনের কারুর হাতেই ছাতা নেই। মাথায় রুমাল দিয়েছি। বিন্দুর মাথায় ঘোমটা। বউ বউ লাগছে। বলব ওকে? কিন্তু ও যেভাবে গম্ভীর হয়ে মুখ নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে, তাতে কিছু বলার সাহস হয় না। ভালবাসা খুঁজতে গিয়ে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ওর কী হয়েছে, কে জানে। ও-ই তো 'ভালবাসা' খোঁজার কথা বলল। রাস্তায় ঘুরে যে ভালবাসা পাওয়া যায় না, এটা ওর বোঝা উচিত ছিল। ওই বইটা? 'ভালবাসার সংলাপে' ভালবাসা শব্দটাই নেই। নাকি শব্দটা ছিল, আমরাই খুঁজে পাইনি?

হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্লানেটোরিয়ামের কাছে এসে পড়েছি। এতটা রাস্তা পাশাপাশি হেঁটে এলেও, কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। ওর মুখের থমথমে ভাবটা এখনো যায় নি। আমরা রাস্তার ধার ঘেঁসে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কী করে যে উল্টোদিকে যাব, তার উপায় নেই। পরপর সব গাড়ির লাইন। চওড়া রাস্তায় দারুণ জোরে ছুটছে। ভিজে রাস্তায় টায়ারের শব্দ। পায়ের নিচে পাতাল রেলের টানেল। গা শিরশর করছে। যদি হঠাৎ ধস নামে? কয়েকদিন আগে নাকি সোভিয়েতে আণবিক বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাতাসে বা এই বৃষ্টির ফোঁটায় তেজস্ক্রিয় কিছু নেই তো?

আমাদের সামনে এখন বৃষ্টি ভেজা ময়দানের সবুজ ঘাস। বিকেলের রোদ না থাকায়, গোটা ময়দান ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। প্ল্যানেটোরিয়ামের ঘড়িতে ছ'টা পনের। আর একটা দিন চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বিন্দু কী ভাবছিল জানি না, আলতো ভাবে আবার আমার হাত ধরল—এখন তোমার কোনো কাজ আছে?

—কেন বল তো?

—একটা কাজ করবে?

—বলনা, কী করতে হবে—

আরও একটু গা ঘেঁসে দাঁড়ায় বিন্দু। করুণ মুখে আমার দিকে তাকায়।—চলনা, আর একবার 'ভালবাসা' খুঁজে দেখি।—এবারও যদি না পাই তো—ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামে বিন্দু। অতর্কিতে প্রায় নাটকীয় ভাবেই, দু দিক দিয়ে ছুটে আসা সব গাড়িকে উপেক্ষা করে, উল্টোদিকের ফুটপাতে চলে যায়। আমাদের মাঝখানে এখন একশ—কি দেড়শ ফিট চওড়া রাস্তা। দু'দিক দিয়েই প্রচণ্ড বেগে গাড়ি ছুটে আসছে। বিন্দুর মতো নির্ভয়ে আমি রাস্তা পেরুতে পারছি না। ও আমার দিকে চেয়েই আছে। অপেক্ষা করছে। আমরা আবার 'ভালবাসা' খুঁজতে শুরু করব। আমার এক পা রাস্তায়,আর এক পা ফুটপাতে। মাঝখানের কালো রাস্তা ক্রমশ আরও চওড়া হয়ে যাচ্ছে।

তার নাম অঞ্জনা

রমানাথ রায়

সন্ধে ছ'টায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে কেউ নেই। মা-বাবা তীর্থ করতে কাশী গেছেন। আর কাজের লোক দেশে গেছে তিনদিন ছুটি নিয়ে। আমি এখন একা। ঘরের মধ্যে একা থাকতে ভীষণ খারাপ লাগে। ভাবলাম কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে গল্প করি। কিন্তু আজ সারাদিন অফিসে বড়ো ধকল গেছে, শরীরটা ক্লান্ত হয়ে ছিল। তাই বাড়ির বাইরে বেবোতে আর ইচ্ছে হল না। তাহলে কী করব এখন? বসে বসে বই পড়ি। একটা বই নিয়ে বসলাম। দু'পাতা পড়ে আর ভালো লাগল না। বই বন্ধ করে রেখে দিলাম। এবার ইচ্ছে হল টিভি দেখি। টিভি খুলে পাঁচ মিনিট বসে রইলাম। তারপর বন্ধ করে দিলাম। টিভি দেখতে ভালো লাগল না। তাহলে কি গান শুনব? গান শুনতেও ইচ্ছা হল না। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। পড়তেই মনে হল আমি কতদিন ভালো করে স্বপ্ন দেখিনি, কতদিন সপ্নে সুন্দরী নারীর হাত ধরিনি। অথচ আমি দিনের পর দিন ভেবে গেছি বিখ্যাত বিয়াত্রিচের কথা, ভেবে গেছি ওফেলিযাব কথা। কালিদাসের শকুন্তলা, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, রবীন্দ্রনাথের লাবণ্য, শবৎচন্দ্রেব রাজলক্ষ্মী, জীবনানন্দের বনলতা সেন আমাকে কতদিন আচ্ছন্ন করেছে। অথচ আজ পর্যন্ত আমি কারও দেখা পাইনি। তারা আমার স্বপ্নেই থেকে গেছে। এই মুহূর্তে মনেমনে চাইলাম এদের একজন কেউ এসে দাঁড়াক আমার সামনে, আমার হাত ধরুক, আমাকে নিয়ে যাক এখান থেকে অনেক দূরে।

হঠাৎ ডোর-বেলের শব্দ। কে এল এখন? চোখ খুলে উঠে বসলাম। বিছানা থেকে নেমে দরজা খুললাম। খুলতেই চমকে উঠলাম। একী। আমার সামনে এক অপূর্ব সুন্দবী দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে লেগে আছে অদ্ভুত এক হাসি। মনে হল স্বর্গ থেকে কোনো দেবতা অনুগ্রহ করে এই সুন্দবীকে আমার কাছে পাঠিযে দিয়েছে। কিন্তু তা কী কবে সম্ভব? এ নিশ্চয় অন্য কেউ ভুল কবে এখানে এসেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কাকে চাই?

সুন্দরী বলল, আমাকে চিনতে পারছ না?

এবার সুন্দরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, হ্যাঁ, খুব চেনা মনে হচ্ছে। কী নাম যেন তোমাব?

সুন্দরী ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল, আমার কোনো বিশেষ নাম নেই। যে যে-নামে পারে আমাকে ডাকে। তুমিও আমাকে যে নামে ডাকতে চাও ডাকতে পারো।

আমি দরজা বন্ধ করে সুন্দরীকে সোফায় এনে বসালাম। বসিযে জিজ্ঞেস কবলাম, আমি যদি তোমায় বিয়াত্রিচে বলে ডাকি?

—ডাকতে পারো।

—যদি ওফেলিয়া বলে ডাকি?

—ডাকতে পারো।

—যদি শকুন্তলা বলে ডাকি?

—ডাকতে পারো।

—যদি লাবণ্য বা রাজলক্ষ্মী বা বনলতা বলে ডাকি?

—ডাকতে পারো।

এবার একটু থেমে বললাম, অনেক বছর আগে আমি একটা মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। সে এখন কোথায় তা জানি না। তার নাম ছিল অঞ্জনা। আমি তোমায় অঞ্জনা বলে ডাকব?

—বেশ, তাই ডেকো।

আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। অঞ্জনা বসে ছিল। আমি এবার তার পাশে এসে বসলাম। বসে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় থাক?

অঞ্জনা বলল, আমি সাবানের ফেনায় থাকি, সেন্টের শিশিতে থাকি, বসন্তের ফুলে থাকি, ক্যালেন্ডারের পাতায় থাকি, বিজ্ঞাপনের মডেলে থাকি। এককথায় আমি সব পুরুষের স্বপ্নে থাকি। তুমি এখনও আমাকে চিনতে পারছ না!

হ্যাঁ, এবার মনে হল আমি অঞ্জনাকে চিনেছি। কৈশোরে নির্জন রাস্তায় একা হাঁটতে হাঁটতে আমি একদিন এর কথাই ভেবেছি। যৌবনে পা দিয়ে রোজ ঘুমের মধ্যে আমি একেই দেখেছি। আমার হারিয়ে যাওয়া অঞ্জনার মধ্যে এই অঞ্জনাকেই দেখেছি। বিয়াত্রিচে, ওফেলিয়া, শকুন্তলা, কপালকুণ্ডলা, লাবণ্য, রাজলক্ষ্মী ও বনলতা সেনের মধ্যে একেই পেয়েছি। আজও আমি একেই সিনেমার পর্দায়, টিভির বিজ্ঞাপনে খুঁজে বেড়াই। আমার এখন বয়স বেড়েছে। মুখের চামড়া আর আগের মতো চকচক করে না। অথচ অঞ্জনার বয়স এতটুকু বাড়েনি। যেমন ভাবি, তেমনি আছে। সেই কুড়ি কী বাইশ বছর বয়স। সেই ফর্সা রং, লম্বা পা, টানাটানা চোখ, মাথাভর্তি চুল, সরু কোমব—আমার স্বপ্ন। আমি অঞ্জনাকে খুব আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে একটা অনুরোধ করব?

—কী?

—আজ আমি একা। বাড়িতে কেউ নেই। আজকেব বাতটা তুমি আমার কাছে থাকবে?

—কথা দিতে পাবছি না।

—কেন?

—আমি বেশিক্ষণ একজনেব সঙ্গে থাকতে পারি না। আমার ভালো লাগে না।

এই সময় ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—আপনার এখানে কি বিয়াত্রিচে আছে?

না।—বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, কে ফোন করেছিল?

হেসে বললাম, বোধহয় দান্তে।

অঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল, দান্তের জন্য কষ্ট হয়। এখনও আমাকে ভুলতে পারল না।

আবার ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—আপনার এখানে কি ওফেলিয়া আছে?

না।—বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, কে?

আবার হেসে বললাম, বোধহয় শেক্সপিয়র।

অঞ্জনা এবারও হাসতে হাসতে বলল, শেক্সপিয়রও আমাকে চেয়েছিল।

বললাম, হয়তো চেয়েছিল।

—হয়তো নয়। সত্যি। তোমাদের দেশেরও অনেকে আমাকে চেয়েছিল।

—জানি। কালিদাস চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তোমাকে পায়নি।

অঞ্জনা তা শুনে একটু হেসে বলল, অথচ আমি কত সহজে তোমার কাছে ধরা দিলাম।

এই সময় আবার ফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো।

—শকুন্তলা কি এখানে?

না।—বলে বিরক্তিতে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

অঞ্জনা যথারীতি জানতে চাইল, এবার কে?

—এবার কালিদাস হবে হয়তো।

অঞ্জনা বিষণ্ণ গলায় বলল, আস্তে আস্তে সবাই খোঁজ নেবে। আমি এদের হাত থেকে এখন রেহাই পেতে চাই। তাই তোমার কাছে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিতে এসেছি। তুমি কাউকে আমার কথা বোলো না।

বললেই আমাকে নিয়ে চলে যাবে। আমাকে আবার বইয়ের পাতায় আটকে রাখবে।

বললাম, ও নিয়ে তুমি ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

—কী?

অঞ্জনা একটু থেমে বলল, এখানে আমাদের থাকা চলবে না। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

জানতে চাইলাম, কোথায় যাবে?

—তা জানি না। তবে বইয়ের পাতায় আর নয়। এতদিন বইয়ের পাতায় আটকে থেকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর পারছি না। কেবলি এক বইয়ের পাতা থেকে আর এক বইয়ের পাতায়, সেখান থেকে আবার অন্য বইয়ের পাতায়। এই চলেছে বছরের পর বছর ধরে। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে ফের বইয়ের পাতায় আটকে রেখো না। আমি এখন সব বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমি সাবানের ফেনায় সেন্টের শিশিতে, বসন্তের ফুলে, ক্যালেন্ডারের পাতায়, বিজ্ঞাপনের মডেলে ঘুরে বেড়াই। ছাপার হরফে আর থাকতে চাই না।

কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আমাবও ইচ্ছে ছিল অঞ্জনাকে ছাপার হরফে ধরে রাখি। বিয়াত্রিচে, ওফেলিয়া বা শকুন্তলার মতো সেও আমার লেখায় অমর হয়ে থাকুক। কিন্তু অঞ্জনা আর ছাপার হরফে আটকে থাকতে চায় না। তা'হলে আমি ওকে নিয়ে কী করব? শধু কথা বলব? শুধু ভালোবাসব? শুধু ওর হাত ধরে যেখানে খুশি ঘুড়ে বেড়াব? না, তা হয়না। অঞ্জনাকে আমার চাই। চাই আমার হাতের মুঠোয়, চাই কালো হরফের মধ্যে।

এই সময় ডোর-বেলের শব্দ। দরজা খুলেই দেখি বঙ্কিমচন্দ্র। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কপালকুণ্ডলা আছে?

জোর দিয়ে বললাম, না।

—মিথ্যে কথা। কপালকুণ্ডলা ভিতরে আছে। আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিন।

অসম্ভব।—বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে সোফায় এসে বসলাম।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, কে?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

অঞ্জনা ভীত গলায় বলল, সব কবি লেখকরা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি এদের নিয়ে ক্লান্ত। কী করি বলোতো? চলো, চলে যাই। আর দেরি ক'রো না।

অঞ্জনাকে মিথ্যে সাহস দিয়ে বললাম, আমি যতক্ষণ আছি, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি চুপ করে বসে থাকো।

অঞ্জনা কথামতো চুপ করে বসে রইল। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। আমার ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। পৃথিবীব সব কবি-লেখকদের ওপর রেগে গেলাম। এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। তাঁদের বইয়ের পাতা থেকে কেউ যদি উঠে এসে আমার ঘরে ঢুকে বসে, গল্প করে, ভালোবাসে, তা'হলে তাদের এত মাথাব্যথা কেন? আমাকে এভাবে ঘনঘন বিরক্ত করার কী মানে হয়? এইসব কবি-লেখকরা দেখছি খুব হিংসুটে স্বভাবের। আমার এখন সব গোলমাল হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, এতদিন পবে হঠাৎ দেবতার আশীর্বাদের মতো অঞ্জনাকে যখন পেয়েছি, তখন তাকে সহজে ছাড়ব না, তার সঙ্গে গল্প করব, দুটো ভালোবাসার কথা বলব, কিন্তু তা হবার নয় দেখছি। এখন যে কী কবব তা বুঝতে পারলাম না।

আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, অঞ্জনা!

অঞ্জনা বলল, কী?

—তোমার কি সত্যি ভয় করছে?

—একটু একটু।

—তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। দরকার হলে আমি...

কথা শেষ হল না। ডোর-বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথ। একগাল দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি রবীন্দ্রনাথকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলাম না। না দিয়ে বললাম, এখানে লাবণ্য নেই। আপনি আসতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ একথা শুনে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। আমি সেকথা তাঁকে বলতে দিলাম না। আমি তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে অঞ্জনার পাশে এসে বসলাম। রাগে উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপতে লাগল। একটা কিছু করা দরকার। থানায় খবর দেব? কিন্তু থানার লোকেরা কি আমার কথা শুনবে? মনে হয় শুনবে না। আমার কথা তারা হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে, এ আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতি। তাহলে করব কী? কার কাছে যাব? কে আমাকে সাহায্য করবে? নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল।

অঞ্জনা বলল, তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? রেগে গেছ দেখছি।

বললাম, রাগব না! আমাকে কেন এই কবি-লেখকরা বারবার বিরক্ত করবে? আমি কি করেছি? আমার কী অপরাধ?

অঞ্জনা হাসল। বলল, শান্ত হও। উত্তেজিত হয়ো না।

বললাম, আমি আর পারছি না। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের দেখছি এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আবার ডোর-বেল বাজল। এবার কে এল? নিশ্চয় শরৎচন্দ্র। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার অনুমান ঠিক। শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলু।

আমি শরৎচন্দ্রকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে বললাম, আপনার রাজলক্ষ্মী এখানে নেই। আপনি আসুন।

শরৎচন্দ্র কী একটা বলতে চাইলেন। আমি তাঁকে সে সুযোগ দিলাম না। আমি তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে আবার অঞ্জনার পাশে এসে বসলাম। বললাম, চলো, আমরা এখনি এখান থেকে চলে যাই। তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে আর একমুহূর্ত থাকা ঠিক নয়। এরপর জীবনানন্দ আসবেন বনলতা সেনের খোঁজে।

অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। জানতে চাইল, কোথায় যাবে?

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এমন জায়গায় যাব, যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না।

—এমন জায়গা কি আছে?

—নিশ্চয় আছে।

—তাহলে সেখানেই চলো।

এসময় আবার ডোর-বেল বেজে উঠল। মনে হল, এবার নিশ্চয় জীবনানন্দ। আমি দরজা খুলে দিলাম। না, জীবনানন্দ একা নন। সঙ্গে অনেক কবি-লেখক আছেন। এঁদের মধ্যে আছেন দান্তে, শেক্সপিয়র, কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। আমি একসঙ্গে এতগুলো বিখ্যাত সাহিত্যিকের সামনে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি এখন এঁদের কী বলে ফেরাব? আমি কিছু বলতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, আমি তাঁদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতেও পারলাম না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁরা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। আমার বাধা দেওয়াব ক্ষমতা হল না।

দান্তে আঞ্জনাকে দেখেই বললেন এইতো আমার বিয়াত্রিচে।

শেক্সপিয়র বললেন, কখ্খনো না। এ আমার ওফেলিয়া।

কালিদাস বললেন, দূর পাগল! এ আমার শকুন্তলা।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, বাজে কথা। এ আমার কপালকুণ্ডলা।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, অসম্ভব। এ আমার লাবণ্য।

শরৎচন্দ্র বললেন, থামুন আপনারা। এ আমার রাজলক্ষ্মী।

জীবনানন্দ বললেন, আপনারা কেন ঝামেলা করছেন। এ আমার বনলতা সেন। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি।

তারপর তাঁদের মধ্যে শুরু হল কথা কাটাকাটি। হতে হতে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হল। ঠিক সেইসময় একজন সুদর্শন যুবক এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকে অঞ্জনাকে বলল, তুমি এখানে! আর আমি হন্যে হয়ে তোমাকে চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি তোমাকে আমার সিনেমার নায়িকা করব। এখনি শুটিং শুরু হবে। তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। তোমার জন্যে সব আটকে আছে।

অঞ্জনা খুশিতে লাফিয়ে উঠল, আমি সিনেমার নায়িকা হব?

যুবকটি হেসে বলল, হ্যাঁ।

—সব কাগজে আমার ছবি ছাপা হবে?

—হ্যাঁ।

এরপর অঞ্জনা আর কারো দিকে ফিরে তাকাল না। যুবকটির হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার পর কবি-লেখকরা একে একে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর থেকে চলে গেলেন। আমিও দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বলভদ্রের আনন্দ

তাবাদাস বন্দ্যোপাধ্যায

ভূর্জপত্রেব পুঁথি হাতে দ্বিপ্রহবে আমলকি গাছেব তলায বসেছিলেন বলভদ্র। এখন আচার্যদেব বিশ্রাম কবছেন। অন্যান্য সতীর্থবাও দৃষ্টিব অন্তবালে। ব্রাহ্মণ এবং আবণ্যকেব কিছু টীকা বচনা কবাব প্রযোজন কযেকদিনেব মধ্যে। আচার্যেব সে বকমই নির্দেশ। তাই সতীর্থদেব সঙ্গে অন্য সব দিনেব মত নিকটেব কাকচক্ষু নদীব জলে মাছেব খেলা দেখতে না গিযে তিনি মূল পুঁথিতে একবাব চোখ বুলিযে নিচ্ছেন। আচার্য তাঁকে বড স্নেহ কবেন। তাঁব মতে আর্যাবর্তে বলভদ্রেব মত মেধাবী ছাত্র আব একটিও নেই।

হঠাৎ বদভদ্রেব নাসিকায় ভেসে এল জাতিপুষ্পেব মৃদু সুগন্ধ। একটু অবাক হলেন বলভদ্র। এ অঞ্চলে, অন্ততঃ আচার্যদেবেব আশ্রমেব নিকটে তো জাতিপুষ্পেব বৃক্ষ নেই। এত সুস্পষ্ট সুগন্ধ বহুদুব থেকে আসাও সম্ভব নয। কাবণ অনুসন্ধানেব জন্য উঠে দাঁডালেন বলভদ্র।

বলভদ্র শালপ্রাংশু মহাভুজ। কিন্তু ভাবতবর্ষেব অগ্নিবর্ষী সূর্য তাঁব গাত্রবর্ণকে আনার্যতুল্য কবে তুলেছে। আচার্যেব আলোকসামান্য প্রতিভাধব ছাত্রেব মুখাকৃতি তাঁব পাণ্ডিত্যেব সমপবিমাণ অসুন্দব। কিন্তু অন্তবেব বৈদিক প্রশান্তি পণ্ডিত বলভদ্রেব অসুন্দব মুখেব ওপবে একটি সমাহিত ভাব এনে দিযেছিল।

এই অন্তবেব প্রশান্তি বেশীদিন বইল না বলভদ্রেব। আশ্রমকাননেব প্রান্তদেশে তমালবনেব পত্রচ্ছাযে সুগন্ধেব উৎস সন্ধানবত বলভদ্র মুখোমুখি হলেন আচার্যেব প্রতিবেশী বিষ্ণুদত্তেব কন্যা সোমাব।

সোমাব সঙ্গে পূর্ব থেকেই আলাপ আছে বলভদ্রেব। আচার্যেব জন্য দুগ্ধ সংগ্রহেব প্রযোজনে প্রাযই বিত্তশালী বিষ্ণুদত্তেব গৃহে যেতে হয তাকে। সেখানে যে দু'একবাব বাক্যালাপ কবেন নি সোমাব সঙ্গে এমন নয। কিন্তু এ ক্ষেত্র আলাদা। বসন্তকালেব স্বপ্নিল, দ্বিপ্রহবে মর্মবিত তমালবনচ্ছাযে যুবতী সোমাব সঙ্গে দেখা হবে—এমন কথা তো হিন্দু জ্যোতিষে লেখে না। বলভদ্রেব কঠিন নৈযাযিক মন একনিমেষে সদ্যদুগ্ধোত্থিত ননীব মত কোমল, হযে পডল।

সোমা সম্ভবতঃ তাব গাভীটিকে নিতে এসেছিল। বলভদ্র যখন সোমাকে দেখলেন তখন সে মাটিতে জানু বেখে গাভীটিব পাযেব ক্ষত পবীক্ষা কবছিল। বিশেষ ভঙ্গীতে বসাব জন্য তাব একুশ বছবেব যৌবন প্রকট হযে দোলা দিল আর্যাবর্তেব শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্রটিব হৃদযে। বলভদ্র কি জন্য তমাল বনে প্রবেশ কবেছিলেন তা তিনি এমন পাবদর্শীতাব সঙ্গে ভুলে গেলেন যে, এ ধবনেব বিস্মৃতিপবাযণ হলে আর্যদেব আব উত্তবভাবতে বসতি স্থাপন কবতে হত না।

সোমাব মনে এ ধবণেব বৈকল্য না থাকাব দরুণ বলভদ্র কিছুক্ষণেব মধ্যেই তাব নযনগোচব হলেন। সোমাব ঈষৎ গর্বিত বুদ্ধিদীপ্ত চোখে কৌতুকেব বিদ্যুৎ খেলে গেল। উঠে দাঁডিযে সে সপ্রতিভভাবে বলল—গাভীটিকে দেখছেন বুঝি? বেশ স্বাস্থ্যবতী না?

প্রাণপণ চেষ্টা করেও বৈয়াকরণ বলভদ্র মনের মধ্যে উন্মত্ত নৃত্যশীল শব্দগুলিকে ব্যাকরণের সূত্রে গ্রথিত করতে পারছিলেন না। এবার আরক্ত মুখে বললেন—"না, ঠিক তা নয়; হ্যাঁ, গাভীটি বেশ পৃথুলা—আমি তো জাতিপুষ্পর সুগন্ধ—

—মঙ্গলার স্বাস্থ্য দেখে আপনার দেখছি বাক্‌রোধ হল—

বলভদ্র উত্তরোত্তর গভীর জলে গিয়ে পড়ছিলেন। তিনি গলায় পৌরুষ আনবার চেষ্টা করতে বললেন—তা নয়। আমি জাতি পুষ্পের সুবাস পেয়ে তার উৎস সন্ধানে এসেছিলাম ভদ্রে।

—সে উৎস যে বনের এই বিশেষ অংশেই এমন ধারণা আপনার কেন হোলো?

—বাতাস এদিক থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে কিনা—তাই-ভাবছিলাম—

—আবহাওয়াতত্ত্ব আপনার দেখছি মুষ্টিধৃত।

বলভদ্র ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আচার্যদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা বাক্‌পটিয়সী মেয়েটির বাক্যবাণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তিনি অসহায় কণ্ঠে বললেন—কিন্তু উৎসটি এদিকে বলেই তো মনে হোল। বাক্যটিতে দৃঢ়বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হলো না। নিতান্ত হাল ছেড়ে দেওয়া কথা।

এবার সোমা কলকণ্ঠে হাসলো। বলভদ্রের মনে হলো সামগান এর চেয়ে অনেক কর্কশ। সোমা বললো—ঠিক ধরেছেন। তবে জাতিপুষ্পের সুবাস নয়—জাতি পুষ্পের নির্যাসের সুগন্ধ।

বিস্মিত বলভদ্র তার প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না।

—আমাব তাত অনার্যদমন জাতিপুষ্পের নির্যাস তৈযারীর কৌশল জানেন, তিনিই পাঠান মাঝে মাঝে। আজ বস্ত্রাঞ্চলে তা একটু সিঞ্চন করেছিলাম মাত্র। আপনার উত্তরীয়ে একটু ঢেলে দেব কি?

বিহ্বল বলভদ্রের কণ্ঠ দিয়ে যে শব্দ বের হল তা সমর্থনও হতে পারে—আবার নাও হতে পারে।

সেদিন আপন কুটিবে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত অধ্যায়ন তেমন জমলো না বলভদ্রের। টীকাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকাব। কিন্তু পালকের লেখনীতে বার বার কালি শুকিয়ে যেতে লাগলো—তিনি দ্বারের বাইবে অষ্টমীর ম্লান জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আশ্রম কাননের দিকে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে তার পুঁথির পাতা এলোমেলো করে দেয—মৃৎপ্রদীপেব শিখা কেঁপে ওঠে। ত্রস্ত বলভদ্র উঠে দ্বার বন্ধ কবে একে একে পাতাগুলি সংগ্রহ কবেন ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে। পুঁথি মুড়ে জানলায় এসে দাঁড়ান। সম্মুখের বনভূমি একটানা পতঙ্গেব ডাকে মুখব। চাঁদেব আলোয বেতসবনের যে অন্ধকাব ছায়া চ্যুতপত্রে আবৃত মাটিতে পড়েছে তা কি কারুর চোখের তাবার চেয়েও কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু কার চোখের তারা?

ভূর্জপত্রে একখানি কবিতা লিখে ফেললেন বলভদ্র। অন্তরেব গূঢ় কথা ভাষাবিদ্ বলভদ্রের শ্লোকে প্রকাশিত হলো। একটি উপমা দিতে গিয়ে হঠাৎ থামলেন তিনি। নারীকে আকর্ষণ কবার মতো কোন গুণে তিনি গুণান্বিত? তাঁব প্রকট কণ্ঠাস্থি—অতিমাত্রায পেশল কৃষিজীবীর মত দেহগঠন, সর্বোপবি অসুন্দব মুখাকৃতি। এক কথায়

বলভদ্র কুৎসিত। শুধু নীরস বিদ্যার বলে কি যুবতী নারীর মন জয় করা যায়? এতদিন এ বিষয়ে বিশেষ শিরঃপীড়া ছিল না তার। অধ্যয়নের ফাঁকে কখনো কামনা অনুভব করেছেন বটে—কিন্তু তার আক্রমণ এমন প্রবল ছিলো না। আবার অসমাপ্ত কবিতাটির কথা মনে পড়ে তাঁর। উপমাটিকে যথাযথ করে তোলেন কি করে? নায়িকার চোখের তারা কতখানি কালো? তাঁর গাত্রবর্ণের থেকেও কি বেশী?

একটি তৃণের শীর্ষ ছেদন করে দাঁতে কাটছিলেন আচার্যের ছাত্র পিঙ্গলাক্ষ। বাতাস তাঁর উত্তরীয় নিয়ে খেলা করছিল। সুদেহী পিঙ্গলাক্ষের চোখে অসহিষ্ণুতার আভাস। কই, সোমা তো এখনও এলো না।

অকস্মাৎ উত্তরীয়ে টান পড়তে চকিতে মুখ ফিরিয়ে পিঙ্গলাক্ষ দেখলেন সোমা এসেছে। সযত্নে কেশবিন্যাস করা। পরিধানে রক্তবর্ণ বট্টবস্ত্র এবং বাসন্তী রঙের কাঁচুলী। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বিরক্ত পিঙ্গলাক্ষ বললেন—এমন উদ্ভট বেশ করেছো কেন?

এ ধরনের অভ্যর্থনা সোমা আশা করেনি। সারা অপরাহ্ন সে প্রসাধন করেছে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করবে বলে। আর প্রথম দর্শনেই পিঙ্গলাক্ষ তাকে এমন রূঢ় কথা বললেন। সে মনে অনুভব করে পিঙ্গলাক্ষের হৃদয়ের কোথায় যেন একটি কাঠিন্য আছে। একটা ঔদাসীন্য আছে তার প্রতি। তার সব উৎসাহ, উদ্যম-প্রসাধন এক একদিন কেমন অর্থহীনভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। সে বলে—কেন, এমন খারাপ কি।

—একজন শুদ্রানীর রুচিও তোমার থেকে উন্নতমানের।

—আজ এমন বাক্যাঘাত করছো কেন বলোতো?

—উদ্ভট কথা বোলো না। আমি বাক্যাঘাত করলাম কখন? সত্যকথা শোনাব অভ্যাসটাও কি হারিয়ে ফেলেছো? আমি নারীর মধ্যে সুরুচির প্রকাশ দেখতে চাই। আমার সঙ্গিনী হতে হলে তোমাকে আমার যোগ্য হতে হবে।

—না হয় একদণ্ড প্রতীক্ষা করতে হয়েছে—তার জন্য এতো বিরাগ? তোমার ক্রোধও আজকাল—

—ক্রোধ নয় সোমা, হতাশা৷

—যদি আমি তোমার যোগ্যাই নই তবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলে কেন?

—তাই তো ভাবি সোমা। ভুল কবেছি কি?

—নিজের সম্বন্ধে তোমাব এত বড় ধারণা?

—যথার্থ ধারণায় কোন অন্যায় আছে কি?

প্রশ্নের উত্তরে যখন প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হতে থাকে তখন বাক্যালাপ তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে কলহে পরিণত হয়। সোমা উদ্‌গত অশ্রু দমনকরে বলে—কিন্তু আমাকে বৃক্ষে উঠতে সাহায্য করে এখন আরোহিণী সরিয়ে নেওয়ার মধ্যেও কি অন্যায় নেই?

সোমার কণ্ঠে আসন্ন তপ্তাশ্রুপাতের সূচনা দেখে পিঙ্গলাক্ষ কিছুটা অনুতপ্ত হন।

—অকারণ বিচলিত হোয়ো না সোমা। আজ মন খুব ভাল নেই। হয়ত অজ্ঞাতসারে—

বিশেষ কিছু বলার দরকার ছিল না। এই কথাটা তো আগে বললেই হয়ে যেত—সোমা ভাবে।

ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। প্রদোষান্ধকারে এখানে ওখানে দু'একটি খদ্যোত জ্বলে উঠছে

রাত্রির চোখের মত। টিলার অপর পার্শ্বে আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে কৌশিক রাগে ধ্রুপদের তান ভেসে আসছে। চৌতালে বাজছে মৃদঙ্গ। কিছুক্ষণের মধ্যে নবমীর চন্দ্রালোক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। সান্ধ্য বাতাস দোলা দিয়ে গেল মাথার ওপরে নক্ষত্রকিরীটি বিশাল গাছগুলির শাখাকে। পিঙ্গলাক্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যাই সোমা।

কাকচক্ষু নদীর তীরে একটি শিলাখণ্ডে বসেছিলেন বলভদ্র। আজকের মৃত জ্যোৎস্না বড় মধুর লাগছিল তাঁর, একপক্ষ আগে এই শিলাখণ্ডে বসে অন্ধকার রাত্রের অদ্ভুত তারকাবৃষ্টি দেখেছিলেন তিনি। তারকা তো দু'একটি মধ্যে মধ্যেই স্থানচ্যুত হয়, কিন্তু বলভদ্র লক্ষ্য করেছেন বৎসরের বিশেষ একটি সময় তো খুব বৃদ্ধি পায়। এমন কেন হয় সে বিষয়ে গবেষণা করবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আজ আর সেদিকে বিশেষ মন নেই তাঁর। সামনের স্বচ্ছ নদীজলে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়েছে। অপর তীরে মসৃণ প্রস্তরখণ্ড চক্‌চক্ করছে। নদীর ওপারের মাটি বন্ধ্যা, প্রস্তরময়, এদিকের মত শ্যামল নয়। একটি রাত্রিচর পাখি নিঃশব্দে ডানা নেড়ে উড়ে গেল অন্ধকার থেকে আবার অন্ধকারের বুকে। চরাচরব্যাপী স্তব্ধতা কেমন উদাস যন্ত্রণা এনে দেয় বলভদ্রের মনে। কিছু একটা না পাওয়ার বেদনা—কিছু একটি অর্জন করতে পারার যে অভাব—তার বেদনা।

হঠাৎ বলভদ্র লক্ষ্য করলেন কিছুদূরে নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন পিঙ্গলাক্ষ। বলভদ্র আনন্দিত হয়ে ডাকলেন—ভাই পিঙ্গলাক্ষ।

পিঙ্গলাক্ষ নির্জন নদীতটে নিজের নাম উচ্চারিত শুনে বিস্মিত মুখে এগিয়ে এলেন।

—একি, বলভদ্র যে, তুমি অকস্মাৎ এখানে?

—কেন, আচার্যের শিষ্যদের নদীতীরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ নাকি?

—তা নয়, কাব্য করাটা আবার তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয় কিনা, তাই অবাক হচ্ছি আর কি।

—তা হলে সে প্রশ্ন তো তোমাকেও করা যায় পিঙ্গলাক্ষ।

—ঠিকই বলেছ। কাব্য আমারও আসে না। বিশেষ মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে ভারমুক্ত হয়ে এসেছি মাত্র।

—যদি বলি আমার ক্ষেত্রেও তাই?

বিস্মিত পিঙ্গলাক্ষ বলভদ্রের দিকে তাকান, তারপর বলভদ্রেব পাশে বসে বলেন—হৃদয়াবেগের লক্ষণ তো তোমার মধ্যে আগে দেখা যায় নি, বলভদ্র।

—আগে ছিল না বলে কি এখনও থাকবে না? মহাশূন্যের গর্ভেই তো পৃথিবীর সৃষ্টি।

—তা বটে।

একটু চুপ করেন বলভদ্র। আশ্রম থেকে গায়ক বেদব্রতর কণ্ঠের ধ্রুপদ ভেসে আসছে এখনও। হাল্কা একখণ্ড মেঘ ভেসে গেল চাঁদের পাশ দিয়ে। বলভদ্র মৃদু কণ্ঠে বলেন—সোমদত্তাকে চেন?

পিঙ্গলাক্ষ প্রেতদৃষ্টের মত চমকে উঠলেন, পলকে তাঁব ভ্রূ কুঞ্চিত হযে গেলো।—কে সোমদত্তা?

—প্রতিবেশী বিষ্ণু দত্তের কন্যা।

একটি সম ফাঁক দিয়ে গেলেন বেদব্রত। দূর থেকেই শোনা গেল। বস্ত্রপ্রান্তে সংলগ্ন একটি কাঁটাফলকে ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুটা যেন আপনমনেই বললেন বলভদ্র—মেয়েটি বেশ।

—বাঃ, বাঃ—তোমার উন্নতি দেখে আনন্দ হচ্ছে।

—কেন ভাই, সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া কি পাপ?

—নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু একজন নারীকে প্রেয়সীরূপে কল্পনা করার আগে তার অনুমতি নিয়েছ কি?

—পিঙ্গলাক্ষ, দেহ ও মন তার হতে পারে, কিন্তু কল্পনা তো আমার নিজস্ব।

—ঠিক সেই কারণেই তো কল্পনাকে সংযত করে রাখতে হয়। সত্য বলো বলভদ্র—একবারও কি তুমি সোমদত্তাকে চুম্বন করার কথা কল্পনা করো নি?

সত্যবাদী বলভদ্র বলেন—হ্যাঁ, তা করেছি।

—তবে ভেবে দেখ। কল্পনাতেও অন্ততঃ তুমি একজন নারীর প্রতি অশালীন ব্যবহার করেছো।

—নারীকে ভালোবাসা কি অশালীন?

—অন্ততঃ তার অনুমতি পাওয়ার পূর্বে ত বটেই।

—এ তো শুধু কল্পনা, পিঙ্গলাক্ষ।

ছিঃ, তোমার মত নৈয়ায়িকের মুখে একথা শোভা পায় না বলভদ্র। কল্পনাতেও অন্যায় করা কি পণ্ডিতজনোচিত?

—আমার কল্পনা আমার আদেশের অবাধ্য। শক্তিশালী অশ্ব উত্তম বাহন বটে—কিন্তু সে তোমার ইঙ্গিত না মানলে তার পৃষ্ঠে অসহায়ভাবে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

—হায় দুর্বলচিত্ত বলভদ্র; তোমাকেই কি না আমি সবচেয়ে দৃঢ়চেতা ভেবেছিলাম।

—চিত্ত নমনীয় বলেই তো দুর্বল নয়, পিঙ্গলাক্ষ। নমনীয় বস্তুকে ধ্বংস করা দুঃসাধ্য। পাষণ্ডের চিত্ত কঠিন—তাই তা ভঙ্গুর।

—তোমার যুক্তিগুলি যেন নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলভদ্র।

—তা যেন হোলো, কিন্তু আমাকে অনর্থক এত নিরুৎসাহ করে দেওয়ায় তোমাব এত আগ্রহ কেন বল তো?

চকিতে সাবধান হয়ে গেলেন পিঙ্গলাক্ষ। সোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপাবটা কখনোই বলভদ্রকে জানতে দেওয়া উচিত নয়। আচার্যের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলভদ্র। কোনক্রমে কথাটা আচার্যের কানে উঠলে সর্বনাশ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এ ধরনের অপরাধ আচার্য ক্ষমা করবেন না নিশ্চই। আর তা ব্যতীত বলভদ্র নিজেই সোমার প্রতি আকৃষ্ট। আসল ব্যাপার জানতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটাবেন। ত্বরিতে শিলাসন থেকে উঠতে উঠতে পিঙ্গলাক্ষ বললেন—আমার আগ্রহ আবার কোথায় দেখলে? 'নেহাৎ তুমি আমার সুহৃদ তাই। নতুবা তোমার ভালোমন্দে আমার পিতার কি শিরঃপীড়া?

পরদিন অপরাহ্নে আপন মনে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বলভদ্র। বসন্তকালের রৌদ্র ঈষৎ তির্যকভাবে বনের মধ্যে দিয়ে এসে পথের ধূলায় পড়েছে। খুব শৈশবের কথা মনে পড়ছিল বলভদ্রের। এই হলুদ হয়ে আসা দিনাবসানের রৌদ্রে কি সব কথা

যেন মনে পড়ে। স্মরণের সুতীব্র যন্ত্রণায় বুক হা হা করে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান সোমদত্তার কথা। বেলাশেষের রৌদ্রে যেন আরো গভীর কি বাণী। আচার্যদেবের কাছে শোনা শ্লোকের মত। এর পেছনেই তো এতদিন ছুটে চলেছেন বলভদ্র। এই বেদনার অনুভূতিটা খুব পরিচিত তাঁর। তবু আজ যেন সবকিছুই পাল্টে গেছে। এমন কি—বেদনাটাও যেন খুব পার্থিব ঠেকছে। কিছুদিন আগের সেই নীরস কাঠিন্য উদ্বায়ী কর্পূরের মত মিশে গেছে পঞ্চভূতে। কি শুষ্ক বিষয় নিয়েই না কাটিয়েছেন এতকাল। প্রেম যদি সত্য না হয়—তবে তিনি আর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করেন না। রসাতলে যাক জ্ঞানবিজ্ঞান পণ্ডিত ছাত্রদের সমিধ্‌বহন। রসাতলে যাক পুঁথিপত্র। ~~ সব আবর্জনা।

বলভদ্র ডুবছিলেন। অতল আর কয়েক হাত নিম্নে মাত্র।

সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরে উম্মনা হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন বলভদ্র। পরে একটি পুঁথি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ দরজায় আঘাত পড়লো। চমকিত বলভদ্রের মনে চকিত দুরাশা খেলে গেল। কিন্তু তাও কি হয় কখনো। না, সে অসম্ভব।

দ্বার খুলে তিনি দেখলেন বেদব্রত এসেছে।

—এসো, এসো বেদব্রত। এই কুশাসনটিতে বসো। গতকাল কাকচক্ষু নদীর তীরে বসে তোমার কৌশিক রাগে আলাপ শুনছিলাম। সমস্ত পরিবেশকে পবিত্র করে তুলেছিল তোমার গান।

—না বলভদ্র। তুমি হয়ত অহঙ্কার ভাববে, কিন্তু তা নয় ভাই। কাল অত চেষ্টা করেও রাগরূপ প্রকাশ করতে পারছিলাম না। কোমল গান্ধারের আর মাধ্যমের কাজ ঠিকমত হচ্ছিল না আদৌ। এক এক সময় কি যে হয়—তা যাইহোক, তোমাকে আচার্যদেব একবার ডেকেছেন। শীঘ্র যেও। তোমার সে তারকাবৃষ্টির রহস্যভেদ করবে বলেছিলে, তার কতদূর?

—আরে রাখো ভাই, আচার্যের দেওয়া কাজটিই এখনো সমাপ্ত করে উঠতে পারলাম না।

যাবার আগে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে বেদব্রত—আচ্ছা, পিঙ্গলাক্ষ আজকাল দেরী করে কুটিরে ফেরে কেন বলতে পারো?

আচার্যের কুটিরে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন বলভদ্র। সম্মুখে বৃদ্ধের তেজোদ্দীপ্ত চেহারা। উন্নত নাসিকা—গৌরবর্ণ কান্তি। ভ্রূর নীচে দুই চোখে অসাধারণ দীপ্তি।

—চরণ বন্দনা করি গুরুদেব।

—স্বস্তি। উপবেশন করো। আমার সে কাজটি সমাপ্ত করেছো?

বলভদ্র অসুবিধায় পড়লেন। মাথা নীচু করে বললেন—আজ্ঞে না গুরুদেব। আশা করি আর দুএকদিনের মধ্যেই সমাপ্ত করতে পারব।

—কেন, যথেষ্ট সময় তো দেওয়া হয়েছে বলভদ্র।

একটু থেমে শিষ্যের মুখভাগ পরীক্ষা করেন আচার্য।

—কিছু কি তোমাকে উত্যক্ত করছে বলভদ্র?

বলভদ্র মনে মনে শঙ্কিত হন।

—আজ্ঞে, তেমন কিছু না গুরুদেব।

—আচ্ছা, এখন তুমি এসো তাহলে। দিন দুই নয়,—আরো এক সপ্তাহ সময় দিলাম। তার মধ্যে শেষ করো কাজটা।

বলভদ্র বিদায় নিলে আচার্য কুঞ্চিতললাটে তাকিয়ে থাকেন তার গমনপথের দিকে।

দশমীর জ্যোৎস্নায় বিধৌত প্রাঙ্গন দিয়ে আচার্যের কুটির থেকে নিজের কুটিরে আসতে আসতে বলভদ্র ভাবলেন টিকা ও ভাষ্যগুলি শীঘ্রই করে ফেলা দরকার। তাছাড়া নিজেও অথর্ববেদ পড়ছিলেন কিছুদিন হলো। সে পাঠটিও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কাজ করার জন্য মানসিক শান্তি প্রয়োজন। তা আসতে পারে একটিমাত্র উপায়ে। বলভদ্র ঠিক করে ফেললেন তিনি দুচারদিনের মধ্যেই প্রেম নিবেদন করবেন।

বাসন্তী পূর্ণিমা এসে গেলো দেখতে দেখতে। সকালে কাকচক্ষুতে গেলেন স্নানেব জন্য। আজই গোধূলিতে তিনি মনের কথা খুলে বলবেন সোমদত্তাকে। একটু প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন বৈকি।

ঝরাপাতার রাশি জমে আছে ঘাটের পথে। তার ওপর দিয়ে শব্দ কবে হেঁটে চললেন বলভদ্র। হাতে একটি অতিরিক্ত উত্তরীয় এবং পরিধেয়। নদীতীবে পৌঁছে বস্ত্রগুলি রেখে নদীতে নামলেন বলভদ্র। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর তীরে ফিরে এলেন। একটু গাত্রমার্জনা করা প্রয়োজন। তীরভূমি থেকে একমুঠো কাঁকর তুলে নিতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। সেটি হাতে নিলেন বলভদ্র।

একটি চ্যাপটা এবং চওড়া বিঘৎপরিমাণ প্রস্তরখণ্ড। পুরোণো পুঁথির পাতাব মতো রঙ। তাতে সুন্দর একটি বৃক্ষপত্রের ছাপ মুদ্রিত হয়ে আছে।

অবাক হলেন বলভদ্র। এ কি বস্তু! কঠিন প্রস্তরগাত্রে বৃক্ষপত্রের প্রতিকৃতি পড়ে কি করে? প্রস্তরখণ্ডটি তীরে রেখে তিনি স্নান সেরে নিলেন। পরে সেটি হাতে করে চললেন আচার্যের কুটীরের উদ্দেশ্যে।

আচার্য স্বয়ং বিস্মিত হলেন জিনিষটি দেখে। হাতে নিয়ে ঘুবিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—এটি রেখে যাও বলভদ্র। পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারি না।

—যে আজ্ঞে গুরুদেব।

কুটীরে বসে বলভদ্র দেখলেন অপরাহ্নের রৌদ্র ম্লান হয়ে এল। প্রাঙ্গণে পুন্নাগচম্পক বৃক্ষ থেকে একটি একটি পাতা খসে পড়ছে। মধ্যাহ্নের ধূ ধূ করে জ্বলা নারকীয় কটাহের মত আকাশটা এখন পুরাতন বান্ধবের মত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বিহ্বলভাব কাটিয়ে উঠে পড়লেন বলভদ্র—উত্তরীয় জড়িয়ে নিলেন গায়। দ্বিধামাখানো পাদবিক্ষেপে বনপ্রান্তের দিকে রওনা দিলেন। সে পথ দিয়ে গাভী নিয়ে নিশ্চয় ফিরবে সোমা।

অজস্র বন্যপুষ্পের কটুগন্ধে ভরা বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে বুক ভারী হয়ে আসে। ছায়া ঘনায় ঝোপে ঝাড়ে। দু একটি পাখী বাসায় ফিরতে শুরু করেছে এবং এর মধ্যেই—

যদিও বৃক্ষশীর্ষে আলো অনেক এখনো। গালে হাত দিয়ে বলভদ্রের কর্কশ অনুভূতি হয়। ভালো ক্ষৌরকর্ম হয়নি। ক্ষুর যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল না।

পথের বাঁকে প্রথম গাভীর হাম্বারব—পরে সোমাকে দেখা যায়। গাভীর কণ্ঠদেশ থেকে প্রলম্বিত দড়ির প্রান্তভাগ ধরে সে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলভদ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন—সোমদত্তা।

—একি আপনি এখানে?

—হ্যাঁ, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, সোমা। গুটিকয়েক কথা ছিল।

—বেশতো, বলুন না।

বলভদ্র ইতস্ততঃ করেন না।

—আমাকে বিবাহ করবে সোমা?

প্রস্তাবটা এত আকস্মিক, যে সোমদত্তা হঠাৎ উত্তর খুঁজে পায়না। তারপর বলে—সে কি করে সম্ভব!

—কেন আমি কি এতই অযোগ্য?

—যোগ্য কি? তাছাড়া যোগ্যতা নয়, প্রশ্নটা মনের মিলের।

—আমার মধ্যে কিসের অভাব সোমা?

—যে জিনিসগুলি আপনার মধ্যে নেই—ঠিক তারই অভাব, ভদ্র।

—আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করে দিওনা সোমা। আমাকে বিফলমনোরথ কোরোনা।

—আপনার প্রকৃতিস্থ থাকার জন্যও ত আমি দায়ী ছিলাম না। আর বিফল মনোরথ? ও জিনিসটা নিজে না হলে তো কেউ কারুকে করতে পারে না। মনোরথ না থাকলে ব্যর্থতার বোঝাও বহন করতে হয় না।

—কিন্তু আমি যে মানুষ।

—তাতে তো কারুর সন্দেহ নেই ভদ্র।

কথার গতি পালটান বলভদ্র!

—তাহলে তুমি রাজী নও?

—একই প্রশ্ন বারবার করা ধীমানের শোভা পায়না।

—অত ধন্দের সৃষ্টি না করে সোজা উত্তর দাও না কেন?

—প্রশ্নটি অত সোজা কি?

বলভদ্র চুপ করেন। বৈকালী আলো এসে পড়েছে সোমার মুখে। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। যেন পার্থিবলোকের, উর্দ্ধে বিচরণশীল কোন শিল্পীর হাতে গড়া একখানি ভাস্কর্য।

—আমাকে বিবাহ করো সোমা। আমি তোমাকে কি না দিতে পারি?

—কি দিতে পারেন?

প্রাচুর্যের মুখ দেখাতে পারিনা বটে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারি। শান্তি দিতে পারি। একটু থেমে বলেন—তোমাকে গৃহ দিতে পারি।

—আমাকে গৃহের প্রলোভন দেখাচ্ছেন, আমি কি গৃহহীনা?

—আমি তোমার নারীত্বের স্বীকৃতি দিতে পারি সোমা।

—কি ভাবে?

—তুমি কি জানো না পুরুষের ভালোবাসাই নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি?

মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে রাজহংসীব মত গ্রীবা প্রকট করে হাস্‌ল সোমা। তারপর ব্যঙ্গে অধর বঙ্কিম করে বলল—সে পুরুষ আপনি নন।

তীক্ষ্ণাগ্র শর যেমন বর্ম ভেদ করে তেমনি আঘাতে বলভদ্রেব হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন—এই তাহলে তোমার শেষ কথা সোমা?

—আপনি কি মহাভারতের ঊনবিংশ পর্ব পড়বার দুঃসাহস করেন নাকি? আর তাছাড়া আপনার কি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না আমি অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ কি না?

—তাই কি?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কিছু বলবার নেই সোমা। আমি দুঃখিত।

—এবং সে আপনার পরিচিত। তার নাম—

—থাক। বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিও না সোমা। আচ্ছা চলি। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সাবধানে যেও।

আব ফিরে না তাকিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকেন বলভদ্র। সরু পথ বেয়ে টিলার ওপর দিয়ে ওঠেন। পেছনের কাকচক্ষুর ওপারে বন্ধ্যা তীরভূমি—এদিকে ছোট ছোট ঝোপে আবৃত ধূ ধূ প্রান্তর। সেই প্রান্তরের ওপাবে কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম দিগন্তের মেঘস্তূপ সীমন্তিনীর সিঁদুরের মত লাল। মাথার ওপরে ক্লান্ত পাখিদের দীর্ঘ সারি। সবদিকে দিনাবসানের শান্ত সুর। একটি শিলাসনে চুপ কবে বসেন বলভদ্র।

কার পায়ের শব্দ না? হ্যাঁ, টিলার অপর পাশ দিয়ে উঠে এসেছেন আচার্যদেব। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ান বলভদ্র। বন্দে গুরুদেব।

—স্বস্তি। বোসো। কটা কথা বলতে এলাম।

গুরুশিষ্য পাশাপাশি বসেন। প্রিয় শিষ্যের স্কন্ধে হাত রেখে আচার্য বলেন—তুমি খুব বিচলিত, না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব।

—তার কারণও আমি জানি। না, লুকোবার চেষ্টা কোবো না বলভদ্র। এতে লজ্জার কিছু নেই। মানবজীবনের এও স্বাভাবিক ধর্ম। তবে এর চেয়ে বড স্বাভাবিক ধর্ম আছে কিনা তার সন্ধান করা প্রয়োজন নয় কি?

—হ্যাঁ গুরুদেব।

—দেখো, সকালে যখন পাথরের টুকরোটি এনে দিলে, তখন ঠিক বুঝাতে পারিনি জিনিসটি কি। পরে একটু কোণ ভেঙে চুর্ণ কবে দেখি বস্তুটি প্রস্তরীভূত পলি মাত্র। নরম পলিতে কোন আদি যুগে হয়ত দৈবক্রমে একটি বৃক্ষপত্র পতিত হয়েছিল। লক্ষ বৎসরের প্রান্তে আজ তা প্রস্তরে পরিণত হয়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে বলভদ্র এ পৃথিবী, এই বৃক্ষরাজি চিরকাল এমনি ছিল না। কারণ প্রস্তরে মুদ্রিত পাত্রটির সঙ্গে বর্তমানের

কোন বৃক্ষপত্রের মিল পেলাম না। হয়ত লক্ষ বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল তরুশ্রেণীর রূপ। হয়ত মানুষ ছিল অন্যরকম।

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি চিন্তা করেন আচার্য। তারপর বলেন—হয়ত লক্ষ বৎসর পর আমাদের প্রস্তরীভূত অস্থি গবেষণার বিষয়বস্তু হবে—কে বলতে পারে বলভদ্র। চিন্তা করে দেখো—সবই পরিবর্তনশীল। মহাকাশের পারাপারহীন বারিধিতে সামান্য একটি ঢেউকে আমরা বড় মর্যাদা দিই। তার প্রাপ্য মর্যাদার থেকে বেশী। একটা বড় ঢেউ তোলবার চেষ্টা কর বলভদ্র। এই পরিবর্তনশীলতার ভেতর একটু স্থায়ীত্বকে গড়ে তোলবার চেষ্টা কর। আজকের দিনের কিছুই আর ভবিষ্যতে থাকবে না। তোমার আমার স্মৃতির শেষ বিন্দুটুকুও মুছে যাবে উত্তরপুরুষদের মন থেকে। পুষ্পাভরণের কোন মূল্য থাকবে না—রুচি পরিণত হবে পরিকল্পিত রুচিবিকৃতিতে। িশেষ ধাতুর প্রতি সাধারণের আকর্ষণ দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে ধাতুখণ্ড ব্যবহৃত হবে মূল্যমানের প্রতীক হিসাবে। একদিন সবকিছু, স-ব কিছু ক্রয় করা সম্ভভ হবে। সবকিছু নষ্ট হলেও একটি জিনিস অবিকৃত থাকবে বলভদ্র।

—কি থাকবে গুরুদেব?

—আনন্দ থাকবে বলভদ্র।

সেই মুহূর্তে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলভদ্রের মনে হলো যেন আকাশ-বাতাস প্রান্তর-প্রস্তর—সব হৃদস্পন্দনের তালে তালে ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করে স্পন্দিত হতে হতে বলছে—আনন্দ বলভদ্র—আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ।

মহাকালের হৃদস্পন্দন থামবার নয়। বিপুল আনন্দ বুকে নিয়ে কুৎসিত বলভদ্র পায়ের কাছে ঘাসের দিকে তাকান। দিনশেষের একটি সুন্দর প্রজাপতি তাঁর আচার্যের পায়রে কাছে এসে বসেছে। ওর বুকেও এই বিশাল স্পন্দন। মুগ্ধ বলভদ্র বলেন—দেখুন গুরুদেব। একটি প্রজাপতি।

লাল গোলাপ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

কতকাল পর যে বিশ্বজিৎকে দেখল তৃণা। পাঁচ বছর। নাকি আরেকটু বেশি? বোধহয় ছ'বছর। সুকান্ত-তৃণার বিয়েতে বিশ্বজিৎ আসতে পারেনি। পরে কী একটা কাজে যেন এসেছিল কলকাতায়, তখন একবার ঘুরে গিয়েছিল এখান থেকে। বড় জোব ঘণ্টাখানেক ছিল। তারপর আর এমুখো হল কই! সেই যে চাকরি নিয়ে পাড়ি জমাল চণ্ডিগড়ে, কলকাতাকে ভুলেই গেল। সুকান্ত তৃণাকেও। নাহ, ভুল হল। এখনও নিয়ম করে একটা বন্ধুকৃত্য করে বটে বিশ্বজিৎ। প্রতি বছব তৃণা সুকান্তর বিবাহবার্ষিকীতে একটা করে চিঠি পাঠায়। তিন, কি চার বাক্যের। চিঠির মোদ্দা কথা একটাই। সুখে থাকো।

ছ' বছরে বিশ্বজিতের চেহারায় কি খুব বদল ঘটেছে? হুঁ, তা তো একটা ঘটেছেই। তৃণা লক্ষ করছিল বিশ্বজিতের রগের দু'একটা চুলে এখন রুপোলি রং, লম্বা শরীরের টিঙটিঙে ভাবটা উধাও, বেশ খানিকটা মাংস আর চর্বি লেগেছে ছ'ফুটি কাঠামোয়। মুখে একটা সতেজ কাঠিন্য ছিল বিশ্বজিতের, সেটাও কেমন কোমল হয়ে এসেছে যেন। চকচকে গালে গাঢ় নীলচে ভাব। এক সময়ের ঝাঁকড়া দাড়ি বিশ্বজিৎ কি এখন ইলেকট্রিক শেভারে দাড়ি কামায়?

বিশ্বজিৎও চোখ কুঁচকে দেখছে তৃণাকে,—কী রে, বাইবেই দাঁড় কবিয়ে বাখবি নাকি? ভেতরে ঢুকতে দিবি না?

তৃণা দ্রুত সামলে নিল নিজেকে,—তোকে বাইরেই দাঁড করিয়ে রাখা উচিত। তুই আসবি না।

—যা যাহ্। এটা তোর বাড়ি নাকি? সুকান্তব বাড়ি।

তৃণাকে প্রায় ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিল বিশ্বজিৎ। তৃণাব যে কী হয়ে গেল, বাচ্চা মেয়েদের মতো খপ্ করে চেপে ধরেছে বিশ্বজিতেব হাত। চোখ পাকিযে বলল,

—ইশ, দেখি আমি না ঢুকতে দিলে সুকান্ত কেমন তোকে ঢুকতে দ্যায়।

সুকান্ত ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে এসে গেছে। হাতে বিশ্বজিতেব স্যুটকেস। ভাবী। প্রকাণ্ড। চাকা গড়িয়ে স্যুটকেসটাকে ফ্ল্যাটে ঢোকাচ্ছিল সুকান্ত, হাসতে হাসতে ফিবে তাকাল,—বলেছিলাম না, তৃণা তোকে দেখলেই ঝাড় দেবে।

ছদ্ম ভয়ে বিশ্বজিতেব চোখ পিটপিট,—তোব বউ কি সত্যি সত্যিই মারধর কববে নাকি রে?

—করবই তো। এতদিন আমাদেব ভুলে ছিলি তাব শাস্তি নেই?

—কী দিয়ে মারবি? বেলনচাকি, না খুন্তি?

—ঠিক আছে, ভেতবে আয়, তারপর দেখছি।

তৃণা হাতটা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎ এক লাফে ফ্ল্যাটের ভেতব। চোখ ঘুবিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ফ্ল্যাটটাকে। চোখ ঘোবাতে ঘোবাতেই বলল,—তোব একটা মিনি এডিশন থাকাব কথা না বাড়িতে? কোথায় সে?

—তুই আমাদের এত খবর রাখিস নাকি? তৃণা ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ল না।

—বাহ্, পৃথিবীতে একটা মিনি তৃণা এসে গেছে, আমি জানতে পারব না?

—ঘোড়ার মাথা। নিশ্চয়ই সুকান্ত তোকে রাস্তায় বলেছে।

—উঁহু, টেলিপ্যাথিতে জেনেছি। বিশ্বজিৎ সোফায় গা ছড়িয়ে দিল। পা দুটোকে তুলে দিয়েছে সেন্টার টেবিলে। পাখার দিকে মুখ তুলে শার্টের বোতাম খুলছে পুট পুট,—নিয়ে আয়, সে বেটিকে নিয়ে আয়।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল,—সত্যি তো, মেয়েটাকে দেখছি না কেন? কোথায় গেল?

—পাশের ফ্ল্যাটে। সবস্বতী নিয়ে গেছে। তৃণা টেরচা চোখে বিশ্বজিতের দিকে তাকাল,—জাঁহাপনা, এখন কীভাবে আমরা সেবা করতে পারি আপনার?

—চটপট কফি করে নিয়ে আয়। সারা রাত ট্রেনের চা কফি খেয়ে জিভ হেজে গেছে। শুধু কফি দিবি কিন্তু। নো বিস্কুট ফিস্কুট। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া তো দেখি।

অবিকল আগের মতোই হুকুমদারি ভঙ্গি। অভ্যাসটা বদলায়নি। চা কফি এখনও শুধুই খায়।

সুকান্ত আর বিশ্বজিৎ গল্প করছে, রান্নাঘর থেকে কান পেতে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল তৃণা। সুকান্তই বলছে কী সব, ভাল শোনা যাচ্ছে না।

সুকান্তর কথা বলার ধরনটাই এরকম। স্বর সর্বদাই নিচু তারে বাঁধা। উচ্ছ্বাস, বিরক্তি, প্রেম, অপ্রেম সবই বড় পরিশীলিত সুকান্তর। তবকে মোড়া। চিরকালই।

বিশ্বজিৎ ঠিক উল্টো। লাগাম ছেঁড়া! উদ্দাম।

এখনও কী জোরে জোরে হাসছে বিশ্বজিৎ!

তৃণার বুকটা শিরশির করে উঠল।

এক সময়ে বিশ্বজিতের ওই হাসিতে গমগম করে উঠত যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। এক সময়ে ওই হাসিতেই পুরোপুরি হিপনোটাইজড সেই মেয়েটা। তৃণা বসু। থার্ড ইয়াব কেমিস্ট্রি।

কী বোকা! কী বোকা!

গুব গুব কফির জল ফুটছে। তৃণা তিন কাপ কফি করে ড্রয়িংরুমে এসে দেখল সবস্বতী ফিরেছে মেয়েকে নিয়ে। সুকান্তর কোলে বসে আছে টুকি, আর তাকে একটুখানি কাছে টানতে প্রাণপণ ডাকাডাকি করে চলেছে বিশ্বজিৎ। মাত্র চোদ্দ মাসের টুকির আপন পব বোধ বড় টনটনে, সে-ও কিছুতেই যাবে না অচেনা আগন্তুকেব কাছে।

তৃণা খিলখিল হেসে উঠল,—আমার মেয়ে মানুষ চেনে বে!

—তাই তো দেখছি। বিশ্বজিৎ হাল ছেড়েছে এতক্ষণে,—মিনি তৃণাব খুব গুমোর।

—গুমোর কেন হবে? আমার মেয়ে খুব রিজার্ভড। সহজে উল্টোপাল্টা লোকের কাছে ধরা দেয় না।

—তোর থেকে তা হলে বুদ্ধিমতী হবে বল?

—হবেই তো।

শেষ শব্দ দুটোতে হঠাৎই জোর পড়ে গেল। বিশ্বজিৎ কি থমকাল একটু? তৃণা

অপ্রস্তুত সামান্য। অকারণেই ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করেছে হঠাৎ। তাড়তাড়ি কফি খেয়ে বাজার যাওয়ার জন্য তাগাদা দিল সুকান্তকে। মেয়েকে কোলে ঝুলিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল, বেরোল। চটপট ময়দা মাখার জন্য হুকুম ছুঁড়ল সরস্বতীকে। রান্নার লোকটা এখনও কাজে এল না বলে গজগজ করল।

বিশ্বজিৎ কিন্তু দিব্যি নির্বিকার। আয়েস করে চুমুক দিচ্ছে কফিতে। সিগারেট ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছাড়ল—এই, তোদের আজ কী মেনু রে?

—সাসপেন্স। খাবার টেবিলে দেখতে পাবি।

—মাংস হচ্ছে তো? কষা কষা?

—তাও দেখতে পাবি।

—রাধছে কে তুই না তোর রান্নার লোক?

—যদি আমিই রাঁধি, আপত্তি আছে?

—তা একটু আছে বইকি। নুনে পোড়া, চিনি গোলা মাংস আজ আর কিন্তু খেতে পারব না ভাই।

বিশ্বজিতের দেখাদেখি সুকান্তও হাসছে মিটিমিটি,—আরে না না, তৃণা এখন অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে।

—পাল্টেছে বলছিস?

—টেস্ট করে দ্যাখ।

—সেই দেখতেই তো আসা। বিশ্বজিতের চোখ নাচছে,—কী রে তৃণা, পরীক্ষায় পাশ করবি তো?

তৃণা উত্তর দিল না। ঠোঁটের কোণে শুধু হাসি ফুটল অল্প। অথবা ফুটল না।

দুই

বিশ্বজিৎ স্নানে ঢুকেছে। সুকান্ত বাজারে।

তৃণা জলখাবার তৈরি করছিল। লুচি আর আলুর তরকারি।

ছোট ছোট গোল ময়দার লেচি আবর্তিত হয়ে চলেছে। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নিটোল আকার পাচ্ছে ক্রমশ।

তৃণাও ঘুরছিল। এক অদৃশ্য বেলনের চাপে।

...বারুইপুরের বাগানবাড়িতে পিকনিক জমে উঠেছে জোর। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদেয় সকলের পেট চনচন। রান্নার জায়গায় প্যান্ডেমোনিয়াম।

ব্রততী বলছে,—ইশ, কত নুন দিয়েছিস রে মাংসে!

—দেখি দেখি। একটু টেস্ট করি।

—এমা, সত্যিই তো। একেবারে নুনকাটা।

মাংসরাঁধুনি তৃণা কেঁদে ফেলেছে প্রায়,—কী হবে এখন?

কে যেন বলল, বোধহয় অনুরাধা,—একটু মিষ্টি বাড়িয়ে দে না, মেক-আপ হয়ে যাবে।

পড়িমড়ি ছুটেছে তৃণা। বিকেলে কফি করার জন্য যতটা চিনি রাখা ছিল, সবটাই ঢেলে দিল হাঁড়িতে।

শেষ দুপুরে সার সার পাত পড়েছে বাগানবাড়ির লম্বা চাতালে। মাংসের ঝোল মুখে দিয়েই কোরাসে চেঁচাচ্ছে সবাই,—তৃণা তুই ডাহা ফেল। তৃণা তোর বিয়ে হবে না। তৃণা তুই ডাহা ফেল। তৃণা তোর বিয়ে হবে না।...

ইচ্ছে করেই কি দিনটার কথা মনে করিয়ে দিল বিশ্বজিৎ? না কথার ছলেই কথা? নাকি বুকে কাঁটাটা রয়ে গেছে বলেই সাধারণ একটা কথাকে অনর্থক জটিল করে তুলছে তৃণা! মনে মনে।

ছোট্ট একটা আনমনা শ্বাস পড়ল তৃণার।

কাঁটাটাই রয়ে গেল। ফুলটা নেই।

...বারুইপুরের বাগানবাড়িতে কোত্থেকে এক গোলাপ ফুল তুলে এনেছে বিশ্বজিৎ। ইয়া বড়। টুকটুকে লাল। ফুল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক।

অঞ্জন ঠাট্টা করে বলল,—তুই কি শাজাহানের রোলে অ্যাক্টিং করছিস নাকি?

বিশ্বজিতের চোখ ঢুলুঢুলু,—অ্যাক্টিং নয়, অ্যাক্টিং নয়। আমি এখন রিয়েল শাজাহান। ইন সার্চ অফ মাই মমতাজমহল।

—ফুলটাও কি তার জন্য?

—অফকোর্স। তাকে পেলে তারেই দিব বুকের এই গোলাপখানি।

খ্যাপা। একদম খ্যাপা।

বিশ্বজিতের খ্যাপামি কলেজবিখ্যাত। রীতিমতো প্রবাদ। নিত্যনতুন কী যে সব অদ্ভুতুড়ে শখ চাগাড় দিয়ে ওঠে পাগলটার মাথায়! একবার বেশ কিছু দিন পকেটে একটা সাদা ইঁদুর নিয়ে আসতে শুরু করল ক্লাসে। সুতোয় বাঁধা ইঁদুর যখন তখন ক্লাসরুমে ছেড়ে দিচ্ছে। সুতোর প্রান্ত ধরে ছোটাচ্ছে প্রাণীটাকে। একবার এর গায়ে, একবার ওর গায়ে। কখনও শাড়িতে, কখনও সালোয়ার কামিজে। ক্রসকান্ট্রি রেস। রাজেশ্বরী তো একদিন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল ভয়ে। সে এক বিদিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি। আরেক বার তো মহা বিভ্রাট। ল্যাব থেকে ইথাইল অ্যালকোহল চুরি করে খেয়ে ফেলল বিশ্বজিৎ। নেশা হয় কিনা দেখার জন্য। ভাগ্যিস দু-ঢোঁক খাওয়ার পরেই হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে বন্ধুরা! তাও বমি টমি করে কেলেঙ্কারি! মাঝে তো কদিন উধাওই হয়ে গিয়েছিল গেরুয়া পরে। সন্ন্যাসী হবে। মাধুকরী করে কাটাবে জীবন। উপোসে শুকিয়ে কাঠি হয়ে বিশাখাপত্তনম থেকে ফিরে এল।

সেই বিশ্বজিৎ করে পুষ্পচয়ন! পারেও বটে!

গোলাপটাকেও তাই নতুন পাগলামি ভেবে হাসাহাসি করছে বন্ধুরা। মেয়েরা তো বেশি করে। শুধু তৃণার মনই যে কেন অন্য কথা বলে!

...শেষ বিকেলে বাগানবাড়িতে ঝাঁকড়া লিচুগাছের নীচে ফুল হাতে উদাস শুয়ে আছে বিশ্বজিৎ। একা একা।

ভিড় এড়িয়ে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেছে তৃণা,—গোলাপটা প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারলি না?

শুয়ে শুয়েই তৃণাকে দেখছে বিশ্বজিৎ। প্রাণ ভরে শুঁকল একবার গোলাপটাকে,—দেব?

তৃণার গলা গভীর,—গোলাপটা তুই কাকে দিতে চাস, আমি জানি।

—তুই কি জ্যোতিষচর্চা শুরু করেছিস নাকি? দাড়ির আড়ালে বিশ্বজিতের মুখ ঝিকঝিক।

তৃণা দুম করে বলে ফেলল,—দে, ফুলটা আমাকে দে।

বিশ্বজিৎ তড়াক করে উঠে বসল,—তোকে! কেন?

মুহূর্তের জন্য ব্রীড়ায় আনত তৃণার মুখ। পরক্ষণে বিবেবাক হেনেছে,—আমি নিজে থেকে চাইছি, তুই আমাকে দিবি না?

বিশ্বজিৎ সময় নিচ্ছে। আচমকা বলে উঠল—চল, আমার সঙ্গে এক্ষুনি তা হলে পালিয়ে চল।

—কোথায়?

—প্রশ্ন নয়। যাবি কিনা বল?

—পাগলের মতো কথা বলিস না।

বিশ্বজিৎ হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল,—ভয় পেয়ে গেলি তো?

তৃণা নীরব।

বিশ্বজিৎ ফুলটা বাড়িয়ে দিয়েও সরিয়ে নিল,—নাহ্, এ ফুল তোকে দেওয়া যায় না। দেওয়া উচিত নয়।

—থাক। চাই না আমি।

—রাগ করিস কেন? তোকে গোলাপ দেবে অন্য কেউ। নবীন জাদুকরের মুখ থেকে হাসি মুছেছে পুরোপুরি,—তুই সুকান্তকে ফেরাস না তৃণা। ছেলেটা সেই কবে থেকে তোর জন্য বাটন্‌হোলে লাল গোলাপ লাগিয়ে বসে আছে, সে খবর রাখিস?

থাকুক। থাকুক।

তৃণা মানতে চায়নি। তৃণা অবুঝ হয়েছিল। তৃণা তর্ক জুড়েছিল। তৃণা জোর করে কেড়ে নিতে চেয়েছিল গোলাপটাকে।

অটল বিশ্বজিৎ রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিল তৃণাকে। একটা পিতল বঙের বিকেল সিসে বরন হয়ে গেলে।

কী অপমান! কী অপমান!

তৃণাকে দেখলে এড়িয়ে যায় বিশ্বজিৎ। তৃণাকে দেখলে ভিড় খোঁজে।

কীভাবে যে ইউনিভার্সিটির শেষ ক'টা বছর কেটেছিল!

একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। কার সঙ্গে নীড় বাঁধা ভাল? যাকে তৃণা ভালবাসে, তার সঙ্গে? নাকি যে তৃণাকে সত্যি সত্যি চায়, তার সঙ্গে? সুকান্ত কী কম ভালবেসেছে তৃণাকে! সুকান্তর মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান আছে, বাস্তববুদ্ধি আছে, তৃণার জন্য সর্বগ্রাসী আকুলতাও আছে একটা। এর বেশি আর কী চায় নারী!

তবু যে কেন তৃণার বুক টিপটিপ!

বিশ্বজিতের চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই! এত দিন পরেও!

স্পিড পোস্টে চিঠিটা এল পরশুদিন। কানাডায় চলে যাচ্ছে বিশ্বজিৎ। দেশ ছাড়ার আগে কুচবিহার যাবে আগে। বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে সকালের ট্রেনে কলকাতায় এসে প্লেন ধরবে পরদিনই ভোরে। একটা পুরো দিন তৃণাদের বাড়িতে কাটাতে চায় বিশ্বজিৎ। সুকান্ত যেন অতি অবশ্য স্টেশনে আসে।

কেন এসেছে বিশ্বজিৎ? তার প্রত্যাখ্যানে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্কটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাজিয়ে দেখতে চায়? যাওয়ার আগে?

কে জানে।

তিন

স্নান সেরে বেরিয়েছে বিশ্বজিৎ। বেরিয়েই যথারীতি শুরু হয়েছে হাঁকডাক,—কিরে, খেতেটেতে দিবি? পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে।

সরস্বতীকে রান্নাঘরের দায়িত্বে রেখে ডাইনিং টেবিলে এল তৃণা,—নে। খা।

—এ কী রে! বিশ্বজিতের চোখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি,—কটা লুচি দিয়েছিস? দুপুরে কিছু খেতে না দেওয়ার মতলব আছে নাকি?

—কিছু বেশি দিইনি। খেয়ে নে। দুপুরে যা মেনু আছে, খিদে না থাকলেও ঠিকই খেয়ে নিবি।

—কী মেনু?

—বলেছি না সাসপেন্স। তৃণা ঠোঁট টিপে হাসছে,—দেখিস আজ, নুন মিষ্টি সব ঠিকঠাক থাকে কিনা।

কথাটা যেন কানেই ঢুকল না বিশ্বজিতের। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে লুচি ছিঁড়ছে।

তৃণা খাওযাটা দেখছিল। এখনও বিশ্বজিৎ আগেব মতোই গোগ্রাসে গেলে। যেন এক্ষুনি কেউ কেড়ে নেবে থালাটা।

একটা মায়া জাগছিল তৃণার। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁবে, তুই যে চলে যাচ্ছিস, তোর মা বাবার কী হবে?

—কী আবার হবে! যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

—তোর তো আর ভাই বোন নেই, বিপদ-আপদে দেখবে কে?

—কলকাতায় যখন পডতে এসেছিলাম তখন কে দেখেছিল? বাইবে বাইরে চাকবি করে বেড়াচ্ছি, এখনই বা দেখছে কে?

—তাও তো দেশেই ছিলি। কাছাকাছি।

—দূর, বাবা-মা'র আমাকে ছাড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। খাগড়াবাড়ি আর মদনমোহনতলা করে দিব্যি দুজন বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বলতে বলতে মুখ তুলেছে বিশ্বজিৎ,—পৃথিবীতে কারও জন্যই কোথাও কিছু আটকায় না রে।

তৃণা চুপ একটুক্ষণ। কথা খুঁজছে। ঠিক ঠিক সময়ে কথা না এলে কী যে চাপ বাড়ে মনের ওপর! চাপটাকে তাড়াতে আন্‌তাবড়ি বলে উঠেছে,—তুই এখনও বিয়ে করলি

না কেন? বয়স হলে তোকে দেখবে কে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসে গেছে,—বয়স হবে কী রে? বয়স তো হয়ে গেছে। দেখছিস না চুলে পাক ধরেছে?

—ফাজলামি করিস না। পঁয়ত্রিশ বছর আবার একটা বয়স নাকি? বলিস তো মেয়ে দেখি। টুপ করে কানাডা থেকে এসে টোপর পরে যাস।

—মাথা খারাপ! আমি বলে ওই ভয়েই মানে মানে কাটছি। আবার ফিরব গাঁটছড়া বাঁধতে?

—বুঝেছি। বুঝেছি। বিদেশে গিয়ে মেম বিয়ে করার শখ হয়েছে।

—নারে ভাই। মেম-টেম আমার পোষাবে না। আমি হলাম গিয়ে পাত পেড়ে খাওয়া পার্টি, আমার কি কাঁটা চামচ বউ চলে? পাঞ্জাবের তন্দুরিই বলে হজম করে উঠতে পারলাম না।

—কী রকম? কীরকম? তৃণার বুকে চকিত কৌতূহল।

—সে এক মজার কাহিনী। মাঝে কয়েক দিন চণ্ডিগড় থেকে সোলানে গিয়েছিলাম চাকরি করতে। মদের কারখানার কেমিস্ট। তা হল কী, সেখানে আমার বস ছিল এক পাহাড়ের মতো সর্দার। দুম করে সর্দারজির মেয়ে আমার প্রেমে পড়ে গেল। যখন তখন আমার কোয়ার্টারে এসে হানা দেয়। যত বলি ওগো ছাড়ান দাও, কোম্‌লি নেহি ছোড়তি। ছোট্ট টাউন, ওখানে কোনও কথাই কারও কাছে গোপন থাকে না, সর্দারজিও একদিন জেনে গেল ব্যাপারটা। কিংবা কে জানে মেয়েও হয়তো বলে থাকতে পারে। শুনেই সর্দারজি চড়াও আমার ওপর। পারলে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শতদ্রু বিপাশায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

—মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার জন্য?

—উঁহু, প্রেমে সাড়া না দেওয়ার জন্য। একটা মেয়ে যেচে তোমার কাছে প্রেম নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও, এত বড় সাহস! তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।

তৃণার চোখ স্থির,—তারপর?

—তারপর আর কী। আমি ল্যাজ গুটিয়ে ব্যাক টু চণ্ডিগড়। তা সেখানেও ধাওয়া শুরু করল মেয়েটা। আমাকে ছাড়া নাকি বাঁচবে না। বাপস্‌, জব ভাউচারটা পেয়ে জোর বেঁচেছি।

তৃণার চোখের পাতা অচঞ্চল তবু,—মেয়েটা বুঝি দেখতে ভাল নয়?

—নাহ্‌। সুন্দর। সুন্দরই। গুড ফিগার, টানাটানা নাক চোখ, টকটকে রং। হিস্ট্রি না পলিটিকাল সায়েন্স কিসে যেন এম এ। গুরু নানক ইউনিভার্সিটির। গজলের গলাটিও খাসা।

—বিয়েটা তা হলে করলি না কেন?

—ওই, হয়ে উঠল না। ভাবলাম আটকা পড়ে যাব। বিশ্বজিৎ কথা ঘোরাতে চাইছে এবার,—সুকান্তটা এখনও ফিরল না কেন রে বাজার থেকে?

তৃণা তবু খোঁচাচ্ছে বিশ্বজিৎকে—কথার উত্তর দে আগে। বিয়ে কি গারদ, যে আটকা পড়ে যাবি?

—গারদ নয় বলছিস?

—নয়ই তো। সুকান্তকে দেখে বুঝছিস না?

বিশ্বজিৎ খাওয়া শেষ করেছে। বেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। ফিরে এসে হাত মুছছে তোয়ালেতে। প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বদলেই ফেলল,—তোদের মেয়েটা কিন্তু দারুণ দেখতে হয়েছে। বার্বি ডলের মতো মুখ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তোর সঙ্গেই বেশি মিল, নারে?

তৃণা হেসে ফেলল,—কথা ঘোরাতে তোষামোদ শুরু করলি কেন?

—ধরে ফেললি? বিশ্বজিৎ হেসে উঠেছে শব্দ করে,—তুই বেশ চালাক হয়েছিস দেখছি।

—তোর কি ধারণা বোকাই থাকব?

—থাক। আর ঝগড়া করিস না। বিশ্বজিৎ হাসি ধরে আছে মুখে,—যা তোর মেয়েটাকে নিয়ে আয়। একটু আদর করি।

—ওকে তো আর আনা যাবে না। তৃণা মজা করল একটু।

—কেন?

—তোর মিনি তৃণা ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলেও জাগবে না।

—স্ট্রেঞ্জ! এই তো জেগে ছিল। আমাকে কাটানোর জন্য মেয়েটাকে ক্লোরোফর্ম ট্রোলোফর্ম করে দিলি নাকি?

—দিতেও পারি। তৃণার হাসি বাড়ল। অকারণে হাসছে খিলখিল,—কাজের কথায় আয়। তোর গোলাপটা তা হলে এখনও কাউকে দেওয়া হল না?

বিশ্বজিৎ সিগারেট ধরিয়েছে। রহস্যময় ধোঁয়া ভাসাচ্ছে হাওয়ায়,—গোলাপটার কথা তবে এখনও তোর মনে আছে?

তৃণা মনে মনে বলল, ভুলতে পারলাম কই।

চার

দুপুরে জব্বর হল খাওয়াটা। ইলিশ মাছ, ভেটকির ফ্রাই, পোলাও, মাংস, রসমালাই। খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল বিশ্বজিৎ। শুনতে শুনতে পুলক জাগার থেকেও তৃণার অস্বস্তি হচ্ছিল বেশি। সুকান্তর চোখ দুটোও হাই মাইনাস পাওয়ারের পিছন থেকে প্যাটপ্যাট হাসছিল যে!

খেয়ে দেয়ে খানিকটা ভাতঘুম দিল বিশ্বজিৎ। ও ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে। তারপর উঠে বিকেল নাগাদ বেরোল সুকান্তকে নিয়ে। টুকিটাকি কী যেন সওদা করবে। পুরনো দু একজন বন্ধুকেও মুখ দেখিয়ে আসবে একবার।

ফিরল সন্ধ্যের অনেক পরে। সঙ্গে দু হাত ভর্তি খেলনা। টেডি বিয়ার, দম দেওয়া রোবট, চোখ পিটপিট পুতুল, লাল বল। খেলনা দেখিয়ে টুকির সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে বিশ্বজিৎ। টুকি তবু সুকান্তর কোলে অনড়।

বিশ্বজিৎ টুকির চুল ঘেঁটে দিল,—আয় না একবার। প্লিজ আয়।

টুকি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে উঠেছে,—নন্না। নন্না।

—একবারও আসবি না? বিশ্বজিৎ টেডি নাচাচ্ছে টুকির সামনে।

টুকি মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাদামি ভালুকের থেকে সুকান্তর কোলই এখন বেশি পছন্দ তার।

বিশ্বজিৎ নিজেই এবার নাচতে শুরু করেছে। অঙ্গভঙ্গি করছে বিচিত্র। হাসছে। লাফাচ্ছে। বিটকেল সুরে রাইম শোনাচ্ছে টুকিকে।

টুকি যেন একটু একটু মজা পেয়েছে এবার। সুকান্তর কোল থেকেই বিশ্বজিতের দিকে আঙুল দেখাল,—মাম্‌মা।

—মামা কী রে? বিশ্বজিৎ থমকে দাঁড়িয়েছে,—জেঠু বল।

টুকি আবার বলে উঠল,—মাম্‌মা।

—না, জেঠু।

—মাম্‌মা।

—মামা ডাকটা কে শেখাল রে? বিশ্বজিৎ হার মেনে হাসছে এতক্ষণে,—তুই নিশ্চয়ই?

তৃণার মজা লাগল,—কেন, মামা ডাকে তোর আপত্তি আছে?

—আপত্তি করলেই বা শুনছে কে? এখন তোর আর আমি ওকে কিছুই কমিউনিকেট করতে পারব না! হাসি ছড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গেল বিশ্বজিৎ।

বোধহয় গোছগাছ সারতে।

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে জোর আড্ডা জমল। বহুকাল পর। তিন বন্ধুর। শেষ আড্ডা।

কথায় কথায় সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল বিশ্বজিৎকে,—তুই কি কানাডায় পাকাপাকি ভাবে থেকে যাবি ঠিক করেছিস?

বিশ্বজিৎ গুছিয়ে বসেছে চেয়ারে,—পাগল! এ বান্দা কোনও এক জায়গায় বাঁধা থাকে না।

—তা হলে?

—গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। জানিস তো এককালে গ্লোবট্রটার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার? একবার যখন বেরোতে পেরেছি, এরপর কানাডা থেকে ইউ এস এ-তে ঢুকে পড়ব। নায়াগ্রা, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, মার্টোগ্রাসো, কিচ্ছু ছাড়ব না। তারপব আসব ইউরোপে। আফ্রিকার দিকেও যেতে পারি।

—তারপর?

—তারপর এশিয়া। বোখারা। সমরখন্দ চিনের পাঁচিল গোবি মরুভূমি।

—তারপর?

—অস্ট্রেলিয়াও যেতে পারি।

—তারপর?

এবার আর চট্‌জলদি উত্তর নেই বিশ্বজিতের। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাচ্ছে তৃণার দিকে, একবার সুকান্তর দিকে।

তৃণার চোখে ব্যঙ্গ ফুটল,—শরীরের জোশ যখন মরবে, তখন কী গতি হবে তোর?

বিশ্বজিৎ ঝপ করে বলে বসল,—আচ্ছা, তখন যদি তোদের কাছে ফিরে আসি, একটু জায়গা মিলবে না?

—আমাদের কাছে! তৃণার মুখে অপার বিস্ময়,—তুই এখানে আসবি?

—বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাব বল। বিশ্বজিৎ হাহা হাসছে,—ভেবে দ্যাখ, তখন কিন্তু অনেক মালকড়ি থাকবে আমার কাছে। আই উইল বি আ সলভেন্ট ম্যান।

এখনও ঠাট্টা? এখনও মজা?

তৃণার স্বর তীক্ষ্ণ হল,—সত্যি আসবি তুই?

বিশ্বজিৎ হেসেই চলেছে,—তখন আর তা ছাড়া গতি কী!

বৈশাখের নীল রাত ভারী মনোরম এক বাতাস ছড়াচ্ছে। বাতাসটাকে বুক ভরে টানতে চাইল তৃণা। বহু বছর পর। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে তিন বেতের চেয়ারে তিনটে বুড়ো বুড়ি বসে আছে। অনেকটা পথ ঘুরে এসে এক বৃদ্ধ কথা বলে চলেছে একটানা, এক বৃদ্ধ শুনছে, আর এক বৃদ্ধা নয়ন ভরে দেখচে দুই বৃদ্ধকে।

পাঁচ

কাকভোরে চলে গেছে বিশ্বজিৎ।

বন্ধুকে ট্যাক্সিতে তুলে দিতে গিয়েছিল সুকান্ত, ফিরে এসে আবার গড়িয়েছে বিছানায়। মেয়েকে আঁকড়ে ধরে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তৃণা পায়ে পায়ে পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। একটা মাত্র দিনের জন্য এসেছিল বিশ্বজিৎ। একদিনের জন্য সব ছড়িয়ে, আবার গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বন্ধ ঘরে এখন শুধুই এক হাহা শূন্যতা।

নাহ্, শূন্যতা কোথায়। তৃণা যে চোখ বুজলেই অনুভব করতে পারছে গন্ধটাকে। গোটা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে গন্ধটা। একটা টাটকা গোলাপের সৌরভ। ইয়া বড়। টুকটুকে লাল।

যাওয়ার আগে বিশ্বজিৎ তবে ফুলটাই দিতে এসেছিল তৃণাকে? নাকি এও শুধু তৃণারই মনগড়া উপলব্ধি?

তৃণা জানে না।

বৃষ্টির জন্যে

রাধানাথ মণ্ডল

বিকেলের দিকে একটু মেঘ দেখা যায় মাঝে মাঝে। ইস্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে মহিম একদৃষ্টে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মেঘ বৃষ্টির নয়, সে জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

কতদিন আগে সেই মেঘ দেখা গিয়েছিল এই গ্রামে? সময়টা মনে মনে হিসেব করতে করতে মহিম হাঁটে। চৈত্রের প্রথম দিকে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হয়ে থাকতেও পারে। ঠিক মনে নেই। শুধু সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল এবং বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত একটাই চিন্তা তাকে অস্থির করে রাখে, এক বছর, দু বছর, অনন্ত কাল ধরে সে দেখে আসছে এই বৃষ্টিহীন, শুকনো, নীরস দিনযাপন। আর এত রোদ—ছাতা ভেদ করে, চুল ভেদ করে, তালু ভেদ করে চলে আসছে তার উত্তাপ, মনে হয় শরীরের সবটুকু রসের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। প্রায়ই তার ভয় হয়, এই বুঝি সে আর থুথু ফেলতে পারবে না, শরীরের সজল নিয়ম সব ভুলে যাবে। রাত্রিবেলা রমলা যখন খুব কাছ ঘেঁষে আসে তার তখন—

এ কি মাঠ? আল রাস্তা ধরে যেতে যেতে মহিম ভাবে। শেষ শ্রাবণে মাঠের এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। একটু সবুজ নেই কোথাও। ঘাস নেই। জমিতে আগের বছরের ধানগাছের গোড়াগুলো পর্যন্ত আধপোড়া হয়ে আছে। মনে হয় প্রায় দিনই বাগাল ছেলেরা গোটা মাঠময় আগুন ধরানোর খেলা খেলে যায়।

এবছর ইস্কুলে ছুটি পড়েনি। প্রতি বছর তাদের ইস্কুলে বর্ষার ছুটি পড়ে। এ নিয়ম কবে থেকে চলে আসছে সে জানে না। শহরের ইস্কুলগুলি গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন দুপুরবেলা দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুমোয়, তখন তারা মর্নিং স্কুল সেরে বেলা এগারোটার ঠা-ঠা রোদে বাড়ি ফেরে। তারপর একদিন সময় পালটে যায়। যেদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়, সব লোকেরা হইহই করে মাঠে বেরিয়ে পড়ে, সেদিন সেও স্কুলে এসে নোটিশ বইয়ে লেখে, দিস ইজ টু নোটিফাই দ্যাট দি স্কুল উইল রিমেন ক্লোজড—গোটা একটা মাসের জন্যে ছাত্র-শিক্ষকদের কানে সেই যে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়ার আনন্দ, মহিম এবার তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

কিন্তু ছুটি না পড়লেও ইস্কুলে ছেলেরা এখন আসে না অনেকেই। এই দারুণ শুখার সময়ে প্রতিটি ছেলের রোজ রোজ ইস্কুলে হাজিরা দেওয়া, পড়াশুনো করা ঠিক আশা করা যায় না। মহিমের নিজেরও কেমন অর্থহীন মনে হয় সব কিছু। প্রতিদিন তালা খোলা, রুটিন ঠিক করা, ছাত্রদের সামনে খসখসে বইয়ের পাতা মেলে ধরা, মনে হয় এসবের কোনও তাৎপর্যই নেই। তার চেয়ে কোটিগুণ জরুরী এককোঁটা বৃষ্টি। এই গ্রামের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি গাছ, পাতা, ঘাস, এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘাসের চিন্তায় মহিমের হাসি পায়। ঘাস কই? এই যে কত বড় মাঠ পড়ে আছে এদিক থেকে ওদিক, এখানে একটাও কি ঘাস আছে? এক সময় ছিল। কিন্তু এখন আর ঘাস বলে চেনা যায় না তাদের।

অথচ এই সময় অন্যরকম দৃশ্যের কথা ছিল। এক হাঁটু কাদার ভিতরে লাঙল চলছে,

দুটি ছেলে গরুর পিছনে লাঙলের বোঁটা ধরে আছে একজন লোক। বীজতলায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে লোকেরা, উঁচু ধানের চারায় তাদের মাথা দেখা যায় না। হয়তো এই অবেলায় প্রচুর বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে, চাষী দৌড়ে গিয়ে আলের উপর জবুথবু হয়ে বসে পড়ল তালপাতার পেখে মাথায়, জমির মাঝখানে কালো কুচকুচে রঙের মোষ ভিজছে, তার পিঠের উপরে বসেছে ধবধবে বক। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মহিম নিজে বর্ষার ছুটিতে কতবার যে এই দৃশ্যের অংশীদার হয়েছে!

ইস্কুল থেকে মহিমের বাড়ির দূরত্ব—কত হবে? আধ মাইল? তা হতে পারে। একটা মাঠের ব্যবধান ঠিক মাইল দিয়ে মাপা যায় না। শহরে হলে সময়ের হিসেবে মাপা হত। এখানে একটা মাঠ। বহু বহুবার সে এই মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটেছে। এই আঁকাবাঁকা আল রাস্তা, যেতে যেতে দুপাশের এই জমিগুলো তার ভীষণ চেনা। কতবার যে সে এদের চেহারা বদলে যেতে দেখেছে।

আল কেটে তৈরি হয়েছে গরুর গাড়ির লিক। বর্ষায় এগুলো বুজিয়ে দেওয়া হয়। এ বছরে এখনও বুজোনো হয়নি। মহিম ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরিয়ে যায় লিকগুলো। একটা ক্যানাল পড়ে রাস্তার মাঝখানে। মহিম একটু থামে। এখানে ধুতি তুলে সাবধানে পা ফেলে পেরিয়ে যেতে হত। এখন একটা মরা সাপের মতো শুয়ে আছে এই ক্যানাল। শুকনো খড়খড়ে কাঁকর আর বালি। এখন দশ হাত মাটি খুঁড়লেও এক আঁজলা জল বের করে আনা যাবে না। বেশ কয়েকটা শ্যালো টিউবওয়েল হয়েছিল গ্রামে। এই অঞ্চলে সভ্যতার একমাত্র চিহ্ন। কিন্তু এখন জলের লেয়ার চলে গেছে বহু নিচে, পাঁচ ঘোড়ার শক্তি তাকে আর মাটির উপরে তুলে আনতে পারে না।

তবু নিশ্চয় এর একটা বিহিত হবে—মহিম ভাবে। এতগুলো লোক কিছুতেই শুকিয়ে যেতে পারে না। মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় যে চাষ, তা কি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে? ডিভিসি, কংসাবতী—এত সব পরিকল্পনা হয়েছে, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে আছে একটা জনদরদী সরকার, জলের অভাবে একটা গোটা বছর মানুষেরা কি ধুঁকতে পারে? প্রতিদিন বিকেলে তিন ক্রোশ দূরের জীবনপুর বাসরাস্তার মোড় থেকে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে চড়ে পাকখাওয়ানো অবস্থায় আসে খবরের কাগজ। হ্যারিকেনের আলোয় তা মেলে ধরে মহিম। খরা নিয়ে জরুরী মিটিং বসছে মন্ত্রিসভার, কেন্দ্র থেকে সমীক্ষক দল আসছে জেলায় জেলায়—মেদিনীপুর, বর্ধমান কিংবা বাঁকুড়ায় তারা সরেজমিনে দেখে যাবে সব কিছু। তারপর দিল্লি থেকে আসবে সাহায্য, ক্যানাল উপচে জল আসবে, বীজধান আবার ফেলা হবে মাঠে। এটা বিংশ শতাব্দীর শেষ, এখনও শুধুমাত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকতে হবে মানুষকে—এ কি কখনও হয়?

মহিম সন্ধেবেলা একবাটি মুড়ি দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে খায়। তবু এক এক দিন রমলা মুড়ির বাটি নিয়ে এলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। খাব না মুড়ি। ফেলে দাও। রোজ রোজ এই রুঠো মুড়ি কারও মুখে রুচতে পারে? মহিমের এই ব্যবহারে রমলা একটু অবাক হয়। সে একমুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তা না হয় রোচে না, কিন্তু রোজ রোজ তোমার ব্যবহার কেমন হচ্ছে, তা খেয়াল করেছ? মুড়ির বাটি নিয়ে রমলা চলে যায়। মহিম বুঝতে পারে, সত্যিই আজকাল তার ব্যবহার বড়ো রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু কি সে? গোটা গাঁয়ের লোকেরাও তো তার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করছে। প্রত্যেকে তাকে পর পর ভাবছে। যেন সে এ গাঁয়ের নয়। সেদিন কানাই গায়েন

বলল, তোমাদের আর কী মাস্টার, তোমাদের অজন্মা নাই, শুকো নাই, মাস গেলে উপর থেকে মাইনেটা ঠিকই আসবে। কিন্তু আমাদের কী হবে বলো তো?

কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু মহিম নিজে কি অনুভব কবছে না সব কিছু? এই বৃষ্টিহীন দিন, এই খরা—এর থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেও কি চাইছে না প্রাণপণে! হতে পারে সে নিজে কখনও লাঙল ধরেনি, ছোটবেলা থেকে বাইরে বাইরে কেটেছে তার। কিন্তু পড়াশুনো শেষ করে সেও কি ফিরে আসেনি এই গ্রামে? এখানে মাস্টাবি করে বলেই নয়, সে এখন এই গ্রামেরই লোক, এখানে সে থাকে। এখানকাব সব লোকের সমস্যা তার নিজেরও সমস্যা। তবু কেন সবাই তাকে বাইরের লোক ভাববে?

একথা ঠিক, তার আচার-আচরণের সঙ্গে গাঁয়ের অন্য লোকেদের অমিল আছে। ছেঁচতে ছেঁচতে প্রায় মরে গেছে সব পুকুরগুলো। এখন পুকুর মানে পাঁকে ভার্তে ঘোলাটে জল। তবু সব লোকে গায়ে তিল তেল মেখে সেখানেই নাইতে যায়, তাতেই ডুব দিয়ে চলে আসে। মহিম তা পারে না। গাঁয়ের একমাত্র কুয়োয় সে স্নান কবে। দড়ি-বালতি হাতে যখন সে কুয়োতলায় দিকে যায়, দু-একজন টিটকারি দেয়, কী মাস্টার, চানে যাওয়া হচ্ছে নাকি? মহিম অস্বস্তিবোধ করে খুব। একটু অপরাধীও মনে হয় নিজেকে। যদি এই সময় কুয়ো শুকিয়ে যায়, যদি খাবার জল না মেলে, তাহলে সে যে গায়ে ঢেলে বালতির পর বালতি জল নষ্ট করেছে, লোকেরা তার জন্যে তাকে ক্ষমা করবে না।

রমলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে রাত্রিবেলা মহিমের একটু অনুতাপ হয়। সে ডাকে এই, শোনো। উলটো দিকে মুখ কবে রমলা শুয়ে থাকে। কোনো জবাব দেয় না, মহিম তাকে পাশ ফেরায়, নিজের দিকে টানে। বিয়েব পাঁচ বছরে রমলার কোনও সন্তান হয়নি। মহিম জানে, গাঁয়ে অনেকে তাকে বাঁজা বলে। রমলারও কানে গেছে সে কথা। বড়ো মায়া হয় মহিমের। রমলা আবও ঘন হয়ে এলে মহিম তাকে ছেড়ে দেয়। শুকনো মাঠের মতো নীরস অর্থহীন মনে হয় রমলার শরীর। প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে নিজের ভিতরে কোনও আবেগ নিয়ে আসতে পারে না। রমলা আবার দূরে সরে যায়। অসহ্য গুমোট এবং জমাট অন্ধকারের মধ্যে মহিমেব প্রতিটি নিস্ফল রাত কাটে।

দিন যায়। দুপুরের দিকে কখনও একচিলতে মেঘ সূর্য ঢেকে ফেললে গাঁয়ের সব লোক ঘরের বাইরে আসে। কপালেব উপর হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আবার বিকেলে সেই মেঘ পাশের গাঁ, তার পরের গাঁ ছাড়িয়ে সুদূর উত্তরে চলে গেলে লোকেরা হতাশ হয়। দুপুর, বিকেল, সন্ধে সবাই তাস খেলে, আড্ডা দেয়। নিষ্কর্মা দিনগুলিতে মাঝে মাঝে শোনা যায় চুরিডাকাতির খবর। মবা পুকুর থেকে মাছ ধরে চলে যায় কারা, সেই মাছ নামমাত্র দামে বিক্রি হয়, কিন্তু কেনে না বিশেষ কেউ। লোকেরা চাল খরচ করে সাবধানে, রাত্রিবেলা কড়া পাহাবায় রাখে ধানের বস্তাগুলি। এখন আর বাইরেব মরাই বা বাখারে ধান রাখে না কেউ, বস্তাবন্দী করে সেই ধান বিছানার পাশে রেখে ঘুমোয়।

মাঝে মাঝে নানা খবর আসে গ্রামে। যারা হাটে যায়, তাদের কেউ ফিরে এসে বলে, হুগলি জেলার নকুণ্ডায় বৃষ্টি হয়েছে গত শনিবার। শনিবাব? কখন? লোকেরা তাকে ছেঁকে ধরে। রাত দু পহরের সময়। জল দাঁড়িয়েছে মাঠে? না। তবে মাটি ভিজেছে। গাঁয়ের লোকেরা নকুণ্ডা-বাসীদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়। কেউ কেউ তার মামাবাড়ির গল্প বলে। তার মামাবাড়িতে নাকি প্রতি বছর সবচেয়ে আগে জল হয়। মামাদের সবই

জোলের জমি। সেখানে সবচেয়ে আগে ধান রোয়া হয়ে যায়।

—কিন্তু এবারে?

—এবারেও বোধ হয় হয়েছে। তবে ঠিক খবর পাইনি।

কেউ বলে কাল ভোরবেলা একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে তার গায়ে, মনে হচ্ছিল কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। কেউ বলে, রাত্রিবেলা পর পর দুদিন সে মেঘের ডাক শুনেছে। বড়ো স্পষ্ট সেই ডাক। বাছুরের হাম্বার মতো আকাশের একদিক আর একদিকের সঙ্গে যেন কথা বলছে।

এরই মধ্যে একদিন রাত্রে একটা থালার মতো চাঁদ বাঁশগাছের মাথা ছাড়িয়ে মহিমের উঠোন জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘুম ভেঙে মহিম দোতলার বারান্দায় রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখে। তার এই বারান্দা থেকে একদিকে দেখা যায় উঠোন, উঠোনের শেষে পাঁচিলের ওপাশে বাঁশগাছ, বিশাল আকারের তেঁতুলগাছ, একটু দূরে খড়ের গাদা। অন্য পাশে ধু ধু করছে মাঠ, মাঠের শেষে তাদের ইস্কুল, ইস্কুলের খুব কাছে আবছা হয়ে আছে দূরের গ্রামের সীমানা। এই দিগন্ত-বিস্তৃত জ্যোৎস্নায় সব কিছু আশ্চর্য এবং অলৌকিক মনে হয়। মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনও অভাব নেই। মহিম দেখে তাদের উঠোনে জড়ো করা আছে আবর্জনার স্তূপ, একধারে চার-পাকা উনুন, উনুনের পাশে উপুড় করা কালো কালো চারটে হাঁড়ি—দিনের বেলা ধান সেদ্ধ হয়েছে। পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে লাঙল, জোয়াল, এঁকড়ো, লাঠি-সোটা—বহুদিন ওদের ব্যবহার হয়নি। মহিম দেখে মাঠময় ছড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মায়া, অফুরন্ত মায়াবী আলো। মহিমের মনে হয়, আকাশ দু হাত উপছিয়ে ঝরিয়ে দিচ্ছে এই যে জ্যোৎস্না, এতে গোটা গ্রাম, গ্রামের মানুষজন, তাদের জমি-জিরেত, সুখ-দুঃখ, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব স্নিগ্ধ এবং ধন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি যে এমন অকৃপণ, এমন উদার এবং মহৎ হতে পারে, আজ ঘুম না ভেঙে গেলে জানতেই পারত না মহিম। অনেকটা সময় কেটে যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় মহিমের মনে হয়, সে খুব অন্যায় করছে। ছি ছি, তার এই মনোভাবের কথা গ্রামের অন্য লোকেরা যদি জেনে যায়, কী ভাববে? এই সময় আকাশ থেকে অন্য কিছু ঝরে পড়ার কথা ছিল। বড়ো নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর এই জ্যোৎস্না। মহিম খুব দ্রুত ঘরের ভিতরে চলে যায়।

পরের দিন মহিম ইস্কুলে গিয়েই ফার্স্ট পিরিয়ডে ছুটির নোটিশ দিয়ে দেয়। রেনি ভেকেশন শব্দটা লেখে না, তার বদলে লেখে বাৎসরিক ছুটি। চারদিকে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা একটা দারুণ আতঙ্ক ঘনিয়ে আসছে সকলের মনে মনে। ছাত্রেরা আসছে না, শিক্ষকদের পড়ানোয় আগ্রহ নেই, এই সময় ইস্কুল খুলে বসে থাকার মানে হয় না।

বাড়ি ফিরে আসতে রমলা বলে, শুনেছ?

—কী?

—আজ কুলিপুজো।

—কুলিপুজো?

—হ্যাঁ, গাঁয়ের সব লোক মিলে আজ কুলিরাস্তাকে পুজো করবে। কুলিপুজো করলে নাকি জল হয়?

—দূর! যত্ত সব!

—তুমি যাবে না?

—পাগল হয়েছ?

—গাঁয়ের সব লোক যাবে!

মহিম রেগে যায়। রমলার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি? আমাকে তুমি গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে এক করে দেখো? তুমি কী করে ভাবলে এসব কুসংস্কারে আমিও বিশ্বাস করব?

রমলা চুপ করে থাকে। মহিম আবার বলে, আমি তো যাবই না, তুমিও যাবে না।

হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে রমলার। আমার ইচ্ছে হলেও আমি যেতে পারব না।

মহিম একটু অবাক হয়। কেন?

রমলা কোনও উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। মহিম আবার জিজ্ঞেস করে, কেন, তুমি যেতে পারবে না কেন?

নিজের পায়ের আঙুল দেখতে দেখতে রমলা জবাব দেয়, কুলিপুজোয় শুধু ছেলেপুলের মায়েরা যেতে পারে, আর কেউ নয়।

একমুহূর্তে মহিম বোবা হয়ে যায়। তাকে কেউ যেন চাবুক মারে। সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ বহুগুণ হয়ে গিয়ে পড়ে গাঁয়ের লোকেদের উপর। এই উনিশশো বিরাশি সালেও তারা যা খুশি করবে, আর সেই যা খুশি করতে গিয়ে কারও মনে আঘাত দেবে? মহিমের ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্তে রমলাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। এখানে সত্যিই বাস করা যায় না।

বিকেলের দিকে দেখব না দেখব না করেও দৃশ্যটা চোখে পড়ে যায় মহিমের। এই সময় কুলিরাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে রোজ সে গ্রামের অন্য প্রান্তে বটতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, জীবনপুরের মোড় থেকে আসা ডাকহরকরা পাশের গাঁয়ের পোস্টাপিসে যাওয়ার পথে সাইকেল থেকে না নেমেই খবরের কাগজটা তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। সে কাগজ নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

যাবার সময় ব্যাপারটা দেখল মহিম। রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা কচুপাতা বিছানো হয়েছে। প্রতিটি পাতার উপর একগুচ্ছ করে শনফুল। মহিম শনগাছ দেখেছে, তার ডগায় ফুলও ফুটে থাকতে দেখেছে। কিন্তু আলাদা করে তুলে আনা এত শনফুল কখনও দেখেনি। বিকেলের আলোয় রাশি রাশি হলুদ শনফুল কাঁচা সোনার মতো টলটল করছে রাস্তার উপরে। মহিম দেখল ফুলের থেকে অনেক রেণু ধরে পড়ছে ধুলোয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-একবার মাড়িয়ে দিল মহিম।

এক জায়গায় কয়েক জন জটলা করছিল। তাদের ভিতর থেকে দু-একটা কথা ছিটকে এসে লাগল মহিমের কানে। ব্যাঙ পাওয়া যাচ্ছে না। কুলিপুজোয় নাকি ব্যাঙের খুব দরকার হয়। সন্তানবতী রমণীরা একটা ব্যাঙ নিয়ে কচুপাতার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। তারপর শনফুল দিয়ে পুজো করা হবে সেই ব্যাঙের। পুজোর পর একটা গর্তে রেখে জল ঢালা হবে ব্যাঙের মাথায়। ব্যাঙ ডাকবে। ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টিও হবে।

কিন্তু ব্যাঙ পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রিবেলা কারা যেন হ্যাজাক জ্বালিয়ে এক পুকুর থেকে আর এক পুকুরে ঘুরে ঘুরে সব ব্যাঙ ধরে নিয়ে চলে গেছে। অনেক দামে কলকাতায় চালান দিয়েছে সেই সব ব্যাঙ। এখন পুকুরে পাঁকের উপরে, শুকনো নালায়, সারের ডোবাগুলোয় একটাও ব্যাঙ নেই। এই গ্রামে এখন ব্যাঙের দুর্ভিক্ষ? মহিম আশ্চর্য হয়।

কিন্তু ব্যাঙ যদি পাওয়া যেত? বৃষ্টির সঙ্গে ব্যাঙের ডাকের একটা সম্বন্ধ আছে মহিম জানে। প্রতিবার যখন বৃষ্টি নামে চারদিক থেকে হাজার হাজার ব্যাঙ কোঁ কোঁ করে ডেকে ওঠে। কিন্তু একটা ব্যাঙকে কি এভাবে জল ঢেলে ডাকানো যায়? আর ব্যাঙ ডাকলে কি বৃষ্টি আসে? মহিমের কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

ব্যাঙ ছাড়াই কুলিপুজো হয়ে গেল। খবরের কাগজ হাতে মহিম ফেরার পথে দেখল গাঁয়ের মেয়েরা একসঙ্গে একটা গর্তের ভিতরে জল ঢালছে কাল্পনিক এক ব্যাঙের মাথার উপরে। ব্যাঙ নেই, নিজেরাই মুখে ব্যাঙের ডাক ডাকছে আর সুর করে গাইছেঃ

খালে বিলে জল নাই,
মাঠে ঘাঠে নাই,
কুলি ভরে জল দাও
পেট ভরে খাই।

যেতে গিয়েও মহিম থামে। ভালো করে চেয়ে দেখে চারদিকে। গাঁয়ের সব মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ঘিরে আছে পুরষেরা। কলসি-ভর্তি জল সাজানো আছে চারদিকে, তার থেকে আঁজলায় ভরে নিয়ে গর্তের মধ্যে ঢালছে মেয়েরা। সকলের মুখে ওই একটাই কথাঃ খালে বিলে জল নাই—পুরুষেরা গলা মিলিয়েছে তাদের সঙ্গে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে দ্রুত। এই গ্রামের মাঝবরাবর যে একমাত্র রাস্তাটা, যাকে তারা কুলিরাস্তা বলে, সেখানে অন্ধকার হয়ে আসছে। বাঁশ গাছের উপরে পাখি ডেকে ওঠে, তাদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আসে। মহিম আস্তে আস্তে পা বাড়ায়। বহু দূর পর্যন্ত সমবেত কণ্ঠের ওই কথাগুলো তাকে তাড়া করেঃ খালে বিলে জল নাই, খালে বিলে জল নাই, খালে বিলে—যেতে যেতে মহিম রাস্তার দুদিকে তাকায়। তার মনে হয়, এই গ্রামকে সে চেনে না। বৃষ্টির জন্য ওই যে ব্যাকুল প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছে, তার মনে হয়, বহু শতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসছে ওই ডাক। একটু পরে যে রাত্রি ঘনিয়ে আসবে এই গ্রামে বহু হাজার বছর আগের সেই রাত।

সন্ধেবেলা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে খবরের কাগজটা খুলে ফেলে মহিম। পাতার পর পাতা জুড়ে নিষ্প্রাণ শব্দের স্তূপ। প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত মহিম তন্ন তন্ন করে খোঁজে। প্রাণপণ আগ্রহে পড়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। না, কোথাও এতটুকু, একবিন্দু সজল আশ্বাস নেই। বড্ড মন খারাপ হয়ে যায় মহিমের। মানুষ তাহলে বেঁচে থাকবে কী করে, কিসের আশায়?

রাত্রিবেলা মহিম খুব কাছে টেনে নেয় রমলাকে। ছেলেপুলে হয়নি বলে তোমার খুব খারাপ লাগে, তাই না? রমলা কিছু বলে না। সে চুপচাপ মহিমের বুকের উপর শুয়ে থাকে। হঠাৎ মহিমের শরীব টানটান হয়ে ওঠে। সে তার বুকের উপরে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ পায়। একফোঁটা জল। তারপর আর একফোঁটা। খুব দ্রুত তার হাত চলে যায় রমলার চোখে। দু-চোখ উপচে যাচ্ছে জলে। মহিম তা মোছাতে যায়। বলতে চায়, খুব বেশি তো দেরি হয়ে যায়নি, এখনও অনেক সময় আছে। পারে না। গরম ঘরে, অন্ধকার বিছানার উপরে সে স্থির হয়ে শুয়ে থাকে। অবিরল জলের ধারা তাকে আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয়।

ক্যারন্ত এ আঁ

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

'ক্যারন্ত এ আঁ! ক্যারন্ত এ আঁ!' আর্থাৎ 'একচল্লিশ!' একচল্লিশ আমার ঘরের নম্বর। একতলার রিসেপশানে আমার ফোন এলে এভাবে করিডব মাইকে ঘরের নম্বর ঘোষণা কবে হাঁক পাড়েন আমাদের ছাত্রাবাসেব কেয়ারটেকাব মাদাম কার্মস। ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে অনেক সময় এই ডাক শোনাও যায় না স্পষ্ট, কিংবা শুনেও মনে হয় ও ডাক আমার জন্য ন্য। তখন আশপাশের কোনও ঘবের ছেলে বা মেয়ে এসে দরজায় টোকা দিয়ে ডাকে, 'রাজীব!' অন্য সবার বেলাতেও এই রীতি। বিশেষত আমার পাশের ঘরের গ্রীক মেয়ে মারিয়া পাপলুসের ক্ষেত্রে। যতক্ষণ ঘবে আছে হয় মন দিয়ে অঙ্ক কষছে নয়তো বিয়াব খেয়ে ঘুমোচ্ছে। মাদাম কার্মাসের ডাক কখনও তার কানে পৌঁছয় না।

আজ কিন্তু এই নিয়ে তিনবার ডাক এল আমার। এবার লিফটে নামতে নামতে আমাব কেবলই মনে হচ্ছে এ ডাকটাও ভুল। যে 'ক্যারন্ত এ আঁ' নম্বর চাইছে হযতো সে আমাকে চাইছে না। আগের দু'বারই টেলিফোনের মহিলাকণ্ঠটিকে 'রং নাম্বাব' বলে চলে এসেছি। কিন্তু তারপরেও এই ডাক। সত্যিই ও কাকে চায়?

ফের রিসিভার তুলে বললাম, হ্যালো! আর অমনি ও প্রান্ত থেকে সেই সুবেলা ফরাসিণী কণ্ঠ, 'ক্যারন্ত এ আঁ?' ফের কিছুটা বিরক্তি দমন করে বললাম, হ্যাঁ। তবে আমাব মনে হয় ওই ঘরের আগের বাসিন্দাকেই আপনি চাইছেন। কী নামের লোককে আপনি চাইছেন বলুন তো?

মেয়েটি এবার বেশ দুষ্টুমির স্বরেই বলল, 'ক্যারন্ত এ আঁ'! হঠাৎ ভীষণ রাগ চড়ে গেল মাথায়, ভাবলাম দড়াম করে ফোনটা নামিয়ে দিই! মানুষের কাজেব সময় ঘন-ঘন ফোন করে নওছল্লা! পরমুহূর্তে ভাবলাম, আহা, থাক্। ও কী চায় দেখি। এবার 'আপনি' সম্বোধনকে 'তুমি'তে নামিয়ে এনে বললাম, একচল্লিশ বলছি, বলো কী করতে হবে?

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে এক দমকা হাসি ওপারে। সহসা লজ্জা হল, মেয়েটা বুঝিবা আমাকে নিয়ে মস্করা ফাঁদছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ফোনটা আর নামাতে পাবলাম না। বললাম, কী হে, মাদমোয়াজেল, এত হাসি কিসের? ওপাব থেকে আওযাজ এল, ভয় কেটেছে তাহলে, মঁসিয়ুব? এবার আর আমি কোন জবাব দিলাম না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বেশ ঠ্যাটা মেয়ে। হয়তো রসিকও।

একটু থেমে ও-ই বলল, বিকেলে কী কবছ মঁসিয়ুর? বললাম, কিছু না। কাফেতে বসে সময় কাটাব।

—আমার পছন্দসই একটা কাফেতে আসবে?

—সেটা কোথায়?

শাৎলে-লে-আলের কাছে। খুব খোলামেলা জায়গা। তোমার ভাল লাগবে।

—সেটার নাম কী?

—কাফে দ্রুজো।

—বুঝলাম। ও কাফে আমি চিনি। বাজে মেয়ের ভিড় হয় বড্ড।

—তা হোক না। আমিও তো বাজে মেয়ে। মন্দ লাগবে না।

এবার দুজনেই আমরা টেলিফোনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। আমি মন মনে ভাবলাম, বাপ্‌রে! এ মেয়ের সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। তারপরেই মনে ফের প্রশ্ন উঠল, ওকে চিনব কী করে? তাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু অতশত মেয়ের মধ্যে তোমায় চিনব কী করে?

—সে দায়িত্ব তোমার। যাকে তোমার আমি বলে মনে হবে তার পাশেই গিয়ে বসো।

—বসে কী নাম ধরে ডাকব?

মেয়েটি হঠাৎ করে নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও করল না। বলল, দেখি কী নামে তুমি ডাকো, আমাকে। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ ফোনটা নামিয়ে রাখল ওদিকে। আমি হতবুদ্ধির মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ফোন-হাতে। যে মেয়ের নাম জানি না, জীবনে কখনও দেখিনি, কী বয়স সে আন্দাজও নেই, তাকে একরাশ মেয়ের মধ্যে থেকে বারই বা করব কী করে? গলার স্বর যদিও বা শুনেছি তাও টেলিফোনে। আর যাকে-তাকে যা-তা নামে সম্বোধন করে কি মার খাব নাকি শেষে? ভাবলাম, দূর ছাই। যাবই না। আমার কী এত তাড়া? আলাপ করার এত রস থাকলে ও নিজেই ফোন করবে।

'যাব না, যাব না' এটা শুধু ভাবনাতেই থেকে গেল, যত দুপুর গড়াতে থাকল হৃদয়ের একটা তাড়না শুরু হল একটিবারের মতন মেয়েটিকে চাক্ষুষ করার। ক্রমে না যাওয়ার চিন্তা উবে গিয়ে প্রবল কৌতূহল আর আবেগ দাপাতে লাগল বুকের ভেতরটায়। একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম বটে, কিন্তু সমস্ত মন ছেয়ে রইল ওই না-দেখা মেয়েটার কথা ও কণ্ঠধ্বনি। আমি মাঝে মধ্যে ঘড়ি দেখতেও আরম্ভ করলাম।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি সিডে উনিভার্সিত্যার মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলাম শাৎলে-লে-আলের। আমার কামরায় ক'টি যুবতী ছিল, তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলাম এদের মধ্যে সেই মেয়ে যদি থাকে। কাজটা যে কত অবান্তর, কিছুক্ষণ পর সেই জ্ঞান হতে বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম নিজেই। এভাবে আদেখলের মতন মেয়েদের দিকে তাকালে মেয়েরাও মজা পায়। একটি মেয়ে তো ফিক করে হেসেই দিল, আর দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল জানলার দিকে। আমি বুঝলাম এটা আমার হাভাতেপনার জবাব।

লে-আলে এসে ভূমধ্যস্থ কনভেয়ার স্ট্রিপে চেপে শাৎলের দিকে চলে গেলাম। পরে এস্ক্যালেটরে চড়ে যখন রাস্তায় উঠে এলাম, তখন ঘড়িতে বাজে ছ'টা আর আকাশের আলো মিলিয়ে যায়-যায়। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে হন-হন করে হাঁটতে লাগলাম কাফে দ্রুজোর দিকে।

এর আগে কাফে দ্রুজোতে যে কখনও বসিনি তা' নয়। লে-আল বাজারের এক বিশেষ প্রান্তে পাথুরে রাস্তায় এক কোণে সারাদিন ভিড়ে জমজমাট এই কাফেতে কয়েকবার ঢুঁ মেরেছিলাম বাংলাদেশী বন্ধু রশিদের সঙ্গে। এখানে কোন্ মেয়ে

বারবণিতা আর কোন্ মেয়ে যে তা নয়, সেটা খুব অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া ঠাউরে ওঠা দায়। রশিদ তো বিশ্বাস করতে চায় না যে, এসব মেয়ের কেউ কেউ দেহপসারী। সমানে বলছিল, আমারে কইলে তো আমি যেভারে খুশি বিয়া করতে পারি। তখন ওকে প্রায় নিরস্ত্র করার জন্যই বললাম, তা মিএগা, তোমায় বিয়ে করছেটা কে? তখন কিছুটা আহত বোধ করে রশিদ বলল, তা ব্যাপ্যারে বিয়া নাই বা করলাম। ক্ষতিডা কী?

দ্রুজোতে আজও বেশ ভিড়। সামনে রাস্তায় একজন যাদুকর শীতের মধ্যেও খালি গায়ে আগুন গেলার খেলা দেখাচ্ছে। অন্ধকার আকাশের পটে সেই লেলিহান শিখা একটা চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জিপসি গোছের একটি দম্পতি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে স্প্যানিশ গান গাইছে। টেবিলে টেবিলে বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের জটলা, পানাহার। আমি দেখেশুনে একটা দূর প্রান্তের খালি টেবিল বেছে নিয়ে ওয়েটারকে অর্ডার করলাম, দু ভ্যাঁ ব্লঁ। অর্থাৎ সাদা ওয়াইন। এই সাদা ওয়াইন জিনিসটা আমার খুবই প্রিয়, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একলা-একলা সময় কাটাতে পারি কিছু সাদা ওয়াইন আর কড়া তামাকের সিগারেট নিয়ে। আমি ওয়াইন আসতে পকেট থেকে মার্লবরোর প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরালাম।

দু'চুমুক ওয়াইন পেটে পড়তেই নিজেকে খুব সুখী-সুখী লাগছিল। ভুলেই যাচ্ছিলাম আমি কেন এসেছি। হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে একটা খিল খিল হাসি। আমি চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, গোলাপী গাউন-পরা এক সদ্য যুবতী তার পাশের ছেলেটির সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে ঢলে ঢলে কথা কইছে। একবার ভাবলাম গলাটা সেই ফোনের গলা নয় তো? তারপরেই ভাবলাম, ধ্যুস। সে মেয়ে পুরুষের সঙ্গে বসে থাকবে কেন?

আমি আবার ঝিম মেরে বসলাম। এবার হঠাৎ চোখ পড়ল একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের দিকে। কালো সোয়েটার পরে এক মনে সিগারেট টানছে আর আগুনের খেলা দেখছে। আমার ঘোর সন্দেহ হল এই মেয়েই হয়তো সেই মেয়ে। আমি উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম। যেমন খদ্দেরের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়ায় ভাল ওয়েটার। মেয়েটা কিন্তু একমনে জাদুকরের কাণ্ড দেখে যাচ্ছে। জাদুকর ভুক্ ভুক্ করে আগুন খাচ্ছে আর হাঁ করে সেই আগুন ছুঁড়ে দিচ্ছে শূন্যে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি মেয়েটিকে কী নামে সম্বোধন করি। মেয়েটিও দেখি কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না আমার দিকে। আমি শেষে একটা দুটো ঢোক গিলে বললাম, ক্যারস্ত এ আঁ।

মেয়েটি এবার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো বটে কিন্তু সেই চাহনির কোনই মানে নেই। স্পষ্ট বুঝলাম আমার ছুঁড়ে দেওয়া কথাটার কোনও মানেই দাঁড়ায়নি তার কাছে। তখন তাড়াতাড়ি বললাম, পার্দোঁ মাদমোয়াজেল, জে ত্রাম্পে। অর্থাৎ, সরি ম্যাডাম, ভুল করে ফেলেছি।

ফের এসে নিজের জায়গায় বসলাম আর একটু বিষণ্ণও বোধ করলাম। কোন্ এক পাগলির টেলিফোন শুনে কি ঝঞ্ঝাটেই না পড়েছি। ফের চুমুক দিলাম ওয়াইনে আর নতুন একটা সিগারেট ধরানোর উপক্রম করলাম। হঠাৎ আমার কানের পাশেই সেই আধা-পরিচিত খিল খিল হাসি আর নিচু স্বরে ডাক, ক্যারস্ত এ আঁ?

আমি ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম কালো সোয়েটার আর সাদা স্কার্ট পরা সেই মেয়েটাকেই, যে একটু আগে আমার ডাক শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি ভয়ানক অবাক বোধ করে প্রায় তোৎলাতে তোৎলাতে বললাম, তু—তু—তুমি? মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ আমি বুদ্ধুরাম।

—তা' তখন ওরকম হাবাগোবার ভাব করলে কেন?

—দেখছিলাম তোমার মনের কতটা জোর। ভড়কে যাও কিনা।

—তা ভড়কে তো একটু গিয়েছিলাম। যাক গে, তুমিও তো আমায় চিনতে পারোনি।

—কে বললে চিনতে পারিনি? চিনতে পেরেছি বলেই তো না-চেনার ভাব করছিলাম।

এবার আমি সত্যি সত্যি দমে গিয়ে বললাম, ও! মেয়েটি তখন ওর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হাতটা ধরে অন্তত বসতে তো বলো। কতক্ষণ আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?

খুব লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে পাসের চেয়ারে বসলাম। আর জিজ্ঞেস করলাম কী পানীয় নেবে মাই ডিয়ার? মেয়েটি আমার শাদা ওয়াইনের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি। আমি ওয়েটারকে ডেকে আরও একটা শাদা ওয়াইনের অর্ডার দিলাম। তারপর টেবিলের ওপর আলতো করে রাখা ওর হাতটার ওপর আমার হাতটা পেতে বললাম, এবার তোমার নাম জানতে পারি কি, প্রিয়তমা?

সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই বিদ্রূপাত্মক খিল খিলে হাসি। এবার লজ্জা নয়, রাগই হল আমার। আমি ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরে বললাম, তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো এভাবে দু'জনে দু'জনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে গেলে কি কোনও বন্ধুত্ব হতে পারে? আর কেনই বা প্রয়োজন তেমন বন্ধুত্বর।

মেয়েটি আমার হাতের তলা থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখের ওপর চাপা দিয়ে বলল, শ—শ—শ। চুপ। এত রাগ করার কী আছে। নাম বলার কি সময় পার হয়ে গেছে? বরং তোমার নামটাই বলো আমাকে।

আমি রাগে গজরাতে গজরাতে বললাম, আমার নাম, 'ক্যারন্ত এ আঁ। আর অমনি উচ্চোরোলে হাসতে লাগল মেয়েটি। রাগ আমার একটু একটু চড়ছিলও আর হঠাৎ তা এমনই বিশ্রী পর্যায়ে উঠে গেল যে ওয়েটার যখন ওয়াইন নিয়ে টেবিলে এলো, আমি একটা দশ ফ্রাঁ-র নোট তার প্লেটে ছুঁড়ে দিয়ে খুব রূঢ় একটা 'মেসি' অর্থাৎ ধন্যবাদ মেয়েটিকে উপহার দিয়ে প্রচণ্ড জোরে পা চালিয়ে কাফের থেকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর সেই অদ্ভুত গতিতে হাঁটতে থাকলাম নদীর দিকে। মাথাটা আমার অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে, নদীর পাশে না গেলে তা' আর ঠাণ্ডা হওয়ার উপায় নেই। নাম-না-জানা এই উটকো মেয়েটিকে আমার এখন একটা বেশ্যা বলেই মনে হচ্ছে।

আমি জোরে হাঁটলে সেটা সত্যিই খুব জোরে হাঁটা হয়। বড্ড অল্প সময়েই তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই। এক্ষেত্রেও হাঁটার স্পিড এত অস্বাভাবিক বেশি হয়ে গিয়েছিল যে নিজে ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই দেখি সোন নদীর এত উপর পঁ ন্যফ বা নতুন ব্রীজের গোড়ায় চলে এসেছি। আমার সম্বিৎ ফিরে এলো নদীর ওপারে আলোর মালা, নদীর কালো জলে সেই প্রতিফলিত সেই আলোর সারি আর একটুকরো চাঁদ আর নদীর

দূর কোণ থেকে ভেসে আসা স্টিমারের যান্ত্রিক ধ্বনিতে। নদীর পাশে বা নদীর ওপর সেতুতে দাঁড়িয়ে আমি কখনও রাগী থাকতে পারি না। নদীব জল আমার রাগ গলিয়ে জল করে দেয়। হঠাৎ নিজের শরীরটা বেশ হাল্কা বোধ হল, আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সেতুর রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। আর ঠিক তক্ষুনি আমার কানের পাশে বেজে উঠল ফের সেই ধ্বনি, তুমি রাগ করেছ সোনা?

আমি মাথা না ঘুরিয়েও টের পাচ্ছিলাম এ গলা কার। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না রাগব না কাঁদব। নাকি সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেব মেয়েটিব গালে। কিন্তু না, আমি কিছুই করলাম না, কারণ আমার শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে আসছে। এত দ্রুত যে মেয়ে আমার পিছু নিতে পারে এই সন্ধ্যের অন্ধকারে, তার মাথায় কিছু জটিল মতলব আছে। সে সহসা নিস্তার দেবে না আমাকে। আমি রেলিং ছেড়ে শরীরটাকে সোজা করার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু তার আগেই মেয়েটি আমার মুখটা ওর বুকের মধ্যে ঠেসে ধবে আমাব সাবা মাথায় চুমুর আদর দিতে লেগেছে। ওর হাতের ও মুখের স্পর্শ ওর কালো সোয়েটারেব চেয়েও উষ্ণ। তার চেয়েও উষ্ণ আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া ওর নিশ্বাস। আমাব মনে হল, ওই ভালবাসায়-ভরাডুবি বুকে মাথা রেখে আমার মৃত্যু হলেই ভাল হয। এই আলিঙ্গন থেকে কোনও দিনও যেন আমার মুক্তি না হয়। আনন্দে, সোহাগে সম্পৃক্ত আমি এই অযাচিত, অকল্পনীয় ভালবাসায় ভেতরে ভেতরে এতটাই দ্রব হয়ে উঠলাম যে, আমার চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বলতে থাকলাম, আমি আর তোমার নাম জানতে চাই না, প্রিয়তমা। কোনও দিনও জানতে চাইব না। তুমি শুধু আমায় ছেড়ে যেও না কোনদিন।

এবার মেয়েটি আমার মুখটা তুলে ধরল ওর মুখের দিকে আর গভীবভাবে তাকালো আমার চোখের দিকে। আমার চোখের জল গিয়ে লেগেছিল আমার চশমায়, কিন্তু সেই ভিজে কাচের মধ্যে দিয়েও আমি দেখতে পেলাম, মেয়েটি কাঁদছে। দু'টি অশ্রুর ফোঁটা টলটল করছে ওর চোখের কোণে আর এক অব্যক্ত বেদনায় কুঁকড়ে উঠছে ওর পবম সুন্দর মুখটি। আমার নামও জানে না ও, তাই অস্ফুট স্বরে শুধু আমায় ডাকছে, 'ক্যারস্ত এ আঁ। জ্য তেম্। ক্যারস্ত এ আঁ! জ্য তেম্। একচল্লিশ। আমি তোমায় ভালবাসি।' আমার কিন্তু মুখ দিয়ে আর কোনও কথা সরছে না, যা বলতে চাই সবই যেন নিবর্থক হয়ে যাচ্ছে, সবই কীরকম বরফ হয়ে গলার মধ্যে খক্‌খক্ করছে। আমি ফের মুখ ঘসতে লাগলাম ওর মুখে, আমার ডান হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম ওব স্তন, তারপর ক্লান্ত শিশুর মতো ঢলে পড়লাম ওর কোলে।

একটু বাদে যেন গলার জমা বরফ আরও জমে উঠে পাথর হতে লাগল। বাকরুদ্ধ নই শুধু, আমি ক্রমশ যেন শ্বাসরুদ্ধও হচ্ছি। আমি মাথা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম দুটো শক্ত হাত আমার গলায় বসে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি আতঙ্কে চোখ মেলে দেখতে পেলাম সে হাত কার, কিন্তু চোখের সামনে সেই বেদনাকম্পিত মুখটাই দেখলাম। শুধু একটা সামান্য হাসিব ঝিলিক যেন ওই দুঃখী মুখে। আমি হাত দিয়ে গলার হাত দুটিকে জোর করে ছাড়াতে চেষ্টা কবতেই সুন্দরী হাসি আরও

পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। চোখের জলটাও যেন কখন উবে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে একটা কঠিন, নির্মম আক্রোশ। আমি আরও জোরে চাপ দিলাম গলার হাত দুটোয়, কারণ আমার সমস্ত দমই প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমার হাতের চাপে মেয়েটির হাত সরে গেল গলা থেকে ঠিকই, কিন্তু সেই মুখ ওর চোখের কোটর থেকে মণি দুটোও কীভাবে জানি অন্তর্হিত হল। একটি অনুপম সুন্দর মুখে কোনও চোখ নেই!—এই সুরিয়ালিস্ট দৃশ্য জীবনে যে কখনও দেখতে পাব এ আমার সমস্ত কল্পনার অতীত। আমি আমার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মনটাকে নিঙড়ে কোনও মতে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, কে? কে তুমি? ব'লো তুমি কে? এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার অবসন্ন হাত দুটোও এগিয়ে গেল রূপসীর গলার দিকে। আমি সজোরে চেপে ধরলাম ওর সরু, নরম, সুন্দর গ্রীবা। আমার আকাঙ্খা হল ওর গলা সেভাবেই কিছুক্ষণ টিপে ধরি যেভাবে এতক্ষণ ও টিপে রেখেছিল আমার কণ্ঠ। কিন্তু ওই পর্যন্ত! ওর গলা স্পর্শ করা মাত্রই ওর সুন্দর দাঁতের পাটি হাসিতে জ্বলে উঠল। তারপর সেই হাসি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল গোটা মুখে, যেন কঙ্কালের হাস্য। সেই খিল খিলে আওয়াজটাও ফিরে এলো কণ্ঠে, এবং আমি যত চাপ দিতে থাকলাম ততই উচ্চরোল হতে থাকল ওই হাসি। কতক্ষণ এভাবে চেপে ধরেছিলাম ওর গলা আমার স্মরণ নেই। শুধু এটুকুই অনুভব করছিলাম যে মেয়েটি ক্রমশ রেলিং ভেদ করে পিছিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে এবং সেই সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। রেলিং থাকতেও ওর শরীর ওপারে নদীর মধ্যে ঢলে গেল এক সময়, রেলিঙে বাঁধা পড়ল আমার শরীর। আমার দুটো হাঁটু মাথা রেলিঙের ওপর, আরেকটু এগোলেই গোটা শরীরটাই তলিয়ে যেতে পারত। কিন্তু গেল না।

আমি হোস্টেলে ফিরে এসে লিফটের দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মাদাম কামর্স আমায় জিজ্ঞেস করলেন, খুব রূঢ় কণ্ঠে, আবার নিশ্চয়ই খুব নেশা করে ফিরছ, রাজীব? এভাবে কী পড়াশুনো হবে তোমার?

মাদাম কার্মস অভিভাবিকা.নন যে এমন সুরে কথা কইতে পারেন। কিন্তু তাহলেও আমি প্রতিবাদ কবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে কি খুব রুখুসুখু লাগছে? মাদাম ফের ঝাঁঝের মাথায় বললেন, সেটা বললে কমই বলা হয়। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে বার্বেসের কোনও বেশ্যার বিছানা থেকে উঠে আসছ।

মাদামের এই কথাটা শেলের মতন বিঁধল বুকে। আমি লিফটে না উঠে একতলার টয়লেটে ঢুকে পড়লাম আর বেসিনের সামনে দাঁড়িযে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। আমার সারা মুখে ও জামার কলারে লিপষ্টিকের ছোপ। গলায দু'তিনটে কালশিরের দাগ। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটব থেকে। ঠোঁটের এক পাশে খানিকটা ছড়ে গিয়েছে। চুল উস্কোখুস্কো আর বুকের কাছে দুটো বোতাম ছেঁড়া। কীভাবে, কী কাজে এমনটা হয় সে প্রশ্ন তোলারও অবকাশ নেই। নিজেকে দেখে নিজেরই করুণা হচ্ছে।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা আর মাদাম কার্মসের হাঁক, রাজীব! রাজীব! টেলিফোন।

আমার রক্ত ফের জমে বরফ হচ্ছে। আমি জানি এ ফোন কার। আমি জানি এবার ও আমায় কোথায় যেতে বলবে। এবার গেলে যে আমি ফের আসতে পারব তারও

নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তাও যেন যাওয়ার জন্য বাসনা জাগছে ভেতরে। শরীর ফের উষ্ণ হচ্ছে, মাথায় একটা ঘোর সৃষ্টি হচ্ছে। আমি চোখে-মুখে সামান্য জল ছিটোতে ছিটোতে চেঁচিয়ে বললাম, যাচ্ছি, মাদাম কার্মঁস।

যখন দরজা ঠেলে বেরুলাম, দেখি দরজার পাশেই মাদাম গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমি এগোতে যাব, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, রাজীব, ফোনের ঐ মেয়েটির গলা আমি চিনি। মনে হয় বেশ্যা। ওর পাল্লায় পড়ে তোমার ঘরেরই আগের বসিন্দা পিটার মাথা খারাপ হয়ে হাসপাতালে। ও-ও একদিন ফিরে এসেছিল এই তোমার মতন চেহারা করে। তখন বুঝিনি ও কোন্ পথে গেছে। তাবপর একদিন নতুন ব্রীজের মাঝখানে ওকে আধমরা অবস্থায় পাওয়া গেল। সেই থেকে হাসপাতালে।

মাদামের কথাগুলো ভীষণ খাঁটি বলে মনে হল, কিন্তু আমার ভেতর থেকে প্রবল প্রতিরোধ ওই উপদেশ মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে। আমি আস্তে আস্তে কাউন্টাবে এসে ফোনটা তুলে নিলাম আর খুব আদরের স্বরে বললাম, হ্যালো!

আর ওপারে সেই প্রিয়, পরিচিত খিল খিল হাসি আর প্রশ্ন, ক্যারন্ত এ অ্যাঁ? আমাব মনে হল, এই কণ্ঠস্বরটির জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত আছি।

বোরহানপুর কথা

অমর মিত্র

অভীকের মনে পড়ল না কবে অ্যাপ্লাই করেছিল। প্রতিদিনই দু-পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন হয় পোস্ট অফিস না হয় কুরিয়রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিয়োগ কর্তাদের ঘরে ঘরে। তার ভিতরেই ছিল নিশ্চয় কোনও একটা। ভুলেই গেছে সে। এখন চিঠির ভাষা পড়ে মনে হচ্ছে চাকরিটা বোধহয় না হয়ে যায় না। বুথে গিয়ে টেলিফোনে রুমিকে ডাকল অভীক, শোন, একটা কল এসেছে, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে হয়ে যেতে পারে, তুই কি আসবি রুমি?

চাকরি হয়ে গেল! ওপারে রুমি যেন আনন্দে গলে যায়, সত্যি।

আমি বোরহানপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি। বহরমপুর। আমার পিসির বাড়ি, কবে যাচ্ছিস বল দেখি?

উনিশে পৌঁছতে হবে, কিন্তু ওটা বোরহানপুর।

বোরহানপুর। না না বহরমপুর।

হাসল অভীক, চিঠি আমার হাতে আর তুই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিস বহরমপুর, নো ম্যাডাম, বি ও আর এইচ এ এন... আপনি কি আসবেন?

তিষ্ঠ ক্ষণকাল, আসছি, তুমি এস রবীন্দ্রসদন মেট্রোর এসকালেটর গেট-এর সামনে, দ্যাখো অভীক, ওটা বেরহামপুরও হতে পারে, ওড়িশায়, ফুল অ্যাড্রেস কী, কবে অ্যাপ্লাই করেছিলে?

কিছুই মনে নেই রুমি। বলতে বলতে অভীক বুঝতে পারে রুমি টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে ওপারে। বুথ থেকে বেরিয়ে সোয়েটারের নিচে শার্টের বুক পকেটে রাখা খামটি স্পর্শ করল অভীক বাইরে থেকে। অনুভব করল যেন খামের ভিতরে অজ্ঞাত প্রায় কোনও এক বোরহানপুর লুকিয়ে আছে। ঘন্টাখানেকের ভিতরেই বোরহানপুর নামটি তার বুকের ভিতরে পৌঁছে গেছে যেন। এই তো কুরিয়র-যুবকের হাত থেকে লম্বা খামটি গ্রহণ করল সে। তারই বয়সী ছিল যুবকটি, ছাব্বিশ, সাতাশ ময়লা প্যান্ট, ময়লা রঙজ্বলা সোয়েটার, মুখে পাতলা দাড়ি, যেন সে দূর বোরহানপুর থেকেই বয়ে এনেছিল অভীকের জন্য এই আশ্চর্য খবরটি। লোকটি কি কুরিয়র কোম্পানীর ছিল, নাকি বোরহানপুরের এই রোজ অ্যান্ড জেসমিন কোম্পানীর নিজস্ব কেউ? অদ্ভুত নাম তো রোজ অ্যান্ড...। গোলাপ এবং জুঁই। অভীক হাঁটতে লাগল মেট্রো স্টেশনের দিকে। রবীন্দ্রসদন পৌঁছে যাবে মিনিট পনেরোর ভিতরে। চলমান সিঁড়িতে উপরে উঠে যেতে যেতে দেখবে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে রঙিন কার্ডিগানের সব নানারকম মেয়ে। তাদের ভিতরে রুমি আলাদা। পশম চাদরটিও সে ওড়নার মত করে ঝুলিয়ে দিয়েছে গলা থেকে। রুমির সঙ্গে তার অদ্ভুত টান। রুমিরও তা আছে। কখনও 'তুই তোকারি' কখনও 'তুমি' কখনও 'আপনি'—কত রকম যে তাদের

সম্বোধনের ভাষা!

রুমি বলল, দেখি চিঠিটা, বোজ অ্যান্ড জেসমিন, কবে অ্যাপ্লাই..?

মাথা নাড়ল অভীক, তাবপর বলল, আজকাল তো এজেন্সি জমা নেয় অ্যাপ্লিকেশন, তারপর তারাই ঝাড়াই বাছাই করে কোম্পানীকে পাঠায়।

চিঠি পড়তে পড়তে রুমি হাত বাড়িয়ে দিল, কনগ্রাট্স, তোব তো চাকরি হয়েই গেছে, অভীক, ওরা তো তৈরি হয়ে যেতেই বলেছে, শুধু ফাইনালি কতগুলো কণ্ডিশন নিয়ে কথা বলবে, হয়ত বন্ড নেবে. কবে দিলি ইন্টারভিউ?

বলছি না, ইন্টারভিউও হয়ত নিয়েছিল কোনও এজেন্সি, আজকাল সব বদলে গেছে রুমি, বাবা-কাকাদের মত কিছুই হচ্ছে না। বাবা-কাকাদের সময় কী হত তা আমরা জানি না, কিন্তু জায়গাটা তো বহরমপুরও নয়, বেরহামপুরও নয়, এ পুর কোথায়? বলতে বলতে রুমি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল বড়সড় আকারের চিঠিটি। ই-মেল, ফ্যাক্স, টেলিফোন নম্বর সব আছে, কিন্তু এই প্রিন্ট আউটটাব কোনও গোলমাল হয়েছিল মনে হয়। উপবের অংশটা ঝাপসা হয়ে গেছে। প্রতিটি বর্ণকে যেন টেনে লম্বা করে দিয়েছে যন্ত্রের দাঁত। রুমি পড়তে চেষ্টা করছিল, তাবপব চিঠিটা অভীকের হাতে দিয়ে বলল, কী রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন বল দেখি।

কে?

তোর এই কোম্পানি, রোজ অ্যান্ড জেসমিন, গভর্ণমেন্ট অফিসও এমন করে না।

অভীক বলল, যে ডেসপ্যাচ করেছে তার দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

নাকি ইচ্ছে করেই এমন করে দিয়েছে চিঠিটা। বলতে বলতে রুমি তার গায়ের কালো চাদর গলা দিয়ে জড়িয়ে নিল, অদ্ভুত। বডিটা সব ঠিক আছে, মাথাটায় গোলমাল, নিচে, রুলের তলায় কোম্পানির নাম না থাকলে ধরাই যেত না কার চিঠি।

কেন, সাইন করেছে জি সি পারমার, এম. ডি. রোজ অ্যান্ড জেসমিন।

হ্যাঁ, কিন্তু মস্তিষ্কে আঘাত, মুখে অ্যাসিড, দেহ অবিকৃত, তুই কীভাবে যাবি বোরহানপুর?

অভীক দেখতে লাগল চিঠিটা। কম্পিউটার প্রিন্ট এমনভাবে বেরল? প্রথম অংশটা ধেবড়ে গেলে প্রিন্টার অ্যাডজাস্ট করে পরের অংশ ছাপা হল। এই কাগজটি তো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যাওয়ার কথা ছিল। ভুল করে হয়ত এই প্রিন্টটা পাঠিয়ে দিয়েছে। আসল কাগজটা চলে গেছে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। অনেক রকম সম্ভাবনার কথা মনে হতে লাগল। সে চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে সোয়েটারের নিচে রেখে দেয়।

হাঁটছিল দুজনে। রাস্তা পার হয়ে রবীন্দ্রসদনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রুমি বলল, দেখুন অভীকবাবু, আজ বারো, ঠিক সাতদিন আছে, পরের সপ্তাহে এই দিনে আপনাকে রোজ অ্যান্ড জেসমিন-এর এম-ডির চেম্বারে ঢুকে মিঃ পারমার কে স্যালুট

করতে হবে, কিন্তু আগে জানতে হবে বোরহানপুরটা কোথায়?

এই রকম একটা চিঠি পাঠাল কেন বলুন দেখি?

রুমি হাসল, ওসব ভেবে লাভ নেই, ওরা নিশ্চয় আর একটি চিঠি পাঠাবে না গোলাপ এবং জুই এর গন্ধ মাখানো।

কিস্যু পড়া যাচ্ছে না। বিড় বিড় করল অভীক, আমি যাব না।

না-গেলে চাকরিটা ফসকে যাবে।

মাথা নিচু হয়ে গেল অভীকের। চাকরি চাই। এখনই। এই মুহূর্তে। এই দণ্ডে, এই পলে, চোখের পাতা ফেলার আগেভাগেই। কত আর দেরি করবে? তাদের পাশের ফ্ল্যাটের প্রশান্তদা আটত্রিশ, এখনও কিছু পায়নি, টিউশনি করে বেড়ায়, মার্চ থেকে জুন অবধি একেবারে বেকার, টিউশনিও থাকে না। কী রকম ভূতের মত হয়ে যাচ্ছে লোকটা। প্রেম করত। মিতুলদি অন্য কাকে যেন বিয়ে করে কসবায় থাকে। প্রশান্তদা নাকি এখনও ফোনে যোগাযোগ রাখে। সবই শোনা কথা। অনুমানের কথা। কিন্তু প্রশান্তদা তো ভীষণ সত্য। প্রশান্তদাকে দেখে ইদানীং মনে হচ্ছে চাকরি একটা চাই-ই। না হলে কোনওদিন রুমিও চলে যাবে, লুকিয়ে, নিঃশব্দে। রুমির দিকে তাকায় অভীক। রুমি খুব সুন্দর। রুমি, হাসলে ভাল লাগে, মনে হয় বাতাসে ঢেউ উঠল। রুমি হাত নেড়ে নেড়ে যখন চার্লি চ্যাপলিনের কথা বলে, মনে হয় রুমিই সত্য, আর কেউ নয়। রুমি যখন একা একা পাতাল থেকে উঠে আসে চলমান সিঁড়িতে নিঃঝুম দাঁড়িয়ে, তখন আচমকা মনে হয় যেন পাতালপুরীর রাজকন্যার বন্দীত্ব ঘুচল এতদিনে।

রুমি বলল, এখন কী করবেন অভীকবাবু?

কী করি বল দেখি রুমি?

তুমি আমার সঙ্গে এস। বলে রুমি আবার যে পথে এসেছে সেইপথে ফিরে চলল। আবার কি পাতালে নেমে যাবে রুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে। পাতাল রেলের কোনও স্টেশনের নাম হত যদি বোরহানপুর। ধুস। কী সব আবোল-তাবোল ভাবছে সে। পাতাল রেলের স্টেশনের নাম দিয়ে চিঠি পাঠালে পৌঁছবে কারও কাছে? রুমি তাকে নিয়ে রেলওয়ে রিজার্ভেশন কাউন্টারের বড় বাড়িটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

কোথায় তা জানি না, আমার কাছে টাকাও নেই। মৃদু আপত্তি জানায় অভীক।

টাকা আমার কাছে আছে, তোর টিকিটটা কাটা দরকার, কতদূর যেতে হবে তাও জানিস না, কোম্পানীর উচিত ছিল টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া।

রি-ইমবার্স করবে লিখেছে তো।

সে তো পরের কথা, এখন রিজার্ভেশনই পাবি কি না দ্যাখ, এখানে আমার দিদির ভাসুর, ললিত ব্যানার্জি কাজ করেন, দেখি ওঁকে পাই কি না।

দোতলার রিজার্ভেশন অফিসের লম্বা চওড়া করিডোরে জনা পঞ্চাশেক লোক। অফিসটাকে বাইরে থেকে একদম ধরা যায় না। যে এতজন এখানে কাজ করে,

এতজন এখানে টিকিট আর রিজার্ভেশনের জন্য হুমড়ি খেয়ে আছে কাউন্টারের জানালায়। রুমি দেওয়ালে টাঙানো ট্রেনের নাম দেখতে লাগল, অভীক দেখতে লাগল ফেয়ারচার্ট। ফেয়ারচার্টে বহু স্টেশনের নাম লেখা আছে, খ্যাত, অখ্যাত। তাদের ভিতরে বহরমপুর, বেরহামপুর নাম পেয়ে গেল অভীক, কিন্তু বোরহানপুর নামটি পেল না। বোরহাম্রপুর আর বোরহানপুর এক নয় যেমন এক নয় বহরমপুর আর বেরহামপুর। কত সব অচেনা, আশ্চর্য জায়গার নাম পেয়ে গেল অভীক, কিন্তু বোরহানপুর খুঁজে পেল না। তার মানে ওই জায়গায় কি কোনও রেল স্টেশন নেই? না থাকতেই পারে, ট্রেন থেকে হয়ত পছন্দপুর বা ন'পাহাড়ি, সাত পাহাড়িতে নেমে টাঙ্গায় করে যেতে হয় বোরহানপুর রোজ অ্যান্ড জেসমিন-এ। কোম্পানীরই বা কী অদ্ভুত নাম। 'রোজ অ্যান্ড জেসমিন'—আর কোনও পরিচয় নেই? কোম্পানী কী কাজ করে,কী উৎপাদন করে তা বোঝা যাচ্ছে না.তাদের নামে ও চিঠিতে। লেটার হেডে হয়ত ছিল, কিন্তু বাতিল প্রিন্ট আউটের ওপর আমন্ত্রণপত্র ছেপে আসায় তা অবোধ্য। তার পদটি মার্কেটিং অ্যাসিস্টেন্ট টু এম ডি। কী মার্কেটিং করে? গোলাপ আর জুঁইয়ের গন্ধ? সুগন্ধি তৈরি করে নাকি ওই কোম্পানী? জানে না তো এমন কোনও সংস্থার নাম। রুমি কি জানে? রুমি, এই রুমি। রুমি ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে।

অভীক সরে এসে জানলার ধারে দাঁড়ায়। বাইরে সূর্যকরোজ্জ্বল কলকাতা শহরের আকাশ। দূরে গড়ের মাঠের প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর অন্ধকার। ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছে নানা রঙের যানবাহন। বোরহানপুর এই শহরের কোথাও তো হবে না নিশ্চয়, যাদবপুর, অলিপুরের গায়ে গায়ে তো নয় নিশ্চয়। বোরহানপুর দূরে, এই শহর থেকে অনেক দূরে। কলকাতাকে ফেলে তাকে চলে যেতে হবে বোরহানপুরের নিরুদ্দেশে। কোথায় কত দূরে তা? ঘাটশিলা, মুসাবনির দিকে, সুবর্ণরেখা নদীর ধারে? 'রোজ অ্যান্ড জেসমিন' কি আসলে একটা কর্ণারফিল্ডের নাম? ধুস্ তা হতে পারে নাকি? অনেকদিন আগে মুসাবনির তাম্রক্ষেত্র দেখেছিল সে। বিকেলে নদীর জলে গা মাজতে বসেছিল কৃষ্ণকলি আদিবাসী রমণীরা। কী আশ্চর্য রূপ দেখেছিল সে সুবর্ণরেখা নদীর। তখন মনে হয়েছিল যদি তার চাকরি হয় ওইখানে, সে আর ফিরবে না। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বোরহানপুর মিলে যাক সুবর্ণরেখার তীরের কোনও জায়গার সঙ্গে। একা পড়ে আছে নিঃঝুম।

রুমি এসে তার পিঠে হাত দেয়, চ, কম্পিউটারে নেই।

নেই তো যেতে লিখবে কেন?

স্টেশন নেই বলে জায়গাটা কি থাকবে না?

ললিতদা তো বললেন, জায়গাটা চেনা তাঁর, রেলে তো ঘুরেছেন অনেক, ঠিক মনে করতে পারছেন না। তবে সুলতানগঞ্জের দিকে হতে পারে।

অভীক কিছু বলে না, রুমিই বলে যায়। ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার ধারে সুলতানগঞ্জ নাকি খুব সুন্দর জায়গা। ললিতদা ছিলেন রেলের গার্ড, রেলই তাঁর একটা পা নিয়ে

নিয়েছে, তাই এখন কলকাতায়। পা কাটা না গেলে তিনি হয়ত সুলতানগঞ্জেই থেকে যেতেন। বোরহানপুর ওদিকে হতে পারে, ট্রেনে করে গিয়ে কোনও একটা স্টেশনে নেমে ট্রেকার কিংবা বাসে বোরহানপুর, হ্যাঁ, আমি কিন্তু অ্যাপনার সঙ্গে বোরহানপুর যাব মিঃ সান্যাল।

আমার সঙ্গে। অভীক তার বুকে হাত দিয়ে চিঠিটা স্পর্শ করল সোয়েটারের নিচে, বিড়বিড় করে, কোথায় জায়গাটা তাই বোঝা গেল না এখনও।

বোঝা যাবে, জায়গাটা তো আছে, দারুণ সুন্দর জায়গা, হয়ত পাহাড়, হয়ত ঘন অরণ্য, হয়ত ছোট নদী...সব আছে, আপনি কলকাতা ছেড়ে বোরহানপুর চলে গেলে আমি একা-একা থাকবো কী করে এখানে? তুমি ছাড়া আমার কি আর কোনও বন্ধু আছে অভীক? বলতে বলতে রুমি নেমে এল নিচে, দু'জনে পা দিল ফুটপাথে। বিড়বিড় করছিল রুমি, তার বন্ধু শম্পার হাজব্যান্ড রাজস্থান বর্ডারে রয়েছে, শম্পার খুব মন খারাপ, যুদ্ধ যদি হয় তবে সর্ব্বোনাশ হয়ে যেতে পারে, শম্পা আর অচিন্ত্যকেও না হয় তারা বোরহানপুরে ডেকে নেবে, অচিন্ত্য যাবে না আর ব্যাটলফিল্ডে, কী অভীক তেমনও তো হতে পারে, 'রোজ অ্যান্ড জেসমিন' ওদের একজনকে একটা চাকরি তো দিতে পারে, ইস! কারোর কেউ যদি যুদ্ধে যায়, কী যে তখন হয়!

অভীক বলল, এখন কী করা যায় রুমি?

রুমি দাঁড়ায়। তার চোখে চোখ রাখে। বড় বড় চোখ রুমির। পাখির ডানার মত মেলে দেওয়া দুটি চোখ ভাসিয়ে দিতে পারে রুমি, চাপ গলায় বলল, কী রকম ফুরিয়ে যাচ্ছিল সব, বোরহানপুরের চিঠিটা বড় সারপ্রাইজ।

হ্যাঁ। মাথা কাত করল অভীক, সারপ্রাইজ না থাকলে সব কিছু ফুরিয়ে যায় রুমি।

রুমি নিজের কথাই নিজে খণ্ডন করল, তাহলে লটারির টিকিট কাটা হোক।

মাথা নাড়ে অভীক, বলতে থাকে, সারপ্রাইজ তৈরি করা যায় না, বিস্ময় নিজে নিজে জন্মায়, আমরা কি এই কয়েক ঘন্টা আগে বোরহানপুরের নাম জানতাম? আমি কি জানতাম তুমি আমার সঙ্গে বোরহানপুর চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারবে, আশ্চর্য! বোরহানপুর ঘটিয়ে দিল। রুমি গাঢ় স্বরে বলল, না গিয়ে উপায় কী, আমাদের তো কিছু না কিছু করতে হবে, কোথাও না কোথাও যেতে হবে, আমি যে আপনাকে ভালবাসি মিঃ সান্যাল।

আমাকে। তুই। অভীক নিজেকে দেখতে গিয়ে বুকের উপর বোরহানপুরের চিঠিটা অনুভব করল। হাটতে লাগল এলোমেলো হয়ে। কী বিস্ময় নিয়ে আজ ভোর হয়েছিল এই শহরে। আজ কি সবার জীবনে নানা বিস্ময় এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে? রুমি তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ওখানে কি কোনও নদী আছে অভীক?

থাকতেই পারে, পৃথিবীতে কত নদী। আমাদের দেশে কত নদী। বনপাহাড়?

থাকতেই পারে, থাকলেই তো বোরহানপুর সুন্দর।

ট্রেন কি ভোরবেলায় পৌঁছবে?

অভীক বলল, মাঝরাত্তিরেও পৌঁছতে পারে, খুব শীত ওই দিকে।

যদি ঠিক দুপুরে পৌঁছয়? রুমি বলল।

না, না। মাথা নাড়ে অভীক, ঠিক বিকেল বিকেল, ঠিক সন্ধের আগে পৌঁছতে পারে হয়ত, যখন তুমি নামবে ট্রেন থেকে, সূর্য অস্ত যাবে দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে।

রুমি বলল, ওই রকম একটা ছবি আঁকতাম আমি আঁকার ইস্কুলে।

অভীক বলল, আমরা কবে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলাম ছোটবেলায়, শীতের সময় মাঝরাত্তিরে নেমেছিলাম গাংপুর নামে একটি স্টেশনে।

রুমি দাঁড়িয়েছে। স্টোভ সোঁ সোঁ করছিল ফুটপাথের ধারে। চাওয়ালা বুড়ো পাম্প দিয়ে যাচ্ছিল স্টোভে। জল, দুধ আর চা একসঙ্গে ফুটে উঠল। রুমি হাত ধরল অভীকের। অভীক বিড়বিড় করে, জায়গাটা কী করে আইডেন্টিফাই করি বল দেখি, কোনদিকে হতে পারে?

ম্যাপ দেখলে হয়।

ওয়ার্ল্ড ম্যাপ?

খিলখিল করে হেসে ওঠে রুমি, বলল, হ্যাঁ, পৃথিবীর মানচিত্র।

বোরহানপুর কি মেক্সিকোর কাছাকাছি?

রুমি বলল, হতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপ।

সেখানে ই-মেল যাবে, ডট কম?

চায়ের ভাড় হাতে নিতে নিতে রুমি বলল, যাবে, না গিয়ে কোথায় যাবে, আচ্ছা বোরহানপুরে কি ঘোড়ার গাড়ি চলে, টাঙ্গা? বোধহয়, স্টেশন থেকে টাঙ্গায় করে যেতে হবে 'রোজ অ্যান্ড জেসমিন'-এ।

সাত ঘোড়ার টাঙ্গা?

তাই তো সূর্যের রথ চলে। অভীক সরাসরি তাকায় রুমির চোখে। অভীকের মনে হচ্ছিল তাকিয়েই থাকে। কবে থেকে তারা দু'জনেই চাকরি খুঁজে যাচ্ছে। কোনওটাই লাগছে না। রুমি টিউশানি করে, সে টিউশানি করে। রুমির বর খুঁজছে ওর মা-বাবা, অভিকের যে কিছুই হবে না কোনওদিন তা প্রতিদিনই বলে যাচ্ছে ওর দাদা। অভীক কেন ট্রেনে লজেন্স কিংবা ধূপকাঠি বেচতে যায় না, তা নিয়ে তার কতই না বিস্ময়! অভীক ভাবছিল, রুমি ছাড়া তাকে আর কেউ ভালবাসে না। রুমিকে নিয়েই সে বোরহানপুর চলে যাবে এই শহরের নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে ফেলে রেখে। কিন্তু বোরহানপুর আসলে কোনদিকে? ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশায়, অন্ধ্রে, নাকি এই পশ্চিমবাংলার ভিতরে। বর্ডারের দিকে? বোরহানপুর গিয়ে দাঁড়ালে কি বাংলাদেশ দেখা যাবে? পাকিস্তান দেখা যাবে পশ্চিমে, রাজস্থান কিংবা পাঞ্জাব সীমান্তে? রুমি বলল, যখন চিঠি তুই পেয়েছিস, তুই বোরহানপুরে যাবিই, আর তুই গেলে আমিও, বাক্সপ্যাটরা বেঁধে।

কিন্তু এখন আমরা দুজনে কী করব?

বোরহানপুর খুঁজব, খুঁজতে তো হবেই, তুই একা খুঁজলে কি আর পাবি? তুই যা অন্যমনস্ক, হয়ত বোরহানপুরের গাড়ি দেখেও দেখবি না।

হতে পারে, তখন যে তোর কথা মনে পড়তে থাকবে।

রুমি বলল, আমি তোকে খুব চিনি, তুই কিছুই চিনতে পারিস না। চ অভীক, বোরহানপুর খুঁজে বের করি, না হলে ঘরে বসে বসে চেনা পথে ঘুরে ঘুরে তোর মাথার সব চুল উঠে যাবে। আমিও বুড়ি হয়ে যাব।

অভীক বলল, কেউ তো খোঁজ দিতে পারছে না।

ঠিক লোককে জিজ্ঞেস করিনি তাই।

অভীক চুপ করে থাকে। বুঝতে পারছে তার চেয়েও রুমিকে টেনেছে বোরহানপুর অনেক বেশি। বোরহানপুরই রুমিকে আর অপেক্ষা করতে দেয়নি, বুকের সব কথা বাতাসে বের করে দিয়েছে রুমি। রুমি যে তাকে ভালবাসে তা রুমি ছাড়া কে বলতে পারে? ভালবাসে রুমি তো বোরহানপুরেই চলে যেতে পারে তার সঙ্গে।

রুমি চাপা গলায় বলল, শোন অভীক, কেউ যদি কোনও খোঁজ না দিতে পারে, পৃথিবীর মানচিত্রেও যদি না আঁকা হয় বোরহানপুরকে, কোনও ট্রেন যদি ওইদিকে না যায়, কোনও এরোপ্লেন যদি আকাশ ভেঙে না উড়েও যায়, তবু আমরা বোরহানপুর খুঁজে নেব। খোঁজাটাই তো 'রোজ অ্যান্ড জেসমিন' কোম্পানির কাজ, রোজ অ্যান্ড জেসমিন'...। রুমি অভীকের গায়ে গোলাপ আঁকল মনে মনে, তার গায়ে বনযুথিকা।

অভীক শিহরিত হল। হতেও তো পারে। তার সাক্ষাৎকার আরম্ভ হয়ে গেছে, হয়ত দুজনের একসঙ্গে বোরহানপুর খুঁজে নেওয়ার ভিতর দিয়ে।

রুমি বলল, না যদি খোঁজ পাই, যে কোনও একটা ট্রেনে উঠে পড়ে বলব, চল বোরহানপুর।

তারপর?

যে কোনও বাসে উঠে পড়ব গঙ্গার ধারে গিয়ে, ওখান থেকে কত জায়গার না বাস ছাড়ে, উঠে পড়ে বলব চল বোরহানপুর।

বাহ্, যদি কোনও বাসই না যায়, কোনও ট্রেন না শোনে কথা?

রুমি তার হাত চেপে ধরল. তার চোখের দিকে পরিপূর্ণ নীল নয়নে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, না যদি যায়, দু-পা বাড়িয়ে বলব, চল বোরহানপুর, আমাদের পা আমাদের কথা তো শুনবেই, কী খাওয়াবে বলো অভীক, আমি তোমার সঙ্গে বোরহানপুর খুঁজতে যাব সারা জীবনের জন্য, কী দিবি রে আমায়, কী দিবি?

অভীক বলল, গোলাপ দেব, জুঁই দেব, যা পাব আমি তাই দেব।

ব্যাভিচারিণী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

'খা বে পদ্ম, খা, একটা চুমো খা', বলতে বলতে লখীন্দব তার পেশল কব্জিতে পদ্মকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটদুটো ভরে নেয় নিজেব ঠোঁটেব ভেতব। একটা পিচ্ছিল শিবশিরচেতনা লখীন্দরের শরীরময, আর মুহূর্তে পদ্মর লাল চেরা জিব ছুঁয়ে ফ্যালে লখীন্দরের জিব। পদ্মর ঠোঁট দুটো বাৎ কবে কিছুক্ষণের জন্য অবশ হযে যায় সে, তার শরীরে ঝিম ধরে, জিব থেকে রক্তের ভিতরে ক্রমশ সেঁধিয়ে যেতে থাকে একটা ঘুম। ততক্ষণে পদ্ম লখীন্দরের শরীরে জড়িয়ে জড়িয়ে মাথাটা রাখে তার কাঁধের ওপর। এক-একবার চেরা জিব বার করে চকিতে ঢুকিয়ে নেয় মুখে, শরীরের ক'ফোঁটা বিষ ঝরে যেতে তারও শরীরে অবশভাব। আধো-ঘুম-আধো-জাগরণে তখন লখীন্দরের জিব অস্ফুট কণ্ঠে আউড়ে যাচ্ছে, পদ্ম, পদ্ম রে, আ, জেবন জুড়ায়—

চ'রচালা খোড়ো ঘরের দরজা তখন হা-হা খোলা, দখনে হাওয়া কপটি ঠেলে হু-হু শব্দে ঘরে ঢুকছে। বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, কিন্তু না লখীন্দর না পদ্ম, কারো তাতে হুঁশ নেই। তেলচিটে বিছানায় একমুখ কালো পিঙ্গল বঙে মেশা দাড়িগোঁফ নিয়ে আরামে গোঙাচ্ছে লখীন্দর। এখন তার সমস্ত সত্তা, রক্ত মাংস ভরে রয়েছে পদ্মের দেওয়া আরাম। গাঁয়ের একধারে কালনাগিনী নদীর প্রান্তে তার ঘর। নদীর নামও কালনাগিনী, লখীন্দরের ঘর ভর্তিও নানা জাতের সাপ। সে সমস্ত সাপই তার পোষ্যপুত্তুর। শুধু এরমধ্যে এই পদ্ম, এই সোনার বর্ণপদ্মগোখরো, যার চোখের ভেতব লখীন্দরের জন্য এক অদ্ভুত চোরাটান, তার সঙ্গেই লখীন্দরের যতো ভাব-ভালবাসা। ঘোরের মধ্যে সে পদ্মের পিচ্ছিল শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'পদ্ম, পদ্ম রে, তুই আব জন্মে লিচ্চয আমার বউ ছিলিস।'

বিষেব কণাগুলো জিব থেকে আস্তে আস্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়াব সঙ্গে সঙ্গে তার চোখেব সামনে নেমে আসে একটা লাল-নীল জাল, সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা। তার সুতো বেয়ে সে ক্রমশ ভাসতে থাকে, উড়তে থাকে, এক অন্তহীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় স্বর্গের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি একটা হাল্‌কা-ভাব, বঁমচুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অদ্ভুত এক ধরনের সুখ তাকে বুঁদ কবে রাখে। কখনো মনে হয় আকাশ থেকে একটা নীল রঙের পরী, যার গা-টা তুলোর মত নরম, লখীন্দরকে উম উম শব্দ করে চুমকুড়ি দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

এভাবে পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে লখীন্দর, আর তার শরীরে লেপ্টে থাকে পদ্মের পিচ্ছিল শরীর। লখীন্দরের স্যাঙাত ষষ্ঠীপদ একবাব উঁকি মেরে দেখল, তার গুরু ঝিম মেবে পড়ে আছে, চোখ দুটো বোঁজা, উস্কখুস্ক চুল, লালা গড়াচ্ছে তাব দু কষ বেয়ে। এসময় তাকে বিরক্ত করাটা লখীন্দব পছন্দ করে না। এর আগে ষষ্ঠীপদ ক'বার ডেকে ভীষণ দাবড়ানি খেয়েছিল তার গুরুর কাছে।

পদ্মের সঙ্গে তার এই ক'বছরের ভাব ভালোবাসা, তার বিষের এই ছোবল লখীন্দরেব শবীর একেবারে বদলে দিয়েছে। টানটান চামড়ার রং কাল্‌চে মেরে গেছে, কুঁকড়ে গেছে আঙুলগুলোর চামড়া, হল্‌দেটে হয়ে গেছে চোখেব রঙ। । এসব বুঝতে পারে লখীন্দর,

মাঝে মাঝে পদ্মকে বলে, 'শুধু চামড়ার রঙ নয় রে পদ্ম, তোর চুমু খেয়ে আমার রক্তের রঙটাই বদলে গেল রে।' একদিন ষষ্ঠীপদকেও হাসতে হাসতে তাই বলেছিল।

ষষ্ঠীপদ বিশ্বাস করেনি, লখীন্দর হঠাৎ তার দিকে তীব্রচোখে চেয়ে বলে, 'প্রেত্যয় হয় না? দেখবি তবে—'বলে একটা ধারালো অস্ত্র বিছানার তলা থেকে বার করে নিজের কব্জিতে একটা আঁচড় কাটে, অমনি কালো রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে থাকে তার শিরার ভেতর থেকে। ষষ্ঠীপদ দেখে থ হয়ে গিয়েছিল।

২

এই পদ্মের সঙ্গে লখীন্দরের ভাব-ভালবাসার আজ দু আড়াই বছরের। ঝিম কেটে যেতে লখীন্দরের মনে পড়ে যায় পদ্মের সঙ্গে তার প্রথম দেখার কথা। কি বিশাল ফণা তার, সোনার বর্ণ রঙ, সারা গায়ে মাছের আঁশের মতো দাগ, মাথায় একটা খড়ম চিহ্ন। খোঁদল থেকে বেরিয়ে একলাফে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফণাটা তাক করেছিল লখীন্দরের কপাল বরাবর, চোখে জিবে গনগনে রাগ, দাঁতে আ-কামানো লকলকে বিষ। লখীন্দরের শরীরে বেদেনীর রক্ত। তার বাপ ছিল জেলে, কিভাবে যেন এক দলছুট বেদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর সেই বেদেনীর পাল্লায় পড়ে তার বাপ মাছ ধরার পেশা ছেড়ে সাপের গুণিন হলে খুব নামডাক হয়। সেই রক্ত লখীন্দরের শরীরে ছিল বলে মুহূর্তে গোখ্‌রোটার গলার কাছে চেপে ধরে বশ মানিয়ে ফেলেছিল। যেখান হতে দেখল [illegible] সাপ নয়, সাপিনী, তাই এত চোখের ছেনালি। পোষ মানতেই লখীন্দর ওর নাম দেয় পদ্ম।

পদ্মর খবর প্রথম এনে দিয়েছিল ষষ্ঠীপদ, তার স্যাঙাৎ, বয়সে ওর চেয়ে ঢের ছোট ষষ্ঠীপদ তাকে 'সাপের মাস্টার' নাম দিয়েছে। নামটা ওর মন্দ লাগে না। প্রায়ই ষষ্ঠীপদ তার পায়ের কাছে বসে বলে, 'গুরু, সাপের নাড়ী নক্ষত্র তোমার মতো ভূভারতে কেউ জানে না।' সেই ষষ্ঠীপদই একদিন ভোর-ভোর এসে বলেছিল, বামনবমীপুরের বোসবাড়ির ফাটলে নাকি সাপ দেখা গেছে। বোসবাড়ির বোসবাবুরা এখন আর গাঁয়ে থাকে না। ছেলেপুলেরা চাকরি-বাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাবার পর ওখানেই বাড়িঘরদোর করেছে। গাঁয়ের অত বড় বাড়িখান এখন পোড়োবাড়ি। তার দালানে বাস করে নটে ভিখিরি। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। সাপটা নাকি তাদের বিছানার পাশে এসেছিল রাতের বেলা।

লখীন্দরের রক্তে তখন সাপ ধরে বেড়ানোর নেশা। জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে, পুরোনো বাড়ির ফাটল থেকে টপাটপ সাপ ধরে আনে। এমনকি ধানক্ষেতের আলের উপর ঝিলিক ছড়িয়ে পালিয়ে যেতে থাকা আলকেউটেও ছুটে ধরে ফেলেছে সে। তার খোড়োঘরে ঝাঁপির পর ঝাঁপি সাপে ভরে উঠেছে। ষষ্ঠীপদর কাছে নতুন সাপের খবর পেয়ে তক্ষুনি বোসবাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল।

প্রায় সাতদিন সাপটার সঙ্গে জড়িবুটি খেলায় গুম্ হয়েছিল লখীন্দর। তিনতলা পোড়োবাড়িটার কোন ফাটলে কিংবা চোরাকুলুঙ্গিতে সাপটা লুকিয়ে রয়েছে তা মগজে আনতেই বেশ ক'দিন ক'রাত কেটে গিয়েছিল। তারপর এক ঠা ঠা দুপুরে এক ফাটলের ফাঁকে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ তার লাল চেরা জিব লখীন্দরকে দেখিয়ে তার অস্তিত্ব

জানান দেয়। তারপর থেকে সেই জড়িবুটি খেলা, কখনো তার ফণাটা এক নজর চোখে সেঁধোয়, কখনো তার এক চিলতে লেজ। আবার মুহূর্তে সে ফাটা ফাটলের ফাঁকে ফেরার। একঘর থেকে অন্য ঘরে, দোতলা থেকে তিনতলার চিলে কোঠার ঘরে। তক্কে তক্কে লখীন্দরও তার পিছু পিছু গন্ধ শুঁকেই সে বুঝেছিল এটা পদ্মগোখরো না হয়ে যায় না। তারপর সোনালী রঙের ঝিলিক দেখে তার ধারণা মিলে যায়। সাতদিনের দিন এক খোঁদলে পুরো হাতখান ঢুকিয়ে গোখরোটাকে বার করে নিয়ে আসে লখীন্দর। জড়িবুটি খেলে পোষ মানিয়ে ওকে ঘাড়ে ফেলে বলেছি, 'চ রে পদ্ম, ঘরে চ। এই পোড়োবাড়িটায় তরে আর মানায় না।

চারচালার খোড়ো ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝাপি। কোনটায় কেউটে, কোনটায় শঙ্খচূড় কোনটায় খান কুড়ি-পঁচিশ আইরাজ। অন্য পাশের ঝাঁপিতে রয়েছে শাঁখামুটি, রক্তকানড়, কালাজ। বিশ-পঁচিশটা ঝাঁপির ভেতর ভিনজাতের সাপের বাস, আর এদের নিয়েই লখীন্দরের সংসার। তার এই ছোট্ট ঘরখানাকে ষষ্ঠীপদ নাম দিয়েছে সাপঘর। লখীন্দরের চেতনা, অনুভূতি জীবিকা সবকিছুকেই ঘিরে রয়েছে মা মনসার এই জীবগুলো। বলা যায় এদের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ, এদের চাউনি, লকলকে জিবের ওঠাপড়া, ফণার দুলুনি দেখে সে বুঝতে পারে ওদের কথা। জীবগুলোও লখীন্দরকে ভালোবাসে, সোহাগ জানায়। আবার লখীন্দরের চোখে রাগ দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ফণাসুদ্ধ একলাফে পিছিয়ে গিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে সভয়ে লক্ষ্য করে লখীন্দরকে। এক-একটা সাপের এক-একরকম কেতা, লখীন্দর সব বুঝতে পারে।

সাপঘরের এইসব জীবের দেখাশোনা করার ভার ষষ্ঠীপদর ওপর। লখীন্দরকে গুরু মেনেছে সে। তাঁর ভারী ইচ্ছে, 'সাপের মাষ্টারে'র পা ধরে একদিন সেও মাষ্টার হবে। লখীন্দর যখন গোখরো কিংবা রক্তকানড় গলায় ঝুলিয়ে দুকোশ পথ ভেঙে নারাণগঞ্জের সনাতন মল্লিককে নেশা বেচতে যায়, তখন সঙ্গে থাকে ষষ্ঠীপদ। সাপের ছোবল জিবে দিয়ে বুদ হয়ে যায় সনাতন মল্লিক। এক ছিলিম গাঁজার মতো এক ছোবল বিষ। ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে একবার সনাতন মল্লিককে দ্যাখে, একবার লখীন্দরকে, আরেকবার লখীন্দরের গলায় ঝোলানো গোখরোকে, ষষ্ঠীপদর চাউনি দেখে লখীন্দর কখনো বলে ওঠে, 'খাবি নাকি রে, এক ছিলিম।' বলে গোখরোটাকে এগিয়ে ধরতেই ষষ্ঠীপদ তিড়িক লাফ মারে, কিন্তু তার পিছু ছাড়ে না। আবার লখীন্দর যখন রাত বিরেতে ভিনগাঁয়ে সাপের বিষ ঝাড়াতে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার সঙ্গে থাকে। অবাক হয়ে দ্যাখে কিভাবে লখীন্দর বিষদাঁতের ক্ষতের উপর খোলামকুচি চেপে ধরে মন্ত্রের অমোঘ টানে বিষ নামিয়ে নিয়ে আসে। আবার শহুরে বাবুরা যখন কাঁচের টিউব এনে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার পাশে। বস্তুত এসব ব্যাপারে ষষ্ঠীপদই সব যোগাযোগ করে। দেনাপাওনা দরদাম সব ষষ্ঠীপদর হাতে। মা মনসার জীবের খাবারও জোগাড় করার ভার তার ওপর তাদের বাস করার ঝাঁপির দরকার হলেও সে।

ষষ্ঠীপদ এ সবই করে বিদ্যে-শেখার লোভে। লখীন্দর 'সাপের মাষ্টার' একদিন তার সব বিদ্যে নিশ্চয় সে ষষ্ঠীপদকে দিয়ে যাবে। কখনো লখীন্দরের কাছে ভয়ে ভয়ে এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু লখীন্দরের সেই এক কথা, 'দূর বেটা, তুই সাপের লেজ ধরতে ভয় পাস, তুই সাপের মন্তর শিখবি কি রে। যা ভাগ।'

গাঁয়ের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গেও লখীন্দরের সম্পর্ক খুব কম। সে পড়ে থাকে গাঁয়ের একপ্রান্তে, নদীর ধারে, একা তার মা মনসার জীবদের সংসারে বুঁদ হয়ে। এক ষষ্ঠীপদ ছাড়া বাকি মানুষজন সাপঘরের নাম শুনলে তার সাত হাত দূর দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা লখীন্দরের ঘরের ত্রিসীমানায় কেউ পা মাড়ালে সে তার সাপদের লেলিয়ে দেবে। লখীন্দর এ সব কথা শুনে হাসে, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে সে হাসির ঝিলিক বড় অদ্ভুত।

লখীন্দর ষষ্ঠীপদকে বলে, 'বুঝলি বেটা সবাই আমাকে ডরায়, আবার সাপে কাটলে আমাকেই আবার তারা তালাশ পাঠায়। এ ভারী মজার কথা।'

কখনো ষষ্ঠীপদকে বলে, সাপের মন্তর শিখবি, তার আগে সাপের চোখ ভাল করে নজর দিয়ে চেন। সাপের নজরই হল আসল। শাঁখামুটির চোখ আর বাঁশবনে কেউটের চোখ একরকম নয়, একটার চোখে খচরামি তো অন্যটার চোখে শয়তানি। আবার মেটে সাপের চোখ, তার মধ্যে কেমন সতর্কতা আর ভয়।

ষষ্ঠীপদ হাঁ করে শোনে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

৩

লখীন্দরের বাপ ছিল সাপের গুণিন। কিন্তু সাপের নজর লখীন্দর ভালো করে ঠাহর করতে শেখে যেবার ভীমরাজ বেদের দল তাঁবু গেড়েছিল তাদের গাঁয়ের ধারে। ষষ্ঠীপদ এখন যেমন ছুঁকছুঁক করে তেমনি জড়িবুটি খেলার লোভে সেও ঘুর ঘুর করতো বুড়ো বেদে ভীমরাজের আশে পাশে। একদিন বুড়ো রেগে গিয়ে নিজের গলা থেকে একটা মস্ত কেউটে সাপ খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। লখীন্দর সতর্ক হবার আগেই কেউটেটা ছোবল বসায় তার হাতে, মুহূর্তে চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মুখে গ্যাঁজলা। পরে জেনেছিল সেই ভীমরাজই তার কাটা ক্ষত থেকে এক চুমুকে বিষ তুলে নিয়েছিল। লখীন্দরের জ্ঞান ফিরলে তার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, 'যা বেটা, তোর হাতে খড়ি হল আজ।'

তারপর থেকে বুড়ো ভীমরাজ তাকে প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছিল, একে একে চিনে নিল সাপেদের ঘরসংসার, তাদের চাউনি। ক্রমে তার নিজের চোখেও সাপেদের মতো তীক্ষ্ম আর তীব্র হয়ে উঠল, যেরকম ছুরির মত দৃষ্টি সে দেখতে পেত বুড়ো ভীমরাজ আর তার ছেলে নগারির চোখে। নগারি তখন তার বয়সী এক যুবক। একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর তামার মতো গায়ের রঙে অজস্র পেশী তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে চেনায়। নগারি তার বাপের মতই সাপের দোস্ত এবং যম। অনায়াসে তাজা একটি গোখরোর ঠোঁট দুআঙুলে ফাঁক করে তার বিষদাঁত ভেঙে আনতো নিজেব ঝকঝকে সাদা দাঁতের আঁকশি-তে। লখীন্দরের বউ গোলাপী একদিন এই কাণ্ডটা দেখে চোখ ছানাবড়া করে বলেছিল, 'হাই মা, ই কি দস্যি না দানব!'

লখীন্দর তার দোস্তের দিকে গৌরবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বউকে বলেছিল 'উটা একটা গরুড় বটেক।' গরুড় শব্দটা নগারির পক্ষে সবচেয়ে মানানসই ছিল। সাপের উপর তার একটা অহেতুক হিংস্রতা। যে সাপটা তার কথা শুনতো না, কিংবা হেরফের ঘটাতো তার আচরণে, ভীষণ রেগে যেত নগারি। তার ঝাঁকড়া চুল আরো

ফুলে উঠতো রাগে, কিড়মিড় করতো দাঁত। কখনো এমন হয়েছে, এক আছাড়ে একটা গোখরোকে মেরে ফেলেছে। লখীন্দরের মুখে এমনটা শুনে গোলাপী বিস্ময়ে হা হয়ে বলতো, 'লোকটা কি গো, ই তো চণ্ডালের রাগ।'

সেই নগারি যখন লখীন্দরের দোস্ত হল, লখীন্দরের সঙ্গে তার ঘরে আসত। গোলাপী প্রথমটা ভয়ে আঁতকে সরে থাকতো দূরে। বলা যায় না, লোকটার যা রাগ, কিন্তু তাকে যখন কাছ থেকে দেখল তখন নগারি অন্যরকম। তার দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর সাত কাহন গল্প বলত লখীন্দর আর গোলাপীর কাছে। কখনো সমুদ্রের পাড়ে, কখনো গভীর জঙ্গলে তাঁবু ফেলে তাদের বসবাসের কথা, ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডকারখানার গল্প। তখন দুজনেই হা করে শুনত সে সব। তারপর একদিন যখন নগারি গোলাপীকে একটা হরেক ডিজাইনের পুঁতির মালা দিলো, তাতে ঝকঝক করছে লালনীল স্ফটিকখণ্ড তাই দেখে গোলাপী তো আনন্দে থ। মনে মনে ভাবল লোকটার বাইরেই অমন রাগ, ভিতরটা নরম।

লখীন্দর তখন বুড়ো বেদে ভীমরাজ আর নগারীব কাছে একেব পর এক জড়িবুটি খেলা শিখছে, বশ মানাচ্ছে বিষে টইটম্বুর সাপগুলোকে, কোন সাপের মেজাজ কিরকম, কার দুর্বলতা শরীরের কোন জায়গায়, এসবই সারাক্ষণ তার মাথায়। রাতে ঘরে ফিরে গোলাপীকে তারবিদ্যের রকম বোঝাতো, জাহির করতো তাব ক্ষমতা। সাপ সম্পর্কে গোলাপীর প্রাথমিক আড়ষ্ঠতা কেটে গেলে সেও হা করে শুনত লখীন্দরের বিদ্যের রকম।

যখন লখীন্দরের জড়িবুটি খেলা শেখা প্রায় শেষ, নতুনভাবে জীবন শুরু করার স্বপ্নে যখন সে মশগুল, ঠিখ তখনই একদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার ঘর ফর্সা। বুড়ো ভীমরাজ বেদে তার তাঁবু গুটিয়ে দলবল নিয়ে যখন দেশান্তরে রওনা দিয়েছে, তার সঙ্গে গোলাপীও কোন ফাঁকে ভিড়ে গেছে নগারির সঙ্গে। ব্যাপারটা লখীন্দর জেনে একেবারে নিথর। মা মনসার জীবকে সে ভালবাসতে শিখেছিল বটে, কিন্তু গোলাপীকে তো ভালোবাসা দিতে কিছু কম করেনি। ঘরে এসে সংবিৎ ফিরতে সে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল, 'যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা।'

এ-কথা ঠিক, গোলাপীর প্রায়-ফর্সা চাবুকের মতো শরীরটার মধ্যে সে অনেক সুখ পেয়েছিল। গোলাপী রঙঢঙ জানতো বেশ। আর বেদেদের সাপগুলো চেনার পর গোলাপীর শরীরটাও মনে হতো আবেকটা সাপ, অমনই পিচ্ছিল, অমনই সোন্দর। লখীন্দরের ঘরে গোলাপী যেন তার অস্তিত্বের অর্ধেক ছিল, সেই গোলাপী কখন যে তার রঙঢঙের ভাগ নগারিকে দিয়েছিল, তা লখীন্দর বোঝেনি। যখন বুঝল, তখন তার সারা ঘরে গোলাপীর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। বেবাজিয়ার দল তখন তাবু গুটিয়ে কত দূরে চলে গেছে কে জানে।

গোলাপী গেল, কিন্তু সর্দার ভীমরাজের কাছ থেকে যে বিদ্যে লখীন্দর শিখে ফেলেছে, তাতে সে বিদ্যের এক জাহাজ। জড়িবুড়ি মন্তর পড়ে সমস্ত সাপকেই সে এখন বশ মানাতে পারে, সাপে-কাটা রুগি বাঁচাতে পারে, সাপের চাউনি দেখে তার কথা বুঝতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে তার সাপঘর। ভেবেছিল,

আরেকটা গোলাপী ঘরে নিয়ে আসে, কিন্তু বোসবাড়ির ফাটল থেকে হঠাৎ এই পদ্ম তার ঘরে এসে সব উলটপালট করে দিল।

এখন সেই পদ্মর আকর্ষণে সে প্রায় সম্মোহিত হয়ে থাকে সারাদিন। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পদ্মকে নিয়েই তার খেলা। কখনো পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে সে, আর পদ্মও তার শরীরে জড়িয়ে, সোহাগ দিয়ে, গায়ে লেপ্টে পড়ে থাকে। কখনো পদ্মের ঠোঁটে চুমু খায়, পদ্মও তার চেরা জিব মেলে চেটে দেয় লখীন্দরের গাল। দেখলে মনে হয় ও তার বে করা বউ। পদ্মের পিচ্ছিল শরীরের স্পর্শে তার শরীর জেগে ওঠে, এক অদ্ভুত সুখ তাকে অবশ করে দেয়। শুধু চুমুই দেয় না, এক ভীষণ বর্ষার রাতে পদ্মর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে এক অদ্ভুত বিজাতীয় প্রতিক্রিয়ায় রত হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্রমশ তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে। এই অদ্ভুত রতিক্রিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকে মাঝে মঝে, অমন নধর হিলহিলে সাপটার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানো তার কাছে মধুর হয়ে ওঠে। গোলাপীকে হারিয়ে তার ভিতরে যে ক্রোধ, হতাশা আর ক্ষোভ ছিল পদ্ম ঘরে এসে তা অনেকটা মিটিয়ে দেয়। বরং তারমনে হয়, পদ্ম তাকে যে আনন্দ দেয়, তা গোলাপী কখনো দিতে পারেনি। পদ্মকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে ভাবে, 'যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা, আমার পদ্ম তর চেয়ে ঢের ভালো, এ তর মতো বেইমানি করবে না।

ক্রমে পদ্মর উপর তার ভাব-ভালোবাসা এমন ওম হয়ে ওঠে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করে না লখীন্দর। যেখানেই যায়, পদ্ম তার সঙ্গে আছে। তা এই নিয়ে একদিন একটা বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। গোপালনগরের ভবগোঁসাই লখীন্দরের এক বাঁধা খদ্দের। হপ্তায় একবার জিবে সাপের ছোবল নেয়। শুধু নেশাই করে না, সে একজন রসিক মানুষ। কোন সাপের সোয়াদ কেমন তা নিয়ে লখীন্দরের সঙ্গে মশকরা করে, তোর ওই বাঁশবুনে কেউটে সেদিন আমার ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি লখীন্দর। শালা মহা বজ্জাত আছে। তা এই ভবগোঁসাই হঠাৎ লখীন্দরের কাঁধে সুন্দরী পদ্মকে দেখে হাসতে হাসতে বলে, 'পদ্মর চুমু কি তুই একলাই খাবি, লখীন্দর? একদিন আমাকেও দে না ওকে। না হয় একটু বেশিই দাম দেব।' বলে তার নীলচে জিব বার করে দেয়।

ইঙ্গিত বুঝে লখীন্দর ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তখন তার চোখ দুটো লাল, মুখটা চকিতে হিংস্র হয়ে ওঠে, হয়তো ভবগোঁসাইকে একটা ভীষণ আঘাত করে ফেলতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'তোমার বে-করা বউটাকে কি একদিন আমার সঙ্গে শুতে দেবে, ভবগোঁসাই?'

মুখের ওপর এমন একটা জবাব দিতে পেরে বেশ খুশি হয়েছিল লখীন্দর। পদ্মকে তার শরীরের সঙ্গে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এসেছিল। টাকার গরম দেখাতে এসেছে ভবগোঁসাই, পদ্ম যে তার কতখানি, সেটা তো হারামখোরটা জানে না।

৪

শহর থেকে একদল বাবু হপ্তায় একবার এসে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়। লখীন্দর জানে, এসব বিষে ওষুধ তৈরি হয়। বাবুরাও লখীন্দরকে বেশ খাতির

করে। এতরকম সাপের বিষ নাকি আর কোথাও তারা পায় না, আর এখানে মেহনতও সবচে কম, দামেও সস্তা।

তা এসব থেকে টাকা-পয়সার যা আমদানি হয়, তার হিসেব রাখে ষষ্ঠীপদ। সাপের খাবার যেমন সে যোগাড় করে, তেমনি লখীন্দরের খাবারের দায়িত্বও তার উপর। এটুকু হলেও লখীন্দর খুশি, বাকি পয়সা ষষ্ঠীপদ কি করে, তা সে খোঁজ রাখে না। মাঝে মাঝে ষষ্ঠীপদ অবশ্য বলে, যা টাকা-পয়সা জমেছে, তা দিয়ে একটা পাকাবাড়ি বানাবো, তার ভেতর সাপঘর হবে। সাপ রাখার জন্যে বড় বড় কাচের বয়েম কিনে আনবো। দেখবার জন্যে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়বে।

লখীন্দর অবাক হয়। পাকাবাড়ির ভেতর সাপঘর। বলে, 'তোর মাথাখান খুব পোষ্কার ষষ্ঠীপদ।

একদিন ঝাঁঝা করছে দুপুর। কালীনারায়ণপুরের এক জোতদারের বাড়ি থেকে ফিরছে লখীন্দর, কাঁধে তাজা রক্তকানড়। একটু আগে জোতদার শ্রীধর সামন্তের জিবে বিষ ঢেলে দিয়ে এসেছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় পদ্মকে একটা ঝাঁপির মধ্যে রেখে সে বলে এসেছে, 'একটু জিরেন নে, দুফারবেলা আসবো।' ভবগোঁসাই পদ্মর উপর লোভ দেখানোর পর থেকে সে আর ওকে নিয়ে কারো বাড়ি যায় না। পদ্ম তার একার। তা ছাড়া অন্য কোন সাপ থাকলে পদ্ম কেবলই গবগব করে। ফোঁসফোঁস শব্দে তাব বাগ জানাতে থাকে।

ফিরতে ফিরতে লখীন্দর ভাবছিল, বেচারা জোতদারের এই নেশা তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। সর্বক্ষণ রাজনেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে জমিজমা দেখবার সময় কোথায়। সামন্তবাড়ির লোকজন লখীন্দরের ওপব মনে মনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। তার গলায় এমন এক-একখানা রক্তকানড় কিম্বা পদ্মগোখরো ঝোলানো থাকে যে ভয়ে আর রা কাড়ে না। ইদানীং অবশ্য ওঁর এক ছেলে সাবালক হয়ে জমিজমা দেখাশুনা করছে, তাতে একটু হাল ফিরেছে।

ফেরার পথে হঠাৎ ষষ্ঠীপদ বলল, 'গুরু, রূপনগরের পূজোর দালানে একটা পদ্মগোখরো দেখা গেছে।'

লখীন্দর ক্লান্ত ছিল, কিন্তু পদ্মগোখরোর নাম শুনে চমক জাগে। এক পদ্ম ছাড়া তার কাছে আর যে দু-একটা পদ্মগোখরো আছে, তারা হয় বুড়ো না হয় নির্জীব। আবার একটা চনমনে পদ্মগোখরো ঘরে নিয়ে এলে হয়। পরক্ষণেই ভাবে নতুন একটা পদ্মগো'রো এলে পদ্মর আবার গোঁসা হবে না তো!

কিন্তু ষষ্ঠীপদ বলে, 'না হয় ওটা আমিই পুষবো খনে। কদিন তোমার কাছে রেখে বিষ দাঁত ভেঙে একটু মানুষ পানা করে দাও।' একটু ভেবে হঠাৎ পেঁচানো রক্তকানডটাকে ষষ্ঠীপদর দিকে ছুঁড়ে বলে, 'তাহলে এটাকে ধর। দুচারটা সাপ ধরে কাটাই আজ। অনেকদিন জড়িবুটি খেলা হয় না। আমি জঙ্গল থেকে একটা শিকড় খুঁজে নে আসি।'

ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে রক্তকানড়টাকে লুফে ধরে, সাবধানে গলায় পেঁচায়, একটা হাতে ধরে রাখে সাপটাব গলা। কি চমৎকার দেখতে বক্তকানড়টা, পেটেব কাছ থেকে দুদিকে মাথা পর্যন্ত লাল টকটকে দাগ, যেন দুপায়ে আলতা পরানো। লাল জিবটা ফালুক ফুলুক করে বাইরে এনে আবার চকিতে ভিতবে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। হিলহিলে শবীবটা ষষ্ঠীপদব

গায়ে গলায় শিরশির করে নড়তে থাকে। গুরুর আদলে সেও রক্ত কানড়টার গায়ে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

কোত্থেকে একটা শিকড় জোগাড় করে আনে লখীন্দর। রূপনগরের পূজোর দালানে দুজনে পৌঁছোয়, নাকের রোঁয়া বাড়িয়ে বড় করে ঘ্রাণ নেয় লখীন্দর, হ্যাঁ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে বটে। তারপর সে কয়েকটা ফাটলের কাছে পরপর টোকা মারে, আবার নাকে ঘ্রাণ নেয়, শিকড় বোলায়, বিড়বিড় করে কি সব বকে তারপর মাথা নাড়ে। সাপটা তার সঙ্গে জড়িবুটি খেলছে। দালানের সব দেয়ালেই ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। কোথাও বেশি, কোথাও কম, তার মানে জীবটা চট করে ধরা দেবে না। যতো সময় যায়, তার মস্তর খরচ হয়, শিকড়ের গন্ধ উবে যায়, কিন্তু গোখরোটা কাবু হয় না। এদিকে খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। ষষ্ঠীপদ বলে, চলো গুরু, আজ আর হবে না, কাল আবার আসবো।

কিন্তু লখীন্দরের তখন রোখ চেপে গেছে, পদ্মও তার সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলেছিল, এই মা মনসার জীবটাও ঠিক একই রকম খেলা খেলছে। লখীন্দরের চোখ দুটো ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকে। সেই ভোরবেলা কালীনারায়ণপুরে গিয়েছিল, তারপর থেকে এই টানা পোড়েন। গায়ে মুখে টলটল করছে ঘাম, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, লালচে হয়ে উঠছে দুটো চোখ। একটা প্রচণ্ড নেশা তাকে দালানের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাড়া চার ঘণ্টা লড়াই চালানোর পর একটা খোঁদলের ভেতর থেকে পদ্মগোখরোটার টুটি টিপে ধরে টেনে বার করল সে। দড়াম করে শানের মেঝেতে ফেলতেই বিশাল ফণা তুলে দাঁড়াল ওটা, একেবারে তাজা, চকচকে, সোনালী রঙ। লখীন্দর লক্ষ করল, ওটা সাপিনী নয়, সাপ। বোধ হয় মরদ বলে তার ফোঁসফোঁসানিও ভয়ঙ্কর। কিন্তু লখীন্দরের গায়ে বেদেনীর রক্ত আছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সাপটা তার কাঁধে জড়িয়ে লেপটে থাকে গায়ের সঙ্গে। ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবল, পদ্ম কি একে দেখলে হিংসেয় জ্বলবে। পদ্মকে কাঁধে-গলায় জড়িয়ে যখন সে তার শঙ্খচূড়, রক্তকানড় কিংবা বাঁশবুনে কেউটেটাকে ঝাঁপি থেকে বার করে ঘরের মেঝেয় রাখে, ওদের নিয়ে খেলা করে, কিংবা ওরা তার মালিককে একটু সোহাগ জানায়, অমনি পদ্ম ফোঁস-ফোঁস করে রাগ জানাতে থাকে, লখীন্দরের গলায় আরো শক্ত করে ফাঁস জড়ায়। একদিন তো একটা শামুকভাঙা কেউটের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।

যেতে যেতে ষষ্ঠীপদকে বলল, 'বুঝলি ষষ্ঠীপদ, এটাকে দেখলে আমার পদ্ম খুব গোঁসা করবে।'

ষষ্ঠীপদ এসব বোঝে না, বলল, 'ওটার বিষদাঁত দেখেছো, গুরু, বিষে টঙ হয়ে রয়েছে, শহরে খবর দেবে নাকি!'

লখীন্দর হাসে, 'তোর শুধু টাকা আমদানীর ফিকির। বরং এর বিষটা জিবে নিতে কেমন লাগে, তা দ্যাখ দিকি।' বলে সাপটা তার গলা থেকে খোলার ভঙ্গি করে অমনি ষষ্ঠীপদ চিৎকার করে ওঠে, 'দোহাই গুরু, এক্কেবারে মরে যাবো। আগে তোমার বিদ্যেটা শিখিয়ে দাও, তখন তোমার মতো অমন পদ্মগোখরো নিয়ে আমিও বিছানায় শোবো।'

লখীন্দর মস্করা করে, 'গোখরো নিয়ে বিছানায় শুবি, তো তোর বউ কোথায় শোবে?'

মস্করায় যোগ দেয় ষষ্ঠীপদ, 'বউও শোবে, গোখরোও শোবে, দুজন দু'পাশে।'

হেসে ওঠে লখীন্দর, গলায় ঝোলানো সাপটার লেজ আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, 'দূর বোকা, ওরা যে সতীন, একসঙ্গে ঘর করে না।

সাপঘরের কাছে আসতে ষষ্ঠীপদ এবার রক্ত কানড়টাকে লখীন্দরের কাছে দিয়ে দিল, 'এবার চলি গুরু। কাল একটা নতুন ঝাঁপি কিনে এনে দেব।' বলে সে ঘরমুখো হাঁটা দেয়। লখীন্দর এবার তার শিকল খুলে ঘরে ঢোকে। রক্তকানড়টাকে ছেড়ে দিতে সে ঠিক তার ঝাঁপির ডালা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। এদিকে নতুন পদ্মগোখরোটাকে দেখে পদ্মর অদ্ভুত ব্যবহার। অন্যদিন সে ঘরে ঢুকলেই পদ্ম তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠোঁটে, গালে, কপালে জিব বুলিয়ে ভালোবাসা দেয়। আজ যেন সে লখীন্দরের গায়ে অন্য এক গন্ধ পেয়েছে, আর সেই গন্ধ নাকে যেতে তার কি ঝাঁপা-ঝাঁপি, ফোঁসফোঁসানি। দু-তিনবার ছোবল মারলো লখীন্দরের বুকে, কপালে। লখীন্দর আজ তাকে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে গেল। হেসে বলল, 'বাপরে, মেয়ের কি তেজ!' অন্য পদ্মগোখরো দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। লখীন্দর অবাক হলো, বুঝতে পারলো না দুজনের চোখের চাউনির ভাষা, একটু করে দুজনেই ফণা নামিয়ে দুপাশে সরে গেল।

কদিনের মধ্যেই বোঝা গেল নতুন পদ্মগোখরোটার বেশ তেজ আছে। তা সত্ত্বেও লখীন্দরের বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়ল। ষষ্ঠীপদ একদিন শহরে বাবুদের ধরে এনে বেশ খানিকটা বিষ বেচে দিল তার। নতুন গোখরোটা লখীন্দরকে বেশ পছন্দ করছে দেখে কিন্তু পদ্ম তাকে মোটেই হিংসে করলো না, বরং সেও নতুন সাপটাকে বেশ পছন্দ করতে লাগলো। আশ্চর্য, পদ্ম কি হঠাৎ ভালো মেয়ে হয়ে গেল?

৫

ষষ্ঠীপদ একদিন একটা মজার খবর দিল। লখীন্দরের কাছে খবরটা বেশ মজার বইকি। শহরের এক বাবু নাকি সাপ পোষে। মস্ত বড় দালানবাড়ি, কিন্তু সারা ঘরের দেয়ালে সাপের ছবি, সাপের ওপর মস্ত মস্ত বই, বাবু সারাদিন সাপ নিয়ে পড়াশোনা করে। তার ঘরে অনেকগুলো কাচের বয়ামে সাপ রাখা আছে, নানান ধরনের কাচের বয়ামগুলোকে নাকি অ্যাকোরিযাম বলে। সেই বাবু নাকি একটা গোখরো সাপ কিনতে চায়। তার জন্যে মোটা টাকা দেবে।

লখীন্দর সাপ ধরে বটে, কিন্তু সাপ বেচে না কখনো। হয় তার ঝাঁপির মধ্যে রাখে, নচেৎ পছন্দ না হলে মাঠেঘাটে ছেড়ে দেয়—যা মা মনসার জীব, চরে খা।

ষষ্ঠীপদ বড় বড় চোখ করে বলে, একদিন দেখবে চলো গুরু, কি সোন্দর দেখতে কাচের বয়ামগুলান। অমনি কটা বয়াম তোমার জন্যেও কিনে দেবো। তোমার তো অনেক সাপ, কটা বেচে দাও। কাচের বয়াম কিনে ঘরে সাজাই।

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ে লখীন্দর, উঁহু, সাপের গুণিন আমি, সাপ বেচতে নেই। মা মনসার গোঁসা হবে।

শহরের বাবু সাপ নিয়ে লেখাপড়া করে শুনে অবাক হয়ে যায় লখীন্দর, সাপ নিয়ে আবার লেখাপড়া করা যায় নাকি। আশ্চর্য তো! সে তো সাপ নিয়ে তার জীবন কাবার করতে চলল, তা নিয়ে আবার বই হয় তা তো সে জানতো না। মানুষ যে কতরকম ধ্যানাচি জানে।

লখীন্দবের কথা শুনে ষষ্ঠীপদ মুষড়ে পড়ে, তুমি তো ইচ্ছে কবলেই অনেক সাপ ধবতে পাবো গুরু, কটা সাপ বেচলে কিছু যাবে আসবে না।

কিন্তু লখীন্দবেব সেই এক বা, সাপ বেচবো না। ষষ্ঠীপদ ফাঁপবে পড়ে। বোঝে না তাব গুরু অত বেশি কবে তাব পোষ্যপুত্তুবদেব ভালোবাসে কেন।

দু-একদিনেব মধ্যে লখীন্দবেব মনে হল, পদ্ম আব তাকে আগেব মতো সোহাগ দিচ্ছে না, বিছানায় তাব সঙ্গে জড়াজড়ি কবে না, কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। মাঝবাতে সে পদ্মকে সোহাগ দেয়, তাব ঠোঁট নিজেব ঠোঁটেব মধ্যে নেয়, কিন্তু পদ্ম আব চুমো দেয় না তাকে, গাযে জড়ায না, বুকেব উপব ফণা তুলে নাচ দেখায না। হল কি পদ্মব? লখীন্দবেব অভিমান হয, বাগ হয পদ্মকে হঠাৎ টান মেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয মেঝেতে যা ভাগ, ছুঁড়ি, তুই মেঝেয শুয়ে থাক, তব বেছানা মানায় না।

কদি‍ন এবকম মান-অভিমানেব পালা চলল, গুটি-গুটি সাপটা তাব বিছানায উঠে এলো। লখীন্দব আব তাকে কাছে নেয না কাঁধে-গলায জড়ায না। চুপচাপ তাব বিছানায পড়ে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। ষষ্ঠীপদ একদিন ডাকতে এসে প্রচণ্ড তাড়া খেযে চলে গেল। বুঝতে পাবল না। গুরুব মেজাজ এত তিবিক্ষি কেন?

একদিন মাঝবাতে ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে লখীন্দবেব ঘুম ভেঙে যায। নিশুতি বাত সমস্ত ঘবে ডাঁই হযে জমে আছে। চালেব একটা খড়ও চোখে নজব কাড়ে না। ফোঁসফোঁসানিব শব্দটা আসছে ঘবেব কোণ থেকে। কি মনে হতে উঠে বসলো লখীন্দব। ষষ্ঠীপদ শহব থেকে তাকে একটা লাইটাব কিনে এনে দিযেছিল, তাব ছোট্ট চাকাটা ঘোবাতেই ফস্-কবে আলো জ্বলে ওঠে। খাট থেকে নেমে অন্ধকাব হাতড়ে ঘবেব কোণেব দিকে যায সে। মনে হল কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছে ঘবে, গন্ধটা তাব খুব চেনা। ফস্ কবে লাইটাব জ্বালাতেই দেখল, ঠিক যা ঠাহব কবেছিল তাই। পদ্ম তাব বিছানা থেকে নেমে নতুন সাপটাব চাবপাশে ঘুবঘুর কবছে, যাব মধ্যে সদ্য ধবে আনা পদ্মগোখবোটা বাখা আছে।

মাথাটা গবম হয়ে গেল লখীন্দবেব। বুকেব মধ্যে একটা বিষ-পিঁপড়ে কুটুস কবে কামড় দিল। গত ক-বছবেব মধ্যে যা ঘটেনি, হঠাৎ পদ্মব এমনধাবা হয়ে যাওয়াতে তাব চোখেব সামনে একটা বিদ্যুৎ ঝিকমিক কবে খেলে যায়, কি বে পদ্ম, তোব খুব গুমব হযেছে, তাই না? আমাব বেছানায তব আব ভালো লাগে না।

লাইটাব জ্বালাতেই পদ্ম হতচকিত হযে ফণা তুলে দাঁড়ালো, তাবপব লখীন্দবেব পাযে জড়িয়ে সোহাগ জানাতে শুরু কবে, যেন পদ্ম খুঁজে পাচ্ছিল না লখীন্দবকে, এখন দেখতে পেয়ে পা থেকে জড়িযে জড়িযে গাযে ওঠে, গালে জিব বুলিযে দেয। লখীন্দবেব বাগ তৎক্ষণাৎ নেমে যায, গলে জল হযে যায তাব অভিমান। পদ্মকে বিছানায নিযে চলে আসে, পদ্মব বিচ্ছিল শবীবে নিজেকে ডুবিযে দেয—পদ্ম বে, দেখ, তবে কতো ভলোবাসি, আমি, তব জন্যে আবেকটা বউ আনি নাই। নইলে গোলাপী আমাবে অমন একটা দাগা দিল।

পদ্ম ওব বুকেব ওপব ফণা তুলে দাঁড়ায, মাঝে-মাঝে লতিযে নেমে চুমু খায ওব গলায, গালে। অদ্ভুত সুখ পায লখীন্দব। ঘোবা বাত আবো ঘনঘোব হযে আসে। বাইবে ঝিবি ঝিবি ডাকে শিশিব পড়াব মতো টুপটাপ শব্দ হয।

ভোরে উঠে পদ্মকে বলল, "তুই তোর ঝাঁপির মধ্যে আজ সারাদিন থাকবি। আমি শহরে যাচ্ছি।' বলে পদ্মকে তার ঝাঁপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। প্রথমে মুখ, তারপর সরসর করে তার সমস্ত শরীর, তারপর লেজ, আস্তে আস্তে পদ্মর শরীর ঝাঁপির মধ্যে চলে যায়। শহরে বেরুবার আগে নতুন পদ্মগোখরোটার ঝাঁপির উপর দুটো থান ইট চাপা দেয়। লখীন্দর ভাবে, পদ্মটার হঠাৎ কি নোলা বদ্‌লেছে। নতুন পদ্মগোখরোটা মদ্দা-সাপ, সাপেদের মধ্যে মরদ। এমন একটা মদ্দার গন্ধ পেয়ে পদ্ম কি তার জাতপুরুষকে খুঁজে পেলো। আর লখীন্দর যে এতকাল ওকে তার সোহাগ আর ভালোবাসা দিয়ে আসছে, সেটা কি পদ্মর মনে নেই? হঠাৎ লখীন্দর ভাবল, এসব কি এলোমেলো ভাবছে, হতো নেহাৎ খেয়ালবশে পদ্ম তাদের নতুন অতিথির তালাশ নিয়ে গিয়েছিল।

আসলে তার মনের এই যে বিষ পিঁপড়েটা, তা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে গোলাপী। নইলে আগে সে এমনধারা ছিল না। গোলাপী তো তার সামনেই নগারির সঙ্গে কতো রসের কথা বলেছে, সে তো কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি গোলাপীর মনে অন্যরকম ছিল। নতুন পদ্মগোখরোটা লখীন্দর বেচে দেবে, এই খবর শুনে ষষ্ঠীপদ লাফিয়ে উঠল। চলো গুরু, শহরে যাই, বাবুটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

সাপ নিয়ে লেখাপড়া করা বাবুটার সঙ্গে লখীন্দরেরও কথা বলার খুব ইচ্ছে। সে সাপের গুণিন, প্রতিটা সাপের নিশ্বাস সে চেনে, তার চে' বেশি আর কে জানে।

সেই কথাই বলল শহুরে বাবু। লোকটার এককাঁড়ি বয়স না, মুখে ছেলেমানুষভাব। ঘরের চারপাশে অ্যাকোয়ারিয়াম, তার মধ্যে বেশ কটা সাপ, একটা কেউটে, একটা লাউডোগা, একটা চিতে। ঢোঁড়া আর মেটে সাপও রেখেছে কটা। দেখে লখীন্দরের হাসি পায়। নির্বিষ সাপ কেউ বয়ামে রাখে। মাঠে ছেড়ে দাও, চরে খাক্। দেয়ালে কতোরকম সাপের ছবি, আলমারিতে কতো বই। টেবিলে দু-খানা বই-এর মলাটেও সাপের ছবি আঁকা।

শহুরে বাবুটা তাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল, কত সব খবর জানতে চায়। লখীন্দরের জীবন ভর জানার জগৎ সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বার করে আনছে, সাপের নাড়িভুঁড়ির খবর। বাবুটা তার সঙ্গে যত কথা বলছে, ততই উত্তেজনায়, উৎসাহে লাফিয়ে উঠছে। লখীন্দর নাকি একটা হীরের খনি, তাকে খুঁজলে জগৎ সংসার নাকি চমকে যাবে।

পদ্মগোখরোটার দাম ঠিক হল মোটা টাকার। লখীন্দর যদি তাকে আরো সাপ ধরে দেয়, তবে ভালো দাম দিতে সে দ্বিধা করবে না। লোকটা আরো বলল, একদিন সে লখীন্দরের সাপঘর দেখতে যাবে।

শহুরে বাবুকে লখীন্দরেরও বেশ ভালো লেগে যায়, ষষ্ঠীপদকে বলে, ওই পদ্মগোখরোটার সঙ্গে আরো কিছু সাপ দিয়ে আয় ষষ্ঠীপদ। আরামে থাকবে, খাবে। বাবু মস্ত বড়লোক, আর বেশ সমঝদার।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। ষষ্ঠীপদ ফেরার পথে হোটেলে খাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু লখীন্দর রাজী হয়নি। হয়তো পদ্মও এতক্ষণে মুখে কুটোটি কাটেনি। অনেকক্ষণ ধরে যে বিষ পিঁপড়েটা কামড় দিচ্ছিল, এখন তাব ধার একটু ভোঁতা। নতুন পদ্মগোখরোটা বিদেয় হবে ভেবে স্বস্তি পায়। মনে মনে বলে, তর কোন দোষ নাই রে,

পদ্ম। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। গোলাপীটা বাজারে মেয়ে ছিল। বেবাজিয়া হয়ে গেছে, বেশ করেছে।

একরাশ ঘাম, ক্লান্তি আর ভাবনা মাথায় নিয়ে দরজা খুলল লখীন্দর। ঘরে ঢুকেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল। শরীরের কোথাও উপছে পড়ল একঝলক রক্ত, অথবা রক্তের ভিতরে একটা ঘূর্ণী টাল খেয়ে গেল। ঘোরলাগা চোখে দেখল, মেঝের উপর একজোড়া সাপ। প্রায় লেজের উপর ভর করে শঙ্খ লেগেছে। দুটো সোনালী সুতোর রেখা, নড়েচড়ে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের রঙ ছড়াচ্ছে। অমন সোনারঙ দুটো সাপের শঙ্খ দেখে লখীন্দর অন্য সময় হলে মুগ্ধ হত, পরিবর্তে তার শরীরে চাবুক মারতে লাগল কেউ। তুই পদ্ম, তুই এমনধারা,—

পদ্মও লখীন্দরকে দেখে এক মুহূর্ত চমকে গিয়েছিল। তার চোখ আর জিব মেলে একবার তাক' . লখীন্দরের দিকে, কিন্তু তখন তার শরীর ভর্তি ভালোবাসা আর কাম। নতুন পদ্মগোখরোটাও তাকে ছাড়বে কেন! এক লহমা থেমে আবার শরীরে টঙ্কার তুলল তারা, লেজের উপর ভর করে সরে সরে যেতে লাগল লখীন্দরের কাছ থেকে। সেই মুহূর্তে লখীন্দর তার বিছানার তলা থেকে বার করল একটা হাঁসুয়া। চোখের পলক না ফেলতে ঝলকে উঠল চকচকে ফলাটি, আর মেঝেয় আছড়ে পড়ল দুটো সাপের কাটা মুণ্ডু। লাল টকটকে চোখে সেদিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে লখীন্দর বলে ওঠে, তা'লে তুইও গোলাপীব মতো।

নীলাঞ্জনা শুকিয়ে গেছে

দীপঙ্কর দাস

যদিও কোন যুক্তি ছিল না, তবু কেন জানি আমি ভীষণভাবে এক্স্পেক্ট করছিলাম তুমি ঠিক ঠিক এসে পড়বে।...উষা আন্টির কপালে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু জেগে উঠল। শাড়ির আঁচল দিয়ে সেই স্বেদবিন্দু মুছে নিল, তারপর বলল, আমরা ছেলেবেলায় একটা খেলা খেলতাম। বলতাম 'উইশ উইশ' খেলা। মানে খুব অবাস্তব কিছু একটাকে উইশ করে রিয়েলিটি নিয়ে আসার খেলা।

সেই খেলায় কেউ জয়ী হত না। হেরে যেত সবাই। অবাস্তবকে কেবল উইশ করে—যতই ফোর্সফুল হোক না কেন সেই উইশ—রিয়েলিটিতে আনা হয় না। তবু খেলতাম। এক ধরনের একসাইটমেন্ট ছিল খেলাটায়।...ঠোঁটের ফাঁকে হাসল উষা আন্টি। হাসিটাকে ঠোঁটের কোণ থেকে তুলে সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, তোমাকে নিয়ে পাস্ট কয়েকটা দিন সেই ছেলেবেলার খেলাটাকেই খেলছিলাম। খেলতে খেলতে আমার কাছে আমার চারপাশের রিয়েলিটিটাই অবাস্তব হয়ে উঠছিল। আর একেবারে অবাস্তব আশাটাই ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে যাচ্ছিল। কী যে থ্রিলিং ব্যাপারটা, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না!...উষা আন্টি টেনে টেনে শ্বাস নিল কয়েকবার। দুই চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে গেল দূর কৈশোরে ফেলে আসা চাপল্যেব দুখণ্ড স্ফটিক।

—কাগজে বিজ্ঞাপনটা তাহলে কেবল আমাকে ডেকে আনার জন্যই ছাপিযেছিলে? নিরুপম কোন রকমে দম-চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

—তা ছাড়া আর কিসের জন্য ছাপানো বল; আমাদের 'সেন্ট অ্যান্ডারসন' স্কুলটি এমন কি বিখ্যাত যে তাব 'গোল্ডেন জুবিলি' সেলিব্রেশনেব খবরটাকে ঘটা করে কলকাতার ওরকম নামি দামি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করতে হবে?...এটুকু করার জন্য অর্গানাইজিং কমিটির সঙ্গে আমাকে রীতিমতো ফাইট কবতে হযেছে। কমিটি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। দু' একটা লোকাল নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দিযে কাজটা সেরে ফেলতে চাইছিল। আমি যখন বললাম, কমিটি যদি না দেয তাহলে আমি আমার পার্সোনাল ফান্ড থেকেই কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন করব, তখন রাজি না হয়ে পারল না।..উষা আন্টি আবার টেনে টেনে শ্বাস নিল। আবার আঁচল দিয়ে মুখের, কপালের ঘাম মুছল। তারপর চোখ তুলে সরাসরি নিরুপমের চোখের দিকে তাকাল। চোখাচোখি হয়ে গেল নিরুপমের। দারুণ এক অস্বস্তি এসে জড়িয়ে ফেলল নিরুপমকে। নিরুপম দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল। ব্যাপারটা হযত উষা আন্টির নজরে পড়ল না। উষা আন্টিকে এখন কথার ভূত পেয়ে বসেছে। 'উইশ উইশ' খেলার এমন অভাবিত এবং বিরল সাফল্যের উচ্ছ্বাসে হয়ত বা ভুলে গেছে বয়স, সময়ও। সেই কথার ভূতের নির্দেশে উষা আন্টি আবার বলল, ওই বিজ্ঞাপন দেখে সত্যি সত্যি যদি স্কুলের সব প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এসে হাজিব হত, তাহলে তো সর্বনাশ

হয়ে যেত আমার! গেস্টদের অ্যাকোমোডেশন দিতাম কোথায়? এই তো সামান্য একটা গেস্ট হাউস। এর ক্যাপাসিটি তো তুমিও জান।

উষা আন্টি একাই কথা বলে যাচ্ছে দেখে নিরুপম কিছু একটা বলতে চাইছিল। কিন্তু কোথা থেকে যেন চূড়ান্ত এক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ নিরুপমকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেবল সে একা উপস্থিত হয়েছে। পনেরো বছর আগে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা এক স্কুলের 'গোল্ডেন জুবিলি' অনুষ্ঠান উপলক্ষে!...এটা তো এক ধরনের হ্যাংলামো। প্রাক্তন স্কুল সম্পর্কে নিরুপমের মনে ন্যূনতম আকর্ষণও ছিল না। হয়ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল স্কুলজীবনের কালটাকে। যদি কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিরুপমের চোখে না পড়ত তাহলে নিরুপম জানতেও পারত না যে, যে আবাসিক মিশনারি স্কুলে তার ছাত্রজীবনের একটা বিশেষ সময় কেটে গেছে, সেই স্কুল পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করে ফেলল। কাগজের বিজ্ঞাপনটা নিরুপমের নজরে নাও পড়তে পারত। নিরুপম কোন কালেই সংবাদপত্রের তেমন মনোযোগী পাঠক নয়। কেবল সংবাদের শিরোনামগুলির ওপরেই চোখ বুলিয়ে যায়। মন ছোঁয় না কিছুই। সেখানে বিজ্ঞাপন পড়া তো অনেক দূরের কথা! তবু সেই অমনোযোগী চোখ আটকে গিয়েছিল বিজ্ঞাপনটির ওপর। পাঁচের পাতার ডান দিকে দুই কলাম জুড়ে ছয় সেন্টিমিটারের এক বিজ্ঞাপন।—"আগামী মাসে সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুল তার জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করছে। সেই উপলক্ষে সাত এবং আট তারিখে স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই গৌরবময় মুহূর্তে এই স্কুল তার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ভীষণ রকম প্রত্যাশা করছে।"

ব্যাস, এটুকুই। আর কোন বাড়তি কথা নয়। সামান্য কোন ইঙ্গিতও নয়। কোন গোপন প্রত্যাশার অঙ্কুরটুকুও দেখা দেয়নি কোন শব্দের আড়াল থেকে। এই বিজ্ঞাপনটি হয়ত কাছের দূরের আরও অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখেও পড়েছিল। তবু তারা কেউ কর্মস্থলের জরুরি কাজ ফেলে, ঘর সংসার ফেলে,নিরুপমের মতো ছুটে আসেনি দক্ষিণ বিহারের এক বিখ্যাত শিল্প-নগরীর প্রান্ত ছোঁয়া সেন্ট অ্যান্ডারসন নামক এক অনুল্লেখ্য স্কুলে। এটা আপাতদৃষ্টিতে হ্যাংলামো ছাড়া আর কি?

—তুমি বরং এখন একটু রেস্ট নাও। তারপর চানটান সেরে নিও। গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার কুন্দনকে তুমি চেন না। ও নতুন। তবু তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব বলে যাচ্ছি...উষা আন্টি গেস্ট হাউসের দোতলার ব্যালকনিতে পাতা চেয়ার ছেড়ে উঠল। দেখাদেখি নিরুপমও। উষা আন্টি ব্যালকনি পেরিয়ে নিচে নামার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল একবার। শ্বাসের শব্দটা বাতাসে ভর দিয়ে নিরুপমের কান ছুঁয়ে গেল। উষা আন্টি আবার বলল, দুপুরের খাবারটা তোমার এখানেই পাঠিয়ে দিতে বলে যাচ্ছি। তুমি আর কেন ছেলেমেয়েদের ভিড়ে বসে 'কমিউনিটি ফিস্ট' খাবে! ভিড়-টিড় তো তোমার ভাল লাগে না। খাবার পর পারলে একবার অডিটোরিয়ামে এসো। লাঞ্চ ব্রেকের পর তো লাইট এন্টারটেইনমেন্ট-এর আসর। তোমার ভালই লাগবে।

উষা আন্টি আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

দুই

হাওড়া থেকে রাত ন'টাব ট্রেনে চেপেছিল নিরুপম। সকাল সাতটায় ট্রেন থেকে নেমেছে। তারপরও ঘণ্টা খানেক 'সাটেল ট্যাক্সি'তে গেছে। স্টেশন থেকে সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুলের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। ধকল কম হয়নি। ফলে নিরুপমের সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি ছড়িযে ছিল। সেই সঙ্গে হঠাৎ কবে জেগে ওঠা মানসিক অবসাদও ঘিরছিল নিরুপমকে। তবু নিরুপম ব্যালকনির রেলিং ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িযে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল চারপাশ।

পনেরো বছর বয়স বেড়েছে সেন্ট অ্যান্ডারসনের। তবে বয়সই বেড়েছে খালি, তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি বাইরের চেহারার। গেস্ট হাউসের সামনে কিছুটা খালি জমি। সেখানে সাজানো বাগান। এবারের শীতে প্রচুর চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়েছিল গেস্ট হাউসের মালি। এখন ফাল্গুন। তবু সব ফুল মরে ঝরে যায়নি। বাগান আলো করে কিছু ফুল ফুটে আছে এখনও। বাগানের পর গেস্ট হাউসেব বাউন্ডাবি ওযাল। ওযাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ইউক্যালিপ্টাস, ঝাউ আর শিরীষের সারি।

গেস্ট হাউস ছাড়লেই ছাত্রদের হস্টেল। তিন সারিতে ভাগ করা এক একটি তিনতলা বাড়ি। নিরুপম জানে প্রথমটি আজাদ ভবন, মাঝেরটি প্যাটেল ভবন, পরেরটি মতিলাল ভবন। নিরুপম ছিল প্যাটেল ভবনে। ছেলেদের হস্টেল এলাকা ছাড়ালে সেন্ট্রাল লাইব্রেরী। তারপর দোতলা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। পাশে গির্জা। তারপব রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া গাছে ছাওয়া লাল মোবাম বিছানো রাস্তা। সোজা চলে গেছে 'স্কুল কমপ্লেক্স'-এর প্রধান ফটকের দিকে। রাস্তার ওপারে ছাত্রীদের হস্টেল। দুটো বাড়ি, একটি কস্তুরবা ভবন, অন্যটি সরোজিনী ভবন। ওদিকেই মূল স্কুল বিল্ডিংস। ইংরেজি বর্ণমালাব ইউ আকারের। স্কুল বিল্ডিং-এব পেছনে খেলার মাঠ। তাবও পরে স্টাফ কোয়ার্টার্স।

নিরুপমের চোখ সব কিছুকে নিখুঁতভাবে জরিপ কবে নিল। না, সব কিছুই একই রকম আছে। বদলায়নি কিছু। 'গোল্ডেন জুবিলি'ব অনুষ্ঠান উপলক্ষে দালান বাড়িগুলির শরীরে কেবল নতুন রঙ চড়েছে। একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাই।

যেমন বদলায়নি স্কুল বিল্ডিংসের মাঝখানে ছড়ানো প্রাঙ্গণের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ানো প্রাচীন বটগাছের শরীরও। শাখা প্রশাখা থেকে ঝুরি নামিয়ে নামিযে মূল কাণ্ডটাকে ঢেকে ফেলেছে অনেকদিন আগেই। আজও এক অবস্থা।

ওই বটগাছের নিচে একদিন গোটা দুপুব, স্কুলের পিরিযড থেকে শেষ পিরিয়ড পর্যন্ত নিরুপমকে কান ধবে দাঁডিযে থাকতে হযেছিল। নিরুপমের তখন ক্লাস সেভেন। ক্লাস সেভেনের এক ছাত্রব কাছ থেকে যে পরিমাণ বিনয এবং শৃঙ্খলাবোধ দাবি করে এই স্কুল, নিরুপমেব মধ্যে সেসব বিনয এবং শৃঙ্খলাবোধের ঘাটতি ছিল একটু বেশি রকম। ঘাটতি বললেও কম বলা হবে। আসলে নিরুপমের ভেতব তখন আত্মধ্বংসের এক চিতা জ্বলত দাউ দাউ কবে। সমস্ত প্রথা এবং সংস্কাবের বিরুদ্ধেই সে তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

ফলে শাস্তি প্রায়ই জুটত। তবে সেদিনেব শাস্তিটা যেমন সেন্ট অ্যান্ডাবসন স্কুলেব কাছে বিরল, তেমনি নিরুপমেব কপালে জোটা শাস্তিব সব দৃষ্টান্ত ছাডিয়ে গেছিল।

স্কুল প্রাঙ্গণের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে টানা আটটা পিরিয়ড কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে গোটা স্কুলবাড়ির প্রতিটি ক্লাস ঘরের ছাত্রছাত্রীবা, মায় টিচার্স রুমের প্রতিটি শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা অনায়াসেই দেখতে পেয়েছিল নিরুপমের লাঞ্ছনা। চূড়ান্ত অপমান আর লজ্জায় সেদিন প্রথম নিরুপমের দু' চোখের কোল ছাপিয়ে দু' চার ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়েছিল। নিরুপমের চোখে জল, তখন বাস্তবিক এক বিরল ঘটনা।

তবে সেই জল খুব বেশিক্ষণ আর্দ্র করে রাখতে পারেনি নিরুপমের দুই চোখের কোল। দ্রুত শুকিয়ে গেছিল জল। শুকনো খটখটে চোখ দুটো রাগে ক্ষোভে অজানা আক্রোশে আবার আগুনের ভাটার মতো জ্বলে উঠেছিল। দুই চোখে আগুন নিয়ে স্কুলের শেষ পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজার পর নিরুপম নিজের হস্টেল-ঘরে ফিরতে পারেনি। ফেরার মতো মনের অবস্থা ছিল না। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলের সীমানা পেরিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছিল 'নীলাঞ্জনা'য়। ছোট পাহাড়ি নদী কোটরা। কেবল বর্ষার মরশুম বাদ দিলে নদীতে জল প্রায় থাকেই না। হাহা করে বালির চর। সেই বালির চরের ঠিক মাঝখান দিয়ে কোনরকমে বয়ে যেত ক্ষীণ এক জলস্রোত। কোটরার ধারেই এক ঝরনা—স্থানীয় নাম নীলাঞ্জনা।

ঝরনা আর কি! ছোট ছোট বিভিন্ন মাপের বোল্ডারের স্তূপের নিচে থেকে মাটি ফুঁড়ে অতিক্ষীণ এক জলধারা—তিরতির করে কোটরার বালির চরা ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে নদীর মাঝবুকে মূল জলস্রোতের সঙ্গে মিশেছে। জায়গাটা বড় নির্জন। কাছেপিঠে কোন লোকালয় নেই। বোল্ডারের ফাঁকফোকর দিয়ে জলধারা বয়ে যাওয়ার মৃদু শব্দটাও স্পষ্ট করে শোনা যায়।

সবচেয়ে উঁচু বোল্ডারের ওপর বসেছিল নিরুপম। দুই হাঁটুর মাঝখানে চিবুক ডুবিয়ে কতক্ষণ যে বসেছিল নিরুপম, খেয়াল হয়নি। ওদিকে বিকেল গড়িয়ে আবছা আলোয় ছেয়ে যাচ্ছিল চারপাশ। কোটরার ওপরকার আকাশ চিরে চিরে ঝাঁক বেঁধে দূরের বনভূমির দিকে ফিরে যাচ্ছিল নাম না জানা পাখপাখালির ঝাঁক। তাদের ডাকের শব্দ অদ্ভুত এক মায়ের মতো ঝিনঝিন করে ঝরে পড়ছিল কোটরা'র বালির চরায়।

—নিরুপম! নি-রু-পম!

উঁচু বোল্ডারের ওপর অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে থাকতে নিরুপম শুনল কেউ যেন ডাকছে তাকে। হাঁটুর ওপর থেকে মুখ তুলে তাকাল ডাকটার সম্ভাব্য উৎসের দিকে। দেখল একটু দূরে, বালির চরায় দাঁড়িয়ে আছে উষা আন্টি। হাত নাড়িয়ে ডাকছে তাকে।

উষা আন্টি সেই বছরেই স্কুলে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজির শিক্ষক। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার ফলে তখনও উষা আন্টির শরীরে ছাত্রী-ছাত্রী গন্ধটা ভাল করেই জড়িয়েছিল।

তবু উষা আন্টি শিক্ষক। সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুলের শিক্ষক। আজকের এমন অপমান এবং লাঞ্ছনায় ভরা দিনে নিরুপমের কাছে উষা আন্টির উপস্থিতি আদৌ স্বস্তিদায়ক ছিল না। ফলে নিরুপম উষা আন্টির ডাক শুনেও কোন সাড়া দিল না। নেমে এল না নিচে। সবচেয়ে উঁচু বোল্ডারের ওপর যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইল!

উষা আন্টি নিরুপমের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ছোট থেকে বড়—এক একটি

বোল্ডার ছোট ছোট লাফ দিয়ে পার হয়ে ক্রমশই উঁচু বোল্ডারের দিকে উঠে আসছিল। আন্টির এমন অভাবনীয় কাজ দেখে নিরুপম সামান্য বিস্মিত হল। প্রতিটি বোল্ডার লাফিয়ে ডিঙানোর সময় উষা আন্টি পবনের শাড়িটাকে দুই হাতে ঘাগরার মতো তুলে ধরেছিল। শাড়ির নিচু সীমানা ছড়িয়ে বারবার অনাবৃত হয়ে পড়ছিল উষা আন্টির পা, পায়ের ডিম। কখনও কখনও হাঁটু বরাবর উঠে আসছিল শাড়ির পাড়। নিরুপম জানত উষা আন্টি জাতিতে সিন্ধি। সিন্ধিরা এমনিতেই যথেষ্ট ফরসা হয়। তবু উষা আন্টি যেন আরও একটু ফরসা। শাড়ির প্রান্ত ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া উষা আন্টির পায়ের উজ্জ্বলতা সেদিন নিরুপমকে দুর্বোধ্য এক শিহরণ উপহার দিয়েছিল।

—এই জায়গাটা বোধহয় তোমার খুব প্রিয়? উষা আন্টি সবচেয়ে উঁচু বোল্ডারের ওপর উঠে আসতে গিয়ে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়েছিল। কপালে ফুটে উঠেছিল স্বেদ বিন্দু। লম্বা করে শ্বাস নিতে উষা আন্টি একেবারে নিরুপমের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। নিরুপমের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল, জায়গাটা ভারি সুন্দর। যেমন নির্জন, তেমনি টাচিং। নামটা আরও সুন্দর—নীলাঞ্জনা। উষা আন্টি শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল। আন্টি একটু বেশিরকম নিরুপমের গা ঘেঁষে বসেছিল, নিরুপমের ডান কাঁধের সঙ্গে আন্টির বাঁ কাঁধ ছুঁয়েছিল। নিরুপমের নাকে জুঁই ফুলের গন্ধ জড়িয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশে কোথাও জুঁই গাছ নেই। ফুলও নেই। গন্ধটা যে উষা আন্টির শরীর থেকেই উঠে আসছিল, সে ব্যাপারে নিরুপমের কোন সংশয় ছিল না।

তবু নিরুপম যেমন ঘাড় বাঁকিয়ে তার চারপাশের যাবতীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে তিতিবিরক্ত হয়ে বসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল। উষা আন্টিই ক্রমাগত কথা বলে চলেছিল, নীলাঞ্জনা নামটা যেই দিয়ে থাকুক, সে কিন্তু নিশ্চিত এক কবি মানুষ ছিল। না হলে এমন অ্যাপ্রপ্রিয়েট একটা নাম সে পাবে কেন। হয়তো সে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মতোই এক প্রকৃতিপ্রেমী ছিল। এরকম হয়। অনেক কবি জন্মায়। আবার হারিয়ে যায়। কেউ নামও জানতে পারে না।

একটু থামল উষা আন্টি। থেমে কয়েকবার শ্বাস নিল আবার। প্রতিটি শ্বাস গ্রহণের সময় আন্টির বুক সামনের দিকে সামান্য উঠে আসছিল। নিরুপমের ডান কাঁধের পেছন দিকে দু'একবার যেন বাঁ বুক স্পর্শ করে গেল। নিরুপম টের পেল তার তলপেট বেয়ে একটা শিরশির অনুভব নিচের দিকে নেমে গেল।

তবু নিরুপম নিরুত্তর।

—এই জায়গাটা তোমার মতো আমারও খুব প্রিয়। যখন আমার খুব লোনলি লাগে, বিকেলের দিকে বেড়াতে প্রায় দিন এখানে চলে আসি। আই ক্যান ফিল, ইভেন ক্যান টাচ দিস সলিচিউড।

এবার নিরুপম কাঁধ ফিরিয়ে উষা আন্টির মুখের দিকে তাকাল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজল উষা আন্টির ফরসা ডিম ছাঁদের মুখের কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা অভিনয়ের সামান্য একটু ছদ্ম আবরণ। আজ নিরুপম স্কুলে ভয়ঙ্কর শাস্তি পেয়েছে। এমন শাস্তি, যা সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুলের জন্মকাল থেকে আজও কোন ছাত্রকে পেতে

হয়নি। যে দুষ্কর্মের জন্য এমন প্রথাবিরুদ্ধ দেশীয় পদ্ধতির শাস্তি জুটেছে নিরুপমের, সেই দুষ্কর্মের কথা শিক্ষক হয়ে উষা আন্টির অজানা থাকার কথা নয়। তবু উষা আন্টি একবারের জন্যও সেই প্রসঙ্গ তুলল না। শিক্ষকের গাম্ভীর্য নিয়ে নিরুপমকে গায়ে পড়ে শোনাল না পিত্তি-জ্বলা ভারি ভারি উপদেশ। এমন অভিজ্ঞতাও নিরুপমের কাছে কম বিস্ময়কর নয়।

—আমাদের দুজনের মধ্যে কত মিল দেখ! উষা আন্টি একটু সরে নিরুপমের মুখোমুখি বসে বলল আবার, আমাদের দু'জনের প্রিয় জায়গা এক। আমাদের দুজনের ভাললাগাও এক। তাহলে আমরা দুজনে এখন থেকে বন্ধু হয়ে গেলাম, তাই না!

—টিচাররা কখনও আমার বন্ধু হতে পারে না। যেমন কোন গার্জেনও পারে না। আই হেট দেম অল।...নিরুপমের গলার নিচে এখনও এক বন্যপ্রাণী ঘড়ঘড় করে চাপা গর্জন করে উঠল।

—একবার স্কোপ নিয়ে দেখই না, পারি কিনা! উষা আন্টির মুখ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল নিরুপমের মুখের দিকে।

—তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জান না। তাই একথা বলছ?

—জানি। সব জানি।

—কী জান?

—কেন? তোমার নাম নিরুপম। তুমি সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। এবং একজন মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট।

—ব্যাস, এটুকু জেনেই ফ্রেণ্ডশিপ?

—আরও জানি। উষা আন্টি শব্দ করে শ্বাস ফেলল। অনেকটা যেন নিরুপমের চিবুকের ওপর ঝরে পড়ল সেই শ্বাস। চাপা গলায় কেটে কেটে বলল, তোমার বাবা একজন মস্ত বড় বিজনেসম্যান। পাটনায় থাকেন। তোমার যখন মাত্র ছ'বছর বয়স, তখন তোমার বাবা এবং মার মধ্যে সেপারেশন হয়ে যায়। তোমার মা এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে বিদেশে চলে যান। এই ঘটনার পর বছর তিন পরে তোমার বাবাও বিয়ে করেন। তুমি পুরো ব্যাপারটা মানতে পারনি। প্রায়ই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে। স্পেশিয়ালি তোমার নতুন মাব ওপর। তিনিও প্রথম থেকেই তোমাকে ডিসলাইক করতেন। ফলে তোমার বাবা তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে এই রেসিডেন্শিয়াল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যান। তারপর থেকে তিনি আব তোমার কোন খোঁজ খবর নেন না। ভ্যাকেশনের সময়েও তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে আসেন না। তিনি কেবল মাসের প্রথমে হস্টেল সুপারের কাছে তোমার নামে মোটা টাকা পাঠিয়ে দেন।..অ্যাম আই কারেক্ট নিরু?

উষা আন্টির মুখ থেকে নিজের বিড়ম্বিত জীবনের বিস্তৃত পবিচয় শুনে নিরুপম যে খুব অবাক হল, এমন নয়। কারণ এতদিনে তার এই পরিচয় স্কুলের শিক্ষকমহল থেকে ছাত্রছাত্রীদেরও মোটামুটি জানা হয়ে গেছিল। আন্টি নতুন এলেও এতটা নতুন নয় যে, তার কানেও নিরুপমের ভাগ্যের কথা পৌঁছবে না। তবু নিরুপম একটু একটু করে নিজের ভেতবে ভাঙছিল। কোটরাব বুকে জল না থাকলেও, চারপাশে হাহা বালির চড়া ছড়িয়ে থাকলেও বুকেব ভেতর জ্বলন্ত চিতার ওপর কে যেন জল

ছিটিয়ে দিচ্ছিল একটু একটু করে। নিজের জীবনের বেদনাদায়ক গল্পকথা নয়, উষা আন্টির বলার ঢঙ, গলার স্বর, কথা বলতে বলতে নিরুপমের মুখের ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসা মুখের অভিব্যক্তি, আন্টির শরীরের ঘ্রাণ, শ্বাসপতনের শব্দ এবং উত্তাপ, দুই ঠোটের ফাঁক ঠেলে উঁকি দেওয়া মুক্তোর দানার মতো দাঁতেব সাবি সব, সব কিছু মিলিয়ে নিরুপমকে ক্রমশই অতীতমুখী কোন স্মৃতির টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে নেই, ভাল করে মনে করতে পারে না নিরুপম, কোনদিন, কোন এক কালে কোন মহিলা—যে এখন সাগরপারের কোন ধনীদেশের বাসিন্দা—ঠিক এইভাবে—সারা শরীরের নিবিড় ঘনত্ব এবং উত্তাপ উজাড় করে শিশু নিরুপমকে ঘিরে রাখত কিনা! তবু কেবলই তার কথা, তার হাসি, তাব আদর, তার শরীর উত্তাপের আশ্রয়ের কথা ফিরে ফিরে আসছিল। নিরুপম হাত বাড়িয়ে যেন সেই অবাস্তব ঘটনার টুকরোগুলোকেই ছুঁতে চাইছিল।

হয়ত কেঁদেই ফেলত নিরুপম। এত আন্তরিকতা নিরুপমের সহ্য হওয়ার কথা নয়। সে তো কেবল তাচ্ছিল্য চেনে। সে তো কেবল ভর্ৎসনা জানে। সে তো কেবল ঘৃণা পেতে অভ্যস্ত। সেখানে উষা আন্টি আবার নতুন করে কেমন ধরনের উপহার নিয়ে এল নিরুপমের জন্য!

তবু কাঁদতে হল না নিরুপমকে। কেঁদে ফেলার মতো বিশ্রী নাটকীয় ঘটনাকে আন্টিই সামাল দিল। ডান হাতটা নিরুপমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঠোটের কোণে স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়ে বলল, অ্যাকসেপ্ট ইট নিরুপম। আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম।

নীলাঞ্জনা থেকে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা নেমেছিল। বালির চড়ায় পা ডুবিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে আসছিল উষা আন্টি। আগে আগে নিরুপম। নিশি আক্রান্তের মতো হাঁটছিল সে। নীলাঞ্জনার ঘটনাগুলি যেন নিছকই স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় তখন নিরুপম বিমূঢ়।

—নিরুপম?

পেছন থেকে ডাকল উষা আন্টি। দাঁড়াল নিরুপম।

—আজ স্কুল ছুটির পর রেক্টর সব টিচারদের নিয়ে জরুরি মিটিং-এ বসেছিলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আজকের ঘটনার পর তোমাকে স্কুল থেকে একস্‌পেল করে দেওয়া হবে। আমি রেক্টর মহাশয়কে বলেছি, আমাকে তিন মাস সময় দিন। যদি এর মধ্যে তোমার কোন পরিবর্তন আনতে না পারি, তাহলে না হয তোমাকে একস্‌পেল করা হবে। রেক্টর মহাশয় অনেক ঝুঁকি নিয়ে আমাকে তিন মাস সময দিয়েছেন।...উষা আন্টির গলা কেঁপে উঠল। হাওয়ার টানে চড়ার বালিব হালকা ঘূর্ণির সঙ্গে আন্টির কাঁপা কাঁপা স্বর নিরুপমের চারপাশে পাক খেতে লাগল। উষা আন্টি একটু থেমে আবার বলল, তিন মাস, ওনলি তিন মাস। আমি হেরে যাব না তো নিরু?

নিরুপম মাথা নাড়ল।—না। তুমি হারবে না আন্টি! আই বেট, ইউ কান্ট লস দ্য ম্যাচ।

তিন

স্নান খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিরুপম। ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলের সীমানায় পা রেখেছে।

সময় এখন ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ। এদিকে এসময় দুপুরের রোদে চোরা গরম মিশে থাকলেও বিকেলের মুখোমুখি বাতাসে হিম জড়াতে থাকে। সন্ধ্যা রাতে শীতের রেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে আবহাওয়ার এমন চরিত্র বড়জোর আর দিন দশেক চলবে। তারপর চৈত্র এলেই চরিত্র একেবারে বদলে যাবে। বাতাসে লু বইতে শুরু করবে। রোদও হয়ে উঠবে আগুনখাগী।

ঘুমটা আচমকাই ভেঙে গেল নিরুপমের। বিছানার পাশে, মাথার কাছ বরাবর জানলাটা খোলা। এ বেলায় বেশ বাতাস ছেড়েছে। গেস্ট হাউসের বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ইউক্যালিপ্টাস, ঝাউ, দেবদারু গাছের পাতায় বাতাস কাটার সিরসির শব্দটা জানালা ডিঙিয়ে বাতাসে ভব দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। একটু শীত শীত করছিল নিরুপমের। তবু পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা গরম চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার মতো উৎসাহটুকুও অনুভব করছিল না।

গভীর এক আলস্য বাতাসে জড়ানো মিহি শীতের মতোই নিরুপমের শরীর জড়িয়ে রেখেছিল। চোখ মেলে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে রইল নিরুপম। এখান থেকে আকাশেব অনেকটা দেখা যায়। নীলবর্ণ আকাশের গায়ে এখন বেলা শেষের ধূসর রঙ ধরছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা সাদা মেঘের স্তূপ ভেসে যাচ্ছে। ঠিক সাদা নয়, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কিছুটা লাল রঙের ছোপ লেগেছে মেঘের স্তূপের গায়ে। আরও দক্ষিণে আকাশের রঙ কিছুটা কালচে। ওদিকেই স্টিল প্ল্যান্ট। চিমনি এবং ব্লাস্ট-ফার্নেসের মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলী জমে জমে অমন রঙ।

সারা গেস্টহাউসটা নিঝুম। থাকার কথাই। কারণ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেবল সে ছাড়া আর কেউ জুবিলি সেলিব্রেশনে অতিথি হয়ে আসেনি। ফলে গোটা গেস্ট হাউসে এখন বাসিন্দা বলতে একা নিরুপম।

জানালার সানশেডের ওপর দুটো চড়াই পাখি এসে বসল। খুনসুটি করল কিছুক্ষণ। তারপর জানালা ডিঙিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। একবার ঘরের ভেন্টিলেটারে, একবার স্থির সিলিং ফ্যানের ব্লেডের ওপর, একবার ঘরের দেওয়াল-ঘেঁষা কাঠের আলমারির ওপর বসে আবার যেমন ভাবে ঢুকেছিল ঠিক সেই ভাবেই জানালা দিয়ে বাইরে উড়ে গেল।

নিরুপম দেখছিল। তার সমস্ত শরীরের স্নায়ুকোষগুলি আচ্ছন্ন হয়েছিল নির্জনতার তরলে। কী ভয়ঙ্কর পাগলামো! খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে নিরুপম কেমন করে ধরে নিয়েছিল, উষা আন্টি এখনও সেন্ট অ্যান্ডারসনেই আছে! পনেরো বছর যে মহিলার খবর রাখে না নিরুপম, পনেরো বছর ধরে সজ্ঞানে যে মহিলার মুখ নিরুপমের স্মৃতিতে বড় বেশি উঁকি দিয়ে যায়নি, সেই মুখ, সেই স্মৃতির অবাধ্য টানে নিরুপম কিনা কলকাতায় ঘরসংসার ফেলে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এতদূর চলে এল!

অথচ উষা আন্টির সাক্ষাৎ না পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল একশো শতাংশই। যদি সাক্ষাৎ না পেত, তাহলে ব্যাপারটা আরও হাস্যকর, ক্লান্তিকর হয়ে উঠত। এমন পাগলামো করার মতো বয়স কি নিরুপমের আছে?

আবার সেই উষা আন্টিকে পেয়ে যাওয়ার পরেও নিরুপমের ভেতরে এমন অবাস্তব অবসাদ এবং নৈঃশব্দ্য নেমে এলো কেমন করে! উষা আন্টি না হয় ছেলেবেলার উইশ উইশ খেলায় মেতে উঠে নিরুপমের আগমনকে বাস্তবায়িত করেছে। কিন্তু নিরুপমের প্রাপ্তিযোগ তো তার চেয়েও বেশি! যা হওয়ার নয়, যা ঘটা ছিল একেবারেই অসম্ভব, তাই তো ঘটে গেছে! নিরুপম পেয়ে গেছে উষা আন্টিকে! তবু এমন আলস্য কেন নিরুপমকে ঘিরে ধরে আছে! দুপুরে খাওয়া সেরে কেমন করে এতটা সময় ঘুমিয়ে পার করে দিল! কেন, এখন, এই মুহূর্তে উষা আন্টির সঙ্গলাভের জন্য ছুটে যেতে মন চাইছে না নিরুপমের!

এমন একটা দিনের কথাও কি নিরুপম স্মৃতি খুঁড়ে বের করতে পারবে, যেদিন উষা আন্টির সঙ্গে বিকেলবেলায় নীলাঞ্জনায় দেখা না হওয়ার পর নিরুপম হস্টেলের ঘরে খুব স্বস্তিতে রাতটুকু পার করতে পেরেছিল! নিদ্রাহীন একটা রাত তখন কত দীর্ঘ বলে মনে হত। ভোর হতে না হতেই নিরুপম হস্টেলের ঘরের চার দেওয়ালের সীমানা ছেড়ে ছুটে যেত উষা আন্টির কোয়ার্টারে। দরজায় টোকা দেওয়ার প্রয়োজনও পড়ত না। আন্টিও যেন নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে ভোর সকালে ঘরের সদর দরজা হাট করে খুলে রাখত। যেন জানত নিরুপম আসবেই। ভোর সকালেই আসবে।

—কাল কেন নীলাঞ্জনায় এলে না আন্টি! আমি অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা করে ফেলেছি। তারপর ফিরে এলাম! অভিমান, নাকি অনুযোগ, স্পষ্ট করে কিছু বোঝার উপায় থাকত না নিরুপমের কণ্ঠস্বর শুনে!

উষা আন্টিও কি কম বিচলিত বোধ করত! কোনও রকমে শ্বাস-চাপা গলায় বলত, কী করব বল! কাল স্কুল ছুটির পর যে আমাদের মানথ্‌লি অ্যাসেসমেন্টের মিটিং ছিল। মিটিং ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

—ওসব তোমার বানানো কথা আন্টি। আই নো, আজকাল তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ!...অবুঝ কিশোরের মতো নিরুপম ঘাড় নাড়ত। নাড়তে নাড়তে বলত,—আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে আমি কিন্তু ঠিক আগের মতো খারাপ হয়ে যাব। তখন তুমি হাজার চেষ্টা করেও আমাকে আর ফেরাতে পারবে না!

—না নিরু, না। ও কথা মুখেও আনতে নেই। উষা আন্টি দুই হাত বাড়িয়ে নিরুপমকে জড়িয়ে ধরত। নিরুপমের মুখ ডুবে যেত আন্টির বুকের উষ্ণতায়। আন্টি নিরুপমের মাথার আগোছালো চুলে আঙুল ডুবিয়ে বিরুনি কাটতে কাটতে বলত, তাহলে আমি যে হেরে যাব নিরু! আমরা আর আগের জায়গায় ফিরতে পারব না।

নিরুপমের তখন ক্লাস টেন।

সময় চৈত্র। সারা দুপরে রোদের তাপে জ্বলতে জ্বলতে আকাশ বিকেলের মুখে তামাটে বর্ণ ধরেছে। কোটরার পশ্চিম পারে এলোমেলো ছড়ান পলাশ গাছের মাথায়

তখন আগুন। নীলাঞ্জনায় বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে উষা আন্টি। নিরুপম এক পলাশ গাছের শাখা থেকে ছিঁড়ে এনেছে আগুনরঙা পলাশ ফুলের ছড়া। আন্টি বলল, আমার খোঁপায় গুঁজে দাও নিরু।

নিরুপম উষা আন্টির খোঁপায় এক জোড়া পলাশ ফুল গুঁজে দিল। কোটরার চড়ায় তখন চৈত্রের বাতাসের দাপাদাপি। বালির ঘূর্ণির সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে শুকনো পাতালতা। বাতাসের ঝাপটাতেই হয়তো বোল্ডারের ওপর দাঁড়ানো উষা আন্টির শরীরটা একটু টাল খেল। নিরুপম ধরার আগেই আন্টি যেন একটু বেশি শক্ত করে জড়িয়ে ধরল নিরুপমকে। শরীর তখন কাঁপছে। নিশ্বাস পতনের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। নিরুপম বিমূঢ়। নিরুপমের কাঁধের ওপর আন্টির মুখ। নিরুপমের বুকের সঙ্গে উষা আন্টির বুক। চৈত্র বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আন্টির আঁচল।

নিরুপমের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনও রকমে ডাকল নিরুপম—আন্টি!

—আন্টি নয়, নিরু। কেবল উষা। যেন মন্ত্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আন্টি। স্থান কাল পাত্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার বোধ থেকে। অবাস্তব কোন নারী হয়ে উঠেছে আন্টি। তেমনি অবাস্তব গলায় বলল আন্টি, এখানে কেউ নেই। নিরু, কেউ শুনতে পাবে না। কেবল একবার বল, উষা! কেউ সাক্ষী থাকবে না তোমার ডাকের।

—বাতাস আছে। বাতাস সাক্ষী থাকবে।

—বাতাসকেও ভয়?

—সব কিছুকেই ভয় আন্টি। তোমাকেও!

সেদিন ডাকা হয়নি নিরুপমের। উষা আন্টিও পরমুহূর্তে নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। নিজেকে নিরুপমের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে এসেছিল নীলাঞ্জনা থেকে।

চার

ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। একবার, দু'বার। নিরুপম বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দিল। দেখল উষা আন্টি।

—সারা দুপুর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে? আন্টি ঘরের ভেতর এল। একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে নিরুপমের খাট ঘেঁষে বসল।

নিরুপম বসল খাটে। পা ঝুলিয়ে। মুখোমুখি। তারপর নিচু গলায় বলল, দুপুরে খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কখন যেন চোখ দুটো বুজে এল। তাই আর লাঞ্চ ব্রেকের পর অডিটোরিয়ামে যাওয়া হয়ে উঠল না।

—বেশ করেছ। ওখানে গিয়ে মিছিমিছি বোর হতে। আমিও এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমার জন্য আলাদা করে সময় দিতে পারতাম না। উষা আন্টি আবার লম্বা করে বার কয়েক শ্বাস নিল। সকালেও ব্যাপারটা বারবার নজরে পড়েছে নিরুপমের। আন্টি এক সঙ্গে দুটো বাক্য শেষ করতেই যেন হাঁপিয়ে পড়ছে। লম্বা করে শ্বাস টেনে টেনে একটু দম নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে। উষা আন্টির কি শ্বাসযন্ত্রের কোন

অসুখ হয়েছে? পনেরো বছর আগে তো আন্টির কোনো রকম অসুখ-বিসুখের বালাই ছিল না। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল উষা আন্টি। বরং নিরুপমই মাঝে মধ্যে গলার ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়ত। যখন তখন ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর জালা বাধিয়ে বসত। সেই আন্টির এমন অসুখ-বিসুখ হলো কেমন করে।

শ্বাস টেনে একটু দম নিয়ে উষা আন্টি আবার বলল, তুমি তো এসেছ কেবল আমার জন্য! একসক্লুসিভলি ফর মি। তাই না নিরু?

রসিকতা! সন্দেহ নেই উষা আন্টির এটি একটি নির্ভেজাল রসিকতা। তবু নিরুপম নড়েচড়ে বসল। সহজে কোন জবাব দিতে পারল না।

বাইরে বিকেলের আলো মাঠ-ঘাট থেকে নিজেকে তুলে আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পথে। একটু পরে সন্ধ্যার আবছা ছায়া অধিকার করে নেবে চরাচর। বাতাসের গতিও বাড়ছিল। নিরুপমের শীত ভাবটা একটু বাড়ল। গায়ে শালটাকে জড়িয়ে নিল।

—তোমার বাবার খবর রাখ কি? আর নতুন মা? কেমন আছেন তারা? উষা আন্টি কাঁধের ওপর থেকে নেমে আসা শাড়ির আঁচলটাকে যথাস্থানে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল।

—ভালই আছেন নিশ্চয়। খারাপ কিছু ঘটলে হয়ত খবর পেতাম। নিরুপম দাঁতে দাঁত চেপে চেপে কথাগুলি বলল।

—ওঃ, এখনো রিলেশন স্ট্রেইন্ড?

—হঠাৎ নতুন করে স্ট্রেইন্ড হতে যাবে কেন? কোন্ কালেই বা স্বাভাবিক ছিল? তবু যত দিন ছাত্র ছিলাম, একটা আর্থিক সম্পর্ক ছিল। এখন তাও নেই।

—তা ঠিক। খুব স্যাড তোমার এই ব্যাপারটা। বলতে হয়, তাই কিছু বলা—এমনভাবে নিরুত্তাপ গলায় সাড়া দিল উষা আন্টি।

ঘরের ভেতর নির্জনতা ছড়াচ্ছিল। নির্জনতা ঢাকছিল দুই অসম বয়সের মানব-মানবীর স্নায়ুকোষ ঘিরে। নিরুপম দেখছিল উষা আন্টির মুখ। সেই ডিম ছাঁদের মুখ এখন কিছুটা লম্বাটে হয়ে গেছে। মাথার সামনের দিকে—সিঁথির পাশে দু-চার গাছা চুলে পাক ধরেছে। দুই চোখের নিচে যেন অল্পস্বল্প কালিও জমেছে। আন্টির এখন কত বয়স হল? নিরুপমের বত্রিশ। তাহলে উষা আন্টির বড়জোর বিয়াল্লিশ। এই বয়সেই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা তো নয় উষা আন্টির।

—বিয়ে করেছ তো?

আন্টির আচমকা প্রশ্ন শুনে নিরুপমের অন্যমনস্কতা কাটল। মাথা নেড়ে জবাব দিল নিরুপম, হ্যাঁ!

—নিশ্চয় খুব সুন্দর বউ হয়েছে তোমার?

—ওই আর কি!

—ছেলে মেয়ে?

—একটি। ছেলে। সবে তিন বছর চলছে।

—ওদের সঙ্গে করে আনলে না কেন? একবার চোখের দেখা দেখতাম।...একটু

ভারি শোনালো আন্টির গলা। যেন তা টের পেল নিজেই। তাই পরিবেশ হালকা করার জন্য একটু শব্দ করে হেসে উঠল আন্টি। হাসতে হাসতে বলল, অবশ্য তুমি জানবে কেমন করে যে আমি এখনও এই স্কুলেই আছি! তুমি তো আমার মতো ছেলেবেলায় কখনও 'উইশ উইশ' খেলনি!

ঘরের ভেতরে মরা বিকেলের ছায়া ছড়াচ্ছিল। আবছা হচ্ছিল উষা আন্টির চোখ মুখ। সেই সঙ্গে ভারি হচ্ছিল নিরুপমের বুক। বুকের ভার হালকা করতে নিরুপম একটা সিগারেট ধরাল।

ধোঁয়া ছেড়ে নিরুপম দেখল আন্টি কখন যেন ওদিকের জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। গেস্ট হাউসের ওদিকটা স্কুল সীমানার শেষ। কোটরার মরা বুক দেখা যায়। নীলাঞ্জনার বোল্ডারগুলিও চোখে পড়ে।

—আমি তোমার ব্যক্তিগত কত খোঁজ নিলাম। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না?...নীলাঞ্জনার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল উষা আন্টি।

হঠাৎ করে গলায় সিগারেটের ধোঁয়া জড়িয়ে যাওয়ায় একটু কাশল নিরুপম, অনেকটা বিষম খাওয়ার মতো কাশি।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না নিরু?'...ঠিক এই এক প্রশ্ন সেদিনও করেছিল উষা আন্টি। প্রশ্নটা যেন নিরুপমকে পনেরো বছর পেছনে টেনে নিয়ে গেল।

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এসে গেছে। টেস্ট পরীক্ষার পর ক্লাসও ফুরিয়েছে। বিকেলে আর নিয়মিত নীলাঞ্জনায় বেড়াতে যাওয়া হয় না। ফলে উষা আন্টির সঙ্গে দেখাও হয় না রোজ। দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চোদ্দ ঘন্টাই কেটে যাচ্ছে বই এবং নোটস মুখে করে।

উষা আন্টি যে ততদিনে নিরুপমকে আমূল বদলে নিয়েছে। এখন সে তার ক্লাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলে। তার ওপর উষা আন্টি নিরুপমকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সে সেন্ট অ্যান্ডারসন স্কুলকে চমকে দেওয়ার মতো ভাল ফল করবে।

সব সময় নিরুপমের বুক টাটায়। নীলাঞ্জনা তাকে টানে। টানে উষা আন্টি। তবু আন্টিকে দেওয়া কথা নিরুপম ভাঙবে কেমন করে! তাই হস্টেলের চার দেওয়ালের মধ্যেই বিকেল সন্ধ্যা কেটে যাচ্ছে নিরুপমের!

সেদিন রাত তখন কত? বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে। নিরুপম টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ফিজিকস্-এর 'লাইট'-এর চ্যাপ্টারে মুখ গুঁজে বসে আছে। পাশে রুমমেট নিরুপমের সহপাঠী অরবিন্দ কোহেলিও ব্যস্ত কেমেস্ট্রি নিয়ে। এমন সময় অরবিন্দ চাপা গলায় ফিস ফিস করে নিরুপমকে বলল, আরে ইয়ার, তেরা উষা আন্টি ইজ এনগেইজড্!

—মানে! নিরুপম যেন অরবিন্দের এমন প্রসঙ্গহীন কথার একটি শব্দও বুঝতে পারেনি, এভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল অরবিন্দের দিকে।

—মানে আবার কি? অরবিন্দ যেন মাঝরাতের নিঝুম স্তব্ধতায় তার রুমমেটকে

কোন নিষিদ্ধ কাহিনী শোনাচ্ছে, এভাবে বলল, লাস্ট সানডে, আমি আর রাজেন টাউনশিপের সেন্ট্রাল পার্কে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ ঊষা আন্টি আর তার সিলেক্‌টেড লাইফ পার্টনারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঊষা আন্টিই আমাদের ডেকে ওর ফার্স্ট চয়েজের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিল। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ইঞ্জিনিয়ার। ভেরি হ্যান্ডসাম গাই মাইরি! নাম বলল সুরিন্দর খান্না। কথা শুনে মনে হলো, প্রবাব্‌লি দে আর গোয়িং টু...!

আর কোনও শব্দ ঢুকছিল না নিরুপমের কানে। হঠাৎ করে মাথার ভেতর একরাশ আঁধার ঢুকে পড়েছিল। চোখের সামনে খোলা ফিজিকস্-এর বই। পড়ার টেবিল, টেবিল ল্যাম্পের আলো, ঘর, ঘরের চার দেওয়াল—সব কিছুই চলমান এক নাগরদোলার মতো দ্রুত পাক খেতে খেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। নিরুপমের কানে তখন অনবরত ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক বেজে চলেছে। শূন্য দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছে খুব অস্পষ্ট একটা দৃশ্য। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো দাঁত নখ বের করে গর্জন করছে নিরুপমের বাবা। তীক্ষ্ণ বিষধর সাপিনীর মতো ফনা তুলে হিসহিস করছে মা। মাঝখানে ছ'বছরের বিভ্রান্ত নিরুপম। কাঁদছে, খালি কাঁদছে। একটু পরে মা সুটকেস হাতে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে মা। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিশু নিরুপম ডাকছে 'মা', 'মা'। মা একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকাল না। ফাঁকা সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে বেজে চলল মার পায়ের চটির শব্দ, ছপ্ ছপ্। ছপ্ ছপ্।

সেদিন সেই ছপ্ ছপ্ শব্দ বেশিক্ষণ শোনার সুযোগ পায়নি নিরুপম। তার আগেই বাবা ছুটে এসে নিরুপমের কান ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজ, এখন, পাশে বাবা নেই। কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখার কেউ নেই। তাই নিরুপমের কানে 'ছপ্ ছপ্', 'ছপ্ ছপ্' শব্দটা বেজেই চলল। ঊষা আন্টি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। সারা রাত নিরুপম আন্টির পায়ের শব্দ শুনে গেল।

এর মধ্যেই হুড়মুড় করে পরীক্ষা এল, আবার শেষও হল একদিন। এবার জয়েন্ট এন্ট্রানস্-এর পরীক্ষা। সংলগ্ন শিল্পনগরে সেন্টার পড়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স্ পরীক্ষার। ফলে স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেলেও হস্টেলে থাকার অনুমতি দিয়ে থাকেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অনেকদিন পরে বিকেলের মুখে কোটরার পাড়ে নীলাঞ্জলায় এল নিরুপম। অনেকক্ষণ পরিচিত উঁচু বোল্ডারের ওপর বসে রইল। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। কোটরার বালির চড়া তখনও যথেষ্ট তপ্ত। একসময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়াকে ডেকে আনল। দূরে, কোটরার বাঁকের মুখে একঝাঁক পাখি ডেকে উঠল। শব্দটা বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে এল এদিকেও।

ফিরে আসছিল নিরুপম। হঠাৎ দেখল নদীর চড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ঊষা আন্টি!

দুরন্ত এক আবেগ বুক ঠেলে উঠে এসে নিরুপমের শ্বাসনালিতে দলা পাকিয়ে বসে গেল। একি চেহারা হয়েছে আন্টির! এত নিরাভরণ কেন ঊষা আন্টির সাজ-

পোশাক। চারপাশে কেবল সাদা বালির বিস্তার। চারপাশে কেবল শেষ বৈশাখের হাহা বাতাস। তার মাঝখানে উষা আন্টির মূর্তিটা যেন পথহারা দিকহারা এক পথিকের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন রকমে বুক ঠেলে উগলে ওঠা বন্য আবেগ চাপা দিল নিরুপম। নিজেকে সামলে নিল। মুখ নামিয়ে উষা আন্টিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা চালালো নিরুপম!

—আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না নিরু? পেছন থেকে বলল উষা আন্টি। দাঁড়াতে হলো নিরুপমকে। পেছন ফিরে তাকাতেও হলো—কেমন আছ?

—কী মনে হয়? প্রায় অন্ধকার থেকে ভেসে এল উষা আন্টির গলা।

—মনে হওয়ার কী আছে! সুরিন্দরবাবুকে নিয়ে নিশ্চয় ভালই আছ!

—যাক, তাহলে নামটাও জানা হয়ে গেছে! আমি ভেবেছিলাম তুমি জান না।

—তাই এতদিন পরে জানাতে এসেছিলে?

—অনেকটা তাই। তোমার পরীক্ষার প্রিপারেশনে ক্ষতি হবে ভেবেই দূরে সরে থেকেছি। তা ছাড়া...উষা আন্টি থামল।

—তা ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি? নিরুপমের গলায় তীব্র শ্লেষ।

—ও তোমাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আমিও ওকে বোঝাতে পারি না, তুমি আমার কাছে কতখানি জরুরি। আমার মুখে তোমার নাম শুনলেই ও এমন খেপে ওঠে যে, আমার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় আমি যদি কখনও তোমার কাছে আসি, কথা বলি, তাহলে ও বোধহয় তোমাকে খুন করে ফেলবে। তাই কষ্ট হলেও আসতে পারি না।

—আমার জন্য তোমার এত বড় ত্যাগ আমার মনে থাকবে। চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উষা আন্টির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিরুপম কোটরার চড়া পেরিয়ে ফিরে এসেছিল।

—নীলাঞ্জনাকে দেখতে যাবে কি নিরু? উষা আন্টি গ্রিলবিহীন জানালার বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল।

নিরুপম সাড়া দিল না। সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। পোড়া ফিল্টার টিপে জানালায় গলিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

—অবশ্য এখন গিয়ে কোন লাভ নেই। নীলাঞ্জনা শুকিয়ে গেছে। আন্টি নিরুপমের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। —আর্টিসিয়ান ঝরনা তো! হঠাৎ করে একদিন নিজে থেকেই শুকিয়ে গেছে।

কথা। অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা। মূল কথা থেকে দূরে সরে থাকার জন্যই অনর্থক কিছু বাড়তি কথার জাল বুনে চলেছে উষা আন্টি। নিরুপমের বুঝতে অসুবিধে হল না।

নিরুপম উষা আন্টির চোখের উপর চোখ রেখে চাপা গলায় বলল, সুরিন্দরবাবুর খবর কী? উনি আছেন কেমন? ওঁকে তো দেখলাম না একবারও! নাকি এখনও

আমাকে খুন করে ফেলতে পারেন বলে ওঁকে আড়ালে রেখে দিয়েছ?

—কেমন আছেন, বলতে পারব না। তবে মনে হয় ভালই আছেন। উষা আন্টি জানালা ছেড়ে আবার বেতের চেয়ারে এসে বসল। বসে ঘন করে শ্বাস ছাড়ল। অবসাদের শ্বাস।

—তোমাদের তো বিয়ে হওয়ার কথা ছিল!

—ছিল কি? হয়েছিল! যে ইয়ারে তুমি এখান থেকে চলে গেলে সেই ইয়ারের ডিসেম্বরে বিয়ে হয়েছিল!

—তা হলে?

—বিয়ে ভেঙে গেল। দু-তিন মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। উষা আন্টি জোর করে হাসতে চাইল। পারল না। মুখটাই কেবল একটু বিকৃত হল।

—কেন?

—শুনবে? উষা আন্টি শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নিরুপমের মুখের খুব কাছে নিয়ে এল নিজের মুখ। নিরুপম দেখল উষা আন্টির এতক্ষণের ক্লান্ত বিষণ্ণ দুই চোখ যেন আদিম এক অনুযোগের উত্তাপে জ্বলে উঠেছে। নিশ্বাস পতনের গতি হঠাৎ করে দ্রুত হয়ে উঠেছে। নাকের পাটা ফুলছে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। নিরুপমের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

—তোমাকে শোনাব বলেই তো এত কাণ্ড করা! উইশ উইশ খেলা খেলে তোমাকে ডেকে আনা। ...সুবিন্দরবাবু আমাকে ত্যাগ করেছিল খুব স্পেসিফিক এক অভিযোগের ভিত্তিতে।

—অভিযোগ?

—হ্যাঁ, অভিযোগ। ওঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল তুমিই আমার শরীর মন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছ যে, বিয়ের পরেও আমি ওঁকে অ্যাট অল অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি। এমনকি শরীর দিয়েও নয়। রাতের শয্যায় ওঁর ডাকে রেসপনস করেনি আমার শরীর। আমি শীতল থেকেছি। অভিযোগটা সেপারেশনের পক্ষে নিশ্চয় যথেষ্ট ছিল, তাই না?

—কী ভয়ঙ্কর, কী বিশ্রী একটা অভিযোগ! তুমি ওই বিশ্রী লোকটার সঙ্গে ডিভোর্সের পর অন্য কাউকে বিয়ে করলে না কেন উষা আন্টি? মিছি-মিছি কেন জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করলে? নিরুপমের গলায় হাহাকার।

কোনও লাভ হত না। আর যাকেই বিয়ে করতাম, তিনিও আমাকে একই অভিযোগে, ত্যাগ করতেন। ...উষা আন্টি ফ্যাকাসে হাসি হাসল। তারপর কেন জানি নিরুপমের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে চাপা গলায় বলল, আমি তো জানতাম সে সময়ে অন্তত সেই দিনগুলিতে, অভিযোগটা সত্যি ছিল।

হবা

আবুল বশার

সুন্দরতম মিলন মুহূর্তেও অরুন্ধতী স্বামীকে অদ্ভুতভাবে অপমান করতে পারে। বুকের দিকে হাত উঠে এলে অরুন্ধতী ঈষৎ বিরক্তিতে সেই হাত সরিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সুনেত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। বুক থেকে হাত সরিয়ে দেয় কেন, কেবল মুখে 'লাগছে' বলে একটা কাতরতা শোনায়, পরে একদিন সুনেত্র বোঝে, অরুন্ধতী যে কাতর হচ্ছে তা ঠিক নয়, সেটা ওর লাগছে বলার স্বভাব মাত্র। আসলে সে স্বামীর স্পর্শকে পছন্দ করছে না, পাছে বুক দ্রুত যৌবন অপচয়িত হয়ে ঢলে পড়ে। একদিন জোর করে হাত ওঠাতে গেলে অরুন্ধতী কটু গলায় বলে—চাষার মতো কেন, বলছি না ঐভাবে হ.াত দেবে না। ঐজন্য চাষার বউদের বুকের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। দু'দিনেই নেতিয়ে আমসি হয়। বলেছি না এসব কথা?

সুনেত্র থমকায়, বোকার মত কষ্টে হাসে, হাত টেনে নেয়। এবং ভেবে পায় না কবে অরুন্ধতী তাকে কী বলেছে। তার আচরণ যে চাষার মতন, কেননা সে বউয়ের বুকের সৌন্দর্যহানী ঘটাচ্ছে, এইটুকু ভেবেই গ্লানিতে মন ভরে যায়, সে প্রচণ্ড আহত হয়।

ঘরের নীল আলো থেকে সে বাইরের অন্ধকারে চলে আসে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কী কববে বুঝে পায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায়। বারান্দার চেয়ারটা কাঠির আলোয় সামান্য খোঁজার চেষ্টা করে। অনেকখানি দূরে অস্পষ্ট দেখতে পায়। সেদিকে এগোয়। হাতড়ে নিয়ে শশব্দে টেনে বসে। বসার পরই মনে হয়, একটা বাজে অতৃপ্তি শরীরে সর্বত্র দৌড়চ্ছে আর গা যেন ডুমো ডুমো হয়ে যাচ্ছে ঘায়ের মতন। সুনেত্রর অদ্ভুত কিছু বিচিত্র অনুভব মনে সহসা পয়দা হয়। যেমন এখন মনে হচ্ছে গা ডুমো ডুমো ঘা মতন হয়ে যাচ্ছে। অনুভূতির এই সুচি-তীব্রতা তার শিল্পী স্বভাবের দোষ, সে অন্তত তাই মনে করে। মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া যে এমনই হবে, শরীরে ফুটে উঠবে, অন্ধকারে বোঝা না গেলেও, সুনেত্রর আলো জ্বেলে ব্যাপারটা যাচাই করতেও ইচ্ছে হয়। অথচ সে চেষ্টা সে করে না। চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। রাত্রি বেড়ে যায়। সিগারেট টানতে থাকে। রাত্রি প্রবীণ হয়। সিগারেট ধরায়। টানতে থাকে। বারান্দায় সারারাত একটি আলোর ফোঁটা কখনও নেবে না। ভোর হয়ে আসে। বাথরুমে জল-চালুনির শন-শন শব্দ জেগে ওঠে। সহসা ক'দণ্ড সুনেত্রর আত্মহত্যার ইচ্ছা হযেছিল। এখন বাথরুমে ভিজতে ভিজতে সুনেত্র কেঁদে ফেলে।

স্নান শেষে তোয়ালেয চুল মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সুনেত্র দেখে সকালের নরম আলো ফুটে গেছে। কোণের ঘরে যোগ-ব্যায়ামের নারী-শিৎকার শোনা যায়। অরুন্ধতীর যোগ শ্রমের শব্দকে শিৎকার মনে হওয়ার নিজেকে যথার্থ বিকৃত মনে করে সুনেত্র। ফের তার স্নান কবতে ইচ্ছে হয়। খুবই অশ্লীল এই মন, সিদ্ধান্ত করে সুনেত্র। ঘর্মাক্ত অরুন্ধতী ঘাড়ে তোয়ালে ফেলে বেরিয়ে আসে। মুখ মোছে, তোয়ালেয় অরুন্ধতী কি চোখ আড়াল করে বাথরুমে চলে গেল? অরুন্ধতীর চোখে এরপব চেয়ে দেখা ঠিক নয়। সুনেত্রর এক ধরনেব ব্যাকুল লজ্জা মনে আচ্ছন্ন হয়।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে স্বামী-স্ত্রী সামনাসামনি কেউ কাউকে দেখে না। ঘাড় নিচু করে খায়।

অল্প পরে মুখ নাড়া থামিয়ে চোখ তোলে অরুন্ধতী। স্বামীকে স্পষ্ট চেয়ে সামান্য স্নেহে দেখে। ক্ষীণ হাসে। এসব কিছুই দেখে না সুনেত্র। একটা অভিজাত নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রী। সেই শব্দে চমকে ওঠে সুনেত্র। কেমন ভয় পায়। সেই দীর্ঘশ্বাসে একটা বিষণ্ণতাও ছিল, সুনেত্র অনুভব করে না। ঠিক এমন সময় অরুন্ধতীর দিদি অনসুয়া কাঁধে স্বাস্থ্যবতী ভ্যানিটি ঝুলন্ত কপালের পাশে উড়ন্ত গুচ্ছ চুল, ঠোঁটে রঙ, স্লিভলেস স্যান্ডো ব্লাউজ, ঘামে ভেতরে পাতলা কঞ্চুলি ভিজে, একটা ফিতের মতন, ঠোঁটের কানাতে ঘামের ভেজা মোম-তেল, এইসব সহ জমকালো পাতলা ঢাকাই জামদানী পরা, পায়ে চটপটে স্লিপার এবং বুকে আলুথালু বদমায়েসী করা দামাল শিশু পিছলে পড়ছে, তাকে সামনে নামানোর পরই শ্বাস ফেলে 'বাবাঃ'। বলে নিজেকে জানান দেয়। এবং বলে, ট্রেনে কী বিষম ভিড় হয়েছিল, পথে কোন রিকস পাওয়া যাচ্ছিল না। ইত্যাদি। তাছাড়া তারপরই 'তোরা কেমন আছিস' কুশল। পরপরই ছেলে কাঁদে, কোলে উঠতে চায়। অন্যমনস্ক কোলে তোলে অনসূয়া। উঠেই বাচ্চা বুক আঁচড়ায়, সেই অসভ্যতার প্রত্যুত্তরে মৃদু বখিল ধমকায় এবং বাচ্চাটাকে চিমটে দেয়, কোল থেকে একপ্রকার ফেলে দেয় নিচে। ডাইনিং টেবিলের একটি চেয়ারে বসে পড়ে মা। বাচ্চা ও মায়ে খুনসুটি ও অতি দুর্বল দুপক্ষের মারামারি হয়। বাচ্চাকে কোন মা চিমুটি দেয় কখনও দেখেনি সুনেত্র। এই ঘটনা কেন যেন তার অশ্লীল মনে হয়।

অনসুয়া শুধায়—তোর দুধ আছে অরু?

অরুন্ধতী বোনপোকে এক হাতে বাহু আঁকড়ে নিজের দিকে টেনে রাগে ফুলতে থাকা মুখ সস্নেহে নিরীক্ষণ করে বলে—আছে। দাঁড়াও খেয়েনি, তারপর দিচ্ছি।

অনসূয়া বলে—অসভ্য ছেলে সেকথা শুনবে না, বুকের দুধ চাইছে।

সুনেত্র বলল—তাই দিন না ওকে।

অনসূয়া সহসা আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যায়। বলে, কী বলছেন আপনি? একি রাস্তার ভিখিরি যে বুকের দুধ খাবে? আপনি মাঝে মাঝে খুব গ্রাম্য কথাবার্তা বলেন। দীপিকা ওর বাচ্চাকে নিয়ে স্টেশনে আসতে চায় না, ফুটপাতে হাঁটে না, বস্তির ওদিক দিয়ে স্কুল অবধি যায় না। কারণ প্রকাশ্যে মেয়েগুলো বুক আলগা করে বাচ্চাকে বুক চোষায়, বিশ্রী, তা-ও তো বাচ্চার মনে ইফেক্ট করে, করে কিনা বলুন?

তারপর নিজেই উত্তর দেয় অনসূয়া করে। করেই। সেই জন্যই বলছি, দিপিকা ভালই করে। আজই রাস্তায় আসতে আসতে যা দেখলাম, উফ্! ভাবা যায় না।

বাচ্চা মনোযোগ দিয়ে সহসা মায়ের কথা শুনতে শুরু করেছিল, আবার কাঁদতে শুরু করল। বোধহয় অতি ক্ষীণ কৌতুকে সুনেত্র শুধাল—কী দেখলেন দিদি?

অতি ক্ষীণ কৌতুকও কানে গিয়ে বিঁধল অনসুয়ার। বলল—যা দেখলাম, তা কি আপনাকে বোঝাতে পারব। শিশু হলে কী হয়, মুখ না চঞ্চু বুঝে পাই না: নারীর এই দেহ তো ভাগাড় নয় সুনেত্র।

—ভাগাড়? চমকে ওঠে সুনেত্র। চা চলকে পড়ে।

—এমন করে চোষে আর গুঁতোয় যে বাচ্চা যে মানুষের সেকথা গায়ের জোরে

বলতে হয়। আমি সহ্য কবতে পারি না। মাথা ঘোরে। অথচ রাস্তার মায়েরা কি নির্বিকার। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে নারীর মতন অসহায় কে আছে। দিয়ে যাও। কেবল দিয়ে যাও। হাড় মাস নিংড়ে দাও। কি জ্বালা সুনেত্র আপনি বুঝবেন না। স্লিম ফিগার দাও, ফের 'ফরেন-কাউগুলোর মতন দুধ দাও। সব তো আমরা পারব না সুনেত্র। দেহ তো একখানাই।

বলতে বলতে অনসুয়ার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ছেলে কথা শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ চুপ করে গেছে। অরুন্ধতী উঠে গিয়ে গেলাস ভর্তি দুধ নিয়ে আসে। শিশু নিঃশব্দে দুধ খায়। তারপর দুধ শেষ করে কষে আঙুল ঢুকিয়ে চুষতে থাকে। অরুন্ধতী বলে—আরো খাবে মনে হচ্ছে।

অনসুয়া সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়—না। ও আর খাবে না। ওই ওর স্বভাব। কী সুখ, ওই জানে। একেবারে গণ্ড! হাত নামাও রাজা। হাত নামাও।

শিশু ভয়ে হাত নামিয়ে টেবিলে আঙুল ঘষে কী যেন হিজিবিজি আঁক দেয়। অরুন্ধতী সেদিকে চেয়ে দেখে শুধায়—কী লিখলে রাজা?

রাজা ঠোঁট ফুলিয়ে কোলে মুখ ঢাকে অরুন্ধতীর, কী বলে বোঝা যায় না।

সুনেত্র বলে—আমার ছোট ভাই অয়ন ছিল ভয়ানক দুষ্টু। ও অনেক বড় হয়েও মায়ের দুধ খেয়েছে।

অরুন্ধতী হঠাৎ-ই রেগে গেল। বলল—সেটা কোন কৃতিত্বের কথা নয়। মাঝে মাঝেই কথাটা এমন আহ্লাদ করে বলো যে তোমার মোটিভেশন বুঝতে পারি, তুমি খুব পুরনো মানুষ, তোমাকে ঠাকুদ্দা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমার সব আহ্লাদই আমি মেটাতে প্রস্তুত নই।

সুনেত্রর মাথায় সহসা আজ আগুন ধরে যায়। প্রথমে সে স্থির করতে পারে না, কী জবাব দেবে। ফস্ করে দিয়াশলায়-কাঠি জ্বেলে ফেলে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। হাতের কাছে সিগারেট পায় না। উঠে পড়ে। আবার বসে পড়ে বলে—পুরনো কিন্তু কত পুরনো তুমি জানো না অরুদেবী। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পেছনে তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছ, আমি তোমাদের সভ্যতা চিনতে পারি না। হয়ত তোমরাই ঠিক। অতীতের মায়ায় মজে থাকা ঠিক নয়। তবু এটুকুই কেবল আমার সামনের নাতনীটিকে বলব যে তার স্লিম-ফিগারের দিকে আমার কোন আর্টিস্টিক অ্যাফেকশন নেই। না একদম না। কোন দুধে আর্দ্র করুণ নারীই আমার সন্তানের জননী হবে, সেই স্বপ্ন আদিম, সেই একটা স্মৃতি দিয়েই আমি আমার মাকে দেখতে পাই। আর এদিকে তলোয়ারের মতন তীক্ষ্ণ দেহ আমাকে কাটে। আমার সন্তানকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে। আমি আমার সন্তান ও আমার মাঝখানে কোন ধারালো তরবারি ছুইয়ে রাখতে চাই না। একজন আধুনিকারও যৌন-সংস্কার কিন্তু কুৎসিত হয়। সন্তানকে একলা করে। স্বামীকে পর করে। তারপর সেই স্ত্রী নিজেও একা হয়, আত্মরতির পূজা করে। ছিঃ!

অনসূয়া বলল—আপনি কি আমাদের সঙ্গে কবিতায় ঠাট্টা করছেন?

—না। আমি খুব বিভোর আছি। উত্তর করে সুনেত্র। নিজেকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

—তাই তো থাকবে, তুমি যে শিল্পী। খোঁচা দেয় অরুন্ধতী।

—হ্যাঁ। সন্দেহ করো নাকি? গলা ভারি করে সুনেত্র।

—না। তা কেন করব? তবে তোমার ছবি আর মূর্তিগুলোই বলে দেয় মডার্ন সিভিলাইজেশনের প্রবলেম বা ক্রাইসিস ধরবার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমার বেশির ভাগ ছবিই তো ন্যুড। বর্বর।

—হ্যাঁ। বর্বর বৈকি! কিন্তু হিংস্র নয়। স্বার্থপর নয়। ইনোসেন্টলি এইনশিয়েন্ট বারবারিক্। ঠিক। বাট ইটস্ আ প্রিমিটিভ ড্রিম। আদি স্বপ্ন। একটা স্ট্রীম। বুঝবে না, বুঝবে না। কিছুতেই বুঝবে না। কী সেই স্রোত আমার মনেব মধ্যে বইছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম, জেনারেশন আফটার জেনারেশন আমি সেই সহজ আদিমতাকে স্বপ্নের মতন বহন করছি। মস্তিষ্কের স্মৃতি-কোষে মানুষ শত বিবর্তনেও সেই স্বপ্ন লুকিয়ে রেখেছে। কিছুতেই আমি তা ভুলতে পারি না। আমি ধরে রাখব। কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না।

বলতে বলতে কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুনেত্র। তারপরই শীতল মূর্তির মতন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নিবে যায়। খুব নরম গলায় বলে আমার বিশ্বাসের পৃথিবী নিজেই গড়েছি এমন নয়। আদিম একটা স্মৃতি দিয়ে কেবল নিজেকে নিজে ঘিরে রেখেছি এমনও নয়। সেটা বাস্তব, তাই আছে। সেখানে নেই কোন অরুন্ধতী। হ্যাঁ। নেই। সেখানে আছে—

—থাক আর শোনাতে হবে না। দিদি খুব বোরড 'ফিল্' করছে। তুমি তো একটা পাগল বল দিদি, এনিয়ে চলা যায়। মুখে শুধুই স্বপ্ন স্বপ্ন, এদিকে ও এমন 'বাফ্' যে চিন্তাও করতে পারবি না, বুঝবেও না কিছু।

আবার রাত্রের ঘটনাটাকে ইঙ্গিত করল অরুন্ধতী। সেকথা মাথায় আসা মাত্র সুনেত্র টেবিল ছেড়ে ঘরে ঢুকে গেল। তার ভেতর তোলপাড় হতে লাগল। তাব মাকে মনে পড়তে লাগল। অয়নকে মনে পড়েছিল।...

অপরপক্ষে দুই বোন পত্রিকা ঘেঁটে ঘেঁটে যোগ-ব্যায়ামের পদ্ধতি আলোচনা কবল। রান্নার নানান মুসাবিদা পাঠ করল। সেলাইফোঁড়াইয়ের চর্চা করল। চুল বাঁধার গল্প করল। হিমানী মাখার গল্প করল। শাড়ি সংক্রান্ত রঙ জমিন পাড় সুতো ইত্যাদির মিলিমিশি তর্ক করল। শাড়ি দেখাল। শাড়ি দেখল। প্রশংসা করল। গলগল করে ওরা গলে যেতে লাগল। পাছা ও জঙ্ঘার বা উরুতের বিশদ আলোচনা করল। অভিনেত্রী রেখার যোগ-ব্যায়ামের মুদ্রাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা। টিভিতে সাবানের ও পানীয়ের অর্ধনগ্ন জলকেলি লক্ষ্য করল। ওদের ভারি আনন্দ হতে লাগল। দেহে এল ভয়ানক আরাম। ওরা মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে খাটে শুয়ে গেল। চোখ মুদে এল। ওরা বিউটি স্লিপ দিল। ওরা জেগে উঠল। দেখতে দেখতে ওরা স্বপ্নের মতো হয়ে গেল। ওরা আর বাস্তব রইল না। শ্লথ গলায় ওরা সিনেমার মতন কথা বলতে লাগল। হ্যাঁরে। ও কি খুব বোগা? না। ও কি খুব ন্যাতানো? না। ও কি বিকৃত? না। তবে কী ও? ও খুব ছেলেমানুষ। বোকা। ভ্যাট্! হ্যাঁ দিদি। আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি। তাহলে অনেককাল ধরে রাখতে পারবি। কী? এই যে সব কেমন টসকে দু দিনে পানসে হয়ে যায় না? স্বামীর অত্যাচারে হয়। সেই কথা বলছি। একটু না-ছুঁই না-ছুঁই থাকা ভাল। সেটা যদি সংস্কার মতন হয়, তা-ও ভাল। তাতে ফল ভাল হয়। কী রকম হয়? এই ধর অন্য পুরুষরাও গায়ে লাগতে চায়, স্বামী তাতে হিংসে করতে শেখে, সেটাই লাভ, তখন এঁটেল মাটির মতন লেগে

থাকে, পালায় না। সেটাই তো আরাম রে! আসলে আমাদের সঙ্কট কেউ বুঝবে না। একেক সময় মনে হয় দুপাশে দুই শত্তুর নিয়ে শুয়ে আছি। বাপ খাব খাব করে। ছেলেও করে। দুপক্ষই নিংড়ে নেবে। তারপর ফেলে দেবে। মাঝে একলা মেয়েমানুষ আমি কী করব? তরবারি না হয়ে উপায় আছে? ভাবলে খুব কান্না পায় আমার। দুনিয়াটা ঠিক যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। কোথায়?তা তো জানি না অরুন্ধতী। অরু, তুই কখনও কাঁদিস না?

অরু ওরফে অরুন্ধতী দেখল দিদির চোখ চিকচিক করছে। কেন যেন দিদির এই কান্না অরুন্ধতীর ভাল লাগে না। কিঞ্চিৎ ঘেন্নাই লাগে। কেন লাগে সে বুঝতে পারে না। ওর সঙ্কট আরো অদ্ভুত ঠেকে তার নিজের কাছে। অরু বলে—টেস্টটিউব বেবি হয়েছে কলকাতায়। কাগজে পড়েছি। ব্যাপারটা আরো ডেভেলপড হলে ভাল হত। অন্য মেয়ের পেট ভাড়া নিয়ে বাচ্চা করানোতেই কষ্ট দিদি। যন্ত্রে প্রসব করলেও মন বোধহয় মানবে না। অথচ সেইসব চালু হয়ে যাচ্ছে। খারাপই লাগে। আবার হলে ভালই হত এমনও হয়। কী করি? যন্ত্রকে মানুষ ধীরে ধীরে আর সামলাতে পারবে না মনে হচ্ছে। এসবও ভাবনা করি। কাঁদি-ও। কিন্তু ভয়ও করে। আমি বোধহয় মোটা হয়ে যাব। বাচ্চা হলেই আমাদের বংশে মোটা হয় সব। কেবল তুইই কিছুটা সামলে আছিস।

—হ্যাঁ। রোজই একটু একটু কাঁদবি। শরীর পাতলা থাকবে। যন্ত্রের ভয়েও কাঁদবি, মানুষের ভয়েও কাঁদবি। আমি তাই করি। বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনসূয়া। দুই বোনের চোখ ঘুমে চুলের মতোন জড়ানো।

গড়ানো মধ্যাহ্নে এ-ঘরে ঢুকে এসে সুনেত্র দুই বোনের ঘুম জড়ানো মদির চোখ দেখে বুকের গভীরে আশ্চর্য এক শীতল ঘৃণা অণুভব করে। বলে। আমি যাচ্ছি অরু!

সুনেত্র কোথায় যেন চলে যাচ্ছে পোশাক-আশাকে তৈরি, ওরা দুই বোন দেখতে পায়। উড়ে যায়। সুনেত্রর স্বভাব খুব নরম। সে এতই আহত হয়েছে যে সমগ্র জীবনকে তার মিথ্যা মনে হয়। ভুল মনে হয়। দাম্পত্যকে তার আর মানবীয় মনে হয় না। তার মনের মধ্যে রোগ তৈরি হয়। সে পালাতে থাকে।

রাত্রে অরুন্ধতী সুনেত্রর আঁকার ঘরে এসে টেবিলে একটা সাদা পাতায় আঁকিবুকি লক্ষ করে ঘাড় নামিয়ে। তলায় সুনেত্রর নিজস্ব ভাষায় কতকগুলি লেখা পঙ্‌ক্তি চোখে পড়ে। সুনেত্র লিখেছে :

আদিম পৃথিবীর আকাশ ছিল আরো নীল। অত্যন্ত গাঢ় আর প্রসন্ন নীল। মটরশুঁটির ফুলের চেয়েও নীল। জীবনানন্দের কবিতার মতন নীল। সুনীল গঙ্গোর কবিতার মতন গাঙ্গেয় নীল। সেই আকাশে নীল কস্তুরি আভার চাঁত উঠত। সেই চাঁদের নিচে বনজোছনায় রূপলি শিশিরে ঝলমল করত আর সেখানে শুয়ে থাকত মধ্যরাত্রে এক রূপসী কাজল-পরা হরিণী, গায়ে তার পয়সা ফুলের মতন চিতি গোল দাগ বড়ই মনোহর, সে জাব কাটত স্মৃতিব ক্ষরণে আর পুরনো কথা মনে করত। তার ছিল এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি, সেই তীব্র মিলনে নাভিতে তার সুগন্ধির জন্ম হয়। এ-ইতিহাস কেউ জানে না। বর্বর বুনো বনমানুষের সঙ্গম-আর্তনাদে তোলপাড় বনানীর এই হরিণী একদা ভয়ে মূর্ছা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে সেকালের মানুষ দয়ায় আর্দ্র হয়, সে তখন যৌবনবিদ্যা শেখে। বনমানুষ থেকে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। তখন নারীর বুকে দুধে আর্দ্র করুণ স্তন প্রস্ফুটিত

হয়, তা ছিল সুগোল অমৃত ফুলের মতন রাঙা, লবঙ্গ কুঁড়ির গন্ধ ছিল মিশে, তা খেয়ে পৃথিবীর মানুষের প্রথম প্রসিদ্ধ মস্তিষ্ক তৈরি হয়। তা ছিল শীতল ও অহিংস। আমি অরুন্ধতীদের ঘৃণা করি। কারণ তারা আমার কোন কাজে লাগে না।

পড়া শেষ করে অরুন্ধতী কেমন তীব্র গমকে গলায় কান্না উথলে ফেলে, ফেটে যায়। দিদি এসে ওকে সান্ত্বনা দিলে শোনে না কিছুতে। সে পাগলের মতো কাঁদতে থাকে।

তারপর একদিন পথ চলতে চলতে কোন এক ধুলিগ্রামে এক ঈভের সঙ্গে দেখা হয় সুনেত্রর। ঈভের অন্য নাম হবা। গল্পে তার নাম হবা বিবি। সে একটা গান গাইতে গাইতে মাঠ ভাঙছে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার ঢের আগের প্রখর বিকালে। আকাশ নিষ্করুণ। প্রকৃতি তাপে উতলা। চরাচর ধুঁকছে। ক্ষেতমজুর বেকার। ওদের দড়ি ধুলোর ঝাপটায় সাদা হয়ে গেছে। তেমনি এক ক্ষেতমজুরের কন্যার নাম হবা বিবি। কোন প্রকারে একটা সাদা পাতলা কাপড় ওর দেহকে বেষ্টনের চেষ্টা করেছে মাত্র। তা ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনও ঢের। ইজ্জত যাকে বলে, তা-ও বড় উদাসীন করেছে ঐ কাপড়ের বাহানা। সুনেত্র বিহ্বল হয়ে পড়ে। সুনেত্রর বিশ্বাস ছিল না, পৃথিবীতে এমন মানুষ এখনও পাওয়া যায়। হবা আপন মনে গাইছে ঃ

ওরে শিমুল ফুল
তুমি থাক গাছের ডগালে
আদর কেহ করে না
তোমার গন্ধ নাই বলে। ও শিমুল ফুল...

সুনেত্র পেছন থেকে সহসা প্রশ্ন করে—কে গো সেই শিমুল ফুল? কোথা থাকে?

হবা আচমকা প্রশ্নে মৃদু চমকে পেছন ফেরে। এতদিনে সুনেত্রর মুখে দাড়ি গোঁফ ছেয়েছে বেপরোয়া। জামাতে ধুলাবালি। একেবারে আলাভোলা পাগলের মতো। তা দেখে অকারণ হেসে ফেলে হবা। বুঝতে পারে লোকটা পথ-ভোলা মুসাফির। বা সত্যিই পাগল। বা যে ইচ্ছে সে, তবে ভাল মানুষ। হবা বলে—সে থাকে ডগালে বুলছিই তো ভাইজান।

—বটে?

—হ্যাঁ। গায়ে ছন্দ ফুটিয়ে হ্যাঁ বলে হবা।

—নাম কী শুনতে পাই?

—কার নাম? আমার না তার?

—দুটোই বল।

—আমি হনু হবা জুলানী, জোলার বিটিগো, বাপের তাঁত উঠে যেয়েছে। আর যা ভাবছ, তা লয়। উনি হলেন সোয়ামী।

—বেশ তো। নাম বল?

—নাম? তুমি নমস্কার করো না?

—করি।

—মোছলমান কী করে?

—সালাম।

—অ্যাঁ?

—ঐডেই নাম। শিমুল ফুল। ছোটজাত আমরা। ছোটনোক।

—তাতে কি?

—সেইডেই তো গানের কথা। এ-জাতের আদর নাই বুজলে?

—কে বলল?

—বুললে গানী সমসের আর কানাই পাগলা।

—তারা কারা?

—গায়েন।

—ও। আসছ কোথা থেকে?

—ইস্টিশন। ফের হাজারী তালতলার বাগান থিকে 'আছর' শুনে।

—ইস্টিশন কেন?

—খাবার লিয়ে যেয়ুছিনু। শিমুল ফুল পানি-খাবার খেয়ে মাল বইবে। আসা পথে বাগানে গান। শুনে লিই খানিক।

—তোমার বর কী করে?

—ঐ তো বলনু মাল বহে। মুঠে। ছোটনোক।

—শিমুল ফুল?

—হয়।

শুনতে শুনতে মন মজে যায় সুনেত্রর। বুঝতে পারে, কিছুক্ষণ আগেই হবা বাগানের শব্দ-গান শুনছিল। প্রশ্ন করে—বাগানে শব্দ-গান শুনছিলে?

উত্তর করে হবা, জী। ধড়-বিচারি আর জাত-বিচারি গান। পাল্লা হয় দুজনার। আলম দরবারী হলেন ওনাদের উস্তাদ।

সুনেত্র অনুমান করতে পারে, পাগলা কানাই আর গানী সমসের পাল্লা দিয়ে গান করছে, আলম দরবারী দুজনেরই গুরু। দরবারী টাইটেল সুনেত্র নতুন শুনছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় সুনেত্র। প্রকৃতির মতো সচ্ছল এই দীর্ঘাঙ্গী রমণী তার বিষয়। বিষয়ই শুধু নয়, রমণীর স্বাস্থ্য প্রাচুর্য যেভাবে রেখায়িত ভরাট ও পূর্ণ, সেই বলিষ্ঠতা যে কখনও দৃষ্টিগোচর হবে সে ভাবতে পারেনি। হবা নামটিকে মেয়েটি সার্থক করেছে। তার স্মৃতির সঙ্গে হুবহু সব মিলে যাচ্ছে। হবা ভিনদেশী লোকটিকে শুনিয়ে বলল—এ-বচ্ছর আকাল লাগবে মুনে লিচ্ছে, আসমানে হ্যামেশা শগুন (শকুন) উড়ছে। বিষ্টি নাই। ছানাপোয়ালি বাঁচবে না। সোয়ামী বাঁচবে না। গেবস্তর বলদ বাঁচবে না। ছাগলগুনা ভিটের মাটি চেটে যে বেঁচে থাকবে, সেই ভিটাও চলে গেল, মুরগিগুনা খুদ পায না, মাঠের ধান হয়্যাছে পাতান বুকের ভিতরি খাঁ খাঁ করে।

শুনতে শুনতে চমকে ওঠে সুনেত্র। মেয়েটির ভিটা চলে গেল কীভাবে? শুধায় সে। কীভাবে গেল তোমার ভিটা?

সুনেত্রকে চলে যাওয়া ভিটেয় এনে তোলে হবা। কঞ্চির বেড়া দেওয়া ঘর, মাটি লেপন করা। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে নিম। নিমের গা বেড়ে দড়ি। ছাগল ধুঁকছে। কষে ফেনা। সেদিকে চেয়ে দেখে সুনেত্র। শুধুয় তোমার ভিটে চলে গেল কেন?

হবা বলে, ভিটে চষা পুঁড়ে আর এঁড়ে চুষা কাওট, কথাটা মুনে রাখবেন ভাইজান। এমুন সুবচন যে ধন্দ গো। শুনেছেন?

—না। অবাক হয়ে হবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুনেত্র। হবা বলে, ধীরে ধীবে সব কথা ভাঙব তুমাকে। আগে থির হও। এখানে বসেন তুমি। এই ছিমায় (ছায়ায়) বসেন।

ছায়া পড়েছিল ঘরের চারিতে। মাটি থেকে এক বিঘত উঁচু সেই দাওয়া। একটা চট পেতে দেয় হবা। সুনেত্র ঘাড়ের বড় ব্যাগ নামিয়ে রেখে বসে পড়ে। ঘর থেকে ঘুমন্ত বাচ্চাকে ডেকে তুলে হবা দূরের অন্য একটি নিমের জড়ে গিয়ে বসে। বুক খুলে দেয়। তারপর কেমন বিষণ্ণ-উদাস হয়ে পড়ে। বাচ্চা দুধ খেতে শুরু করে। হবা সুনেত্রকে লজ্জা করে না। পাতলা সাদা মেঝের শাড়ীতে হবার সব রেখা অতি স্পষ্ট। বুকখোলা। কাপড়ের আড়াল দেওয়ার মতন গা-ঢাকা কাপড় তার নেই। তা নিয়ে সে বিড়ম্বিতও নয়। সে নির্বিকার। ছেলেকে সে ঘরে ফিরেই যেমন করে সাত তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়ে দুধ দিতে লাগল যে তাতেই বোঝা যায়, ছেলেকে রেখে গিয়ে তার মন ভাল ছিল না। হবা বলল, গায়ে খানিক হাওযা লাগিয়ে এলে বুকে দুধ নামে। ছেলে তাগড়া হবে, জোয়ান হবে, বাপের সাথে মাল টানবে, গাযে দুধ না লাগলে চলবে, কহেন ভাইজান। আমার ভিঠা নাই, মাটি নাই। এইটুকুন ভবসা। ফের এই বাছাও মাকে দেখে না আর। মা তবো তাকে দুধ দেয়। তাগড়া কবে। মুটেব বাচ্চা হাতির বাচ্চা, সেই গতব বানায় মা। সেই তাগড়া সুনা মা-কে লাঠি মারে, চড় মারে। লাথি দেয়। ভাত দেয় না। বোঝেন তুমি ভাই।

সুনেত্র বলল, তোমার তো শিমুল ফুল আছে। সে তোমাব ভবসা নয।

—নাহ! সে-ও লয়। অভাবের টানে জেবন কুথা যায় খোদা মালুম। পুরুষ যখন পারে না, তখন পালায়। লয় তো তালাক দেয়। ইখানে কচুপাতার পানি কখন চলকাবে নারীও জানে না ভাইজান। তবো এই ভিটার জন্যি মুন বহলায়, ছাওয়ালকে দুধ দি। ক্যানে দিই বুঝতে পারি না। আপনি তো বুঝমান, কহেন, ক্যানে দিই।...ওহ্!

বাচ্চা মা-কে কামড়েছে। কাতরোক্তির বদলে যেন খোদোক্তি করে হবা। ছেলে মাকে গুঁতোয়। নিংড়ে নেয়। নিঃস্ব করে দিতে চায়। মা তবু জানে না, কেন যে আশ্চর্য সুখে চাঁদের মতন এখনও পরিপূর্ণ। শেষ হয়ে গিয়েও সে শেষ হচ্ছে না। মুছে যেতে গিযেও যাচ্ছে না। ভিটে চলে যাওয়ার পরও সেই ভিটেয় পড়ে আছে হবা। সুনেত্র শুধাল—পুঁড়ে কে গো মেয়ে?

হবা বলল—সে একজনা। জাত তার পুড়ে লয, স্বভাব তার পুঁড়ে।

—সেটা কেমন কথা?

—সে এক ধন্দ কথা, শউরে নোক বুঝবে না।

শহুরে সুনেত্র সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিল না। ভিটে চলে যাওয়ার পরও ভিটে থাকে কি করে? কেনইবা যায়? বাচ্চা জ্বালাতন করছে। গুঁতোচ্ছে। নিঃড়ে খাচ্ছে। ভরাট বুক তার তেল-পিছলানো বলিষ্ঠ দেহ রেখায় রেখায় অদ্ভুত আদিম। সুনেত্রর আঁকার বিষয। সুনেত্র দেখেতে থাকে। ভাবে, ক্যানভাসে এই ন্যুড, এই বর্বর স্বাস্থ্যের তীব্র জীবন এঁকে ফেলবে কিনা। মেয়েটিকে তাহলে অ্যাপ্রোচ কবতে হয়। দশ-বিশটা টাকাবও লোভ দেখাতে

হয়। এইসবই ভাবছিল সুনেত্র। এমন সময় লোকটি এলেন। দেখেই মনে হল, সেই পুঁড়ে যে, হবাকে ভিটে ছাড়া করেও ভিটেয় রেখেছেন। হবা আর পুঁড়ের চোখ চালাচালির মধ্যেই একটা গোপন ইশারা ফুল্ল হয়ে ওঠে। হবা কি রক্ষিতা ও মুটে-স্ত্রী? লোকটি প্লুতসুরে নাটকের মতন হবাকে 'হাওয়া' বলে ডাকলেন। আছিস নাকি? খিক্ খিক্। পুঁড়ের অশ্লীল হাসি উঠোনে ঢুকে এল। হবা বাচ্চাকে বুক ছাড়িয়ে মাটিতে মৃদু ধাক্কায় ঠেলে দিল। বলল—বসেন মিএগসাব।

পুঁড়ে সুনেত্রকে দেখে শুধালেন কে বটে?

—আমি শহর থেকে আসছি। এখানে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। একটু জল খাব।

—বেশ। খান। জল খান। বাতাসা খান। এই লে হাওয়া। মেহমানকে বাতাসা দে। পানি দে। বলেই পুঁড়ে একটা ঠোঙা এগিয়ে দিল হবাকে। শালপাতার ঠোঙা। বাতাসা এনেছেন। পুঁড়ে বললেন—এই ভিটে আমি কিনে লিয়েছি। বুজলেন। ভিটে আমি খাই, নাকি ওবাই ভিটেখাকী, বিছনখাকী, বলদ-খাকী সেডা নির্ণয় কবেন, আপনিই বলেন ব্রাদর। হাওয়া ক্যানে কাঁদে উ রে বোঝান তো' এত দিই, তবু মন ভরে না। আমিই ওদের রাখ্যাছি। তাড়িয়ে দিইনি। ছুপিযে ছাপিয়ে কত 'হেলপ' করি, গুনতি কে করে। তবু মন ভরে না। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ! বলতে বলতে যেন কৈফিয়ত দেওয়া হল এমন নিশ্চিন্তে উনি সুনেত্রব পাশে খানিক বসে থাকলেন।

হবা সুনেত্রকে জল খেতে দিয়ে বলল—চাষার লোভ ভিটের পানে। যেতিসে হারামী পুঁড়ে- খাসলত (স্বভাব) পায়। ক্যাওট হলেন কৈবৰ্ত্ত। চাষা। সে তো বলদ চুষে বাঁচে। আর ঐ পুঁড়ে পরের ভিটে ছিনিয়ে লতানে ফসল ফলায। এইডাই ধর্ম্ম। কী গো মিএগ ভুল কইছি?

উত্তরে হেঁ হেঃ শোনা যায়। চোখে সুতো-টানা চশমার একটি কাচ আধাআধি ফাটা, সেই দাগ মণির উপর পড়ে একটা চোখ বেশি তেরছে গেছে। হবা বলে—চাষা ভয় পায় বলদ মরলে। বউ মরলে তত লয়। আর পুঁড়ে পরে ভিটে দেখে বেড়ায়। এখুন তেনারই দয়ায় আমরা আছি ভাইজান।

আবার হেঃ হেঃ হাসি। কিছুক্ষণ বাদে লোকটি উঠে চলে যায়। একটা আশ্চর্য ভিটেখোর সাঙঘাতিক লোককে দেখে সুনেত্র। সহসা হবা একেবারে চোখের উপর এসে চাপা' শ্বাসভরা গলায় সুনেত্রকে শুধায়—আমার কাছে কী দরকার তুমার?

হবার গলা গম্ভীর। যেন সন্দেহ মাখা। সুনেত্র সচকিত হয়ে পকেট থেকে একখানা নোট বার করে এগিয়ে ধরে হবার সুমুখে। হবা বলে— যা করার জলদি করবা। মিএগসাব আসবে। বলেই হবা গায়ের কাপড় ফেলে দেয়। বলে— ভিত্‌রি চলো।

সুনেত্র মিষ্টি হেসে বলে—না। এখানেই থাকো। আমি তোমাকে আঁকব।

সুনেত্র আঁকতে শুরু করে। হবা গান শুরু করে, ওরে শিমুল ফুল। গানের ফাঁকেই শুধায়—ধন্দ কথা শুনলেন তুমি? তারপরই 'ওরে শিমুল ফুল'। গান চলে। আঁকা চলে। মাঠ থেকে একটা খব বাতাস মুখে আগুনের লম্বা শিখা তুলে নিয়ে হবার গায়ে জিভ চালিয়ে শুষতে থাকে। অনুভব করে সুনেত্র। সহসা হবা বলে—মিএগসাব আমাব ভিটাব জগদ্দল। উনি লড়বে না। শুষবে। আমার ভাতারপুত কঙ্কাল হবে। আমি তখনও গান করব, তুমি আঁকবা, কী গো শহব-ভাই? কথা বুলেন?

একেবারে আমুলে নড়ে ওঠে শিল্পীর সব সত্তা। হবা বলে—সব দিব আমি। শুধু ঘর দেও। অন্ন দেও। আমাকে বসতি দেও। আমার মরদ দেও। আমি হাওয়া। আমাকে আদম দেও খুদাজী।

নগ্ন নারী কাঁদতে থাকে। ঈভের দেহ থরথর করে রেখায় রেখায় চুরমার হয়ে অজস্র তরঙ্গ তৈরি করে শিল্পীর স্মৃতিতে আন্দোলন তোলে। বাচ্চাটি উঠোনে ছাগলের পেটে কান পেতে থলিতে দুধ জমা হওয়ার শব্দ শুনছে। ছাগলরা ভিটের মাটি চাটছে। লেজ নাড়ছে আকালের শুষ্ক পৃথিবীতে, যেন দুর্ভিক্ষ তাড়াতে চায়।

ছবির নাম হবা। শিক্ষিত মানুষ শুধায়, সেটা কে? সুনেত্র বলে দেয়, উনিই ইভ। চারপাশে ওঁর পশুপাখিরা আছে। পাশে পড়ে আছে ভাতার-পুতের কঙ্কাল। হবা আমাকে সেই রকমই বলেছিল। এত লম্বা কঙ্কাল কখনও দেখেনি মানুষ। এত লম্বা কেন? না, আমি স্টেশনে এক লম্বা কুলিকে দেখেছিলাম। ছোট কঙ্কালখানি ঈভের সন্তান। আকাশ থেকে শকুন নামছে। মাঠে খেলছে আগুনের জিহ্বা। শুষতে আসছে। তবু ঈভ বেঁচে আছে। তার সমগ্র বলিষ্ঠতা, দেহের প্রচণ্ড তাকত, রেখার ভারি চাপ লেগেছে ছবিতে। পৃথিবীতে ঈভের কখনও মৃত্যু হবে না।

অরুন্ধতীকে বলতে থাকে সুনেত্র। অরুন্ধতী দেখে কী বিশাল দেহ। কী প্রচণ্ড অমৃত ফলের মতন সুগোল স্তন, পরিপূর্ণ দুধে স্ফীত, নাভীর কুণ্ড কি মস্ত বিবর। তলপেট কী তীব্র পুরু। উরু কী মারাত্মক থামের মতন কিন্তু অদ্ভুত কোমল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ফেলে অরু। হঠাৎ দেখে ঘরে সুনেত্র নেই। নিজেকে ভয়ানক একা মনে হয়। অরুন্ধতী শরীরের কাপড় খুলে ফেলে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়। একবার নিজেকে দেখে, একবার ছবিকে। গলা শুকিয়ে ওঠে। কান্না পায়। অরুন্ধতী কেঁদে ফেলে। ছবির নারীও কাঁদতে চাইছে, আবার অদ্ভুত প্রসন্নতাও ঠোঁটে, চুলে কী বিষণ্ণতা। সে কঙ্কাল দুটির দিকে কেমন সকাতর স্নেহময় এবং ভরাটি প্রসন্নতায় দুঃখে মাখামাখি।

অরুন্ধতীর চোখ সহসা ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। ফের নিবে যায়।

সুনেত্র এই ছবিকেই ভালবাসে।·কখনও সে অরুন্ধতীকে দেখে না। অরুন্ধতী তার প্রয়োজনে লাগে না। বন্ধুদের বলে, আমি যা সৃষ্টি করেছি, তাই জীবনের জন্য যথেষ্ট। বাস্তব জীবনের চেয়ে আমার বিশ্বাসের জগৎ বড়। আমার স্মৃতিই মহার্ঘ। আমি আর কিছুই চাই না।

বন্ধুরা বলে, এই বিমুখতা, এই ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচ্যুড ঠিক নয় সুনেত্র। অরুর জন্য কিছুটা আগ্রহ থাকা উচিত।

সুনেত্র ফের বলে—কিন্তু ও তো আমার কোন কাজেই লাগে না। ও এই ছবিকে ঈর্ষা করে।

অরুন্ধতী সব শুনে বলে—হ্যাঁ, হিংসে করি। ছবিই কি জীবনের সব? ওকে বুঝিয়ে বলুন, ও পাগল হয়ে গেছে।

বন্ধু বলল—সুনেত্র তুমি পাগল।

সুনেত্র হেসে ফেলল। বলল—হ্যাঁ পাগল বৈকি! কোন একটা গভীর বিশ্বাসই তো মানুষকে পাগল করে। আমি পাগল হয়ে ভাল আছি। সুস্থ আছি। অরুকে আমার লজ্জা করে। চোখ তুলে দেখতে ভয় লাগে।

বন্ধুরা কথা শুনে চমকে উঠল। আঁতকে উঠল বলা যায়। সুনেত্র বিভোর হয়ে ভাবে, সে সত্যিই তবে ঠিকঠাক আছে। দিব্যি আছে। সে তার স্মৃতিকে স্টুডিও-তে রোজ প্রত্যক্ষ করছে। ঈভের ভিটে নেই। বসতি নেই। সন্তান নেই। আদম নেই। কেউ নেই। সে হবাকে একা করে দিতে পেরেছে। এবার সে হবার কষ্ট প্রত্যক্ষ করবে। যন্ত্রণা দেখবে। কামনার রূপ দেখবে। অরুন্ধতী পাশের ঘরে একলা থাকে। স্বামীর কাছে আসতে সাহস পায় না। পৃথক দুই ধরা প্রান্তে বাস করে স্বামী-স্ত্রী। আদম আর ঈভ। একথা ভাবতে ভাল লাগে সুনেত্রর। আনন্দ হয়। অরুন্ধতীর চোখের তলায় কালি পড়ে। স্বাস্থ্য শুকিয়ে যায়। সেই ম্লান চোখ তুলে অরুন্ধতী স্বামীর ফটোর দিকে চেয়ে থাকে। বিছানায় যেন একটা কঙ্কাল শুয়ে থাকে। একদিন হঠাৎই এই দৃশ্য চোখে পড়ে যায় সুনেত্রর। কঙ্কালটা কী যেন চিঁ চিঁ করে কথা বলছে, সুনেত্র বুঝতে পারে না। সে বেরিয়ে চলে আসে বাইরে কোথায় চলে যায়।

সেদিন স্টুডিও-য় ঢুকে সুনেত্র দেখে ঘর অন্ধকার। লোডশেডিং হয়েছে। আলো জ্বালাবার চেষ্টাও বৃথা। সে অন্ধকারেই একা চুপচাপ বসে থাকে চেয়ারে। হঠাৎ নাকে লাগে অদ্ভুত সুবাস। এমন গন্ধ কখনও সে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেনি। না। করেছে বোধহয়। করেছে। বিয়ের রাতে একটা ভীষণ অচেনা বিদেশী নির্যাস অরুন্ধতীর গায়ে জড়িয়ে ছিল। ঠিক কতকটা সেইরকম গন্ধ। যে গন্ধে মন কোন্ দূরপ্রান্তে কিসের গন্ধ আর কিসের হাহাকারে হারিয়ে যায়। সারা ঘর সির সির করছে। শ্বাস ফেললেও মনে হচ্ছে সেই সুগন্ধি বেরুচ্ছে। এমনটা হল কিসের দরুন। কে অমন করল! বুঝে পায় না সুনেত্র। হঠাৎ কানে আসে, কিসের যেন খসখস শব্দ হচ্ছে। কেউ কি আছে এখানে? সুনেত্র মোম ধরায়। দেখে ঈভেব পায়ের তলায় কে যেন শুয়ে আছে। তাবত গায়ের কাপড় কোমড়ে জড়ো করা। বুকের স্তন বুকে শুকিয়ে এসেছে। গা কঙ্কালের মতন কাঁটা কাঁটা। সুনেত্র চিনতে পারে না কে এই মহিলা। প্রশ্ন করে, তুমি কে? কঙ্কাল নড়ে ওঠে। চোখ খোলে। কাঁদবার চেষ্টা করছে। পারছে না। গন্ধটা আরো গাঢ় হয়ে নাকে লাগছে সুনেত্রর। সুনেত্র ধীবে ধীরে টের পায় গন্ধটা কঙ্কালের দেহ থেকে উঠছে। নাভী থেকে উঠছে। কতকাল পর এরকম একটা গন্ধ উঠছে। কঙ্কাল উঠে বসে। ওর চোখ হরিণীর মতন কাজলটানা সুন্দর। ওর গায়ের শাড়ি পয়সা ফুলের ছাপ দেওয়া চিতিরঙ। মোমের আলো জোছনার মতন স্নিগ্ধ। প্রশ্ন করে, কে তুমি? কঙ্কাল কাঁদতে চেষ্টা করে, পাবে না। তারপর কোন প্রকারে বলে ওঠে সেই নারী, তুমি পাগল হয়ে গেছ সুনেত্র।

সুনেত্র বলে ওঠে, তুমি অক? তোমার গায়ে গন্ধ কিসের?

—গন্ধ।

অবাক হয় অরুন্ধতী। তাব বাববারই মনে হয় স্বামীকে সে পাগল করে দিযেছে। গলা কেঁপে যায়, অকন্ধতী বলে—আমায় তুমি একটুখানি ছোঁবে না সুনেত্র?

সুনেত্র বলে—এখন পৃথিবীতে বড় আকাল অক। হবা তার ভিটে বিক্রি করে দিয়েছে। একটা জগদ্দল পাথর ওর বুকে চেপে বসে আছে। ওর কোন আশ্রয় নেই।

অকন্ধতী বলে—ওব পাষাণ নামিয়ে দাও সুনেত্র। আমিও নিঃশ্বাস পাচ্ছি না। কষ্টের এত ভার আমিও বইতে পারছি না। আমাবও একটা ছবি আঁকো সুনেত্র। প্লিজ।

—পাষাণ ভাব নামানোর শক্তি আমার হাতে নেই অরুন্ধতী। তারপর স্বগতোক্তি

করে, তোমার গায়ের গন্ধ কি ভুল অরু? বিড়বিড় করে সুনেত্র একাকী। তারপরই হঠাৎ তার মনে হয়, পাষাণ কথাটা কি গোলাকাব? হবার বুক থেকে গড়িয়ে এসে অরুন্ধতীর বুকে উঠেছে। এই ঘটনা কীভাবে সম্ভব? আশ্চর্য সচকিত হয় শিল্পী। গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে নাকে লাগে। ওর মস্তিষ্কে স্মৃতির প্রবাহ শুরু হয়। সুনেত্র ফের ছিন্ন হয়ে তলিয়ে যায়। অরুন্ধতীকে কিঞ্চিৎ অনুভবের চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু আর পারে না। অরুন্ধতী সহসা সুনেত্রর পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে। বলে—আমাকে একটু চেয়ে দ্যাখো সুনেত্র। আমাকে স্বাস্থ্য দাও। আমার বুকের থলি দুধে পূর্ণ করো। আমাকে ঈভের মতন সচ্ছল করো। আশ্রয় দাও।

কিন্তু এসব কথা গলায় জোর নেই বলে অরুন্ধতীব কণ্ঠে ফুটে ওঠে না। সে কেবল পা জড়িয়ে ধরে। পা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুনেত্র। সে গন্ধটা কিসের ঠিক মতন নির্ণয় করতে পারে না। ওর স্মৃতি ওকে ধোঁকা দেয। আহা! যদি তার সেই মৃগ-গন্ধ মনে পড়ত।

মনে পড়ে না। কারণ অরুকে সুনেত্র বিশ্বাস করতে পারে না। অরুও বোঝে, সে আর স্বামীকে পাযে না। সে তখন ছবি ও নিজের গায়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। হু হু করে পুড়তে থাকে সুনেত্রর স্মৃতি আর বাস্তব।

বাইরে চেয়ারে অন্ধকারে বসে চাঁদ ওঠা দেখে সুনেত্র। নীল কস্তুরি আভার চাঁদ। বারান্দায় চাঁদের আলো এসে লাগে। শিশির ঝলমল কবে। যৌনার্ত কোন পশু কাছের জঙ্গলে দাপাচ্ছে। সেই তোলপাড় শোনা যায়। মৃগীর নাভীমূলে সুগন্ধি জন্মাবার ইতিহাস স্মরণ হয়। ঘরে অরুন্ধতী পুড়ে যেতে থাকে।

রাস্তায় নামে সুনেত্র। হবা বিবির ভিটেয় এসে দেখে, ওরা কেউ নেই। কুটিরখানাও নেই। সেখানে চাষ পড়েছে। ভাল লতাপাতা জন্মেছে। ফুল ও ফল হয়েছে। মিঞাসাব পাহারা দিচ্ছেন উৎসন্ন ভিটার আবাদী। সুনেত্রকে দেখে হাসলেন। বললেন—কারে খোঁজেন বাবু। সে তো নাই।

পানিতোয়া বিল পেরিয়ে ঐ আসমানের তলায় সরল পথ। সেই ধারে গেলছে। যাবেন?

পাগল লোকটির চোখমুখ কঠোর হয়ে উঠল। মিঞাসাব বললেন—হাওয়াকে ওর সোয়ামী ত্যাগ করেছে বাবু। সেই দুঃখে মেয়েডা ঐ পানে চলে গেল। আমিও ভিটা দখল নিলাম।

এই প্রথম পাগল সুনেত্র 'অরু' 'অরু' বলে হু হু করে কেঁদে উঠল। তারপর সে ছুয়ে চলল দিগন্তের ওপারে।

একটি সার্থকতম নারী-মিলন তার খুব জকরী।

বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর!

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আপনার বয়স?

—উনিশশো চল্লিশে জন্মেছি।

—চাকরিতে কবে ঢুকেছিলেন?

—যে বছর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হল।

—কী পোস্টে কাজ করছেন?

—ইউ. ডি. সি.। আমাকে বড়বাবু বলে।

—দেশ কোথায়?

—খণ্ডঘোষের কাছে, কেওটাগ্রাম।

—তা আপনি ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে নদীর পাড়ে গেলেন কেন? থানার বড়বাবুর চোখ টর্চলাইটের ফোকাস মেরে আছে। মেজবাবু, জমাদার, পিওন, সবাই ঘিরে আছে। বড়বাবু টেবিলের ওপর রাখা পেপার-ওয়েটে হাত বুলোচ্ছেন, সেই হাতের দুআঙুলে চাপ। সিগারেট ছোট হয়ে এসেছে। দেওয়ালে জেলার ম্যাপ। ম্যাপ-এ নীল রং-এ দামোদর নদী।

(আমি চাষীর ছেলে। জাতে মাহিষ্য। বংশে আমিই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করি। তাইতে আমার বাবা হরিসংকীর্তন বসিয়েছিলেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী বর্ধমান সদর থেকে এসেছিলেন ঐ হরিসংকীর্তনে। যাবার সময় আমার পিঠে হাত রাখলেন, মাথায় হাত রাখলেন, তারপর একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে মেমারির এম-এল-এ-র কাছে যাই। তখনকার দিনে এম-এল-এ-রা আজকালকার মত ছিল না। অত ঘোরায় নি। চাকরিটা হয়ে গেল।)

—কী করেন? কোন ইউইনয়ন? ফেডারেশন বা কো-অর্ডিনেশন?

—এ্যাঁ?

—কোন ইউনিয়ন করেন?

—ঐতো, মাধব দশ মাসে দুটাকা করে চাঁদা নেয়, ইউনিয়নের চাঁদা।

—কোন ইউনিয়ন সেটা, ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন?

—সেটা তো ঠিক...মানে খোঁজ করিনি স্যার...

(আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। অফিসে কোন পার্টি মিষ্টি খাবার টাকা দিতে চাইলে আমি নিজে নিই না, পিওন জগবন্ধুকে দেখিয়ে দিই। জগবন্ধু প্রতি হপ্তায় আমাকে যা দেয়, আমি তাতেই খুশি। আমার অত লোভ নেই। পালবাবু, জানাবাবুদের মত পিওনদের সঙ্গে খিটিমিটি করি না। কাজের ব্যাপারে আমার কোন ইয়ে নেই। সাহেব যা করতে বলে করে দিই। তক্কো করি না।)

—আপনার অফিস থেকে দামোদরের পাড় কত দূর?

—দু-তিন কিলোমিটার হবে।

কিসে গেলেন?

—রিক্সায়।

—বে-থা করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাচ্চাকাচ্চা?

—চারটি।

—পরিবার কোথায়?

—দেশে।

—চারটে বাচ্চা? বাচ্চাগুলো আপনার তো? হেঁ-হেঁ। তা আপনি খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে কী ধান্ধায় ঐ অন্ধকারে দামোদরের ধারে গেলেন? ক'দিন জয়েন করেছে মেয়েটা?

—তা বছরটাক হবে।

(সাইকেল রিক্সাটা অফিসের সামনে গাছতলায় দাঁড়ালো। একটা রোগা মত মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—এটাই কি বি-ডি-ও. অফিস? আমি বললুম—হ্যাঁ।

তারপরই মেয়েটা গাছটার দিকে তাকিয়ে বলল—এটা বুঝি কৃষ্ণচূড়া গাছ?

আমি বললুম তেঁতুল। তারপর একটা ছেলে মেয়েটাকে ধরে রিক্সা থেকে নামালো। তখনই আমি দেখলুম মেয়েটা খোঁড়া। ছেলেটা ব্যাগ থেকে আশোকস্তম্ভের ছাপমারা একটা খাকি খাম বের করল। বলল জয়েন করতে এসেছে।

—কে? —এই যে আমি এর দাদা।)

—মেয়েটার নাম বলুন।

—পূরবী। পূরবী দত্ত।

—বয়স?

—সার্ভিসবুক না দেখে...

—আন্দাজে বলতে পারেন না একটা যুবতী মেয়েছেলের বয়স?

—না-না-না, যুবতী নয় স্যার, মানে বয়স অনুযায়ী যুবতী বলতে পারেন, কিন্তু ঠিক যুবতী নয় স্যার। মানে রোগা, খোঁড়া...

—আপনি তো মহা ঘোড়েল লোক মশাই, যুবতী কিন্তু, কিন্তু যুবতী নয়. .এবার বলুন মেয়েটাকে কিভাবে রেপ্ করা হয়েছিল, বেশ ভালভাবে ডিটেলস-এ বলবেন।

—ঠিক বলতে পারব না, স্যার। আমাকে আগে ওরা মাথায় মারে। জ্ঞান হবার পর দেখি আমি দামোদরের বালির চড়ায় শুয়ে আছি। আমি ওনার নাম ধরে ডাকলাম। কেউ নেই স্যার, শুধু ক্র্যাচ্‌টা পড়ে আছে।

—এবার বলুন আপনি কী ধান্ধায় ঐ সন্ধ্যেবেলা অফিসের মেয়েটাকে নিয়ে দামোদরের পাড়ে গিয়েছিলেন।

—মেয়েটা দামোদর দেখতে চাইছিল স্যার, সেই জয়েন করার পর থেকেই। আমাদের

অফিসে স্যার একটা ম্যাপ, আপনাদের মতই, আমাদের দেয়ালে ঝোলান থাকে। ওখানে স্যার নীল-রং-এ দামোদর নদী আছে। মেয়েটা স্যার ম্যাপে দামোদরের নাম দেখেই কেমন যেন—বিশ্বাস করুন,—কি বলব, বর্ষার খল্‌সে মাছের মত, কি বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তো দামোদর পার হয়ে...

—পুরোন কথা ছাড়ুন। আজকের কথা বলুন।

—সেই কথাই তো বলছি স্যার, মেয়েটাতো কেবল দামোদর যাব দামোদর যাব প্যাঁচাল পাড়তো। আমি বলতাম কী হবে ওখানে গিয়ে? ও বলতো—না যাবোই, একদিন নিয়ে চলুন না। তা আজ আমি স্যার, ছুটিতে ছিলাম। কারণ আজ সকালে বর্ধমান যেতে হয়েছিল। আমার জমিতে স্যার, বর্গা রেকর্ডিং হয়ে গেছে। বর্ধমানে সেট্‌লমেন্টের এক সাহেবের বাড়ি দুটো মুরগি আর মিহিদানা নিয়ে যেতে হয়েছিল, স্যার, আমার সম্বন্ধী নিয়ে গিয়েছিল। ফিরলাম বিকেলে। চায়ের দোকানে বসে জল-দুধ খাচ্ছিলাম, চা খাই না। তখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে মেয়েটা যাচ্ছিল স্যার, আমাকে দেখে ফেলল। বলল—এই যে আপনি, আজ চলুন, নিষেধ শুনব না। আমি বুঝলাম—দামোদর যাবার বায়নাক্কা। মেয়েটা বলল—কতদিন বাদে রোদ উঠেচে। আমি বললুম—রোদ উঠেছে ভাল কথা। ধানে কীটপোকা লাগবে না।

উনি বললেন—সেদিন আসবার সময় ট্রেনে দেখেছি দামোদর পাড়ে কতো কাশফুল, আর সেই ছোট বেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছিলাম। চলুন না দাদা, রিক্‌সা করে দামোদর পাড়ে যাই। আমি বললুম—কাশ একগোছা নিয়ে আসবখনে। কাশফুলের ডাঁটি দিয়ে বেশ ভাল ঝাঁটা হয়।

উনি বললেন—আপনার দাদা খালি গেরস্থালীর চিন্তা। চলুন না, রোদ্দুরটা কমলা রং-এর হয়ে যাচ্ছে, কাশফুলগুলোর রংটাও আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে না? দেখব। আমার যদি পা ভাল থাকতো, আপনাকে বলতাম না। একাই চলে যেতাম—ছুটে চলে যেতাম। তাই রিক্‌সা করলাম।

—তখন বিকেল ক'টা?

—সাড়ে চার-পাঁচ হবে।

—তারপর রাত্তির পর্যন্ত কাশফুল দেখালেন! একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খোচাচ্ছেন বড়বাবু। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। পাশে একটা মাকালীর ক্যালেণ্ডারও আছে। তাতে জবাফুলের মালা পরানো। থানার মধ্যে মাকালী? মাকালী সর্বত্র। টেপে হিন্দি গান বাজছে। পুলিশ শুনছে। এটাও সর্বত্র।—সর্বত্র রেপ্ হচ্ছে বুঝলেন সর্বত্র। আপনার ওখানে ওই মহিলাকে নিয়ে যাওয়াই উচিত হয় নি, বুঝলেন।

(ঠাকুর্মার নাকি বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে। এখন যিনি আমাদের গুরুদেব, তাঁরবাবা শ্রীশ্রীষড়ানন গোস্বামী গুরুপ্রসাদী করেছিলেন ঠাকুর্মাকে। সেটা কি রেপ্ ছিল। সবাইতো তাতে সায় দিয়েছিল। ঢাকঢোল বেজেছিল। বর্ধমান স্টেশনে এক ভিখারিনী ডি-এ-বৃদ্ধির আলাপে ব্যস্ত দুজন ভদ্রলোককে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত করেছিলেন। একজন ভদ্রলোক বলল—ভিক্ষে তো কবছ, ছানাপোনা হওয়া কমাতে পারো না?

ভিখারী মা বলেছিল—ছানাপোনা কি এমনিতে হয় বাবু? পুলিসের নোকেরা কিছু না পেলে পেলটফরমে থাকতে দিবে কেনে? লোক দুটো হাসলো। আমি হাসলাম। মানে কি ন্যায্য কথা ভাবলাম, হক্ কথা ভাবলাম।

এখানকার বাসন্তী সিনেমাহল-এ একটা সিনেমা চলছে। ডেস্‌প্যাচে যে ছেলেটা বসে সে নাকি তিনবার দেখেছে। সেখানে নাকি পাঁচবার রেপ্ আছে। ছেলেটা অফিসের চৌকিদারকে ঐ পাঁচটা রেপের বর্ণনা দিচ্ছিল। সেই গল্প শুনে মণ্ডলবাবু দাঁত ক্যালালো। মিত্রবাবুও। আমিও। রেপ কি দাঁত ক্যালানোর মত ব্যাপার?—তবুও....)

—তা ওই মেয়েটা খামোকা চাকরি করতে কলকাতা ছেড়ে এখানে মরতে এল কেন?

—ওর বাবা গ্যাস্ট্রিকে মারা যান। কম্‌পেনসেটরি গ্রাউন্ডে চাকরি। সরকার এখানেই পোস্টিং দিয়ে দিল। ধরা করার কেউই ছিল না।

—ওনার সঙ্গে কে থাকতেন?

—ওনার মা থাকতেন। তবে বোধ হয় মাসখানেক ধরে উনি একাই আছেন।

—দাদাটি?

—পিসতুতো। শিবপুরে থাকে।

—তাহলে মাসখানেক ধরে একা?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে তো ও জিনিস হয়েই গ্যাছে।

কয়েকজন হেসে উঠল। জেলার ম্যাপ, গান্ধিজীর ছবি, বিড়ির গন্ধ, ফ্যাকাশে আলো...

—তারপর?

—মানে?

—শুরু করুন। কাশফুল থেকে শুরু করুন।

—উনিতো রিক্‌সা থেকে নেমে ক্র্যাচে ভর দিয়ে নদীর দিকে এগুতে লাগলেন। বালিতে ঐ ক্র্যাচ-লাঠির গোড়া সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। উনি আঙুলটা পশ্চিমের দিকে রেখে বললেন—দেখুন, ওদিকে কী হচ্ছে। আমি বললুম—ওদিকেতো খড়গপুর যাবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। উনি বললেন—আঃ! সূর্যটাকে দেখুন না, কিরকম রং দেখুন, জলের মধ্যে চিকিচিকি, কাশফুল সোনালি হযে গেছে। আমি বললুম—এমনকী আর, এরকম তো রোজই হচ্ছে। তিনি আমাকে বস্‌তে বললেন। আমি একটু দূরে বসলাম। উনি দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললেন—বিদ্যাসাগর। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—ছোটবেলায় বইতে বিদ্যাসাগরের ছবি দেখেছি, সাঁতরে পার হচ্ছেন তিনি দামোদর, সেই থেকেই, বুঝলেন, দামোদরের কথা শুনলেই বিদ্যাসাগর মনে পড়ে। দামোদরের এপাড়-ওপাড় জুড়ে বিদ্যাসাগর, তাই না? আমি বললুম—বিদ্যাসাগরের দামোদর কি আব আছে? সব চড়া পড়ে গেছে।

এমন সময় স্যার, ঝোড়ো বাতাস আসে। কোত্থেকে শুকনো অশ্বত্থ পাতা হাওযায়

উড়ে এসে ওনার শাড়িতে লাগে। উনি ঐ পাতাটা গালে ঘষছিলেন আর আপন মনে কেমনধারা যেন বকবক করছিলেন। বলছিলেন—সেই কবে ছোট বয়সে উনি শিবপুরে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলেন, ওনাকে রিক্‌সায় চাপিয়ে পিসতুতো ভায়েরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল, একটু পরেই ঘন আব কালো মেঘ। আকাশ ফালা-ফালা—তারপর হাওয়া, বৃষ্টি—। রিক্সাওয়ালাতো জোর রিক্‌সা ছুটিয়ে চলল বাড়ির দিকে। উনি কেবলই বলেন—আস্তে চলো—আস্তে চলো....আমি তখন বলি—এবার উঠুন মিস দত্ত...মিস দত্ত বললেন...পুরবী বলতে পারেন না, পুরবী, উনি সেই অশ্বত্থ পাতাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন—শুনুন না, একটা জরুরি কথা আছে। আমি বললাম—বলুন না, শুনতে পাচ্ছি। উনি বললেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমায় কত কাজ শিখিয়েছেন অফিসে। কত গাছ চিনিয়েছেন রাস্তায়, আজ কী সুন্দর জায়গাটা দেখালেন.....

আমি উড়েআসা আর একটা অশ্বত্থ পাতা খপ্‌ করে ধরে ওনাকে দিতে গেলাম—'নিন', উনি হাসলেন। হাওয়ায় ঐ হাসি উড়ে গিয়ে কাশফুলে মিশে গেল। বললেন—কী হবে? আমি বললুম—ঐ যে এতক্ষণ পাতাটা নিয়ে খেলা করলেন, তাই আর একটা দিলুম। উনি বললেন—শুনুন, আপনার জন্য একটা সোয়েটার বুনছি। শীতের আগেই দিয়ে দেব। আমি বললুম—ঐ সোয়েটারটা, যেটা আপনি অফিসে মাঝে মাঝে বোনেন, সবুজ আর সাদা? ..

—তাবপর? চুপ করে গেলেন কেন মশাই, বলুন, কিছু বাদ দেবেন না।

—অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি বললুম—এবার উঠুন মিস দত্ত, উনি তবু বললেন—আর পাঁচ মিনিট।

এমন সময় স্যার, একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামল। তিনজন লোক এগিয়ে এল। আমাকে ঠাস্‌ করে একটা চড় মারল। বলল—শালা মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি? তারপর ওনাকে বলল—এতক্ষণ তো একে আনন্দ দিলেন এবার আমাদের একটু দিন। আমি বুঝলুম সামনে বিপদ। গুরুনাম জপ করতে লাগলাম।

আমি ওনাকে আকড়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না। ওরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়িতে তুলল। আমি মধুসূদনকে ডাকতে লাগলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। আম্যর পকেটে টর্চলাইট ছিল স্যার, গাড়ির নম্বরটা দেখলাম। তিন হাজার দুই।

—তিন হাজার দুই?

সবাই কেন যেন নড়েচড়ে বসল। এ-ওর মুখের দিকে তাকালো।

—নম্বরটা ঠিক দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার, তিন হাজার দুই। স্পষ্ট দেখেছি।

নম্বরটা জপ করতে করতে আসছি।

বড়বাবু কলম ঠুকলেন টেবিলে। বললেন—আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন! ওরা আপনাকে মেরেছিল...

—স্যার, ওটা ঠিকনয় স্যার, মিথ্যে বলেছিলাম। একজন সজ্ঞান ব্যাটাছেলের কাছ থেকে একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়া স্বীকার করতে খুব লজ্জা করছিল স্যার, তাই প্রথমে মিথ্যে বলে দিয়েছিলাম।

—ধুর মশাই, আপনি একজন লায়ার।

—না স্যার, মাকালীর পা ছুঁয়ে বলছি কিচ্ছু মিথ্যে নেই, সব সত্যি বলছি স্যার, শুধু প্রথমটায়....

আপনি আপনি অন্ধকারে কি করে গাড়ীর নম্বরটা পড়লেন?

—আমার পকেটে টর্চ থাকে স্যার। নতুন ব্যাটারি, পরশুর কেনা, যশোদা ভাণ্ডার থেকে কিনেছিলাম।

বড়বাবু সিগারেট ধরালেন। একটু চুপ থেকে বললেন—দেখুন মশাই চাকরি করতে এসেছেন ঝুটঝামেলায় কেন জড়িয়ে পড়ছেন, এসব ডায়রি ফায়রি কেন করতে যাচ্ছেন, চেপে যান। আমি বললুম—ওদের ধরবেন না? মেয়েটাকে বাঁচাবেন না? গাড়িটার নম্বর তো...

—তাহলে তো প্রথমেই আপনাকে অ্যারেস্ট করে দেবো। যদি বলি আপনিই চক্রান্ত করে...

থানা থেকে বেরিয়ে আসি। ঘরে যাই। রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে করল না, শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই উঠে পড়লাম। বাইরে একফালি চাঁদ আলো বমি করছে। পূরবী দেবী যে বাড়িতে থাকেন ঐ বড়ির সামনে গেলাম। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। পূরবী দেবীর নড়াচড়াও দেখতে পাই। আঃ। ডাকলাম না। যদি কেউ কিছু ভাবে? কিম্বা আমার নিজেরই মুখ দেখাবার লজ্জা। সারারাত নিজের ঘরে একা একা বসে থেকে পরদিন সকালে ওর ঘরে গেলাম।

আমাকে দেখেই ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়ে। আমি কিছু বলি না, বলতে পারি না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

উনি বললেন—আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ির একজন বলছিল—একটা খোঁড়া মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত...অন্য একজন বলছিল—দেখি মালটাকে। গাড়ি আলো জ্বালতেই একজন বলল—কাকে ধরে এনেছ? এঁকে চেনো না? এতো বি-ডি-ও অফিসে কাজ করে। অন্য একজন বলল—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; এখনো ইটভাটার দিকে গেলে সাঁওতাল টাওতাল পাওয়া যাবে।

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরে গেল। আমি বি-ডি-ও অফিসের কেরাণী বলে বেঁচে গেলাম। অন্য একজন হয়তোবা মরল, যার চোখে চশমা নেই, গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না।

আমি বললাম—যাক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন ম্যাডাম।

উনি বললেন—ছিঃ ছিঃ, একি বলছেন।

ছি ছি শব্দটা বলার সময় মুখ দিয়ে থুথু ছিটালো। ক্ষোভ আর ঘৃণার পুটলি ছুঁড়ে দিল যেন। থুথু-মাখানো ছিঃ শব্দটা চামচিকের মতো ঘুরতে লাগল। এই ছিঃ কি আমি? না আমার চারপাশ।

অফিসে আর আমার সঙ্গে কথা বলতেন না পূরবীদেবী। আমি কোনদিন আগে এসে পূরবীদেবীর ড্রয়ারের ফাঁকে গলিয়ে দিতাম শির বেরহওয়া অশ্বত্থ পাতা বা মাছরাঙা পাখির নীল পালক। তবু উনি কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই মনে হ'ত

থুথু ছিটানো ছিঃ শব্দটা চামচিকের মত আমার পাশে পাশে ঘুরছে।

একদিন চিমনি কারখানার কনট্রাক্টর এসে আমায় বলে—জলের ব্যবস্থাটা শিগ্‌গির করে দেন দাদা, বহুদিনতো হল। সন্দেশের বাক্‌সোটা টেবিলে রাখলেন। আমি বললুম বাকসোটা হঠান শিগগির। তারপর বললুম—সিরিয়ালি হবে। আপনার টাইম হলেই পেয়ে যাবেন। বিরক্ত করবেন না। বলেই পুরবীদেবীর দিকে তাকালাম।

দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বি-ডি-ও. সাহেব নিজে এসে বললেন—এবার চিমনি ফ্যাক্টরির জলের ফাইলটা ছেড়ে দিন। আমি বললুম, ওটার প্রায়োরিটি নেই। হাসপাতালের জলটা আগে হবে।

চিমনি ফ্যাক্টরির কনট্রাক্টার সাহেব গাড়ি করে এসেছিল। তার নম্বর তিন হাজার দুই।

কিছুদিন পরে গাড়িটাকে আবার দেখলাম অফিসের সামনে। গাড়ির নম্বর তিন হাজার দুই। গাড়িতে বি.ডি-ও. সাহেবের পরিবার। গাড়ি যাচ্ছে বর্ধমান-টাউন। আমি রুলটানা স্কেলটা নিয়ে ছুটলাম। বেপরোয়া বাড়ি মারতে লাগলাম গাড়িটার গায়ে। মুখ থেকে থুথুমিশ্রিত ছিঃ শব্দটা ঠিক্‌রে বের হতে থাকে। গাড়িতে ঝম্‌ঝম্। বি.ডি-ও পরিবার চিৎকার করতে থাকে। সবাই আমাকে ধরাধরি করে সরিয়ে দেয়। টেনে অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়। আমি একটি মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল—চারিপাশে তাকাই।

আমার ট্রানসফার হয়। মুর্শিদাবাদের খুব ভিতরের দিকে। পানিশ্‌মেন্ট। আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম। পুরবীদেবী ক্র্যাচে ভর দিয়ে আমার ঘরে আসে। তখন রাত্রি। ঝি ঝি ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। পুরবীদেবীর হাতে সাদায় সবুজে মেশানো সোয়েটার। বললেন—দাদা, এটা পরবেন।

আর কী আশ্চর্য! যেন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল দামোদর, বিশাল; বিদ্যাসাগর।। বিদ্যাসাগর।।

উনি বললেন—ভাল থাকবেন। চিঠি লিখবেন। জানাবেন, কেমন থাকেন, আর...

আর কিছু দরকার নেই। বাজনা বাজছে ঝিঁঝির শব্দে, বাজনা বাজছে ব্যাঙ-এর ডাকে। হারমোনিয়ামের মত বেজে উঠল মুর্শিদাবাদের রাস্তা।

ফাউ

নলিনী বেরা

চারপাঅলা টেবিল, তক্তার ওপর আধ ইঞ্চি পুরু তেলচিটে ময়লা, সাইডবাটামে ব্লেড খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অজস্র দাগকাটা হিজিবিজি—'অমিয় বেহুলা'—তার ওপর একজোড়া পা। থ্যাবড়া থ্যাবড়া আঙুল, ধুলোয়-মুলোয় খসখসে পা-পাতা, অধিক হন্টনে পদরেখা নিশ্চিহ্ন, শুধুমুদু বুড়ো আঙুলের গালসিতে ধ্যাবড়া দাগ দুটো টিকটিকির মত পড়ে আছে নিথর—দুই বুড়ো আঙুল অনবরত নড়ে, আরেক জোড়া পা।

মুখ দেখা যায় না, টেবিলের তলায় চোখ গেলে আরেকটা চারপাঅলা চেয়ার, সেই চেয়ারে ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের থার্ডটীচার সদাশিববাবু, মানে আমার বড়দা, এম-ই, বসে বসে আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরায়।

হুটপাট আচমকা বলে, 'এ্যাই এ্যা-ই, ও কি কচ্ছ হে? গল্প না করে বানান করত—আষাঢ়?' 'আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।'

টেবিলের ওপর দু' বুড়োর নড়াচড়া থামল, মুখ থেকে বইয়ের আড়ালটুকুও সরল, এবার ঠোঁট দুটো ফাঁক—'কী বল্লি?'

বললাম, 'আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।' ঠিক বলেছি অত ভয় বা কি,—মুখচোখের ভাব এইরকম।

ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাটুকু-ই কেটে কেটে আরেকবার শুনিয়ে দিল বড়দা, যাতে আমার কানেও ঢুকে যায় ঠিকমত।—'আ, মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার, ড-এ শূন্য ড়?'

'হু-উ।'

আমাদের স্কুলের উত্তরে মাঠ, মাঠ থেকে নামুতে হেঁটে গেলে বিল, তা বাদে নদী, জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশ অব্দি দেখা যায়।

দেখলাম, মাঠ ভেঙে আমার বাবা রুদ্রনাথ, তার ডানহাতের মুঠোয় ধান-শীষে গাঁথা গুটিকতক চ্যাঙমাছ, চান সেরে খড়িওঠা আদুল গায়ে বাড়ি ফিরছে, এই দুপুর দুপুর। একপলক দেখেই ঘাড় ঘুরালাম, ততক্ষণে বড়দা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিধে চোখ রেখে এগিয়ে আসছে, হাতে ঝুনঝুনি বেত—

যাকে বলে চাকুন্দাগাছ, সেই গাছের ছড়ি, মাথাটা ছ্যারকানো, ছাত্রদের মেরে মেরে নয় টেবিলে ঠুকেই মুণ্ডটা ছ্যারকে গেছে।

ক্রমশ পিছু হটছি চৌকাঠ পেরুলে দে-দৌড়, বড়দাও দৌড়চ্ছে, দু' হাত একহাত আধহাত, আর-আরেকটু—

'কী-কী হল? ওকে যে ঠ্যাঙাচ্ছিস বড়? রাস্তা আগলে দাঁড়াল বাবা। জায়গাটা কাঠের পুলের কাছাকাছি, পুল আর কোথায়, মরাহাজা খালের ওপর মহুলগাছের গুঁড়ি, তার এদিকে বাবা ওদিকে বড়দা, নিরাপদ দূরত্বে আমি।

আচমকা বাবাকে দেখে ভ্যাবাচকা বড়দা তো-তো করে বলে, 'বানান ভুল করেছে।'

'কী বানান?'

'আষাঢ় করেছে—আ মূর্ধন্য-ষ এ আ-কার ড-এ শূন্য ড়।'

'অঃ।' বলেই বাবার দুমদাড়াক্কা কোশ্চেন বড়দাকে, 'আরে তুই, তুই বানান করত—

কার্তবীর্য্যার্জ্জুন।'

বড়দা কি আর পারে, অপারগ বড়দা হেঁটমুণ্ড রাগে গরগর কত্তে কত্তে ফিরে চলেছে স্কুলে, আর—বাবার আগে আগে ছাগলছানার তুল্য তিড়িঙ-বিড়িঙ লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরছি আমি।

—এই করেই তো প্রাইমারীটা হয়ে গেল।

MERCURY, বানান হল—M-E-R-C-U-R-Y, খটোমটো না খুব সহজ বানান, যে কেউ করতে পারে, আমি কিন্তু পারলাম না।

ডাস্টার ছুঁড়ে কেমেস্ট্রির রাগী মাস্টার বিজয় মহাপাত্র মহাক্রোধে ফেটে পড়ে বলে, 'ইডিয়েট!'

খানিক চুপ থেকে তর্জনী তুলে গর্জন করল, 'হ-ত-ভা-গা, রসায়নে তুই পাবি শূন্য, ডাব্‌ল্ জিরো-ও।'

লম্বা-চওড়ায় ছোটখাটো হাড় জিরজিরে, কিন্তুক দাপকে দোর্দ্দণ্ড, বিজয়বাবু খুব গুণী লোক ছিল।

ফাংশান-টাংশান হলে ছাত্রছাত্রীদের গানের তালিম দিত, আমার মত গেঁয়োভূতকেও একদা হাতমুঠ খামচে ধরে বসিয়ে দিল হারমোনিয়ামের সামনে, 'নে ধর—

'এখন আর দেরী নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো।'—সেই বিজয়বাবু, রোগা-পটকা গুণী লোকটার ক্লাস, বোর্ডে প্লাস-মাইনাস কী সব কত্তে কত্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, চাঁদু, বানান কর ত—MERCURY ?

কথায় কথায় একে-তাকে 'চাঁদু' বলা তার বদ-অভ্যেস, প্রথম চাঁদটা-ই সুধন্য।

কাঁপতে কাঁপতে সুধন্য বানান বলল, ভুল।

ভুল ভুল, ভুল।

আমি তখন আপনার মনে আওড়াচ্ছি, খুব পারব, ও ত ভেরী সোজা! একে একে হিমাংশু, শশধর, শিখা, সমরেশেরও হয়ে গেল, কে যে ভুল বলল কে যে ঠিক—ততক্ষণে গুলিয়ে ফেলেছি।

ডাস্টার ঠোকাঠুকির আওয়াজ, দ্রুত থেকে দ্রুত হচ্ছে, লাস্টঅব্দি আমাকে, 'অ্যাই, তুই বল ত।'

বললাম, 'M-E-R-C-U-R-R-Y'।

সেই আমি, হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে ইস্কুল টপকে এলাম।

কলেজে এসেও ছাড়-ছাড়ান নেই, লে বাবা, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে প্রথম সর্গ দ্বিতীয় সর্গ, ইত্যাদি—সেই 'সর্গের বানান কি বল-অ?'

২

'বলতে লজ্জা কচ্ছে, আ-রে বলই না।'

'কী বলব মনঞ্জনদা?'

'এই তোমাদের ভাবভালবাসার পসঙ্গ'।

'একদম বাজে কথা।'

ডানহাতের এক আঙুলে দাঁতে গুড়াখু ঘষে আর বলে, 'হ কথা ত বাজে, মাত্র ক'মাস, এই কদিন কলেজ করেই যা কিত্তি দেখালে!'

চার ফুট, কি বড়জোর সাড়ে চার—এই একটুকু হাইটের মনোরঞ্জন, থার্ডইয়ার, পাঞ্জাবি-পাজামা পরে যায় আর কলেজ করে, তার বেশি চিত্র-বৈচিত্র্য নেই কোনও।

এর-তার প্রেমের প্রসঙ্গ শুনলে আহ্লাদে গুড়াখু মাজে, দাঁতে-আঙুলে আওয়াজ হয়—চিকচিক! রোগ আর কি।

'এই করেই আঙুলগুলো যাবে, দাঁতেরও বারোটা।'

'হু।'

'কী হু?'

'যাও ত যাও, আজ তোমার টিউশনি—নেই?'

'থাকবে না কেন!' মনোরঞ্জনদাকে রাগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ি, এই আমার রুম-মেট, মানুষটা বড় ভাল।

'রূপছায়া' সিনেমা হলের ডানদিকে জগুবাবুব খাটাল, গরু-মোষের কাজকারবার, বড়ামারা-ঝাড়গাঁ লাইনে বাবুদের বাস চলে। এই খাটালেব পশ্চাতে অমুক পার্টি অফিস, ছোটমত ঘব, তার গর্ভে আমাদের বসবাস।

বাবু হয়ে বসে বসে মনোরঞ্জন কামিল্লা যখন ফেস্টুন লেখে—'চলছে চলবে'—তখন খুব ইচ্ছে করে আর দুটো 'না' বসিয়ে লিখে রাখি, 'চলছে না চলবে না।'

দ্যাখো মনঞ্জনদা, ঠিক একদিন লিখে ফেলব, তুমি ঘুমোও! এই ভাবতে ভাবতে 'ছবিঘর', এখানে মাত্র পাঁচ টাকায় কোট-টাই আর চশমার ফ্রেম পরে ছবি তুলেছি, সে ফটো আছে।

এবার চুলগুলো উল্টো আঁচড়াব, সাইকেলেব পিঠে বসে থেকেই ডানহাতের চেটোয় আচমকা উল্টে চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি করলাম।

এর পরেই ত বড় রাস্তা, উত্তর থেকে দক্ষিণে পাতা আছে, দক্ষিণে যাও ঝাড়ে গ্রাম রাজ কলেজ, আর উত্তরে—

আট-দশ মিনিট সাইকেল চালালে সাঁইবনী ঝোপ আর বামদা ফরেস্ট কলোনী, কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াতেই লীলাবতীব মা বলল, 'এসে গেছ বাবা।'

'হু এলাম।'

বলে আচমকা চোখ গেল ঝাঁকড়া সীম গাছটার নিচে, ঐখানেই একটা সাপ—সারা দেহে বুটিবুটি, হাত দেড়েক লম্বা—খুব বেরিয়েছিল এক বৈকালে, হাওয়া খেতে।—'সাপ! সাপ!' চিৎকারে ঘাড় তুলে দেখি, মহারাজ। 'দাঁড়াও'—মারবার ফন্দি খুঁজছি, লীলাবতী বলল, ঠিক পারবেন ত?' না পারাব কী আছে!' ঘবে কেউ পুরুষমানুষ ছিল না, লীলার মা বলেছিল, 'দ্যাখো বাবা, মাল্লে মারো আঘাত দিয়ে ছেড়ো না।' মাসিমা; এক আঘাতেই থেঁতলে যাবে দেখুন না।' উঁহু, হাতের লাঠি লটকে থাকল হাতে, মহারাজ বুকে হেঁটে নির্ভয়ে গেলেন।

হাত মস্কে ফিরে এলাম টেবিলে, লীলা খুব হেসেছিল।

ঐ সেই সীমবৃক্ষ, তার নিচে পুরুষত্ব আমার দেডাসুদে বন্দক রয়েছে, হু কবিতা। লীলার মা বলল, 'ও যে একটু যাবে।'

'কোথায়? কে মাসিমা?'

'লীলা আজেকটু বেরুবে, মার্কেটিং-এ।'

'বেশ ত যাক, না হয় পরে আসব।'

মাসিমার চটপটে জবাব, যেন তৈরী ছিল, "তুমিও যাও না বাবা সঙ্গে, কী আছে, দাদার মত!'

হাঁ-না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, সেজেগুজে লীলাবতী ছুটে এল মায়ের কাছে, বুকে আলতো কিল মারল, মা-মেয়েতে কী সব কথাবার্তা, মেয়েব থুতনি নেড়ে শুনিয়ে মা-বলল, 'ঢঙ, তুই যা ত।'

শালার সাপটাকে একবার পেলে হয় এখন। দাঁত দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে করব দু'টুকরো, কাঁচামাংস খাব। সেদিন খুব ফক্কি দিয়ে মাজা দুলিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল হে দন্তবিষো!

এই প্রথম, লীলাবতী আমার সঙ্গে রাস্তায় এই প্রথম, তার বড় লজ্জা, ছুরকে-ফরকে হাঁটে।

এক বুড়ো ফরেস্টার সাইকেল চালিয়ে অফিস থেকে ফিরল, কলোনীর গেটমুখে দেখা, তার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠে থাকল কপালে। বিদ্রূপ হাসছে! যাও যাও, কাজ করগে; গিয়ে খাকি হাফ-পেন্টুল চড়িয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মাঠময় দৌড়বে।

ফিতে আঁটা জুতোর তলায় বছর ষোলর ফটাফট আওয়াজ, কালো বেণী হিসহিসিয়ে পিঠের ওপর আছড়ে ফেলে হাঁটে, লীলা খুব সেজেছে। সাজো গো সাজোবালা।

বাটিক প্রিন্টের শাড়ী তার ওপর ম্যাচিং ব্লাউজ, ম্যাচ করা টিপ, হাতে দার্জিলিঙের বটুয়া।

'আজ কোন্ দোকানে, লীলা?'

'রকমারি।'

জুবিলী মার্কেটের অলি-গলি রাস্তা, সার সার দোকানপাট, লোকজনের ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা।

চেনামানুষ চোখে এলে চোখে-মুখে গর্বের হাসি, বলতেও ইচ্ছে করে আগবাড়িয়ে, দ্যাখো দ্যাখো, কার সঙ্গে আজ বেরিয়েছি।

কেউ কেউ বলল। 'কী হে? কীরকম আছ?'

'একপ্রকার আছি।' বলেই চোখ তুলে লীলাবতীকে দেখাই, বাটিকপ্রিন্ট ছলর-বলর হেঁটে চলেছে।

দাবনায় আলতো ঘুষি মেরে বন্ধুমানুষ সরে পড়ল, আরেকটু এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই রেডী-মেড কাপড়ের দোকান, তার মধ্যে 'রকমারি।'

সামনে পুজো, 'রকমারির' বাহার খুব, বঙচঙে আলোর রোশনাই, এই বৈকালেও এক-কে আর লাগছে।

ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গে কর্মচারী লোকটা গাল চুলকে বলল, 'কত? চৌত্রিশ?'

'হুঁ-উ।'

'তাই দ্যাখা।' সুন্দর করে ছাঁটা পাকা গোঁফ নিয়ে বুড়ো কত্তা বসে আছে, কাঠের মই বেয়ে আরেকজন ফুড়ুক-দুড়ুক দোতলায় উঠল।

উঠুক।

কাউন্টারে অল্প-অল্প ভিড়, বেঞ্চি ত খালিই বসলে হয়। সেই দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ব্লাউজের বাণ্ডিল ঘেঁটে চলেছে লীলা।

ঘাঁটুক।

খুব ফাণ্টা দেখিয়ে বসে পড়লাম বাবু হয়ে, আর বসতেই বাজখাই আওয়াজ—'সরে ভস্।'

নাকে নথ, হাতে মকর মুখী বালা, কানে কানপাশা, মোটা থোম্বা মাঝবয়েসী একটা বউ হাত-পা ঝেড়ে চিল্লোচ্ছে, 'লাজ-লজ্জা নাই?'

'তার মানে!'

পায়ের চটি খুলে পড়ল, চাকর টাইপের আরেকটা লোক কাঁধের গামছা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ফের চটি পরিয়ে দিল পায়ে, ততক্ষণে নাকের নোলক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে, রাগে।

নথ নেড়ে বলে, 'আ-রে পুরুষ, ঘাড়ের ওপর ভসে পড়লি!'

কম করেও আধ হাত ফারাক, তা সত্ত্বেও বউটা এসব বলে কী! এই প্রথম, লীলাবতী আমার সঙ্গে রাস্তায় এই প্রথম, আর আজকেই—রাগে দুঃখে চোখ ফেটে জল, বুড়ো কত্তা দেখছে, লীলাবতী দেখছে, দু'চারজন বাইরের খদ্দেরও জড়ো হচ্ছে,—ওঠ, জ্বলে ওঠ পুরুষত্ব আমার! জামার আস্তিন গুটিয়ে আচমকা মাকড়ার মত তড়পে উঠি, 'হ্যাঁ, এ কী কথা! ইয়ে-ইয়ার্কি পেয়েছেন? যা খুশি বললে হল, কী ভেবেছেন?'

'থুঃ' বলেই মোটা থোম্বা বউটা তার নথ সুদ্ধ নাক বাঁ থেকে ডানে সপাটে ঘুরিয়ে নিল, আর দেখি কি—পুরুষত্ব আমার মুড়মুড় করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বউটার গা ভর্তি গয়না, 'রকমারির' বুড়ো কত্তা তার পক্ষ নিয়ে খুব তোয়াজ করল, আমার মত ফেকলুর হয়ে কথা বলতে তার দায় পড়েছে!

এদিন রাস্তায় লীলাবতী আর একটি কথাও বলল না।

৩

না বলুক, মহালয়ার দুদিন আগে একটা ভাঙাচোরা ট্রানজিস্টার রেডিও টেবিলের ওপর ধপ করে বসিয়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে বলল, 'যাবার সময় নিয়ে যাবেন।'

'কোথায়?'

'জানি না।'

এটা-ওটা দেখছি নেড়ে চেড়ে, হতভম্ব; লীলাবতীর মা এসে মুখ করল, 'মেয়ের কথার কী ছিরি! না গো বাবা, আর কাকে বলব! তুমি বলে বলছি, রেডিওটা সারিয়ে এনো ত।'

'এ আর এমন কী কাজ, মাসিমা!'

'তা হলেও, খারাপ হয়ে পড়ে আছে, একে-তাকে বলি—'

'আর বলতে হবে না, কালকের মধ্যে।'

'হুঁ-উ, তা না হলে ত মহালয়াটাই—বীরেন ভদ্রের 'যা দেবী সর্বভূতেষু' কী ভাল যে লাগে বাবা।'

বগলে রেডিও, আরেক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল, দ্রুত পদে চালিয়ে 'তার-বেতারে'

এলাম, ভুঁড়িঅলা দোকানদারকে বলি, 'আজকের মধ্যে হবে না?'

চ্যাপ্টা ডিম্বাকার লম্বাটে, মিনি-ধুমসো, কম করেও পঞ্চাশটা, সব নাড়িভুঁড়ি বের করা দুজন ছোকরা মত কাজের লোক তার জুড়ছে।

'কি, হবে না?'

'অন্য দোকান দেখুন, আর ভাই পারছি না।'

'পাত্তে হবে, আরেকটা ত দাদা।'

'বেশ পরশু আসুন।' গাদার ভেতর বড় অবহেলায় দোকানদার লীলাকে আছড়ে ফেলল।

'পরশু?' কত যেন হিসেব করে বলি, 'থাকছি না, কাল হবে ত বলুন।'

'চার্জ বেশী পড়বে।'

'কত?'

গাদা থেকে ফের লীলাবতীকে তুলে এনে খুলে খালে দেখল ভুঁড়িঅলা, বলল, 'নেই কিছু, কমসে কম ত্রিশ টাকার ধাক্কা।'

'থার্টি-ই দেব।'

পুনরায় গাদার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল দোকানদার, তার হাত ধরে বললাম, 'একটু কেয়ার নিয়ে রাখুন।'

বিছানো লাল নুড়ি পাথর, দুধারে চারানো আকাশমণি বৃক্ষচূড়া, বামদা ফরেস্ট কলোনির রাস্তা-ই এই।

খেলার মাঠে ভাঙা ইটের দেয়ালে পোড়া কাঠ কয়লার কী সব অসভ্য লেখা, একটা গিরগিটি থাপার-থুপুর চার পায়ে তার খানিকটা ঢেকে রাখল, খানিকটা এখনও পড়া যায়।

না-না করেও পড়ে ফেললাম, পড়তেও লজ্জা, চলন রাস্তায় কে যে এসব লেখেটেখে। প্রায় দুপুর, দুপুর, হাতে রেডিও, সাইকেল চালিয়ে মহানন্দে কলোনির চৌহদ্দিতে ঢুকে আসি।

সরকারী কুয়োয় কলোনীর দু'চারজন ডোরাকাটা বেড-কভার সাবান জলে ভিজিয়ে কাচছে থাপুস-থুপুস।

'ম্যাল, ভাল করে নিঙড়ে ক্লিপ এঁটে ম্যালে দে।' লীলাবতীর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠিকে-ঝিকে বলল।

বেঁটেখাটো ঠিকে-ঝি, ঠিক পাত্তা পাচ্ছে না কাপড় শুকনো দড়িটার, বিস্কুট-দৌড়ের বাচ্চাদের মত লাফাচ্ছে।

এক হাতে ট্রানজিস্টার, সাইকেলের পিঠে বসেই আবেক হাতে দড়িটাকে টেনে ধরলাম, পাত্তা পেয়ে ঠিকে-ঝি মুচকি হাসল, তার পায়ের কাছে এখনও এক বালতি।

লীলার মা বলল, 'এই ত, এসে গেছ বাবা। নিঙড়ে নে নিঙড়ে, অত জল। হাত তাড়াতাড়ি চালা।'

বলেই বলল, 'অনেক করেছ, আর কষ্ট কত্তে হবে না বাবা দাও আমাকে!'

রেডিও ফেরত দিয়ে বলি, 'ও আর কষ্ট কি!'

'কষ্ট না? মহালয়া শুনবে ত বাবা? বীরেন ভদ্দের 'যা দেবী সর্বভুতেষু' কী ভাল

যে লাগে?

'রেডিও নেই, মাসিমা।'

'তাতে কি, আমাদের এখানে এসো, তুমি ত ঘরের ছেলের মত।'

'সে আর বলতে।'

মনোরঞ্জন কামিল্লাকে বলা হয়নি, আজ রাত্রে যাব, কালকের ভোর মহালয়া। মন বড় অস্থির পঞ্চম।

চোখ বুজি ত বাঁকা রামধনুকের তুল্য দাগ, পিছু হটতে হটতে অতি বড় খাদের গর্ভে গিয়ে ঠেকে, আর ঝটকা মেরে ভাত ঘুমটাও ভেঙে যায়।

তো ফের শুরু করি, একে একে এক, এক দুগুনে দুই, এক তিন্নে তিন—এই করে শেষ অব্দি ঢলে পড়লাম ঘুমে, ঘুম বড় মহাশয়।

যখন ভাঙল, রঙচটা সাইকেল হাঁকিয়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ঝাড়েক গ্রামের রাস্তায় ঘোড়ার বেগে দৌড়লাম। জনমানুষ নেই কোথাও, দুটো-চাট্টা কুকুর যা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। জীবগুলোর এমনি চিৎকার যেন গাড়ির সামনের চাকা তাদের বাঁকা ল্যাজের ওপর দিয়ে গেছে, আর দুয়েকটা ত রাজার মত গেল।

টুকরোটাকরা আলোর উপস্থিতি, ঢুলু ঢুলু ঘুম-চোখে উঠে এলে কি র'ম দেখতে লাগবে, লীলাকে? গেট খুলবে কে?—মাসিমা?

রাতচরা দুটো পাখি ডাকাডাকি শুরু করল, অদ্ভুত, শুনলে মনে হবে পরস্পর বলছে এই-তুই-যা, এই-তুই-যা—

চুপিসারে গেলাম, কাঠের দরজায় ঘষা লেগে সামনের চাকার কিছু ধুলো খসে পড়ল ঝুরঝুর, এবার ডাকতে হয়।

'মাসিমা,

ও মাসিমা!'

'লীলা।'

'শুনতে পাচ্ছেন, মাসিমা?'

'আমি—'

কড়াও নাড়লাম, চরাচর চুপচাপ, আরেক কিস্তি ডাকতে গিয়ে মনে হল, ধুর, আমি কি আদেখলা?

মনে হতে ফের চাকা ঘুরল সাইকেলের, স্পোকের মধ্যে কিছুনা-কিছু একটা জড়িয়েছে।

ফিরে যেতেই জড়তা, খপাং কবে লাথি ছুঁড়লাম মাডগার্ডে, টাল খেয়ে সামান্য দুমড়ে গেল।

আর সেই কিছু জড়িয়ে থাকার ফরফরানি আওয়াজটা নেই, সাইকেল দিব্য চলে।

জোরেসে, আরো জোরসে চালিয়ে জগুবাবুর খাটাল পেরুলাম, আর ক'গজের মধ্যেই ত পার্টি অফিস-মেস, মনোকষ্ট বড়!

মেসের সম্মুখভাগ সামান্য উঁচু, গায়ের জোরে এক হেঁচকায় সাইকেল সুদ্ধু উঁচু জায়গাটা ডিঙোব, আর পা ফস্কে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটে গেল আচমকা।

বাঁ বগলের এক বিঘৎ নিচে সাইকেলের হাড় ঢুকে বসে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড, যন্ত্রণা

বড় বড় দাগা দিলে হে, লীলাবতী।

৪

দাগটা কিন্তু আছে, বাঁ কাঁধের ওপর বাঁ গাল চেপে ধরলে চোখেব দৃষ্টিতে পষ্ট উঠে আসে, দাগটা।

তবে সে আড়ষ্ঠতা নেই, বাজার-হাট করি, লীলাবতীকে পড়াই, মাঝে মধ্যে থেকেও যাই, খুব খাওয়া-দাওয়া হয়।

একদিন ত তুমুল বৃষ্টি, লীলার বড়দা রেইন কোট গায়ে চড়িয়ে অফিস বেরিয়ে গেল, জানলায় হাত গলিয়ে লীলা বলল, 'বিষ্টি বাদলায় চুপচাপ বসে থেকে জলের ছাঁট ধরাই হবি, কী ভাল যে লাগে।'

'আমার বাপু খিচুড়ি, গরম খিচুড়ি আর—'কথা আর্ধেক রেখে লীলাবতীর মা জানলা টপকে পানের পিক ফেলল, জলে মিশে একাকার হয়ে আসে খানিকটা টপাৎ-লাল।

'আর, ডিম ভাজা? তাই হোক না মা, হোক।' মেয়ের চোখ-মুখে সুখ-সুখ।

মা বলল, 'ডিম ত নেই, ডাল খানিকটা শট আছে।'

'যাঃ' মুখ ঘুরিয়ে লীলা জলের ধারা নিয়ে পড়ল, ধারাপাত প্রবল। সত্বর ছেড়ে যাবে তার কোন ভরসা নেই, তবু আকাশের হাবভাব দেখে নিয়ে বলি, 'কী আনতে হবে বলুন এনে দিচ্ছি।'

'বিষ্টি যা!'

'ভাববেন না, ওর'ম কত-অ ভিজেছি।'

'তা হলেও—'

দোনোমনো লীলাবতীর মা আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলে, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে কী বুঝি না।'

ঠিকই বোঝেন, নিজের মনে কপচে ধুম-বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়লাম, এখান থেকে বাজার কম করে দেড় মাইল।

দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি, ছাতা নিয়ে গাড়ি চালানো-ই ঝঞ্ঝাট, ছাতা থাক অতএব।

ঝড়ো জলের দাপট চাকার গতিমুখ ঠেলে ঘুরিয়ে দিতে খুব চালাচ্ছে ছলাকলা, সামান্য শীত-শীত ভাব।

এই বৃষ্টি বাদলায় কে আর বাজার করতে আসে, যা মাথা তার থেকে ছাতাই বেশি কালো কালো ভুসভুসে খইচালা।

ডাল ত নিলাম, এবার ডিম, ডিম কিনতে যেতে হবে সেই আলু আনাজপাতির ওদিকটায়, ঝরছে ত ঝরছে।

একটা নধর-গতর শূয়োর ভিজতে ভিজতে ড্রেনের ধাব দিয়ে দৌড়ুল, তার পশ্চাতে দুটি মাদুস-নুদুস বাচ্চা, বাজারের নাবালক জীব, সব দেখেও আনন্দ। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল ডিম কিনেই ফতুর, দু জোড়া হাঁসের ডিম এক টাকা চল্লিশ, আর কিছু কেনার নেই।

বাজাব থেকে বেরুব আর দেখি কি, এক থুত্থুরে বুড়ি কচুপাতায় বেলী ফুল সাজিয়ে বসে আছে, বিক্রী করবে।

মুখের রেখা কুঁচকে-মুঁচকে কদাকার, তাব মধ্যে এই ছোট ছোট কাঁচের গুলির মত

ছোট দুটো চোখে পড়েও পড়ে না।

হাতে-পায়ে হাজা, হাজায় জল লাগলে জ্বলুনি হয়, বুড়ি যেন জল খাওয়াচ্ছে ঠুসে ঠুসে, কত খাবি খা।

খাড়া বৃষ্টির নিচেই বসেছে, বাজেপোড়া গাছের ওপর ঝড়-জঙ্গল নির্দয় যেরূপ, বুড়ির ওপর তেমনি ধারা অপঘাত, শীতে অঙ্গ কাঁপছে ঠকঠক।

'সরে বসলে ত হয়, শুধুমুদু ভিজছ?'

আরেকটু হলে সামনের চাকা কচুপাতায় ফুলগুলিকে ধেবড়ে দিত, সাবধান হয়ে বলি, 'কত?'

'আনা চাইরেক দিবি।'

প্রায় চাবকে সাইকেলটাকে ছুটিয়ে আনলাম বামদা ফরেস্ট কলোনীর ভেতর, দেখেই লীলাবতীর মা বলল, 'এ-হে, ভিজে একদম ঝড়ো কাক হয়ে গেছ বাবা!'

না, দাঁড়কাক; আপনার মনে বলতে বলতে ডাল-ডিম নামিয়ে রাখলাম, ডাল খানিকটা ভিজে ছিল, নখে টিপে লীলাবতী মুচকি, 'আধ্ধেক সেদ্ধ মা, বাঁচা গেল, তোমাকে বেশি খাটতে হবে না আর।'

'একটা টাকা দেন ত, মাসিমা।'

মা-মেয়ের চার চোখে কথা হচ্ছে, বললাম, 'দ্যান, ঘুরে এসে বলছি। গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে রাখলাম।

টাকা নয়, দু'দুটো আধুলি দিয়ে-থুয়ে লীলাবতীর মা বলে, 'আজকালকার ছেলে-মেয়েদের বুঝি না, কী সুখে যে আবার ভিজবে বাবা!'

বুড়িটা হেসে-খেলে ভিজছে, খাড়াখাড়ি বৃষ্টিবাণ, তার কোন হিন্দোল নেই, ফুলগুলি তেমনি আছে, একটাও বিকোয়নি।

দুটো আধুলি দিয়ে অল্প কিছু ফুল নিলাম, বাদবাকী ও বেচুক, আরো দুটো পয়সা পাক।

বলার মধ্যে বলেছি, 'যাও, কারুর দোকানঘরের আটচালায় উঠে পড়ো, এভাবে ভিজলে আর দেখতে হবে না!'

বলেই বড় সুখে লীলাদের বাসায় ফিরে এলাম, আজ এখানেও বড়ো সুখ—খিচুড়ি আর ডিমভজা।

রান্নাঘরের দোরগোড়ায় শুকনো জামাকাপড়ে বাবু হয়ে বসে গল্পটা আগাগোড়া বলে ফেললাম।

তাতে আরেক কাঠি রঙও চড়ালাম, 'আসলে কি জানেন মাসিমা, ওই বৃদ্ধার মুখের কুচকানো-মুচকানো রেখার ভেতর গোটা একটা ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখেছি।

শুনে ত লীলাবতীর মা মেয়েকে উস্তন-খুস্তন করে, আর বলে, 'মা রে, শুধুমুদু ছেলেটাকে ওর'ম্ করিস, ছেলে কিন্তু ভাল।'

৫

হঁ ভাল-ই, খুব ভালমত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো, চড়ুইপাখির তুল্য লীলা এ-ঘর ও-

ঘর করে। এটা-ওটা উল্টায়, মন গেলে একদৃষ্টে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।—'কি হল, কী দেখছ?'

আর কথা নেই, ঘাড় নিচু করে পিঠের ওপর পড়ে থাকা বাসি বেণীটাকে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, জলদি হাতে চুলের ভাঁজগুলো খুলে ফেলল, গার্ডারটাও।

ফের ধীরেসুস্থে বাঁধা, গার্ডার আটকে চুলের ডগায় সামান্য থুতু—ঝটকা মেরে ছুঁড়ে ফেলল, যে কে সেই।

কাঁধের দুদিকে ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'রেডিওটা খুলুন ত।'

'কী এখন, খবর?' বলতে বলতে খুললাম, রেডিওতে সত্যই খবর হচ্ছে।

"এইমাত্র পাওয়া খবরে প্রকাশ, খানসেনাদের প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে মুক্তি ফৌজ ঢাকা—"

আর কি, দু'হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতে লীলাবতী দৌড়ুল, 'মারেম্মা শুনেছ? শুনবে ত এসো।'

'জয় বাঙলা। জয় বাঙলা!' মা-মেয়ের পরস্পর গলা জড়িয়ে বারান্দায় কাঁদতে বসল, কপালের সিঁদুরটিপ ধেবড়ে উঠে গেছে মাথায়, উড়োখুড়ো চুলের মধ্যে আটার ভুসি, কী যে আনন্দ।

এই লোকগুলোর দেশ ওপারে, ফকফকিয়ে ভোর হবার মত দেশটা খরখর স্বাধীন হচ্ছে।

তার আগেই হাজারে হাজারে ভয়ে-ত্রাসে বোঁচকা-বুঁচকি কাঁধে এদেশে আসছে হুহু, উঠে দাঁড়িয়ে লীলাবতীর মা বলে, 'জানলে বাবা, আমার নব্বই বস্‌সরের বুড়ি শাশুড়ী এখনও ওই দেশে, এই তালে যদি আসেন।'

চিঠি এল, জলপাইগুড়ির রাজাভাতখাওয়া থেকে লীলাবতীর বাবা লিখেছে, 'আমার মাতাঠাকুরানী গত পরশু পদধূলি দিয়াছেন, তুমি চিঠি পাবামাত্র অবিলম্বে আইস।'

তাড়াহুড়োয় লীলার মা তার স্বামীর কর্মস্থল রাজাভাতখাওয়া রওনা হল, স্কুল আছে বলে মেয়ের যাওয়া হল না।

ভাবলাম, রসেবসে ক'দিন ভালই কাটবে, এই সংসারের দায় ত এখন থেকে আমার।

ওই এক লোক, লীলার বড়দা, খায়-দায় পানটি মুখে ঢুকিয়ে অফিস করে, কী গেল কী থাকল সংসারে—অত শতর অঙ্ক কষা তার ধাতে নেই, ধর্তব্যেও রাখল না।

"কী মাছ আনব, বড়দা?"

'ঐ যে গরাসে-গরাসে মাথা!' তার মানে চুনোমাছ কিনে আনার ফরমাস, সাধ হয়েছে প্রতিগ্রাসে মাছের মুড়ো খাবে। খুব চটকদার লোক, আছে ফূর্তিতে।

অতএব রোজ চালের ড্রামে বগলঅব্দি ডানহাত গুঁজে রেখে দেখি, আর কদ্দিন। ফুরিয়ে গেলে চালপাইকারকে বলতে হয়, 'দ্যান, এম-ও (মানি অর্ডার) এলেই শো করব, চেনাজানার মধ্যে।'

'হাঁ হাঁ, সে ত বটেই।'

আছে সুখে লীলাবতী, সময় সময় দু'হাতে কানের লতি টেনে খুলে ফেলে কানপাশা, ডাঁটি ধরে নাড়াচাড়া চলে, ফের কানের ফুটোয় উঠেও যায়। 'ডিজাইনটি বেশ।' তোয়াজ

করে বলি।

লীলা হাসে, 'মনে করে খামটা কিন্তু আনবেন।'

'হুঁ' করে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বললে না ত—কার নিকট লিখলে?'

'জানি না, যান।'

খাম-পোস্টকার্ড কিনে ঘরে এলে লীলা গেট ছেড়ে অনেকটা দৌড়ে আসে, হাতে নিয়ে ফের দৌড়তে দৌড়তে গেল।

বারান্দায় খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে বসে, অতঃপর, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।—'কি অত দ্যাখো?'

নট নড়ন-চড়ন, ডাকটিকিটে মন, দেখেটেকে লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে, 'কী যন্ত্রন্না বলুন।'

'কিসের কি?'

খামপোস্টকার্ডের গায়ে পাঁচ পয়সার এক্সট্রা টিকিট সাঁটা আছে, রিফিউজী রিলিফের। ছবিতে বোচকাবুঁচকি কাঁধে তিনজন শরণার্থী, দুটো বাচ্চা, দেখতে দেখতে বলে উঠি, 'ও এই জন্য।'

এর দিনকতক বাদে, একদিন খুব আহ্লাদে আসছি কলেজ করে, সেই রঙচটা সাইকেল ঘোড়ার গতিবেগ, কলোনীর মধ্যে এসে আরেকটু উগ্রচণ্ড হলাম, লীলাও এতক্ষণে ফিরেছে।

চাকার এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম দরজাটা, আজকাল এভাবেই দরজা খুলে ফেলা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে।

অধিক ক্ষমতা পেলে যা হয়, আমিই ত এ বাড়ির হেড এখন, আর কে! ভাবতে ভাবতে ঢুকছি, আর দেখি কি বারান্দায় ছোট ছোট ধাপিতে বসে আছে লীলাবতী, তার দু'চোখে জল টসাটসা। হল কি?

কাছেই আরেকজন, ফতুয়ার মত হাফ-শার্ট, গলায় তাবিজ, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। আমার থেকে যৎকিঞ্চিৎ বড় হবে, জলে জলে ঝাপসা চোখ দুটো, গড়িয়ে হাঁ-গালে এসে পড়লে জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছে লোকটা, নোঙরার জাণ্ড!

একটু জোরেই শব্দ করে গাড়িটাকে হিড়হিড়িয়ে বারান্দায় এককোণে তুলে রাখলাম, ঘরেও ঢুকলাম একবার। বেরিয়ে এলাম, ফের ঢুকলাম। ফেব বেরুতেই লীলা বলল, 'মুচুকুন্দদা—' 'আমাদের আত্মীয়, জয়বাঙলা থেকে এস্ছে।'

তার মানে রিফিউজী।

আচমকা মুচুকুন্দ উঠে দাঁড়িয়ে তার ফতুয়া কাম-হাফ-শার্টের ফালি কাপড দিয়ে লীলার চোখ মুছিয়ে বলল, 'ওড়ি, কান্দস না।'

ভোরবেলা উঠে দেখি, পাতকুয়োয় ধড়াস-ধডাস বালতি ধসিযে জল তুলছে মুচুকুন্দ, কানায় কানায় ভরতি দুটো ড্রাম।

পাতকুয়োর পাড়ে লীলাবতীর শাড়ী-শায়া স্তূপাকাবে বাখা, এখন বসে বসে কাচবে, এ আবার কি!

আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল, ব্রাশ কত্তে কত্তে প্রচণ্ড রাগে ঘাড় ঘুরিয়ে গাছের

ওপর বসে থাকা কাক দেখলাম, সেও ভি আচ্ছা! বাজার যাবার আগে মনটা আরেকবার খিঁচড়ে গেল, চেয়ারে মুখোমুখি বসে লীলার সঙ্গে কথা বলছি, কথা আর কি—এই কী দরকার, কি-কি আনতে হবে, মাছ না এনে ডিম আনা-ই ভাল, আয় দেবে বেশি, ইত্যাদি।

মুচুকুন্দ ঢুকল কি যেন চিবুতে চিবুতে, তার কচল-কচল আওয়াজ, ঢুকে লীলার চেয়ারের হাতায় থেবড়ে বসে পড়ল।—হাসছে।

সেই দাঁত বের-করা হাসি, আর সয় না, কথা থামিয়ে আচমকা উঠে পড়লাম, জোটেও যতসব! শুধুমুদুই আমাদের মাঝে, বড়বাবু?

সাইকেলটাও আর ঠিকমত চলে না, খুব সত্বর রিপেয়ারে নিতে হবে, ভাবতে ভাবতে চড়ে বসলাম।

বারান্দায় বেরিয়ে লীলাবতী তৎক্ষণাৎ বলল, 'কচুরি আনবেন।'

'দেখি!'

বটতলার হিঙের কচুরি বিখ্যাত খুব, সেই এক ঠোঙা আর বাজার, গলদঘর্ম হয়ে ফিরছি। রাস্তায় দু'জন চেনা-পরিচিত লোক কথা না বলে পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেল, কার মনে না দুঃখ হয়। আর কি বুঝি না, এর মূলে হিংসা? আরে যা যা, কেউ না থাক লীলাবতী ত আছে, বামদা ফরেস্ট কলোনী—ওই ত ঢের।

বড় মুখ করেই ফিরছি, একদম হাতে গরম হিঙের কচুরি, খেয়েও সুখ-আহ্লাদ, মনঞ্জনদা, এই ত জীবন!

একটা কাক ঠোঙা দেখে গলা ফাটিয়ে চেল্লাচ্ছে, যতই চেল্লাও হে তোমার জন্যে সন্দেশ কেনা হয়নি। এককালে 'তীর্থের কাক' নিয়ে বাক্যরচনা ত কত করেছি, মনে পড়ল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, লীলাবতী চুল বাঁধছে, চুলের গোড়ায় টাইট-বাঁধা দড়ির খুঁটটা দাঁতে চেপে পা ছড়িয়ে আরামসে। তার পশ্চাতে বাবু হয়ে বসা মুচুকুন্দ খোঁপায় হাত ঠুকে ঠুকে বলছে, 'ওড়ি, য্যান্তা কস্ ত্যান্তা।'

মুচুকুন্দ চুল বাঁধে, কানের খোল বের করে দেয়, উকুন বাছে—কী না করে মুচুকুন্দ। নাচতে গাইতেও পারে।

একদিন ত খুব হচ্ছে নাচগান, মাথায় গামছা বেঁধে মুচুকুন্দ উঠোনে নাচছে, বারান্দায় এদিক-ওদিক করে তাল ঠুকছে লীলা, পারলে নেচেও নেয়—এমনি হাবভাব।

'পুবপরোদি ফইরত্ গাড়ত্ পানিন্নিবাল্লাই' না কী যেন গানের কথাগুলো, তার কী যে অর্থ যে জানে সে জানে, আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রাগে, তেড়েফুঁড়ে বললাম, 'কি হচ্ছে কী?'

বলতেই মুচুকুন্দ আচমকা থেমে থাকল, ঘোরের মধ্যে তখনও তাল ঢুকছে লীলা, কেটে যেতে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'আপনি নাচুন ত, মুচুকুন্দদা।' নাচানাচি শুরু হল আবার, অসহ্য, দড়াম করে দরজার পাল্লা আটকে পিঠ ঠেকিয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠুকে ভাবলাম, এই উটকো লোকটা—

ঐ লোকটাই যত নষ্টের গোড়া, একে ত অন্নধ্বংস, তার ওপর এই প্রকার ধ্যাস্টামো, দিনকে দিন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, একটা কিছু ভাবা দরকার।

ভাবতে ভাবতে দু'দিন তিন দিনের দিন রাজাভাতখাওয়ার চিঠি—ঘরের ছেলের মত আমি সেইহেতু হুকুম হয়েছে—রাজাভাতখাওয়ায় লীলাকে অতি অবশ্য পৌঁছে দেওয়ার, মায়ের খুব অসুখ, লীলার যাওয়া দরকার একান্তই। চিঠি পেয়ে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলাম, সে কেউ দেখল না। যাক, আপদটা আর তা'লে সঙ্গে সঙ্গে থাকছে না, লেপ্টেমেপ্টে? যাবার একদিন আগে মুচুকুন্দ তার আরেক আত্মীয়ের বাড়ি রাঁচি রওনা-ও হয়ে গেল।

হেসে খেলে বলি, 'আর কি, এবার ত রেডী হতে হয়, উঠে পড়ো।'

৬

কামরূপ এক্সপ্রেসে যাব, হাওড়া থেকে রাত ন'টায় গাড়ি, এটা-ওটা গুছিয়ে নিতে নিতে আচমকা আঁতকে উঠে লীলা বলল, 'এই যাঃ আমার কন্‌সেসান্‌টাই আনা হয়নি, কী-ই হবে?'

'স্টুডেন্ট-কন্‌সেসান্? স্কুলের?'

'হুঁ।'

এর অধিক কথা নেই, হাতে-পায়ের নখ খুঁটল, গোড়ালির ফাটা চামড়া টেনে হিঁচড়ে ছাড়াচ্ছে।

চিন্তা ভারি, তো বললাম, 'হেড-মিস্ট্রেস কি আছে? আজ ত ছুটির দিন।' লীলাবতী উঠল, খানিক এঘর-ওঘর খোঁজাখুঁজির ভান করল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল তার অত কি-বা গরজ।

ঘাড় উঁচিয়ে দেখি লীলার শায়ার লেস আর শাড়ি খাট থেকে ঝুলছে এক হাত।

এই লীলা আমার সঙ্গে একা ট্রেনে চড়ে যাবে, ভাবতেই বলবীর্য এসে গেল, দু'হাতে টুস্কি মেরে বলি, 'হোক ছুটি, চেষ্টা কত্তে দোষ কী, যাই?' দৌড়ুতে দৌড়ুতে এল, 'আমাদের স্কুলে যাবেন আপনি? উম্‌মা।' 'ওড়ি যাক যাক, তা না'হলে অতগুলো ট্যাকা, কম কথা!' এঁটো কব্জি ভাঁজ করে বড়দা বাথরুমে গেল।

সাইকেলের পিঠে উঠতেই ক্যাঁচ-কোঁচ, শুরু হল খুনসুটি, স্প্রিঙগুলো খুব ত জ্বালাচ্ছে।—তা'লে? হাতে খাতা, ছাতা মাথায় আদায়ে চললে, বড়াবাবু?

হুঁ যে র'ম ভাবো, আর কি।

মেয়েদের স্কুলে ঢোকা এক প্রকার হুজ্জুতি, তার ওপর ছুটির দিন, অফিস ঘরটা খোলা দেখলাম। এক পাকা মাথা বুড়ো টেবিলে মাথা গুঁজে কাজ করছে, দারোয়ান টপকে ওই বুড়ো লোকটাকে ধরলাম, 'যদি একবারটি দ্যাখেন, বড়ো বিপদ।

'কার?'

হকচকিয়ে বলি, 'না মানে, আপনার দয়া, যদি দয়া করে একবার—' 'উঁহু ছুটির দিন, হবে-টবে না ওসব।'

চেয়ারে বসলাম, পিন-কুশনের গর্ভ থেকে একেকটা পিন আধধেক তুলে ফেলি, ফের মাথা ঠুকে দমন করি—বস হে বস।

নস্যির কৌটো খুলল লোকটা, ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ক্যারামের গুটি ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গি করল, তারপর দু'নাকের ফুটোয় দু'টিপ, পাঞ্জাবির বাঁ হাতায় নাক মুছে তুলে রাখল ফের।

'এক্ষেত্রে, কেসটা যদি আপনাব মেযের হত, মানে বলছি, তা'হলে আপনি কী কত্তেন সার?'

মাথা খামচে একটা আস্ত পিন বেভুল তুলে ফেলেছি, আমার ডান হাতের দু'আঙুলে তার মুণ্ডুটা ধরা, বুড়ো মানুষটার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আছে। সাদা মাথা বুড়ো ধরে ফেলল খপ করে, পিন-কুশনের মধ্যে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল, 'এ-জিনিস খুব বেয়াড়া পাযে যদি একবারটি ফুটে'—

'হাতেই ত ছিল সার।'

'তার অথ?' চটে উঠল বুড়োটা, লীলাবতী কে হয়?'

ডাঁট দেখিয়ে বললাম, 'বোন।'

'কী রকম?'

'কী আবার, এক মায়ের পেটের বোন।'

সামান্য ঘাবড়ে গেল, স্বর বদলে বলল, 'কার কাছে যাবে রাজাভাতখাওয়া?'

'বাবার, ওই জায়গা বাবার কর্মস্থল।'

'অ।' হাতে কলম, উঠে দাঁড়াতেই কাছা চেয়ারের হাতায় লেগে খুলে গেল, ফের ঠিক কত্তে কত্তে বলল, 'যাই বড়দিমণিকে প্রোপোজ করে দেখি, হবে বলে ত মনে হয় না।'

স্টুডেন্ট-কন্‌সেশান হাতে পেয়ে খুশিতে উথলে উঠল না লীলা, বরঞ্চ চোখ বড় করে জেরা করল, 'বড়দিকে কী বললেন? মানে, এই আমি আপনার কে হই? কী সম্পক্ক?'

'কেন, যা সত্য।'

'তার মানে? বলছেন কি—আমি আপনার—'

'হ বল্লেই বা!'

লীলাবতী পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল, 'আমার পেস্টিজ বলে আর কিছু থাকল না কী জঘন্য আপনি।' আমার পড়াও হয়ে গেল, এর পরে আর কি স্কুলে থাকতে দেবেন বড়দিমণি!' বলেই ক্রোধে-আক্রোশে ফেটে পড়ল।

এতক্ষণে, যা যা ঘটেছিল—সেই সাদা বুড়োর গল্প—হাসতে হাসতে লীলাবতীকে বলি, শুনে ত থ।

'বাঃ এত সুন্দর ম্যানেজ কত্তেও পারেন আপনি, দেখে ত মনে হয় না একটু-ও।' কী হাসি চোখ-মুখে, আর কী আহ্লাদ! .

বললাম, 'আমি ঐ রকম।'

ট্রেন চলতে শুরু করলে লীলা বড় ভাল মেয়ে হয়ে যায়, দুয়েকদণ্ড গেল ত বলে, এটা নিয়েছেন, ওটা? আব সেইটে?

'হুঁ, আছে সব।'

'জলের বোতল? যাঃ যাঃ'

'ঐ ত, ওদিকটায়।'

'টিকিটগুলো আছে ঠিক?'

'আছে', বুক পকেটে বাঁ হাত চেপে ধরে বলি, 'আমার জিম্মা থেকে জিনিস খোয়া যাওয়া—অত্ত সহজ না।'

নিশ্চিন্ত লীলাবতী জানলায় মুখ রেখে বাইরের দৃশ্য দেখল, বেলা পড়ে আসছে। এই কামরায় চেনা লোক নেই একটিও—আমি আর লীলাবতী—এই দৃশ্য তুমি যদি দেখতে মনঞ্জনদা। দুদ্দাড় ছুটতে ছুটতে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছে গেল, এবার বদলাবার পালা, আমাদের কামরূপ এক্সপ্রেস ত রাত ন'টায়।

ছোটখাটো লাগেজের ওপর বসে পড়ে লীলা কপালের উলুরঝুলুর চুলগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে নিল, খুব টায়ার্ড।

শালোয়ার কামিজ পরা একটি পাঞ্জাবি বউ বোতলের ছিপি খুলে জল খাচ্ছে ঢকঢক, জল না দুধ? মনে হতে লীলাকে বললাম, 'কিছু খাবে? আনব?'

'হু, জল একটু।'

ব্যাগের ভেতর থেকে ঝটাপট ওয়াটার বটল্টা তুলে ধরলাম, হাত থেকে খামচে নিয়ে ফের ব্যাগের মধ্যে গুঁজে রাখল, বলল, 'কল থেকে আনুন।'

হতভম্ভ আমি হাঁটকে-পাঁটকে পলিথিনের সেই লাল গেলাসটা খুজছি ত খুঁজছি।

তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'ঐটুকু ত জল, এখন খরচা কল্লে বাকী রাস্তাটুকু কী করবেন?

ঠিক কথা। অতএব লাল গেলাস হাতে দৌড়ুলাম জল আনতে দুড়ুক দুড়ুক, ট্রেন-ই এল না এদিকে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার ভয়, কী কিত্তি-কাণ্ড!

জলটল খেয়ে লীলাবতী ঢেঁকুর তুলল, 'কী, ঠিক বলিনি?'

'কিসের?'

'এই যে—কল থেকে জল এনে খাওয়া।'

ডানহাতের তর্জনী হেলিয়ে বার বার কবুল করি, 'বটেই ত, তোমার কথায় যুক্তি কত!'

কামরূপ এক্সপ্রেসে ভিড় তেমন নেই, কুলিদের হাতে-পায়ে ধরে দুটো সীট আরেকটা বাক্সের বন্দোবস্ত হল। এখন আর কোন ঝুটঝামেলা নেই, একদম ঝাড়া হাত-পা, লীলাবতী সীটের ওপর পা তুলে-বসে আছে, তার চোখ দুটো খোলা।

ঢুলু ঢুলু, আরেক নন-বেঙ্গলী বুড়ো ট্রেনে ওঠামাত্র ঘুমুচ্ছে, ঘুমন্ত মাথা এদিক-ওদিক নড় নড় করে লীলার গায়ে ঢলে পড়ল।

আচ্ছাই ত, বুড়োর হাঁটুতে হাত ঘষে বললাম, 'দাদা ঠিক হয়ে বসুন, মেয়েছেলের গায়ের ওপর যে—'

বলতেই সোজা হয়ে বসে লাল চোখে কটমট করে চেয়ে থাকল দু'চার-মিনিট, ফের এখন ঘুমুচ্ছে। ঘুমুলে যে কে সেই, চাপা আক্রোশে লীলাকে উঠে আসতে বলি, 'তুমি, এদিকটায় উঠে এসে বসো ত!'

সীট পাল্টাপাল্টি করে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম, নিশ্চিন্তে।

বুড়োটা আর এখন ঘুমুচ্ছে না, আরেকবার অন্তত ঘুমোও বুড়োবাবা, ঘুম বড় ভাল জিনিস।

বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানি, এর ভেতর দিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেস দৌড়চ্ছে দ্রুতবেগে। কামরায় কামরায় লোক চলাচলের বিরাম নেই, এখান থেকে দেখা যায় বাথরুমের ছিটকিনি উঠছে নামছে, ছড়াক্ ছড়াক্।

ঘুমন্ত মাথা কাঁধ বরাবর এসে যেতে চটজলদি সরে বসলাম, পড়তে পড়তেও খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল মাথাটা, আর লীলার কী হাসি।

খেতে বসে বললাম; 'ঐটুকু ত খেলে, আরেকটা নাও।'

'ডিম? উমম্না।'

'আর্ধেকটা অন্তত?'

'তুমি খাও।'

এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলল ও। আহ্লাদে ফেটে পড়ে বলি, 'খেতে-ই হবে।'

মুচকি হাসে, আচমকা আমার ডানহাতের কব্জি ওর বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ঠোঁটের কাছে ধরল, 'বাবারে বাবা, খাচ্ছি ত!'

নন-বেঙ্গলী বুড়োর চোখের ঘুম সেই যে চটকেছে আর নেই, জেগে বসে গাল-দাড়ি চুলকোচ্ছে।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে লীলাবতী বলল, 'এবার একটু ঘুমোব।'

'সাবধানে ওঠো, দেখো পড়ে না যাও!'

'নিচে আছো কী কত্তে, পড়লে ধোরো।' বাঙ্কে উঠে গিয়ে লীলা চোখ টিপে হাসল। হতবুদ্ধি আমি—কী বলব? বিড় বিড় করে বলি, 'তোমাকে জীবনভর ধরে থাকব, লীলা!'

বাঙ্কের হাতা ধরে ক'মিনিট ত দাঁড়ালাম, বুড়োর দু'ঠ্যাঙের মাঝে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে অতঃপর আয়েস করে বসি, কেমন দেখলে বুড়োবাবা?

ট্রেন বড় নাচাচ্ছে, দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে গন্তব্যে, এই মাত্র আরেকটা স্টেশন ক্রস করল।

আলোর ঝলকানি থেকে ঘাড় ঘুরোতেই দেখি, মুচুকুন্দ! অ্যা, আপদটা ফের কোত্থেকে এল? রুমরুম ভূতের মত দাঁড়িয়ে মিটির-মিটির হাসে। রাগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাউ দাউ জ্বলে উঠল রি রি করে, উটকো লোকটার জ্বালায় অতিষ্ঠ-দু'দণ্ড একলা থাকার যো নেই কোথাও!

'ও কই?' হেসে ত্রিভঙ্গ মুচুকুন্দ জানতে চায়।

আমার দায় পড়েছে কথা বলতে, ডান হাত মাথার চার-ধারে এক পাক ঘুরিয়ে তর্জনী ব্রহ্মতালু বরাবর উঁচিয়ে রাখলাম।

যা বোঝার বুঝল, বাঙ্কের মাথায় হাত রেখে ডাকল, 'ও-ওড়ি, জাগানি?'

শোনামাত্র লীলাবতী ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল, 'আরে, মুচুকুন্দদা, কী-ই মজা!'

কথা হতে লাগল একটানা, ধুন্দুর কী অত কথা? কথায় কথায় জানলাম—ও যাবে এন-জি-পি, তার মানে নিউ জলপাইগুড়ি!

আর ত সয় না, বিরক্ত হয়ে বাথরুমে গেলাম, গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অযথা হাওয়া খেলাম, ফিরে এসে দেখি—লীলাবতী ঘুমুচ্ছে। উটকো মানুষটাও জবর দখল দিব্য বসে আছে নিচে, দেখে হাসল, সে বড় জ্বালাধরা।

মুখ ঝামটে উল্টো দিকে বসি, অ-বাঙালী বুড়ো এখন মুখোমুখি, তার লাল চোখ প্যাট প্যাট করে দেখল, রকম দেখছ বুড়োবাবা?

কোলের ওপর দু'হাত জড়ো করে রাখা, ফতুয়া-কাম-হাফ-শার্ট, কালো করে বাঁধা গলায় সেই তাবিজ, এক মাথা কদম ছাঁট চুল।

চোখাচোখি হলেই মুচুকুন্দ হাসে, হারে মুর্খ।

কামরায় আর তেমন সাড়া শব্দ নেই, যে যার ঘুমুচ্ছে, রেলবাতায় চাকার দাপাদাপিতে গাড়ির দুলুনি—বাড়ছে ত বাড়ছে। ঢুলুনি এসে গেল চোখেও, সেই ঢুলুঢুলু—ছেঁড়া ঘুড়ির তুল্য গোঁত্তা খেয়ে চোখ খুলেছি, আর দেখি কি কালো কোট গায়ে টি-টি, হাত বাড়িয়ে টিকিট চাচ্ছে।

চনমন করে জেগে উঠে দিলাম টিকিট দুটো দেখে-টেখে ফেরত দিল, এবার ত নিশ্চিন্ত।

ওদিকে লোক দুটো সামনা সামনি হতেই ফতুয়ার থলি হাতড়াল মুচুকুন্দ, নেই। উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট দেখল, নেই ত!

না টিকিট না রিফিউজী ক্যাম্পের দাগ নম্বর, কিছুই দর্শাতে পারল না মুচুকুন্দ, ঘাড় ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওই দু'জন।

এতক্ষণে মনে হল, লোকটা ফাউ, কোথাকার উটকো আপদ, বিদেয় হয়ে ভালই হয়েছে, ধুলোটুলো ঝেড়ে সীটের ওপর দু'পা তুলে মহানন্দে বসলাম! আর ত ঝঞ্ঝাট নেই কোথাও!

ঘুম থেকে উঠে ঈষৎ ঘাড় ঝুঁকিয়ে লীলা বলল, 'মুচুকুন্দদা কোথায় গো?'

প্রাণ খুলে মহাসুখে গল্পটা বললাম, শুনে চুপ থাকল দু'দণ্ড, তারপরেই দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা, কথা ত না ফোঁসফোঁসানি—মানুষ? মানুষ তুমি, না জন্তু, জলজ্যান্ত লোকটাকে ধরে বেঁধে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে বসে থাকলে আরামসে?—তার একবার খোঁজ খবর-ও কল্লে না, ছিঃ'!

বাঙ্কের বালিশে মাথা গুঁজে লীলাবতী ফোঁপাচ্ছে, "যান, এই রাত্রে কোথায় হাপিস হয়ে গেল অতবড় লোকটা, খুঁজুন।"

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই নেমে পড়লাম, এদিক-ওদিক মানুষজনের ছুটোছুটি, তার মধ্যে ব্যাটাচ্ছেলে গেল কোথায়?—সেই ফাউ লোকটা।

৭

তাকে এখনও খুঁজে মরি, চাকরি সূত্রে বনগাঁয় পোস্টেড, বনগাঁ, সীমান্ত দিয়ে কত লোক ত যায় আসে। অটো-রিকশায় ভ্যানে চড়ে লোকগুলো টাকা ভাঙিয়ে যশোর রোড বরাবর এগোয়, নানা মুখের সারি।

তার ভেতর সেই ফাউ লোকটাকে খুঁজি, হুবহু কাউকে দেখলে তার পিছু পিছু হাঁটি, সে হয়ত ট্রেনে করে আর কোথাও যাবে। তার সঙ্গে ঠাকুরনগর, হাবড়া অব্দি চলে যাই, ভুল ভাঙলে যে কে সেই, এ ত মুচুকুন্দ নয়।

ওপার থেকে চলে আসা লোকগুলোর তোয়াজ করি, তারা যাতে এ দেশের ভোটার হয় তার জন্যে ঠিক জায়গা মত যোগাযোগও করি—এর মুলে সেই।

মুচুকুন্দ বাঙলাদেশের ব'কলমা নিয়ে বসে আছে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে ডান হাতের তর্জনী মাথার চারদিকে এক পাক ঘুরিয়ে এনে চিবুকে ঠেসে ধরে ভাবি, না এবার যা হোক করে সেই ফাউ লোকটাকে খুঁজতে হবে। সেই তাকে খুঁজে না আনলে লীলাবতীর মন পাচ্ছি না।

বড় দুঃখে আছি হে!!

অলীক সহবাস

কালিদাস ভদ্র

খোয়াই এসে নূপুর একটা সোনাঝুরি গাছের নীচে দাঁড়াল। ভারি নির্জন, সুন্দর জায়গাটা। সন্ধ্যের পর খুব একটা কেউ এদিকে আসে না। সার-সার সোনাঝুরি মোরাম ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুরি দুলছে হাওয়ায়। গাছগুলো যেন মাথার চুলে ঝুমকো গুঁজেছে।

রুপোর রেকাবের মতো দোলপূর্ণিমার চাঁদ আকাশে। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সমস্ত খোয়াই। সহসা নির্জনতা ভেঙে কোথাও পিউ কাঁহা ডেকে উঠল। কোথাও কোনো গাছে অতর্কিতে ডেকে উঠছে কোকিল। পাগল হাওয়ার ছোটাছুটিতে অচিন পাখির ডানার মতো উড়ছে আঁচল।

সোনাঝুরি গাছের পাতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়া ডাইনি জ্যোৎস্না যেন নূপুরকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে। ধিকিধিকি জ্বলা অর্ধেক জীবনেও একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে চায়। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। তখনই কানে এলো কাঁপা-কাঁপা স্বর, 'তুই একটা খা...'

গাছের পাতার মতো খিলখিল হেসে মেয়েলি কথা ফুটল—

—ছাড়, ছাড়, সুড়সুড়ি লাগছে...

নূপুরের চোখ পড়ল দূরে সোনাঝুরি গাছের নীচে। জ্যোৎস্নামাখা যুগলমূর্তি। আবেগঘন অনড় কোনো স্থাপত্যশিল্প যেন। ঘাড ঘুরিয়ে নূপুর দেখল কাছে দূরে গাছের নীচে-নীচে খাজুরাহোর মতো সার-সার দাঁড়িয়ে, বসে। খুব কাছের গাছের নীচে জ্যোৎস্নাছোপানো ফ্রকের মধ্যে ছেলেটার হাত। হাতে মাথা হেলিয়ে মেয়েটা আবার বলল—

—ছাড় না, এখানে কেউ রং দেয়।

—বুদ্ধু, আয়নায় দেখবি চানঘরে...

—আহা! খুব না...

কথাটা ঠং করে বাজল নূপুরের বুকে। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ঝাপসা একটা ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠল।

আটাশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছবি। নূপুর সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার। বি. এ. ইতিহাস। বয়স বড় জোর সতেরো হবে। বাহাত্তর সাল, কলেজ ছাত্ররা তখন উত্তাল রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। ব্যাপক গণ্ডগোল, পুলিশি ধরপাকড় চলছে। মারধর, খুনজখম, বোমাবাজি নিত্য ঘটনা। প্রায়ই কলেজ বন্ধ থাকায় নূপুরের হৃদয়পুরে মাসিবাড়ি থাকা ঠিক হলো। বাবা ধরণীকান্ত যেন শেষমেশ মেয়েকে বললেন, "এই কল্যাণী থেকে রোজ যাতায়াত করতে পারবি না। যা দিনকাল। বরং তোর হাসিমাসির বাড়িতেই থেকে যা। কলেজটাও কাছে হবে।

নূপুর মাসির বাড়ি থাকাটা ভালো মনে মেনে নিতে পারছিল না। তবু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মানিয়ে নিল। মনে আছে সেবার দোলের দিন বেলার দিকে মাসি কোত্থেকে একটা ছেলেকে ধরে আনল। কী, না ছেলেটা তার সইয়ের ছেলে। দমদমে বাড়ি। কিন্তু পুলিশি অত্যাচারে বাড়িছাড়া, এখন এখানেই থাকবে কদিন।

ছেলেটার চোখে চোখ পড়তেই নূপুর চমকে উঠেছিল। প্রখর বুদ্ধিমাখা উজ্জ্বল দুটো চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে প্রদীপের মতো। আঠারো-উনিশের সৌম্য কিশোর। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল। নামটাও বেশ, স্বপ্নময়। স্বপ্নময় বিশ্বাস। প্রেসিডেন্সির সেকেন্ড ইয়ার। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

নূপুর একটুক্ষণ তাকিয়ে ধরা গলায় বলেছিল, "ডোন্ট মাইন্ড, আমি কিন্তু আপনার মতো ব্রিলিয়ান্ট নই। পড়ুয়া, তাই ইতিহাস নিয়েছি।"

—কোন কলেজ?

—লেডি ব্র্যাবোর্ন।

—ব্রিলিয়ান্টরাই ওখানে সিট পায়।

—তাই বুঝি!

—নয় তো কী?

বাড়ি ছাড়ার মনোকষ্ট যেন ভুলিয়ে দিল স্বপ্নময়ের কথাটা। নূপুর বুঝতে পারল একটা গর্ববোধ তার মনে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাস ওতেই নূপুর মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল।

চোখ গোল-গোল করে নূপুর স্বপ্নময়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "পুলিশ আপনাকে খুঁজকে কেন?"

—আমার বন্ধুদের খবর চায়।

—কী খবর?

—ওই কে-কে রাজনীতি করে। তাদের সব নামধাম।

—ও আপনিই বুঝি ওদের দলে আছেন? নকশাল?

—দল বুঝি না-বুঝি, আমার বন্ধুরা তো কোনো অন্যায় করেনি। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি করার অধিকার সবারই আছে। ছাত্ররা এ-দেশে আগেও রাজনীতি করেছে, এখনও করছে। এতে অন্যায় কোথায়?

—বাঃ আপনারা বোমাবাজি করবেন, ক্লাস ভাংচুর করবেন, পুলিশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

—আমার বন্ধুরা উপযাচক হয়ে বোমা মারে না। পুলিশ অযথা তাদের ধরে নিয়ে মারধর করছে, বিনাবিচারে আটকে রাখছে। বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষা করতে...

—বোমা ছুঁড়ছেন, খুন করছেন। না?

বেজায় চটে গিয়েছিল স্বপ্নময়। মুখটা জবাফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। ব্যস, তখনই মাসি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, "তুই বড় স্বার্থপর নূপুর। ছেলেটা ক'বাত পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তুই ওকে অহেতুক উসকে দিচ্ছিস, কেন? যা না, একটু রং খেল। দোলের দিন, ছেলেটার মুখে আবির দে। আবিরে ছেলেটার মনটা একটু অন্যরকম হবে। রুক্ষ ভাবটা অনেক কমে যাবে।"

নাহ্, তোমার দেখছি মা-র চেয়ে মাসির দরদ বেশি। কথাটা মনে এলেও নূপুর মুখে বলতে পারেনি। মাসির কথায় অজান্তেই হাঁ হয়ে স্বপ্নময়কে দেখছিল। মনে-মনে ভাবল অহেতুক কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছে। কেনই-বা নিঃসন্তান মাসিকে কষ্ট দেবে। মাসি হয় তো সইয়ের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো ভাবে।

চুপ করে নূপুর মাসির ঠাকুরঘরে সোজা চলে গিয়েছিল। একটু পরেই আবির-রেকাব হাতে দাঁড়িয়েছিল স্বপ্নময়ের সামনে।

—কী মশাই, শুনেছেন তো মাসির হুকুম? আসুন।

—না, না। আমার রং খেলতে ইচ্ছে করছে না।

—ইস, বললেই হলো! দেখি-দেখি মুখটা...

সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ বাজছিল। স্বপ্নময়ের চুলে আবির বোলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে। ধড়মড় করে হঠাৎ স্বপ্নময় নূপুরের রেকাব থেকে মুঠো করে আবির নিল। দুহাতে নূপুরের মাথা ধরে মাথায়-চুলে আবির মাখিয়ে দিল। ঝটপট করছে নূপুর স্বপ্নময়ের বুকের খাঁচায় পাখির মতো। এই প্রথম পুরুষ হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল নূপুর। মুখে গাঢ় রঙের পোঁচ। নূপুর বাহানা করে স্বপ্নময়ের হাত থেকে বের হতে গেছিল, হুট করে হাতটা পিছলে ঢুকে পড়ে ফ্রকের ভেতরে। কেঁপে উঠল বুকের ঢাল। চোখ তুলে নূপুর আর তাকায়নি। লজ্জায় হিম শরীরে এক দৌড়ে ঢুকল কলঘরে।

আয়নায় নিজেকে দেখল একা, মুখোমুখি। সদ্য বুক ফুঁড়ে ওঠা টিলা আবিরে লাল। নূপুর আধখানা হয়ে গেল। লজ্জা, আশ্চর্য এক ভালোলাগা দোল খাচ্ছে শরীর জুড়ে। অথচ কেমন নিঃস্ব লাগছে। অনেকক্ষণ চান করেছিল তবু রং কোথাও-না-কোথাও যেন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে...

কাউকে নূপুর বলতে পাবেনি। বন্ধু দীপাকেও না। নিভৃতিতেই রইল অর্ধেক জীবন। সন্ধ্যায় মাসিবাড়ির আমবাগানে দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করেছে। নূপুর একবারও মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। স্বপ্নময়ও তাকায়নি। রাজনীতি, দর্শন অনেক কিছুই আলোচনায় মূখ্য অংশ জুড়ে ছিল। স্বপ্নময় একে-একে বলত, নূপুর গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনত। স্বপ্নময়ের বলার ভঙ্গিতে এমন এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিল যা নূপুরের স্বপ্নময়ের প্রতি ভালোলাগা তৈরি করে। আর একভাবে খুঁজে পায় নিজেকে। নতুন করে আবিষ্কার করে।

উথালপাথাল বিভোর বেশ ছিল দুজন। হঠাৎ স্বপ্নময় না-বলেই এক গভীর রাতে চলে গিয়েছিল। নূপুর সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনেছিল স্বপ্নময়ের অন্তর্ধান কাহিনী। মাথা ঘুরে গিয়েছিল নূপুরের। বুকটা হু হু করছিল। হুড়মুড়িয়ে একটা কষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শরীরে। পিছোতে পারছিল না, চোখ ভেঙে জল নেমেছিল। কান্নার জল। লোনা সমুদ্রে অথৈ ভাসছিল নূপুর একা। নিঃসঙ্গ।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে নূপুর ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিল। দীপা অনেক কষ্টে সামাল দিয়ে নূপুরকে নিয়ে এসেছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল। নূপুরের বাড়িতেও ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। নূপুরের বাবা বেশ ভয় পেয়েছিলেন, মেয়ের কাণ্ডকারখানায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ দু'একজন, এমন-কি হাসিমাসির বর তপন মেসোর পরামর্শে হঠাৎ নূপুরের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মেসো খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, "স্বপ্নময়কে নিয়ে নূপুরের বাড়াবাড়ি মোটেই ঠিক হচ্ছে না। শেষে সবাই পুলিশের সন্দেহে পড়বে। রাজরোষে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। মেয়েটার জীবনও নষ্ট হতে পারে জেলে পচে।"

সুখময়ের সম্বন্ধটা মেসোই এনেছিলেন। ব্যাংকের চাকুরে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বেশ

সুখেই থাকবে নূপুর। সুখময় বলেছিল, "বিয়ের পরও নূপুর পড়তে চাইলে পড়তে পারে, কোনো আপত্তি নেই।"

অনেক আপত্তিতেও অসহায় নূপুর সুখময়কে বিয়ে করেছিল। সুখময়ের গভীর ভালোবাসা ধীরে-ধীরে নূপুরকে এক অন্য নূপুর করে তুলেছে। বেশ সুখে, স্বাচ্ছন্দে নূপুর আজ বনেদি ঘরণী। একমাত্র মেয়ে তিতলিকে ঘিরে ছোট সংসার। দেখতে-দেখতে তিতলিও এক চিতসাঁতারে আঠারোয় আজ পা দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। হোস্টেলে থাকে।

হঠাৎ দীপার ফোন যেন এতবছর পরে একটা সাইক্লোন হয়ে আছড়ে পড়ে নূপুরের বুকের উপরে। গত পরশু বিকেলের মরা আলোকে থেঁতলে-গুঁড়িয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠেছিল ফোনটা। শান্তিনিকেতন থেকে দীপা বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল, "অ্যাই নূপুর, কালই চলে আয় আমার এখানে। স্বপ্নময়দা এখানেই থাকে।"

—তুই কী করে জানলি?

—আরে আমি এখানে গত সপ্তাহে জয়েন করেই জানতে পারলাম, স্বপ্নদা ছেলেমেয়েদের কবিতা পড়ায়।

—দূর, ও আবার কবিতা পড়াবে কী!

—হ্যাঁরে, ভালো করে জেনেছি। সেই স্বপ্নময়। স্বপ্নময় বিশ্বাস। আজকের বিখ্যাত কবি স্বপ্নময় বিশ্বাস।

—তোর মাথাটা বিগড়ে গেছে রে দীপা! এজন্য বলি তোর বিয়ে করা উচিত ছিল। ব্যাচেলর থেকে তোর মাথাটা গেছে।

—তুই আয় না একবার...

দীপার ফোনটা কেটে যেতেই অনেকক্ষণ বিছানায় অন্যমনস্ক বসেছিল নূপুর। উদাসীনতা ভেঙেছিল সুখময়ের ডোরবেলের শব্দে। রাতে খেতে বসে নূপুর শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা বলেছিল সুখময়কে। সুখময় বলেছিল, "তোমার যখন শান্তিনিকেতনে দোল দেখার ইচ্ছে যাও। দীপার বাড়িতেই থাকতে পারবে।" নূপুর সুখময়কেও সঙ্গে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল, সুখময় অফিসের কাজের কথা তুলে অব্যাহতি পেয়েছিল।

গতকালই দুপুরে একাই শান্তিনিকেতন এসেছে নূপুর। দীপার বাড়িতে। রতনপল্লি। দীপার কাছেই স্বপ্নময়ের গল্প শুনে-শুনে সারারাত বুকের মধ্যেটা আনন্দ আর ভয়ে ধড়ফড় করছিল নূপুরের। পঁয়তাল্লিশ পেরোলেও নূপুর যেন আবার সতেরোয় পৌঁছে গেছে। ঝিমঝিম বাজছে নূপুর। মানুষের শরীর-মন এত দুর্জ্ঞেয় নূপুর আগে বোঝেনি। স্বপ্নময়কে দেখতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আবার ভাবল এতদিন পরে যাওয়া কি ঠিক হবে? কোন মুখে দাঁড়াবে তার সামনে। পরক্ষণেই ভাবল তার তো কোনো দোষ ছিল না। অসহায় একটা মেয়ে কী-বা করতে পারে! প্রতীক্ষা? কিন্তু কার জন্য? প্রেসিডেন্সি জেল থেকে স্বপ্নময় তো তখন নিরুদ্দেশ। কেউ কোনো খবর দিতে পারেনি। নূপুর নিজেও জানত না স্বপ্নময় আদৌ বেঁচে আছে, না কি পুলিশের গুলিতে...

দীপার বাড়ি থেকে অনেক দ্বন্দ্বে বিকেলে চা-খাওয়ার পর নূপুর স্বপ্নময়ের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিল। পথে বেবিয়ে চাঁদের আলোর বন্যায় ভাসতে-ভাসতে খোয়াই এসে পড়েছিল

নূপুর। সোনাঝুরি গাঠটাকেই নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা দীপার ডাকে চমকে তাকায় নূপুর।

—কী রে, তুই এখানে? কী ব্যাপার...স্বপ্নদার বাড়ি যাসনি?

—নারে, যাওয়া হয়নি।

—সে কী! ভাবছিস কী বলবি?

—না, ঠিক তা নয়। আসলে কী হবে গিয়ে...

—কেন? যা না একবার দেখা করে আয়! এতদূর এলি আর মানুষটাকে একবার দেখে যাবি না।

দীপা যেন ডাইনি-জ্যোৎস্নার মতো উসকে দিল নূপুরকে। রাতজাগা পাখির মতো উড়ন্ত ডানায় মুহূর্তে নূপুর হুস করে চলে গেল প্রান্তিকের কাছে। স্বপ্নময়ের বাড়ি। ছাতার মতো গাছগাছালি জ্যোৎস্না মাথায় বাড়িটাকে আগলে রেখেছে। বুক দুরু-দুরু কাঁপা-কাঁপা হাতে দরজায় টোকা দিল নূপুর।

বেশ কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর দরজাটা হাট করে খুলে গেল। সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে অবাক। এ কী! কাশফুলের মতো সাদা চুলে ভরা মাথা। সাদা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। রোগা, শীর্ণ চেহারায় শুধু চোখ দুটো অবিকল এক আছে। জ্বলজ্বল জ্বলছে দুটো প্রদীপ। হাই পাওয়ার গোল্ড ফ্রেম চশমাটা চোখে পরে লোকটা অনড় চোখে চেয়ে আছে নূপুরের দিকে। বিস্ময়, জড়তা ঠেলে মুখ ফসকে নূপুর বলে, "কী চিনতে পারলে?"

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে স্বপ্নময় বলল, "ভালো আছো?"

—তুমি?

—ভালো।

নূপুর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে আলোয় ভেসে যাচ্ছে স্বপ্নময়ের মুখ। খোলা দরজা দিয়ে পরিযায়ী পাখির মতো উড়ে জ্যোৎস্না ঢুকছে ঘরে। ডাইনি ফাগুন বাতাস তার বুকের আঁচল খসিয়ে দিল। আঁচল সরতেই যেন দুই স্তন বক-বকম করছে। এখনই উড়ন্ত ডানায় তারা শ্বেত কপোতের মতো ওড়াউড়ি করবে।

স্বপ্নময় এক দৃষ্টে চেয়ে আছে নূপুরের দিকে। পলকহীন। বাক্‌রুদ্ধ মূর্তির মতো। নিস্তব্ধতা ভেঙে নূপুরের গলায় শব্দের আঁচড় ফুটল।

—কী রঙের দাগ দেখলে?

বিদ্রূপ মেশানো কথায় স্বপ্নময় যেন আরও বিস্মিত হলো। নূপুরের কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। অনেকটা ছেলেমানুষের মতো বলল, "আজ বুঝি খুব রং খেলেছ?"

—আজ নয়, আটাশ বছর আগে, হৃদয়পুরে...

স্বপ্নময় এবার খুব লজ্জা পেল। নূপুরের আজ আর কোনো লজ্জা নেই। সংকোচ নেই। সে যেন আজ বড় বেপরোয়া।

স্বপ্নময় ভাবল মেয়েরা বিয়ের পর হয় তো বেশি বেপরোয়া হয়ে যায়। ছোটবেলায় তিল-তিল করে জমানো রক্ষণশীল ধারণা বিয়েব পরই ওলোট-পালোট হয়ে যায়। হয়তো তারা জেনে যায় শারীরিক জাদুর গোপন দর্শন।

হঠাৎ নূপুর স্বপ্নময়কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বিয়ে করলে না কেন? কেনই-বা সেদিন তুমি আমায় ঠিকানা দাওনি? চিঠি দাওনি। কেন তুমি নিরুদ্দেশ হলে? কেন..."

স্বপ্নময় শুধু বলল, "একজন ফেরার আসামির যোগাযোগ রাখাটা ঠিক নয়। আর রাখলে তুমিই পুলিশের শিকার হতে। তোমার সুন্দর জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত। বিনাবিচারে বন্দি নয় তো..."

—আমি তো তোমায় খুঁজেছিলাম। পাগলের মতো...

—জানি। আমি সব জানি। তবু উপায় ছিল না।

—তা তুমি বিয়ে করলে না কেন?

—একান্ত ব্যক্তিগত।

—না তোমার কোনো ব্যক্তিগত কিছু নেই। আমার কাছে তুমি আজও উন্মুক্ত। দেখো আমার দিকে...

স্বপ্নময়ের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তখনই লোডশেডিং হলো। মায়া জ্যোৎস্নায় ঘর থইথই করছে। অবাক চোখে চেয়ে স্বপ্নময় দেখছে, জ্যোৎস্না ছোপানো সোফায় এসে বসেছে নূপুর। নিরাভরণ, বিবসনা। মুক্ত স্তনের বোঁটা থেকে টুপটুপ কবে পড়ছে জ্যোৎস্নার ফোঁটা।

আস্তে আস্তে নূপুর স্বপ্নময়ের খুব কাছে এলো। আবেগভরা কণ্ঠে আবার বলল, "বলো না কেন বিয়ে করলে না?"

—এমনি।

শিরশির কাঁপানো অভ্যস্ত আঙুলে নূপুব স্বপ্নময়েব গোপন অঙ্গ খুঁজছে। বেহালার তারে ছড় টানার মতো স্বপ্নময়ের কণ্ঠে ফুটল, "কী করছ? জানি, তুমি পারবে না। এ-বয়সে আর হয় না..."

সাঁওতাল পল্লি থেকে ভেসে আসছে মাদলের বোল, হোলির গান। মহুয়ার গন্ধে ম-ম করছে ঘরটা।

স্বপ্নময় এই প্রথম টের পেল মেডিক্যাল রিপোর্টটা কী নির্মম সত্য। নূপুব জানল না পুলিশের জ্বলন্ত চুরুটে ঝলসানো স্বপ্ন তাদের নিথর কাহিনী। পোড়া স্বপ্নেব যন্ত্রণামাখা নীল অন্ধকারে স্পপ্নটা রেখে দিল স্বপ্নময়।

সুমিত্রার স্পর্শ

মনোজ চাকলাদার

তখনো সন্ধে নামেনি। বাতাস সামান্য ফোকর দিয়ে জানালা ৎয়ে গায়ে লাগছে সুশান্তর। ঘুম পাচ্ছে ওর। শিরা উপশিরা বেয়ে শৈশবের স্মৃতির দিকে এগোয়। সেই মাঠের ঘাসগুলো চোখেব সামনে ফুটে ওঠে। চমকে যায়। সে কি ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে উঠবে। ভি. আর. এস নেবে তেমন ইচ্ছে ছিল না। অজিত সেদিন এমন অসম্মান করে উঠল, যে মাথাটা গরম হয়ে গেল। ইউনিয়নের মিটিং-এ যাবেন না, মিছিল মিটিংএ যাবেন না, ঘরে বসে সব পেয়ে যাচ্ছেন, বেকারদের লেলিয়ে দেব দেখবেন আপনার পোস্টে হাজারটা ছেলে নেচে গেয়ে কাজ করে যাবে—।

কোথাকার কথা কোথায় গড়ায়, শান্ত সুশান্ত ঝেঁঝে উঠে বলে, একেবারে তোতাপাখিটি, নেতা বলেছেন তো, উনিও বুলিটি মারছেন, সাবাদিন বুলিটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো চাঁদ, তা এ ক'বছর বিনা কাজে পয়সা পেঁদাচ্ছো সে হিসেব কি করছো, অপরকে ওস্তাদের মত দায়িত্ব জানাচ্ছো, বড তত্ত্বকে জানিও না, নিজে একটু জেনে তারপর বলতে এসো—।

আপনাদের জানতে আমাদের বাকি নেই, মালিকের দালাল—

কে কার দালাল এখানে সবাই জানে—

অন্য সকলে বলে ওঠে, এই সুশান্তদা কি হচ্ছে, ছাড়ুন তো—

ধরেছিই বা কবে ছাড়ার কথাই বা ওঠে কি করে—।

আপনাদের মত দালালদের টাইট করতে হয় কিভাবে তা আমরা জানি-কত টাইট কবলে, টাইট করতে করতে তা সবই ডকে তুললে—

অজিতকে টেনে নিয়ে যায় কয়েকজন। সুশান্তকে বলে, কি হবে তর্ক করে, এতে কি কোন সমাধান হবে—

একথা সুশান্ত যে জানে না তা নয়। অজিতও যে জানে না তা নয়, এভাবেই নিজেরা অবুঝ হয়ে যায়। মন কষাকষি, অসম্মান নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে যেতে হয় সুশান্তকে। যাতায়াত দিনকে দিন যা ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। ভীড় ঠেলে ঠেলে একেক সময় নিজের ব্যর্থতায় বড় কষ্ট পায় সুশান্ত। বাড়ি এসে বৌ, সুমিত্রাব সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলে না। মেয়ে টুকাইয়ের দিকে তাকালেও বড় কষ্ট হয়। এরা জানে না তার স্বামী, তার বাবা বড় ব্যর্থ মানুষ, অসম্মানিত মানুষ। মালিকের চেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে, তাব সহকর্মী, তাদের আচার আচবণ, কাজ করতে ইচ্ছে কবে না। তার পরদিন অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না। বাতেই একটা সিদ্ধান্ত, আব সে অফিস যাবে না। কাউকে ভয নয, কারোর কাছে পবাজয নয়; এ তার নিজের কাছে পরাজয়।

পবদিন গিয়ে ভি আর এস-এর জন্য একটা দবখাস্ত জমা দেয। ভেবেছিল কেউ জানবে না। এমনিই একটা এব বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছিল। ও এর বিরুদ্ধে চলে গেছে, এটা আর গোপন রইল না। দুদিন পর আনন্দবাবু বলে, সুশান্তবাবু এতে লাভ হবে আপনাব, এ বযসে রিটায়ার করে কী করবেন?

সুশান্ত কোন উত্তর দেয়নি। ধীরে ধীরে ডিপার্টম্যান্টের সকলে জেনে গেল। অজিত

বলে, সুশান্তদা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে না থাকবেন, তবে লড়ব কী করে?

সুশান্ত কিছুই উত্তর করে না। অজিত নরম হয়ে বলে, সেদিনের কথাতে আপনি মনে কিছু করেছেন নাকি—। তারপর হেসে বলে, আমরা তো আপনার ভাইয়ের মত, দেখুন না কোথায় পিঠ ঠেকে গেছে—।

সুশান্তর একবার ইচ্ছে হয়েছিল, ওকে একবার বিশ্বের অর্থনীতি, বিজ্ঞান বিস্ফোরণ, ইতিহাস এবং এখানকার রাজনীতি নিয়ে দুচার কথা শোনায়। কিন্তু অদ্ভুত ক্লান্তিতে ট্রেনের ভিড়ের কথা মনে পড়ল। ভিন রাজ্যের মানুষের ভিড়, তাদের কালচারের কথা মনে পড়ল। সে যেন আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বলে, অজিত, বহু বই আমার কেনা, ওসব বই আমার এখনো পড়া হয়নি। একটু পরকালের চর্চা করি—তারপর হেসে বলে, তুমি তো আবার পরকাল বিশ্বাস করো না—

তা নয়, আসলে কারোর জন্য তো কিছু করতে পারিনা—আপনি বরং চিঠিটা ফিরিয়ে দিন—।

আগে তো ভি. আর. এস দিক, তারপর নয় তোমার কথা ভাবব—

দিলে আর ভাববেন কী করে—

ভি. আর. এস পেয়ে যায় সুশান্ত। নিয়েও নেয়। ফেয়ার-ওয়েল দিতে চেয়েছিল ডিপার্টম্যান্ট। তাও নেয়নি। হেসে বলে, তোমাদের থেকে বিদায় নিইনি, মাঝে মাঝে আসব। বসব, কাজ করে দেবো।

এ্যাকাউন্টস্ অফিসারের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশ ভাল থাকায়, কোন তদ্বির তাকে করতে হয়নি। নীরেন্দ্রবাবুই শুধু একটা যা উপহার দিয়েছিলেন। রাসেলের 'কনকোয়েস্ট ফর হ্যাপিনেস'। বড় আনন্দ পেয়েছিল সুশান্ত। ভাবে, কত লড়াই করে এ চাকরি, ছোটবেলা থেকে প্রতিদিন পড়াশুনা, বাবা মার ধমক, স্কুল ডিঙিয়ে কলেজ, কলেজ ডিঙিয়ে ইউনিভারসিটি। কত পরীক্ষা কত ইন্টারভিউ। পড়াশুনায় ভালই ছিল সুশান্ত। আজ কত সহজেই না চাকরিটা ছেড়ে দিল, বা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

এক ব্যর্থতার গহ্বর থেকে আরেক ব্যর্থতায় ঢোকে। সবুজ ঘাসে পড়ন্ত বিকেলেব আলোয় বল নিয়ে এগোচ্ছে, কত পা, সব চেনা পা। এ পা'টা শুকদেবের, ওটা তরুণের, ওটা অভিজিতের। বড় প্রিয় বল, পায়ের ফাঁক দিয়ে বলটা সে কাটিয়ে নিচ্ছে। আর ঐ রোদ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ধরে রাখতে চায়। কে যেন পেছন থেকে বলে, ওভার, ওভার, খেলা ওভার। সুশান্ত বলটা দেয়। বলটা সে শট মেরে দেয়। যেদিকে যায় যাক, সে শুধু সবুজ ঘাসের ওপর সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুশান্ত ভাবে, কাল থেকে কী আবার মাঠে যাবে—। কাদের সঙ্গে সে খেলবে—। চোখ বুজল সুশান্ত, খেলা শেষ।

(২)

কত বয়স হল সুশান্তর। মায়ের কাছে শুনেছিল ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান। দেশ ছেড়ে সব রেখে চলে এসেছিল। বাবা বলেছিল উনিশ শো ছেচল্লিশ। যখন সে বড় হয়েছে তখন থেকেই সেসময়ের ইতিহাস তার জানার বড় ইচ্ছে। এই দুহাজার এক সালে এই চুয়ান্ন বছর বয়সে ইতিহাস জানা হয়নি। আসলে কেউই প্রকৃত

ইতিহাসটা জানায়নি। ইদানীং প্রকৃত ইতিহাস না জানানোর অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সুশান্ত জানে সে প্রকৃত ইতিহাস জানতেও পারবে না। আর সেই অন্বেষণও সে করবে না, একেক বার ভাবে করবে কিন্তু এত পরিশ্রম করে এরকম কুৎসিত জেনে কী করবে। আর জানলেও সে যখন অপরকে বলবে সে বিশ্বাসও করবে না। সর্বত্রই এক মজার চরিত্র। সবাই কেমন সত্যকে আড়াল করে বা দূরে রেখে মিথ্যেকে নিয়ে জটিলতা তৈরি করে গুরুত্ব বাড়ায়। .

চারপাশে এত মিথ্যে, এই মিথ্যের ভেতর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে কী করে! সুমিত্রা এসে বলে, সারাদিন বসে বসে কী ভাব বল তো—

তোমার কথা, টুকাইয়ের কথা--

যতসব আজগুবি কথা, সমর্থ পুরুষ মানুষ বাড়িতে বসে কাটালে, বাড়িটাই কেমন অথর্ব হয়ে পড়ে—

কেন তোমার কোন কাজটা থেমে আছে শুনি—

পাড়ার সবাই তো বলছে, তোমার চাকরি গেছে—

তা তো সত্যি, ছাড়িয়ে দিত, আগে ছেড়ে দিলাম—

তা কি আর ভাবছে, ভাবছে কোন কুকীর্তি করেছ তাই চাকরি গেছে—

হেসে বলে, সত্যি তাই, বাড়তি লোক হয়ে গেছি, এটা তো অপরাধ। ওদের অনেক লোকসান হচ্ছে, ভি. আর. এস নিয়ে ওদের অনেক পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম, চিন্তা দূর করে দিলাম—তারপর আরেকটু হেসে বলে, আসলে ওরা কেউই বুঝতে পারেনি বিজ্ঞান কোনদিকে যাচ্ছে, অর্থনীতি তো নয়—সব দোষ এখন আমাদের ওপর চাপাচ্ছে, শ্রমিকরা কাজ করছে না—

সুমিত্রা ধৈর্য হারায়। বলে, এসব বক্তৃতা ময়দানে ঝাড়ো না বাবা—

রাজনীতি করতে বলছ—ভি. আর. এস নিলাম এজন্য—অফিস পলিটিকস আর ভাল লাগছিল না—

এবার সুমিত্রা ঝেঁঝে বলে, আমি বাপু শুনিনি, কে কি বলল তার ওপর অভিমান করে কেউ চাকরি ছেড়ে দেয়—।

বেশ নরম চোখে তাকায় সুমিত্রার দিকে। বড় সরল মুখ সুমিত্রার। বলে, জানো কাল কী স্বপ্ন দেখলাম—

আমি কী করে জানব তুমি কী দেখলে। কী স্বপ্ন দেখেছো তা দেখতে পেলে তো ভালই হত—

শোন, এসব রাখো, যা দেখলাম তা বলি—সুমিত্রার এসব শোনার কোন আগ্রহ নেই। সে বলে, কাউকে কিছু কি বলেছ—

কী বলব—অবাক হয়ে বলে।

পার্টটাইম চাকরি টাকরির কথা—

কেন, আমি তো চাকরিই ছেড়ে দিলাম, চাকরি করব না বলে—

সুমিত্রা তার আহাম্মক স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, তবে কী ব্যবসা কববে—ব্যবসা, না—

তবে কী করবে—

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। যতই হালকা হয়ে থাকতে চাইছে সুশান্ত ততই ব্যাপারটা

এক অস্বস্তির দিকে চলেছে। তবু ব্যাপারটা নিষ্পত্তির জন্য বলে, বই পড়ব, শুধু পড়ব—

বাড়িতে একটা মেয়ে বড় হচ্ছে তা খেয়াল আছে—

থাকবে না কেন, বিয়ে তো, টাকা তো রয়েছে, ওর পড়া শেষ হোক—

আবার ধৈর্য হারায়। খাটে বসে বলে, তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে—

—সবাই পারে সুমিত্রা, বড় ক্লান্তিতে চোখ বোজে। চোখ বুজলেই আজকাল চোখের সামনে বই ফুটে ওঠে। সে ঠিক করে উঠতে পারে না কোন বই পড়বে। কোন বই পড়া শুরু করলে শান্তি পাবে। কত মায়া তার বইগুলোর ওপর। লেখকদের নাম মনে পড়ে। কত লেখকের আজ পর্যন্ত ছবি দেখেনি। নাম জেনেছে কেবলমাত্র। সুমিত্রা কী সত্যি বিশ্বাস করবে বাকী জীবন বই পড়ে কাটিয়ে দিতে চায়। সুশান্ত বোঝে, সুমিত্রাও বড় একা। এই একাকীত্ব সেই বা কী করে দূর করবে। কী চায় ও। তার সামর্থ্য তো জানে সে। টাকাপয়সা কোন কিছু গোপন নেই। চাকরী থেকে আর কী পেতে পারত সুশান্ত! এদেশটা ভারতবর্ষ, সে বাস করে পশ্চিমবঙ্গে, জৌলুসময় জীবন বা জেল্লাময় জীবন তার আর ইহজীবনে হবার নয়। এক ব্যর্থ জীবনই বয়ে যেতে হবে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত। সুমিত্রা আর টুকাইয়ের জন্য বেঁচে থাকতে হবে। শুধু কী তাই, এক পরাধীন জীবন। নিজের জন্য যতটা না বাজে তার চেয়ে অনেক বেশি বাজে সুমিত্রার জন্য। সুমিত্রা তো তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছিল। কী করে জানবে কী তার স্বপ্ন ছিল। একদিন বলেছিল, ওর ঘুড়ি ওড়ানো বড় শখ, ঘুড়ি বানাতে চেয়েছিল। বেশ কিছু চিন কাগজ, কাঠি এনে দিয়েছিল সুশান্ত, আঠা বানিয়ে তিনজনে ছাদে গিয়ে ঘুড়ি বানায়। একটি ঘুড়িও আকাশে ওড়েনি। দেয়াল জুড়ে সাজিয়ে রেখেছিল সুমিত্রা।

(৩)

সুশান্ত ভি. আর. এস নেওয়াতে কেউই খুশি হয়নি। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি এমন করে তুলেছে সবাই, আর এ পরিবেশের জন্য কে বা কারা দায়ী এ নিয়ে অজস্র বিতর্ক হতে পারে কিন্তু পরস্পরের ওপর দোষারোপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। কারো সঙ্গে কথা বলার লোকও পায় না সুশান্ত। এই তো রোহিত বা স্বপনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়েছে, আগে কত সহজভাবে ওরা ওদের মত ব্যক্ত করেছে, আজ কেমন গুটিয়ে কথা বলছে। যেন ওদের কথা কোথাও বলে দেবে সুশান্ত। আর সুশান্ত বলে দিলে ওরা অনেক জটিল অবস্থায় পড়বে। সুশান্ত যেন শত্রু শিবিরের লোক। একথা সত্য বই পড়বে বাকি সময় এরকম ভাবনা নিয়েই সে ভি. আর. এস. নিয়েছে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে না। নির্ভেজাল আড্ডা দেবে না। আর চায়ের দোকানে তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাব কথা বলবে না। সে তো রাজনীতি করে না, কোন দলের সদস্য নয়, কোন দল এলে গেলে তার অর্থনৈতিক বা সংস্কৃতিগত কোন উত্থান পতন হবে বা সে কোন কেউকেটা হবে এমন সম্ভাবনা নেই। সাদামাটা সাধারণ মানুষ সে। হ্যাঁ, মোটামুটি ভাল ছাত্র সে। তবে বড় চাকুরে সে নয়, চাকরি বা সামাজিক জীবনে কোন সাফল্য নেই। সাফল্যহীন পুরুষ বা সমাজের অজ্ঞাত পুরুষ হিসেবে কাটিয়ে এসেছে। আপশোষ, বেদনা থাকলেও কখনো বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়নি তার মনে। এই চুয়ান্ন বছরে এসে সে শূন্য চরাচরে এসে দাঁড়ায়। কে যেন ডাস্টার দিয়ে জীবনটা মুছে দিল। ছায়া নৃত্যের মত বা সেল্যুটের

মত তার প্রাইমারিস্কুল, হাইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ছেলেমেয়েদের সে দেখে। কতজন তার স্মৃতিতে আসেনি তার হিসেব করতে পারে না। যাদের কথা মনে আসছে তাদের কথা ভাবতে ভাবতে কেটে গেল সকাল, দুপুর, বিকেল এবং রাত। টুকাই এসে বলে, বাবা এভাবে বসে বসে তুমি যেমন পাগল হয়ে যাবে, আমরাও তো হতাশ হয়ে পড়ব—মায়ের দিকে একবার দেখেছো—

টুকাইয়ের দিকে তাকায় সুশান্ত। একবার ভাবে, এ মেয়ে তার সারা জীবন ধরে এক ব্যর্থ বাবাকে দেখতে দেখতে সেও উজ্জীবিত হতে পারেনি, শুধুমাত্র পড়াশুনায় ভাল, ভাল রেজাল্ট করেছে মাত্র, বড় বেদনা নিয়ে বেঁচে আছে—প্রতিটি জায়গায় সে দেখেছে তার বাবার কোন অস্তিত্ব নেই—টুকাই যখন তার বাবার কাছে এসেছে, অনুকম্পা নিয়ে এসেছে। গলাটা বেশ ভার হয়ে এল।

টুকাই বলে তুমি বড় সেকেলে, সবসময় ভাব ভবিষ্যতে কী হবে, কী হবে—

মৃদু হাসল সুশান্ত তার এই সরল মেয়েটিকে দেখে। পাশের চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে। টুকাই বসল বাবার পাশে।

বেশ হালকা ভাবে বলে, পড়াশুনা শেষ হলে কী করবি—

কেন সবাই যা করে—

দুমাস বাদে তার মেয়ে একুশ বছরে পড়বে। বলে, তোর মা তো বিয়ে বিয়ে করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে—

ও মার কথা ছেড়ে দাও—

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় হাসে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে দূরের আকাশের দিকে। লোকে বলে সীমাহীন আকাশ। সত্যি কী তাই ঐ নীল রংটাই তো চোখ আটকে দেয়। ঐ নীল রংটাই তো আকাশের সীমানা। ছোটবেলা থেকে মনে হত এই নীল রংটা সে পেরিয়ে যাবে। ঐ রংয়ের বাইরে সে যেতে পারেনি। বলে, তোর মাতো ঠিকই বলে বোধহয়—তবে আজকাল মনে আসে তোর মা বিয়ে করে কী পেল—

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে টুকাই। তবু বলে, সে কথা মাকেই জিজ্ঞেস কোর—

কিন্তু তা না হয় করব। কিন্তু আমি তোর কাছে জানতে চাই তুই এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু ভাবিস কিনা।

আমি সাধারণ মেয়ে, সাধারণ ভাবেই বাঁচতে চাই—

আমিও তো তাই চেয়েছিলাম, তা আর পারলাম কই—

টুকাই কি বুঝল কে জানে। কোন উত্তর সে দিতে পারে না। সে শুধু বুঝতে পারে বাবা এক গভীর যন্ত্রণায় রয়েছে। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই। বাবার একটা নেশা দরকার। এ নেশা তাদের পরিবারের কতটা সর্বনাশ নিয়ে আসবে কে জানে। বাবাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে এভেবে টুকাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

পিঠে হাত রাখে সুশান্ত। হাত বুলিয়ে বলে, ভয় কিসের, আমি তো আছি—

তবু টুকাই কাঁদতে থাকে। গাঢ় রাতের আলো ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে দুজনকে।

(৪)

যে কোন রাষ্ট্রেরই নাগরিক হতে পারত সে। ভারতের নাগরিক হয়েছে বলে যে আলাদা গর্ববোধ করে তা নয়। ভারতের নাগরিক বলে যে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধে

পেয়েছে তাও নয়। তবে যেদিন থেকে সে পড়াশোনা শুরু করেছে সেদিন থেকে ভারতকে ভালবাসে। মারডেকায় ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুটবলে। বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ার মিছিলে যোগ দিয়েছিল। ওঃ পেতে রাতে শুনেছিল ইংল্যান্ডকে টেস্টে ভারত হারাচ্ছে। বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত কপিলদেবের নেতৃত্বে। পটকা ফাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে উল্লাস করেছে। কাশ্মীর নিয়ে এত তাণ্ডব হচ্ছে এজন্য সে ব্যথিত। এ প্রদেশটি ভারত থেকে ছিনিয়ে কেউ নিক এ চায় না। এ দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশ এজন্য তার গর্ববোধ রয়েছে। হিন্দুদের কুসংস্কার নিয়ে কেউ বললে ভালই লাগে কিন্তু হিন্দুদের খাটো করে যখন অন্য ধর্মকে বড় করতে চায়, তারা সাম্রাজ্যবাদকে রাস্তা করে দেয়, তখনো তার মনে লাগে। নাস্তিক মানুষ সুশান্ত, আধুনিক মানুষ সুশান্ত, নিরপেক্ষ মানুষ সুশান্ত। সে কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না। ভোট সে দেয়, সম্পূর্ণ ইস্যু ভিত্তিক। স্বাধীনতার পক্ষেই সে ভোটটি দেয়। রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতাদের সে কখনো বিশ্বাস করে না। সে জানে এরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকার জন্য মিথ্যাচার করে। মিথ্যাচার করতে করতে মাঝে মাঝে নাগরিকদের দুয়েকটি অধিকার আদায় করে দেয়। এই অধিকার পেতে পেতে এতদূরে তো এসেছে। তাই কোন রাজনৈতিক দলই চূড়ান্ত নয়। এ চূড়ান্ত ভেবে নেওয়াটা বড় বিপদ। এ বিপদ ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের। অধিকারও হারাচ্ছি আমরা। ভি. আর. এস নিয়েও শান্তিতে নেই সুশান্ত।

যত সহজে বই পড়বে ভেবেছিল সেটা আর হয়ে উঠছে না। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে, বই পড়া নিয়ে এত উদ্বেগ করে কী লাভ। একটা দীর্ঘ সময় তো সামনে রয়েছে। আর যদি মরে যায়, মৃত্যু পর্যন্ত একটা আতঙ্ক থাকবে। এই আতঙ্ক ও ভীতি থেকে তার রেহাই নেই। মৃত্যুর পর, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। কিসেরই বা মুক্তি। আবার সত্যিই কী সে বই পড়ার জন্য অবসরের আগে অবসর নিয়েছে। ঢিমে তালেই তার পড়া চলছে। কী পড়ছে সে। উপন্যাস। তার প্রিয় বিষয়গুলো করে শুরু করবে। আজই শুরু করবে। প্রাইজ থিয়োরি, স্ট্যাটিস্টিকস। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এসব সে চর্চাই করেনি। খাতা কলম নিয়ে পড়তে বসে সুশান্ত। ছাত্রের মত। সুমিত্রা দেখে কাগজ কলম নিয়ে পড়ছে সুশান্ত। এসে বলে, তুমি কী তোমার যৌবনে ফিরে যেতে চাইছ—

না, এসব ভুলে গিয়েছি তাই একটু রপ্ত করে নিচ্ছি—

আমি ভাবলাম তুমি ঠাকুর দেবতার বই পড়বে—

ঠাকুর দেবতার বই, কেন—

বয়স হয়ে গেলে লোকে তাই তো করে জানি—

হেসে ফেলে, সে যুগ আর নেই, বিজ্ঞানের যুগ, আধুনিক যুগ—

—কিন্তু মৃত্যু কী করে ঠেকাবে, কেমন করে—

ঐসব পড়লে ঠেকাতে পারব—

না, তবে অজানা কল্পনায় আনন্দ পেতে পারো—

পুনরায় সুমিত্রার কথায় হাসল সুশান্ত। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মোহ তৈরি হল। ও কী ঐ চোখের জন্য অপেক্ষা করেছিল। ঐ সুমিত্রাই বা এল কেন। অন্য কেউ এলে তো পারত। শুধু যেন এক চান্স। প্রবাবিলিটি! কলমটা তুলে তাকাল তার ডগায়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ভাবে সে কিসের জন্য অপেক্ষা করছে। চোখ বুজে সুমিত্রাকে বলে, বল তো আমি এখন কী করতে পারি—

আমি আবার কী বলব—

তুমি একটা সাজেস্ট কর—

আমার চেয়ে কত বেশি জান—

এখন আমার জানার মূল্য রাষ্ট্রের কাছে শূন্য। রাষ্ট্রের কাছে আমি ভস্ম—আমার কাছে তো তুমি ভস্ম নও, তুমি আমার স্বামী, তুমি টুকাইর বাবা—

চোখবুজে সুশান্ত বলে, যা সব টাকা পেয়েছি দুজনকে ভাগাভাগি করে দেব, আমার ওপর তোমাদের নির্ভরতা তৈরি হয়েছে সেটা চলে যাবে—।

সুমিত্রা ভাবে এখন তার কিছু বলার নেই। এত ভারি ভারি নাটকীয় কথা তার কোনদিনই ভাল লাগে না। সুশান্তকে বহু কারণেই অপছন্দ যেমন হয় আবার কেমন মায়াও তো হয়। বাড়িতে ঠিক সময়ে না এলে নানারকম দুর্ভাবনায় বুকটা কেমন ধুকধুক করে ওঠে। এ লোকটা তাকে বেশ কিছু অধিকারও তো দিয়েছে। হাতেব দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে, পরনের যে শাড়িটি তাও তো একটা অর্থ আছে। আজ যা কিছু রান্না করেছে তাতেও এ লোকটির উপস্থিতি রয়েছে। তেতাল্লিশ বছরে সেও শরীরী সান্নিধ্য পায়। এত কিছু ভাবতে ভাবতে সুশান্তর কাঁধে হাত রাখল। তার স্পর্শে একটু কেঁপে উঠল সুশান্ত। বুঝতে পারে এ হাত ভয়ের হাত। হাতটা ধরে সুশান্ত। একটু জোরে। ভাবে এ বয়সে কী প্রাইস থিয়োরী পড়ার বয়স। তার প্রিয় বিষয় ইকোনমিক্স উড়ে উড়ে কোন শূন্যতে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে সে শুধু সুমিত্রার স্পর্শ পেতে চাইছে। শুধু সুমিত্রার স্পর্শ। তার প্রিয় বিষয় ইতিহাস, সোস্যাল স্টাডি, দর্শন। সব বই উড়ে উড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। আলমারি কী শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সে শুধু সুমিত্রার হাতটা ছুঁয়ে রয়েছে। সুমিত্রার উষ্ণতা শিরায় শিরায় বয়ে আসছে। সুমিত্রার স্পর্শ।

শীতল যুদ্ধ

কিন্নর রায়

জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন মৌসুমী মেঘ, বাতাস এবং ধারাবর্ষণে সমস্ত চরাচব জুড়িয়ে যাওয়াই প্রথা, সেই বাৎসরিক সংস্কারে এবছরই কোনো এক ব্যতিক্রম। আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতেই মেঘদূত সংবাদ দিয়েছিল বর্ষণের, মহানগরীর রাস্তা ভিজেছিল শুধু, মানুষ জুড়োয় নি।

আর তারপর কয়েকদিন ধরেই সমস্ত আকাশে এক নিরবচ্ছিন্ন গোধুলি। সকাল থেকে পৃথিবীর ওপর ঝুলে থাকে এক ম্লান আলোর চাদর। অথচ এই রঙে, গোধূলিবর্ণে, কোনো রোমান্টিক-প্রতিমা ফুটে ওঠে না। বরঞ্চ এ আলোয়, এই প্রাকৃতিক বিন্যাসে দম ধরা ভয়ার্ত কোনো সময়ে সুর্যনেভা ছবি।

গরম তাপ উগরে দেয় আকাশ, মাটি। তাপ ছড়ায় চারপাশে। এবং মানুষ ক্রমাগত হা-বৃষ্টি, হা-জল, হা শান্তি করতে করতে ক্লান্ত, অবসন্ন আর প্রায় অসুস্থ হয়ে ওঠে।

ভাড়াটে বাড়ির এই দোতলা ব্যালকনি থেকে সামনে অনেকটাই খোলা আকাশ এবং জমি। গুল কারখানার ফাঁকা জমির ওপর রোদের তাপ শুষে নিতে নিতে গুলেরা ক্রমাগত শুকনো হয়ে ওঠে। যদিও ধোঁয়াহীন কোক-কয়লার ব্যবসায় এখন আর তেমন রমরমানি নেই, তবুও যারা এখনও কারবারের লাইন বদলাতে পারেনি, তাদেব কাছে এ আয়োজনই লক্ষ্মীসম। আরও একটু দূরে মাদার ডেয়ারির পুরনো প্ল্যাস্টিক প্যাকেট থেকে কি কি সব তৈরির শেড। এপাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানোব জায়গা। সারা দিন এবং রাতেও কলকাতার পরিবহন সমস্যায় কিছু সমাধান করে গভীর রাতে এই নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ির থেমে যাওয়া। তখন তার হেডলাইটের আলো, যান্ত্রিক হাঁকডাক এই পাড়ার স্থবির নৈঃশব্দকে ফালা ফালা কবে দিয়ে যায়। চোলাই ঠেক থেকে ফিরতে ফিরতে যে দু চারজন ঘর ফেরা মাতাল রাত জাগা দিশি সারমেয় বাহিনীর চিৎকার আর তাড়াকে সামাল দিতে দিতে হেঁটে আসে, তাবাও এই আলো, এই যান্ত্রিক ঘরঘরানিতে ক্ষণিকের জন্যে ফ্রিজশট হয়েই আবার নিজস্ব রাস্তায় অভ্যেস মতোই পা বাখে।

দোতলায় দুখানা খুপরি ভাড়াঘর, ব্যালকনি, কোনো কিছুই ভাড়া দেযাব প্ল্যান মাফিক তৈরি হয় নি। অথচ আর্থিক সংকট বাধ্য কবে ভাড়াটে বসাতে। বাথরুম, পায়খানা কমন, ইলেকট্রিকের মিটারও একসঙ্গে। রান্নার ব্যবস্থা একতলায়—সিঁড়ির নীচে। বাড়িওলা এবং ভাড়াটে—উভয়পক্ষের সুবিধে-অসুবিধেব এই যে টানা-পোড়েন, তাব মধ্যেই ভাড়ার বিনিময়ে আশ্রয় সন্ধানী মানুষ আসে, বসে যায়।

তখন রাত প্রায় দশটা। কেব্‌ল ফল্‌টেব জন্যে সকাল থেকেই বিদ্যুৎ অনুপস্থিত। ফোন করে, মুখে মুখে সংবাদ পাঠিয়েও এখনও এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় নি। পাশাপাশি দুটো দশ বাই বাবো আব আট বাই দশ ঘবেব ভেজানো দরজা থেকে যে ক্ষীণ, হলদেটে, মোমবাতিব বেখা, তা বাইবের অন্ধকাবের স্থাপত্যে নীরবে মিশেছে কোনো মাত্রা যোগ না করেই।

এই দুই ঘরে মাস আটেক আসা সিদ্ধার্থ এবং মল্লিকাব বিবাহ বা বেজিস্ট্রি ছাড়া সহবাস এখন যেন বা বরফ-শীতল অবস্থানে। একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সোজা

উঠে এলে বাঁদিকের যে হলুদ পর্দাঅলা ঘর, সেখানেই সিদ্ধার্থের আপাত অবস্থান। ডান দিকের ঘরে নীল পর্দা, সেখানে মল্লিকা। আবার কখনও যুগ্ম সম্মতিতে দুজনে একই ঘরে, হলুদ নীলের সীমানা মুছে দিয়ে।

এই মোমবাতি আলোকিত অন্ধকারে সিদ্ধার্থ একলাই তার শোবার চৌকির ওপর আধশোয়া হয়ে একটি লিফলেট ফাইনাল ঘষামাজা করছে। সম্প্রতি ঔরঙ্গাবাদের বাঘৌরা এবং দালালচকে রাজপুত ও যাদবের যে বর্ণ-সংঘর্ষ, এবং ক্রমাগত হত্যা, তাকে ঘিরেই গড়ে উঠছে এ রাজনৈতিক ইস্তাহারের শরীর। মোমের নরম আলোয় লিখতে লিখতে কখনও শুয়ে পড়া, কখনও উবু হয়ে বসা সিদ্ধার্থের ছায়া দেয়ালে মাঝে মাঝেই এক নতুন নতুন চেহারায় বিঁধে যাচ্ছিল। পাশে সস্তা কাঠের টেবিলে কমদামী ছাইদানির বুকে সিগারেট পুড়তে পুড়তে ছোট হচ্ছিল। অনেকটা ছাই জমে জমে পাল্টে যাচ্ছিল সিগারেটের রং। ধোঁয়া বড় ধীরে মিশছিল মোমের আলো লাগা অন্ধকারে। গত দু-তিন দিনের ইংরেজি কাগজ ছড়ানো মেঝের ওপর। বিছানায় দেশলাইয়ের পোড়ানো কাঠি, চা-খাওয়া কাপ প্লেট, মাটির ভাঁড়, মুড়ে ফেলে দেওয়া কাগজের ঠোঙা, সিগারেটের খালি প্যাকেট সমস্তই অগোছালো।

সিদ্ধার্থের খালি গা, আলগা করে দেয়া পাজামার দড়ি আর এই ঘরের অবিন্যস্ত বিছানা, অজস্র অগোছালো বই এবং ঘরের কোণে ও পাখার ব্লেডে ঝুল-সবই এই মলিন আলোয় অন্য কোনো মায়া নিয়ে স্থির। বাইরে এতটুকুন হাওয়া নেই, সিদ্ধার্থ তার স্বাভাবিক শরীরী অভ্যাসে ক্রমাগত ঘামছিল। কপাল, ঘাড়, পিঠ কিংবা বাহু থেকে গড়িয়ে আসা জলরেখার আলো লেগে লেগে যে চিত্রকল্প, সেখানে বুঝি বা কোনো ক্ষীণ জলস্রোতের মায়া।

একই দেওয়ালের অন্য ঘরে মল্লিকা সন্ধ্যার পর তৃতীয় সিগারেটটি জ্বালল। বড় সিগারেটে আগুন দিয়ে বুক অব্দি ধোঁয়া নামাতে নামাতে মল্লিকা বইয়ের র‍্যাকের পাশে ক্রমাগত চলা টাইমপিসের দিকে তাকাল। রাত সাড়ে দশটা প্রায়। সিদ্ধার্থ ও তার একসঙ্গে থাকার চুক্তিমতো এতক্ষণে সিদ্ধার্থের রান্না করে ফেলার কথা। কিন্তু আজ সকালের কথা কাটাকাটি, আদর্শ থেকে পরে যা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে, এবং ইদানীং যা প্রায়ই ব্যক্তিগত কুৎসাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, সিদ্ধার্থকে বোধহয় এই প্রথম চুক্তিভঙ্গের অনুপ্রেরণা যোগায়।

একটু আগেই নিচের বাথরুম থেকে পা ধুয়ে এসেছে মল্লিকা। চুল না ভিজিয়ে তাকে একরকম স্নানই বলা চলে। ঘরের বাতাসে দামী সাবান, পাউডার আর সবে তেত্রিশ ছোঁয়া মল্লিকার গন্ধ। আর মল্লিকা এই মাথা না ভেজানো স্নানের পর বিছানায় সিগারেট ধরিয়ে কিছু আয়েশী মেজাজে তার স্বাভবণহীন শ্বেত শঙ্খ রঙের হাতের চামড়া এই ম্লান আলোয় দেখতে দেখতে কেমন অকারণেই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এখনও কলেজ খোলে নি, দু-এক দিনের ভেতরেই শেষ হয়ে যাবে গ্রীষ্মের ছুটি, তবুও সকাল থেকেই আজ ব্যস্ত ছিল মল্লিকা। চেতলায় একটি বধূহত্যা মামলায় অভিযুক্তদের জামিন না দেয়ার দাবি জানিয়ে আলিপুর জজ কোর্টে অনেকগুলি মহিলা সংগঠনের যে বিক্ষোভ ও মিছিল, তাতে মল্লিকা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই উপস্থিত ছিল। এখন আর কোনো সংগঠনের সঙ্গেই তার সদস্য হিসেবে যোগ নেই। কিন্তু সকলেই তাকে চেনে এবং ডাকে। পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে যে কোনো বিদ্রোহেই মল্লিকা পুরোগামিনী। তার সঙ্গে তখন সবে

বিপুলের বিবাহ না করে এক সঙ্গে থাকায় দাঁড়ি পড়েছে।

বব করা চুলের একটি দুটি ঘাড়ের কাছে পাউডার ফুঁড়ে ফুটে ওঠা ঘামের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া অভ্যন্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার ফিরে আসছিল বাতাসে। আঙুলের আনমনা টোকায় ছাই ঝরে পড়ল মেঝেয়। বাঁ হাতে কপালের ওপর এসে পড়া ঈষৎ খয়েরি কেশগুচ্ছ যেন বা অবহেলাতেই সরিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা এক পা মুড়ে, এক পা সোজা করে তার যে বসার ভঙ্গি, তার মাত্রা পাল্টে দিয়ে দুটো পাই মুড়ে বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার এপাশে ওপাশে সিগারেটের লালচে আগুন বড় ধীরে রং ছড়াচ্ছিল। শাদা ত্বকে যেন বা কোনো পুরনো দগদগে ঘা।

বাঘৌরা, দালাল চক হত্যা নিয়ে সিদ্ধার্থ তার সংগঠনের লিফলেট শেষ করতে করতে ঘড়ির কাঁটা সময়ের হিসেবে রাত এগারোটা পার করে দিয়েছে। এই বিদ্যুৎ-বিহীন অন্ধকার, গরম, মশার আক্রমণ, মল্লিকার সঙ্গে সকাল থেকে তীব্র কথা কাটাকাটি সিদ্ধার্থকে কিছু কোণঠাসা করেছে।

আসলে তার ও মল্লিকার এই চুক্তিবদ্ধ যৌথ-জীবন ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে সিদ্ধার্থের কাছে, হয়ত বা মল্লিকারও। আশির দশকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই সিদ্ধার্থ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিল। তার কোনো ষাট বা সত্তর দশকের অতীত নেই। বছর পঁচিশের বয়স্ক সিদ্ধার্থ এই দর্শন এবং মল্লিকা—একই সঙ্গে দুটিকেই ছুঁতে পেরেছিল। তার সঙ্গে মল্লিকার আলাপ সেই তো বোম্বের সুতোকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এক সভায়। এবং তারপর ক্রমাগতই অন্ধ্র, বিহার-এর কৃষক, হরিজন হত্যার বিরুদ্ধে সমাবেশে, কখনও কোনো নারী নির্যাতন বিরোধী সেমিনারে। মল্লিকা, একা মল্লিকাই তো তখন সকলকে ছাড়িয়ে এক অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব।

আমরা এক বছর এক সঙ্গে থাকব দুজনে, শুধু দুজনেই, কোনোভাবেই তোমার মা-বাবার সঙ্গে নয়, কারণ প্রত্যেক মানুষই ইনডিভিজুয়াল ইউনিট, আর এই থাকা হবে সবরকম বিবাহ বন্ধনহীন, না লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, না রেজিস্ট্রি, আমাদের দুজনেরই আলাদা ঘর থাকবে, শরীর সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণভাবেই দুজনের স্মৃতির ওপর। বিছানায় নারী মানেই মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই ধর্ষণ, যেন বা বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি কখনও কখনও—পুরুষদের এ অত্যাচার আমি কোনো দিন মেনে নেব না সিদ্ধার্থ। আর কোনোভাবেই আমি সন্তান ধারণ করব না—মা হবো না।

মল্লিকার এই শেষ কথাটুকু শুনে সিদ্ধার্থের চমকে ওঠা। মল্লিকা যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছিল, শারীরিক গঠন আলাদা বলেই কোনো নারী কেনই বা শুধু পুরুষের বীর্য এবং তার ফল সন্তান বহন করে বেড়াবে? এই বহনের ক্লেশ তো তার একারই। সুতরাং, সন্তান নয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে অ্যাডপট করা যেতে পাবে—হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে দিতে দিতে কাটা চুল কপাল থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে বাঁ হাত একবার জিনসের ব্যাক পকেটে ঢুকিয়েই বের করে এনে মল্লিকা সিদ্ধার্থকে এইসব শর্তের সঙ্গে একবেলা রান্নার শর্তও জুড়ে দিয়েছিল। ওর মর্নিং কলেজ, সুতরাং সকালে সিদ্ধার্থ। বিকেলে মল্লিকা।

মাস আটেক আগে এক শীতের কুয়াশামাখা সন্ধ্যায দু-হাজাব টাকা অ্যাডভান্স, সঙ্গে এক মাসের তিনশো টাকা বাড়ি ভাড়া গুনে দিয়ে সিদ্ধার্থ আর মল্লিকা একই ছাদের নিচে

চলে আসতে চেয়েছিল। বাড়ি দেখানো দালালটিকেও দিতে হয়েছিল তিনশো টাকা।

দক্ষিণেশ্বরে ছোট একতলা ভাড়া বাড়িতে সিদ্ধার্থর বাবা, দাদা-বৌদি, তাদের একটি সন্তান ও ছোট বোন সম্বন্ধে কোনো দিনই মল্লিকা তার কৌতূহল বা জিজ্ঞাসার অ্যান্টেনা বাড়িয়ে দেয় নি। তার নিজের বিধবা-মা ছোট ভাই নিয়েও কোনো স্নেহের জায়গা আছে বলে কখনও মনে হয় নি সিদ্ধার্থর। কেমন যেন ফর্মাল সব কিছু। কলেজ, নারী-মুক্তি, পুরুষের অত্যাচার—এসব নিয়েই ব্যস্ত মল্লিকা।

এই আট মাসের ভেতর সেভাবে কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণেও তাদের যাওয়া হয় নি। হয়ত নেহাতই এড়িয়ে যাওয়া, নাকি অস্বীকার করা সমস্ত রকম স্থিতি-স্থাপকতা। মল্লিকার এই মানসিক স্তর আজও বুঝে উঠতে পারে না সিদ্ধার্থ।

শরীর-সম্পর্কের ব্যাপারেও মল্লিকা স্পষ্ট উচ্চারণে জানিয়ে দেয়—আর এ জানিয়ে দেয়া তার বহু আগেই—বিছানার স্বাধীনতাও পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অন্যতম অর্জনের বিষয়। মার্কসবাদ, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের ছবি থেকে উঠে আসা সামগ্রিক চিত্রমালা সিদ্ধার্থকে ইদানীং মল্লিকার যাবতীয় বিষয় নিয়েই ধন্দে ফেলে। নারী শুধুমাত্র খুশিমতো পুরুষসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতায়, খোলাখুলি সিগারেট এবং মদ্যপানে, চুল কেটে, জিনস পরে মুক্তিব দরজায় পৌঁছতে পারে কিনা, তা নিয়ে সিদ্ধার্থর সংশয় বাড়ে। আর-এ যেন তাকে এক দার্শনিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

পৃথিবী জোড়া ফেমিনিস্ট আন্দোলন, ব্রা পুড়িয়ে ফেলা, পুরুষের সঙ্গে বিবাহে অস্বীকার করা, সার্ত্র এবং সিমোনের বিবাহহীন দাম্পত্য—সেই সিদ্ধার্থের মানসপটে। কিন্তু এভাবেই কি নারী পারবে তার আবহমানের শেকল ছিঁড়ে ফেলতে?

পুরুষশাসিত সমাজে তাকে পদে পদে বেঁধে রাখার জন্যে যে চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই সব প্রতিবাদেই কি আসবে সার্মগ্রিক মুক্তি? নাকি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন, ভিয়েতনাম বা আলবেনিয়ার মতো সামাজিক মুক্তির সামগ্রিক ফল পাবে নারী ও পুরুষ? এই দ্বন্দ্বে এই তীব্র দ্বন্দ্বে কাটে কাল। আর এই অভ্যাসে আট মাসের বিবাহহীন দাম্পত্যে—হয়ত বা দাম্পত্যের ট্রায়ালে মল্লিকা ক্রমাগতই সিদ্ধার্থের দোষ অস্বীকার করে। এবং সিদ্ধার্থও মল্লিকার। তাদের দাম্পত্য, শরীর-অভ্যাসে, অবসাদ, বিষাদ, বিষণ্ণতা এবং ক্বচিৎ আনন্দে যে সামগ্রিক সংসারের ছবি, তা কখনই ফুটে উঠতে দেখে নি সিদ্ধার্থ। হয়ত সে এ-ই চেয়েছিল। এবং মল্লিকাও।

সন্তান কামনায় কোনো দুর্বল মুহূর্তে সিদ্ধার্থের আকুলতা—মল্লিকা প্রথমে গাঁইয়া, মফঃস্বলী, অনাধুনিক, পরে পুরুষের আক্রমণ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। আর চুক্তি ভঙ্গ হচ্ছে—এমন অনুশাসনের ধমকও ছিল তার গলায়। আর সিদ্ধার্থ শীতের সরীসৃপ হয়ে গুটিয়ে ছিল নিজেকে নিজেরই ভেতরে।

সিদ্ধার্থ তো সেই যুগকে মনে করতে পারছিল যখন বৎসরান্তে গর্ভবতী রমণী যেন বা পৌরুষেরই প্রতীক। তাব ফলে সন্তান সন্তান আর সন্তান। রক্তহীন, সূতিকায় ভোগা জননী ধীরে মৃত্যুর দরজায়। সেই—পাপ কি আজ প্রতিবাদ হয়ে ফিবে আসছে মল্লিকা, মল্লিকাদের কণ্ঠে? এর জন্যে নিশ্চয় দায়ী এক দশক, দু দশক পাঁচ দশক বা তারও আগের সিদ্ধার্থরা।

অথচ তাদের দাম্পত্যের বাগানে মাত্র একটি সন্তানই হয়ে উঠতে পারত সুগন্ধী পারিজাত। দুটি জীবনের ফাঁকে একটি রামধনু রঙ যোগচিহ্ন।

আজ সকালে নিজের সাংগঠনিক কাজকর্ম, টি-ভি-র জন্যে একটি অসমাপ্ত চিত্রনাট্য তৈরি করে ফেলার জন্যে প্রোডিউসারের তাড়া, এবং আজই দুটি বই রিভিউ দৈনিক কাগজে জমা দিয়ে আসার অঙ্গীকার সিদ্ধার্থকে রান্নাঘর বিমুখ করেছিল।

চিত্রনাট্যের খসড়া কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরই সামনের রাস্তা দিয়ে কেরোসিনের লরি গড়িয়ে যেতে দেখে মল্লিকা তাড়া দিয়েছিল। লরি পৌছনোর আগেই জনা তিরিশ-চল্লিশের খালি টিন, বোতল, প্লাস্টিকের জ্যারিকেন, ভাঙা ইট রাস্তায় লাইন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল। এরপর বই রিভিউ করতে হবে এবং জমা দিয়ে আসতে হবে দৈনিকের অফিসে, না হলে এ সপ্তাহে রিভিউ যাবে না এবং ফলে ঐ পাতার এডিটর বিপদে পড়বেন, এমন কমিটমেন্ট সিদ্ধার্থকে কেরোসিন লাইন থেকে ফিরিয়ে আনে। গ্যাস ফুরিয়েছে দিন দুই, ডবল সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা কোনোমতেই করে ওঠা যাচ্ছে না, এই সব প্রায় প্রাত্যহিক নাগরিক সমস্যার মধ্যে লেখালেখির এই চাপ সিদ্ধার্থকে বিরক্ত করে তুলছিল। তার কেরোসিন লাইনে না দাঁড়িয়ে ফিরে আসা, রান্নার উদ্যোগ নিয়ে রান্নাঘরে না যাওয়া, সবই মল্লিকাকে করে তুলেছিল রাগী। তারপরই সেই অগ্নুৎপাতের শুরু। ক্রোধী বাক্য বিনিময়। আদর্শ থেকে ব্যক্তিই হয়ে ওঠে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু।

সিদ্ধার্থ কি ভেবে রিভিউয়ের দুটো বই আর নোটস কাগজপত্র ব্যাগে ভরে হাজির করে গেছিল ধর্মতলা কফি হাউসে। নিরিবিলিতে একটা টেবিল টেনে নিয়ে তার সমালোচনার ইতি টেনেছিল, তারপর জমা দিয়ে আসা কাগজের অফিসে।

সিদ্ধার্থ কি তার অনিয়মিত রোজগার, পয়সা-কড়ির অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির জন্যেই ক্রমাগত আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে মল্লিকাকে? নাকি মল্লিকার স্বাধীন, ব্যক্তিত্বময়ী, আপাত-রুক্ষ চেহারা তাকে দিয়েছে কোনো মাতৃ-প্রতিম রূপকল্প, হয়ত সিদ্ধার্থের অজান্তেই। এমন যাবতীয় আত্ম-বিশ্লেষণই সিদ্ধার্থের অভ্যন্তরে।

রাজনৈতিক ভাবে আনডারগ্রাউণ্ডে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে যেভাবে সংগঠনের কাজে এগোচ্ছিল সিদ্ধার্থ, তাতে মল্লিকার সঙ্গে দেখা না হলে তার জীবনই বোধহয় পাল্টে যেত। একবার রাজনৈতিক ভাবে ভেসে ওঠার পর, এবং এভাবেই শহরে থেকে বিপ্লবী রাজনীতি চালানো যায়, এই মানসিক স্বস্তির অবস্থান নিয়ে বেঁচে থাকার যে অভ্যাস সিদ্ধার্থর, তা থেকে ফিরে আনডারগ্রাউণ্ড রাজনীতিতে ফিরে যাওয়ার মানসিকতায় এখন কেমন যেন স্থবিরভাব। একবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে, আবার সেই দুঃখ-কষ্ট এবং অনিশ্চয়তার পথে ফিরতে দ্বিধা থাকে এবং থাক রাজনীতি তো করছিই এমন ভাবনা তাকে থামিয়ে দেয়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যানের ব্লেডরা দৌড়তে শুরু করল। তার মানে বিদ্যুৎ এলো। পাখার হাওয়া সিদ্ধার্থের গায়ের ঘাম টেনে নিতে নিতে তার গোটা শরীরও জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। মোমবাতির হলুদ শিখা জোরালো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে এক সময় পোড়া, কালো পলতেকে সাক্ষী রেখে নিভে গেল, ধীরে। এ বাড়ির পেছন দিকে যে আর একটি দোতলা বাড়ি, তার বারান্দায় বদ্রি এবং চুনিয়া-মুনিয়ার খাঁচা। আলো জ্বেলে উঠতেই সমস্ত পাখির কল-কাকলি ভোরের আকাশ ভেবে নিয়েছিল বারান্দায় টিউব-জ্যোৎস্নাকে। আলোয় আলোয় ক্রমাগত ডেকে চলেছিল পাখিরা।

ক্লান্ত ক্ষুদার্ত, অবসন্ন সিদ্ধার্থ মশারি টাঙাবার জন্যে এই অন্ধকারে আলোর সুইচ

খুঁজল। তারপর সুইচে আঙুল ছুঁইয়ে ঘরে আলো ডেকে এনে মশারি গোছাতে গোছাতে, বিছানা ঝেড়ে নিতে নিতে, এবং অবশেষে নির্দিষ্ট হুকে দড়ি লাগাতে লাগাতে আপনমনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

অন্ধকার ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা। নানান ভাবনার টানাপোড়েনে তার যে কখন ঘুম এসে গেছিল টেরও পায় নি। ঘুম নয়, হয়ত বা ঘুমের প্রস্তুতি—যার অন্য নাম তন্দ্রা। মল্লিকারও খিদে পাচ্ছিল, রাগ হচ্ছিল এবং ক্ষোভও। তার সঙ্গে ছিল কিছু ক্লান্তিরও আবরণ। বিপুলকে ছেড়ে সিদ্ধার্থর কাছে এসে সে কি কোনো স্থায়ী ভূমির খোঁজ করেছিল? তার ফেমিনিস্ট আদর্শ, পুরুষ বিরোধী আন্দোলন—সবার ওপরেও কোনো মায়ায় যেন জড়িয়ে গেছিল কি সিদ্ধার্থ? নাকি এও তার আপাত-পুরুষ বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র!

প্যাকেটে আর সিগারেট নেই। অথচ মল্লিকার এখন সিগারেট-তৃষ্ণা। পেছন দিকের দোতলা বাড়ির ব্যালকনিতে আবার পাখিদের কলধ্বনি, ডাকতে ডাকতে থেমে যাওয়া। কেউ নিশ্চয় আলো জ্বেলেছিল, তারপর আবার নিভিয়ে দিয়েছে।

এখন অনেকটা রাত জাগতে হবে মল্লিকাকে। হয়ত অকারণেই, কিংবা কোনো জেদে। আলিপুরের জেলা শাসকের কাছে কাল ডেপুটেশন, চেতলার বধূহত্যা এবং অন্যান্য আরও বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধে। ডেপুটেশনের বয়ান তখনই তৈরি করবে মল্লিকা। অথচ কাল সকালেও তা করা যেতে পারত।

গরমে গা প্যাচপ্যাচ করছে মল্লিকার। মল্লিকা কি আরও একবার স্নান করে আসবে নিচের বাথরুম থেকে, টিউবওয়েল টিপে জল তুলে এনে?

একটা, একটা নয়, গোটা তিনেক সিগারেট হলে ডেপুটেশনটার বয়ান লেখা হয়ে যেত। পাড়ার দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। মল্লিকা কি সিদ্ধার্থের স্টক থেকে সিগারেট নিয়ে আসতে যাবে?

ঘরে আলো জ্বেলে, দরজায় ছিটকিনি তুলে, বড় আয়নায় নিজের তেত্রিশ বছরটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল মল্লিকা। তার আভরণহীন হাতে, খালি গলায় অলঙ্কার শূন্য কানের লতিতে যে নৈরাশ্য আর নৈরাজ্যের ছবি, তা দেখতেদেখতে ববকাট চুলে হেলায় হাত বুলিয়ে, সামনা সামনির পর পাশ থেকে নিজেকে আর একবার আয়নায় দেখল মল্লিকা। ঘরের টাইমপিস টিকটিক করে রাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ফ্যানের হাওয়ায় দুলে দুলে ঢেউ তুলছিল নীল পর্দা।

সিদ্ধার্থর ঘরে কি সিগারেট পাওয়া যেতে পারে এমন প্রশ্নের একটি পাতলা মেঘ মনের কোণে ঝুলিয়ে মল্লিকা শব্দ না করে দরজার ছিটকিনি খুলল। পর্দার আড়ালে দরজা রইল খোলা।

মশারি টাঙিয়ে, গুঁজে, চৌকি থেকে নেমে লাইট নেভাতে যাওয়ার আগে সিদ্ধার্থ টের পেল স্টিলের জগে জল নেই। বাড়ির টিউবওয়েলের জল খাওয়া যায় না। তার পাইপের গভীরতা নির্দিষ্ট চান, কাচাকাচি অথবা হাত পা ধোয়ার জন্যেই।

এখন সদরে চাবি পড়ে গেছে। চাবি বাড়িওয়ালার শোয়ার ঘরে। সুতরাং বাইরের টিউবওয়েল থেকে জল আনাও এখন অসম্ভব ব্যাপার। সারা রাত তৃষ্ণার গভীরে থাকার আশঙ্কা নিয়ে সিদ্ধার্থ একবার ভাবল মল্লিকার বন্ধ দরজায় টোকা দেবে কি না, আর তখনই তার মনে সকালের অপমান ঝংকার দিয়ে উঠল। মল্লিকার ক্রমাগত আক্রমণ

তার স্থায়ী চাকরিহীন ব্যক্তিত্বহীনতাকে, তার রাজনৈতিক-দর্শনের টালমাটাল অবস্থানকেও।

শুকনো ঠোঁট, পেটে ক্ষিদের তাড়না নিয়ে স্টিলের জগ মাটিতে নামিয়ে রেখে, লাইট নিভিয়ে কি ভেবে আবার লাইট জ্বেলে সিদ্ধার্থর শুয়ে পড়া। হলুদ পর্দা অল্প অল্প ঢেউ তুলছিল পাখার হাওয়ায়। কোলবালিশে পা তুলে দিতে দিতে সিদ্ধার্থ একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করছিল। তার দরজা ছিল খোলা।

দরজা বন্ধ করে মল্লিকাও বিছানায় বসে ডেপুটেশন লিখছিল, কাটছিল। কাচের কুঁজো থেকে একবার জল গড়িয়ে খেয়ে এসে তার চোখ আকাশে আটকে গেল। সেই গোধুলি বর্ণের সূর্য নেভানো আবরণ এখনও আকাশকে ঘিরে রেখেছে। তবে তার বর্ণময়তা এখন চোখে ধরা পড়ে কালচে রং হিসেবেই। কোনো নক্ষত্র বা চাঁদের দেখা নেই। চারপাশে গাছের পাতারা নিশ্চল। গুমোট, ভ্যাপসানো ভাব চারপাশে।

কি ভেবে মল্লিকাও যেন দরজার খিল, ছিটকিনি খুলল—বেশ শব্দ করেই। তারপর অকারণেই দুবার কাশল, গলা খাঁকারি দিল দরজার পাশে এসে। দোতলার সিঁড়ির মুখে কোলাপসেবল গেট বন্ধ, ছাদের সিঁড়ির দরজাও আটকানো, সুতরাং চোরেব ভয় নেই। পর্দা টেনে দরজা খোলাই রাখল মল্লিকা।

দু জোড়া খোলা দরজার আড়ালেই আধো ঘুমে, আর অনেক বেশি জাগরণে দু জন মানুষ তাদের নিজের নিজের দরজায় অপর হাতের কোনো টকটক ধ্বনির প্রতীক্ষায় থাকতেই লাগল, থাকতেই লাগল, থাকতেই লাগল।

ভালোবাসার ট্রাপিজিয়াম

শ্যামল মজুমদাব

বাতাসে ভাসছিল মনামী। চাবপাশ থেকে বঙিন আলোব ফোকাস পডছিল ওব শবীবেব ওপব। আব সেই আলো ওব শবীব ঢাকা চুমকি বসানো সাদা ফ্রকেব থেকে লক্ষ আলো হযে ঠিকবোচ্ছে। অনেকটা নিচে চেযাব, গ্যালাবি ভর্তি অসংখ্য দর্শক। ওদেব মাথাব ওপব যে বিশাল শূন্য যেখানে ভাসতে ভাসতে ট্রাপিজেব খেলা দেখাচ্ছে। নিজেব শবীবেব ব্যালেন্সে পেবিযে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্য দিক। এক দোলনাব থেকে আব এক দোলনায, আলো আব বাতাসেব ভেতব পিছলে পিছলে।

এভাবে খেলতে খেলতে সকলেব চোখেব সামনে নতুন একটা পৃথিবী তৈবি হযে যাচ্ছিল। সেই পৃথিবীতে মনামী ভাসতে ভাসতে রুদ্রাশিসেব দিকে উডে গেল।

দোলনাব বড পাযে চেপে ধবে উল্টো কবে দুলতে দুলতে দুহাতে মনামীব হাত দুটো লুফে নিল। তাবপব দুজনেই দুলতে লাগলো বাতাস কেটে কেটে। খুব সাবধানে ঘাড উঁচু কবে তাকাতেই হাতে চাপ দিযে ইশাবা কবলো রুদ্রাশিস। ভেতবে ভেতবে দারুণ হাসি পায় মনামীব। হাসতে হাসতে দুজনেই মাথাব মধ্যে ফুলেব বাগানেব একটা দৃশ্যেব পট ভাঙতে থাকে। দুজনেবই মনে পডে।

হাসতে হাসতে হাত ছাডিযে নেয মনামী। তাবপব অসংখ্য ফুলেব মাঝখান দিযে হেঁটে যায।

পার্কটা বেশ বড। পার্কেব একদিকে অদ্ভুত সব ফুল সাজানো হযেছে। পার্কেব নিজস্ব স্থাযী সব বড বড গাছে বং কবা। ফুলেব প্রদর্শনী হচ্ছে এখানে। দূব দূব থেকে টবে কবে সব বিখ্যাত ফুলেবা এসেছে। সাদা কাপডে মোডা উঁচু উঁচু সব আসনে শোভা পাচ্ছে তাবা। স্টিবিওতে হালকা সেতাবেব সুব। একটু দূব থেকে মনামী জিজ্ঞেস কবলো রুদ্রাশিসকে, ওটা কি ফুল?

চন্দ্রমল্লিকা।

– সে তো সবাই জানে। ঠোঁট ওল্টায মনামী, কিন্তু কি চন্দ্রমল্লিকা?

-জানি না।

—কোবিযান। হাসতে থকে মনামী, তুমি পাবলে না।

চাবদিকে ছডিযে ছিটিযে লোকজন।

খুব হালকা ফুলেব গন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে একগুচ্ছ ফুলেব দিকে আঙুল তুলে হঠাৎ বলে ওঠে রুদ্রাশিস

ওটা কি ফুল?

প্রথমেই জিভ কেটে মুখে শব্দ কবে মনামী। তাবপব বলে, ওভাবে কোন ফুলেব দিকে আঙুল তুলে কিছু বলতে নেই। তাহলে তাডাতাডি ফুল ঝবে যায।

সবি।

আঙুল গুটিযে মুঠো কবে হাত ফুলেব দিকে উঁচিযে এবাব মনামী বলে কোন ফুল এটা?

হাঁ।

—ওগুলো তো এন্টিরিনাম।

রুদ্রাশিস পুলের থেকে চোখ ফিবিয়ে মনামীব দিকে তাকায। পায়ে হিল, হলুদ বঙেব মিডিতে ঢাকা আঁকোসাঁটো শবীব। গায়ে গোলাপি কার্ডিগান।

সাজিযে বাখা সরোভিযা ফুলেব ঝাড পেবিয়ে যেতেই চোখে পডলো একটা উঁচু বেদিতে সব মডেল সাজানো। ফুলের প্রদর্শনীতে এই সব মেডেল সংগ্রহ হযেছে।

—ফুলেরাও মেডেল পায়। মনামী হাসতে হাসতে রুদ্রাশিসেব কাঁধে মাথা বাখে।

—কিন্তু ফুল কি তা জানে?

—সেকথা ফুলকেই জিজ্ঞেস করো।

—তবু সবাই কিছু না কিছু মেডেল কোন এক সময় পায। বলতে বলতে মনামীব চুলেব গন্ধ পায রুদ্রাশিস।

তাবপব ওবা আবো অনেক ফুল দেখলো। নানাবকম ফুলেব পাশে এক একটা লাঠিব ওপব সাদা কাগজে লেখা সব ফুলের নাম। দূব দূব থেকে আসা ফুলেদেব সঙ্গে ওদেব পবিচয হলো। তাদেব অদ্ভুত সব নাম জানলো। একটা বড গাছেব পাশে কেলিযাস ফুলেব ঝাড তৈবি কবে বাখা হযেছে। তাতে আলো পডে কি সুন্দব বং খেলছে পৃথিবীতে।

মনামী বলে, এত যে সব ফুল দেখছো, কোন ফুলটা সব থেকে তোমাব বেশি প্রিয?

চাবপাশ দেখে রুদ্রাশিস। তাবপব মনামীকে। মাটি থেকে সোজা একটা ডালেব ওপব কেমন ফুটে থাকে চন্দ্রমল্লিকা। পাতলা ছিপছিপে একটা শবীব। চোখ, নাক, মুখ, মসৃণ, ঠোঁট ফুটে আছে তাতে। রুদ্রাশিস ওব দিকে আঙুল তুলে বলে, এই ফুলটা।

হাসতে হাসতে জিভ কাটে মনামী, আবাব ভুল কবলে তুমি। ওভাবে আঙুল তুলে দেখাতে নেই। তাতে ফুল ঝবে যায।

২

যেভাবে এসেছিল সেভাবেই রুদ্রাশিসেব হাত ছেডে গেল মনামী। শূন্যে আলো আব বাতাস কেটে কেটে এক দোলনাব থেকে আব এক দোলনাব দিকে। মুখটা একটু তুলে হাত দুটো বাডিয়ে দিল। সে হাত আস্তে কবে টেনে নিল কৃষ্ণমূর্তি। সুইমিং পুলেব এক কোমব জলে দাঁডিযে যেন হাত উঠিয়েছে মনামী। একটু ঝুঁকে কৃষ্ণমূর্তি সে হাত ধবে পাডে উঠিযে আনছে তাকে। এই মুহূর্তে এমনই একটা ভঙ্গি। তাবপব দুজনেই ভাবনাব ভেতর একটু একটু কবে হাবিয়ে যেতে থাকে। এক সময ওবা পৌঁছে যায সেখানে

রঙিন ছাতাব তলায় মুখোমুখি বসে প্রশ্ন কবলো মনামী,

—তোমাব তৃতীয় স্ত্রীব খবব কি?

—আপাতত আছে ঠিক, কৃষ্ণমূর্তি হাসে, আসলে খুব একটা পুবনো' তো হযনি!

—পুবনো হলেই যে চলে যাবে এমন কথা তো কথা নেই। মনামী গম্ভীব হয, ভাল লাগা, মানিযে চলা, এসবও তো একটা ব্যাপাব।

—অফকোর্স, কৃষ্ণমূর্তি টেবিলে টোকা মাবে। বাডিতে একমাত্র বুডি মা আছে। আমাকে এভাবে ঘুবতে হয়। স্ত্রীব বাডিতে থাকা, এবং আনেকদিনেব তফাতে আমাব হঠাৎ হঠাৎ বাডি যাওযাকে মেনে তো নিতে হবেই। কিছু কবাব নেই। কত লোকই তো অনেক দূবে চাকবি কবতে যায একলা। আব এই না দেখা হওযাব সুযোগ নিযে

বৌটা পালালো অন্যজনের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে কৃষ্ণমূর্তি বিযারেব অর্ডাব দেয়। তারপর বলে, আমি সেইজন্যেই তো একই ক্যাটাগবিব মেয়েকে বিয়ে কবলাম দ্বিতীয়বারে। কিন্তু আমি নানাবকম বাডতি সুবিধেব জন্যে দল বদল করতে স্বামী বদালে গেল তার।

মনামী হাসে, একেবারে তোমাব কোন দোষ নেই, এটা কি মেনে নেওয়া যায়?

—মোটেই না। সামান্য অপ্রস্তুত হয কৃষ্ণমূর্তি।

বিযারেব বোতলেব দিকে তাকিযে মনামী বলে, গত বছব দিল্লিতে তুমি আমায় অফাব করেছিলে। যদিও তুমি আমাব থেকে অনেক সিনিযাব। অবশ্য এটা আমাব কাছে কোন ব্যাপাব নয়। তবে বিয়ে ব্যাপাবটাই আমাব কাছে অন্য। ভাল তো যে কোন সময় এমন কি বিয়ের পরেও লাগতে পাবে কাবোকে। সেখানে গভীবভাবে মিশতে চাইলে না মেশার কোন কাবণ নেই। তাই বলে সব কিছু ছেড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে-- এটা কবি না।

—তাহলে তুমি এখন—

কৃষ্ণমূর্তিব কথাটা লুফে নিযে মনামী বলে, আমাব এই উনিশ বছর বয়সে বিয়ে টিযেব মত ব্যাপাব নিযে ভাবতে ভাল লাগে না। কৃষ্ণমূর্তির গ্লাসে বিযাব ঢেলে দিতে দিতে ও বলতে থাকে, নিজে খাওযাব থেকে নিজের হাতে অন্যেব গ্লাস উপচে বিয়াব ঢেলে দিতে বেশি ভাল লাগে আমাব। গ্লাসেব গা বেয়ে গড়িয়ে পড়বে শুধু ফেনা আব ফেনা। ওঃ কী যে ভাল লাগে ভাবা যায় না।

কৃষ্ণমূর্তি শুধু দেখে মনামীকে, কিছু বলে না। একদিন অন্তত গ্লাস টেবিল ভাসিয়ে নিজেব ইচ্ছেমত ও ঢেলে যাক। আব এখন মনামীব সেই হাত চেপে ধবে ওব মনে হলো, আজ যদি আবো একটু বেশি দুলতে চায় তো দুলুক।

দুলতে দুলতে মনামী শবীবেব কাযদায় স্পীড নেয়। হাতে ধবে পাযবা যেভাবে উডিয়ে দেয় আকাশে। ঠিক সেইভাবে কৃষ্ণমূর্তি সাদা জামাব পালকে ঢাকা মনামীকে উডিযে দিল শূন্যে।

৩

গেবোবাজ পাযবাব মত শূন্যে একটা ডিগবাজি খেযে শমীকেব হাতে এসে বসে মনামী। দুজনেব হাত দুজনেবই কাছে বাঁধা। ওবা দুলছে। দুলতে দুলতে এভাবে একসময় গাছপালা, সমুদ্রতট, আদিগন্ত জলবাশি এসব কিছুব মধ্যে পৌঁছে যায়

আজ বেশ সকালেই এসেছে বীচে বালিব ওপব, জগিং করলো ওবা কিছুক্ষণ। তাবপব সমুদ্রেব ধাব ঘেঁসে হাটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে শমীক বলল,

—কাল টেন্টে যখন তাস খেলছিলাম আমবা তখন তুমি এলে, কিন্তু চলে গেলে কেন?

–তাতে কী হয়েছে।

—খেলাব জন্যে ডাকছিলাম

—আমাব তাস খেলতে ভাললাগে না। মুখে হালকা তাচ্ছিল্যেব ভাব ফুটে উঠলো মনামীব। একটু থেমে আবাব বলল, কোন ইনডোব গেমসেই আনন্দ পাই না তেমন।

—তবে কি ভাল লাগে?

—অনেক কিছু খেলতে, যেমন ক্রিকেট, লন টেনিস, সুইমিং, এই সব আব কী।

তবে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়। এক এক জায়গায় এক একটা খেলার সুযোগ এসে যায়। আর এসব কিছুকে ছাড়িয়ে যেটা বেশি ভাল লাগে তা হলো আকাশে উড়ে বেড়াতে।

—তুমি প্লেন চালাতে জানো নাকি?

—না, জানলে কি এভাবে কেউ পড়ে থাকে।

শমীকের মনে হলো, এই একমাত্র ইচ্ছে যা অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। প্রায় সবাই ছেলেবেলা থেকেই পাইলট হবার স্বপ্ন দেখে।

এভাবে বীচের ওপর দিয়ে গল্প করতে করতে ওরা এগোচ্ছিল। কখনো দুজনে, কখনো একলা এলোমেলো ঘুরছে। এক সময় শমীকই আবিষ্কার করলো দৃশ্যটা। বালির চর শেষ হয়ে সমুদ্রের জল যেখানে শুরু হয়েছে—ঠিক সেইখানে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মনামী। গায়ে আকাশী রঙের ঢিলেঢালা মিডি। সত্যিই কি যে লাগছিল দৃশ্যটা। শীতের সকালে ফ্যাকাশে আকাশ। তবু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রং পাল্টে যাচ্ছিল সমুদ্রের। শমীক বালির ওপর বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে। বালি এবং সমুদ্র—প্রকৃতি তার দু'ঠোটের মাঝখানে যেন মনামীকে ধরে রেখেছে। দূর থেকে ওর ডাকতেও সাহস হয় না। দৃশ্যটা কেটে যেতে পারে। একটু পরে প্রকৃতি তার এক ঠোট নিয়ে নিজের অন্য একটা ঠোট ভিজিয়ে নিতেই ও দেখলো মনামীও ভিজে গেছে খানিকটা।

আর এখন শমীক দেখলো, তারই হাত ধরে কেমন শূন্যে দুলছে সেই দৃশ্যের মেয়েটি। দুলতে দুলতে ওর হাত ছেড়ে শূন্যে ভেসে যায় মনামী।

৪

ভাসতে ভাসতে একইভাবে পৌঁছে যায় সন্দীপের কাছে। পৌঁছেই ভাল করে লক্ষ্য করে মনামী। এর সঙ্গে খুব একটা পরিচয় হয়নি এখনো। নতুন দলে এসেছে। কথাটা মাথায় আসতেই মনে মনে সে কথাটাই বলল ওকে, তুমি কবে যেন এসেছ?

একদৃষ্টে তাকেও লক্ষ্য করে সন্দীপ। মাত্র কয়েকদিন হলো ও এই দলে এসেছে। বাংলাদেশের একটা সার্কাস দল থেকে এই আসা। প্র্যাকটিস করতে কয়েকদিন সকলের সঙ্গে নেমেছিল অবশ্য। ওর হাত দুটো বেশ শক্ত। সেই শক্ত হাতের মুঠোর মধ্যে মনামীর নরম হাত। তবু খুব একটা মন্দ লাগছে তা নয়। শক্ত হাতে যেটুকু লাগতে পারে। আর সেই লাগাটাই অন্যরকম ভাল লাগা ফিরিয়ে দিচ্ছে শরীরে।

চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল কালো শরীর, কী যে সুন্দর স্বাস্থ্য পুরুষটার। এমন শরীরের কাছে নোঙর ফেলতে কোন মেয়ের না ভাল লাগে। নিজের দেহে সেই ভাললাগা খেলে যেতে যেতে মনামী শুনলো সে বলছে,

—তোমার নাম?

—ম-না-মী। একটু থেমে থেমে ও বললো।

—বাঃ।

—এক ফরাসী আমার নাম রেখেছিলেন। যখন আমি সবে এসেছি এই দলে, তখন তিনি এখানে কাজ করতেন। আমার অন্য একটা নাম ছিল। অথচ উনি প্রথম থেকেই আমায় ডাকতেন এই নামে। কথা বলতে বলতে ও একটু হাসে, ফ্রেঞ্চ ভাষায় মনামী মানে 'ও মাই লাভ'। হয়তো সে কারণেই এই নামটা তাঁর পছন্দ। সকলে একই নামে

ডাকতে ডাকতে এ নামটাই আমার থেকে গেল শেষে।

—এ নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করার থেকে পুরো নামটা একটু একটু করে শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলে বেশি ভাল লাগে। সন্দীপ মনে মনে আবার বলল, ম-না-মী।

অন্য মুখ থেকে নিজের নামটা শুনতে শুনতে ও জিজ্ঞেস করলো, আর তোমার নাম?

—সন্দীপ।

নামটা শুনে মনামীর গলায় বিস্ময়ের শব্দ খেলে যায়, সে তো বাংলাদেশের এক ভয়াবহ দ্বীপের নাম।

—আমি তো তাই। চোখে চোখ রেখে ভাবনার ভেতর কথাটা বলে সন্দীপ।

—সেবার ঝড় আর বৃষ্টিতে কী ক্ষতিগ্রস্তই না হয়েছে সেই দ্বীপের মানুষ। বলতে বলতে দম নেয় মনামী, যারা আশ্রয় নিয়েছিল তার বুকে—তাদের অনেকেই ধ্বংস হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে, বহু মানুষ ঘর ছেড়েছে। কাগজে, টিভি-তে তার কয়েকটা নমুনার ছবি দেখেছি অবশ্য। কী বীভৎস সেই সব দৃশ্য। ভাবা যায় না। অথচ এখন সেখানেই শরীর নোঙর করেছি আমি।

—তবু কোন ভয় নেই। সামান্য হাসে সন্দীপ।

—আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না। ভেতরে ভেতরে দৃঢ় হয় মনামী। তারপর বলে, আমি ধ্বংস হতে চাই না। একটু একটু করে বিধ্বস্ত হতে ভালবাসি।

—তাই বুঝি?

—হুঁ। চোখ নাচিয়ে গলায় আওয়াজ করে মনামী। ওর শরীরে বেশ একটা মজা খেলে যায়। সেই মজার নেশায় দুলতে দুলতে স্পিড নেয়। ওপাশে শমীকের জায়গায় এখন কৃষ্ণমূর্তি। কৃষ্ণমূর্তি অন্যের কাছে। রুদ্রাশিসের হাত ধরে আর একজন।

—তাহলে আমি চলি? মনামী হাসে।

—আর একটু থাকো প্লিজ। সন্দীপের গলায় অনুরোধ।

—থাকার উপায় নেই।

—কেন?

—সত্যি করে কোথাও পাকাপাকিভাবে থাকা যায় না বলে।

—এটা ঠিক নয়, বলে সন্দীপ তাকায়।

মনামী ভাবলো, কিছু ভুল বললো নাকি। ওর মনে হয়, ট্রাপিজের এইটুকু জগতের বাইরে প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন প্রয়োজনে এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া, একজনের কাছ থেকে একজনের কাছে যাওয়া। গোটা পৃথিবী জুড়ে এই যে ট্রাপিজের খেলা—সেখানেও স্থায়ীভাবে কোথাও থাকা কি যায়।

সন্দীপ হাতের মুঠো একটু আলগা করতেই মনামী শূন্যে ভেসে যায় আবার। এখন যেন কার কাছে যাবে?

বাদ্যকর

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কেউ পথ পায় আবার কেউ পায় না। সে হাজার চলনদার হোক না কেন—চলার মতন মন থাকা চাই। নিশানার টান থাকা চাই। আর মস্ত এক জোড়া চরণ থাকা চাই। তবে কিনা একদিন চলতে চলতে পথ সরল হয়, ঘোঁচঘাঁচ খানাখন্দ জানা হয়, বোঝাযায় পথের ধাবা আড়া।

শ্রীপতি মাস্টারের পরিষ্কার মনে আছে গেলবার যখন প্রথম পলাশস্থলীর ট্রেন ধরে রসা স্টেশনে নামল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তা দুটি। পূবে আর পশ্চিমে। সে গেল পূবের পথে।

মাঝখানে দুটি বৎসর। খরায়-বানে দেশ কাতর ছিল বলে ডাক পড়েনি। এবার রুখোশুখো হলেও রসাতল নামেনি। তাই ইলামবাজারের শ্রীপতি বাদ্যকরের ডাক পড়েছে আবার। ডাক গিয়েছে একখানা পোস্টোকার্ডে—এসো হে মাস্টার, আমরা বাজনা পেড়েছি।—বিস্তর বাক্য লেখা না থাকলেও এ তলবের তলে তলে টান ছিল। অনেকটা সেই প্রবল গ্রীষ্মে শালনদীর তলাকার লুকোছাপা জলের মতন। বালি আঁচড়ালেই সরল কাঁচ জল। শীতলে জীবন জুড়ায়। আর দেরী করা চলেনি। বাস্তু আর মা জননীকে প্রণাম করে রওয়ানা হয়েছে—গেলবারের মতন। ভাইকে বলে এসেছে না ফেরা অবধি যেন মুদির দোকান আগলায়।

সেদিন এমনি সন্ধ্যাকাল ছিল। ট্রেন থেকে গুনে গুনে তিনজন মানুষ নামল। প্রথম দুজন তো নেমেই পশ্চিমে হাঁটা ধরল। বাকি রইল এক বৃদ্ধ। সেও যুবকের চরণে আগে আগে দে হন্টন। প্রায়-চল্লিশ মাস্টার তো তাকে ধরে ছুঁয়ে পায় না। যেন শশকের গমন। শেষকালে লম্বা লম্বা পা ফেলে তাকে গিয়ে ধরল মাস্টার।— পেঁচালিয়া কুন পথে যাব মা'শয়?

বগলের লাঠি কাঁধে তুলে বৃদ্ধ বলল—সিধা। তারপরে দক্ষিণপানে।

—বেশ।

—আগে পইড়বে ভুলো লাগার মাঠ। তাপরে সিধা, তুমার লাক বাবাবর।

তারপর বৃদ্ধ যা বলল তা শুনলে শরীর হিম হয়। ভুলো লাগার মাঠে আনকা নতুন মানুষ মাত্রই নাকি পথ হারায়। খাঁ খাঁ মাঠ। সামনে পিছনে ঘর বাড়ী নেই। পার হতে সময় লাগে বেশ কিছু। তবু মানুষের একটা আন্দাজ আছে তো। সে আন্দাজে যদি ধা পড়ে তো আকাশে তাকাতে হবে। দেখতে হবে সে তারাটি স্থির না দপদপে। সে হল ভুলকো তারা যে কিনা পথ ভুলায় আবার চিনিয়ে দেয়। যদি দেখ তারা অস্থির তো গেছ হে মহাশয়। যতই হাঁট না কেন রাত আর পোহাবেনা। সারা রাত ভুলোর চক্করে পড়ে ঘুরে মরবে। তা কি করতে হবে তখন। নিশ্চয় কোনো বিধান আছে। চলতে চলতে এক তেমাথার মাঝখানে এসে থামল বৃদ্ধ। তারপর ডান দিকে হাত তুলে বলল—সিধা।

শ্রীপতি বুঝল বৃদ্ধ যাবে ভিন্ন দিকে। সে প্রায় নাছোড় হয়ে বলে উঠল ভুলো ধইরলে কি উপায় হবেক?

বৃদ্ধ কাঁধের লাঠি বগলে নেয় তারপর দখিন হাতটি তার চোখের সামনে আঁজলা

করে বলে ওঠে—তিন খাবল মুত চুখে ঝাপট মার। অমনি ভুলোর বাপ ছেড়ে যাবেক্।

বোঝা গেল ভুলো যেহেতু এক অপজিনিস তাকে ছাড়াতেও তাই অপকর্ম।

বাম দিকের নিচু পথ বেয়ে মানুষটি নেমে যায় ঘোর ঘোর সন্ধ্যার ভিতরে। রাঢে রাঙা পথ সময়ে সময়ে বর্ণচোরা, তাই এ আঁধারে কালোবরণ। পথ নেমে গেছে দূরের আকাশের দিকে। শ্রীপতি শুনতে পেল রুক্ষ মাটিতে তার লাঠি বাজছে ঠকাস্ ঠকাস্। অর্থাৎ বগলের লাঠি ভূমি ছুঁয়েছে। আর সাত পাঁচ না সে ভেবে দখিন পথে উঠে পড়ল। আর খানিক গেলেই মাঠ। মাঠ পার হলেই পেঁচালিয়ার সীমানা। কাঁধের ঝুলিতে যতক্ষণ ক্ল্যারিওনেট বাঁশীটি সুরে আছে ততক্ষণ কোনো চিন্তা নেই। তেমন হলে বাঁশীতে ফুঁ মারবে কলজের তাবৎ বাতাস ঠেলে। অমনি পেঁচালিযাব বাদ্যকবেরা বুঝতে পারবে মাস্টার আসছে। হয়তো ওপার থেকে করনেট বাঁশীতে আওয়াজ ফিরবে—এসো হে প্রাণ সখা তুমার চলণ দেইখতে সাধ মনে।

তা সেই গানখানি মনে মনেই রইল। মুখেও না বাঁশীতেও না। ভয়ডর পেলে তবে তো গান। শ্রীপতি ক্রমে দখিন পথ ছেড়ে যেখানে এসে থামল সেখানে পথ ফুরিয়েছে। কিংবা সমস্তটাই পথ—প্রকাণ্ড প্রান্তর। যেতে হলে নিজেকে পথ প্রস্তুত করে নিতে হবে। অন্ধকারের বিরাট হাঁ-গাল মুখিয়ে রয়েছে সুমুখ আগলে। বলছে এসো হে পাথক ঝাঁপ দাও অথবা নেমে পড়। মাস্টার থমকে ভাবল ফিরবে নাকি। কিন্তু ভাবলেই কি আর ফেরা যায়। যে লোকটি ইলামবাজারে সমাচার নিতে গিয়েছিল সে বারবার বলে গেছে পেঁচালিয়ার বাদ্যকরেরা অপেক্ষা করে বসে থাকবে। সামনে বিয়ের মরসুম। এ ছাড়া আরো কতো শুভ কাজ। মাস্টার তাদের সুর দেবে, তাবা সেই সুর শিখে উঠবে গিয়ে আর পাঁচজনাব আঙিনায়, আনন্দ মেলায়। মাঝখানে পেটপূরণের জন্য মিলবে কিঞ্চিৎ বজতমুদ্রা। কিঞ্চিৎ না কোরো বঞ্চিত।

অন্ধকারের চাঙড় ঐ মাঠের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল না শ্রীপতি। তার চোখের সামনে পেঁচালিয়ার বাদ্যকরদের অভাবী মুখগুলি হাঁ করে চেয়ে আছে যে। সে জানে দিনমানে তারা পরের জমিতে মুনিষ-বেগার দেয়, জানপাত করে লাঙল ঠেলে মুখে ফেনা উগরে। আর রাতের বেলা সে হাতে বাঁশী ওঠে, ঢোল নাচে, মুখের আগায় সুর উপচে ওঠে। যে মানুষ দিনের বেলা উদোম গায়ে কাদা মাটি চষেমষে সেখানে প্রাণ আনে সেই তো আবার এক রাতে লাল পাগড়ী মাথে ভিন্ন প্রাণের কারবার ফেঁদে বসে। দুটি প্রাণের সোনার কাঠি কিন্তু বাঁশী। দিনে তারা বাজায় বাঁকা বাঁশী আর রাতে আড়। বাজনাদার কে? না সেই একজন—বাঁকা শ্যাম নটবর নাকি কালোবরণ জোয়ালে স্কন্ধ পেঁচালিয়ার বাদ্যকর মানুষ।

পথ ছেড়ে মাঠে নামল শ্রীপতি। রুক্ষ মাটিতে পাথরেব প্রাণ। মাঝে মাঝে কিছু ঘাসের রাজত্ব। বাদবাকি কাঁটা ঝোপ জাঙলা। রাত যত আঁধার হোক না কেন এমন মাঠের এক আলাদা আলো আছে। সে আলো আকাশের তারা থেকে কঠিন মাটিতে বিঁধতে গিয়ে ছিটকে ওঠে। আর আছে দূর গ্রামের কুটিরে মণ্ডপে জ্বলা প্রদীপ-লণ্ঠনের আলো। সে আলো দূরের শাল বন ছুঁয়ে সার সার তালগাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে শূন্য চরাচরে তৈরী হয় চাপা আলোর আভা—অনেকটা ঝাপসা কুয়াশার মত। শ্রীপতি পরিষ্কাব দেখতে পেল মাঠের আদুল অঙ্গে আলো আঁধারেব মোহ

মাখামাখি করে রয়েছে। দুইয়ে মিলে একাঙ্গী।

চলতে চলতে সামান্য আন্দাজ পায় পথের। শোনা আছে দিক দিশাহীন সাগরের মাঝখানে মানুষ পথ ঠিক করে কি এক কাঁটা যন্ত্র দিয়ে। এ মাঠও তো সেই রকম। কোথাও কোনো সন্ধানের চিহ্ন নেই। কেবল দূরে এক প্রান্তে দাঁড়ানো তাল গাছগুলি জানান দিচ্ছে ঐ বাগে এক কাঁদর আছে নিশ্চয়। অতএব খানিক ভরসা। মনে মনে বাঁক ফিরল শ্রীপতি। একটু বামে। অমনি মনে হল কে যেন আগে আগে চলেছে ফারাক রেখে। কয়েক যোজন না মাত্র ক'হাত। কে, কে যায়। কেউ একজন তো বটে। না হলে কি চোখের ভুলে পড়তে হবে। ভাল করে চোখ টেনে তাকাল শ্রীপতি। হ্যাঁ, ঠিকই তো, কে একজন আগে আগে চলেছে। তবে চলব বড় সোজা সাপটা না। কেমন যেন টলোমলো আঁকা বাঁকা। চলেছে মাঠ বরাবর একটু বা দ্রুত গমনে অন্ধকারের চেয়েও অধিক কালো সেই মানুষ। ছায়ার মধ্যে পাতলা আলোর মত সরে সরে যায়, পিছনে তাকায় না।

মনে সামান্য ভয় এলেও পা এড়িয়ে গেল না। এবড়ো খেবড়ো মাঠে চটির ফটফট শব্দ তুলল শ্রীপতি। যদি সে তাকায়, ফিরে কথা বলে। কিন্তু না, সে কেবল নত মাথাটি সোজা করল। অমনি আকাশের মৃদু আলোর নিচে পরিষ্কার বোঝা গেল তার এলোচুল কোমর ছুঁয়েছে। কেশের চালচিত্রে দেহের উপর অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। শেষ চৈত্রের আগল ছাড়া বাতাসে তার এলো চুল উড়ছে, শাড়ীর আঁচল দুলছে। কে হে, ডাইন পরী নয়তো! শেষকালে কিনা এই নিপাট বাদ্যকরের স্কন্ধ মটকে রক্ত পান!

দিগন্তে শাল বনের দিক থেকে একটা মৃদু ফুলের বাস এসে মাঠে নামল। মাথার উপরদিয়ে একটা পাখি ডানা নাড়তে নাড়তে ধেয়ে গেল বনের দিকে। দূরে কাঁদরের সীমানায় তালপত্রে হাওয়ায় ঝাঁঝর বেজে উঠল ঝমাঝম। শ্রীপতি গলা খাঁকারি দিল—কে বটে?

ছায়া থামল। শ্রীপতিও। কিন্তু পিছন ফিরল না। এরপরে তো আবার কিছু বলতে হয়। শ্রীপতি ডাকল আবার—কে?

দ্বিতীয় প্রশ্নে কাজ হল। ধীরে ধীরে ছায়া ফিরে দাঁড়াল। তার কালো মুখে অন্ধকারের আভা লাগল। মেয়ে হাসল। শ্রীপতি তো অবাক। চেনা নেই, জানা নেই, এমন খাঁ খাঁ প্রান্তরে অপর পুরুষের প্রতি চেয়ে হাসছে। এ কেমন মেয়ে। নষ্ট নয় তো। না কি ডাইন এমন করে পুরষ ভুলায়। মাথাটি চড়াৎ করে ওঠে। শেষকালে কি ঐ মেয়ের ভুলোয় পড়ে রাত কাবার করতে হবে। ঢোক গিলে বলল শ্রীপতি—পথ হারিন গেইছে।

বলা মাত্র অন্ধকার দুলে উঠল। সে হেসে উঠল শব্দ করে। হাসে আর দুই হাতে চাপড় মারে। সে হাসিতে কাঁদর পাড়ে তাল পত্রের ঝমাঝম চাপা পড়ে যায়। চৈত্র মাসের বাতাসের দাপট ম্লান হয়ে যায়। শ্রীপতির মনে হল নিরালা মাঠের ঘুম ভাঙছে। মেয়ে হাসতে হাসতে বলে—পথ মালুম পেছ না?

শ্রীপতি অন্ধকারে মাথা নাড়ে। প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন।

মেয়ে পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে আসে। যে পথ যাবার জন্য খোলা ছিল সে বুঝি এখন বন্ধ। কিন্তু শ্যামা মেয়েটির চোখে পথ হারানোর ভয় নেই। নিজের বুকে আঙুল রেখে সে ফিস ফিস করল—আমি ইখানে থাকি।

বলে কি! এই প্রান্তরে থাকে কিনা এই সোমত্ত নারী! শ্রীপতি আস্তে আস্তে বলল—বেশ। কিন্তু—

—কি!

—সাঁঝ বিয়নে একা একা ঘুরে বিড়াইছ।

—তা কি?

শ্রীপতি বুঝতে পারল এর সঙ্গে আর কথা বলে লাভ নেই। কোনো কথার তো সোজা জবাব নেই। তারপর যদি দৈবাৎ কেউ দেখে ফেলে বাজনার মাস্টার অন্ধকার পাঁদাড়ে মেয়েমোনুষের সঙ্গে ফুসুর ফুসুর করছে তাহলে আর দেখতে হবে না। সে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে তার সামনে চলে যায়। অমনি পিছন থেকে ডাক আসে—কুথা যাওয়া হবেক্?

—পেঁ।।লয়া।—গম্ভীর জবাব দেয় মাস্টার। তারপর হাঁটতে থাকে কাঁধের থলিটি সাপটে ধরে। এত সময় যে ছিল ছায়া সে এখন কায়া হয়েছে। কথা শুনে বোঝা গেছে সে ডাইন নয়কো, মানুষ। কিন্তু কেমন? সে প্রশ্নে কাজ নেই এখন। মনে পড়ল সাগরে পথের হদিশ ঠিক করা সেই কাঁটা যন্ত্রের কথা। মেয়েকে শুধাবে নাকি কোন দিকে পেঁচালিযা। পেছন ফিরে তাকাবার আগেই কানে এল—ওলো মালিনী লো সই, সারা রাতি ফুল কুড়ালি পয়সা পেলি্য কৈ—। পরিচিত গান। মাইকে শুনে সুরটি খানিক কব্জা করা গেছে। বাজনায় বেশ উঠবে ভাল। মাস্টার গমনের গতি কমিয়ে দিয়ে গান শুনতে লাগল। কণ্ঠ সাধা না হলেও একেবারে বেসুরে বলছে না। কিন্তু বেশীক্ষণ না। ঐ একটি চরণ গেয়েই সে বলে ওঠে—বাপ বইলবে ছুঁড়ি বেয়াদব, মা বইলবে মাগী বুন বাদাড়ে ঘুরি বেড়ায়। পিথিমীটো যেন কেমুন। সব পাষাণ পাথ্থর পারা।

শ্রীপতি শুনল সে আপন মনে যেন আপনাকেই বলে চলেছে। কথার কোনো মাথামুণ্ডু পাওয়া মুশকিল। সারারাত্রি ফুল কুড়াবার পর এমন কথা কোথা থেকে আসে সে চিন্তা করবার আগেই আবার কথা হয়—আমার বাপু কুনো ভামনা নাই। খেছি দিছি ঘুরে বেড়াইছি। কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।

কার মনে কি আছে! এ ইঙ্গিত কি বাদ্যকরকে। না কি নিজেকে। শ্রীপতি দাঁড়াল। তারপর হাত তুলে বলল—আগে চল।

—ক্যানে। আমার ঘর আমি যেমুন খুশী যাব।

—কুথা!

—পেঁচালিয়া। কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।

এ তো মহা আতান্তরে পড়া গেল। এ যে একেবারে নেই আঁকড়া মেয়েছেলে। বেশ তো যাচ্ছিল আপন মনে। এখন যেচে আলাপ করে বিপদ হল। আগে যেতে বললে যায়না উলটে কি সব পেঁচালো কথাবার্তা বলে। পেঁচালিযার ধারাই কি এমন? এর চেয়ে ভুলোর পাল্লায় পড়লে বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু একে ছাড়াবে কোন মন্ত্রে।

পায়ে পায়ে বেশ খানিকটা পথ চলে আসা গেছে। পিছন ফিরলে আন্দাজ হয় প্রায় মাঝ মাঠ। দূরের আকাশে গ্রামের আলোর ছটা লেগেছে। সেই ছটা এড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে জেগে আছে শালবনের পাহারা। গাছেদের চোখে দিবানিশি ঘুম নেই। রাতের বেলা তারা ধ্যানে বসে। পাশাপাশি গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু কেউ কারোর না।

চৈত্র শেষের বাতাসের মুখে ধুলো উড়ছে। চোখে মুখে তার ঝাপট খেতে খেতে বলে উঠল শ্রীপতি—তুমার নাম কি?

—ক্যানে, অপর মানুষের পরিবারের নাম ক্যানে?

আবার এক সর্বনাশ। এ যে বলে অন্যের বিবাহিতা। ঘরের বৌ বলে কথা তার ওপর গ্রাম দেশ। সে কিনা রাতবিরেতে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। চরিত্রে পাঁক নেই তো। বাদ্যকর অস্পষ্ট স্বরে বলে—না এমনি শুধালাম।

—বেশ। শুধালে যখন তখন বলি। আমার নাম মনসা। ঝাঁপড়াতলার বাউড়ীদিগের ঝউ বটি।

—সোয়ামী—

—সি মরদ লেয়না আমায়। মনসার বাপের নামে তার নাম, আমার বাপের ভাতে উর প্যাট ভওো।

অর্থাৎ কিনা ঝাঁপড়াতলার শংকর বাউড়ী এদের ঘর জামাই। কিন্তু কেন, কি দোষে সে মনসাকে ত্যাগ করে।—লেয়না ক্যানে?

শ্রীপতির এ প্রশ্নে মনসা ফোঁসে না। বরং কেমন উদাস গলায় বলে—কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।

আবার সেই, ধন্দের খোঁচা। কথা ঘুরিয়ে দিয়ে শ্রীপতি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—পেঁচালিয়া কতো দূর বটে?

মনসা এই মাঠের মতই উদাস। আপন মনে বলে চলে—ভুরের বেলা আঁন্ধার আবার রেতেও। দিনটো যে কখন আসে বুইঝতে লারি বাপু।

—ক্যানে?

মনসা ভেঙচি কাটে—ক্যানে। নিকার পারা কথা। চুখে ঘুম আসে যে।

—বেশ।

শ্রীপতি আর কথা বাড়ায় না; আনমনা হলে হোঁচট খেতে হবে। তাই মাথা হেঁট করে চলে। যেতে যেতে ভাবে এ তো শুধু অবোলা মাঠ না। এর মুখে যে বোল বাজছে, আলো আঁধার খেলছে। দিনমানে নিকনো আকাশের তলায় এ বচন কেমন লাগে জানা নেই। কেবল জানা হল রাতের কথা। আকাশে চোখ রাখলে দৃষ্টি বাধা পায় তারায় তারায়, মেঘের খানাখন্দে। আর এখন চরণ আটকায় কঠিন মাটির উঁচা নিচায়। এদিকে যে বাদ্যকরের নজরের তলায় বিভ্রম জেগেছে সে খবর তো পাকা। কেননা মেয়ের মাথার চুলের বাসের সঙ্গে ঐ শালবনের বাসের কোনো বেমিল নেই। চৈত্রের বেতাল পবনে মনসার কেশ খেলছে। যেতে যেতে সে জানান দিচ্ছে মস্ত এই চরাচর শুধু পাথর না। সেখানে বাতাস খেলে আবার গানও বাজে। মাঠের যেমন এই উঁচা তো সেই নামো, মনসার বচনেও তেমনি উত্থান-পতন। পথের আগা ধরতে না ধরতেই হারিয়ে যায় গভীর অন্ধকারে। কেবল যা ভাগ্য আকাশের দিক জানানো ঐ তারাটি এখনো চেয়ে রয়েছে। শ্রীপতি গুন গুন করে—আজো পথের কুনো হদিশ প্যালম না..

ডোমপাড়ার কাছে আসতে অন্ধকার ছিঁড়ে চার-পাঁচটি লণ্ঠন এগিয়ে আসে। আলোর ওপারে অচেনা মুখগুলির পাশ থেকে একজন বলে ওঠে—উস্তাদ এইসেছে গো।

অমনি আর সবাই কলরব করে ওঠে। আশপাশ দিয়ে ইঁদুর ছানারমত চঞ্চল শিশুর দল হুটোপাটা শুরু করে দেয়। শ্রীপতি দেখল ডোমপাড়ার মেটে ঘরের চালে সদ্য বিচালি পড়েছে। কে একজন একখানা মোড়া এনে রাখে। শ্রীপতি বসে। কাঁধের ঝোলার উপর কুতুহলী দৃষ্টি এক কিশোরের। কে জানে কি মন্তর পোরা আছে উয়ার ভিতরে। এক বৃদ্ধ নাগাড়ে তালপাতার বাতাস করে যায়। ঠিক তখনি ঘরের ভিতর থেকে এক মহিলার চিলকণ্ঠ ভেসে আসে—খালভরা, নামুনে। তুর ইজ্জৎটো যমে লিইছে। হাড়মাস হাঁজাইয়ে দিলেক।

সঙ্গে মনসার কান্না। কেঁদে কেঁদে কি যে বলে সব বোঝা যায় না। কেবল বোঝা যায় সে বুঝতে পারছে না কার মনে কি আছে। শ্রীপতি তাকাতে বৃদ্ধ বলে—মনসা তুমার সাথেই তো—

শ্রীপতি মাথা হেলায়।

—আমি সিষ্টিধর। উর বাপ বটি।

মোড়ার উপর শ্রীপতি। সামনে পর পর তিনটি লণ্ঠন। তার ওপারে গোল করে ঘিরে বসে আছে আদুল গা ঘোর কালো মানুষের সার, পেঁচালিয়ার বাদ্যকর বৃন্দ। আরো পিছনে বালক বালিকার দঙ্গল। বিস্ফোরিত চোখে তারা মাস্টারকে দেখছে। কেমন বাবরি চুলে তেল চকচক করছে। পরনে ধুতি, গায়ে হলুদ জামা। দাঁতে বিলক্ষণ পানের দাগ।

ঘরের ভিতর থেকে এবারে অশ্রাব্য গালাগাল সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। সঙ্গে মনসার কান্না ও বিলাপ। শ্রীপতির নিজেকে হঠাৎ অপরাধী বলে মনে হয়। সে আবার তাকায় পাখা হাতে মানুষটির চোখে। অমনি সৃষ্টিধর বলে ওঠে—উর মাথাটো ঠিক নাই। জামাই তাফাৎ গেইছে।

এতক্ষণে চোখের সামনে চিত্রটি সম্পূর্ণ হল। শংকর বাউড়ী মনসাকে বিবাহ করে জানতে পারল তার মাথার ব্যামো। ঘরজামাই মানুষ। দিনের বেলা শ্বশুর শ্যালকদের সঙ্গে পরের জমিতে মুনিষ খাটে আর রাতে নেশা খেয়ে টং হয়ে বসে বাজনা শোনে। হাত দেয়না যন্ত্রে। কেননা সে সবে তার অধিকার নেই। বাদ্য করের বাজনায় যেমন বাউড়ীর হাত নেই তেমনি বিস্তর চেষ্টা করেও সে মনসাকে হাতে পেল না। ক্রমে সে বুঝতে পারল মনসার মন কোথাও নেই। সারাদিন গাছের তলায় কাঁদরের পাড়ে ঘুরে বেড়ায় আর রাত হলেই মাঠমুখো। একা একা আঁধরে ঘুরে বেড়ায়। ধরে বেঁধে মারধোর করেও বাগে আনা যায় না। কতোদিন শ্বশুর জামাই মিলে রক্তারক্তি করেছে। মনসা দ্বিগুণ কেঁদেছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে। ডোমপাড়ার রাঙা উঠান তার ঠোঁটের রক্তে অধিক রাঙা হয়েছে তথাপি সে ফেরেনি। প্রতি রাত্রে আলগা উদাস প্রকৃতি ছুটে গেছে আর এক প্রকৃতির দিকে। শংকর তাকে মানতে পারেনি। মনে কু জেগেছে। ক্রোধে ঈর্ষায় বিপর্যস্ত পুরুষটি একদিন ভোর রাত্রে পালিয়ে বেঁচেছে। মনসার কান্না শুনতে শুনতে ভাবল শ্রীপতি শংকর বাউড়ীর ভুলো ছেড়েছে।

বাদ্যকরেরা ঘিরে বসেছে। মাঝখানে মোড়ায় শ্রীপতি। অল্প বাতাস পড়ে পথের ক্লান্তি কেটেছে। এবারে বিষয়কর্ম।

শ্রীপতির দক্ষিণে ঢোলক কোলে সৃষ্টিধর বাদ্যকর। বামে করনেট হাতে অধর। সামনে

মহাদেব, সুবল, নরেন এমনি আর সব বাদ্যকর। গায়ে গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। যার যার হাতে যন্ত্র। কেউ কোনো কথা বলছে না। অনেকটা সেই মাঠ থেকে দেখা শালবৃক্ষের স্তব্ধ সারের মতন। আপন আপন ধ্যানে বসেছে সব। শ্রীপতি থলি থেকে বাঁশী বার করে জামার কোনা দিয়ে যত্ন করে মুছছে। কালো বাঁশীব অঙ্গে পিতলের গহনা—লণ্ঠনের আলোয় তেল পিছলানো। সেইদিকে অবাক চেয়ে আছে তেলহীন রুখো মাথার বাদ্যকরেরা, না কি দূর মাঠ পারের গম্ভীর শালবৃক্ষ শ্রেণী। শ্রীপতি মুখ তুলল। আকাশ চিরে এক চিলতে চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে। এক থালা সুপাবির মধ্যে একফালি দুধ শাদা নারকেল রাখা আছে যেন। বিচিত্র পূজাব ডালি। কোন পূজাব। স্তব্ধতার, অপেক্ষার। মুখের কাছে বাঁশি নেবার আগে কপালে ঠোঁয়াল বাদ্যকর। চোখ আপনিই বুজে এল। অমনি শুনতে পেল কাঁদরপাড়ে তালপত্রের বাজনায় ঝবনার শব্দ। বাঁশীতে ঠোঁট পড়ল, কুঞ্চন এল, ভালবেসে চুমু খেল শ্রীপতি। অমনি বাতাসে ঢেউ জাগল—সারা রাতি ফুল কুড়ালি পয়সা পেলি কৈ...

আলোর মহাল এড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল মনসা। চোখ বোজা। মৃদু মৃদু দুলতে দুলতে পাগলিনী বাঁশী শুনছে।

সেদিন রাতে আর মনসার দেখা মেলেনি। উঠানেব একটেরে দাওযা সমেত ছোট ঘরে শ্রীপতির ঠাঁই হল। কাঁচা পাকা ভাতেব নেশায ঘুমে বেহুঁসা হযে পড়ল শোবাব সঙ্গে সঙ্গে। দেখা হল পরদিন পুকুবঘাবে।

জল কমে এসেছে ছড়ানো পুকুরে। তলাকাব বালি পাথব কাঁকর পরিষ্কাব। পাঁক নেই। পা দিলে মোলায়েম বালিতে পা ভসভস করে। শ্রীপতি জলেব কিনাবে চ্যাপটা পাথরের উপর বসে নিমদাঁতন কবছিল। দিনেব আলোয জায়গাটি বেশ। ওপারে কয়েকটি তালগাছ শিশু কিশোব সমেত আর তিনটি আমগাছ। আব আছে পশ্চিম মাথায় খাড়া পথের পাশে আকাশ ঝাঁপানো পাকুড়গাছ এক। গাছের গোড়ায় সিঁদুব লেপা পাথরের মাথায় একটি ঘুঘু পাখি বিশ্রাম করছে। দাঁতন কামড়ে আকাশে তাকাল শ্রীপতি। একটি প্রসন্ন সকাল। ষষ্ঠ ঋতু যেতে গিয়েও যায়নি এখনো। বাতাসের মেজাজে সে সমাচার বেশ টের পাওয়া যায। মুখ নামিয়ে জলে কুলকুচি করতে গিয়ে দেখল ওদিকের পথ দিয়ে মনসা নেমে আসছে। গাযে গামছা জড়ানো, এক হাতে বাসী কাপড়। শ্রীপতিকে দেখে হাসতে গিয়েও হাসল না। কি যেন ভাবল এক মুহূর্ত তারপর হাতের কাপড় মাটিতে রেখে পাড় ধরে এদিকে চলে এল। জলে দাঁতন ছুঁড়ে তাকাল শ্রীপতি—কি?

—চোর।

—কুথা?

—আমার সুমুখে।

বোঝা গেল কথাটি তাকে লক্ষ করে। কিন্তু কাবণ কি। মনসা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—অবাক হঁয়ে ভেল্যে বইছ যে।

—হঁ।

—কি হঁ।

—কথাটো বুইঝলম না।

—তা বুইঝবে ক্যানে, বাঘের ঘরে ঘোঁগের বাসা যে।

—অখো?

—ভুলই ভালুই আমার গানটো শুনে নিলেক। এখুন যেন নিকার পারা।

কথায় বলে না প্রাতের হাসি সর্বনাশী। তাই বেদম হাসি এলেও হাসল না শ্রীপতি। ভাসন্ত দাঁতন কাঠিটি জলের ঝাপটায় দূরে ভাসাতে ভাসাতে বলল—এ গান কি তুমার কিনা?

মনসা হঠাৎ সাপটে দাঁড়াল তারপর তার পিঠে আচমকা এক কিল বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—কিনা, লয় চিনা শুনা।

প্রায় দৌড়ে পুকুর পাড় ধরে চলে যেতে যেতে বলে গেল—কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।

হাঁটতে হাঁটতে কাঁদরের ধারে চলে গিয়েছিল শ্রীপতি। চৈত্রের গড়ানে পড়ে জল কমে গেছে। এক জোড়া পানকৌড়ি ডুব সাঁতার দেয় আর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। সতর্ক চোখে চারপাশে কি দেখে। আবার ডুব। দুটি তালগাছের মাঝখানে যে ফাঁকটুকু সেখানে বসেছিল শ্রীপতি। গায়ে জামা নেই, কোলের উপর বাঁশীটি আছে। একটা বিড়ি ধবিয়েছে অমনি নজর গেল পানকৌড়ি যুগলের দিকে। এ সময়ে আর সকলের মত তাদেরও রিপু প্রবল হয়েছে। তাই একটি আর একটিকে অমন করে টানছে, ভালবাসছে। অমনি মনে পড়ে যায় কাজিপাড়ার সেই কথকতার কথা। কথকঠাকুর মনসামঙ্গলের গৌরচন্দ্রিকা কবতে গিয়ে বলেছিলেন স্বয়ং মহাদেব একবার তাঁর মেয়ে মনসাকে জল-খেলা করতে দেখে ঐ প্রথম রিপুর কোপে পড়ে উম্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। মনসা যেই বুঝল মতিচ্ছন্নবাপকে যদি না শান্ত করা যায় তাহলে ত্রিভুবনে অনর্থ হবে। শেষকালে অনেক কৌশলে বহু ফয়জত করে তাঁকে ঠাণ্ডা করল সে। মনসার স্বামীও তো শংকর। হতে পারে সে বাউড়ী কিন্তু আসলে সে যে মহাকাল। সে কারণেই কি মনসাকে বহন করতে পারল না সে, দূরে পালাল। ভাবতে গিয়ে মনটা ছাঁত করে ওঠে শ্রীপতির। তাড়াতাড়ি মনকে সরিয়ে আনল কাঁদরের জলে। দেখল পুরষটি তার সাথীকে ঠোঁট দিয়ে বিঁধছে। সেও আস্তে আস্তে তার জুড়ির মুখে ঠোঁট চেপে ধরল। বাঁশী বাজল। মনে মনে বাজল বাদ্যকর।

চোখ মেলতেই দেখল মনসা এসে বসেছে তফাতে। কখন যে এসেছে টের পাওয়া যায়নি। হাত দুটি কোলের কাছে জড়ো করা, চোখ শান্ত, অবাক চেয়ে আছে তারদিকে। শ্রীপতি বাজাতে বাজাতেই হাসল। মনসা কিন্তু সে হাসির জবাব দিল না। কেবল মাথাটি অল্প অল্প দুলতে লাগল। বাজাতে বাজাতে বাদ্যকরের মন অস্থির। ঐ পাগলিনীকি জানতে পারছে এই সুরের প্রাণ কোন কথা বলছে। যদি পাবত তাহলে কি হত। বাঁশী ঝপ করে থেমে গেল। তাহলে শংকর বাউড়ী পেঁচালিয়া ছেড়ে যেত না। তাহলে মনসা এই বিরলে এসে বাদ্যকরের বাঁশী শুনত না। মনসার দোলন থেমে গেল—কি হন্ছে?

—কি?

—বাজাও।

শ্রীপতি দূরে তাকাল। এখানকার মেয়াদ আর বড় জোর দুই দিনের। তারপরে ঘরে

ফেরা। আবার সেই তেল লবণের কারবার। পানকৌড়ি দুজনের দিকে চোখ পড়ল। তারা এখন মহাসুখে। চাপা শব্দ করছে মাঝে মাঝে। জলে ডানা ফরফরিয়ে খেলা করছে। চোখ সরিয়ে আনল মনসার দিকে। দেখল এতো হেলাফেলাতেও তার গালে কোনো মেচেতার দাগ নেই। কপালে ভাঁজ পড়েনি। তেলহীন চুলে জট পড়লেও গালে রোদ চমকে ওঠে। কিন্তু তার মুখের মাঝখানে ছোট্ট নাকের পাটা শূন্য। ছিদ্র আছে গহনা নেই। ছোট পাথর পরলে বেশ মানাতো। সে আস্তে ডাকল—মনসা।

—কি?

.—তুমি তুমি—

মনসা ভাসা নজরে বাদ্যকরকে দেখল—ক্যানে?

শ্রীপতি ঢোক গিলল—চুলে ত্যাল দাও নাই ক্যানে?

মনসার মুখে এবার তুবড়ি ছুটল—মা বইলবে বিটি আঁদারে ঘুরি বিড়ায়, হিঁ থা হুঁথা পাক মারে। বাপ বইলবে এক ডণ্ড ঘরে রইবেক না। তাবাদে পাঁচ জুনে লষ্টবইলবে। তাবাদে—

শুন শুন, আমার কথাটো শুন।

—আরে থাম। সব সতীপনা দিখাইছে। আমি আমার মতন থাকি, দুনিয়াটো দেখি। কিন্তু দিনটো ঝপ্ করি শ্যাষ হইঁন যায়। রাতটো যেন জুরুই থাকে জলের পারা। হঁ গো, আমি কুছুই জানি না। ঠার করে থাকি রেতের বেলা। কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে।

মনসার চোখে জল। শ্রীপতি এই প্রথম তার চোখে হাসি ছাড়া জল দেখল। মনসা কাঁদছে। ঝরঝরিয়ে জল ঝরছে কোলের কাছে। বাদ্যকব শুনতে পেল তালপত্রে বৃষ্টির শব্দ। প্লাবন আনছে না গম্ভীর দুঃখ বাজছে। সে হাত তুলল—মনসা।

মনসা উদাস তাকাল।

—মনসা। আবার ডাকল শ্রীপতি।

কান্নার ভিতর থেকেই মনসা—ক্যানে?

শ্রীপতি বাঁশীতে ঠোঁট বিঁধল—তুমি বড় কঠিন পরাণ হে...

পর পর দুটি রাত কেটে গেছে। আজ শেষ রাত। এই দুই দিনে পেঁচালিয়ার বাদ্যকরেরা বেশ কটি সুর শিখে নিয়েছে। সকলে সমান না পারলেও অধর পেরেছে। সে যখন বাজায় মনসা এসে চুপ করে বসে থাকে। তখন কে বলবে মেয়ে অশান্ত বুনো।

অধর বলল—আজ এ্যাকটো লতুন গান চাই উস্তাদ।

শ্রীপতি হাসল। সৃষ্টি ঢোলকে গুবগুব চাঁটি মেরে বলল—ই বছর বড় নাম হবেক। কি বল হে। সুবল।

হঁ হঁ।—সুবল ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

—বাজনার র‍্যাট বাড়াইতে হবেক হঁ।—চেঁচিয়ে ওঠে মহাদেব বাদ্যকর।

শ্রীপতি হাত তুলল। সকলে চুপ। কোলের কাছে বাঁশী। হাত জোড় করে বলল—আশীব্বাদ দাও গো ভাইসব। সুরটো যেন না ভুলি।

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল। সৃষ্টিধর তো মাস্টারের দুই হাত চেপে ধরে—কি বল হে ম্যাস্টার। তুমি আমাদের গুরু বটে।

শ্রীপতি সেই কঠিন হাত দুটি নিজের বুকে ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দিল।

পর পর তিনখানা লণ্ঠন জ্বলছে। ডোমপাড়ার সীমানায় আজ বাতাসের মোচ্ছব লেগেছে। এলোমেলো হাওয়ায় আলো স্থির থাকছে না। শ্রীপতি বলল—আলো নিবাও।

সমস্ত আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে মোড়ার উপর বসে দেখল শ্রীপতি কালো শালবৃক্ষেরা নিঃশব্দে বসে আছে। ঘরের চালের বিচালিতে বাতাস এসে ধাক্কা মারছে। ধুলো পাতা উড়ছে উঠান ছয়লাপ করে। কিন্তু মানুষগুলি নড়ছে না। মাথার উপরে নারকেল ফালি আজ কিছু বড়। আলো ঠিকরাচ্ছে মাটিতে। এ অবস্থায় তারা সব স্থিব, যেন ভুলো লেগেছে। এমন হয়তো হয় সময়ে সময়ে যখন উঠান, রোয়াক এমনকি ঘরের কানাচেও ভুলো উঠে আসে। তখন মাঠ ঘাট তার কুটুম। মৃদু জ্যোৎস্নায় সদ্য কাঁচি নেশা খাওয়া বাদ্যকরেরা কেমন বুঁদ হয়ে বসে আছে। মাস্টারের ভেলকি দেখবে বলে। দূরে অন্ধকারে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে মনসা। মাথার জটা চুল উড়ছে দুরন্ত বাতাসে। শ্রীপতি বাঁশীতে ফুঁ দিল—হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব বিবল মনের কথা—

অন্ধকারে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—ই গান চইলবেক না হে।

কয়েকজন গুন গুন করতে থাকে নিজেদেব মধ্যে। সৃষ্টির ঢোলক সমে না এসেই থেমে যায়। তাব মুখে অস্বস্তির ছায়া। কিন্তু সব অস্বস্তি সরিয়ে দিয়ে দূর থেকে মনসা চেঁচিয়ে ওঠে—থাম থাম। বড় সমঝদার সব।

কারা চাপা হাসল এ কথায়। গাছেবা গায়ে গা ঘষল। শ্রীপতি সেদিকে মন না দিয়ে বাজিয়ে গেল—মরমে না জানে ধরম, বাখানে সে আর দ্বিগুণ ব্যথা—

স্তব্ধ রাত্রে গম্ভীর বাঁশীর স্বরে বাদ্যকরদের বসতির এই এলাকাটি বার বার বিদীর্ণ হতে লাগল। কিন্তু শ্রীপতি বুঝতে পারল না মনসা ভাঙছে না গলছে। কেবল দেখতে পেল দেওয়ালে হেলানো অন্ধকারটি এধার ওধার দুলছে।

পরদিন প্রথম পক্ষী না ডাকতে সৃষ্টিধরের হাতে ধরা লণ্ঠনের আলোর ছটা ধরে শ্রীপতি পেঁচালিয়া ছাড়ল।

আজ এই দুই বৎসরের ফারাকেও শ্রীপতি বাদ্যকর পথ ভোলেনি। এখন মধ্যবৈশাখ। তাই বাতাসের মুখে গরম ঝাল। সন্ধ্যা হলেও সে তেজ জুড়ায়নি। কাঁধের থলি সাপটে ধরে সে মাঠে এসে নামল।

সব কিছু তেমনি আছে। দূরের শালবন। অন্ধকাব কাঁদর সীমানায় তালবৃক্ষের সাব। এমন কি ভুলকো তারাটিও।

কিছুই তো খোযা যায়নি। আকাশ থেকে গড়িযে পড়া তাবাব আলোর শোভায মাঠ ভাঙতে ভাঙতে শ্রীপতি ভাবছিল ভুলো লাগবে কখন। কখন দেখবে মাঝে মাঝে চলেছে সেই ছায়া, মাথার চালচিত্রে শালবনের গন্ধ বাতাস আব হাসিতে এই প্রকৃতির জাগবণ। আসলে প্রকৃতি তো ঘুমাযনা, বিশ্রাম করে। সে বিশ্রাম ভাঙাতে ডাক পড়ে আর এক আলাভোলা প্রকৃতিব। সে যে তার ধরণ ধারণ বোঝে। এখন হাসি তো তখন কান্না। এই ঝোড়ো ঝাল তো ঐ আবার জল। শংকর বাউড়ী কি কবে বুঝবে এ তত্ত্ব। তাব হাতে যে বাঁশী নেই।

চলতে চলতে মাঝ মাঠ চলে এলো শ্রীপতি সেই ছায়ার লোভে লোভে। কিন্তু কোথায় সে। চারপাশে জোনাকি উড়ছে। আলোর মালা ঘুরছে অন্ধকারের বুকে। ফুলগুলি ছড়িয়ে যাচ্ছে দিক বিদিক। তালপত্রের বাজনায় তেমনি ঝরনার আনন্দ। এ সবের মাঝখানে এই প্রকাণ্ড মাঠ বিশ্রাম করছে। সারাদিনেব তাপ পুইয়ে ক্লান্ত। আর ঠিক এই ফাঁকে তার বুকের উপর এসে দাঁড়িয়েছে বাদ্যকর—সামান্য মানুষ। পায়ের নখে সামান্য আঁচড় কাটারও ক্ষমতা নেই। কোথায় দাগ দেবে, বুক যে পাথরের। এ তো আর শাল নদীর বালি না যে খুঁড়লেই জল টলটল। কি করবে এই একা পুরুষ। কিন্তু শ্রীপতি জানে তার থলিতে যে বস্তু আছে তার একটি ডাকেই এ পাথরে জল উঠবে। কঠিন মাঠি দুলে উঠবে। যে কিনা ভুলো লাগায় সেই পড়বে নিজের পাকে।

শ্রীপতি বাঁশীতে ফুঁ দিল। সারা রাতি ফুল কুড়ানোর গান। বাজাতে বাজাতে মাঠ পার হয়। চটকদার গানটি নিজের মতন করে জলদে বাজায় শ্রীপতি আর মনে হয় মাঠ জাগছে। বিশ্রাম ভাঙছে অলস প্রকৃতির। সমস্ত চরাচরে কেমন এক আয়েশ কাটানোর ভঙ্গী। মাঝখানে দুটি বৎসর বুঝি এমন করে কেউ ডাকেনি। আজ আবার ডাক এসেছে। ডাক এসেছে ভিতর থেকে। কিন্তু সে কি এখনো সেই ধন্ধে পড়ে ভাবছে—কার মনে কি আছে।

মাঠ এবং পথ ছেড়ে শ্রীপতি এসে থামল ডোমপাড়ায় সীমানায় বাদ্যকরের দুয়ারে। পাড়ায় পাড়ায় শাঁখ বেজে গেছে অনেকক্ষণ। চণ্ডীর থানে প্রদীপটি এখনো নেবেনি। তিন চারটি কুকুর তাকে দেখে ডেকে উঠল। সে হাঁক দিল—কে আছো হে।

প্রথমে ধেয়ে এল ছেলের পাল। যেন ধুলোর মুখে একরাশ শুকনো পাতা। টলোমলো এক শিশু তার দিদির জামার কোণা ধরে। পিছনে আলো হাতে প্রথমে সৃষ্টিধর। পরে পরে সুবল, নরেন। মুখের সামনে আলো ধরে বৃদ্ধ হাসল—ভাল রইছ ম্যাস্টার?

শ্রীপতি হেসে মাথা নত করল।

—মুখটো কেমুন শুঁখাই গেইছে। ছামুতে এস, চুখে লজর কম যে।

আলো কাছে এনে ভাল করে তার মুখ দেখতে থাকে সৃষ্টি। পিছন থেকে নরেন বলে ওঠে—উস্তাদকে দেইখতে কেমু—ন লুকে লুকারণ্য।

শ্রীপতি মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যি শাল বৃক্ষের প্রাণ কতো সুন্দর। সে কেবল বলল—সব খপর ভাল তো?

সকলে এক সঙ্গে জানান দিল তারা খুব ভাল আছে। দুটি বৎসর কষ্টে কেটেছে। ফসল হয়নি জমিতে যেমন কাজ ছিল না তেমনি উৎসবেও ডাক পড়েনি। দুর্দিনে কি আর আনন্দ করা সাজে এবারে দেশের দিন হয়তো খানিক বদলেছে বলেই গোটা কতক বায়না মিলেছে। শ্রীপতির হাত ধরে সৃষ্টিধর ভিতরে নিয়ে এল।

কিছুই খোয়া যায়নি। এমনকি সেই মোড়াটিও। শ্রীপতি বসেছে কোলের কাছে থলি সাপটে সামনে লণ্ঠন জ্বলছে যথারীতি। তারপরে গায়ে গায়ে বসেছে বাদ্যকরেরা। সকলে দেখছে মাস্টারকে। এ বছর আরো কতো না নতুন সুর পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কোথায়। মনসাকে তে ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় না। শ্রীপতি ভাবল জিজ্ঞাসা করে মনসার কি সমাচার। কিন্তু সে বলে উঠল—অধর কুথা গেইছে?

মহাদেব বলে—গুণীন কেবল চেলার খবর লেয়।

—না না, এমুনি শুধালাম।!—শ্রীপতি হাসল।

মহাদেব উত্তর দেয়—সি ছুঁড়া এখুন লেচে লেচে বিড়াইছে।

আবার প্রশ্ন করার আগেই সৃষ্টিধর সাঁওতাল পাড়ার দিকে হাত তুলে বলে—সি শালো উই ডান মাগীর লেগ্যে পাগল। বাজনা হাতে লেয় না, অষ্টপহর সিথায় থাকে।

কিন্তু এ সব সমাচারে যে তার মন নেই। ভেবেছিল এরপর কেউ নিজে থেকে হয়তো মনসার খবর দেবে। কিন্তু কেউ সে পথ মাড়াল না। আলোর সীমানা পেরিয়ে দূরে চোখ রাখল শ্রীপতি। সেখানেও কেউ নেই। কেবল দাওয়ার বাঁশের খোঁটায় একখানা মেটের হাঁড়ি দুলছে। এদিকে উঠান পেরিয়ে রান্নাঘর। আলো জ্বলছে। কাঠের আগুনের ছটায় কারা নড়াচড়া করছে বোঝা যায় না। রান্নাঘরের পাশ থেকে একটা ছাগল ডেকে উঠল। শ্রীপতি বাঁশী বার করল। সৃষ্টি অমনি বলে ওঠে—রাখ রাখ। দেহটা ঠাণ্ডা কর খানিক।

ও প্রান্তের ঘর থেকে শিশু কেঁদে উঠতে রান্নাঘর থেকে এক ঘোমটাবতী দ্রুত পায়ে সেদিকে চলে গেল। সৃষ্টি গলা তুলে বলল—সব ঘুঁমই গেইছ লয়?

এক কচি মেয়ের কণ্ঠে জবাব—দিছি, দিছি, জল গরম হন্‌ছে।

শ্রীপতি ভাবল আর দেরী করে লাভ কি। সে বাঁশীতে আলগা ফুঁ দিল। কোনো গান না। এমনি একটা যেমন তেমন সুরের মুখ ধরে বাজাতে লাগল। বাজায় কিন্তু চোখ বোঁজে না। মন যে বাজনায় নেই। মানুষগুলি নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। দু-একজন বিড়ি ধরিয়েছে! কেবল বুড়ো সৃষ্টি দুই হাঁটুতে হাত ঘষছে। জলদে বাঁশী বাজছে যেমন তেমন। যেন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে যেথা সেথা। এলোমেলো ঘুরে মরছে অন্ধকারে। হয়তো বা নিজের ভ্রমে নিজেই ঘুরে মরা। শ্রীপতি বাজায় কিন্তু উঠান কোণের অন্ধকার দোলে না, বাঁশীতে ডাক দেয় কিন্তু সাড়া মেলে না।

একটি ছোট মেয়ে এসে একবাটি মুড়ি রেখে যায়। সঙ্গে এক দলা গুড় আর আলুভাজা। বাঁশী রেখে বাটি তুলে নেয় শ্রীপতি। কেননা সৃষ্টি তাড়া মারছে বড়।

রান্নাঘর থেকে এক ঘোমটা টানা বৌ বেরিয়ে আসে, হাতে চায়ের গেলাস। হেঁট হয়ে পাত্রটি নামিয়ে রাখতেই শ্রীপতির হাত মুখের কাছে আটকে যায়। লণ্ঠনের আলোয় তার ঘোমটা ঢাকা মুখের সবটুকু চাপা থাকে না। বাদ্যকর পরিষ্কার দেখতে পেল মনসার নাকের পাটায় একটি ছোট তারা ঝিক মিক করছে। কপালে সিঁদুর আর পাতা কাটা কেশে চাকচিক্য।

শ্রীপতি স্থির। কিছু বলতে গিয়েও পারে না। মনসা যেন কতো সহবতে আর লজ্জায় পাত্রটি নামিয়ে রেখে চলে গেল। কিন্তু কোথায় সেই শালবনের গন্ধমাখা কেশের চালচিত্র আর সেই আলগা উদাস মাঠ। কোথায় গেল সেই কল কল হাসির ঝরনা, আগল ছাড়া বাতাসের ঝাঁঝর বাজনা। এ কি সেই মেয়ে যার কখনোই জানা থাকে না কার মনে কি আছে। সৃষ্টিধর বলে ওঠে—তুমাদের আশীর্ব্বাদ ম্যাস্টার, মনসা ভাল হঁয়ে গেইছে। বাবার থানে মানত ছিল যে।

বাদ্যকর আস্তে আস্তে মাথা নামায়। কোলের উপর বাঁশীটি। বিশ্রাম করছে। মহাদেব পাশ থেকে বলে ওঠে—হঁ, উব মরদটো ফিরে আইছে।

সামনে থেকে কালো পানা হ্যাংলা একটি লোক বিড়ি এগিয়ে দিয়ে দাঁত বার করে—আমি বাজনা বাঁজাই না উস্তাদ বিড়ি খাই।

আসর সুদ্ধ লোক সে রসিকতায় হেসে ওঠে। শ্রীপতি বিড় বিড় করে—আমি তো এ দিশ্য দেখার লেগ্যে আসি নাই হে...

সৃষ্টি বলে—কি বইলছ ম্যাস্টর?

শ্রীপতি আরো আস্তে বলে—কে জানে বাপু কার মুনে কি আছে...

বৈশাখের মত্ত বাতাসে ধুলোর মুখে শুকনো পাতা ওড়ে। কাঁদর পাড়ে তালপত্রে হাওয়ায় তুমুল ঝাঁঝরে বর্ষার শব্দ বাজে। দমকার তোড়ে লণ্ঠন নিবে যায়। অমনি সমস্ত চরাচরে ভুলো লেগে যায়।

অন্ধকারে স্তব্ধ শালবনের মুখোমুখি বসে বাজায় বাদ্যকর—তুমি বড় কঠিন পরাণ হে...

পাথুরে মাটিতে হাওয়ার ঝাল এসে ছোবল মারছে। ধুলোর আঁধিতে চারিধার ঝাপসা। খর বৈশাখের আগুনে প্রকৃতি জ্বলছেন। রুদ্রের জটায় যেন আছড়ানি বাজে। এমন এক তাতের দুপুর মথায় করে ফিরছিল বাদ্যকর। আগুনের ফুলকি ঐ রাঙা ধুলায় তার সর্বাঙ্গ রাঙা যেমন রাঙা মাথার উপরে ঐ আকাশ। এমন সময়ে হাজার মাথা খুঁড়লেও ভুলকো তারাটির দেখা মিলবে না।

বাগ্‌দান

আফসার আমেদ

দেউলিয়া বাজার থেকে বাসে করে কোলাঘাট ইস্টিশান। কোলাঘাট থেকে লোকাল ধরে পাঁশকুড়া যাবে। কমলা, নিতাইকে টরে টরে রাখছিল। যখনই বাসের থামার জায়গা আসে, নিতাই নেমে যায় কিনা। কিংবা নেমে গেছে কিনা। তারপর বাসটা যখন একটু খালি হল তখন নিতাই বাসের ওপরের রড ধরে তারসামনে এসে দাঁড়ালে স্বস্তি পায় কমলা। কমলা মুখ ঘুরিয়ে তিনশো জর্দার পিক ফেলল জানালার বাইরে। মুখ ফিরিয়ে আনল। ঠোঁটে গড়িয়ে এসেছে রাঙা পিক। জামার ভিতর থেকে হাত গলিয়ে রুমাল বার করে। পিকটা মুছল আর নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। নিতাই হালকা হাসলেও শান্তি পেল না কমলা। নিতাইয়ের শার্টের বোতাম লাগাতে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। বোতামটা লাগানো হয়ে গেলেও নিতাই ঝুঁকে রইল তার দিকে। বোতাম লাগিয়ে ফেলার পর আর জামা ধরে রাখার সুযোগ পায় না। হাত-দুটো নিজের কোলের ওপর পড়ে। রুমালটার দু-কোণায় দুটি মোড়ক। একটায় টাকা, অন্যটায় পানের খিলি। 'পান খাবে?'

'এখন নয়, থাক।' ঠিক এই কথাটি যে নিতাই বলল তা নয়। কথাটা এমন ধীরে বলেছিল যে, কমলা শুনতে পায় নি। হাওয়া আর বাসের গোঙানি ছিল। তবে নিতাইয়ের ঠোঁট নড়াচড়া আর ভঙ্গিতে এরকম কথা বলছে নিশ্চয়, ধরতে পারে সে। তখন সে রুমালের মোড়ক খুলে একটা পান বার করে। ঝুলে থাকা নিতাই পানটা লক্ষ্মীছেলের মত মুখে ফেললে কমলা হাসে তারপর। নিতাইও হাসে।

কমলা হাসছিল। চুড়িপাড় আর নীল জমিনে হলুদ ডুরে শাড়ি কোঁচ দিয়ে পরা। বেণীর মুখে ফিতে। খোঁপা করা। খোঁপায় জাল। চোখে কাজল। দেউলিয়া বাজারে নিজের পান সিগারেটের দোকান। ঝাঁপ ফেলে আয়নার সামনে কাজল পেনসিল দিয়ে নিজের চোখে নিজে কাজল টানতে গিয়ে সরু হচ্ছিল না তেমন। ন্যাকড়া ভিজিয়ে কাজল টানা সরু করছি যখন তখন ভাবছিল নিতাই এই আসে, এই আসে। বাইরে খাঁ খাঁ গ্রীষ্মের রোদেও ঝাঁপফেলা দোকানটার ভেতর আয়নায় তেমন আলো ছিল না। চোখের পাতায় কেমন হালকা ছায়া এঁটে ছিল কমলার। নিতাই, নন্দ পালের হোগলার দোকানে হোগলা বাঁধে ফুরনে। বেলা এগারটা। তখনো হোগলা বাঁধছিল। কোনো কোনোদিন এই হোগলা মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে চলে যায়। কমিশনে রোজগণ্ডা হয়ে যায়। রোব-সোম-মঙ্গল এই তিন দিন হাওড়ার মিমানি হাটে মুটের কাজ নিতাইয়ের। জগন্নাথ ঘাট আর হাটে মাল বয় সোম-মঙ্গল। রোববারে গদিঅলার গাঁট বয়। রাতে। রোববার সন্ধেবেলা পৌঁছে যায় সে মঙ্গলা হাটে। আজ শনিবার। কাল যাবে। বেলা এগারোটায় পান খেতে এলে কমলা মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। নিতাইয়ের ওপর গোঁসা হয়েছে দেখাচ্ছিল কমলা। নিতাই নিজে নিজেই পান ভাঙতে থাকে। দু-শো টাকা হাওলাত নিয়ে বোনের বিয়ে দিয়েছে, এখনো দিতে পারে নি, সে কথা নয়। ভর রাতে বাপ আর ছোটভাই ঘুমুচ্ছিল, কমলা তখন রোডের ধারে চালায় ফিরে গিয়ে দোকানের ক্যাশ গুনছিল, নিতাই মদ খেয়ে এসে বাপকে জাগিয়ে তুলল। বাপকে

বলল, সে কমলাকে বিয়ে করবে। বিয়ে করবে করবে, রাত-দুপুরে মদ খেয়ে বাপকে ঘুম থেকে তুলে এমন করা কেন?

গত রাতেই এমন কাণ্ডটা করেছে নিতাই। দেউলিয়া বাজারের দোকানপট্টির সকলেই জানে নিতাইয়ের সঙ্গে তার ওঠাবসা চলছে। দু-দিন ছাড়া একসঙ্গে সিনেমা দেখেছে। কমলার চার-বছরের ছেলেটাকে নিয়ে ঘোরে। কোলে-কাঁকালে নেয়। দোকানের পাটাতনে পাশে বসে শাড়ির পাড়ে চোরপোলতে বেছে দিতে অনেকে দেখল দু-দিন আগে। নিতাই পানে চুন ঘষছে আর হাঁ করে নিতাইকে দেখছে কমলা। পাশে বসে পান-বিড়ি সিগারেট বিক্রি করে নিতাই। হাঁ করে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে কমলা। নিতাইয়ের একবারও বিয়ে হয় নি। আসলে কমলা, নিতাইকে কাছে কাছে ধরে রাখার ঘনত্ব চাইছিল। কখন কি কোন ঘবের বেটিকে ধরে আনে। এটা একটা ভয় আর আশঙ্কা। কেননা নিতাই বড় একটা কথা বলে না। এই চুপচাপকে ভয়। কখন কি করে বসে।

পাখির মত তার কাছে নিতাই আসে। কথা শোনে। কিন্তু এক-এক সময় এমন ভাবে উঠে যায়, তাতে কেঁপে ওঠে কমলা।ফের যখন আসে তখন রাস্তার কুকুরকে গালাগাল দিয়ে তার রাগটাকে বোঝায় সে। নিতাই নিথর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কমলা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। দেউলিয়ার ফুলের বাজাবের ফুলের মত হেসে ওঠে। নিজের হাতে তিনশো জর্দা দিয়ে পান ভেঙে বাড়িয়ে দেয়। নিতাইকেও হাসতে হয়। হোগলা বাঁধতে বাঁধতে উঠে এলে নিতাইযের মাথায় তখনো গামছা জড়ানো থাকে। গামছাটাকে টান মেরে খুলে দেয কমলা। হাতপাখাটা দু-এক বার ঝাপটা মেরে রেখে খদ্দের সামলায়। এটা ওটা হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য কোমরে খোঁচা মারে নিতাইয়ের। তিনশো জর্দার পিকে তখন গাল ভর্তি কমলার। মাথাটা চনমন করে। ভুল কৌটোটা বাড়িয়ে দিলে নিতাইকে আবার খোঁচা মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ে কমলা। পিক গড়িয়ে যায় ঠোঁট বেয়ে। গলায় এসে পড়ে। গলায় রুপোর হার। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে এমন ভাবে গলার পিক মুছতে থাকে যে, নিতাই তারদিকে তাকিয়ে থাকবেই।

বাসের ভেতর তেমন করেই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল নিতাই। এখন ত আর জামার বোতাম লাগাচ্ছে না,—তবুও। তাদের বিয়ে হতে পাবে। কিন্তু প্রেম আলাদা সামিগিরি। চেনা মানুষ বলে প্রেম করার সুযোগ পায়। বিয়ে হলেই যে এমন প্রেম হয় তা নয়। বিয়ে হলেও প্রেম না হলে ছাড়াছাড়ি হয়। কিন্তু বিয়ে না হলে, প্রেম হলে ছাড়াছাড়ি হয় না।

আর দু-চারজন এমন নিজে পান ভেঙে খেত। দোকানেব পাশ দিযে কতদিনের পর না তাকিয়ে হেঁটে গেলে খচ-খচ করে ভেতরটা কমলাব। বউয়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। কিংবা বালিচকের পাটিওয়ালার সঙ্গে এক বছর পরে দেখা।পয়সা ফেলে পান ভাঙে। পান দিতে হাত সরছে না যখন লোকটা তাকিয়ে চমকে ওঠে। কমলা তার এই এড়িয়ে যাওয়াকে মুছে দিতে পারে না। পাশে তারই কোনো সাঙাত আছে। পান নিয়ে খদ্দেরের মত চলে যায়। তাদের সঙ্গে কমলার ওঠাবসা ছিল এমন। অথচ সম্পর্ক ঘন হয় নি। ধরে রাখতে পারেনি। প্রেম হয় নি। প্রেম হল না বলে যুগলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল কমলার। যুগলের সঙ্গে আনাজওয়ালি মেয়েটার প্রেম হল। বেশিদিন

নয়—এক বছর। তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে গেল, আর ফিরে এল না। পরে শুনেছিল যুগলের সঙ্গে মেয়েটার আগে প্রেম হয়েছিল। একসঙ্গে তারকেশ্বরে গিয়ে প্রেম ঘন হয়। আর ফিরে আসেনি দেউলিয়া বাজারে।

নিতাইয়ের সঙ্গে পাঁশকুড়ার 'চারুলতা'তে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে কমলা। সামনের গ্রামে নিতাইয়ের দাদা-বৌদি-মা-বাপ-ভাই-বোন মিলে লণ্ডভণ্ড সংসার। ঘরভিটেতে ঠাঁই না হোক, তার চালাতে থাকবে না হয় নিতাই। কমলার বাবা, ছেলে ও ছোটভাই থাকে। নিতাইয়ের আর জায়গা হবে না। যুগলও থাকত। আটাত্তরের বানের ঘা খেয়ে ময়না থেকে বাপ ভাই মায়ের হাত ধরে মাসুমচক থেকে চলে এসে দেউলিয়ায় বাঁশ পুঁতে চালা করেছে বাপ। দেশের জমি বেচে পান-বিড়ি সিগারেটের দোকান সাজিয়ে দিয়েছে সেই আট বছর আগে, ফ্রকপরা কমলাকে। মা মরল কলেরায়। বাপ মনোহর সাতের গদিতে ফুল-ডাকার কাজ নিল। ভাই লাক্‌সারি বাসের হেলপার এখন। পনের টাকা রোজ। চিটফান্ডের একটা বইয়ে ছ-শো টাকা, আর একটা বইয়ে এগার শো টাকা জমিয়েছে কমলা। দু বছর আগে প্রায় হাজার টাকা জমিয়েছিল সে। একটা ছ-আনা ওজনের সরু হার গড়িয়ে নিয়েছিল। তারকেশ্বরে যাবার সময় যুগল সেটা নিয়ে পালায়। মদন খাঁড়ার করাতকলের কাজটা ছেড়ে দিয়ে গেল যুগল। এ মুখো আর হয় নি। দেউলটিতে থাকে। করাতকলের লরির ড্রাইভারের পাশে থাকত। লোহাদা, দাশপুর, পাঁশকুড়া,মেছেদা, বালিচক, ঘাটাল, দেউলটি, উলুবেড়ে যেত ফিতে ফেলে কাঠ মাপতে। কাঠমাপা, লরির সঙ্গে থাকা আর চেকপোস্টে লরি কোর্টে তুললে ছাড়াবার ব্যবস্থা করা ছিল তার কাজ। তার পার্টির কাছে তাগাদা মারা, আদায় করাও ছিল তার কাজ। কখনো ট্রেনে-বাসে-লরিতে—কোনো ঠিক থাকত না।

নিতাই পরে বলেছিল। যুগলকে মেয়েটার সঙ্গে পাশাপাশি ট্রেনে চড়ে আসতে দেখেছিল নিতাই। রাতের ট্রেনে শেয়ালদা থেকে কাঁচা আনাজ আনত মেয়েটা। তারই সঙ্গে দেউলটি নেমে যেতে দেখেছে কেউ কেউ। একদিন নাকি যুগল পার্টির বাড়ি থেকে দু-হাজার টাকা ট্যাকে করে আনছিল। ভিড়ভাট্টা ট্রেন। ট্রেনে উঠে ট্যাক হালটে টাকাটাকে আর পায় না। টাকা হারিয়ে মনমরা হয়ে হায় হায় করছিল যখন তখন আনাজওয়ালি মেয়েটা ট্রেনের ভেতর কুড়িয়ে পাওয়া টাকার বাণ্ডিলটা যুগলকে দেয়। সেই' টাকা ফিরে পেয়ে যুগলের সঙ্গে মেয়েটার প্রেম হয়ে যায়। যুগল নাম-ঠিকানা নিয়ে তার কাছে যেত। বিধবা বউ সে। যে ট্রেনে সে আসত যুগল সেই ট্রেনে আসত। মেয়েটার মাল বয়ে নিয়ে তার সঙ্গে যেত সে। তারপর তারকেশ্বরে গিয়ে আর ফিরে আসে নি যুগল। ওখানে নাকি চশমার কাচে পাওয়ার লাগাবার কারখানায় ফুরনে পাওয়ার লাগায়।

নিতাইয়ের জামার বোতাম লাগাচ্ছিল না, তবুও ঝুঁকে রয়েছিল নিতাই তার দিকে। হঠাৎ ঝাঁকুনি। জামা খামচায় কমলা। হাসে। নিতাইও হাসে। নিতাইয়ের হাসিটা ঠোঁটের কোণেই গেঁথে থাকে। ছেলে টুনাকে কোলে কাঁখে নেয় নিতাই। ওঠাবসার ভাবসাব। চেনাজানা, ভাবসাব। প্রেম কি হয় নি? নিতাই টাকা ধার নিয়েছে বোনের বিয়েতে। টাকা শোধ চায় নি। দোকানে এসে পান খায়। বসে। গল্পসল্প করে। নিতাই একবারও বিয়ে করেনি। কমলাকে তার খরাপ লাগবে বলে দিতেই পারত। জানে, সবাই জানে।

তারও বয়স কাঁচা। নিতাইও কাঁচা বয়সের বাড়ন্ত ছেলেটা। বাপটাও এক বে-আক্কেলে, নিতাইয়ের সঙ্গে মদ খায়। সাট্টা খেলে। অত সব পয়সা কোথায় যায় নিতাইয়ের?

নিতাইকে কমলার চোখ দেখছিল। দোকানে জেনারেটারের দেয়া বাল্বের আলো। নিতাই মদ টেনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশের পান-বিড়ি-সিগারেট দোকানের রবে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে। রেডিও সেন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও রবের দোকানে নারকেল-দড়ির মুখে আগুন জ্বলছিল। মিষ্টির দোকানে কারিগররা কাজ করছে। শেষ বাস প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে গেছে। বোম্বে টেলার্স'-এ সেলাই মেশিনের ঘ্যার ঘ্যারর শব্দ, আর টেপ-এ হিন্দি গান। দূরে অন্ধকারে কল চাপার ঠকাং ঠন্‌ঠন্ শব্দ। কুকুরকে অন্ধকারে কেউ লাথি মারে। রাস্তা দিয়ে ঘটাং ঘট কিট্ কিট্ রিক্‌শা চলে যায়। সাইকেল যায় শন করে। ট্রাক ধুলো উড়িয়ে যায়। একটু হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। গুমটিতে যা গরম। বিন্ বিন্ ঘামে কমলা। লন্ড্রিতে আঁচ ফেলে দিয়েছে। চা-দোকানে ধোয়া-পাকলা করছে কর্মচারীরা। কোথা থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে এসে নাকে লাগছে। রাত থেকেই কিছু কিছু ফুল এসে জড় হয় দেউলিয়ার আড়তে। ফুলের আড়ত। বড় আড়ত। ভোর থেকে চলবে কেনাবেচা। নিতাইয়ের হাঁটা চলার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। নিতাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে কমলা। চালার বাইরে লুট করে শুয়ে থাকবে লোকটা। অনেক দেখেছে নিতাইকে কমলা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ তল্লাটের অনেকে জানে। কিন্তু কমলা জানে তাব আর নিতাইয়ের মধ্যে ভাবসাব হয়েছে, প্রেম হয় নি।

কেননা তার সঙ্গে আর দু-চারজনের ভাবসাব হয়েছিল, প্রেম হয় নি। যুগল চশমার কাচে পাওয়ার লাগায়।

নিতাইয়ের সঙ্গে পাঁশকুড়ার 'চারুলতা'য় ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখবে। ফিরবে একসঙ্গে।

কোলাঘাট স্টেশনে এসে বাসটা থেমে গেল। আগে নামল নিতাই। পরে নেমে নিতাইয়ের মুখোমুখি কমলা। রোদ খাঁ খাঁ করছে। নিতাইয়ের জামা ভিজে শপ শপ করছে।

নিতাইয়ের বসন্তের দাগ ভরা মুখ চক চক করে উঠল রোদে। লুঙি পরা। শার্টের নীচে লুঙির ওপর নিশ্চয় গামছা আছে। ঘাম মুছছে না নিতাই।

নিতাই বলল—'একটা ছাতা যদি থাকতোক কে!'

সিনেমা হলে ত পাখা আছে।' কমলার গলায় আশ্বাসের সুর। রুমালের গিঁট খুলছে। একটা পানের খিলি বার করে নিতাইয়ের হাতে গুঁজে দেয় কমলা। "ঠাণ্ডা লিমকা খাবে?'

'গালে পান।'

'পান ফেলে দাও, নতুন পান দুবো কো।'

হাত ধরে নিতাইকে দোকানের সামনে নিয়ে যায়। ঢুকে যায় দোকানের ভেতর দোকানদার সুইচ টিপে পাখা চালায়। নিতাই কমলা টেবিলে মুখোমুখি। কমলা হাসে। নিতাই হাসে। 'কোলাঘাটে, মোকে অনেকে চেনে।'

'স্যাঙাত?' কমলা চোখ দুটোকে আয়ত করে রাখে।

'স্যাঙাত কেউ কেউ। খরিদ্দার আছে ঢের কতক।'

'মোর নেই কি? যারে দেকি তারেই চেনা লাগে—দেউলিয়া বাজার কে না যায়?
দুজনে পাইপ দিয়ে লিমকা খায়।

কমলা বলল—'কামাখ্যা বলছিল পাতালে রেল চলছে কলকাতায়। মেয়েছেলে কথা বলে আর রেল চলে। লোলিত হাজরার ছেলেটা পড়ে পড়ে পাগল হয়ে গেছে। ইংলিশ কাগোচ দাও, গড় গড় পড়ে যাবে। গোপালের বিড়ির কারখানায় কুঁজো খাঁদু বে করেচে জানো ত! হাবাগোবা নয়, ভাল গেরস্তের মেয়ে। ফর্সা। তবে দাঁত উঁচু। তমাকে কতোবার বলেচি টর্চবাতি লিবে। এই গরমের হাওয়ায় মাঠে-ঘাটে সাপখোপ থাকতে পারে।কোথাটা কমলার কিনা! গরিবের কোথা বাসি হয়।' নিতাইয়ের ঠোঁট বেয়ে লিমকার জল গলায় পড়লে, কমলা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। বলল, 'দকানের ঝাঁপ ফেলতে গিয়ে আঙুল খেঁতলে গেছে। এই দ্যাকো।'

নিতাই হাত বুলিয়ে দেখে। বলে, 'জগা মিলে কাজ করে, দেকেচ ত তাকে? তার এই আঙুলে একসিডেন হইছিল। শুনেচ, দেউলিয়া বাজারে সিনেমা হল বসবে আর বরফকল? মাড়োয়াব দেড় লাখ টাকা দরে জমি কিনেচে দ্যাখো নি রোটের ধারে? ইট গেঁথে ঘিরে লিচ্চে। ওখেনে তাঁত বসবে। মেছেদায়, থার্মলে কনটাক্টর লোক খাটাচ্ছে ঢেরখানেক। মনু বলল, মেশিন লোহলক্কড় লেথুড়। পালকি বেয়ারা আর দেশে দেকেচ একটাও? ইয়াজদি কত হাজার টাকা জানো? চোদ্দ হাজার। হাটে যেয়ে ত দেখ নি ঘাড়ে কত মাল লিতে পারি? সে যতই হোক, মাথায় তুলে দেয়া চাই শুধুকে। এগবার ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝে লব—ব্যস।'

কমলা বলল—'দোকানের টাটে ঠায় বসে থাক না, দেকবে শিরে কেমন ব্যতা হবে। রাতের বেলা শোও, ব্যতা। খদ্দেড়ের ঝুড়ি ঝুড়ি কথার জবাব দিতে দিতে মাথা ছিঁড়ে যাবে কেন?

নিতাইয়ের সরল হয়ে উঠেছে মুখচোখ। 'গালাগালিদাও আর ঘেন্না কর, মাঝে মাঝে মাল না খেয়ে থাকতে পারবু নি।'

'কয়েকটা কাঁসার থালাবাটি, গেলাস, দুধখাবার বাটির বড় শখ', কমলার ভেজা গলা।

নিতাই, কমলার আঁচলে নিজের আঙুল জড়াচ্ছে।

'ময়নার মাসুমচকে মোদের ভিটে-জমি ছিল। ঠাক্‌মার কোলে চড়তুম খুব। বাঁশবাগান, খড়িবন আর বানবরোজ', নিতাইয়ের শার্টে বোতামে হাত দেয় কমলা। বোতাম খোলে আবার লাগায়। কানের লতিতে ট্যাপ গেঁথে আছে তার। ঠোটেরওপর ঘাম জেগে উঠেছে। গালের ভেতর লালা। চোখের পাতা ওঠানামা করছে ঘন ঘন। জামার বোতামটা ফের খোলে। নিতাই বলে—'সুখ শান্তি পেলে বাঁচি।' জামার বোতামটা আবার লাগিয়ে দেয় কমলা।

পয়সা মিটিয়ে নিতাইয়ের পেছু পেছু হাঁটে কমলা। নিতাই লম্বা লম্বা পা ফেলেএগিয়ে যাচ্ছে। বুঝি ভাবসাব শুধু, প্রেম হয় নি। না হলে এত ছাড়া ছাড়া হাঁটে কেন নিতাই?

'টিকিট কাটবে নি?' পেছন থেকে হাঁকে কমলা।

'টিকিট লাগবে নি—চল তঁ।'

প্ল্যাটফরমে, নিতাই হন্তদন্ত। লোক গিজ গিজ। দু-ঘণ্টা কোনো ট্রেন আসে নি। মেদিনীপুর লোকাল দেবি কবে আসছে। ইস্টিশানের কলে চোল চোল করে মুখে

জল দেয় কমলা। নিতাই ট্রেনের অভ্যস্ত যাত্রী, তৎপর হয়ে উঠছে। কমলা মুখে আঁচল ঘষে। ট্রেন আসছে। নিতাইয়ের মধ্যে অস্থিরতা। কমলার ধীরতাকে বেয়াত করে না। সে যেন এই ভিড়ের মধ্যে টুপ করে মিশে যেতে পারে। কমলার দোকানে এসে বসা নিতাই আর থাকবে না। পাখির মত এসে বসে থাকার মানুষই নয় যেন সে।

নিতাই হিড় হিড় করে হাত ধরে টানে কমলার। ভিড় ঠেলে নিয়ে যায়। যেন বস্তা নিয়ে যায়। ব্যাথাভরা আঙুলটা বাঁকিয়ে ধরে ব্যথা দিতে দিতে যেন বস্তায় হুক মেরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এই জনস্রোতের চাপে নিতাই ভুলে গেছে কোন আঙুলটায় তার ব্যথা। এখানে দাঁড়াও, এখেনে লেডিস, খুব ভিড় হবে—লেডিস ছাড়া উঠতে পারবে নি—পাশেরটায় মুই উঠচি—পান ফেলে দাও। কিন্তুক পিক ফেলতে পারবে নি, যা ভিড়!'

ট্রেন থামতেই লেডিস কামরায় ঠেলেদিয়ে পাশের কামরায় উঠে যায় নিতাই। ট্রেনের ভিড়ের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে কমলা বুঝি বা আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল। বুঝি বা জ্বরের ঘোরের ওপর কষ্টে বক বক করার মত কথা বলে ওঠে। হাতের মুঠোয়তাপ আর কানতলা গরম কমলার। ঘামে চোখের কাজল চোখের ভেতর গিয়ে জ্বলুনি দিচ্ছে। ট্রেন যাচ্ছে। হাতের কাছে নিতাইয়ের শার্টে বোতাম নেই। নিতাই যেন অচেনা হয়ে উঠল হঠাৎ। শিমুলতলিতে ঘর। মুটের কাজ ও হোগলা সেলাইয়ের কাজ করা নিতাই মালাকার। তড়বড় করে হেঁটে যেতে পারে। চেনা মানুষকে যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় অচেনা লাগে তেমনটা মনে হচ্ছিল নিতাইকে কমলার। কখনো কখনো দেউলিয়ার বাজারেই মনে হয়। দোকান থেকে বিদায় নিয়ে পেছন ফিরে চলে যাবার সময় মনে হয়েছিল তার। কাঁধে ফেলা গামছার পুঁটুলি। ওতে কী আছে? একবারও পেছন ফিরে তাকায় না আর। বনতুলসী দিয়ে ঘরের চারপাশ বেড়া দিয়ে রাখলে কাদের গরু এসে বেড়া ভেঙে দিয়ে গেছে শোনালে নিতাই কথাটাকে শুধু সমস্যাই মনে করে। বনতুলসীর আনন্দ তার চোখে পড়ে না। অথচ ছেলে টুনার শিকনি নিজের হাতে ফেলে কোলে কাঁখে নেয়। বোতামে হাত দিতে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। মদ খেয়ে চলতে না পারার সময় সঙ্গে যাবার জন্যে আকুল হয়। নেশা করে হাজারবার সে বলেছে তাকে বিয়ে করবে। নিতাই একবারও বিয়ে করে নি। বুঝি শখ-আহ্লাদ অনেক। ফুল পায়ে মাড়াতে ভয় করতে দেখেছে। কুকুরকে সজোরে লাথি মারে। সিনিমাহলে সিটি দেয়। রেগে গেলে কোনো খিস্তি মুখে আটকায় না তার। অথচ সিনিমাহলে কমলার ঘুম ধরেছে বলে মাথাটা নিতাইয়ের বুকে নুইয়ে দিলে, নিতাই সত্যি ভাবে কমলার ঘুম ধরেছে। অথচ দোকানের ভেতর বসে থাকতে থাকতে, চেয়ে থাকতে থাকতে, পাশে একমনে থাকতে থাকতে; দূরের খদ্দের দোকানে আসতে দেখতে পেয়েও কমলার হাতটা মুঠোয় চেপে ধরে এমন যেন, কোনোদিন ছাড়বে না।

পাশের কামরায় নিতাই। জালের ঘেরাতে কমলা নিতাইকে দেখতে পায়। ভিড়ের মধ্যে হ্যান্ডেল ধরে পেছনে ফিরে আছে। অথচ নিতাই তাকে দেখতে পাচ্ছে না। উঃ কি গরম। উসখুস করে কমলা। রাইফেলধারী পুলিশ আর কালো কোট পরা চেকার নিতাইয়ের কামরায় উঠে গেছে। টিকিট দেখছে সকলের। গাড়ি ছাড়ে। গাড়ি

যায়। নিতাই যদি ধরা পড়ে যায়। তার কামরায় উঠে সেও ধরা পড়ে যাবে। বুক ধড়ফড় করে কমলার। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু খাবার জল যদি পেত। ভোগপুর এল। ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে কেউ কেউ পালাচ্ছে। ট্রেন ছাড়ছে। নিতাই দাঁড়িয়ে আছে। কামরার ভেতরে অস্বস্তিতে কাটায় কমলা। নিতাইয়ের থেকে চোখ ফেরায় না সে। সে বুঝি পালাবার সুযোগ পাচ্ছে না। যাদের ধরেছে, তাদের কোমরে দড়ি বাঁধা। পুলিশ দুটো দড়ি ধরে আছে। চেকার বিনা টিকিটের যাত্রীর কলার ধরে টানতে টানতে পুলিশকে দিচ্ছে। পুলিশ দড়িতে কোমর বাঁধছে। এক দড়িতেই। ট্রেন থামছে। ট্রেন যাচ্ছে। নিতাই নামার সুযোগ পাচ্ছে না। নিতাই ধরা পড়ে গেছে। কি সর্বনাশ। পুলিশ ঘিরে আছে তাকে। কোমরে দড়ি পরাচ্ছে। একটা দড়িতে পাঁচজনকে বেঁধেছে। নিতাইয়ের বুকে নত হওয়ার সখ। কমলার কান্না পায়। ট্রেন যাচ্ছে। ট্রেন চলছে শন শন। নিতাইকে নিয়ে পাঁশকুড়ার 'চারুলতা'য় সিনেমা দেখতে এসেছিল। শুধু কি সিনেমা দেখতে এসেছিল? একসঙ্গে থাকার কথাটা পাকা করত সে।কেননা যুগল আর আসবে না। নিতাইয়ের থাকার জায়গা নেই—চলে আসতে বলত। একটা বিয়ে হয়ে যেত তাদের।

এই মুহূর্তে নিতাইয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা মানতে পারছিল না কমলা। নিতাই-এ মন বসে গেছে তার। কম কথা বলে। চুপ করে থেকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় কিছু। এমন খেপাটে, মুখগোঁজা, গায়ের পাশে পোষা পাখির মত থাকা নিতাইকে নিয়ে ঘর করতে তার মন বসে গিয়েছিল। কুড়ে নয়, কিন্তু পয়সা ওড়ায়। কমলাও রোজগার করে। কমলা ঘামছিল। পরের স্টেশনে গাড়ি থামল। পাঁশকুড়া। পাঁচজনকে পুলিশ ঠেলতে ঠেলতে নামাচ্ছে। কাঁধে বন্দুক। কমলা ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগচ্ছে। কমলা নেমে পড়ে। মাথাটা ঘুরে যায়। ডাউনের লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। তাতে পুলিশগুলো নিতাইকে তুলল। কমলা, নিতাইয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। মেছেদায় নিয়ে যাবে ওরা নিতাইকে।

চলন্ত ট্রেনে উঠতে যাচ্ছিল কমলা, সামনে এসে হাতটা ধরে ফেলে দাশরথি।

'কি করছু? চলন্ত ট্রেনে উঠচু যে?'

'না, নিতাই বিনা টিকিটে চড়েছিল, চেকার ধরেচে।'

'কুন নিতাই?'

"হোগলা বাঁধে।'

'তমার দকানে যাকে দেখি?'

'অই ত।'

কমলা হাত দিয়ে চোখ ঘষে। কাঁদে।

'থামো থামো, লোগ পাঠাচ্ছি। মেছেদায় নিয়ে যাবে নিশ্চয়। কদিন ধরে চেকিং চলছে। জানু নি? এস।' হাত ধরে টানে দাশরথি। খুস করে হাতের টানে দাশরথির সঙ্গে চলতে থাকে কমলা। কমলা কাঁদছিল। দাশরথি গোঁজ হয়ে চলেছে। বুঝতে চাইছিল কমলার অবস্থাটা। 'কথাকে আসছিলে?'

'পাঁশকুড়ায়। সিনিমা দেখতে।'

'নিতাইয়ের সংসার নেই?'

'না। ও কথা শুধালে?'

দাশরথি হাসে। 'জানি নি কিছু মনে করেছু?'

কমলা মুখ টিপে হাসে।

দাশরথি লাইন থেকে নেমে হাঁকে—'মহাদেব।'

চায়ের দোকানে একটা লম্বা মত ছেলে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। 'মেছেদোয় যা তো একবার।'

কমলাকে দেখছিল মহাদেব। 'তমার দেউলিয়া বাজারে দকান আছে নয়?'

মাথা হেলায় কমলা। দাশরথির ভাই। মহাদেবকেও আগে দেখেছে কমলা। দাশরথি দোকানে দোকানে 'তুফান' ব্যাটারি সাপ্লাই করে। কমলার দোকানেও ব্যাটারি বিক্রি হয়। দাশরথি প্রতি হপ্তায় ব্যাটারি দিতে যায়। দাশরথির বদলে মহাদেবও দু-একবার ব্যাটারি দিয়ে এসেছে। মহাদেবকেও চেনে কমলা। কমলা চেনাজানা চোখমুখ নিয়ে মহাদেবের দিকে তাকাচ্ছে।

নিতাইকে চিনিস ত?' মহাদেবকে দাশরথি শুধায়।

'কুন নিতাই? কী হয়েছে?'

'দেউলিয়ায় নন্দ পল্যের দকানে হোগলা বাঁধে, হাওড়া হাটে গাঁট বয়, চিনিস নি?'

'খুউব। শালাকে ধাতানি দিতে হবে?'

'না না। উইদাউটে আসছিল, ধরে নে গেছে মেছেদোয়—ছাড়িয়ে আনবি।' দাশরথি বুক পকেট থেকে একগোছা টাকা বার করে কুড়ি টাকার একটা লাল নোট মহাদেবকে দেয়। মহাদেব টাকা নিয়ে এক মুহূর্তে শুধু কমলাকে দেখেছিল, তারপর লাফিয়ে চলে যায়।

পাঁশকুড়ায় নামতেই এমন চেনা-পরিচিত সব। দোকানপসারি, রাস্তায় রাস্তায় কত চেনাজানা আরো আছে। রিকসাওয়ালা, মুটে মিস্ত্রি, চাষা, খরিদ্দার অনেকে চেনা বোধ হয়। স্টেশন-লাগোয়া শহরটা। রেললাইনের পাশেই খাতের ধারে বস্তি, শুয়োর চাষ, মোষ খাটাল। মাংসের দোকান। বিড়ি বাঁধার কারখানা। আনাজের আড়ত। ইলেকট্রিক তার, টেলিফোন লাইন। মানুষের বসবাসে ঠাসা।

'কে এসেছে দ্যাখো।'

বড় রাস্তার নীচে পাঁশকুড়া স্টেশন লাগোয়া দাশরথির ঘর। চালার ওপর কুমড়ো লতা। রোদ লেগে পাতা কুঁকড়ে ছিল।

দাশরথির বউ খাওয়া শেষ করে থালাবাটি হাতে সাজিয়ে উঠে দাঁড়াল। কমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টর টর করে খাতেরদিকে থালাবাটি মাজতে নেমে গেল। পাশের ঘর থেকে একটা কালো মত বউ বেরিয়ে এল। সে কমলাকে দেখছিল।

দাশরথি বলল, 'রীনার মা, এ হল মোদের বৌদি—দেউলিয়ায় পান-সিগারেটের দকান আছে। বৌদি—ইটা মোদের মহাদেবের বউ। তোর দিদি অমন করে চলে গেল কেন বলতো রীনার মা?'

মহাদেবের বউ এগিয়ে আসে। 'কে দিদি?' হাসে মহাদেবের বউ। 'তমার যাবার সময় ঝগড়া হইছিল মনে নেই তমার?'

দাশরথি হেসে ফেলে। 'এই যা, ভুলে বসে আছি।'

দাশরথি খাতের দিকে নেমে যায়। হয়তো বউয়ের মান ভাঙাবে। সোয়ামির সঙ্গে

কমলাকে দেখে হয়তো কিছু ভেবেছে। কমলার হাসি পায়, ভারি জ্বালাতন!

রীনার মা এসে উঠোনে একটা আসল পেতে দেয়। চালায় খোসা একটা পাখা পেড়ে দেয়।

কমলা পাখা হাতে নিয়ে মহাদেবের বউয়ের দিকে ঘাড় তুলে তাকাল।আসনে বসে তার ডান হাতটা টেনে ধরল। মহাদেবের বউ তার সামনে উখড়ে বসে হাসল। বলল—'দিদির কটা ছেলেমেয়ে?'

'একটা—ছেলে।' তারপর ঢোক গিলে বলল, 'জল।'

রীণার মা উঠে জল গড়াতে যায়।

কমলা ঘাড় কাত করে বউটার দিকে মুখ ফেবায়। 'দি বাতাসা দিউনি—বমি বমি লাগছে।'

রীনার মা শুধু হাসি-মুখ। একগাল হাসতে হাসতে জলের গ্লাস এনে সামনে ধরল। 'পেটে ছেলে বুঝি?'

'ধ্যোৎ! তমার ত!'

'হ্যাঁ—মুখে আঁচল তোলে রীনার মা। 'ছ-মাস বলে ধরতে পারলে দিদি।'

দাশরথি খাতের ঘাট থেকে বউকে সঙ্গে নিয়ে উঠে আসছে। বউয়ের হাসিমুখ। দাশরথির দিকে মুখ কাত করে হাসতে হাসতে, দাশরথির কথা শুনতে শুনতে উঠে আসছে।

দাশরথির বউ চালায় ঢুকে গিয়ে থালাবাটি ঝন ঝন করে রাখে। যেন সারা শরীর তার হেসে উঠল।

দাশরথি উঠোনতলায় দাঁড়িয়ে—'একটু চিনির জল করে দাও সোনার মা।'

সোনার মা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রীনার মার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। ঘরের ভেতর দুজন ফিসফাস করছে। নোয়া শাঁখার ঝনঝনানি। ফিসফাস, চাপা হাসি।

দাশরথি, 'বৌদি, নিতাইকে ছাড়িয়ে এখানেই আনবে—তা এখেন থিকে তমাদের আর যাওয়াযাওয়ি নয়।'

'ও কোথা এগবারও বল নি দাশুদা—আর একদিন এসে থেকে' যাব।'

'আর একদিন থাকতে পারবে, আর আজ থাকতে পারবে নি হয়! কারখানা দূরে, কয়েকটা দকান ঘুরে আসছি বৌদি।'

বীনার মা সোনার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দাশরথির বউ, 'তুমি যেথাকে যাচ্চ যাও, দিদি এখন মোদের হাতে, যাওয়াযাওয়ি এখন মোদের হাতে।'

দাশরথি চলে গেল।

কমলা ঘামছিল। পাখা ঘোরায়। দাশরথি, নিতাইয়ের কথা তার বউকে বলে দিয়েছে। বউ আবার তার জা রীনার মাকে বলছে। চুড়ি পাড় আর নীল জমিনে হলুদ ডুরে শাড়িটা গায়ে কেমন দেখাচ্ছিল তাকিয়ে বুঝতে চাচ্ছিল কমলা। স্খলিত আঁচল। বুকের কাছে এসে পড়েছে। ভেতরে জামা ভিজে গেছে। কোথা থেকে হালকা একটা হাওয়া মাঝে মাঝে আসছে। গায়েগতরে লাগে। আরাম বোধ হয়। কোথায় সেলাইকল চলার ঘ্যার ঘ্যারর শব্দ হচ্ছে। পাশের চালার পাশে রিকসা দাঁড় করানো। ছাপাখানার মেশিন চলার শব্দ। ট্রেন যাচ্ছে আসছে ঢক ঢক ঘটাং ঘটাং।

চিনির জল এনে হাতে ধরিয়ে দেয় সোনার মা। দুজনে এসে হাসিমুখে পাশে বসেছে।

ওদের হাসিমুখ দেখে তারও ভেতর থেকে হাসি বেরিয়ে আসছিল। গেলাস ধরে খেতে শুরু করে দেয় তাই।

সোনার মা বলল—'তবুও আমরা এক ঘর কুটুম পেনু।'

কমলা চিনির জল খেয়ে রুমাল বের করে, রুমালের এককোণে মুখ মুছে, রুমালের গিঁট খুলতে খুলতে বলল, 'পান খাবে? তিনশো দেয়া।'

তিনজনে পান খায়। কোথায় যেন পায়রা বাকবাকুম করে।

বেলা পড়তেই পাঁশকুড়া শহর গঞ্জ শব্দময় হয়ে ওঠে। বড় রাস্তায় লোকচলাচল বেড়ে যায়। কাছেই সিনেমাতলা। লোক গিজ গিজ করছে। আলুর চপ ভাজার গন্ধ। জিলিপি ভাজছে একটা দোকানে। স্যাকরার দোকান আর ওষুধের দোকানের মাঝখানে গলিতে একটা ইলেকট্রিক পোস্ট পড়বে, সেই গলি দিয়ে কিছুটা গেলেই 'দীপক কোল বিক্রুইট ইন্ডাস্ট্রিজ'। ধোঁয়াহীন রান্নার গুল তৈরি হয়। ওখানে সোনার মা কাজ করে। সকাল সাতটা থেকে বারটা পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিল। তারপর বিকেল চারটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত কাজ করবে। তাদের ছেলেমেয়েরা এখন রাস্তায়, এখানে-ওখানে ঘোরাফেরা করে। মাঝে মাঝে কারখানার কাছে আসছিল। কমলা ওদের লজেন্স কিনে দেয়। ওদের মা-রা কারখানায় কাজ করে।

নিতাই এখনো এল না। ট্রেন আসার শব্দ পায়। লোকজনের ভিড় বাড়ে। মহাদেব আর নিতাইকে দেখতে পায় না। মহাদেবের বউ বাইরে বেরিয়ে পাশের চা-দোকানে চা বলে গেল। চারজন পুরুষ আর তিনজন বউ কাজ করছে কারখানায়। দুটো মেশিন চলছে। দুটো মেশিন চালাচ্ছে দুজন পুরুষ। একজন পুরুষ মাল মাখছে—তার সঙ্গে মাখার কাজ করছে একজন বউ। সোনার মা আর রীনার মা তৈরি মাল ঝুড়ি করে বের করে এনে মেলে দিচ্ছে। আর একজনা পুরুষ তারের জালের ওপর শুকনো মাল পোড়াচ্ছে।

চা-দোকানের বাচ্চা ছেলেটা চা আর লেড়ো দিয়ে গেল কমলাকে। বাইরে পাতা টুলের ওপরে বসে ছিল কমলা। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। নিতাই এলে তাকে রাগ দেখাবে সে। সে চুপচাপ বসে ছিল।

সোনার মা রীনার মা-র দিকে তাকাবার সময় নেই। মেশিনের মাল ঝুড়ি ভরে এনে, খালি ঝুড়ি বসিয়ে দিয়ে, ভরা ঝুড়ি বের করে এনে আজুড়ে ফের ভরা ঝুড়ি আনতে হবে। কমলার মনে হয়, এই দুই দিদি বুঝি বোবা। কোনো কথা বলছে না। বলবার সময় নেই। হাত দুটো কয়লার গুঁড়োতে আরো কালো। মেশিনের গুম গুম শব্দ। এখানে কাজ করার এক ধরনের কালিমাখা শাড়ি পরেছে তারা।

আসকে পিঠের মত নরম কালো কালো গুল। সোনা ও রীনার মা কাজ করছে। ওরা এখন কোনো কথা বলছে না। ওরাই কাজ সেরে বেরিয়ে এসে বলবে কত কথা। হাসবে। অথচ এখন দেখলে মনে হয় হাসতে জানে না। সই সই খেলা! এমনও মন টেনে ধরা মানুষ আছে? বাইরে টুল বের করে বসিয়ে কাজ করতে যায়। গায়ে-গতরে হাত বুলিয়ে দেখেছে। হাসি পায়। নিতাইয়ের সঙ্গে ভাবসাব ওঠাবসা। প্রেম হয় নি এটা জানে সে। এদের হাবভাব দেখে মনে হয় নিতাইয়ের সঙ্গে তার

সত্যি প্রেম হয়েছে। নিতাইয়ের জন্যে মন কেমন করে। এখনো এল না। এখন মনে হয়, নিতাই হাওড়ার হাটে চলে গেলে, যেমন তার প্রেমহীন চলে যাওয়া থাকা মনে হয়। আসলে তা নয়। হোগলা নিয়ে গ্রামে গ্রামে চলে গেলে নিতাই কাজের মধ্যে থাকে মনে হয়। যেমন সইরা, দিদিরা কাজ করে। নিতাই মদ খেলে মনের কথা বলে ফেলে। আসলে সে মুখচোরা। নিতাইয়ের জন্য মন কেমন করে ওঠে তার। যুগল আর ফিরবে না। ছেলে টুনাকে ঘরে রেখে এসেছে, তারও জন্যে মন কেমন করে তার। যুগলের ওপর আর বিশ্বাস নেই তার। নিতাই পোষা পাখির মত। কেন এমন মন কেমন করে তার নিতাইয়ের জন্যে? সইদের দেখে? সই আর এই গোটা পাঁশকুড়া শহর তার আর নিতাইয়ের প্রেম হয়েছে এটা [illegible] বিশ্বাস করাতে চায়। নিতাইয়ের প্রতি দ্বিধা ও অবিশ্বাস যেন সব ভুল, মিথ্যে। কেননা মনেই হয়, নিতাই কেমন করে তার কাছে চলে এসেছে। তিনশো জর্দা দেয়া একটা পান দিয়ে গেল একটা বাচ্চাছেলে। গলির মুখের পানওয়ালা মুখ বাড়িয়ে আছে। এরা বুঝি জানে। সোনার মা পান দিতে বলেছে বোধ হয়।

পান খায় কমলা। বেশ ভাল হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে কোনো মেঘের চিহ্ন নেই। হাওয়া আর হাওয়া। এখান থেকে দাশরথিদের ঘর দেখা যায়। সন্ধে এখন তেমন হয় নি। উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে নিতাই ও মহাদেব। নিতাইকে সত্যি ছাড়িয়ে এনেছে মহাদেব। কমলা দেখতে পেয়েছে নিতাইকে। নিতাই দেখতে পায় নি। কমলা উঠে দাঁড়াল। কারখানায়, দিদিদের তাকাবার ফুরসত নেই।

পায়ে পায়ে উঠোনতলায় এসেছে কমলা। এক কাঁড়ি রজনীগন্ধার ডাঁটি কিনে এনেছে মহাদেব। মহাদেব পেছন ফিরে কমলাকে দেখতে পেয়েছে। নিতাই রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলোকে উঠোনের মাদুরের ওপর রাখছে। মেলে দিচ্ছে। বুঝতেই পারছে না যে কমলা তার পাশের এসে দাঁড়িয়েছে। মহাদেব ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। নিতাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি কমলার। নিতাই হাসল। নিতাই কাছে এসে দাঁড়াতে জামার বোতামে হাত যায় কমলার। খোলে আর লাগায়।

ঘর, উঠোনতলা ফুল আর ফুলের গন্ধ। সন্ধে পেরিয়ে গেছে। উঠোনে লম্ফ জ্বলে। দুই সই উঠোনে রান্না করে। উঠোনের মাদুরে ফুল। মহাদেব ব্লু গোলা বালতিতে বজনীগন্ধার ডাঁটির ফুল চুবিয়ে সাইজ মত বেঁধে কেটে তাদের ছেলেমেয়েদের রাস্তায়, বাসস্ট্যাণ্ডে সিনেমাতলায়, স্টেশনে বিক্রি করতে পাঠায়।

বেশ হাওয়া আর ফুলের গন্ধ। উঠোন থেকে নামলেই খাতের ধার। সেখানে বনকলমীর দাম। সেখানে বাতাস আরো খেলে বেড়ায়। নিতাই আর কমলা সেখানে বসে থাকে। কথা বলে। কমলা, নিতাইকে ছুঁয়ে বসে থাকে।

দাশরথি বুঝি এখনো বাজারে ঘুরছে। ব্যাটারি বিক্রি করছে। মহাদেবের জুয়োর বোর্ড আছে। কতকগুলো ঠাকুর-দেবতার ছবি একটা বড় কাগজের ওপর। সেটা মেলে বসে। সাইড ব্যাগের ভেতর সেই-সব ছবি খামে ভরা থাকে। ছবির ওপর পয়সা রেখে, সাইড ব্যাগ থেকে খাম তুলে যদি সেই ছবি তুলতে পারে তা হলে চারগুণ পয়সা পাবে। মহাদেব আজ জুয়োর বোর্ড না নিয়ে গিয়ে ফুল বেচছে। বাচ্চাগুলো সঙ্গে সাথে আছে।

অ্যালুমিনিয়ামেব হাঁড়িকুড়ি বেচতে যাওয়া এক ফিরিওয়ালা দাশরথিদের পাশের

একখানা ছোট ঘরে ভাড়া থাকে। সে সন্ধের সময় ফিরে এসেছে। সে লোকটা অন্ধকারে দূরে বসে বিড়ি খাচ্ছে।

দাশরথি ফিরল। কুকুরকে লাথি মারল।

ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। বাতাস আর বাতাস।

উঠোনতলায় দাশরথি চেটাই মেলছে। নিজেই একটা হ্যারিকেন জ্বালায়। বাতাসে শিখাটা কাঁপে। আলোটা কাঁপে। পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে গুনছে থুতু দিয়ে। হাতের পাশে টর্চবাতি। জ্বালিয়ে নিতাই আর কমলাকে দেখল।

কমলা আর নিতাই উঠে এল চাটাইয়ে। দাশরথি টাকাকড়ি পকেটে পুরে দিয়ে হাসল।

সোনার মা কেটলিতে চা এনে দাঁড়িয়েছে। কারখানার ভেতর না-হাসা না-কথা বলা মানুষটি আর নয়, সে হাসছে। কাপে কাপে চা ঢেলে দেয়। উঠে দাঁড়িয়েছিল, কমলা খপ করে দাশরথির বউয়ের হাতটা ধরে বসিয়ে দেয়। 'বস ত দিদি, মোদের দেউলিয়ায় যেতে হবে কিন্তুন।'

'মোর কোথা ভুলে গেলে দিদি?' পাশের উঠোন থেকে মহাদেবের কালো বউটা অভিমান করে ওঠে।

কমলা বলে—'সক্কলে! ওখেনে গাজন হয়, নীলরাত দ্যাখবার মতন।'

রীনার মাও উঠে এল। পাশে এসে আড়ঘোমটা দিয়ে বসল ভাসুরের কাছে। রান্নাবান্না সব শেষ।

নিতাই পাশে বসে ছিল। হঠাৎ কেমন লাগে। এই আবহাওয়ায় মনে ধরে নিতাইয়ের সঙ্গে তার ঘোর প্রেম আছে। না হলে নিতাইকে পুলিশ ধবে নিয়ে গেল যখন, তখন কাঁদল কেমন করে? আরো বেশি পাঁশকুড়ার মানুষগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে তাদের প্রেমকে। ফিরিওয়ালাটা পাশে এসে বসেছে। এক চা-দোকানদার এল। সকলে জানে। আরো কেউ না কেউ এসেছে। কাছের মানুষ তারা। কেউ কাশে। কেউ বিড়ি ধরায়। নিতাইয়ের শার্টের বোতামটা খোলা। কমলা আরো প্রেম বোধ করে। একজন ট্রানজিস্টার বগলে করে এল। হিন্দি গান হচ্ছে তাতে।

নিতাই পকেট থেকে বিড়ি বের করে। সকলকে বিড়ি দেয়। বিড়ি খাচ্ছে সকলে। কমলাও একখানা বিড়ি ধরায়। সোনার মাও বিড়ি খাচ্চে, শুধু রীনার মা বিড়ি খায় না। ট্রানজিস্টারে গান হচ্ছে। তারই মধ্যে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে। হাওয়া আর হাওয়া। আর ফুলের গন্ধ। হিন্দি গান শেষ হয়ে বাংলা গান শুরু হতে ট্রানজিস্টার যার বগলে ছিল, সে বন্ধ করে দেয়।

পাশ থেকে কেউ বলল—'মেছেদোয় হেবি কান্ড, থার্মাল—হটেল, দকানদানি—একটু জ্যাগা ঘিরতে পারতে দাগুদা—হলদিয়া রোটের পাশে। কিছু না হলে সাইকেল সারানোর দকান দিতে।'

আর একজন বলল—'পাঁশকুড়ার 'চারুলতা-র' মত সিনিমা হল মেছেদা-কোলাঘাটে একটাও আছে নাকি?'

কেউ বলল, 'দেউলিয়ার ফুলের হাট জব্বর।'

কমলা বলল—'ফুলের গন্ধ সব সময় দেউলিয়ার হাটে।'

নিতাই বলল—'ওখেনে গেলে দেখাপড়া করবে।'

দ্বিতীয় জন বলল—'যাই ত ওখেনে। তমাদের দেকেচি ওখেনে। সোনালি লাল মাজনের রিকসায় কাজ করি।'

নিতাই—'তালে তুমি গ্যাঁড়া দিন্দাকে ত চিন?'

'খুউব—গ্যাঁড়ো দিন্দা মেয়ের বে দিচ্ছে ভোগপুরে।'

এক দুজন করে উঠে উঠে চলে যাচ্ছিল। তখন মহাদেব আসে।

নিতাই বলছিল, এই পাঁশকুড়া ভোগপুর মেছেদা কোলাঘাট হলদিয়া তমলুক দিঘা, আবার বালিচক, খড়গপুর, মেদিনীপুর ঘুরে পিরে দেখেছে। তার চেনা-জানার গণ্ডিটা কেমন বড় সেটা বুঝতে পারে কমলা। নিতাই কত কথা বলছিল। দেউলিয়া বাজারে ফুল আর ফুল। ইচ্ছে করে কোনোদিন ফুল মাড়ায় না।

দুই বউ ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দিয়ে উঠোনে বসে বসে ঘুমে ঢুলছিল। মহাদেব এসে তার বউকে নাড়ায়।

দাশরথিও উঠে যায়।

কাঁসার থালার এক থালা ভাত দু-হাত সামনে ধরার মত নিতাইকে কমলার চোখ দেখছিল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাস দিচ্ছে। ফুলের গন্ধ বাতাসে। কমলা পান খেতে ভুলে যায়।

কমলা কথা কয়ে ওঠে—'জানো ত, হাজার হোক মেয়েছেলে। এগার হাত কাপড়েও ল্যাংটো। একা একা দকান সামলাতে হয়। ঝাঁপ বন্ধ করতে যেয়ে কেতরে গেছি সেদিন। তারপরেতে ফুলে গেল আঙুল। কি ব্যতা কি ব্যতা। রাতের বেলা বিসনায় ছটফট করেছি। এখুনো কি ব্যতা—এই দ্যাকো।' কমলা নিতাইয়ের দিকে বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে ধরল এক মুদ্রায়। আঙুল বাড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে যেন সারা শরীরটা এক আকাশের নীচে জাগে। হ্যারিকেনের আলোয় মাটিতে তার ছায়া পড়ে। হাতের তলায় যেন বরণডালা কিংবা দেওয়ালির প্রদীপের মত কিছু। নিতাই আঙুলটার দিকে তাকায়। সন্তর্পণে আঙুলটা ছোঁয়।

স্রোত

সনৎ ভট্টাচার্য

বীতশোক বিশ্বাসই করতে পারছে না, গার্গি মা হতে চলেছে। অথচ তার মা হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ তাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন বছর আগে। তবুও বীতশোকের কাছে গার্গির মা হওয়াটা রীতিমতো ইন্দ্রপতন। বহমান জীবনের ছন্দপতনও। সাত সকালে গার্গিকে ভারী সুন্দর লাগছে। তার চোখেমুখে ধরা পড়ছে খুশি। তিন বছরে এমনি ষোলো আনা খুশিতে তাকে কোনোদিন দেখেনি বীতশোক। অবশ্য সেও জানে, মেয়েদের প্রথম মা হওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। গতকাল রাতেই তো গার্গি তার মা হওয়ার কথাটা জানিয়েছে। বলেছে—আজ তোমাকে একটা খুশির খবর দেবো।

দু-হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরেছিল গার্গি। এমনি কতদিন কতবারই তো গার্গি তাকে জড়িয়ে ধরেছে, কত না বায়না করেছে। কিন্তু আজ কোনো বায়না বা আবদার নয়, স্রেফ একটা খুশির খবর। প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাই বীতশোক বলেছে—আনন্দের খবরটা এবার বলো।

বীতশোকের কপালে ছড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুলগুলো, সযত্নে সরিয়ে দিতে দিতে গার্গি বলেছে—তুমি বাবা হতে চলেছো।

খবরটা রীতিমতো ইলেকট্রিকের শক দিয়েছিল বীতশোককে। ভাগ্যিস তাদেব শোবার ঘরে নাইট বাল্ব জ্বলছিল, নইলে বীতশোক ধরা পড়ে যেত। বিব্রত হতে হতো গার্গির কাছে। গার্গির সোহাগী পেঁচানো হাতদুটো ধীরে ধীরে সাপ হয়ে বীতশোকের গলায় যেন চেপে বসতে লাগলো। শ্বাস রোধ হয়ে এল তার। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো একটা সন্দেহ। গার্গির হাত দুটো কি বিশ্বাসঘাতক?

সারারাত ঘুমোতে পারলো না বীতশোক। অব্যক্ত যন্ত্রণা ছাপ ফেললো তার চোখেমুখে। সাইক্লোন শেষের প্রকৃতির মতো। অভিনয়েও মেক আপ করতে পারলো না সে। অথচ নতুন সকালে গার্গি রীতিমতো ঝরঝরে স্মার্ট। খুশির বার্নিশে চোখ-ধাঁধাঁনো রূপ। বীতশোক অনুভব করতে পেরেছিল, গার্গির পরিবর্তনের কারণটা কী। বীতশোক গার্গিকে সঙ্গ দিতে পারলো না, কেমন যেন অসহায়, মলিন লাগলো তাকে। অপরাধী মনে হলো নিজেকে। নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করতে চাইলো। পারলো না। তারই দুটি সত্তা দু-ভাগ হয়ে বীতশোককে নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করলো। ঝুড়িতে রাখা কাঁকড়াদের মতো। বীতশোক পারলো না নিজেকে বাঁচাতে। তার একটা সত্তা' চাইলো গার্গির সঙ্গে বেলুনের মতো খুশির হাওয়ায় উড়তে। কিন্তু তার অপর সত্তা বিষের পিন ফুটিয়ে সেই বেলুন দিল চুপসে। গার্গি চায়ের কাপ হাতে বীতশোকের সামনে দাঁড়াতেই সে নিজেকে সাবলীল করতে গেলে কী হবে, ধরা পড়ে গেল। গার্গির খুশির রং ফিকে হয়ে গেল। বীতশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো—তোমার কি শরীর খারাপ?

—কই নাতো!

যেকোনো ভাবে ম্যানেজ করতে চাইলো বীতশোক। পারলো না। অপরাধবোধ

তাকে সাবলীল হতে দিল না। গার্গি বীতশোকের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে গিয়ে বললো—তোমাকে এমনি মনমরা দেখাচ্ছে কেন?

—ও তোমার দেখার ভুল।

চায়ে চুমুক দিল বীতশোক। নিজেকে বেশ আঁটোসাটো করে বাঁধতে চাইলো। কিন্তু বজ্র বাঁধনে ফসকা গেরো। গার্গির মনে সন্দেহের মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছে। সে বীতশোকের একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। জিগ্যেস করলো—তিন বছরে তোমাকে তো কোনোদিন এমনিভাবে দেখিনি। কিগো, ঝড়ের সংকেত নয় তো?

ব্যাস হাত দিয়ে গার্গিকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু সে অনুভব করতে পারলো তাব হাত ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। সে গার্গিকে ধরে রাখতে পারছে না। নতুন করে আবার চাযে চুমুক দিয়ে সে হাসতে হাসতে বললো—মনে আশঙ্কা বাসা বাধলে শরতের পরিচ্ছন্ন আকাশকেও ঝড়ের আকাশ মনে হয়।

গার্গি নিজেকে সরিয়ে নিল অভিমানে। উঠে দাঁড়ালো। খুশির জোয়ারে রীতিমতো ভাঁটার টান। সে ঘর ছাড়ার জন্যও পা বাড়ালো। বীতশোক পেছন থেকে তার একটা হাত টেনে ধরলো। গার্গি কোনো কথা বললো না। বীতশোক বললো—তোমাকে দারুণ লাগছে। প্রথম বাচ্চা এলে তোমাদের এমনিতেই সুন্দর লাগে তাই না?

—জানিনা।

মুখ ফিরিয়ে নিল গার্গি। চলে যেতে চাইলো। বীতশোক বেশ শক্ত করে ধরে রাখলো তার হাত। বললো—গার্গি, মুখ ফেরাও।

গার্গি নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইলো। বীতশোক উঠে দাঁড়ালো। জোর করে গার্গির মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখলো, চোখে জল। বিস্মিত বীতশোক। 'তুমি কাঁদছো গার্গি?'

শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে গার্গি বীতশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—'তুমি কি খুশি নও বীতশোক?'

গার্গির মুখের পানে তাকিয়েই থাকলো বীতশোক। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো। কোথাও দাগ নেই, যা গার্গিকে কলুষিত করবে। গার্গির মুখেও কোনো কথা নেই। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঢলে পড়লো বীতশোকের বুকে। বীতশোক গার্গিকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো।

দুই

বীতশোকের চাকরির বয়স সাত। সরকারি চাকরি নিয়েই ঢালাই করা ছাদের তলায় জীবন। ব্যাঙের ছাতার মতো আশঙ্কা ফুটে বেবোনোর ভয় নেই। এমনিতেই বীতশোক হিসেবি ছেলে, মেসে থেকেও বিষয়ী। তাই মেসে থাকাকালীন দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে দু-কাঠা জায়গা কিনেছিল। বিয়ের বছব খানেকের মধ্যে একটা বাড়িও তৈরি করেছিল। সরকারি লোনে। দু-খানা ঘর। লাগোয়া বাথরুম। রান্নাঘর। সামনে এক চিলতে বারান্দা। সাদামাটা হলেও, বেশ ছিমছাম। বাড়ি কমপ্লিট করেই গার্গিকে এনেছিল কলকাতায়, দেশের বাড়ি থেকে। গার্গি খুব খুশি হয়েছিল। বীতশোকের মা-বাবাও।

এরপর নদীর সাবলীল স্রোতের মতো বয়ে চললো সুন্দর জীবন। আশা আকাঙক্ষা ও স্বপ্ন-দেখার জীবন। হতাশা মাঝে মাঝে আবর্জনা হযে জীবনেব স্রোতের মুখে

এলেও ছন্দ নষ্ট করতে পারেনি। নদীর মতো তাদের জীবনের স্রোতও ছিল প্রবহমান। আজ এই প্রথম তাদের জীবনের ছন্দ পতন ঘটতে চলেছে। দায়ী কে? বীতশোক না গার্গি। উত্তর খোঁজে বীতশোক।

খুশির খবরটা বীতশোকের বাবা, মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে গার্গি। গতকাল রাতেই। টেলিফোনে। গার্গির মুখেই বীতশোক শুনেছে, মা, বাবা রীতিমতো খুশি। অবশ্য খুশি হওয়ারই কথা। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান, বাবা নিজে না বললেও মাকে দিয়ে বলাতেন। বিয়ের আগে বীতশোক কলকাতা থেকে বহরমপুরে যখনই গিয়েছে মা-বাবার কাছে, বিয়ের জন্য মায়ের সে কী পীড়াপীড়ি। তারপর বিয়ের পর গার্গিকে পীড়াপীড়ি। নাতি-নাতনির জন্য। গার্গি সেসব কথা রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে কতদিন কতবার বলেছে। চাহিদাটা তো শুধু মা-বাবার নয়, বীতশোক ও গার্গিও তো চাইতো। অথচ যখন বীতশোক জানতে পারলো, যে বাবা হতে চলেছে সে মেনে নিতে পারছে না। তাদের ছন্দময় জীবনে একটাই তো যন্ত্রণা, ক্রনিক আমাশয়ের মতো মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিত। সন্তান না আসার যন্ত্রণা! সেই সন্তান আসছে, গার্গি মা হতে চলেছে। তবু যে কে সেই যন্ত্রণা। জীবনের এপিঠ ওপিঠ দুপিঠেই যন্ত্রণা।

তিন

বছরে দু-বার ডাক্তারি পরীক্ষা করেছে বীতশোক। গার্গিকে না জানিয়েই। গার্গিকে দুঃখ না দেওয়াটাই ছিল একমাত্র কারণ। ডাক্তার দু-বারই বলেছিলেন—আপনি বাবা হতে পারবেন না। সন্তান আনার ক্ষমতা আপনার নেই।

ডাক্তারের কথাটা মনে পড়লেই বীতশোক যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। তবে কি ডাক্তারের হিসাবের গরমিল? তবে কি গার্গি? না, বীতশোক গার্গিকে আজও ষোলো আনা বিশ্বাস করে। তবুও মশা মাছির মতো বীতশোকের শরীরের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ায় সন্দেহ। হুল ফুটিয়ে ঢোকাতে চায় অবিশ্বাসের বিষ। বীতশোক তাই মরীয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে রক্ষা করতে চায়। পারে না। সে বাড়ির বাইরে বেরোয়। তৃতীয়বার ডাক্তারি পরীক্ষা করতে।

রবিবার, ছুটির দিন। বীতশোক ছুটির দিনে বাইরে সাধারণত বেরোয় না। আজ তাকে হঠাৎ বেরোতে দেখে গার্গি জিগ্যেস করে—কিগো, কোথায় বেরচ্ছো?

—ডাক্তারের কাছে।

—কেন?

—শরীরটা ভাল নেই।

—তাই কাল থেকে তোমাকে মনমরা লাগছে। তবে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ডাক্তারকে সব কিছু বলতে হবে।

—না-না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি সব খুলে বলবো ডাক্তারকে।

—ডাক্তারের কাছে কোনো কিছু লুকোবে না কিন্তু, এমনকি আমাকে লুকোলেও লুকোতে পারো, ডাক্তারকে নয়, বুঝলে। পথে নামে বীতশোক। পায়ে পায়ে এগোয়। গার্গির কথাটা কানে বাজে, 'আমাকে লুকোলেও লুকোতে পারো, ডাক্তারকে নয়, বুঝলে।' চোখের সামনে ভাসে গার্গির অসহায় নিষ্পাপ মুখ। একেবারে বিশ্বস্ত। কোনো

খাদ নেই ভালবাসায়। ষোলো আনা আন্তরিক। তবুও যেন অশুভ কোনো শক্তি বীতশোকের ভালবাসার ও বিশ্বাসের মজুত ভাণ্ডারে অবিশ্বাসের বিষ ঢুকিয়ে দেয়। গার্গিকে বিশ্বাসঘাতিনী প্রমাণ করার ষড়যন্ত্র করে। কারা যেন কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে যায়—ললনা মানেই ছলনা। বিশ্বাস করতে নেই। তবুও বীতশোকের চোখের সামনে ভেসে ওঠা গার্গির মুখ বিকৃত হয় না, অবিশ্বাসিনী হয় না। বীতশোকের হাতে ঝোলে ওজন নির্ণায়ক পাল্লা। সেই পাল্লায় এক পাশে বিশ্বাস, অন্যতে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের যাবতীয় বাটখারা চাপিয়েও কোনোমতে গার্গির উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের পাল্লাকে নোয়ানো সম্ভব হয় না।

চার

বীতশোক ডাক্তারের চেম্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দরজা ঠেলে ঢুকতে পারে না। একরাশ সংকোচ তাকে জাপটে ধরে। নিথর পাথর করে দেয় তাকে। কী সামনে, কী পেছনে কোনো দিকেই পা ফেলতে পারে না। তার সামনেও খাদ, পেছনেও খাদ। আগেপিছে দু-দিকেই বিপদ। অথচ পাওয়ার কিছু নেই। দু-দিকেই কেবল হারানোর। ডাক্তারবাবু যদি তাকে পরীক্ষা করে একই রায় দেন, কী করবে বীতশোক? স্রোতের প্রতিকূলে যেতে পারবে? ত্যাগ করতে পারবে গার্গিকে? শিউরে ওঠে বীতশোক। গার্গির মুখটা ভেসে ওঠে। অসহায়, নিরপরাধ, গ্লানিহীন এক বিশ্বস্ত মুখ, কাদা ছিটোলেও দাগ লাগে না। তবে তৃতীয়বার ডাক্তারের রায় জেনে লাভ কী। গার্গিই বলেছিল একদিন—ভালবাসায়, বিশ্বাসটুকু গেলে থাকেটাই বা কী। আখের রস চলে গেলে যেমনটি হয়।

বীতশোক পেছন ফেরে। তবুও পা তুলতে পারে না। মনের মাঝে প্রতিবাদের ঝড়। পোকা যেমন দাঁত কুরে কুরে খায়, সন্দেহের বিষ বীতশোককে কুরে কুরে খেতে থাকে। তবে কি সারাজীবন গার্গির সঙ্গে অভিনয় করবে? গার্গির কাছে ভিখিরি হয়ে থাকবে? কেউ না জানুক গার্গি তো জানবে, সে বীতশোককে একটা সন্তান ভিক্ষে দিয়েছে। বড় হয়ে ছেলেটা যখন বাবা বলে ডাকবে, বীতশোকের মনে হবে, প্রতিটি ডাকের মধ্যেই করুণা। তাব থেকে অঘটন ঘটুক। যন্ত্রণা লালন করে লাভ নেই। প্রসবের প্রয়োজন। সীতার মতো গার্গিরও অগ্নিপরীক্ষা হোক। সত্য আবিষ্কার হোক,। সীতার মতো গার্গিকে যদি ত্যাগ করতে হয় করবে। বীতশোক এগোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু সেই পিছুটান। পা ফেলতে গিয়েও গুটিয়ে নেয়। তিন বছরে গার্গির দেওয়া উজাড় করা ভালবাসা তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। বীতশোক যন্ত্রণায় ছটফট করে। সে অনুভব কবে, হৃদয়ের তূণে সযত্নে রাখা বিশ্বাসের তীরটাকেই সে অবিশ্বাস ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে মাথা কুটেও ফেরাতে পারছে না।

সারা শরীর বেয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে বীতশোকের। চোখের সামনে অস্পষ্ট আলো। সেই আলোয় গার্গি ধরা পড়ে না। ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে। সে অনুভব করতে পাবে গার্গির ভালবাসার ওপর তার মোহ। দ্বিচারিণী আত্মবিশ্বাস তাকে সংকীর্ণতা উপহার দিয়েছে। নইলে নিঃস্ব হয়ে কেউ পথে বেরোয়। নিজেই নিজেকে কশাঘাত কবতে ইচ্ছে করে। আত্মহননই মুক্তির একমাত্র উপায়। নিজের আয়নায় নিজের মুখ ভেসে ওঠে। নিজেকে নিজেই কটূক্তি করে। তুমি কি অবিশ্বাসী নয়?

এমনকি বিয়ের পরও তোমার সঙ্গে সুষমার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল না? সেই ভালবাসায় কোনো কলঙ্ক ছিল না? আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে বীতশোকের। মনে পড়ে, অসাবধানতা-বশত সুষমার কয়েকটা চিঠি থেকে গিয়েছিল বইয়ের আলমারিতে। সেইসব চিঠি আবিষ্কার করেছিল গার্গিই। বীতশোকের কাছে কোনো কিছুই জানতে চায়নি সে, জীবনের ছন্দ নষ্ট করতে চায়নি, স্রোতের মুখে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বলেছিল—চিঠিগুলোর আর প্রয়োজন নেই। থাকলে তোমাকে আমাকে উভয়কেই কষ্ট দেবে। পেছনের সবকিছু পেছনেই থাক। আমরা নতুন করে শুরু করেছি, দুজন দুজনকে বিশ্বাস করেছি।

গার্গির সেই কথাগুলো মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজের সংকীর্ণতার জন্য নিজেকেই দোষারোপ করে। ধিক্কার দেয়। পেছন ফেরে, ডাক্তারের চেম্বারকে পেছনে ফেলে সে সামনে এগোনোর চেষ্টা করে। গার্গির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। নিজের ওপর বিশ্বাস আনার চেষ্টা করতে করতেই আকাশে মেঘ জমার মতো মনের আকাশে বিশ্বাসও জমতে শুরু করে। শরীরের অবশ গ্রন্থিগুলো আবার সচল ও সতেজ হয়। লাটাইয়ের সুতো গোটানোর মতো বীতশোক বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ানো তার অবিশ্বাসী মনকে গুটিয়ে এনে নিজের আয়ত্তে হৃদয় কারাগারে নিক্ষেপ করে। ঝাঁপিতে সাপকে যেমন করে রাখা হয়। জমাট বরফ গলে যেমন জল হয়, তেমনি করেই বীতশোকের কঠিন পাথরের মতো হৃদয়টা নরম হয়। আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। সাবলীলভাবে যে পথ ধরে সে এসেছিল, সেই পথ ধরেই ফিরে চলে। মূল স্রোত থেকে যেন দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। ভিন্ন পথে বইতে শুরু করেছিল জীবনের স্রোত। সে স্রোতের না আছে গতি, না ছন্দ। এখন বীতশোক আত্মবিশ্বাসে টইটুম্বুর। বীতশোক বুঝতে পারে ডাক্তার নয়, গার্গিকে চাই। তবেই তার রোগমুক্তি হবে। দুটি স্রোত একত্র ও একাত্ম হয়ে আবার একই পথে প্রবাহিত হতে হবে। একেবারে মোহনার দিকে। তবেই সে জীবন ফিরে পাবে। আত্মদর্শনে ও আত্মবিশ্লেষণে বীতশোক তার নিজের রোগ ধরতে পেরেছে। আত্মশুদ্ধিতেই রোগ নিরাময় হবে। সেই আশায় বীতশোক রীতিমতো দৌড় শুরু করে। গার্গির সঙ্গে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে। তাহলে, কেবল তাহলেই বীতশোক নদী হবে। স্রোত পাবে। নইলে বদ্ধ জলাশয় হয়ে যাবে।

শ্রবণানক্ষত্রের রাত্রি

প্রদীপ রায়গুপ্ত

মিসেস মজুমদার মানে শোভনাবউদিকে আমি ঠিক সামলে উঠতে পারছি না। 'ট্যাকল' কথাটার জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ না পেয়ে এই প্রাকৃত ক্রিয়াপদটিই ব্যবহার করলাম। এতে যদি কারো মনে দৈহিকতার একটি স্থূল দৃশ্য ভেসে ওঠে, তবে সে অশালীনতার দায় আমার নয়। বস্তুত ওই ধরনের কোনো অঘটন যাতে না ঘটে সে-চেষ্টাই আমি গত ছ-মাস যাবৎ করে আসছি। সুযোগ যে ছিল না এমন কথা বলব না। প্রলোভনও ছিল। এই তো কয়েকদিন আগে এক মেদুর সন্ধেয় এসে শুনি, রাজা ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুরুলিয়ার অযোধ্যাপাহাড়ে এক্সকারশনে গেছে, ওদিকে মিস্টার মজুমদারকে হঠাৎ অফিসের কাজে যেতে হয়েছে মুম্বই। ফাঁকা বাড়িতে শোভনাবউদি একা। রাজা নেই শুনে আমি উঠে পড়বার উপক্রম করছিলাম, উনি আমাকে চা খেয়ে যেতে বললেন। ঝামর-ধরা মেঘ ছিল আকাশে এতক্ষণ, হঠাৎ ব্যাট উপুড় করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। জানালার ওপারে রাস্তাঘাট সব ঝাপসা। পরাশর রোডে আবার আধঘণ্টা বৃষ্টি হলেই হাঁটুজল। নতুন-কেনা ক্যুয়ো ভ্যাদিসটার সম্ভাব্য দুর্দশার কথা ভাবছি, আখরোট কাঠের ট্রের উপরে দু-খানা চায়ের কাপ সাজিয়ে শোভনাবউদি ঢুকলেন, সঙ্গে কাচের প্লেটে একগাদা পেঁয়াজি। উনি বেশ কায়দা করে বলেন, ওনিয়ন পকোড়া। একটা কাপ আমার হাতে তুলে দিয়ে অন্য কাপটি নিজে নিলেন। কাচের রেকাবির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, খেয়ে দ্যাখো কেমন হয়েছে।

রাজাকে পড়াতে যতদিন এসেছি এ-বাড়িতে, উনি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। এক-একদিন এক-একরকম। সিঙাড়া, প্যাটিস, নুডলস। কোনদিন হয় তো বা লুচি আর আলুর দম। শুধু বিস্কুট সহযোগে কোনোদিন চা পাঠিয়েছেন বলে মনে করতে পারি না। রাজার সামনে খেতে আমার লজ্জা করত প্রথমটায়। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একখানা পকোড়া তুলে কামড় বসিয়ে আমি বললাম, চমৎকার! তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জানালার বাইরে তাকালাম। বিকেলের নরম আলো কখন যে আষাঢ়সন্ধ্যার কোমল কালোতে মিশে গেছে, ঘরের ভিতরে বসে তা টের পাইনি এতক্ষণ। খুব হঠাৎ করেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল যেন। বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা-মাথায় দু-চারজন বাড়িমুখো মানুষ। আমাদের বাসা আবার উত্তরে। বৃন্দাবন বোস লেনে। এই বৃষ্টিবাদল ঠেঙিয়ে কখন যে সেখানে পৌঁছব! আমার দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে শোভনাবউদির দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার পারমিশন নিয়ে একটা খাচ্ছি।

উনি ভুরু তুলে হাসলেন। বললেন, ঢং!

উনি যখন এইভাবে হাসেন অথবা কথা বলেন, আমার তখন কীরকম যেন ঘোর

লাগে, মনে হয় চুরি করে একটা নিষিদ্ধ ফলের বাগানে ঢুকে পড়েছি। পেটের মধ্যে একটা গুড়গুড় শব্দ হয়। সেটা ভযেব না লোভের, বুঝতে পারি না।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিলাম এ-বাড়িতে। আমাকে দেখে, আমার সঙ্গে কথা বলে, ওঁব পছন্দ হয়েছিল। রাজাও এসে একবার দেখে গিয়েছিল আমাকে। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে? না কি এই প্রথম?

বছর তিনেক হল বাংলায় অনার্স পাস করে বসে আছি, কোনো চাকরি পাইনি। প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলেও বাংলার মাস্টারের চাকরি জোটাতে পলিটিক্যাল মুরুব্বির জোর লাগে, আমার সে-সব কোনোকালেই নেই। তবে এই তিন বছরে ছ-সাতটা প্রাইভেট টিউশনি আমি করেছি। টিউশনির সূত্রেই অর্পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। ও এখন স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে অনার্স পড়ছে, সেই সঙ্গে কমপিউটার শিখছে।

মুখখানা একটু নামিয়ে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, না, আগেও পড়িয়েছি। প্রথম যাকে পড়িযেছিলাম সেই মেয়েটি হাযার সেকেণ্ডারিতে বাংলায় সেভেন্টি-ওয়ান পারসেন্ট পেয়েছিল।

বাহ্। চমৎকার! মিসেস মজুমদার আশ্বস্ত হয়ে বলেছিলেন, তা-হলে ওই কথাই রইল? বুধবার আর শুক্রবার আসবে, তাই তো?

হ্যাঁ, কাকিমা। আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো?

কাকিমা! উনি হেসেছিলেন। সেই প্রথম জেনেছিলাম, হাসির ভিতর দিয়েও অপছন্দের কথা কী সুন্দরভাবে জানানো যায়। আমার বিমূঢ় ভাব দেখে শেষে বিশদ হয়ে বলেছিলেন, তুমি আমাকে বউদি বলে ডেকো। এমন একজন তাগড়া জোয়ানের মুখে কাকিমা শুনলে কেমন যেন বুড়ি-বুড়ি লাগে নিজেকে।

এবার আমার অবাক হবার পালা। বুড়ি উনি নন নিশ্চয়ই, কিন্তু বয়স কত ওঁর? শরীরের যত্ন যে করেন সেটা বোঝা যায়। ফরসা রঙ, একটু পৃলুলাঙ্গী, মসৃণ চামড়াব পিছনে সম্ভবত ভিটামিন-ই আর জলপাইতেলের দাক্ষিণ্য। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা রেশমিকোমল চুল। ঈষৎ রাঙানো ঠোঁট, সরস ও পুষ্ট। হাতের নখে পালিশ। ওঁকে দেখে রাজার মা মনে হয় না, দিদি মনে হয়। অথচ, খানিকক্ষণ আগে জেনেছি, রাজার এক দিদিও আছে। সে ব্যাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আমার অনুমানে অর্পিতারই সমবয়সী সে। বাইশের সঙ্গে আরো বাইশ যোগ করলে চুয়াল্লিশ। অথচ ভদ্রমহিলাকে দেখে আটত্রিশ-উনচল্লিশের বেশি মনে হয় না। তুলনায় মিস্টার মজুমদারকে ববং অনেকটাই প্রৌঢ় লাগে দেখতে। বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় টাক।

কড়কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। লাগাতার বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, ফুটপাথ এখন জলের তলায়। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমি বললাম, আজ তবে উঠি বউদি।

এই বৃষ্টিতে যাবে কী করে? বৃষ্টি থামুক আগে।

এবপর ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

তেমন হলে থেকে যাবে এখানে। কাজের লোক এই ওয়েদাবে আসবে বলে

মনে হচ্ছে না। দুজনেব জন্য একটু খিচুড়ি বানিযে নেব। ফ্রিজে দু-চাব পিস ইলিসমাছও আছে। বৃষ্টিতে জমবে ভালো, কী বলো?

না বউদি, আমাকে বাড়ি ফিবতে হবে। মা ভাববে।

তোমাদের দোতলায় একটা ফোন কবে জানানো যায় না?

আমি দৃঢ় গলায বললাম, না, ওদেব ফোন খাবাপ।

উনি হাসলেন। হাসলে ওঁব ঠোঁট বাঁদিকে সামান্য বেঁকে যায। তাচ্ছিল্য আব মাধুর্যে মেশানো হাসি। ফিফটি-ফিফটি। বললেন, ভয় নেই, অর্পিতা জানতে পারবে না। আজ সন্ধেয় এই ঝড-বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চযই ওর সঙ্গে তোমাব অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই?

আমি অবাক হয়ে বললাম, অর্পিতাব কথা আপনি জানলেন কী করে?

উনি শ', বললেন, আমি জানি। এমনভাবে বললেন যেন এটাই অন্তিম কথা, এবপরে কোনো প্রশ্ন থাকতে পাবে না, বা থাকলেও তা অবাস্তব। সম্ভবত গল্পচ্ছলে আমিই কোনোদিন উচ্চাবণ করেছিলাম অর্পিতাব নাম, আব তাবপর উনি হয তো কখনো আমাদের দুজনকে একসঙ্গে অ্যাকাডেমি চত্বরে বা নন্দনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখেছেন। বইমেলায় অথবা কোনো আর্ট এগজিবিশনেও দেখে থাকতে পারেন। এক আব একে যোগ কবে দুই কবেছেন, তাবপব অন্ধকাবে ঢিল ছুঁড়েছেন। আমাব মুখের দিকে তাকিয়ে এখন উনি ভাবছেন, ঢিলটা যথাস্থানেই লেগেছে।

অর্পিতা জানলেই বা কী? উনি কি ভেবেছেন অর্পিতা আমাকে বিয়ে করবে? সচ্ছল ঘবেব মেয়ে অর্পিতা, মোটামুটি সুন্দবী, স্ট্যাটিসটিক্স আব কমপিউটাব নিযে পড়াশোনা শেষ কবে নির্ঘাত একটা চাকবিও জোটাবে, ও কি আর শেষ পর্যন্ত একটা বাংলায় অনার্স বেকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে? এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে বছব তিনেকেব একটা অ্যাফেযার ছিল অর্পিতাব। ছেলেটা আমেবিকা না কানাডা কোথায় একটা পাড়ি দেবার পব থেকে ও আমাব দিকে একটু ঢলতে শুরু করেছে। তাই বলে ঢলাঢলি বলতে বাংলায় যা বোঝায, আমাদেব সম্পর্কটা মোটেও সেরকম নয়। দু-চারদিন নিভৃত মুহূর্তে এক-আধটা চুমু খেযেছি, এই পর্যন্ত। শোভনাবউদি বোধ হয নিজের মতো করে অনেকখানি বেশি ভেবে নিয়েছেন।

আমার কাজ সঙ্গ দেওযা, কাবণ আমাব হাতে অঢেল সময। অর্পিতাকে যেমন সঙ্গ দিই, তেমনি সঙ্গ দিই শোভনাবউদিকেও। কিংবা বলা ভালো, নিঃসঙ্গতা ঘোচাই। ওঁব সঙ্গে নিউমার্কেটে যাই, ওঁব দুঃস্থ ছোটবোন বিশাখাদিব বাড়িতে যাই, হাঁপানিব ওষুধ নিতে ঠাকুবপুকুবে ভূতনাথ কবিবাজেব কাছে যাই, দু-একদিন উনি আমাকে টালিগঞ্জ ক্লাবেও নিয়ে গেছেন। স্বামী অফিসেব কাছে সাবাদিন ব্যস্ত, মেযে সুদূব ব্যাঙ্গালোরে, খেলাধুলো-পড়াশোনা-বন্ধুবান্ধব নিযে ছেলেদের আলাদা জগৎ। ওঁর তো একজন কথা বলাব লোক চাই। আমি তো দোষেব কিছু দেখি না। তবে আজকাল উনি আমার উপব অধিকাব ফলাতে শুরু কবেছেন, এটা আমাব ভালো লাগছে না।

ঠিক হয়েছিল সপ্তাহে দু-দিন বাড়িতে এসে বাজাকে বাংলা পড়াব, চাবশ টাকা নেব। তিনমাস পব টাকাটা বাড়িযে উনি হাজাব কবে দিলেন। আমি ভদ্রতাবশত

মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম। উনি আমল দেননি। বলেছিলেন, তোমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমাকে এক্সপ্লয়েট করাটা কোনো কাজের কথা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কোনো প্রাইভেট টিউটর হাজার টাকার কমে বাড়িতে এসে ছাত্র পড়ায় না। তুমি অকারণে লজ্জা পাচ্ছ।

সেদিন ওঁর মহানুভবতায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে সংশয় জেগেছে, ওঁকে সময় আর সঙ্গ দিই বলে উনি একটু ঘুরপথে তার দাম দিচ্ছেন না তো। যাই হোক, অতশত ভাবতে গেলে আমার মতো মানুষের চলে না। প্রায় পঁচিশ বছর বয়স হল, কোনো নির্দিষ্ট উপার্জন নেই, বছরখানেক আগে বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারটা যেন খুঁটি-ওপড়ানো তাঁবুর মতো হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়েছে।

অনেক কষ্টে সে-রাতে শোভনাবউদির হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। রাস্তায় জল থইথই করছে। ঘোলাটে জলে হ্যালোজেন আলোর কাঁপন। হঠাৎ বাবার কবিতার দু-তিনটে লাইন জেগে উঠল আমার মনে :

> এই দুরারোগ্য ঋতু—এ শুধু নরমভাবে আমাকে ভেজায় :
> মনে পড়ে শারীরিক কত জলময় ছিল প্রবল লুণ্ঠন—
> এমন জলের দিনে দেহ থেকে ঝরে যায় জলের বেদনা।

বাবার কবিতাগুলোকে এখন আমার ছেলেমানুষি মনে হয়। ইনকরিজিবল রোমান্টিক ছিল আমার বাবা। শুধু কবিতায় নয়, জীবনচর্যাতেও কোনো বাস্তববুদ্ধি ছিল না। তার ছেলে হয়ে আমি কত প্র্যাকটিক্যাল। এই যে হাঁটুজল মাড়িয়ে রাসবিহারী মোড়ের দিকে হেঁটে চলেছি বাস ধরব বলে, মাথার উপরে এখনো মিহিন বৃষ্টির গুঁড়ো—কই, আমার শরীর থেকে তো কোনো বেদনা ঝরে যাচ্ছে না। হয় তো তেমন আশ্লেষভরে কোনোকিছুকেই দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে পারিনি, তাই আমার বেদনার বোধও বাবার মতো অত তীব্র নয়।

দুই

মা বলল, ডলির ভর্তির ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নে সঞ্জু, মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

আমার ছোটবোন ডলি এবার আটশ-র মধ্যে তিনশ তিন পেয়ে থার্ড ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করেছে। মা তাকে উচ্চমাধ্যমিক পড়াতে চায়। ডলির উপরের বোন জলি দু-বার উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। এখন ঘরে বসে পড়শিদের জন্য উলের জামা বোনে। সবচেয়ে বড়ো মলি অবশ্য আমাদের মুক্তি দিয়ে গেছে। ডানলপ ব্রিজ বি-বা-দী বাগ রুটের মিনিবাসের এক কন্ডাকটরকে বিয়ে করেছে ও, আলমবাজারের দিকে কোথায় যেন থাকে। আমি কোনোদিন ওদের বাড়িতে যাইনি।

মাকে বললাম, এই মার্কসে কাছাকাছি কোনো স্কুল-কলেজে ফর্ম দিচ্ছে না। দূরের কোনো কলেজে ভর্তি হলে ও কি একা একা যাতায়াত করতে পারবে?

মা বলল, উপায় কী? তেমন হলে যেতেই হবে।

পড়েই বা কী লাভ হবে মা? সেই তো জলির মতো দশা হবে।

ডলি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আক্রোশভরে বলল, আসলে দাদা আমাকে পড়াতে চায় না মা। টাকা খরচ হবে যে।

আমি একবার ঠাণ্ডা চোখে ডলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তারপর মার দিকে ফিরে বললাম, ডলি তো ঠিক কথাই বলেছে মা। সত্যিই তো, টাকার সংস্থানই বা কোথায়? বাবা তো তেমন কোনো সম্পত্তি রেখে যায়নি।

মা ব্যথিত মুখে চুপ করে রইল। নির্মম শোনালেও কথাটা তো মিথ্যে নয়। মার ফ্যামিলি পেনশনের সতেরোশ টাকা ছাড়া টিউশনি বাবদ আমার আয় এখন পনেরোশ-র মতো। এই টাকায় সংসার চলে না। আশি হাজার টাকার প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল বাবার, তা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়েছে মার নামে, বাকি টাকা থেকে এক হাজার দেড় হাজার করে প্রত্যেক মাসে সংসারে ঘাটতি মেটাতে [illegible]। কে জানে এভাবে আর কতদিন চলবে। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে বাবার অফিসে একটা চাকরির দরখাস্ত করে রেখেছি, তবে অনুকম্পার তালিকায় আমার ক্রমিক সংখ্যা সাতাশ, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চাকরি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছিল আমার বাবা, উচ্চাভিলাষ না থাকায় পদোন্নতি ঘটেনি। তাতে অবশ্য বাবার কোনো আফসোস ছিল না। নিজের কবিতার মধ্যে বাবা ছিল এক আত্মমগ্ন রেশমকীট। সারাটা যৌবন প্রেমের কবিতা লিখে কেটেছে। পরিণত বয়সে অবশ্য লেখনীর তীব্রতা কমে এসেছিল, কমে এসেছিল লেখার সংখ্যাও। একটা হতাশার ভাব, জীবন সম্পর্কে একটা উদাসীনতার ভাব এসে গ্রাস করেছিল বাবার চেতনাকে। শেষের দিকে প্রায় বছর দশেক বাবা আর কবিতা লেখেনি। তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে বাবার, মার মতো বউ পেয়েছিল। অভাব-অনটনের মধ্যেও মা সংসারের আঁচ বাবার গায়ে লাগতে দিত না। দু-হাত দিয়ে আড়াল করে বাবার কাব্য-প্রতিভার দীপশিখাটিকে যেন বাঁচাতে চাইত সারাক্ষণ। নিজের কোনো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাদীক্ষা না থাকায় মার পক্ষে বাবার মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না। মা কবিতা বুঝত না বাবার বউ হওয়ার সুবাদে জীবনানন্দ দাশের নামটার সঙ্গে মা পরিচিত ছিল। মা ভাবত, রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের পরেই বাংলা কবিতার তৃতীয় পুরুষের নাম নিশীথরঞ্জন ঘোষ। বাবার প্রতিভা নিয়ে এতটাই গর্ব ছিল মার মনে।

বছর কুড়ি আগে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে হাজারতিনেক টাকা তুলে তিন ফর্মার একটা কবিতার বই ছাপিয়েছিল বাবা, নাম দিয়েছিল 'শ্রবণানক্ষত্রের রাত্রি'। বিয়াল্লিশটা কবিতা ছিল বইখানায়। গ্রন্থস্বত্ব ছিল মার নামে, আর উৎসর্গের পাতায় লেখা ছিল 'তোমাকে'। এই 'তুমি'-টি কে তা আমি অনেক ভেবেও বের করতে পারিনি। মা-ই যদি হবে, তবে মার নামটা লিখতে দোষ ছিল কোথায়? অথবা মার নাম না লিখেও 'আমার স্ত্রীকে' বা ওই জাতীয় অন্যকিছু লেখা যেত। মনে হয়, বাবা তার উৎসর্গের মানুষটিকে ইচ্ছে করেই রহস্যাবৃত করে রেখেছিলেন। কবিতাগুলির পঙ্‌ক্তির গভীরেও ছিল ওই একই রহস্য। অনির্দেশ্য সর্বনাম 'তুমি' শব্দটাই বাবার কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছিল। এক অনাম্নী নারীকেই যেন হৃদয়ের সমস্ত পূজা ও সমস্ত

আকৃতি নিঃশেষে নিবেদন করেছিল বাবা। দু-এক জায়গায় একটা নামও অবশ্য ব্যবহার করেছিল। 'শ্রবণা'। বইটির নাম এই মহিলার নামেই রাখা।

তীব্র শরীরী সংরাগের কবিতা ওই সব। কিশোর বয়সে পড়তে পড়তে শিহরিত হয়েছি আর ভেবেছি, অনির্দেশ্য সর্বনামগুলির আড়ালে এই মহিলা কি আমার মা? দারিদ্র-ঘরের অল্পশিক্ষিত মেয়ে হলেও আমার মায়ের রূপ ছিল দুর্গাপ্রতিমার মতো, প্রায় প্রবাদপ্রতিম। ওই আলোকসামান্য রূপের স্তুতি রচনা করা বাবার মতো এক নবযুবক স্বামীর পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। কোন একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম, ফরাসি কবি লুই আরাগঁ তাঁর বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। বাবার কবিতার স্ফুরণ যে বিয়ের পরেই ঘটেছিল তা অবশ্য নয়। কলেজ জীবন থেকেই বাবা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। আর প্রেমের কবিতা লেখা তো কবিদের স্বভাবধর্ম। প্রেমে না পড়লেও তারা লেখে, আর প্রেমে পড়লে তো কথাই নেই। এমন কি হতে পারে না, শ্রবণা নামের এই মহিলা আসলে পুরোপুরি এক মানসী প্রতিমা, বিয়ের পর বাবা তাকে মার আদলে মিলিয়ে নিয়েছিল? শ্রবণা নামটা কি অনেকটা অ্যানাগ্রামের মতো করে পাওয়া? আমার মায়ের নাম যে বনশ্রী। সংশয়ের দোলায় দুলত আমার মন।

'শ্রবণানক্ষত্রের রাত্রি' থেকে কবিতা পড়তে গিয়ে কিশোর বয়সে লজ্জা করত আমার। মনে হত বাবার হৃদয়ের একটা গোপন প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়েছি, ছেলে হয়ে যেখানে ঢোকা আমার উচিত হয়নি। তবু কবিতাগুলির মাদকতার আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারতাম না। অনেক কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল :

> তার মুখমদ থেকে কিছু ফুটেছিল ফুল সৌরভে মদির;
> আহা প্রেম, আহা আমি সঙ্গোপনে কেন ওই
> ব্যক্তিগত প্রজাপতিটির
> ছিঁড়েছি বর্ণাঢ্য পাখা, মাংসের ভিতরে সে তো বিঁধে আছে
> উড়ন্ত বেদনা—
> তার নির্জনতা তাকে আরো বেশি নিষ্ঠুর করেছে :
> মৃত নারীটির দেহে খুঁজেছি প্রবালকীট, দ্রাক্ষাফল, আরো গাঢ়
> মাছের জলজ আঘ্রাণ,
> সন্তান চেয়েছি স্বপ্নে....

এই স্বপ্ন-প্রার্থিত সন্তান যদি আমি হই, তবে আমার গর্ভধারিণীকে বাবা 'মৃত নারী' বলেছে কেন? মা তো বাবাকে সব উজাড় করেই দিয়েছিল, তবু কেন বাবা আফসোস করে প্রেম নামক প্রজাপতির বর্ণাঢ্য পাখা নিজ-হাতে ছেঁড়ার কথা লিখেছে? আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমার বুকের ভিতরে একটা কষ্ট হত। তবে কি বাবা অন্য কোনো নারীর কাছে সন্তান চেয়েছিল? কে সেই নারী? কবিতাগুলির নিচে রচনা-তারিখের উল্লেখ না-থাকায় ব্যাপারটা আরো গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। কোন কবিতা বিয়ের আগে লেখা, কোন কবিতা বিয়ের পরে, সে-কথা বোঝবার উপায় ছিল না। প্রায়ই ইচ্ছে হত, বাবাকে জিজ্ঞেস করি। বাবার সঙ্গে

আমার বেশ সহজ সম্পর্ক ছিল, তবু ছেলে হয়ে বাবাকে এমন ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করতে আমার সংকোচ হয়।

গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঁচশ কপি কবিতার বই ছাপিয়েছিল বাবা, একটাও বিক্রি হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে একে-তাকে সৌজন্য বিলোতে বিলোতে শ-দুয়েক কপি ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাকি কপিগুলো ডাঁই করে রাখাছিল ভাঙা একটা কাঠের আলমারির ভিতরে। বাবা মারা যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন সকালবেলায় দেখলাম, মা সবকটা বই নামিয়ে একটা একটা করে শাড়ির আঁচলে মুছে আবার তুলে রাখছে। মার জন্য আমার কষ্ট হয়েছিল। পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করছিলাম, আচ্ছা মা, বাবার এই কবিতাগুলো তুমি পড়েছ?

মা ঘাড় দুলিয়ে বলল, পড়েছি। তবে আমি তো কবিতা ভালো বুঝি না।

বাবার কবিতায় একজন মহিলার কথা ঘুরে-ফিরে আসে। তুমি কি ওই মহিলার পরিচয় জানো?

মৃদুস্বরে মা বলল, না।

তোমার কখনো জানতে ইচ্ছে হয়নি?

হয়েছে। তোর বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কি বলল বাবা?

তোর বাবা বলল, কবিতার মেয়েরা না কি পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ নয়। কিছুটা কল্পনা আর কিছুটা বাস্তব মিলিয়ে তারা মানুষের চেহারা নেয়।

তা সেই আংশিক বাস্তবটা কার আদলে তৈরি সে-কথা তুমি জিজ্ঞেস করোনি?

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এতদিন পর এ-সব প্রসঙ্গ তুই কেন তুলছিস, সঞ্জু? তোর বাবা আমাকে ছাড়া কিছু জানত না। কোনোদিন তার কাছ থেকে আমি অসম্মান বা অবহেলা পাইনি। কাজেই কবিতায় সে কী লিখল না-লিখল তাতে কিছু এসে যায় না আমার।

মার আত্মপ্রত্যয় দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

মা আরো বলেছিল, এই বইটা বেরোনোর পরেও পাঁচ-সাত বছর মানুষটা কবিতা লিখেছিল। তিন-চারখানা দিস্তে-খাতা ট্রাঙ্কে পড়ে আছে। তোর যদি কোনোদিন টাকাপয়সা হয় সঞ্জু, তুই বাবার আর একখানা বই ছাপাবার ব্যবস্থা করিস।

মার ভাবাবেগ আমাকে স্পর্শ করলেও আমি নিজে খুব একটা বিচলিত হইনি। একজন অসফল কবির পসথুমাস কাব্যগ্রন্থ। ভাবনাটার মধ্যে একটা রোমান্টিক বিষাদ ছড়িয়ে আছে। এখানে ঘুমায় এক কবি, যার জলে লেখা নাম। সে নাম তো কবে ধুয়ে-মুছে গেছে। যে চার-পাঁচটা লিটল ম্যাগাজিন বাবার কবিতা ছাপত তারাও কেউ বাবার কথা মনে রাখেনি। বিস্মৃতি সমুদ্রের মতো, তার উদ্বেল জলরাশি সব লেখা মুছে দিয়ে যায়। আর সত্যি কথা বলতে কী, বাবা তো অন্য কারো জন্য কবিতা লেখেনি, নিজের জন্যই লিখেছে। নইলে সত্তর-একাত্তরের আগুন-ঝরা দিনেও বাবা এমন নির্লিপ্তভাবে কী করে প্রেমের কবিতা লিখতে পারে! এই প্রাতিস্বিক জীবনচর্যার কি কোনো সামাজিক মূল্য আছে?

জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। ঘর অন্ধকার। মনটা খারাপ লাগছিল। দু-হাতেব উপরে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। ডলি এসে বসেছে তক্তপোশে, আমার বুক ঘেঁষে। অস্ফুট গলায় বলল, আমার ওপর রাগ করিস না দাদা। কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি ভেবে বলিনি।

আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। আমার থেকে আট বছরের ছোট ডলি। স্বপ্নের ভিতরে বাবা যে সন্তানদের চেয়েছিল, ও তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ। এক বিফল রোমান্টিক কবির স্বপ্নসন্ততি আমরা সবাই।

ডলি বলল, খাবি না দাদা? মা বসে আছে।

আমি বললাম, তুই কিছু ভাবিস না ডলি, কোথাও না কোথাও আমি তোকে ঠিক ভর্তি করে দেব।

তিন

রাজাকে পড়াতে একটুও ভালো লাগছে না আমার। একদম ফক্কড় ছেলে বলতে যা বোঝায়, তাই আর কী। আজ হঠাৎ আমাকে বলল, রোববার বিকেলে গাড়ি করে রবীন্দ্রসদনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম সঞ্জয়দা, আপনাকে দেখলাম। সঙ্গে আপনার গার্লফ্রেন্ড ছিল।

গার্লফ্রেন্ড বুঝলে কী করে?

মুচকি হেসে রাজা বলল, ওটা বোঝা যায়। আমারও একজন আছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, রাজাটা যতখানি পাকা তার চেয়ে বোকা অনেক বেশি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড়ো হয়েছে বলে চাল-চলনে কথাবার্তায় একটা সপ্রতিভতা আছে। তাই ওর বোকামিটাকে পাকামির মতো লাগে। দুটোই আমার অসহ্য।

তবু টিউশানিটা ছাড়তে পারছি না। অনেকগুলো টাকা। তা-ছাড়া শোভনাবউদি বলেছেন মিস্টার মজুমদারের অফিসে আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন। আমাকে শুধু একটা তিনমাসের কমপিউটার কোর্স করে নিতে হবে। কোথায় ভর্তি হব তা নিয়ে অর্পিতার সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি।

পড়াতে পড়াতে জলখাবার চলে এল। চিনেমাটির প্লেটে চিকেন কাটলেট, পেসট্রি আর একটা বড়সড়ো গুলাবজামুন। আমি অবাক হয়ে শোভনাবউদির মুখের দিকে তাকাতে উনি ঈষৎ হেসে বললেন, খাও।

ওরে বাবা, এত কিছু খাওয়া যায় না কি? মিষ্টিটা তুলে নিন।

খাও তো। বলে একটা ভ্রূভঙ্গি করে উনি ভিতরে চলে গেলেন। এমনিতে সবসময়ে সেজেই থাকেন, কিন্তু আজকের সাজগোজটা একটু অন্যধরনের। চুলে বেলফুলের শিকল, গা থেকে দামি পারফিউমের সৌরভ আসছে। উনি চলে যাওয়ার পরেও গন্ধটা থম মেরে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

রাজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখখানায় একটু হাসি-হাসি ভাব। চোখাচোখি হতে বলল, আজ মা-বাবার অ্যানিভার্সারি। মাসি আব মেসো এসেছে।

চিকেন কাটলেটে কামড় দিতে গিয়ে থমকে গেলাম। বললাম, তোমার বাবা কোথায়?

বাবা তো দিল্লীতে। জরুরি মিটিং-এ গেছে।

আমি চুপ করে গেলাম। মিস্টার মজুমদার কেজো ধরনের লোক, অ্যানিভার্সারি বলেই যে তিনি অফিসের কাজ ফেলে স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন এমন আশা শোভনাবউদিও নিশ্চয় করেন না। ছোটবোন এসেছে তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে, তাদের সঙ্গেই উনি সেলিব্রেট করছেন। কাটলেটটা জব্বর আনিয়েছেন। একেবারেই বিস্কুটের গুঁড়োয় ঠাসা নয়, মাংসে ভর্তি।

আগামী বছর মা-বাবার সিলভার অ্যানিভার্সারি। মা নিশ্চয় বড়ো একটা পার্টি আদায় করবে বাবার কাছ থেকে। আপনি যদি ততদিন টিকে থাকেন, আপনারও ইনভিটেশন জুটবে।

চমকে উঠলাম রাজার কথায়। আগামী বছর সিলভার অ্যানিভার্সারি! তার মানে চব্বিশ বছর হয়ে গেল শোভনাবউদির বিয়ে হয়েছে? আমার মার বিয়ের মাত্র দু-বছর পর? মা-বাবা অবশ্য রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে পারেনি। পঁচিশ বছর পূর্তির মাসখানেক আগে হঠাৎ এক রাতে সেরিব্রাল স্ট্রোকে বাবা বিনা নোটিসে মরে গেল।

মার এখন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। শোভনাবউদির বয়সও তা-হলে কাছাকাছিই হবে, বড়জোর দু-এক বছরকম। অথচ কত পার্থক্য দুজনের মধ্যে! দুজনেই দেখতে সুন্দর, অথচ দুজনের রূপ একেবারে পুরোপুরি আলাদা। একজন যদি হয় জগদ্ধাত্রী, অন্যজন তবে উর্বশী। রবীন্দ্রনাথের একটা লেখায় পড়েছিলাম, মেয়েদেব না কি দুটি জাত—মা আর প্রিয়া। প্রথম জাতকে কবি তুলনা করেছিলেন বর্ষাঋতুর সঙ্গে, দ্বিতীয় জাতকে বসন্তঋতুর। বর্ষাঋতু জল দেয়, শস্য ফলায়, নিবাবণ করে তাপ। আর বসন্তঋতু রক্তে চাঞ্চল্য জাগায়, তার বীণার ঝংকারে মর্মে বেজে ওঠে অনির্বচনীয়ের বাণী। মা আর শোভনাবউদির দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলির তাৎপর্য অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই সঙ্গে এ-ও বোঝা যায়, প্রায় সমবয়সিনী হওয়া সত্ত্বেও কেন মাকে মনে হয় বাহান্ন আর ওঁকে আটত্রিশ।

পড়ানো শেষ করে উঠব উঠব করছি, উনি হঠাৎ এ-ঘরে এসে বললেন, তোমার কি বাড়ি ফেরার তাড়া আছে?

আজকাল উনি প্রায়ই আমাকে এদিক-ওদিক নিযে যান। রাজা সেটা জানে বলেই ওর সামনে কেমন একটা অস্বস্তি হয় আমার। আমতা-আমতা করে বললাম, কেন বলুন তো?

বিশাখাদের বাড়ি পৌঁছে দিযে আসব ভাবছি। ফেবার সময় একা ফিরতে হবে, কেউ একজন সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

গাড়ি কি আপনি চালাবেন?

না, হরিরামই চালাবে।

ড্রাইভারই যখন গাড়ি চালাবে তখন, আব ওঁব বোড়াল পর্যন্ত উজিযে যাওযার দবকার কী সেটা বুঝলাম না। হবিরামই বিশাখাদিদের নামিযে দিযে আসতে পারে।

ওঁর সঙ্গে এখন যদি বোড়াল যাই, আমার তো তবে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে তর্ক করা চলে না। সঙ্গী হিসেবে বুড়ো হবিরামকে উনি যে ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না সেটা বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না আমার।

মারুতি এস্টিম গাড়ি শোভনাবউদিদের। হরিরামেব সঙ্গে আমি বসলাম সামনে, পিছনে ওঁরা তিনজন। বিশাখাদির স্বামী কল্লোলবাবু বাব দুয়েক মিনমিন করে বললেন, কেন আর কষ্ট করে আপনি আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন দিদি? আমরা দিব্যি বাসে চলে যেতে পারতাম।

শোভনাবউদি বিরক্ত মুখে চুপ কবে রইলেন। আমি ওঁর মনের ভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। এই অভিজাত ফ্ল্যাটবাড়িতে যারা থাকে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব গাড়ি আছে। তাদের কাছে আত্মীয়বন্ধু যারা দেখা করতে আসে বেশির ভাগ গাড়ি চড়েই আসে। ওঁব কোনো আত্মীয়স্বজন দরোযান-চৌকিদারদের চোখের সামনেই দীন পায়ে হেঁটে গিয়ে পাবলিক বাসে উঠবে, এ-দৃশ্য শোভনাবউদির বরদাস্ত না হবারই কথা।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। বিশাখাদিদের নামিয়ে ফেরার সময়ে আমি আবার হরিরামের পাশে বসতে যাচ্ছি, শোভনাবউদি মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, সামনে কেন পিছনে এসো।

গাড়ির ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। এ-সি চালিয়ে দিযেছে হরিরাম। জানালার কাচ তুলে দিয়েছে। মেঘরঙের কাচের ভিতর দিয়ে দোকানপাট ও রাস্তাঘাটের আলোগুলোকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। উনি চুপ করে সামনেব দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। পাতলা ঠোঁট, টিকোলো নাক। অনেকটা গ্রিক নারীদের মতো। আমি অবশ্য কোনো রক্তমাংসের গ্রিক নারীকে দেখিনি। কিশোব বয়সে গল্পের বইয়ে হেলেন-অব-ট্রয়ের ছবি দেখেছি। বলাই বাহুল্য, সেটা সত্যিকারের কোনো মানবীর প্রতিকৃতি নয়, কোনো এক শিল্পীব মনের মাধুরী দিয়ে আঁকা।

মৃদুস্বরে বললাম, মেনি হ্যাপি রিটার্নস অব দ্য ডে।

উনি চমকে উঠলেন। বললেন, রাজা বলল বুঝি?

আমি বললাম, মিস্টার মজুমদার যদি থাকতে পারতেন, ভালো হত।

তুমি কি মিস্টার মজুমদারের হয়ে অ্যাপলজি চাইছ? ওঁর গলায় বিদ্রূপ খেলে গেল।

আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। উনি আত্মগতভাবে বলে চললেন, আমার কাছে এই দিনটার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই। নেহাৎ বিশাখা আর কল্লোল হঠাৎ এসে হাজির হল—ওরা তো আর ভেতরের ব্যাপার কিছু জানে না!

ভিতরের ব্যাপার আমিও কিছু জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারি যে, শোভনাবউদি প্রিয়ার জাত, মায়ের জাত নন, কাজেই সন্তানেব ভালো-মন্দ নিয়ে মেতে থাকবার বদলে এই বয়সেও উনি বরং স্বামী বা প্রেমিকের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ পেতেই বেশি পছন্দ করবেন। মাত্র কয়েক মাস আমি যেটা বুঝেছি মিস্টার মজুমদার সেটা চব্বিশ বছরেও বুঝে উঠতে পারেননি।

তুমি শুনলে অবাক হবে, রাজার যখন এক বছর বয়স তখন আমাদের ডিভোর্সের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ওর মোটর অ্যাকসিডেন্ট হল। শাশুড়ি কেঁদে-কেটে অনুরোধ করলেন, ও সুস্থ হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত আমি যেন ওকে ছেড়ে না যাই। সেই যে থেকে গেলাম, তারপর ষোলো বছর এইভাবেই চলছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এভাবে কি এতদিন থাকা যায় বউদি?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে উনি মৃদু হাসলেন। তারপর খুব সহজ গলায় বললেন, সামনের উইক এন্ডে বিশাখা আর কল্লোলকে নিয়ে আমি পুরি যচ্ছি। ওরা কখনো পুরী যায়নি। কল্লোলটা কোনো কম্মের নয়। আমি না নিয়ে গেলে ওদের পুরী দেখা হবে না। মজুমদার সাহেব ওদের অফিসের গেস্ট হাউসটা বুক করে দিয়েছে। চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, একেবারে সমুদ্রের ধারে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আমি তোমার জন্যও টিকিট কাটতে বলেছি।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, আমি! না না, সে কী করে হয় বউদি? মিস্টার মজুমদার কী ভাববেন? রাজাই বা কী ভাববে?

উনি স্থির গলায় বললেন, সে ভাবনা তোমার নয়, আমার।

শোভনাবউদির সঙ্গে আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, রাত করে বাড়ি ফিরেছি, কিন্তু কখনো বাইরে রাত কাটিয়ে আসিনি। আর এ তো টানা চাররাত্রি তিনদিনের প্রোগ্রাম। এয়ার কন্ডিশনের ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আমাব মেরুদণ্ড বেয়ে ঘাম গড়িয়ে নামছিল। আমি মরিয়া হয়ে বললাম, আমার বাড়িতে মা-বোনেদের আমি কী কৈফিয়ৎ দেব?

যেন অন্তিম কথাটি বলছেন এমন গলায় শোভনাবউদি বললেন, কিছু একটা অজুহাত তৈরি করে নিও। অর্পিতাকেও একই কথা বোলো। এই বলে উনি গাড়ির সিটের উপরে আমার ডানহাতখানা ওঁর বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

আমার হাত যতটা ঠাণ্ডা, ওঁব হাত ঠিক ততটাই গরম।

চার

অনেকদিন বাবার ট্রাঙ্কটা খোলা হয় না। ট্র্যাঙ্কের নিচে মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। ফুটো দিয়ে আরশোলারা যাতায়াত করছে। মা একদিন বলল, কী রে সঞ্জু, বাবার ট্রাঙ্কটা একদিন খুলে পরিষ্কাব করতে পারিস না? আরশোলাতে বোধ হয় কবিতার খাতাগুলো কেটেই ফেলল।

সকাল দশটা নাগাদ একদিন ট্রাঙ্ক খুলে বসে গেলাম। তিনফুট লম্বা, দুফুট চওড়া আর আড়াইফুট উঁচু বিশাল সেকেলে ট্রাঙ্ক, ভিতরটা নানান অপ্রয়োজনীয় পদার্থে ঠাসা। বাবা কোনো জিনিস ফেলত না, অকিঞ্চিৎকর জিনিসও জমিয়ে রাখত। কবিতার খাতা ছাড়াও পুরনো কিছু ছেঁড়াখোঁড়া বই, পত্র-পত্রিকা, চিঠিপত্র, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, এক্স-রে প্লেট, কয়েকটা পুরনো চশমা, ঠাকুরমার পায়ের চটি, ঠাকুরদার বাঁশের হাতলের ভাঙা ছাতা, ফুলতোলা আসন, আমাদের ভাইবোনদেব ছোটবেলার জামা, সবুজ হয়ে যাওয়া আদ্যিকালেব কিছু কাঁসার বাসন, কালো পাথরের গ্লাস, খলনুড়ি ইত্যাদি কী যে নেই ওব মধ্যে। সবকিছুই কিন্তু খুব পরিষ্কাব কবে গুছিয়ে রাখা। আমি ডা[illegible]

খুলতেই ছোট-বড়ো নানান সাইজের কিছু আরশোলা দ্রুত পায়ে উপর থেকে নিচের দিকে জিনিসপত্রের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

একে একে বের করতে লাগলাম সব। কবিতার খাতাগুলো উপরেই ছিল। আরশোলার মলমূত্র চিত্রবিচিত্র হয়ে গেছে, অন্য কিছু ক্ষতি হয়নি। খাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় চোখ আটকে গেল আমার। কবিতাটির নাম 'আরোপ' :

মৃত্যুর আতিশয্যে যাকে বলো অমরতা
সে আমার অভিপ্রেত নয়;
তোমার বুকের কাছে গাঢ় যে বলেছি কথা
সে-ও সাময়িক অপব্যয়।
চিঠিতেই জানিয়েছ তোমার বিনম্র ঋণ
তাই আমি নীল শিশুঘাতী
তোমার নশ্বর রূপ বয়ে গেছি তাপহীন—
আজ কার কাছে হাত পাতি।
শ্রবণা, তোমার মুখে যত স্বেদমুক্তা ফোটে
আমি তত পরিশ্রম করি;
অথচ নির্বোধ তুমি স্মিত অবলীলা ঠোঁটে
নিজেকে ভেবেছ ঈশ্বরী।

কবিতাটা পড়ে চমকে উঠলাম। বাবাব মতো লোক 'তুমি' সর্বনামের বিশেষণ হিসেবে 'নির্বোধ' শব্দটাকে ব্যবহার করেছে! এ যে ব্লাসফেমি! শ্রবণা নামের মহিলাটির অহংকার নিয়ে এ যে তুমুল বিদ্রূপ! কিন্তু নীল শিশুঘাতী? শিশুঘাতী পুরুষটির গায়ের রঙ নীল? না কি শিশুটির রঙই নীল? নীলকি বিষের দ্যোতক? বাংলায় অনার্স হয়েও নিজের বাবার কবিতা যদি আমি বুঝতে না পারি তবে সেটা কার দোষ—আমার, না এই কবিতার? বাবা তো আর শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো বিদ্বান ছিল না যে তার লেখা কবিতা আমার বোধবুদ্ধির নাগাল ছাড়িয়ে যাবে।

একে একে নামাচ্ছিলাম সব জিনিস। ঠাকুরদার ছাতা, ঠাকুরমার চটি, পুরনো বই আর পত্রিকা, চিঠিপত্র। আরশোলাতে চিঠিপত্র আর পত্রিকার পাতা অনেক জায়গায় কেটে ফেলেছে। শুকনো গুঁড়ো নোংরা ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। হাত দিয়ে ধরতে আমার ঘেন্না করছিল। তবু পরিষ্কার করবার জন্য যখন হাত লাগিয়েছি, মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

বিভিন্ন লোকের লেখা চিঠি। কুড়ি বছর, পঁচিশ বছব, তিবিশ বছব আগেব লেখা চিঠি। বাবার মাসি, বাবার জ্যেঠামশাই, আমার দিদিমা, বাবার বন্ধু নরেনকাকু আর সুজিতকাকু, আর কিছু অল্পখ্যাত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি। এমন কী, অমলেন্দুনয়নের চিঠিও আছে। মার লেখা দু-একখানা চিঠিও দেখলাম। বাপের বাড়ি গিয়ে লিখেছে। ইতস্তত করে একখানা চিঠি খুলেও দেখলাম। তেমন কিছু নেই। —আমি ভালো আছি। পেটের ব্যথাটা আর হয় নাই। সঞ্জু সারাদিন ঘরময় হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়, শীঘ্রই হাঁটিতে শিখিবে। তোমার তো খাওয়াদাওযার কষ্ট হইতেছে। বেশি রাত জাগিয়া লিখিয়ো না। কবে আমাকে লইতে আসিবে? —মা তো খুব সেকেলে মহিলা নয়,

তবু যে কেন এরকম সাধুভাষায় চিঠি লিখত কে জানে!

চিঠিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার পেলাম, বহু পুরনো, দশ পয়সা দাম ছিল তখন ইনল্যাণ্ডের। মেয়েলি হাতের লেখা। কিন্তু মার লেখা নয়। চিঠির উপরে তারিখ দেওয়া আছে। সেটা মার বিয়ের মাস ছয়েক আগের একটা তারিখ।

চিঠিখানার ভাঁজ খুললাম। আরশোলায় একটা দিক কেটে দিয়েছে। ঝর্নাকলমের লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কয়েক জায়গায়। —নিশীথদা, আপনার বিরাট বড়ো চিঠির উত্তর সংক্ষেপে দিচ্ছি। কেননা আমার বলার মতো কথা খুব অল্প। দাদার বন্ধু হিসেবে আপনার সঙ্গে আমি শিষ্টাচার করেছি মাত্র। সেটাকে অন্য কিছু ভেবে ভুল করবেন না। আপনাকে প্রেমিক অথবা স্বামী...। —এরপর আর পড়া যাচ্ছে না। আরশোলারা কেটে দেওয়ায় মহিলার পরিচয় চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। চিঠির উপরে সেণ্ডার্স অ্যাড্রেসেও কোনো নাম বা ঠিকানা নেই।

এই কি তবে বাবার শ্রবণা? শ্রবণানক্ষত্র? আশ্চর্য লোক তো বাবা! প্রত্যাখ্যানেব এই চিঠিখানাও সযত্নে রেখে দিয়েছে! যদি মার হাতে চিঠিখানা পড়ত? আমি চিঠিখানা পাঞ্জাবির পকেটে পুরে ফেললাম। দ্রুত হাতে ট্রাঙ্কের জিনিসগুলো ভিতরে ভরলাম আবার। বাবার উপরে আমার রাগ হচ্ছিল। সেটা অবশ্য বাবা প্রেমে পড়েছিল বলে নয়। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেমে যে কেউ পডতে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল বাবা মাকে ঠকিয়েছে। সনাতন হিন্দু নারীর সংস্কারে আমার অল্পশিক্ষিত মা দেবতাজ্ঞানে পুজো করেছে বাবাকে, আর বাবা তখন মনে মনে ধ্যান করেছে তার আরাধ্যা দেবীর, তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে তীব্র শারীরিক আশ্লেষে। একটা কথাই আমার মাথায় ঢুকছিল না। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হবে বাবা অমন চট করে বিয়ে করে ফেলল কেন? বাবাদের আমলে বিফল প্রেমিকেরা তো সহজে বিয়ে করত না। অন্তত দু-এক বছর দাড়ি-টাড়ি রেখে উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়াত। তবে কি মার ভিতরে বাবা তার শ্রবণাকে পেতে চেয়েছিল? ভাবতে গিয়ে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল।

বাড়িঅলার কিশোরী কন্যা এসে বলল, সঞ্জুদা, আপনার ফোন এসেছে ওপরে।

ওব মুখে একটা চাপা হাসি। জিজ্ঞেস করলাম, নাম বলেছে? •

ও বলল, না। তবে ফিমেল ভয়েস।

নিশ্চয়ই শোভনাবউদি। রাজাকে বাড়িঅলার ফোন নম্বরটা এই ভেবে দিয়ে রেখেছিলাম যে, যদি কোনোদিন ওর অসুবিধে থাকে তবে আমাকে আগেভাগেই জানাতে পারবে। বাসে-ট্রামে অতটা পথ গিয়ে যদি দেখি রাজা নেই, তবে হয়রানিই সার। সময়ও নষ্ট।

দোতলায় গিয়ে ফোন ধরলাম। না, শোভনাবউদি নন, অর্পিতা। আমি একটু অবাক হলাম। অর্পিতা সাধারণত আমাকে ফোন করে না। দরকার পড়লে আমিই পাবলিক বুথ থেকে ওদের বাড়িতে ফোন করি।

অর্পিতা বলল, আগামী রোববার বিকেলটা ফ্রি রেখো। অ্যাকাডেমিতে একটা নাটকের টিকিট কেটেছি।

আমি প্রমাদ গুনলাম। শুক্রবার রাতের ট্রেনে আমি তো পুরী যাচ্ছি। ফিরব মঙ্গলবার সকালে। শোভনাবউদি একটা অজুহাত তৈরি করে রাখতে বলেছিলেন।

আমি কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। মাকেও তো কিছু বলতে হবে। বাংলায় অনার্স একজন বেকার যুবকের পক্ষে তিনদিন বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকার অজুহাত খাড়া করা বেশ শক্ত।

বললাম, রোববার আমি থাকছি না। মালদা-র একটা মিশনারি স্কুলে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছি। যাওয়া-আসায় দু-দিন, ইন্টারভিউয়ের জন্য একদিন—মোট তিনদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

অর্পিতা অবাক হয়ে বলল, আগে বলোনি তো!

কালই চিঠি পেয়েছি।

অর্পিতা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাও ভালো, চাকরির চেষ্টা করছ। রোববার থাকছ না শুনে আমি প্রথমে ভাবলাম, তোমার নতুন ছাত্রের মায়ের সঙ্গে প্রোগ্রাম করেছ কোথাও।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বললাম, হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন?

হঠাৎ কেন হবে? আজকাল তো উনি প্রায়ই তোমাকে বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

তুমি কি আমার ওপরে গোয়েন্দাগিরি করছ?

বিতৃষ্ণার সুরে অর্পিতা বলল, না। আমার অত সময় নেই। তবে কলকাতা তো খুব একটা বড়ো শহর নয়। অনেক কিছু চোখে পড়ে যায়, অনেক কিছু কানে আসে।

আমি রাগের গলায় বললাম, তুমি তোমার এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছ, অর্পিতা। তোমার বোঝা উচিত—

অর্পিতা চেঁচিয়ে উঠে বলল, পারভার্ট। একটা মায়ের বয়েসি মহিলার সঙ্গে...ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না।

বাড়িঅলার মেয়েটা দরজার আড়াল থেকে শুনছে। আমি তাড়াতাড়ি ফোন রেখে নিচে নেমে এলাম।

রান্নাঘরের সামনে একফালি বারান্দায় মা বঁটি পেতে আনাজ কুটছিল। মাকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, আমি একটা কাজে তিনদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি মা।

আনাজ কোটা থামিয়ে মা দু-এক মুহূর্ত উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, বাবার ট্রাঙ্কটা পরিষ্কার করে সব জিনিসপত্র আবার গুছিয়ে রেখেছিস তো? কয়েকটা ন্যাপথালিনের গুলি দিলে পারতিস।

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরে মায়ের জন্য প্রবল একটা কষ্ট হতে লাগল। সারাটা জীবন প্রতারিত হয়ে এসেছে, তবু বাবার স্মৃতিগুলিকেই কস্তুরীর মতো অতি যত্নে আঁকড়ে ধরে আছে।

বাথরুমে গিয়ে বাবার প্রেমিকার চিঠিখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে পায়খানার পটে ফেলে দিলাম। তারপর বালতি-ভর্তি জল ঢেলে দিলাম পটে।

পাঁচ

সমুদ্রের ধারে বালির উপরে আমরা দুজন মাথায় তোয়ালে দিয়ে বসে ছিলাম। বেশ খানিকটা দূরে বুকজলে দাঁড়িয়ে বিশাখাদি আর কল্লোলবাবু হাত ধরাধরি করে

স্নান করছেন। এক-একটা ঢেউ আসছে, আর কল্লোলবাবু দারুণ ক্ষিপ্রতায় উপরের দিকে লাফ দিচ্ছেন। ভাবভঙ্গি অনেকটা সিনেমার কৌতুকাভিনেতারদের মতন।

আমরা খানিক পরে নামব সমুদ্রে।

গতকাল সকাল দশটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছেছি। গেস্ট হাউ টা দারুণ, প্রায় ছবির মতো। একটু পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি, চারদিকে ফুলফলের বাগান, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মেনটেনান্স খুব ভালো। একতলায় বিরাট ড্রইং-রুম, কিচেন আর ঠাকুর-চাকরদের থাকবার ঘর। দোতলায় তিনটে বেডরুম, অ্যাটাচড বাথ, দক্ষিণদিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা ঝুলন্ত ব্যালকনি। ব্যালকনিতে একটা বেতের গোলটেবিল পাতা, টেবিল ঘিরে গোটা ছয়েক বেতের চেয়ার। ওখানে বসে চা খেতে খেতে ঝাউয়ের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়।

কাল সমুদ্রে আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনের পোশাক ছেড়ে হাতমুখ ধোয়া, চা-জলখাবার খাওয়া, লাঞ্চ এবং ডিনারের মেনু ঠিক করে ঠাকুরকে জিনিসপত্র কিনতে বাজারে পাঠানো—এইসব কাজে বেশ খানিকটা সময় চলে গিয়েছিল। বেশিক্ষণ সমুদ্রবিলাস সম্ভব হয়নি। আজ বিশাখাদির উৎসাহে আমরা সকাল-সকাল সমুদ্রে এসেছি।

কালকের মতো আজও হাতে-মুখে সানস্ক্রিম মেখে এসেছে শোভনাবউদি, তবু দু-ঘন্টা ধরে সমুদ্রস্নান করে চামড়া পোড়াবার মতো ছেলেমানুষ উনি নন। বিশাখাদিদের ঘন্টাখানেক স্নান হয়ে যাবার পর উনি সমুদ্রে নামবেন। একসঙ্গেই সবাই ফিরব গেস্ট হাউসে।

খাওয়াদাওয়ার পর কাল রাতে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত ব্যালকনিতে বসে গল্প করেছিলাম আমরা। তারপর যে যার শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। চমৎকার গদি দেওয়া বিছানা, দুধের মতো সাদা চাদর আর বালিশের ওয়াড়, ফিনফিনে পাতলা মশারি। এত বিলাসবহুল শয্যায় কখনো শুয়েছি বলে মনে করতে পারছিলাম না। নানান রকমের আজেবাজে চিন্তা আসছিল মাথায়। স্নায়ুর কোষে একইসঙ্গে উত্তেজনা আর অবসাদ। ঘুম আসছিল না।

রাত বারোটায় দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। আমি খুব একটা অবাক হইনি। টোকা পড়তে পারে জনতাম। শোভনাবউদি যে অনেক ফন্দিফিকির করে পুরী বেড়াতে এসেছেন সেটা বুঝতে না পারার মতো নির্বোধ আমি নই। আমারও বা কৌমার্য ছাড়া কী এমন হারাবার আছে! আমি কারো কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ নই। উনি আমাকে যেভাবে ব্যবহার করছেন, অর্পিতাও অনেকটা সেভাবেই আমাকে ব্যবহার করে। শোভনাবউদি তো তবু শরীরের অভিজ্ঞতা দিতে চাইছেন আমাকে, মিস্টার মজুমদারের কম্পানিতে একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। অর্পিতা আমাকে কী দেবে, প্রত্যাখ্যান ছাড়া? আমি বাবার মতো রোমান্টিক বুড়বক নই, তেমন কোনো সুযোগ আমি অর্পিতাকে দেব না।

পাশ থেকে শোভনাবউদির মুখের প্রোফাইল দেখতে দেখতে একটাই প্রশ্ন জাগছিল আমার মনে। আমি ওঁর কত নম্বর প্রেমিক? ওঁর স্বামীর পর আমি নিশ্চয়ই ২য়

জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ নই। আমার আগে আরো কতজন পুরুষ এই বিকীর্ণকামা মহিলার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেছে কে জানে! তারা এখন কোথায়। তারা কি সবাই মিস্টার মজুমদারের কম্পানিতে চাকরি করছে?

আমার দিকে ফিরে শোভনাবউদি বললেন, তুমি এত চুপচাপ কেন? তোমার কি গ্লানি হচ্ছে?

আমি অকপটে বললাম, না।

চলো, সমুদ্রে নামি। ওদের বোধ হয় ওঠার সময় হয়ে এল।

সমুদ্রে স্নান করতে নেমে ঝিনুকে পা কেটে গেল আমার। জল থেকে উপরে উঠে দেখি বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে টপটপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গেস্ট হাউসে ফিরে শোভনাবউদি বেটাডিনে তুলো ভিজিয়ে নিজের হাতে আমার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। ওঁর তৎপরতায় গেস্ট হাউসের অ্যাটেনড্যান্ট রামেশ্বর সাহু এক বুড়ো ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল। তিনি আমার বাম বাহুতে একখানা টেটভ্যাক ইনজেকশন দিলেন।

আগে থেকেই ঠিক ছিল বিকেলে আমরা কোনারক দেখতে যাব। যথাসময়ে গাড়ি এসে গেল। ওঁরা তিনজন বেরিয়ে পড়লেন। আমি ব্যালকনিতে ডেকচেয়ার পেতে আধশোয়া হয়ে সারাটা বিকেল কাটিয়ে দিলাম। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে নীল সমুদ্র। সমুদ্র এখন শান্ত। জলচর পাখিরা মাছের লোভে উড়ছে। আমার বা-পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করছিল।

মনে হচ্ছিল জ্বর আসছে।

ওঁদের ফিরতে ফিরতে রাত আটটা বাজল। কোনারক দেখে জগন্নাথের মন্দির হয়ে ফিরেছেন। শুকনো প্রসাদ এনেছেন বিশাখাদি। তালপাতার বাক্সে জিবে গজা। শোভনাবউদি আমাকে একখানা গজা এনে দিলেন। যেন এই পবিত্র প্রসাদে সমস্ত অবৈধতার স্খালন হবে।

আজ শোভনাবউদি আরো দুঃসাহসী। খাবার টেবিলেই আমাকে বললেন, ডিনারের পর আমার ঘরে একবার এসো তো। কথা আছে।

বিশাখাদি ও কল্লোলবাবু দারুণ ক্লান্ত। ওঁরা শুতে চলে গেলেন। ব্যালকনিতে বসে একটা সিগারেট শেষ করে আমি শোভনাবউদির ঘরে গেলাম।

শাদা লেসের কাজ-করা একটা হালকা হলুদ নাইটি পরে আয়নার সামনে বসে উনি ক্রিম মাখছিলেন। সুন্দর একটা গন্ধ আসছিল ওঁর গা থেকে। পিঠের মাঝখানে ব্রা-র হুক ফুটে উঠেছে। আমি তাকিয়ে রইলাম।

উনি বললেন, বিশাখা বোধ হয় টের পেয়েছে, বুঝলে? তবে ভয় নেই, ও কাউকে কিছু বলবে না। ও অনেক সাহায্য পায় আমার কাছ থেকে।

আমি ম্রিয়মান গলায় বললাম, আমিও তো আপনার কাছে অনেক সাহায্য পাই বউদি। আমার মতো একটা প্রাইভেট টিউটরকে আপনি মাসে হাজার টাকা দিচ্ছেন, এটা কি কম? আবার বলছেন, কমপিউটার কোর্সে ভর্তি হবার জন্য অ্যাডভান্স দেবেন।

উনি ভুরু নাচিয়ে সকৌতুকে বললেন, তুমি একটা হীরের টুকরো ছেলে। তোমার

দাম হাজার টাকার অনেক বেশি। অর্পিতাকে আমার হিংসে হচ্ছে।

আপনি যেরকম ভাবছেন, অর্পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। পুরী আসার আগে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে।

এই না হলে ছেলেমানুষ! শোভনাবউদি ওঁর সেই অদ্ভুত হাসিটি হাসলেন। মাধুর্য ও তাচ্ছিল্য ফিফটি-ফিফটি মেশানো। তারপর প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, অর্পিতাকে তুমি বোধ হয় বুঝতে পারোনি। ও একদিন টেলিফোনে আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে। মিস্টার মজুমদারকে সব বলে দেবে বলে শাসিয়েছে।

আমার চোখের সামনে পৃথিবী দুলে উঠল। কয়েকদিন আগেই মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি আমাকে বায়োডাটা টাইপ করে ওঁকে একটা কপি দিতে বলেছেন। অর্পিতার অবিমৃশ্যকারিতায় আমার বোধ হয় চাকরিটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি পাংশু মুখে বললাম, কী হবে বউদি তা-হলে?

কী আর হবে! শোভনাবউদি তরল হেসে বললেন, খুব বেশি যদি কিছু হয়, আমাকে ও ডিভোর্স করবে। সেক্ষেত্রে তোমার চাকরিটা যে হবে না সেটা বলাই বাহুল্য।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলালাম আমি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উনি খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, ভয় কী? তেমন হলে তুমি আর আমি না হয় লিভ-টুগেদার করব।

আমি আঁতকে ওঠার ভান করে বললাম, আপনার যা সব এক্সপেনসিভ হ্যাবিট! আমি বেকার ছেলে—

শোভনাবউদি বিরক্ত হয়ে বললেন, সারাক্ষণ বেকার ছেলে বেকার ছেলে কোরো না তো। তোমার তো টাকাপয়সার নিরাপত্তা চাই? আমার সঙ্গে থাকলে তোমার সেসব চিন্তা থাকবে না। গত পঁচিশ বছরে মজুমদার কোম্পানি থেকে যত টাকা আত্মসাৎ করেছে, তার প্রায় সবটাই আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে।

শোভনাবউদির ঠাট্টার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল, সহসা সেটা আমাকে প্রবলভাবে আঘাত করল। আমার দারিদ্র্য নিয়ে উনি অনুকম্পা করেন জানি, কিন্তু আমারও সহনশক্তির একটা সীমা আছে। কী ভেবেছেন উনি আমাকে? একটা কেঁচো, একটা কৃমিকীট? ওঁর সব অহংকার এক পাশব শক্তিতে চূর্ণ করে দিতে ইচ্ছে হল আমার। বললাম, বেশ, তবে তাই হোক। তোমার সঙ্গে আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত। বলতে বলতে পাঁজাকোলা করে শোভনাবউদিকে আমি তুলে নিয়ে এলাম বিছানায়। আমার পৌরুষ আক্রোশভরে জেগে উঠেছিল। উনি ঠিক তন্বী নন, কিন্তু ওঁকে তুলে আনতে কোনো কষ্ট হল না আমার।

উন্মত্ত হাতে আবরণ ঘোচাচ্ছিলাম আমি। ওঁর চোখ নিমীলিত। গাল ও নাকের ডগায় রক্তোচ্ছ্বাস। শিশির-ঝরার মতো অশ্রুতপ্রায় গলায় বললেন, তুমি যেমন অর্পিতাকে পড়িয়েছ, আমাকেও তেমনি একজন পড়িয়েছিল। পয়সা নিয়ে নয়, এমনিই পড়াত। দাদার বন্ধু ছিল।

সারাক্ষণ অর্পিতাকে উনি প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে চলেছেন। একটা কমপ্লেক্সের পর্যায়ে

চলে গেছে ব্যাপারটা। ওঁর শরীরের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম, এখন শুধু তুমি আর আমি। কোনো থার্ড পার্সনের কথা ভাবা চলবে না এখন।

উনি ফিসফিস করে বললেন, তোমাকে দেখলেই যে তার কথা মনে পড়ে যায় আমার। সে আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু আমি তাকে বড়ো নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কে জানে কোথায় হারিয়ে গেল লোকটা!

থমকে গিয়ে আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ফিরিয়ে দিয়েছিলে কেন?

সামান্য কী-একটা কাজ করত লোকটা। আর না কি কবিতা লিখত। মজুমদারের মতো ইঞ্জিনিয়ারকে ফেলে আমি কেন অমন একটা লোককে বিয়ে করত যাব? বলতে বলতে প্রায় স্ত্রী-মাকড়সার ধরনে উনি জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

আমার শরীর শিথিল হয়ে এসেছিল। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে নামছিল। আমার এমন সাহস ছিল না যে ওঁর প্রেমিকের নাম জিজ্ঞেস করি। কোনোক্রমে ওঁর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে আমি বিছানা থেকে নামলাম। পায়ে পায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সমুদ্রের গর্জন কানে আসছে। জোয়ার এল বোধ হয়। ঝাউগাছের পাতাপল্লবের ফাঁকে সমুদ্রবাতাসের মর্মরধ্বনি।

আমার পিছন-পিছন উনিও নেমে এসেছেন। বললেন, ঠিক আছে, আর কারো কথা এখন বলব না। চলো। এই রাতটাকে নষ্ট কোরো না।

আমার পিঠে ওঁর স্তনের স্পর্শ। আমি শক্ত করে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ওঁর দিকে চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার মুখের ভাষাও যেন হারিয়ে গেছে।

শোভনাবউদির কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমার হাত ধরে উনি টানাটানি করছিলেন। ওঁর তীক্ষ্ণ নখে ফালা-ফালা হয়ে যাচ্ছিল আমার পিঠ। দাঁতে দাঁত ঘষে উনি বললেন, নখরা করছ? কত টাকা চাই তোমার? কত টাকা?

আমাকে ছেড়ে দিন বউদি, প্লিজ। আমি আর পারছি না।

ড্রেসিং টেবিল থেকে হাতব্যাগখানা তুলে নিয়ে চেন খুললেন উনি। একগাদা নোট মুঠো করে ছুঁড়ে মারলেন আমার মুখে। সাপিনীর মতো হিসহিস করে বললেন, আরো চাই?

আমি নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় ধুয়ে যেতে লাগল আমার লোভ ও কামনার সারাৎসার।

সুপর্ণাকে নিয়ে একটি কথকথা

জগন্নাথ প্রামাণিক

দিগন্তে রামধনু ও মেঘমালা

সুপর্ণাকে আমি প্রথম দেখি স্বপ্নে। তখন আমি প্রতিরাতেই স্বপ্ন দেখতাম। কখনও কখনও দিনের বেলায়ও। বিশেষত, আমাদের উঠোনের বেলের ঝাড়ে ফুল এলে কিংবা ফুলের গন্ধে চারদিক সুবাসিত হলে। আমার মাষ্টার বাবার যে বছর মাথা খারাপ হল এবং চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল—সাবধান—সাবধান—সিরাজউদ্দৌলা, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর এগিয়ে আসছে। অথবা 'যাহা যায় তাহা অনন্ত কালের জন্য [illegible]িয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আইসে না।'—প্রভৃতি অসংলগ্ন আবোল তাবোল সংলাপ। বাবার মাথা খারাপ হওয়ার পরই আমি সুপর্ণাকে স্বপ্নে দেখি এবং আমার গনগনে যৌবনে সুপর্ণা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কামনার কীটজাল বিস্তার করে আমাকে দগ্ধ করতে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও যা অসম্ভব, যা ধরা ছোঁয়ার বাইবে, যা ভাবতে গেলে জিভের সব লালা শুকিয়ে যায়, তা নিয়েও মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্ন দেখে যেতেই থাকে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত। আমারও হল সে রকম অবস্থা। সুপর্ণা রূপবতী, সুপর্ণা স্বাস্থ্যবতী, মেদহীন। রামধনুর সাতটি রঙেব সবকটাই বোধহয় ঈশ্বর সুপর্ণার শরীরে মিশিয়ে দিয়েছে। সুপর্ণার লালঠোঁটে চুম্বক, চোখের তাবায় যাদু। চলার গতিতে ওড়িশি নৃত্যের ভঙ্গিমা। সুপর্ণা শরতেব মেঘমালাব মত ভেসে ভেসে বেড়ায়।

হঠাৎ দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ। আমি কলম থামিয়ে বসে বসেই জিজ্ঞেস করি, কে?

—দাদা আমি, একটু দরকার ছিল।

—এসো।

—আপনার ভাইকে বলেছিলেন?

—কি বলতো?

—ভুলে বসে আছেন তো! আমি ভেবেছিলুম—রুমার চোখে মুখে ঠোঁটে হাসির ফোয়ারা।

—না মানে....

—জানি, আপনি আত্মভোলা।

—বলব, আজকালের মধ্যে। সত্যি তুমি চাকরি করবে?

—না করলে দাদা আর চলছে না। নিমেষে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে যন্ত্রণা আর আর্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে রুমার চোখে মুখে।

রুমা অর্জুনের স্ত্রী। থাকে আমার ফ্ল্যাটের পাশের ফ্লাটে। তিন বছর বিয়ে হয়েছে ওদের, ছেলেমেয়ে হয়নি।

অন্ধকার আকাশে তাবার দ্যুতির মত রুমার যৌবন। যে কোন পুরুষ আকর্ষিত হতে বাধ্য।

আমি একাধারে লেখক এবং শিক্ষক। শিক্ষকতা আমার পেশা লেখা আমার নেশা।

সুপর্ণাকে নিয়ে একটি কথকথা

আমি যখন সুপর্ণাকে নিয়ে উপন্যাসটা লিখছিলাম তখনই রুমা আমার ঘরে ঢোকে, এবং চাকরির কথাটা তোলে।

রুমা চাকরি করতে চায়, কারণ রুমার বরের প্রাইভেট কোম্পানির চাকরির ইনকামে ওদের সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কিন্তু ওর বর অর্জুন মধ্যবিত্ত এবং অল্প আয়ের হলেও এমনই কতকগুলো মূল্যবোধকে ধরে আঁকড়ে বসে আছে, যে, স্ত্রীকে চাকরি করতে দিতে নারাজ। তাই রুমা আমাকে এসে বারবার অনুরোধ করে, যেন আমি ওর স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি, আজকাল অনেক মেয়েই তো আপিস আদালতে চাকরি করছে, রুমা করলে ক্ষতিটা কি। রুমা জানে, ওর বর অর্জুন, আমাকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, আমার কথা সে ফেলতে পারবে না।

একদিন, সেদিন সকাল থেকে আমার মাথার খুব যন্ত্রণা। জ্বরও সামান্য সামান্য। শুয়ে আছি বিছানায়। রুমা সারাদিন আমার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, দাদা আপনার কি শরীর খারাপ?

—ঠিক শরীর খারাপ নয়, সকাল থেকে মাথার খুব পেইন হচ্ছে, তাই স্কুলে যেতে পারিনি, শুয়ে আছি।

—রান্নাবান্নাও করেননি? খাওয়া দাওয়া হয়নি নিশ্চয়?

—না মানে, তেমন খিদে টিদে নেই।

মুহূর্তে রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে থালায় করে কিছু খাবার এনে আমার বিছানার সামনে রেখে আব্দারের সুরে বলে, উঠুন, খেয়ে নিন।

রুমার আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আমি বিছানা থেকে উঠে রুমার আনা খাবার তৃপ্তি করে খাই।

অর্জুনের নাতিদীর্ঘ চেহারার মধ্যে গ্লামারাস কিছু না থাকলেও পুরুষালি ভাবের কোন অভাব নেই। এবং আমার যতদূর মনে হয়, অর্জুন রুমার যোগ্য স্বামী। কিন্তু রুমাদের সংসারের অস্বচ্ছলতা মাঝে মাঝে আমাকে পীড়া দেয়। মনে মনে ভাবি, আমার তো এই ত্রিভুবনে কেউ নেই, যা মাইনে পাই, কিছু যদি ওদের দিই, ওদের সংসারের অভাব ঘোচে। কিন্তু ভাবনাটা, পাছে রুমা এবং ওর স্বামী অন্য ভাবে নেয়, এই চিন্তায় প্রকাশ করতে পারি না। এভাবেই কেটে যায় প্রায় ছটি মাস।

একদিন,আমি যখন আমার উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ সন্ধের দিকে রুমা হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে বলে, দাদা শিগ্‌গির একবার চলুন, ওর ভীষণ বিপদ।

—কী, কী হয়েছে? আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

—পুলিশ এসেছে ওকে এ্যারেষ্ট করতে।

—এ্যারেষ্ট করতে পুলিশ এসেছে? সেকি?

—হ্যাঁ, দাদা।

রুমার চোখে মুখে বিপন্নতা ও ভয়ের চিহ্ন। ওর আপেলবর্ণ রক্তিম গাল যেন রক্তশূন্য।

—সে কি, চল চল দেখি।

আমি রুমাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওদের ফ্ল্যাটে যাই। ওর স্বামী বিছানায় মাথা নিচু করে বসেছিল। আমাকে একঝলক দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রুমার স্বামীকে দেখে আমার যেমন রাগ হয় আবার মায়াও হয় সেরকম। আমি রুমার স্বামীর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রুমাকে জিজ্ঞেস করি, পুলিশ কোথায়?

—গেটে। লিফটের কাছে অপেক্ষা করছে। দত্তদা আমাকে খবরটা দিয়ে গেলেন।

—দত্তদা, যিনি হাইকোর্টের উকিল?

—হ্যাঁ।

—তা কিসের জন্যে এ্যারেষ্ট করতে এসেছে কিছু বলেছে?

—আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে রুমাও মাথা নিচু করে থাকে। স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসার আমার চেনা। এই জগদীশপুর মফস্বল শহরে আমি এই ক'বছরেই ইংরেজির স্যার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছি দ্রুত। সেই সুবাদে, ও.সির পুত্রটিও আমার কাছে টিউশানি পড়তে আসে।

ও.সি. সহদেব পুরকায়স্থ, বিদ্বান, সাহিত্যানুরাগী, যথেষ্ট ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে কথোপকথনের সময় মাথা নিচু করেই কথা বলেন। যদিও আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

আমি রুমাকে, আমার সঙ্গে এস, বলে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে যাই। ও.সি. আমাকে দেখতে পেয়েই বলেন, ভেরি সরি স্যার। আপনার জন্যই ওপরে যেতে পারিনি। অর্জুন সিংহের নামে মার্ডার কেসের ওয়ারেন্ট আছে।

—মার্ডার কেসের? আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। এতক্ষণ আমি ভেবেছিলাম, চুরিটুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অফিসের ক্যাশ তছরূপ, যা অনেক সময়, অনেক মানুষ অভাবের তাড়নায় করে থাকে, অর্জুন হয়ত সে রকমই কিছু করেছে। মার্ডার কথাটা শুনেই আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আমি ও.সিকে দৃঢ়স্বরে বলি, পুরুকায়স্থবাবু, বি অ্যালার্ট অ্যাবাউট ইওর ডিউটি।

—থ্যাঙ্ক য়্যু স্যার। বলেই পুরকায়স্থ ও তার সঙ্গীরা বুটের আওয়াজে সিঁড়ি কাঁপিয়ে ওপরে উঠে যায় এবং অর্জুনকে হাতকড়া পরিয়ে নিচে নিয়ে আসে।

একটা কথা ভেবে আমি আজও আশ্চর্য হয়ে যাই, মার্ডার কেসের আসামী হয়েও অর্জুন ফেরার হল না কেন?

অর্জুনকে নিয়ে চলে যাবার পর আমি ভেবেছিলাম রুমা হয়ত খুব কান্নাকাটি করবে এবং ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটেনি। ঘটেনি কারণ, রুমা আমাকে যা বলেছিল তা এইরকম।

রুমার স্বীকারোক্তি :

দাদা, আমি আর পারছিলাম না। ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। ও আমাকে ঠকিয়েছে। আমরা যখন বিরাটিতে ছিলাম তখন ওর সাথে আমার পরিচয় হয়। ওর ব্যবহার, ভদ্রতা, আন্তিকতা,ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই ওকে আমি বিয়ে করি। ও বলেছিল, ওর বাড়ি বিহারের পাটনাতে। বিয়ের তিন মাস পরে ও আমাকে বলল, আমি দেশে যাচ্ছি দিন সাতেকের জন্যে। দেশে কিছু জমি জায়গা

আছে সে সব বিক্রী করে এখানে একটা ফ্ল্যাট কিনব। আমি সানন্দে বলি,তা তো খুব ভাল কথা। যাও ও সেবার বাড়ি গিয়ে প্রায় মাসখানেক ছিল। ওর আসতে দেরী দেখে, বিহারের বাড়ির যে ঠিকানা দিয়েছিল, সেই ঠিকানায় আমি বেশ কয়েকটি চিঠি লিখি। কিন্তু একটিরও উত্তর পাইনি। পরে মাস খানেক বাদে ফিরে এসে ও আমাকে যা বলল, তা শুনে আমার ঘৃণায় লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। ও বলল, ওর আর একটি বৌ আছে এবং তার একটি মেয়েও আছে। দেশের জমি জায়গা বিক্রী করে এসেছে ঠিকই, তবে বৌকেও সঙ্গে আনতে হয়েছে। আপনি দেখতেন না, এখানে ওখানে কাজের নাম করে ও প্রায়ই দিনই বাড়ি আসত না। আসলে কাজের নাম করে ও ওর বৌয়ের কাছে গিয়ে থাকত। আর এই যে ফ্ল্যাটটা দেখছেন, এটা কেনা হয়েছে আমার মায়ের টাকায়। বাবা মারা যাবার আগে বেশ কিছু টাকা আমার নামে ফিক্সড করে গিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছে। কারণ আমি চেয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকতে। আরও একটি ঘটনা, শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, ওর বিহারে তেমন বিশেষ কিছু জমি জায়গা ছিল না। বিহার থেকে এসে ও ওর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে ওঠে। নিরীহ গোবেচারা মানুষ কালীপদবাবু মেয়ের সুখ-শান্তির জন্যে ওকে একটা প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকিয়ে বেশ কিছু টাকা মেয়ের হাতে দেন ঘর ভাড়ার জন্যে। ও সেই সব টাকা জুয়াতে উড়িয়েছে। বাইরে দেখতে ওরকম মিনমিনে হলে কি হবে ওব মধ্যে শয়তানি বুদ্ধি খেলা করে সব সময়। শুনেছি ওর বাবা ছিলেন বাঙালি, মা বিহারী। রুমা এসব কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমি রুমাকে বলি, যাও ঘরে যাও।

ঘরে যাবার আগে রুমা বলে, ও কাকে খুন করেছে জানেন?

—না, কাকে?

—সবিতাদিকে।

—সবিতাদি কে? আমি জিজ্ঞেস করি।

রুমা আর কিছু বলে না। ওঁর চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরতে থাকে।

আমি বুঝে নিই রুমা ওর সতীনের কথা বলছে।

রুমাকে বলি, চল, ঘরে চল। বলে, আমি দু'পা এগিয়ে সিঁড়িতে উঠতেই, রুমাও আমাকে অনুসরণ করে।

তা যা হোক, আসল কথায় আসি।

অর্জুন মার্ডার করার পর এ্যারেস্ট হয়ে যখন জেলে যায়, তখন রুমা অন্তঃসত্বা ছিল। অতএব আমার একটা দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ে। এবং সে দায়িত্ব, মানবিকতাহেতু আমি যতটা সম্ভব পালন করার চেষ্টা করি। রুমাও ক্রমান্বয়ে আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কিন্তু নিঃস্বার্থ উপকারে যে এত জ্বালা, এত অপমান তা আগে আমার জানা ছিল না। পাশাপাশি ফ্ল্যাটের লোকেরা আমাদের এই ঘনিষ্টতাকে অন্যভাবে নেয়। তারা কুরুচিপূর্ণ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

রুমা একদিন, আমি তখন উপন্যাসটির সুপর্ণা চরিত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে ছটপট করছি, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে পায়ের ওপর আছাড়ে পড়ে বলে, আর আমি

পারছি না দাদা, আমাকে হয়ত সুইসাইড করতে হবে।

আমি কোনওভাবেই বিচলিত না হয়ে রুমাকে হাত ধরে তুলে পাশে বসিয়ে বলি, ছিঃ, অমন কথা মুখে আনতে নেই। কি হয়েছে বল?

—আপনাকে আমাকে নিয়ে পাশাপাশি ফ্ল্যাটের অনেকেই আড়ালে আবডালে বহুদিন ধরে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করত। আজ দত্তবাবু আমাকে একটা বিশ্রী কথা বলে ফেললেন।

—কী বললেন দত্তবাবু?

—দত্তবাবু বললেন, বিশু নাকি ঠিক আপনার মত দেখতে হয়েছে।

—তাই? আমি হেসে বলি।

—হুঁ-উ।

—তা কি আর খারাপ বলেছে। অনেক সময় ভাগ্নেতো মামার মত হয়ই।

—দাদা! রুমা বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

আমি বলি, এর জন্য মন খারাপ করে লাভ নেই। যাও ছেলের কাছে যাও।

এই ঘটনার পর আমারও মনটা কেমন ভেঙ্গে পড়ে। রুমার মনের মধ্যেও সংকোচ ও আরষ্টতার জন্ম হয়। রুমা আমার ঘরে এলেই আমিও সব সময় একটা অস্বস্তি বোধ করি। ঘরে ঢুকলেই মন বলে, কখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। আজকাল আমি আর রাঁধি না। কারণ দু'হাঁড়ির খরচ যে অনেক। আমি বাজার হাট করি। রুমা রান্নাবান্না করে আমাকে ঘরে দিয়ে যায়।

উকিল দিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও অর্জুনের যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। যে রুমা, আগে চাকরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেই রুমা একবারের জন্যেও চাকরির কথা মুখে আনে না, হয়ত ওর শিশুপুত্রের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা, অথবা অর্থের প্রতি নিস্পৃহতা। আমিও পাছে রুমা অন্যরকম কিছু ভাবে, যেমন গলগ্রহ, বোঝা, তাই যেচে চাকরির কথা বলতে পারি না। ক্রমে দিন গড়িয়ে চলে, কেটে যায় প্রায় বছর দুই। রুমার ছেলে এখন হাঁটতে শিখেছে, কথা ফুটেছে মুখে।

এমতাবস্থায় আমি যখন রুমা ও রুমার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন একটা ঘটনা চোখে পড়ে। আমার ফ্লাটের চাবি, রুমার কাছেই থাকত। কারণ রুমার রান্না-বান্নার জন্যে বা এটা ওটা প্রয়োজনে, আমি কখন স্কুল থেকে ফিরি তার জন্যে অপেক্ষায় না থাকতে হয় রুমাকে। তাছাড়া যেহেতু রুমা আমার জীবনের সঙ্গে বা আমি পরোক্ষভাবে রুমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি, তখন আর ব্যবধানটুকু রেখে লাভ কি। বাবা মারা যাবার পর, যেহেতু আমি বাবার 'সবেধন নীলমনি' এবং এযাবৎ অবিবাহিত, ভবিষ্যতে আর সংসার করব কিনা যথেষ্ট বিচার্য, তখন যা কিছু সবই তো রুমা আর রুমার ছেলের।

সেদিন, আমার বাড়ি ফেরার কথা নয়। স্কুলের কাজে কলকাতায় যাওয়ার কথা। কিন্তু শরীর খারাপের জন্যে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হই। সন্ধের ঠিক আগে ফিরে দেখি, রুমা ও একটি সুদর্শন ছেলে আমার ঘরে। আমার সোফার ওপর বসে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথোপকথনে মগ্ন। বিছানার ওপরেই সদ্য সমাপ্ত করা চায়ের কাপ। বার তিনেক বেল টেপার পর রুমা ঘর খোলে। আমাকে দেখেই চমকে ওঠে। চোখ মুখের

ভাবে ভয়ংকর ভীতি। আমতা আমতা করে রুমা বলে, কি ব্যাপার দাদা, কলকাতা যাননি? আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বলি, না শরীরটা খারাপ তাই আজ আর গেলাম না। রুমা ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে এসে হাতটা ধরে পরখ করে বলে, কি হয়েছে? জ্বরটর হয়নিতো?

—নানা, এমনি। সকাল থেকে পেটটা খারাপ, স্কুলেও বার তিনেক বাথরুমে যেতে হল। তাই—

—অহ্। বসুন। বলে রুমা চেয়ার টেনে সামনে এগিয়ে দেয়। আমি চেয়ারে বসতেই রুমা বলে, দাদা ইনি আমার পিসতুতো ভাই অরুণ। দিল্লীতে থাকে। নিজস্ব ফেব্রিকপ্রিন্টের কারখানা আছে। কলকাতা এসেছে কয়েকদিনের জন্যে। খুঁজে খুঁজে এসে হাজির। আমি ঠোঁটে হাসি বিছিয়ে দিয়ে আন্তরিক ভাবে বলি, তা বেশ, ভালইতো। সেদিন ভদ্রলোক আর বেশীক্ষণ বসেননি। সামান্য দু'চার কথা আলাপের পর, কাজ আছে, চলি দাদা, বলে উঠে পড়েন।

রাতে আমি শুয়ে ভাবি, ইতিপূর্বে রুমাকে হাজার দিন হাজার প্রশ্ন সত্বেও ওর যে কোন আত্মীয় আছে, সে কথা ও স্বীকার করেনি, আজ হঠাৎ পিসতুতো ভাই.....।

কিন্তু নিজেকে ছোট না করে ঘটনাটিকে আমি অন্যভাবে নিই। হয়ত রুমা পিসতুতো ভাইকে তেমন আত্মীয়ের পর্যায়ে ফেলেনি বলে হয়ত বলেনি। তা বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তো ভালই। ক্ষতিটা কি। বরং রুমা একঘেয়েমি ও একাকিত্বের জীবনে ক্ষণিক আনন্দ তো পেয়েছে।

এরপর, মাত্র পনের দিন। একদিন স্কুল থেকে ফিরে আমাদের 'গীতাঞ্জলি' অ্যাপার্টমেন্টের গেট দিয়ে ঢুকছি, দারোয়ান আমার হাতে একটি চিঠি এবং দু'টো ফ্ল্যাটের চাবি ধরিয়ে দিয়ে বলে, দিদিমনি আপনাকে দিয়ে গেছেন।

ঘরে ঢুকে লাইট অন করে চিঠি খুলে দেখি, রুমা লিখেছে, 'দাদা, আমি অরুণের সঙ্গে দিল্লী চললাম। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

আজ, অনেকদিন পর, আবার আমি ধুলোময়লা ঝেড়ে আমার উপন্যাসের খাতা খুলে বসেছি। জানি না 'সুপর্ণাকে নিয়ে' উপন্যাসটা শেষ করতে পারব কিনা।

প্রবালদ্বীপের রেশম

ঋতুপর্ণ বিশ্বাস

কলকাতার আকাশে তখন কোন মেঘ ছিল না। বেতার কিংবা সংবাদপত্রে ছিল না দুর্যোগের পূর্বাভাস। তবু অঝর বৃষ্টিপাত আর দমকা হাওয়ার মধ্যে শিয়ালদায় এল রেশম। চেহারাটা সুচিত্রা সেনের নয়, তাই কম বেশী সব সময়ই সেজে থাকতে হয়। বাইরে বেরোবার সময় তো অবশ্যই। কিন্তু ক'দিন থেকেই রেশমের ভিতরস্থ প্রকৃতি এমন বিপর্যস্ত—সাজার কথা মনেই আসেনি। নিজের কিংবা ...ালের, যে কারোরই একটি চাকরি বহুদিন থেকেই চাওয়া ছিল। তবে তা অনেক দূরের কোন গ্রামে হোক কখনোই চায়নি। মধ্যবিত্তের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে চিরকাল অ-বনিবনা। তায় বিষয়টি চাকরির। তাই চোখের নদীতে কান্নার অনেক ঢেউ সয়েও শেষ পর্যন্ত এই স্টেশনেই একদিন প্রবালকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল রেশম। তারপর পেরনো পাঁচবছরে যতবার কলকাতায় এসেছে প্রবাল—ততবারই তাকে নিতে এবং ছাড়তে এসেছে এখানে। মাঝখানের সব দিনগুলিই মোটামুটি একরকম। প্রথম আর আজকেরটি একেবারেই আলাদা। প্রথমটির ব্যথার সঙ্গে মিশেছিল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। তাই সে বেদনা কষ্টযুক্ত হলেও মর্মান্তিক ছিল না। কিন্তু আজ! যেন হারিয়ে গেছে সর্বস্ব। একটা আকারহীন, তালগোল পাকানো মন আর শরীর নিয়ে স্টেশনে উঠে এল রেশম। টিকিট নিয়ে ঢুকে এল নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে। গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। উঠে জায়গা নিয়ে, বাঙ্কারে ব্যাগ রেখে বসে, আঁচল চাপল মুখের ঘামে।

তেত্রিশ দেখা রেশমের শরীরে বেগুনি তন্তুজ। ব্যস্ত মানসিকতায় ব্লাউজ পরা হয়নি রঙ মিলিয়ে। মোম-আলো রঙের ব্লাউজ শাড়ির নিচে জেগে আছে একাকার না হবার দাম্ভিকতায়। দু'চোখের দু'পাশে দু' থোকা কাটা চুল ঝুলে আছে পাশ ফিরে শোয়া দু'দুটি বাঁকা চাঁদের স্থির চিত্রে। ঘাম শোষা রুমাল খুলে, ঘুরিয়ে গরম তাড়াতে চাইল রেশম। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার আকাশ দেখতে চাইল। সোজা হয়ে, ঝোলানো ডানহাতের কবজির উপর বাঁ-হাত রেখে মাথা হেলিয়ে দিল দেওয়ালে। মোছা মুখের উপর আবারও ঘাম তুলছে সময়। তাকে আমল না দিয়ে চোখ বুজিয়েই রইল রেশম।

গ্রাম গঞ্জ ভেঙে দূরের শহরে যাওয়া ট্রেনগুলি সময়মত আসে না। এলেও প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে না। যথা স্থানে, যথা সময়ে সুবোধগঞ্জের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভিতরে স্বস্তি ছুঁয়েছিল রেশমের। বসতে পেয়ে এবং দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে দিয়ে আরো কিছু বিচ্ছিন্ন সুখ সংগৃহীত হলে—ভিতরে আলোকিত হতে থাকল চিত্রপট। গত পরশুর আগের দিন অফিসে মাড়াই হয়ে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে, টেবিল থেকে প্রবালের চিঠি কুড়িয়ে সেই যে দুশ্চিন্তাময় হয়েছিল—তা বুঝি আর কাটবে না গোটা জীবনে। মোম নামের এক সহকর্মীর মেয়ে ছ মাস পরিচিত হয়ে আংটি প্রেজেন্ট করেছে প্রবালকে। সাতাশ তারিখে তাকেই বিয়ে করছে প্রবাল। দু'একদিনের মধ্যে বিয়ের কার্ড পাঠাবে বলে জানিয়েছে। চার তারিখের চিঠি ডাক বিভাগের করুণায় এসে পৌঁচেছে চব্বিশে। হাতে পাওয়ার পরদিনই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল রেশমের, কিন্তু ছুটি মেলেনি। চাকরি এমনই একটি

প্রশ্ন—তাকে মনে রেখেই মানিয়ে নিতে হয় বাকি জীবনেব সঙ্গে। গতকালও বেরোতে পারেনি। টেবিল গুছিয়ে, ছুটছাট ঘরোয়া সমস্যা সামলে সময় করেছে আজ। সব ঠিকঠাক ঘটলে—আজই প্রবালেব বিয়ে। চিঠি পাওয়ার পবদিন নয়, চিঠি পাওয়ার সন্ধেতেই সে বেরিয়ে পড়ত সাতপাড়া গ্রামের জন্যে। যদি জানত এমনি একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে; ঘটবেই বলে স্থির হয়ে যায় নি। গত এক বছরে অনেকবার বিয়ের কথা তুলেছে প্রবাল। গুছিয়ে নেবার জন্যে আর একটু সময় চেয়েছে রেশম। দ্বিতীয় স্ট্রোক এসে বাবাকে নিয়ে যাবার পর তার অফিসে অপেক্ষাকৃত ছোট চেয়ারে শরীর নিংড়ে সংসার টানছিল মা। তার গলার ফাঁস একটু আলগা করতে বিএসসি দিয়ে চাকরি পাওয়ার যুদ্ধে নেমেছিল। সেই যুদ্ধ হাতবন্দী হল এমএসসি পাশ করার পর। ততদিনে মায়ের একরাশ চুল চোখে পড়ার মতন ফাঁকা। কালোর মধ্যে এলোমেলো মিশেছে রূপোর রঙ। ভাইবোনসহ রেশম কাটিয়েছে আরো কিছু অভাবের দিন। প্রবাল এসে চলেছে পুরনো হতে।

চাকরি খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে টিউশনিও শুরু করেছিল রেশম। এক জায়গায় পড়িয়ে আর এক জায়গায় শুরু কবার আগে সন্ধ্যের আগ-মুহূর্ত কাটাতো কলেজ স্কোয়ারের জল দেখে। এসময়ই দেখা মেলে প্রবালদ্বীপেব। সেও তখন ছেলে পড়াচ্ছে কষে। একটুব জন্যে ফুসফুসে দম ভবতে আসে পাশের বেঞ্চে।

চাকরি পাকা-হবার পর থেকেই বিয়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিল প্রবাল। তবে তা তেমন জোরালো উচ্চারণে নয়। হয়তো সেই উচ্চারণেই সোচ্চার হত রেশম। এতদিন কবেই বৌ হযে চলে যেত সাতপাড়ায়। হঠাৎ এসে গেল চাকরি। মনে হল, একদিন না একদিন তো বাসিন্দা হতেই হবে প্রবালদ্বীপের। যতদিন পারা যায় কেন না কবে চাকরিটা! পেতে তো কম মেহনত ঝরাতে হয়নি। মা-ভাই-বোনের জন্যে কিছু করাও খুব জরুরী। ভাইটাব কিছু একটা হলেই সে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে। ততদিন না হয় কলকাতায় বদলী হয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করুক প্রবাল। যদি হয়ে যায়—ঘরের সঙ্গে চাকরিও করা যাবে। ভাইয়ের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তার পরের প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্তও সাহায্য করা যাবে তাদের। প্রবালকে বুঝিয়েছিল রেশম। সে বুঝেও ছিল। এসেই রাইটার্সে দৌড়তো বদলীর তদ্বিরে। হঠাৎ গত বছব ভেঙে পড়ল, 'এরা কেবলই আমাকে দৌড় করাচ্ছে রেশম। তুমি মনস্থির কর। চল আমাব সঙ্গে। আমার তো কাউকে পয়সা পাঠাবার নেই, তোমার আমার উদ্বৃত্ত পাঠিয়ে দেব তোমার মায়ের কাছে।'

রাজি হতে পারেনি রেশম। মনে হয়েছিল অকারণে ব্যস্ত হচ্ছে প্রবাল। সে নির্ভর করতে পারে তার টাকার উপর। মা-ভাই-বোন নাও করতে পারে। বড় কথা, চাকরি ছেড়ে দেওয়া এক মিনিটের ব্যাপার। যে কোন মুহূর্তেই দেওয়া যায়। তারপরেই যদি কলকাতায় ট্র্যান্সফার পায় প্রবাল? কিংবা ঈশ্বর না করুন, যদি কখনো বিপদ হয় দুজনের কারো? তার চেয়ে বরং সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আবো কিছুদিন সময় নেওয়া উচিত। সেই সময়েব সীমারেখা পর্যন্ত এখানে বদলীর জন্যে চেষ্টা করুক প্রবাল। শেষ পর্যন্ত যদি না-ই হয় চলে যাওয়াটা তো হাতের মুঠোয় রয়েছেই। সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে চিঠিপত্রের হাব কমে এসেছিল দুজনেরই। প্রতি সপ্তাহে নতুন চিঠিব আসা কিংবা যাওয়া কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাসে দুটিতে। মাস ছয়েক আগে এক চিঠিতে প্রবাল লিখল, সহকর্মীর এক

মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার নাম মোম। মোমের মতই তার রঙ এবং মসৃণতা। এর পরের চার পাঁচটি চিঠিতে আর তার কোন নামগন্ধ নেই। শুধুই তাতে অনুরোধ উপরোধ, আর পারছি না রেশম, বিয়ের ব্যাপারটা দ্রুত স্থির করে ফেল। মোমের রঙ এবং স্বভাবের বর্ণনা বিরক্ত করেছিল রেশমকে। তাছাড়া সেসময় একটা ঝামেলাও চলছিল অফিসে। প্রবালের সব চিঠির ঠিকঠাক জবাব দেয়নি রেশম। সম্ভবত মাস আড়াই আগে প্রবাল লিখল, মোম সত্যিই বড় মিষ্টি মেয়ে। তার জন্মদিনে গিয়ে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করা গেল। সে আমাকে একটা আংটি উপহার দিয়েছে।

এ চিঠির জবাব খুব কড়া করে দিয়েছিল রেশম। এসব কি ছেলেমানুষী শুরু করেছ! মোমের সঙ্গে আলাপ-বিলাপ বন্ধ কর। পাড়াগাঁ, বিপদে পড়বে; বিয়ের কথা আপাতত ভাবতে পারছি না। অফিসে ঝঞ্ঝাট চলছে। বোনের পড়াশুনোয় তেমন গা নেই। ভাবছি তার বিয়েটাই আগে দিয়ে দেব। এত চিঠি লিখছ—কোনটাতেই কাজকর্মের প্রগতি কিংবা শরীর গতিকের উল্লেখ নেই। এগুলিতে নজর দাও। সময় কাটবে, আখেরেও লাভ হবে।

এচিঠির পর অনেক দিন আর প্রবালের চিঠি আসেনি। দিন বুইয়ে এই এল, মোমের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হওয়া এবং দু'একদিনের মধ্যে তাদের বিয়ের কার্ড পাঠানোর সংবাদ নিয়ে। চারের চিঠি যখন চব্বিশে এল, পরেরটা- বিয়ের কার্ড নিশ্চয়ই আরো পরে আসবে। কিংবা হারিয়েই গেছে হয়তোবা।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। জানলা দিয়ে আসা অনেক বঞ্চনার কিঞ্চিৎ হাওয়ায় এখন ঈষৎ মোলায়েম হচ্ছে ভিড়ঠাসা ট্রেনের গুমোট পরিবেশ। ইদানীংকার ভারতীয় রেল এক আধঘন্টা লেটকে লেটের মধ্যে ফেলে না। তাই সুবোধগঞ্জের গাড়ি পয়তাল্লিশ মিনিট লেটে ছাড়লেও তা যথা সময়ে ছেড়েছে বলাই নিরাপদ। সেই সময় ছেড়ে এই যান এই মুহূর্তে এমন জানবাজী রেখে দৌড়চ্ছে—বিকেলের আগে রেশম সাতপাড়ায় পৌঁছতে পারবে বলে তার মনে হচ্ছে না। সাত পাড়া নিয়ে সাতপাড়া গ্রাম। প্রবাল থাকে দ্বিতীয় পাড়ায়। স্টেশন থেকে তার বাসার দূরত্ব রিকশায় আট মিনিটের পথ। কখনো সেখানে যায়নি রেশম। প্রবালের মুখে শুনে শুনে সে-গ্রামের সব কিছু অনেকদিন থেকেই তার ভিতরে ছবি। সেই ছবির গ্রামে পৌঁছনোর জন্যে রেশমের মন ট্রেনের আগে আগে ছুটছিল। বিয়ে ভাঙার কথা সে ভাবতে পারে না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সিন করার মানসিকতাও তার নেই। সে শুধু দেখতে চায় তার চোখের উপর কেমন করে বিয়ে করে প্রবাল। দেখতে চায় কেমন সে মোম—যার আগুনে এতদিনের সম্পর্ক চমৎকার জ্বালিয়ে দিতে পারল প্রবাল। কিন্তু শুধু এই দেখতেই কি এই শরীর মনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে রেশম। ট্রেন যত সাতপাড়ার ব্যবধান কমাচ্ছিল—নিজের কাছেই সে নিজে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছিল।

দুপুর ছাড়ানো বেলায় সাতপাড়ায় নামল রেশম। স্টেশনে পা রেখেই মনে হল, কেন সে এল। নতুন করে অপমানিত হবে বলে। বিয়ে মানেই লোক সমাগম। সেখানে পৌঁছে নিজের পরিচয় কিংবা তার পরিচয় প্রবালই বা কি দেবে! ভাঙা শরীর মন শেষের দিকে আরো ভাঙতে ভাঙতে ট্রেন থেকে নেমেছিল রেশম। শোনা রাস্তা মিলিয়ে নিয়ে সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েই থেমে গেল। আজ কিছুতেই প্রবাল-গৃহে যাওয়া যায় না। আজ প্রবালের বিয়ে। চোখের সামনে টলমল করে উঠল পৃথিবী। শরীরের সব শক্তি পা য়ে

ঢেলে তাকে দিয়ে শরীর বইয়ে নিয়ে নিজেকে টিকিট ঘবেব সামনে আনল বেশম। ব্যাগ খুলে টাকা বের করে ঝুঁকে পড়ল কাউন্টারে। ঠিক তখনি পিছন থেকে এসে হাত চেপে ধরল কেউ। 'ফিরে যাচ্ছ!'

'প্রবাল!' বিস্ময়ে বুঝি ফেটে যাবে রেশম।

ডান হাতে তাকে জড়িয়ে নিয়ে ওয়েটিং বেঞ্চ এনে বসালো প্রবাল। শান্ত হয়ে বলল, 'এতদূর এসেও ফিরে যাচ্ছিলে, রেশম!'

'কি করি, কার কাছে যাব! মোমের প্রবালের কাছে।'

কৌতুকভাঙা গলায় হেসে উঠল প্রবাল। বলল, 'দূর। মোম তো আমার বানানো। তোমাকে নাগালে পাওয়ার জন্য এমন একটা গল্প আমাকে বলতেই হল।' চকিতে চোখ তুলে তাকাল রেশম। প্রবাল দু'চোখে আশ্বাসের হাসি দুলিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক তাই। এমনি একটা গল্প বলে আমি তোমাকে জাগাতে চেয়েছিলাম রেশম। চার তারিখের পব থেকে প্রতিদিন ট্রেন টাইমে স্টেশনে আসি। জানি, তুমি না এসে পারবে না। কিন্তু এত দেরি করবে ভাবি নি।'

'চিঠি যেতে দেরি করেছে।'

'গেছে যে—এই আমার অনেক।' উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ তুলে নিল। হাত বাডিযে বলল, 'এস।'

রেশম উঠে দাঁড়াল নিজেই। তাবপব নিবিড় করে জডিযে ধবল প্রবালেব হাত।

ঘুড়ি ওড়াবার দিন

অমিতাভ সমাজপতি

এই নিয়ে তিনবার হল। তিনবার তিনরকম ভাবে চেষ্টা করে তাপস বসে পড়েছে ছাদের মেঝেতে। ঘুড়ি ওড়েনি।

'তুমি ঘুড়ি ওড়াতে পারো না?'

'না।'

'এই যে বললে ঘুড়িটা উই উঁচুতে তুলে দেবে? দিচ্ছ না কেন? ও বাবা, ও বাবা—'

বিরক্ত তাপস এই সকালবেলা জীবনের হাজারো অকৃতকার্যতার সঙ্গে আর একটার সংযোজন করে আরও বিরক্ত হল। একটা ঘুড়ি, উড়ল না। ছেলেবেলায় দাদা ঘুড়ি ওড়াত। তাপস শুধুই লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। প্যাঁচ খেলার সময় ও শুধু বলত ভো কাট্টা, ব্যস ওই পর্যন্তই। ঘুড়ি ওড়ানো শেখা হয়নি। অবশ্য অনেক কিছুই শেখা হয়নি তাপসের। সর্বাণী খোঁচা দেয় দু বেলা—ফিউজ লাগাতে পারো না, ছেলের খাতায় একটা ছবি আঁকতে পারো না। সাইকেল চালাওনি কোনও দিন। সাঁতার। ছি ছি বোলো না কাউকে—

আর একবার চেষ্টা করার জন্য লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় তাপস। ঘুড়িটাকে কল খাটিয়ে গেড়ো দিতে দিতে ও আবিষ্কার করল যে এই টেকনলজিটা বেশ কঠিন; এবং এটাও জানার জিনিস এবং এটাও সে জানে না।

বুম্বা আবার লাটাই ধরেছে। ঘুড়িটাকে ছাদ থেকে খানিকটা নীচে ঝুলিয়ে হেঁচকা টান মারে তাপস। ফরফর ফরত ফর। শব্দের পর শব্দ উঠল, বুম্বা সমানে চিৎকার করছে, উড়ে যাচ্ছে। বাবা, উড়ছে উড়ছে।

ঠক্।

একেবারে গোত্তা খেয়ে ছাদের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘুড়ি। পিতা-পুত্র নির্বাক হয়ে সেই পতনের দিকে তাকিয়ে রইল। পতনের পরেই বিলাপ। একেবারে মহাকাব্যের নিয়ম মেনে বুম্বা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছে।

তাপস চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এখন পর্যন্ত জীবনের সমস্ত অকৃতকার্যতা যেন ম্লান হয়ে উঠেছে এই অপদার্থতার কাছে। ছোট্ট শিশুটাও তাকে বুঝে ফেলেছে।

ছাই-মাখা আকাশে জমাট বাঁধা মেঘ তখন একটু একটু করে ইলশেগুঁড়ি ছড়াতে শুরু করেছে। কয়েকটা বড় জলের ফোঁটা গায়ে পড়তে তাপস এই মহান সংগ্রামের আসন্ন সমাপ্তি অনুমান করে স্বস্তি পায়। লাটাইসুতো ঘুড়ি আর বুম্বাকে বগলদাবা করে নীচে নামবার জন্য পা বাড়াতে বুম্বা আবার কান্না শুরু করল প্রবল বেগে। বৃষ্টির বেগ আর কান্নার বেগের অনুপাত হিসেব করতে গিয়ে তাপসকে আবার থমকে দাঁড়াতে হল। আর একবার শেষ চেষ্টা। ঘুড়ি নামিয়ে দিতে হল নীচে। প্রাণপণে হেঁচকা টান। ছাদের দেয়ালে মাথা ঠুকে কাগজ ছিঁড়ল ঘুড়ি উড়ল না।

এবার আর সময় নেই। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আকারে নেমে আসছে। তাপস আবার সব সাজিয়ে গুছিয়ে নীচে নামবার তোড়জোড় করতে গিয়ে চম্‌কে উঠল। সামনে ফাঁকা, মাঠটার ওপারে হলুদবাড়ির দোতলায় অপর্ণা। বারান্দার গ্রিলটাকে আঁকড়ে ধরে হো হো করে হাসছে। হাত নেড়ে ইশারায় বলছে নেমে যাও, নেমে যাও, ঘুড়ি ওড়ানো তোমার কম্ম নয়।

তাপস বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে হলুদ বাড়ির গ্রিলের দিকে। অবিন্যস্ত মানিপ্ল্যান্টের ঝাঁঝরির মধ্যে অস্পষ্ট মুখ। অপর্ণা। মুখখানি বৃষ্টির জলে ঝাপসা হয়ে আসার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে শুরু করে তাপস।

ও বাবা, আর উড়বে না ঘুড়ি?

কেন?

বৃষ্টি পড়ছে

কেন? বৃষ্টিতে ঘুড়ি ওড়ে না?

না।

কেন?

জানি না—। তাপসের ধমকটা নিষ্ঠুরের মতো শোনালেও কিছু করার নেই ওর। সিঁড়িগুলো পেরোতে ঘুড়ি লাটাই বুম্বা ইত্যাদিরা সব মুছে মুছে যাচ্ছে। নিজেদের পায়ের শব্দ, প্রত্যেকটা দরজায় টিভি, টেপরেকর্ডার আর কাজের লোকদের হৈ হৈ রৈ রৈ মুহূর্তে-মুছে গিয়ে কানে একটানা বাজতে শুরু করেছে শুধু ঝেঁপে আসা বৃষ্টির এপিটাফ। চোখের সামনে হলুদবাড়ি। গ্রিলটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ। অপর্ণা।

কতদিন পরে দেখল অপর্ণাকে? কবে এল? কখন এসে দাঁড়াল বারান্দায়? সেই বারান্দা—চৌকো মোজাইক। মানিপ্ল্যান্টের অগোছালো বিন্যাস। গ্রিলে ষড়ভুজের ছোট ছোট ডিজাইন মাঝে মাঝেই অপর্ণার হাত, ঢুকে যেত ফোকর গুলোতে। একবার করাত দিয়ে গ্রিল কেটে হাত বার করতে হয়েছিল। জায়গাটা বোধহয় এখনও ফাঁকা রয়েছে।

অপর্ণা মানে জানো?

হ্যাঁ।

কী।

বলব কেন?

জানো না বলবে কী—

অপর্ণা মুখ ভেংচে গম্ভীর গলায় বলল, অপর্ণা সেন, সিনেমা করে..

তাপস হাসতে হাসতে বসে পড়েছিল গ্রিলের কাছে ওই সোফাটায়। কিছুক্ষণ আগে বাংলা অভিধান ঘেঁটে জেনে নেওয়া শব্দটা হুবহু মুখস্থ করে নিয়েছিল সে। অপর্ণা অর্থাৎ যিনি তপস্যা কালেও পর্ণ অর্থাৎ পাতা পর্যন্ত আহার করেন নাই—সং, ন+পর্ণ+আ, স্ত্রী

আমাকে সং বললে তুমি।

সং বললাম কোথায়!

এই তো বললে—

তাপস শব্দ করে হেসে উঠে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সং, মানে সংস্কৃত। অপর্ণা

কথাটা সংস্কৃত শব্দ। অপর্ণা ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাপসের গায়ে। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান 'আমাকে তুমি স্ত্রী বলেছ--'

স্ত্রী!

তাপস আরও জোরে হাসতে হাসতে চুল ছাড়াবার চেষ্টা করে 'আরে শব্দটা স্ত্রী লিঙ্গ...'

তাপসের চুল ছেড়ে অপর্ণা কোমরে দু হাত রেখে চোখ বড করে জোর ধমক দেয়, 'তুমি ফের মাস্টারি করছ আমার উপর। দেখবে, দেখবে, কে কী খায়...

আর ঠিক তখনই অপর্ণা চিৎকার করে উঠেছিল, 'এ মা আমার হাত আটকে গেছে! কী হবে!'

তাপস আশ্চর্য হয়ে দেখল গ্রিলের ফোকরে আপর্ণার হাত আটকে গেছে—

বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। পিতা পুত্রের অকৃতকার্যতা বেশ খানিক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করাব পর সর্বাণীর হাসি থামল। 'ঘুড়ি ওড়াতে জানো না। পাঁচতলার ছাদে এত হাওয়া—উড়ল না!'

বিছানায় বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাপস মাথা নাড়ে—না গো, ওটা যে এত কঠিন সাবজেক্ট এতদিন বুঝতেই পারিনি। ভাবলাম অত হাওয়ায় দু-চারটে টান মারলেই উঠে যাবে উপরে। বৃষ্টি কমলে আবার চেষ্টা কবা যাবে...

'অনেক হয়েছে'। ঘুড়ি লাটাই আলমাবিব মাথায় সাজিয়ে রাখতে রাখতে সর্বাণী আবার হাসে।

বৃষ্টি কখন কমবে বাবা?

তা তো জানি না--

কেন জানো না?

তাপস হাসতে গিয়েই থেমে যায়। ছোট্ট ছেলেটার প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা হুবহু একরকম। আবার মনে পড়ে তাকে। বৃষ্টির এই আধখেঁচড়া ছাটে চায়ের মধ্যে দু এক ফোঁটা জল পড়তে জানলাটা বন্ধ করতে এগিয়ে যায় তাপস। ছাটের জল তার মুখ'চোখ ভিজিয়ে দেয়। বৃষ্টি বৃষ্টি...

তুমি বৃষ্টিতে ভেজো?

না।

কেন?

আশ্চর্য তো! বৃষ্টিতে কেউ ভেজে? ঠাণ্ডা লাগে যে!

অপর্ণা ঠোঁট উল্টে ওদের ছাদেব কিনারে দাঁড়িয়ে নীচের মানুষ দেখত। কাগজের পুটলি বানিযে ছুড়ে দিত নীচের হেঁটে যাওয়া লোকেদের মাথায়। বিশেষ করে টাক মাথা দেখলেই এমনটা করত—'আমি টাক সহ্য করতে পারি না। তোমার টাক হলে আমি লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো—'

রক্ত বেরোবে যে।

বোরোক। রক্ত বেরলে কি হয?

তাপস চা শেষ করে জানলার বাইরে ইচ্ছে করেই মুখ বাড়িয়ে রাখল। মুখে চোখে বৃষ্টির রোঁয়াগুলো যথেচ্ছ ভাবে খেলে যাচ্ছে—বারান্দার ফাইবার গ্লাসের করোগেটেড শেডটার উপর জল পড়ে টিপ টপ টিপ টপ শব্দগুলো এক তালে যেন বলে চলেছে অপর্ণা-অপর্ণা...

তাপস বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বর্ষার এই এলোমেলো জল, কালো চুলের মতো মেঘ আর ঝমঝম শব্দ এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মনটার ভেতর থেকে তেড়ে ফুঁড়ে বাইশ বছরের তাপসকে কে যেন কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে বারান্দায়। ঝাপসা জলের পরদার মধ্য দিয়ে, তাপস দেখতে থাকে হলুদবাড়ির চিলেকোঠা।

চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকি চল!

কেন?

কেউ দেখতে পাবে না আমাদের...

কেন?

আরে দূর বোকা, তুমি বড্ড বোকা, একেবারে হাঁদা-গঙ্গারাম। ও মা তোমার গোঁফ উঠেছে! এ মা!

কুড়ি বছরের তাপস ষোলো বছরের অপর্ণার হাত ধরে উঠে গিয়েছিল ওই চিলেকোঠাব ঘরে; একদিন বর্ষার এমনই দিনে। তারপর—বৃষ্টি বৃষ্টি। ঘন কালো আকাশে থরো থরো মেঘ।'বিদ্যুতের চমকের সাথে কেঁপে কেঁপে ওঠা...

চলো বৃষ্টিতে ভিজি...

কেন?

অপর্ণা রাগ করে একাই দাঁড়িয়েছিল ছাদের মেঝেতে বৃষ্টির জলে। ধীরে ধীরে ষোলো বছরের শরীর ফুটে উঠেছিল আবরণ ছাড়িয়ে। তাপস চিলেকোঠার দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখেছে। বিদ্যুতের চমক হার মেনেছিল এই চমকের কাছে।

ঠাণ্ডা লাগবে।

লাগুক। ঠাণ্ডা লাগলে কী হয়?

জ্বর হয়।

জ্বর হলে কী হয়?

অপর্ণা, অপর্ণা। করোগেটেড শিটের উপর বৃষ্টির জল তখনও একনাগাড়ে শব্দ কবে চলেছে। শুনতে শুনতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাপস। মনের মধ্যে আনন্দ, বেদনা, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাল লাগা। তারপর হেরে যাওয়া।

আমি পাস করেছি। এই যে আমি পাস করেছি ফার্স্ট ডিভিশন।

তাপসের বুকের মধ্যে কেউ যেন লাফ মারল দুটো। ফার্স্ট ডিভিশন। তাপস আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। নিজে ও বরাবর সেকেন্ড ডিভিশন। অপর্ণা যেন সেই প্রথম একাই বড় মাপের লাফ দিল। একলাফে ছিট্‌কে গেল অনেকটা।

বাবা, ও বাবা বৃষ্টি থামবে না?

তাপস আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে বুম্বার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায়। ছোট ছেলেটা উৎকণ্ঠা নিয়ে আকাশ দেখছে। কখন বৃষ্টি সরে যাবে—তার ঘুড়ি উড়বে। দুদিন ধরে সমানে বায়না করছে, ঘুড়ি, ঘুড়ি—

তাপস মাথা নাড়ে—থামবে, নিশ্চয়ই থামবে।

কখন?

এই তো একটু পরে।

তখন আবার আমরা ছাদে যাব? তখন আবার ঘুড়ি উড়বে?

বুম্বার মুখের উজ্জ্বল হয়ে ওঠাটা পুরোপুরি দেখতে পায় না তাপস। তার আগেই তার দৃষ্টি চলে যায় আবার হলুদ বাড়ির চিলেকোঠার ছাদের অংশটায়। জোট বাঁধা কালো মেঘ সেখানে থিক্‌থিক করছে। এই বৃষ্টি না থামাই ভাল। বৃষ্টি থামলেই তাকে আবার উঠে যেতে হবে ছাদে। আবার ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে না পারা। আবার অপর্ণার হাসি—পাশে বসে আছে তার স্বামী। ইঞ্জিনিয়ার। টিকলো নাম। ছ'ফুট লম্বা। ঝকঝকে। সপ্রতিভ। প্রবাসী ভারতীয়। ওদের বিয়ের কয়েকদিন পরেই পরিচয় হয়েছিল তার সাথে তাপসের।

এই যে তাপসবাবু। আমি মশাই আপনাকেই খুঁজছি—

তাপস খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে ভদ্রলোক হো হো করে হাসেন। অপ্রস্তুত তাপস একেবারে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

আপনি হলেন আমার মিসেসের একমাত্র বয়ফ্রেন্ড অ্যান্ড অ্যাজ সি ক্রেমস ইউ আর হার অপু ইন পথের পাঁচালি, অপু ইন অপরাজিত অ্যান্ড অপু ইন...

তাপস লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। লজ্জা পেয়ে ওর কান লাল হয়—

আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন মশাই? এদেশের লোকেরা ফ্রেন্ডশিপ বোঝে না। একজন নারীও যে একটা পুরুষের যথার্থ বন্ধু হতে পারে, এটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। আসুন আপনাদের এই পবিত্র বন্ধুত্বের দীর্ঘ স্বাস্থ্য কামনা করে যদিও এক্ষুনি আমাদের মদ্যপান করা উচিত; তা এই নতুন শ্বশুরবাড়িতে সেটা তো সম্ভব নয়—তাই আপাতত সিগারেট পান করি, আসুন।

ভদ্রলোক সিগারেট বাড়িয়ে ধরতে আরও সংকুচিত হয়ে ওঠে তাপস। তার তখন টিউশনির মাইনেতে বিড়ি খাওয়া শুরু হয়েছে, তাও লুকিয়ে।

ইতিমধ্যে অপর্ণা ঘরে ঢুকে পড়তে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান এবং 'একমিনিট' বলে বাইরে চলে যান। অপর্ণা। লাল সিল্কের শাড়ি। লাল ব্লাউজ। টকটকে ফরসা নাকে নতুন সিঁদুরের গুড়ো লুটোপুটি খাচ্ছে। হাসি খুশি। দারুণ মানিয়েছিল দুজনকে।

তাপস মাথা নামাতে নামাতে নিজের হেরে যাওয়া মেনে নিয়েছিল। সোফায় বসে রয়েছে অপর্ণা। তাপসের মনে হয়েছিল যেন কত দূরে বসে মুচকি মুচকি হাসছে। অথচ কয়েকদিন আগেও এই অপর্ণা ছিল কত সুলভ। সহজ। একদিন বর্ষার এমনি দিনে সারা

কলকাতা ভাসিয়ে এসেছিল সেদিনেব বৃষ্টি। তাপস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। এমনি দিনে তার...... ....

কলেজের বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল অপর্ণা। তুমি এখানে? এই বৃষ্টিতে বেবিয়েছ কেন?'

তাপস উত্তর দেয়নি। অপর্ণা বইপত্রগুলো তাড়াতাড়ি তাপসকে গছিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে তাপস বাঁধা দিয়েছিল, 'একি। জল মাড়িয়ে রাস্তায় নামছ কেন? দাঁড়াও, বাস আসুক'—

অপর্ণা ভ্রূক্ষেপ না করে নেমে গিয়েছিল প্রায় হাঁটু জলে। কাপড়টা অনেকটা তুলে হাঁটছিল ও। বাস-ট্রামের ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠেছিল শরীর। অগত্যা তাপসকেও নামতে হয়েছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে...

কোথায় যাবে?

কোথাও না। তোমার সঙ্গে শুধু হাঁটব। যত দূব চোখ যাবে হাঁটব। না করবে না।

ঝপ ঝপ শব্দে জল কাটতে কাটতে আর ঢেউয়ে দুলতে দুলতে অপর্ণা নিজেব অজান্তেই তাপসের হাত ধরে হাঁটছিল। একসময জলপথ শেষ হয়ে ডাঙায আশ্রয নিয়েছিল দুটি প্রাণী। পরদা দেওয়া রেস্টুরেন্টেব গবম চায়ে মুখ পুড়ে যেতে চোখে জল এসেছিল অপর্ণার। তাপসেব মনে হযেছিল এই হল ঠিক মুহূর্ত। ঠিক এই সময বলা উচিত। অপর্ণা তারপর চা খেল। চপ খেল। আঁচলেব জল নিংড়ে নিতে নিতে ভেজা কাপড় ফ্যানের হাওয়ায় মেলে ধবল নির্দ্বিধায়। তাপস শুধু বসে বসে দেখল, বলা হল না কিছু। চোখের সামনে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে নিজেদের টালির বাড়ি। সকাল সন্ধে টিউশনি, আব প্রায় কাছ ঘেঁষে বড় হতে থাকা দুটি বোন। অপর্ণাদেব দোতলা বাড়ি, সাদা গাড়ি। মাঝখানে ব্যবধান। সমুদ্রের মতো। সেই সমুদ্রের ঢেউ একটু একটু করে সাবাদিনের জমানো প্রেম আব নিকষিত সাহসকে ঠেলে সবিযে দিয়ে একেবারে স্থবির করে দিয়েছিল তাপসকে—

কী দেখছ?

তাপস চোখ নামায়।

চা খাচ্ছ না? ঠাণ্ডা চা খাবে নাকি?

তাপস চুপ করে বেস্টুরেন্টের জানলাটাব বাইবে তাকাতে ধমক দেয় অপর্ণা। 'শোন, আমার বিয়ে। ছেলে বিদেশে থাকে। তোমাব কিছু বলাব আছে?'

তাপস যেন হাতুড়ির আঘাত খেল মাথায়। মুহূর্তে ছোট চিলেকোঠায় আটকে থাকা শৈশব, স্কুল কলেজ ফালা ফালা করা যৌবনের উচ্ছ্বাস ভাসতে শুরু করল চোখে। বাইরে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে আবার তখন। আবাব জানলাটাব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেরে গিয়েছিল তাপস। মাথাটা ক্রমশ নীচেব দিকে নেমে গিয়ে দুলেছে দু চাববার। তারপর...

তারপব কাকতালীয় ভাবে টালিব বাড়িতে এই মালটিস্টোরিড বাড়ি। তাতে জমির মালিক হিসেবে দুটি কামবার একটি ফ্ল্যাট। সরকাবি কেরানি হবাব জন্য মরণপণ।

বোনেদের বিয়ে...টিউশন জীবনের সমাপ্তি। একদিন অফিসফেরত লাল দিঘির ধারে বসে প্রথম মাইনের টাকা হাতে নিয়ে জলের ধারে চুপ করে বসে থেকে প্রশ্ন করেছিল তাপস, কাকে দেব? জলের মধ্যে টুপ টাপ শব্দ হয়ে উত্তর এসেছিল অপর্ণা, অপর্ণা—অনেক অনেক সাহস করে বলে ফেলতে চেয়েছিল সে, অপর্ণা আমি... অথচ তখন সে কত দূরে। তারপর?

তারপর আবার কি! জীবনের প্রয়োজনে সর্বাণী। তারপব বুম্বা সংসার। একটু একটু করে ভুলে থাকা আপ্রাণ চেষ্টা, খানিকটা কৃতকার্যতা—

কমে গেছে। কমে গেছে, বাবা বৃষ্টি কমে গেছে!

তাপস চমকে পিছনে তাকায়। বুম্বা চিৎকার করছে কমে গেছে, কমে গেছে, কমে গেছে—

তাপস আশ্চর্য হয়ে আকাশের দিকে মুখ ফিবিয়ে দেখে বৃষ্টি থেমেছে। কালো আকাশের ফাঁক দিয়ে রোদ উঠে করোগেটেড সিটগুলোকে আরও ঝকঝকে করে তুলছে। এতক্ষণ ওরা একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিল অপর্ণা, অপর্ণা।

বুম্বা দৌড়ে ঘরে ঢুকে মায়েব কাছ থেকে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে তাপসের জামা ধরে টানতে শুরু করেছে। তাপস হলুদবাড়িব চিলেকোঠাব উপবে জমে থাকা মেঘের টুকরোটা দেখছিল। ওখান থেকে এখুনি আবার বৃষ্টি নেমে আসুক। ভাসিয়ে দিক চরাচব। তাহলে তাকে আবার ছাদে যেতে হয় না। নতুন করে অকৃতকার্য হতে হয় না। আবার অপর্ণা হাসবে যে..

ছাদে জলে জলাকার। তাপস জলের সঙ্গে জ্বরের সম্পর্কটা ভাল করে বুম্বাকে বোঝাবার চেষ্টা করে হার মানল। ঘুড়ির যে অংশটা ছিঁড়ে গেছে সেখান থেকে হাওয়া পাস করে ঘুড়িকে উড়তে দেবে না, এমন একটা ভাল অজুহাত দেখিয়েও হেরে গেল। বুম্বার হাতে আর একটি নতুন ঘুড়ি। ঘুড়িতে সুতো বেঁধে অগত্যা আবার তাকে দাঁড়াতে হল ছাদেব কোণটায়। এবং সেই অপর্ণা। লাল শাড়ি। পাশে বসে তার স্বামী।

তাপস মাথা নিচু করে নতুন ঘুড়িটাকে অনেকটা নামিয়ে দিল নীচের দিকে। হাতের খোঁচায় ও ওড়াবার জন্য টান মারতে ঘুড়িটা গোয়ার্তুমির চূড়ান্ত করে নাজেহাল করতে শুরু করল তাপসকে। বুম্বা আবার লাটাই ধরেছে। উৎসাহে ছটফট করছে ও। বাবার এই না পারার লজ্জাকে বুঝতে পারছে না সে।

উল্টোদিকের হলুদবাড়ির দর্শকরা যেন নড়ে চড়ে বসল। তাপসেব যাবতীয় পরীক্ষা নেবার জন্য তৈরি তারা। লাজুক তাপস তাকাতে পারছে না ও দিকে।

সুতোয় খোঁচা মারতে মারতে তাপস আবিষ্কাব কবল যে সমস্ত প্রকৃতি তার সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করছে। মেঘ বৃষ্টি হাওয়া—উত্তরদিকে ঐ হলুদ বাড়িটার সামনেই ওকে দাঁড়াতে বাধ্য করছে। হাওয়া একটু ঘুরে গেলে ছাদের অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো যেত। এ ভাবে ওদের সামনে আসতে হত না। ফর ফর শব্দে একটু খানি ঘুড়িটা উড়তে বুম্বা চিৎকার কবে ওঠে, 'বাবা, উড়ছে, উড়ছে।' মুহূর্তের জন্য অন্যমন হয়ে যাওয়া তাপস অবাক হয়ে দেখল সত্যিই উল্টোদিক থেকে দমকা একটা হাওয়া ফর ফর করে উড়িয়ে

উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে ঘুড়িটাকে। তাপস আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। বরাবরের মাথা নিচু করা ব্যক্তিত্বটা যেন একলাফে ঘুড়িটার সঙ্গে উঠে যেতে থাকে উপরের আকাশে।

বুম্বা খিল্ খিল্ করে হাসছে। ওদিকে হলুদবাড়ির গ্রিল থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রী হাততালি দিচ্ছে জোর।

ঘুড়িটা বেশ উপরে উঠেছে। তাপসের হাত থেকে সুতো বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সোজাসুজি বেশ খানিকটা উঠে এবার ডানদিকে হেলে যাচ্ছে। নিজে নিজেই। তাপস জানে না, কী করা উচিত। সুতোয় জোরে টান মারে সে। ঘুড়ি আবার সোজা হল, আবার হেলে যাচ্ছে বাঁ দিকে। তাপস প্রাণপণে টান মারে সুতোয়। ঘুড়ি বাঁ দিকে নামছে। নামছে। বুম্বা চিৎকার করছে। বাবা নেমে যাচ্ছে। নেমে যাচ্ছে। তুলে দাও, তুলে দাও বাবা! তাপস পাগলের মতো সুতো টানে। অপদার্থ ঘুড়িটা এই যাবতীয় চেষ্টায় কোন ভ্রুক্ষেপ না করে ঝপ্ করে নেমে গেল। আর যাবি তো যা একেবারে হলুদবাড়ির চিলেকোঠায়। কার্নিসে আটকে থেকে যেন মজা করতে থাকে ঘুড়ি।

তাপস হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘুড়িটার দিকে। একটা সরলরেখা তৈরি করে সুতো স্থির হয়। বুম্বা ততক্ষণে আবাব ভ্যা শব্দে কান্না জুড়েছে।

তাপস আবার তাকায় হলুদবাড়ির দোতলায়। ওরা হো হো করে হাসছে। অপর্ণা দু হাতে মুখ চেপে বসে পড়েছে। চোখ নামিয়ে তাপস দাঁড়িয়ে থাকে। হাসো। হেসে যাও অপর্ণা। ঠাট্টা করে যাও—

সাদা-কালো আকাশের দিকে মুখ তুলে তাপস ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। সেখানে তখন মেঘেরা হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে চলেছে। আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, বাঃ বাঃ এই তো চাই। যখন আলো চেয়েছি তখন 'অন্ধকার এনে দিয়েছ, যখন মেঘ চাইলাম তখন... তোমার আর কি? আজ ঠিক এই দিনটিতে বৃষ্টি দিয়ে চরাচরকে একেবারে ভাসিয়ে দিতে পারলে না? একটি চল্লিশ ছুঁতে আসা অকৃতকার্য লোক বেঁচে যেত তাহলে—

আর উড়বে না ঘুড়ি? ও বাবা আর উড়বে না?

তাপস প্রবল ভাবে মাথা নাড়ে, 'না।'

কেন?

কোনও দিন ওড়াইনি তো। অভ্যেস নেই যে—

ওই তো উড়েছিল।

ভুল করেছিল, ভুল করে উড়েছিল, তাই...

বুম্বার কান্না ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে তাপসের যেন গলা আটকে আসে। ইচ্ছে করে সুতোটা ছিঁড়ে দৌড়ে নেমে যায় নীচে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাই করতেই হবে। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় সুতো হাতে করে। যাবার আগে শেষবারের মতো অকৃতজ্ঞ ঘুড়িটাকে দেখতে গিয়ে চমকে ওঠে তাপস। ও কি! এ কি দেখছে ও। চিলেকোঠার সরু লোহার সিঁড়িটা বেয়ে লাল শাড়ি অপর্ণা তরতর করে উঠে যাচ্ছে উপরে। শ্যাওলা ধরা লোহা। যে কোনও মুহূর্তে পিছলে পড়ে যেতে পারে ও। তাপস চিৎকার করে বারণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারে না। বরাবর সে লাজুক। নীচের

বারান্দায় গ্রিল ধরে তখনও যে অপর্ণার স্বামী দাঁড়িয়ে—

অপর্ণা উঠে গেছে। চিলেকোঠার মাথায় দাঁড়িয়ে দেখছে তাপসকে। তাপসের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে। চার পাঁচ ফুটের ছোট বর্গক্ষেত্রটি শ্যাওলায় একেবারে সবুজ। শাড়ি পরে ওখানে কেউ ওঠে। একটু এদিক ওদিক হলেই...

অপর্ণা কার্নিসের কোণ থেকে উবু হয়ে ঘুড়িটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে তাপস ভয়ে চোখ বুজে ফেলে। আবার চিৎকার করে বলতে যায়, নেমে এসো অপর্ণা।

হাতের সুতোয় টান পড়তে তাপস চোখ খোলে। ঘুড়ি অপর্ণার হাতে। দুই প্রান্ত ধরে ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলে ধরেছে অপর্ণা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে তাপস। অপর্ণা ইচ্ছে করে সময় নেয়। যেন প্রস্তুত হবার জন্য তাপসকে অদৃশ্য ইশারায় বার্তা পাঠায়। তা‍ৰপব হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উড়িয়ে দেয় ঘুড়িটা।

তাপস প্রাণপণে সুতো টানছে। হু হু করে উপরে উঠে যাচ্ছে ঘুড়ি। উঁচু আকাশে। যথেষ্ট হাওয়ার রাজ্যে পৌঁছে একেবারে সুস্থির হয়। বাধ্য ছেলের মতো দুলে দুলে উড়ছে ঘুড়ি। কখনও ডায়ে কখনও বাঁয়ে।

বুম্বা চিৎকার করছে, উড়ে গেছে। উড়ে গেছে। নীচে গ্রিল ধরে হাঁ করে ঘুড়িটাকে দেখছে অপর্ণার স্বামী।

তাপস একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে চিলেকোঠার ছাদে। সেখানে অপর্ণা দূরের আকাশের ঘুড়িটাকে দেখছে। লাল শাড়ির আঁচল উড়ে যাচ্ছে শরীর ছাড়িয়ে—

তাপস আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে অপর্ণাকে। কিছুই হারিয়ে যায়নি তাপসের। সব কিছুই সেই আকাশের মতো। সেই বর্ষাব থরোথরো মেঘ। সেই পাগল করা বৃষ্টি, সেই চিলেকোঠা আর তার অপর্ণা—

ঘুড়িটা পাগলের মতো সুতো টানছে তখন।

দীপার প্রেম

আশিষবরণ সামন্ত

আজ তাহলে আসি দিদিমণি—অবনত মস্তকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যায় অনুপম। থাক থাক প্রণাম করোনা, দুটি হাত ধরে বাধা দিয়ে বলে কাল একটু সকাল করেই এসো। মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে দীপা। আগে প্রতিদিন প্রণাম করতো অনুপম। কিন্তু, সেদিনের সন্ধ্যার পর থেকে দুজনেই কেমন যেন লাজুক লাজুক ভাব নিয়ে থাকে। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না।

ফিজিওলজিতে অনার্স পাশ করেই মাত্র একুশ বছর বয়সে মধুপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়েছে দীপা। এক বছরের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। গ্রাম্য স্কুল। শহরের যান্ত্রিক কোলাহল থেকে বেশ মুক্ত। ঐ গ্রামেই এক অপুত্রক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে দীপা একাই ভাড়া থাকে। অবিবাহিতা। তাই সংসারের কোন ঝামেলাই ভোগ করতে হয় না। সব সময়ই পড়াশুনা নিয়ে থাকে। অন্যান্য শিক্ষকদের মতো টিউশন করতে সে রাজী নয়। অনুপম কিন্তু তার কাছে ব্যতিক্রম। ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের একমাত্র ছেলে। একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে পড়লে কি হয় অত্যন্ত কচি বয়স। ওষ্ঠে তখনও শ্মশ্রুরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ছাত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখ্য না হলেও সৌম্য চেহারায় মুগ্ধ না হয়ে পারে না কেউই। দিদিমণি তাকে টিউশন পড়ায়। কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই, প্রায় প্রতিদিনই। ছাত্র হলে কি হবে, অনুপম যেন তার সেই হারিয়ে যাওয়া ধ্যানেব দেবতা। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারূপে যোগদানের প্রথম দিনেই তার মনে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো একটা সুপ্ত অব্যক্ত বেদনায় অগ্নুৎপাত ঘটালো।

বুধবার। স্কুলে প্রথম ক্লাস ছিল একাদশ শ্রেণীতে। হেডমাষ্টারমশাই নিজে এসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অফিসে গেলেন। প্রথম দিনেই ছাত্র-ছাত্রীদেব নামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। তাই দীপা এবার প্রত্যেকের নাম ও পরিচয় জানতে শুরু করলো। সহসা একটি সৌম্যকান্তি ছেলের দিকে তাকিয়েই যেন কিং-কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে তার নাম ও পরিচিতি দেওয়ার আগেই লক্ষ্য করে যে, দিদিমণি তার মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা যেন বিশ্বগ্রাস ক্ষুধায় গোগ্রাসে গিলতে আসছে। ছেলেটি বলে আমার নাম অনুপম মিত্র। অনুপম! বিস্ময়ে হতবাক দীপা। সেই গড়ন, সেই কচি কচি মুখ, কোঁকড়ানো চুল, কপালের ডান দিকে তিল। কিছুক্ষণ নীবব বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীপা। এই কি সেই? না না আমি শিক্ষিকা।

স্কুলের শিক্ষকতা করতে এসে অনুপমকে দেখে তাব পুরনোদিনের স্মৃতিগুলো একের পর এক মানসপটে ভিড় জমাতে শুরু করলো। অনুপম যেন তার কত পরিচিত। কপালের ডান দিকে সেই তিলটিই তার আশৈশবের সাথীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরিচয় জানতে চাইলে ছেলেটি বলে এই স্কুলেরই হেডমাষ্টারমশায়েব ছেলে। ক্লাশ শেষে কমনরুমের দিকে যায়। তাব প্রশান্ত মনে সহসা যেন টাইফুন ওঠে। ছুটিব পর বাসায় ফিরে শুধু ভাবতেই থাকে। বিধাতার একি খেলা! হারিয়ে যাওয়া সেই অনুশান্ত আর এই অনুপম....।

ছোটবেলা থেকেই অনুশান্তের সঙ্গে দীপার এক মধুর সম্পর্ক ছিল। ওরা একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। প্রতিবার ওদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান নিজেদের দখলেই রেখেছে। স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজে পড়াশুনার সময় ওদের সম্পর্ক আরো নিবিড়তর হলো। চলতে থাকে পরস্পরের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। ঐ মধুর সম্পর্কের আরও উন্নতি হোলো ওদের একসূত্রে গাঁথার জন্য অনুশান্তের বাবার এক প্রস্তাবে। অবশ্য এ প্রস্তাব কি জানি কৈশোরের কোন এক অশুভ লগ্নে এর অনেক আগেই দীপা অনুশান্তকে দিয়েছিল। সেই থেকেই ছিল ওদের পবিত্র সম্পর্ক।

কলেজের ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট আউটের আগে অবসর সময়টায় ওরা কয়েকদিনের জন্য দার্জিলিং বেড়িয়ে আসার প্রোগ্রাম করেছিল। অনাবিল আনন্দে পরস্পরের বাড়ির সম্মতি সাপেক্ষে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ দশদিন তারা অসীম আনন্দে অতিবাহিত করলো দার্জিলিং-এর স্বর্গীয় পরিবেশে। একে অপরের কত কাছে। তবুও তাদের পবিত্র চিত্তে এতটুকু কলঙ্ক রেখাপাত করেনি।

ফেরার পথে শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি করে বাড়ির দিকে যাচ্ছে—সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। রাতের অন্ধকার আসার আগেই দুজন যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পথ অবরোধ করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইল দীপাকে। অনুশান্ত প্রাণপণে বাধা দিতে গিয়ে বাধ্য হল দুর্বৃত্তদের হাতে চিরবিদায় নিতে। দীপা কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল ঠিকই কিন্তু, আশৈশবের সাথী অনুশান্তের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে সে যেন সেদিন থেকেই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল। অনুশান্ত বাড়িতে ফিরল না। ফিরল তার মৃতদেহ। দীপা কিন্তু, সেদিন থেকেই যে বের হয়েছে আজও সে মুখ দেখতে দেশে ফেরেনি।

অব্যক্ত বেদনায় জ্বলতে থাকে দীপা। বাঁচার তাগিদেই আজ সে এই স্কুলের শিক্ষিকা। তার অতৃপ্ত জীবন এখন যেন অনেক বেশী ক্ষুধাকাতর।

নিয়মিত স্কুলে আসে। ক্লাশে যায়। তার মন শুধু পড়ে থাকে ঐ একাদশ শ্রেণীতে। কি মিষ্টি ছেলেটি। হয়তো বা তার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, তবুও অনুপমের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সে যেন তার হারানো দিনের সুর খুঁজে পায়। তাকে বারবার পড়া জিজ্ঞাসা করে। বেশীরভাগ সময়ই যেন অনুপমকে দৃষ্টি জালে আবদ্ধ রাখতে চায়। সময়ে অসময়ে কথা বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বইপত্র এমনকি রাত্রি জেগে নোট পত্র তৈরী করে দিতে কার্পন্যবোধ করে না। অবশ্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরও কম স্নেহ করতো না। এই জন্যেই অল্প দিনের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে সে। ইতোমধ্যে অনুপমকে আরও কাছে পেতে সে ব্যাকুল। হেড মাষ্টারমশায়ের কাছে তাঁর ছেলের কম আগ্রহের কথা বলে। বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে তার অবনতি আশ্চর্যজনক। তিনি এর একটা সুব্যবস্থা করতে বললে, দীপা তার কাছে গিয়ে নিয়মিত পড়াশুনার কথা বলে। তাই পিতা ও শিক্ষিকার সুপারিশ ক্রমেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীপার বাসায় পড়তে আসে অনুপম। প্রাণ উজাড় করে ঢেলে দিতে চায় সে তার জ্ঞান ভাণ্ডার। পড়াশুনার অবসরে বন্ধুসুলভ কত কথা। মাঝে মঝে সবুজ রিফিল দিয়ে অনুপমের কপালে টিপ পরিয়ে দেয়। কখনো বা হাতে হাত রেখে তার ভাগ্য বিচার করতে চায়। কখনো বা লজেন্স-চকোলেট কিনে এনে অনুপমের মুখে দিয়ে দেয়। অনুপমও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হাসি দিয়ে তা সানন্দে গ্রহণ করে। কখনো রুমাল লুকিয়ে রাখে, কখনো বা কলমটা। একদিন এইভাবে তার রুমালটা লুকিয়ে রেখে পরের দিন তাতে নিজের নাম

লিখে ফেরত দেয়। কখনো আবাব অনুপমের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দেয়। পরক্ষণে আবার চিবুকে বাম হাত দিয়ে ধরে একেবারে বুকের কাছে মুখটিকে এনে নিজের হাতে যত্নে চুল আঁচড়ে দেয়। অনুপমেরও বেশ ভাল লাগে। সত্যিই দিদিমণি কত ভালো। শ্রদ্ধার দেওয়ালের অপর প্রান্তে অনুপম যেন প্রেমের অঙ্কুরোদগম অনুভব করে। এক সময় দীপা একটি ফোটো চেয়ে বসে। অনুপমও শ্রদ্ধাভরে তা এনে দিলে সে যত্নে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখে। কারণ, অনুপম ছাড়া সে আর বাঁচতেই পারে না। অথচ, বাধার পাহাড়। কিন্তু, ভালবাসা যেখানে ঝর্ণার গতি নেয় সেখানে কি নুড়ি পাথর তার পথ অবরোধে সক্ষম হয়। একদিন না এলে সে দিনটা যেন বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে দীপার। সন্ধ্যার নির্জনতায় অনুপমই যেন তার একমাত্র জীবন্ত সাথী।

পাকা দোতলার প্রশস্ত কক্ষ হলেও বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে মোমের আলোই কক্ষটিকে উজ্জ্বল করে রাখতো। সেই আলোর স্রোতে ওরা দুটি প্রাণী জীব বিজ্ঞানের নানান পাঠ নিয়ে আলোচনায় মশগুল থাকতো।

আচ্ছা দিদিমণি, আপনি তো টেস্টোস্টেরন সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা কবলেন এখন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ সম্বন্ধে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। অনুপমের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে দীপার তাৎক্ষণিক উত্তর—আরে এতো পুরনো পড়া। আজই তো স্কুলে আলোচনা হোলো। আগামীকাল কি পড়া আছে?

আগামীকাল নিষেক বা ফার্টিলাইজেসনের উপর ক্লাস আছে দিদিমণি।

ঠিক আছে। আগে পুরোনো পড়াটাই হয়ে যাক, তারপর আগামীকালেব পাঠ নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

দীপা অনেক যত্নে একের পর এক ছবি এঁকে আলোচনার গভীরে চলে যেতে থাকে।

সেদিন চৈত্র সন্ধ্যা। পাশাপাশি চেয়ারে বসে চলেছে ওদের আলোচনা। টেবিলে জ্বলছে অমলিন মোমের আলো। কালবৈশাখীর একঝলক বাতাস সহসা ঘরের মধ্যে ঢুকে সব তছনছ করে দিতে চাইলো। দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করার আগেই আলোটা কাজ সমাধা করতে বাধ্য হয়েছে।

দিয়াশালাইটা দিন, দিদিমণি, আলোটা জ্বেলে দিই-বলেই অনুপম অন্ধকারে হাত বাড়ালো। যাক, ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও—বলে হাত দুটো চেপে ধরল অনুপমের। ক্ষণিক অস্বস্তিবোধ করলেও ছাড়িয়ে নিতে পারলো না সে। ধীরে ধীরে অনেক অনেক কাছে টেনে নিতে চাইলো। অন্ধকার ঘরে যুবতীর বাহু বন্ধনে থেকে সদ্য যৌবন প্রাপ্ত অনুপমের শরীরে এক কল্পনাতীত শিহরণ জাগলো। তার দেহ যেন শিথিল হয়ে আসে। শেষে অনুপমের আলতারাঙা অধরে রক্তিম অধরপল্লব দুটি মিলিয়ে দেয় দীপা।

বাইরে ঝড়বৃষ্টি মেঘের গর্জন। ক্ষণপ্রভার আলোকে দীপাব ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তারপরই অবণত মুখে কি যেন বলতে গিয়ে পারল না সে। সহসা কালবোশেখীর রুদ্রনয়ন শান্ত হওয়ায় চাঁদের আলো জানালা দিয়ে ঘরে এল। দরজাটা খুলে—"দিদিমণি আসছি" বলে চলে গেল অনুপম।

সেদিন থেকেই অনুপমের মধ্যে একটা ভাবান্তর দেখা গেল। সে যেন একটু দূরে-দূরেই থাকতে চায়। পর পর তিনদিন তার অনুপস্থিতিতে দীপা যেন সবই শূন্য দেখতে থাকে। কোনরকমে কিছু বলার সুযোগ না পেয়ে বাড়ি ফেরাব পথে অপেক্ষা করতে লাগল দীপা। অনুপম কিন্তু অন্য পথেই চলে যায়। একবুক ব্যর্থতা, অভিমান আর ক্রোধ

নিয়ে ফিরে আসে বাসায়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় রাত্রিটা তার জাগরণেই শেষ হয়ে গেল।

অনুপমের কথা চিন্তা করতে করতে সেদিন দীপা তার বি. এড্. ট্রেনিং-এর ব্যাপারে হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেই ভুলে গেছে। পরদিন সকালে উঠেই সে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজরি হয়। দুটো কাজ একসঙ্গেই সমাধা হবে। অনুপম তখন তার বাবার কাছ থেকে ইংরেজির কয়েকটি পাঠ নিয়ে আলোচনা করছে। দিদিমণিকে আসতে দেখে অনুপম অপ্রতিভ হয়ে গেল। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে উঠতে যাবার সময় বলে—অনুপমের দিকে একটু নজর দিন স্যার। ও বেশ কয়েকদিন হল টিউশন পড়তেই যাচ্ছে না। কি বল অনুপম আজ যাবে তো? জিজ্ঞেস করে দীপা।– আমার পড়ার একটু চাপ ছিল কদিন। কেমিস্ট্রির সাপ্তাহিক পরীক্ষা চলছিল তাই—বলে অনুপম। আজ তাহলে নিশ্চয়ই যাচ্ছ? দীপার এই প্রশ্নের পর অনুপম কিছু বলার আগেই অনুপমের বাবা বেশ জোর গলায় বলেন, দিদিমণি পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী আর তুমিই যেতে চাইছ না? অনুপম অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। দীপা চলে যায়।

যেতে যেতে তার মনে ভাসে নানান প্রশ্নের জোয়ার। সে শিক্ষিকা। বৈধ অবৈধের প্রশ্ন জাগে। গীতার ভাষ্যধারা মনে পড়ে যায়। প্রেম নাকি চিরন্তন, চিরমধুর, শাশ্বত। নিষ্কাম প্রেমের কথা শরীরসাপেক্ষে প্রেম জন্মায় সেখানে নিষ্কাম প্রেমের কথা বলা মানে পৈশাচিক মনোবৃত্তির ভাবধারাকে বিড়াল তপস্বীর মতো মুখোশ পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। দীপা তার নিজের মনের প্রশ্নেই নিজে হারিয়ে যায়।

আর কদিন বা থাকবে! ক' মাস বাদেই তো পরীক্ষা। তারপর কলেজে পড়তে চলে যাবে। দিনগুলোর কথা কল্পনা করে চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে তার। না-না সমাজ যাই বলুক—ওকে ছাড়লে আমি বাঁচতে পারবো না। আমার কাছে চিরতরে ওকে রাখতেই হবে।

ছুটির দিন। বাসায় ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে নিয়ে বিছানায় শুয়ে "বিবর" উপন্যাসের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে কখন যেন তাকে বুকে চেপে ধরে স্বপ্নলোকে পাড়ি দিয়েছে দীপা।

আদালত কক্ষ। চারদিকে লোকে লোকারণ্য। অভিনব মামলার বিচার প্রত্যক্ষ করতে অজস্র দর্শনার্থীর ভীড়। বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে চলেছে। হঠাৎ জেগে দেখে সন্ধ্যা আগত প্রায়। আর অনুপম উপস্থিত।

উঠে বসে বিছানায়। হাত দুটি ধরে অনুপমকে পাশে বসিয়ে "বিবর" উপন্যাস খানি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাশ্রুনেত্রে উঠে যায় দরজার কাছে। তারপর ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অনুপম বুঝতেই পারে না যে কি হোলো।—"দিদিমণি-দিদিমণি"—ডাকা শেষ হতে না হতেই দীপা ভাঙা গলায় বলে ওঠে—"না-না-না—আমাকে ডেকো না, আমাকে ডেকো না।"—'বলুন দিদিমণি আমি কি অন্যায় করেছি? বলুন, আমার দোষ হয়ে থাকলে আমায় ক্ষমা করুন। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ অনুপমেরও যেন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আসে। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে দীপা উঠে বসে। তারপর মোমের আলো জ্বেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে অনুপমের কাছে বসে। তার হাতদুটো বুকে চেপে ধরে ভাঙা গলায় বলে—অনুপম, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তোমার মধ্যে। হঠাৎ তরুণীর কোমল বুকের স্পর্শে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায় অনুপমেব শিরায় শিরায়। সে কেমন যেন হয়ে যেতে থাকে। লজ্জা বিনম্র

শিহরিত চিত্তে বলে—"কেন দিদিমণি?" দীপার তাৎক্ষণিক জবাব "না—না, আমাকে দিদিমণি বলে ডেকো না। তোমার ঐ মুখে এ ডাক আমার ভাল লাগে না।'—'কেন দিদিমণি আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে, আমার দিদিমণি বলে ডাকাও নিষেধ?' দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে'—'না-না অনুপম তা না, বলছিলাম তুমি কদিন বাদেই আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যাবে। আমি তখন কি করে থাকবো বলতে পারো? অনুপম নিরুত্তর থাকে।—'আমি যে তোমায় অনুপম—আমি যে তোমায়'—উন্মাদিনীর মতো বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে আসে দীপার। "বলো বলো অনুপম তুমি কি—'। নির্নিমেষ নয়নে পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে—আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থেকেই ঘরের মেঝেতে পা ঘষতে থাকে অনুপম। মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিঃশব্দে পার হয়ে যায়। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। সহসা ধীরে ধীরে হাত দুটি সরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দীপা।

অনুপম বিছানায় বসে পড়ে। যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলো সে দিদিমণির মাঝে তার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে। ভাবতে ভাবতে নিজেকে হারিয়ে দেয় বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি রহস্যে। সহসা চমকে ওঠে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত্রি দশটা। ঘরের দবজাটা ঈষৎ বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করতেই ভুলে যায় সে। দুটি সন্ধ্যার ঘটনা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। বলতেও পারে না সে কাউকে। শুধু নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে চলে—"দিদিমণি কেন আমাকে এত স্নেহ করেন? আমার প্রতি দিদিমণির এত দুর্বলতা কেন? আমি ছাত্র, বয়সে ছোট, তবুও দিদিমণি কি আমাকে—না-না ভাবতেই পারে না সে।

দিন যায়, রাত আসে। রাতের পর দিন। অনুপম কেমন যেন উদাস উদাস। দিন দিন শরীরও যেন তার কৃশ থেকে কৃশতর হয়। টিউশন আর পড়তেই যেতে পারে না। স্কুলে যায় ফিরে আসে। তারপর বিছানায় মুখ গুঁজে ভাবে। বলতে পারে না সে কাউকে। শ্রদ্ধাবশতঃ প্রতিবাদও করতে পারে না দিদিমণির। মনটাও তার যেন ধীরে ধীরে দিদিমণির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ, এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে সে। সদ্য যৌবনের উষা লগনে যেন সূর্য সবেমাত্র পুব—গগনে উঁকি দিয়েছে তখনই তার সামনে লাবণ্যময়ী তরুণী শিক্ষিকার প্রেমের ফাঁদ। দিদিমণির চোখের ভাষা আজ সে বুঝতে পেরেছে। নিজের দুর্বলতা নিজেই অনুভব করছে। মনে তার যে আলোড়ন চলছে তাতে যে কোন সময়েই হয়তো একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

অনুপমের আর কোন রাতেই ঘুম আসে না। সারারাত তার জেগে জেগে কাটে। বিছানা থেকে উঠে বসে। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশেব দিকে তাকায়। কিছুতেই যেন শান্তি নেই। বারবার মনে ভাসতে থাকে দীপার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ের পর থেকে তার প্রতি অকারণ স্নেহের স্মৃতি। মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে ছাদে যায়। উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ মাথা ধরে আসে। একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না কিন্তু তারপরও। ভোরের দিকে বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে ঢাকা দেয়। বেশ শীত শীত বোধ হয় তার। দেহের উত্তাপও যেন তার অনেকটাই বেড়েছে। সকালে উঠতে পারলো না। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা বিড় বিড় করে কি যেন আজেবাজে কথা বলে বাবা সকালেই ডাক্তার ডেকে আনেন।

ওষুধ খেয়েও বেশ কয়েকদিন একইভাবে কাটে। জ্বর ভাল হলেও ক্ষীণ থেকে

ক্ষীণতর হয় তার শরীর। ভুল বকার মাত্রাটা এবার যেন বেড়ে যায়। বাবা বসে থাকেন বিছানার পাশে। মাথা টিপে দেন। সহসা অনুপম বলে ওঠে 'না-না দিদিমণি, আমি আব পড়তে আসব না। আমাব মাথাটিপে দেবেন না। এ কী করে সম্ভব দিদিমণি? লোকে শুনলে কী বলবে। আপনি শিক্ষিকা আমি ছাত্র। না-না দিদিমণি। এ হতে পারে না। বাবা জানতে পারলে আমায় মেরে ফেলবেন, আর আপনার চাকরীটাও যাবে দিদিমণি। এ হতে পারে না।

কথা শুনেই বাবা চমকে ওঠেন। একি বলছে? এই কথাগুলো কি জ্বরের খেয়ালে বলছে? এগুলো কি সব কাল্পনিক কথা? পরক্ষণেই আবার শোনেন—"দিদিমণি, চলুন—আমরা কোথাও চলে যাই। আমাদের যেন আর কেউ খোঁজ না পায়। আমরা দুজনে সেখানে থাকবো। আপনি পড়াবেন আর আমি পড়বো। হ্যাঁ, দিদিমণি পালিয়ে চলুন"। বাবা সাত পাঁচ ভাবতে থাকনে। হঠাৎ অনুপমের বিছানায় পড়ে থাকা একটা রুমাল দেখে তার মাথা যেন গুলিয়ে যায়। ভাবতেই পারেন না তিনি। তবে কি সত্যিই অনুপম মানসিক রোগগ্রস্ত হোলো? অথচ, আগেব চেয়ে ভুল বকার মাত্রাটা বেড়েই চলেছে। বাবা শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞকে ডাক দেন। যথা সময়ে তিনি আসেন। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর কথাগুলো টেপ করে নিয়ে পরের দিন রিপোর্ট দেবেন বলে চলে যান।

বাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতেই থাকেন। তিনিও কয়েকদিন স্কুলের ছুটি নিতে বাধ্য হন। ডাক্তারের রিপোর্ট হাতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যান তিনি। পড়ে দেখেন—কোন এক যুবতীর নিবিড় সান্নিধ্যে এসেই এই মনোবিকার। সামাজিক স্বীকৃতিতে ওদের মিলনই হবে এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। রিপোর্ট পড়ে বাবারই মনোবিকাব হওয়ার উপক্রম। কে তবে এই যুবতী? স্কুলের শিক্ষিকা দীপা দিদিমণি? কী করে সম্ভব। ভাবতেই পারেন না তিনি। একটু সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে সব কথা জানালেন তাঁর অধ্যাপক বন্ধু মনোজবাবুকে।

দীপার সঙ্গে তার আগে থেকেই তিনি বিশেষ পরিচিত। দীপাকে তিনিই শিক্ষিকারূপে নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। একমাত্র তাকে বাঁচানোর জন্যই সব কথা শুনে তাঁরা দুজনেই গেলেন ঐদিন সন্ধ্যায় দীপার বাসাতে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠেন। ওপরের বারান্দায় গিযেই শুনতে পান ঘর থেকে খালি গলায় ভেসে আসছে একটি গান—তোমারই পথ চেয়ে / জীবনের তরী বেয়ে / ধীরে ধীরে এসে হায় / আজ কি পেলাম / সব আশা একাকার / আমি কার কে আমার / পালহীন তরী লয়ে / কোথায় এলাম / কেউ বলে আমি ভুল করেছি / কেউ বলে না—না ভুল ধরেছি / আমি বলি আজ বুঝি অতলে গেলাম / পৃথিবীতে আমি আজ একাকী / বল মোরে পাব তব দেখা কি / নিরালায় নির্জনে / কেন যে এলাম।

গান শেষ হতে না হতেই দরজায় কড়া নাড়েন মনোজবাবু। তাড়াতাড়ি ঘর খুলে দীপা বলে ওঠে—কে অনুপম? এসো, এসো—এতদিন পরে এলে? ঘরে তখন মোমের আলো জ্বলছিল। ঘর থেকে মোটেই চেনা যাচ্ছিলনা যে বাইবে কারা। টেবিলে তখন অনুপমের বাঁধানো ছবি। তারই সামনে বসে দীপা গান গাইছিল। মনোজবাবু বলেন—কী দীপা তুমি চিনতে পারছ না? তোমার একি চেহারা হয়েছে। তোমাকেও যে চেনা যাচ্ছে না? দীপা তখন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যায়।—আসুন

আসুন—বসুন স্যার বলেই দুজনের দিকে দুটি চেয়ার এগিয়ে দেয়। ভিতরে গিয়ে বসে মনোজবাবু বলেন—এতক্ষণ গান শুনছিলাম। বেশ ভালোই লাগলো। আরে এটা কার ছবি? দীপা উত্তরই দিতে পারলোনা। বেমানান দুর্বলতায় নিজেকে যেন চোর বলে মনে হোলো। হেডমাষ্টারমশায় বলেন এটা অনুপমের ছবি। দীপার মুখের রক্তিমতা আরও বৃদ্ধি পায়। মনোজবাবু বলে ওঠেন—জানি দীপা, তোমার জীবনের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা আমি হেডমাষ্টারমশাইকে বলেছি। এখানকার ঘটনাও কি সত্যি? দীপা ডুকরে কেঁদে ওঠে। মনোজবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—"আরে এটা নূতন ঘটনা নয়। আমার জানা একটি কলেজে গতবছর ঠিক একই ঘটনা। দিদিমণি তার ছাত্রকে বিয়ে করে এখনও ঐ কলেজেই অধ্যাপনা করছেন। তাছাড়া তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার দায়িত্ব আমিই নেবো।" দীপার দুচোখ বেয়ে তখনও ঝরে চলেছে শ্রাবণের ধারা। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে হেডমাষ্টার মশায় নীচে নেমে গেলেন। তখন একান্তে দীপা জানায় অনুপমের প্রতি তার অনুরাগের কথা। শুধু তাই নয়, তাকে চিরতরে জীবন সঙ্গীরূপে কাছে পাবার বাসনাও ব্যক্ত করে। মনোজবাবু দ্বীপার বাসনা চরিতার্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নিজে একজন সমাজের উঁচুতলার বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি আদায়েরও প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতীক্ষা

শুভঙ্কর রায়চৌধুরী

এখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলেছে। একটু পরেই কলকাতার কোন এক বিবাহ ভবনে বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের ক্যাসেট বেজে উঠবে। লোকজনদের ভীড় বাড়বে। রজনীগন্ধা ফুলের সৌরভে, পারফিউমের মাদকতায়, সুন্দরীদের ছয়লাপে, আলোর রোশনাইতে জেগে উঠবে একটি আনন্দঘন মুহূর্তের রাত। লাল বেনারসী শাড়ীতে একটি কুমারী মেয়ের কচি মুখখানা আরও উজ্জ্বল দেখাবে।

বিয়ের রাত যে একটি কুমারী মেয়ের জীবনে কত মধুময় তা আজ বেশি করে অনুভব হচ্ছে প্রতিমার। বিশেষ করে অনিমেষকে কাছে না পেয়ে। পরশু রাতে আবার ফুলশয্যা। যে রাতটির জন্য সব কুমারী মেয়েদের মন কত শত কল্পনার জাল বোনে। সেই কল্পনার ফানুষ আজ এক লহমায় চুপসে গেল প্রতিমার জীবনে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। একটু পরেই চাঁদের আলোয় স্নান করবে ধান-ক্ষেত, বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট। তারপর বসন্তের দুরন্ত হাওয়ায় ঝরা-পাতার শব্দে বন ঝিঁঝির একটানা সুরেলা ডাক নির্জনতার বুকে আশ্রয় নেবে। ঘুমিয়ে পড়বে সমস্ত গ্রাম।

সময় রাত দশটা। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোয়নি শুধু প্রতিমা। নিদ্রা দেবী ওর দু-চোখের কোল থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। মশারির ভেতর থেকে মৃদু আলোকিত হ্যারিকেন বাতিটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমাগতঃ ভাবনার জগতে তলিয়ে যায়। আজ ওর বারবার মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা....ঝম্‌ঝম্ শব্দে যখন মালগাড়িটা ওদের বাড়ির কাছ দিয়ে চলে যেত, প্রতিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো গড়িটার দিকে। গাড়ির গার্ডবাবু ওকে ডান হাত তুলে টা-টা করতেন। যেদিন প্রথম গার্ডবাবু ওকে টা-টা করেন, সেদিন গাঁয়ের এই সহজ সরল মেয়েটি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কথাটা ভয়ে সে মা-দেউতা (বাবা) কাউকে বলে নি। শুধু সমবয়সী এক মাসীকে বলেছিল বিশ্বাস করে।

একদিন কি কারণে মালগাড়িটা ওদের বাড়ির কাছে থেমে যায়। গার্ডবাবু ট্রেন থেকে নেমে সোজা প্রতিমাদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। প্রতিমা যখন বুঝতে পারল গার্ডবাবু ক্রমাগতঃ ওদের বাড়ির দিকেই আসছেন, তখন ভয়ে ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। প্রতিমা ভেতরের ঘরে লুকিয়ে পড়ে। একটু বাদে গার্ডবাবু বাড়ির গেটের কাছে এসে বললেন ঃ "এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে?"

প্রতিমার দেউতা, মেয়েকে ডেকে বললেন ঃ "এই প্রতিমা, দেখ তো মা কে এসেছেন?"

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল ঃ "দেউতা তুমি ভেতরে যাও, আমি দেখছি।"

এরপর প্রতিমা যেন কোনদিনও গার্ডবাবুর মুখ দেখেন নি, এই রকম ভাব করে গেটের কাছে এসে বলল ঃ "আসুন না, ভেতরে আসুন।"

এই ভাবেই ওদের পরিচয়ের সূত্রপাত। এরপর প্রায় প্রতিদিনই ট্রেনটা ক্ষণিকের জন্য ওদের বাড়িব কাছে থেমে যেত। দু-জনের পত্র বিনিময় হোত। প্রতিমা যেদিন অনিমেষ চক্রবর্তী (গার্ডবাবু)-র কাছ থেকে প্রথম চিঠি পেল, সেদিন ওই চিঠিটা কতক্ষণ যে বুকে

জড়িয়ে রেখেছিল, খেয়াল নেই। ধীরে ধীরে ওরা ভালবাসার জাল বুনল একসূত্রে।

আজও প্রতিমার স্পষ্ট মনে আছে....শেষ চিঠিতে অনিমেষ বলেছিল—আগামী বৈশাখে আমাদের বিয়ে হবে। তোমার জন্য আমার পছন্দমত সোনার আংটি, কানের দুল, গলার হার গড়বো। আরও কত কি.....।

সেদিন কে জানতো অনিমেষ ওকে ফাঁকি দেবে। তাই তো সেদিন সে লজ্জায়, খুশীতে ছান্দনিক দোলায় বেনী দুটো দুলিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। খেয়ালী হাওয়ার মত রঙীন স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে ছুটে গিয়েছিল ওর সইয়ের কাছে। তারপর দুজনে প্রাণ ভরে সে কি হাসি! যেন খুশীর বাঁধ ভেঙেছে।

এরপর ছোট রেললাইন ভাঙা হোল। ঠিকাদার বাবুরা এলেন কাজ করতে। ছোট লাইনকে বড় লাইনে রূপান্তরিত করা হবে। লাইনের ধারে স্লিপার, পাথর....ইত্যাদি ফেলা হোল। দিনরাত কাজ শুরু হোল।

ইদানিং আর মালগাড়ি চলে না এদিকে। প্রতিমা প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকে অনিমেষের চিঠি আসবে। অনিমেষ ওকে কথা দিয়েছে বিয়ের পর ওরা হনিমুনে কলকাতায় যাবে। সেখানে হাওড়া ব্রীজ, কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, বেলুড় মঠ, গড়ের মাঠ, বিড়লা মিউজিয়াম, তারকামণ্ডল, চিড়িয়াখানা, নিকোপার্ক......কত কিছু দেখাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। স্বপ্ন কল্পনায় ভাসে গাঁয়ের সহজ সরল মেয়েটি।

এদিকে, গাঁয়ের লোকেরা কিন্তু অন-অসমীয়া ছেলের সাথে একটি অসমীয়া সুন্দরী মেয়ের প্রেম প্রীতি-ভালবাসা ও তারপর বিয়ে, এই ব্যাপারটি সুনজরে দেখে না। প্রতিমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এই বিয়ে নিয়ে শুরু হয় ঘোর আপত্তি। তবুও প্রতিমা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই ছেলেকে সে বিয়ে করবে। তারপর অনিমেষের হাত ধরে ওর ঘরে গিয়ে উঠবে। ওদের ছোট্ট সুখের সংসারে আসবে আনন্দের ঢেউ। প্রেমের জোয়ার। তাছাড়া, অনিমেষ বাঙালী বলে কি মানুষ নয়। ভাল-মন্দ পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যেই রয়েছে। গাঁয়ের কেউ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবেন, অসমীয়া মাত্রই সবাই ভাল। অসমীয়া পরিবারে বিয়ে হলে সে সুখী হতে পারবে। না, এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। সবচেয়ে বড় কথা ভালবাসায় কোন জাত নেই। অজস্র যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রতিমা ওর মা-দেউতাকে বলে, এই বিয়েতে রাজী হতে। প্রয়োজনে সে কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবে। প্রতিমার মুখে এতসব কথা শুনে হতবাক হয়ে যায় ওরা। এত কথা মেয়েটা জানল কোথা থেকে।

কিন্তু আজ থেকে প্রতিমা ওর মা-দেউতাকে কি জবাব দেবে। ওর চাপা দুঃখ-যন্ত্রণা, আক্ষেপ, অভিমান নিয়ে কার ওপর সে আছড়ে পড়বে। সে তো আর কলং নদী নয় যে বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে সমস্ত আক্ষেপ নিয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়ে পাড় ভাঙবে। আজ সে একা, বড্ড একা। এই নিঃঝুম নিশুতি রাতে ঘরভর্তি লোক থাকতেও সে এখন একান্ত নির্জন মনের বাসিন্দা।

সেই দুপুর থেকেই ওর হৃদয়াকাশে দুঃখের কাল মেঘ জমছিল। সময়ের সাথে সাথে মেঘের ঘনঘটা, বিষাদের কাল চাদর বিছিয়ে দিল ওর সর্বাঙ্গে। প্রতিমা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মাঝ রাতেই হাউ-হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

প্রতিমার মা জেগে উঠে বললেন : "কিরে মা, কাঁদছিস কেন? পেটে ব্যথা হচ্ছে? জল-তেল মালিশ করে দেবো?"

অভিমানী প্রতিমা ছোট্ট শিশুর মত মাকে জড়িয়ে ধবে অনেকক্ষণ কাঁদল। তাবপব

বালিশের নীচে রাখা চিঠিটা মায়ের হাতে তুলে দিল। মা বললেন ঃ "কার চিঠি? অনিমেষের?"

প্রতিমা চুপ করে রইল। মা বললেন ঃ "কখন এসেছে? দুপুরে?"

প্রতিমা মাথা নাড়ল। মা আবার বললেনঃ

"কোথায় বলিসনি তো?"

চোখের জল মুছে মেয়ে বলল ঃ" তুমি তখন পুকুর-ঘাটে ছিলে।"

"যাক গে, কি লিখেছে পড়তো?" মা বললেন।

এবার প্রতিমা মায়ের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে গিয়ে মরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। দুঃখে-রাগে অভিমানে বর্ষার পাহাড়ী নদীর মত আক্ষেপে মায়ের বুকে আছড়ে পড়ল। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও প্রতিমার কান্না শুনে জেগে উঠেছেন। সবার উৎকণ্ঠা, এই রাত-বিরেতে মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে কেন? ততক্ষণে, প্রতিমার সমবয়সী মাসী চিঠিটা ওর হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করল ঃ—

প্রিয় প্রতিমা,

আমায় ক্ষমা করো। আজ অনেকদিন হোল, তোমার সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি। মিটার গজ লাইন ভেঙে ব্রডগেজ (বড়লাইন) লাইন নির্মাণের সময় কর্তৃপক্ষ আসায় গুয়াহাটি বদলী করে দেয়। এরপর ওখান থেকে আমি ইস্টার্ণ রেলওয়েতে বদলি নিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসি।

তারপর সুবোধ বালকের মত মা-বাবা ও দিদিদের পছন্দ করা পাত্রীকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাই। আশ্চর্য্য! আমি একটি বারের জন্যেও মুখ খুলে বলতে পারলাম না যে সুদূর আসামে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসি। যার নাম প্রতিমা।

যাহোক, আগামী ২২শে ফাল্গুন আমার বিয়ে। তোমার আমন্ত্রণ রইল। এই চিঠি পড়ে তুমি হয়তো আমায় গালি দেবে। বলবে— "ধোঁকাবাজ, বেইমান, কাপুরুষ।" আমি তো অস্বীকার করছি না।

পরিশেষে বলছি, জীবনের এই সুদীর্ঘ চলার পথে জ্ঞানতঃ কাউকে আঘাত করেছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো তোমাকেই প্রথম। তাই, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে, তোমাকে ফাঁকি দেবার কোন বাসনাই আমার ছিল না। তবুও হঠাৎ করে কি যেন হয়ে গেল। লক্ষ্মীটি, আমায় ভুল বুঝো না। তুমি, অন্যত্র মা—দেউতার পছন্দ করা কোন সৎপাত্রকে বিয়ে করে সুখী হও। যদি, আমাদের ভালবাসা খাঁটি হয়ে থাকে, তবে আগামী জন্মে আমার প্রতীক্ষায় থেকো। আমি অবশ্যই ধবা দেবো। আর বিশেষ কি। খামের ওপব আমার ঠিকানা রইল। প্রয়োজনে চিঠির উত্তর দিও। শুভেচ্ছা রইল।

ইতি ঃ—

তোমার অনিমেষ

অগোছাল

বিনতা রায়চৌধুরী

সকাল থেকে এই নিয়ে দু রাউণ্ড হল। না, চা-পর্ব নয়, ওদের ঝগড়া পর্ব। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকালে উঠে অনি ওর অফিসের ফাইলের একটা জরুরি কাগজ খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই ওর মেজাজ চড়তে লাগল। রিনির হাতে তখনও চায়ের কাপ। অনি চেঁচিয়ে উঠল—'কোথায় রাখলে কাগজখানা?' যেন আকাশ থেকে পড়ল রিনি,—'আমি কেন রাখতে যাব? তোমার দরকারি কাগজ, দেখ তুমিই কোথায় রেখেছ।'

—'কাল রাতে আমি একবার চোখ বুলোচ্ছিলাম, আর সকালেই উধাও?'

—'বারে আমি কি জানি? টেবিলেই দেখ না।'

—'এটা কি টেবিল? না ডাস্টবিন? কি অবস্থা টেবিলটার। একটু গুছিয়ে রাখতে পার না?' রিনি দুটো ঢোক গিলল, টেবিলটার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। কিছুতেই গুছিয়ে রাখতে পারে না ও, দু-মিনিটেই যে-কে-সেই। তবু মৃদু প্রতিবাদের গলায় বলল রিনি—'দুজনের জিনিসই তো থাকে টেবিলে, তুমিও তো একটু গুছোতে পার। তা নয়, শুধু ঘেঁটে রাখবে।' অনির এমনিতেই মেজাজ চট্‌কে আছে, তার উপর আবার রিনির এরকম কথা, খুব চটে গেল। এক ধাক্কায় টেবিলের সব কাগজ-পত্র, বই, এমনকি পেপার ওয়েটটাও মাটিতে ফেলে দিল,—'কোথায় জিনিসটা একটু খুঁজবে, তা নয়, ফালতু বক্‌বক্ করছ।'

—'বেশ, থাকল অমন পড়ে', গজগজ করতে থাকল রিনি।

শেষ পর্যন্ত জিনিসটা উদ্ধার করল রিনিই। মুখে গজ্‌গজ্ করলেও দুজনেই হাত লাগিয়ে কাগজটা খুঁজছিল। হঠাৎ অনির বালিশের তলা থেকে টেনে বার করল রিনি,—'এই যে এটা কি?'

—'ওহো, থ্যাঙ্ক্ গড'।

—'গড? অ্যাঁ? আমি রেখেছিলাম, না তুমি? কাল রাতে পড়তে পড়তে বালিশের তলায় কে রেখেছিল?' রিনি তখন তুবড়ি।

অনি কাগজখানা ছোঁ মেরে নিয়ে বলল—

'এক্কেবারে ভুলে গেছিলাম, স'রি। শিগ্‌গির এককাপ চা।' অনির ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দেখে রিনিও হেসে ফেলল। দুজনেই দুজনকে চেনে। যেমন ভুলো মন, তেমনই অগোছাল। কিছু হারিয়ে গেলে দুজনেই দুজনের স্বভাব জানে।

বিয়ের পরে পরে পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিল একদিন অনি আর রিনি। হঠাৎ মাথায় চাপল দীঘা গেলে কেমন হয়, হনিমুন-টুন তো হয়নি ওদের। ব্যাস্ হয়ে গেল পুজোর বাজার করা। সেই এক বস্ত্রে পুজোবাজারের টাকা পুঁজি করে সোজা দীঘা।

—'ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে এসেছ তো?' অনি শুধু জিজ্ঞাসা করছিল।

—'হ্যাঁ, দিয়েছি। চাবি তো সঙ্গেই।'

—'ব্যস, ঠিক আছে।'

—কাউকে কিছু জানোনো হল না কিন্তু....।'

—'আরে, তাসাপাটি বাজিয়ে কেউ হনিমুন যায় নাকি?' খিলখিল করে হেসে বিনি অনিকে সমর্থন জানিয়েছিল। দু-চারটে নেহাৎ দরকারি জিনিস কিনে নিয়েছিল পথ থেকে।

এই হল অনিকেত এবং রঞ্জনা, ওরফে অনি ও রিনি।

ওদের ঠিক সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন মালাবৌদি। স্বভাবটা একেবারে উল্টো হলেও মালাবৌদি অনি ও রিনিকে খুব পছন্দ করেন। ছবির মত গোছানো সংসার মালাবৌদির। একমাত্র ছেলে দেরাদুনে থাকে, হোস্টেলে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব টিপ-টপ, শৌখিন। যেদিন প্রথম রিনিরা মালাবৌদির ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে গেছিল, সেদিন ফিরে এসে দুজনে একই সঙ্গে একটা কথাই বলেছিল—'কি অপূর্ব গোছানো ওদের ফ্ল্যাটটা না?'

—'আমরা পারি না ওরকম করতে?' রিনি ব্যথাহত গলায় বলল।

—'চেষ্টা করলেই পারি' অনির দ্বিধাহীন উত্তর, 'ওদের ফ্ল্যাট আর আমাদের ফ্ল্যাট তো একই রকমের। একই জায়গা। এমনকি ব্যালকনিটাও সমান মাপের।'

—'ঘরে ঢুকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঠিক যেখানে যেটা থাকা দরকার, ঠিক সেখানে সেটা। ফার্নিচারগুলো দেখলে, ঝক্‌ঝক্ করছে, যেন ঠিক কালই কিনে আনা।' প্রশংসায় উছলে পড়তে পড়তে বলল রিনি। অনির গলায়ও সহজ মুগ্ধতা—'যাই বল, অমন সাজানো গোছানো সুন্দর একটা ঘরে থাকলে মনও ভরে যায়। ওটেস্ট পেপার বাক্সটা দেখলে? একটা মিকি-মাউস। শোকেসগুলো এমন সুন্দর করে সাজানো, পুতুলগুলো যেন তাকিয়ে আছে।'

কথা বলতে বলতেই অনিকে হিটার জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপাতে দেখে রিনিও উঠে এল। চা-চিনি আর চায়ের কাপ গোছগাছ করতে করতে বলল—'এত ভাল লাগল, নাগো? এত সুন্দর করে সব কিছু গোছানো। রিনি যেন ভুলতেই পারছে না৷ অনি সোফায় বসে একটা দেশ পত্রিকা টেনে নিল র‍্যাক থেকে। ওর হ্যাঁচ্‌কা টানে আরও কয়েকখানা বই ঝুপ-ঝাপ করে পড়ে গেল মাটিতে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'চেষ্টা করলে আমরাও পারি।' গরমজলে চা পাতা ছেড়ে দিয়ে হিটার বন্ধ করে দিল রিনি, মিটসেফ থেকে কনডেন্সড্ মিল্কটা নিয়ে এল, অনির দিকে তাকিয়ে বলল—'আমি একা করলে তো হবে না, তোমাকেও আমার সঙ্গে সাহায্য করতে হবে। শুনলে না, মালবৌদি কি বললেন, ধীমানদা নাকি ওর চাইতেও এককাঠি বেশি গোছালো।'

—'তা হতে পারে রিনি, আমি অবিশ্বাস করছি না। অন্যমনস্কভাবে বাসের চিকিটটা ওদের মেঝেতে ফেলেছিলাম পকেট থেকে, ধিমানদা এমন সযত্নে সেটা তুলে বাস্কেটে ফেললেন, আমি তো লজ্জায় মরি।'

রিনি চা ছাঁকতে ছাঁকতে দুবার চা চলকে পড়ল টেবিলে। দুধ মিশিয়ে অনির দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে এক কাপ নিল, জিগ্যেস করল—'বিস্কুট নেবে?'—

'দাও' অন্যমনস্ক সুরে বলল অনি। রিনি ভিতর থেকে ঘুরে এসে বলল—'বিস্কুট নেই, ফুরিয়ে গেছে। চানাচুর খাও।'

তারপর চানাচুর খেতে খেতে দুজনে মিলে মালাবৌদি ও তাব গোছানো সংসারের তারিফ করল কিছুক্ষণ বসে বসে।

অনি হঠাৎ উঠে পড়ল, কিছু মনে পড়ে গেল যেন, বলল—'আমি চট্ করে ঘুরে আসছি একটু।' তারপর রিনি একা একা ওর অগোছাল সংসারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবতে বসল ঠিক কীভাবে এটাকে গুছিয়ে সুন্দর করে তোলা যায়। মালাবৌদির মত। ঠিক করল, কাল থেকেই শুরু করবে। সকাল আটটা থেকে কোমর বেঁধে লেগেছে রিনি ঘর পরিষ্কার করতে। প্রথম ঘরটার ঝুল ঝাড়তে হবে, তারপর পুরনো খবর কাগজের ডাই—তারপর ভাঙা পরিত্যক্ত বাজে জিনিস, তারপর..., হঠাৎ অনি বিছানা থেকে ডাকল।

—'এই রিনি, শোন এদিকে।'

—'কেন, আমি ব্যস্ত আছি।'

—'আরে শোনই না।'

—'বল', রিনি অগত্যা এগিয়ে এল।

—'দেখতো, এই কবিতাটা কেমন হয়েছে?'

—'কাল লিখলে?' সোৎসাহে রিনি হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল বিছানায়। তারপরই চেঁচিয়ে উঠল,—'এখন না অনি, পরে শুনব, ঘরের কাজে হাত দিয়েছি।'

—'রাখ তো, এক ঘণ্টায় তোমার ঘর পালিয়ে যাবে না, আর তুমি যা শুরু করেছো, একা শেষ করতে পারবে? আমিও তোমার সঙ্গে হাত লাগাব।' সঙ্গে সঙ্গে রিনি পা ছড়িয়ে বসে পড়ল,—'তাহলে পড়।'

খানিকক্ষণ কবিতা নিয়ে দুজনে মাতামাতি করে অনি বলল—'এই শেষটায় এসে একটা জুতসই লাইন পাচ্ছি না। লাইনটা দেড়খানা হবে, প্রথম লাইনের শেষে আব আধখানা লাইনে মিল দেব। বুঝলে?' কথা শেষ করে অনি উঠে বসল—'উঠি, অফিস যেতে হবে।

—'বারে, আমার ঘর গোছানোয় হাত লাগাবে না?'

—'এখন? সময় কই?'

—'তা বললে হবে না। অন্তত ঘরের ঝুলটা ঝেড়ে দাও, প্লিজ।'

ঝুলঝাড়া নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঘরের ঝুল তাড়াচ্ছিল অনি, আনাড়ির মত। রিনি থেবড়ে বসে পুরনো কাগজ বাছাই করছিল। অনি বলল—'এসব রবিবার করতে হয়।'

—'এঃ কাল কথা হল না, আজ থেকেই শুরু করতে হবে।'

—'তা তো হল' একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল অনি, হঠাৎ ঝুলঝাড়াটা বেমক্কা আলোর শেডের উপর পড়তেই শেডটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। প্রথমটায় খুব লজ্জা পেয়ে গেল অনি, তারপরই চেঁচিয়ে উঠল—'পেয়ে গেছি রিনি শেষ লাইনটা। ওঃ শেডটা না ভাঙলে মনেই আসত না।' ছুটে চলে গেল অনি টেবিলের কাছে। খুব রেগে উঠতে যাচ্ছিল রিনি, কবিতার উপর খাপ্পা হয়ে না, লাইটের শেডটা ভেঙে গেল বলে, কিন্তু

পবক্ষণেই থম্‌কে গেল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল কয়েকবার, তারপর চেঁচিয়ে উঠল—'এই রে, ভাত পুড়ে উঠেছে বোধহয়।' বলেই ছুটে গেল রান্নাঘরে।

দুদিন চলে গেল, ঘরের অবস্থা কিছুই বদলাতে পারেনি রিনি। কেউ-ই সময় দিতে পাবছে না। ইদানীং রিনির গানেব স্কুলে খুব চাপ পড়েছে। রোজই ভাবে কাল থেকে শুরু করবে। আগে যাওবা ছিল, মালাবৌদির ফ্ল্যাট্‌টা দেখে আসার পর থেকে একটা দারুণ হীনম্মন্যতায় ভুগছিল ও। স্বপ্ন দেখে, ঠিক অমন চক্‌চকে মেঝে। ঝকঝকে ফার্নিচার, নিখুঁত সাজানো ম্যাগাজিনের র‍্যাক। বিছানা-টিছানা সব....।

এর মধ্যে অনি একটা কাণ্ড করে বসল। রিনির সঙ্গে কথাবার্তা না বলেই মালাবৌদিকে চায়ের নেমন্তন্ন করে এল। রিনি ককিয়ে উঠল—'সে কি! ঘরের কি দশা, দুটো দিন পরে বলতে পারতে, একেবারে কালই?'

—'রিনি, আমরা দুজনে মিলে পারব না?' তা পারল বটে, দুজনে মিলে রবিবার সারা সকাল বহু চেষ্টা করে আধাআধি গুছিয়ে উঠল, অনি ক্লান্ত হয়ে বলল—'থাক্ রিনি, আর পারছি না।'

—'এখন যে তোমার পুরনো ফাইলের গাদা, আমার গানের খাতা-টাতা সব পড়ে বইল। মেঝেটাও পরিষ্কার করতে হবে। একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট দরকার।' রিনি নিরুপায় গলায় বলল।

—'এক কাজ কর, সব ঠেলেঠুলে খাটের নীচে, আলমারির পিছনে ঢুকিয়ে দাও। দরকার হলে চাদর-টাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

—'ওইভাবে গোঁজামিল? যদি দেখা যায়? কি ভাববে?' খুঁতখুঁত করতে করতে শেষ পর্যন্ত রিনি ওভাবেই কোনমতে ঘরখানার একটা মোটামুটি শ্রী ফিরিয়ে আনল। তারপর অনিকে বলল—'একটু ফুল হলে বেশ মানাতো। মালাবৌদির ঘরে কেমন সুন্দর ফুল সাজানো থাকে সবসময়।' অনি ফুলও আনল, রজনীগন্ধার স্টিক।

মালাবৌদি আর ধীমানদা বেশ খানিকক্ষণ থাকলেন ওদের ঘরে। চা-টা খাওয়া হয়ে গেল। একবার মালাবৌদি মেয়েলি আগ্রহে বললেন—'তোমার রান্নাঘর কোথায়?'

রান্নাঘর। রিনি ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল, ইস্ রান্নাঘরের যা অবস্থা! তাড়াতাড়ি যা মুখে এল বলল—'মালাবৌদি, রান্নাঘরের বাল্বটা না ফিউজ হয়ে গেছে।'—'ফিউজ হয়ে গেছে, থাক তাহলে।' রিনির মুখে অম্লান হাসি। যাক্ বাবা ম্যানেজ হয়েছে। বাঁচা গেছে। ওরা চলে যাওয়ার পর অনি আর রিনির কি হাসি। অনি হাসতে হাসতে বলল—'বিপদে বেশ বুদ্ধি খোলে তো তোমার, বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে! আমি কিন্তু আর একটু হলে বিষম খাচ্ছিলাম।' রিনি হাসছিল, 'যাই বল, ওদের কল্যাণে তবু ঘরটাকে একটু শ্রীযুক্ত দেখাচ্ছে।'

কিন্তু ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ার মত পরদিনই আবার যে-কে-সেই হয়ে গেল। আর পুরোপুরি পুরনো চেহারা ফিরে পেতে তিনদিনও লাগবে না। অনি-রিনি দুজনেই কাল গুছিয়ে ফেলব' করতে করতেই যেখানে সেখানে ম্যাগাজিন, অকেজো কাগজ, পুরনো দেশলাই, সিগারেটের খালি প্যাকেট ও অ্যাস্ট্রেতে ছাইয়ের পাহাড় জমতে থাকল। একদিন সন্ধেবেলা মুখটা দুঃখ দুঃখ করে রিনি বলল—'জান অনি, মালাবৌদির

খুব জ্বর, ডাক্তার ধরতে পারছে না, ঠিক কি হয়েছে।'—তাই নাকি?' অনি খারাপ লাগা গলায় বলল।

—'মালাবৌদির জন্য একজন আয়া এসেছে, সেই দেখাশোনা করছে, ধীমানদা প্রায় কাছে-পিঠেই যান না।'

—'বড়লোক মানুষ, আয়া-ফায়া রাখাটা কায়দার ব্যাপার।'

—'না গো, মালাবৌদি হেসে হেসে আমাকে বললেন, তোমার ধীমানদা অসুখ-টসুখের ধারে-কাছে থাকতে চান না। রোগী ব্যাপারটা ওর পছন্দ নয় একেবারে। তবে যত্নের কোন ত্রুটি নেই, ডাক্তার, ওষুধ, পথ্যের ব্যাপারে উপুড় হস্ত। জান অনি, মালাবৌদির মুখে হাসি থাকলেও চোখদুটো যেন চিক্‌চিক্ করছিল। ধীমানদা মালাবৌদির ঘরেও নেই, পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করছেন। ছোঁয়াচের ভয়!'—'নিজের বৌয়ের অসুখ! তাও ছোঁয়াচের ভয়? যাঃ।'

—'সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। 'রিনি জোর দিয়ে বলল। তারপর সুর নামিয়ে মৃদু গলায় বলল—'অনি, আমার যদি টাইফয়েড হয়, কিংবা চিকেন পক্স, কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু, তুমি আমার কাছে থাকবে?'

—'ছিঃ রিনি, ওরকম বলতে নেই। আমাকে যেন ওরকম পরিক্ষায় কখনও বসতে না হয়। তুমি সবসময় ভাল থেকো। যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে আমারই যেন অসুখ করে।'—'না, কখ্‌খনো না।' রিনির চোখে জল এসে গেল।

অনি ওর বুকে রিনির মাথাটা টেনে নিল। রিনির হঠাৎ মনে পড়ল, ইস্, স্টোভের উপর ডাল চাপানো আছে, বেশি জল নেই ডালে, হয়ত পুড়ে উঠতে পারে। তবুও অনি বুকে গাল চেপে রইল, পুড়ুক, একটু পোড়া ডাল খেলে কি হয়।

কিছুদিন হল অনি ওর কবিতার বই প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। রিনিরও গানের স্কুলের ফাংশন। দুজনের এতটুকুও ফুরসত নেই। যখনই একটু অবসর মেলে তখন দুজনেই দুজনের কাছে নিজেদের জগৎ খুলে বসে। অনি বলে—'রিনি, এবার আমার কবিতার বইটা বেরিয়ে যাবে। সম্পাদককে রাজি করিয়ে ফেলেছি। ভাবছি, বইটা তোমাকেই উৎসর্গ করব।' রিনিও খুশির গলায় বলল—'আমি তোমাকে বলেছিলাম না, তোমার কবিতার বই নিশ্চয়ই বেরোবে। কি এখন খুশি তো? তবে শোন, কবিতাগুলো সব দেবার আগে আর একটু খুঁটিয়ে পড়ে নিও। পরে যেন মন খুঁতখুঁত না করে।'—'ভাল কথা বলেছ রিনি', হাতের কাছে অ্যাসট্রে না থাকায় মাটিতেই সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল অনি—'দু-একটা কবিতা আমি কিছু কিছু বদলাবো ভাবছি।' একদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে রিনি বলল—'জান অনি, এবার স্কুলের ফাংশন দারুণ হবে। আমার উপর ওদের খুব ভরসা এখন। সবাই আমাকে খাতির করছে। তবে আমার আর একটু প্র্যাকটিস্ দরকার।' পরক্ষণেই উচ্ছ্বাস কমিয়ে লাজুক স্বরে বলল, 'ফিরতে দেরি হয়ে গেল বলে কিছু আর তেমন রাঁধতে পারিনি আজ। শুধু আলুভাতে ভাত আর ডিমসিদ্ধ, ঘি আছে অবশ্য, হবে?'

—'হবে না মানে? চমৎকার হবে। ওসব নিয়ে তুমি কিছু ভেব না। এখন বরং প্র্যাকটিসে একটু বেশি মন দাও। আর রান্নাঘরে স্রেফ খিচুড়ির ব্যবস্থা কর।'

সেদিন একটা দরকারে মালাবৌদির ঘরে গেছিল রিনি, ফিরে এসে বলল—'অনি, মালাবৌদির ঘরে গেলেই মন ভাল হয়ে যায়। ঘরে কি মিষ্টি গন্ধ। ফুলের গন্ধ, নাকি কোনো রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করেন মালাবৌদি জানি না। ওদের ঘরটা দেখলে মনে হয় না ধুলোবালি কিছু দুনিয়ায় আছে। মেঝেতে হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। তবে বড্ডবেশি চুপচাপ, ফাঁকাফাঁকা। ধীমানদা নাকি অফিসের কাজে বাইরে গেছেন, বৌদি একা একা বসে উল বুনছেন।'

—'ও, তুমি বুঝি বৌদিকে একা পেয়ে খুব হইহই করে এলে?'

—'না, না, একেবারেই না। ঘরে খুব নিচু সুরে একটা মিউজিক বাজছে। ওখানে গিয়ে বেশি জোরে কথাই বলা যায় না। একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব সারা ফ্ল্যাটটায়।'

—'ওরে বাবা', অনি হেসে ফেলল, 'এবার থেকে কবিতা লেখার সময় মালাবৌদির ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেব।'

কুঁচকানো-মুচকানো বিছানার চাদরটা হাত দিয়ে টেনে কোনমতে সমান করে, তার ওপর ঝপাং করে শুয়ে পড়ে পা দোলাতে দোলাতে রিনি বলল—'দাঁড়াও না আমার ঘরটাও অমন আমি গুছিয়ে ফেলব।'

—'কবে?' সকৌতুকে চোখ টিপল অনি। বিচিত্র মুখভঙ্গি করে জবাব দিল রিনি, 'আহা, নিজে যেন কত গোছাল!'

রিনির স্কুলের ফাংশন শেষ হয়ে গেছে। খুব ভাল ফাংশন হয়েছে। রিনি দারুণ খুশি। শত কাজের মধ্যেও অনিকে টেনে নিয়ে গেছে রিনি ফাংশনের দিন। অনিও রিনিকে বাহবা দিয়েছে। সবার প্রশংসায় রিনি আহ্লাদে আটখানা। সবসময় গুণগুণ করছে। অনির কবিতার বই এখনও বার হয়নি। কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। লেখাগুলো প্রেসেও চলে গেছে, শিগগিরই বার হবে। সকালের দিকে অনি খুব ব্যস্ত হয়ে কি খোঁজাখুঁজি করছিল। হঠাৎ অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'রিনি, আমি কি পাগল হয়ে যাব? আমার নতুন লেখা কবিতা তিনটে কোথায়?

—'আমি তো জানি না' খুব নিরীহ সুরে জবাব দিল রিনি।

—'না জেনে আমাকে উদ্ধার করেছো। কী জান? কী দেখ তুমি? সংসারের কোন দিকটায় তোমার চোখ পড়ে?'

অনির আক্রমণটা একপেশে, একটুও যথাযথ নয়। রিনি সত্যিই কবিতা তিনটে চোখেই দেখেনি, খোঁজ জানবে তো দূরের কথা। কিন্তু নিজের ভুলের দায়িত্বটা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা পরিতৃপ্তি আছে। অনির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই হল। নিজে কোথায় রেখেছে মনে করতে পারল না বলেই রিনির উপর রাগটা গিয়ে পড়ল। রিনি প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলেও, অনির উল্টো-পাল্টা কথায় খুব রেগে গেল। দু-চার কথায় তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। কারোরই খেয়াল নেই, কে কী বলছে।— 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত', অনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এটা একটা ঘর, না ঘোড়ার আস্তাবল? কি অবস্থা, ছিঃ ছিঃ। এখানে থেকে যে আমার অসুখ হয় না, সেটা ভগবানের দয়া।'

—'বেশি ছিঃ ছিঃ করো না, অতই যদি হয়, তাহলে একটা লোক রেখে পরিষ্কার করালেই পার।'

'সামনের ঘরে মালাবৌদিকে দেখ গিয়ে, ঘর তো না, যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। দেখেও তো শিখতে পার। সে তো নিজেই করে সব কিছু। আর লোক রেখে পরিষ্কার করাব কেন? তুমি যদি না থাকতে তাহলে একটা কথা ছিল।'

—'বেশ তো, দুদিন আমি অন্য কথাও যাই, ঘর গুছিয়ে নাও।'

—'আহা, ঘরের বৌ, তার কথার কি ছিরি। তা যাও না, যেখানে তোমার ইচ্ছে। সেবার বাপের বাড়ি গেলে সাতদিন থাকব বললে, তো দুদিন থেকেই চলে এলে কেন? চাবি হারিয়ে গেছে, এই মিথ্যে কথা বলে!'

রিনি এধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘটনাটা সত্যি। আসলে ও অনিকে ছেড়ে থাকতে পারেনি। তাই আলমারির চাবি হারিয়ে গেছে, এরকম একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে এসেছিল। আর অনি নিজে? এখন এরকম বলছে, তখন রিনি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলেনি? 'তুমি এসেছ আমি বেঁচেছি, মনে হচ্ছিল যেন একযুগ তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।' দু রাত ঘুমোয়নি অনি, খায়ওনি ভাল করে। ওর সেই চেহারা দেখে রিনি বলেছিল, 'আচ্ছা, আর যাব না।'

এখন সেই পুরনো কথা তুলে অনি যে এভাবে ওকে বলতে পারে ভাবতেও পারেনি রিনি। রাগে-অভিমানে পাগল হয়ে গেল ও। ইচ্ছে হল দুহাতে আঁচড়ে খাম্‌চে অনিকে রক্তাক্ত করে দেয়। অনি তখন হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুঁড়ে ফেলছে, লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে ঘরটা।

রিনি প্রবল আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল—'তোমার নিজের লজ্জা করে না, সেবার শিলিগুড়িতে তরুণ কবিদের কবি-সম্মেলন ছিল, তোমার পাবলিশার বন্ধু অত সাধাসাধি করল, গেলে না কেন? বৌ-এর আঁচল ধরে বসে থাকতে লজ্জা করল না?'

এ ঘটনাটাও সত্যি, সেবার শিলিগুড়ি যাবার খুব ইচ্ছে ছিল অনির। এমনকি ওখানে গেলে এর আগেই একটা কবিতার বই ছাপা হয়ে যেত। বইমেলায় হাতে হাতে বিক্রির জন্য পাতলা চটি বই, অন্য অনেকেই যেমন করেছিল। কিন্তু রিনিকে তিনদিন একা ছেড়ে যেতে হবে বলে মিথ্যে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল সঙ্গীদের অনি, যায়নি। রিনি নিজেও অনেকবার বলেছিল কিন্তু অনি যায়নি, যেতে পারেনি। রিনিকে রেখে যেতে হবে বলে কলকাতার বাইরে কোন প্রোগ্রামে যেতে চায় না অনি। সেই দুর্বলতায় এমন খোঁচা দিতে পারে রিনি, অনি স্বপ্নেও ভাবেনি। রাগ মানুষকে নির্দয় নিষ্ঠুর করে তোলে। দুজনেই দুজনকে যা খুশি বলে আক্রমণ করছিল, যার তূণে যা বাণ আছে, দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুঁড়ছিল, আঘাতের পরিমাণ পরিমাপের মত মানসিক অবস্থা ছিল না। তছনছ করা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনি বলল হিস্‌হিস্‌ করে—'যে মেয়ে নিজের ঘর এমন আস্তাকুঁড় বানিয়ে রেখে আবার ঝগড়া করে, তার মত নোংরা আর কেউ নেই। ধীমানদার ভাগ্য ভাল, তাই মালাবৌদির মত বউ পেয়েছে।' শেষ কথাটা ইচ্ছে করে বলল অনি, রিনিকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। রিনি যে সেটা না বুঝল তা নয়, তবু খোঁচাটা সহ্য করতে পারল না। বিষাক্ত স্বরে বলল—'তুমি একটা নীচ।' অনির চোখ জ্বলে উঠল

দপ্ করে, ওর হাতটা উপরে উঠল সপাটে রিনির গালে নেমে আসার জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে সামলে নিল নিজেকে। রিনির চোখমুখের নীরব ভাষা এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ওকে। রিনি বলল—'কী হল, থামলে কেন? মার।' তারপর চোখের উদগত অশ্রু গোপন করে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর কোনও কথা হয়নি সকালে। অনি না খেয়েই অফিস চলে গেল। রিনিও কোন খাদ্য স্পর্শ করল না। রান্নাঘরে সবই ঢাকা দেওয়া পড়ে রইল। গানের স্কুলেও গেল না রিনি। নিজেকে রিক্ত নিঃস্ব মনে হচ্ছে। কোনওদিন যে অনির সঙ্গে এরকম একটা বিশ্রী ঝগড়া হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে ছিল। একটা সুটকেসে কিছু শাড়ি-ব্লাউজ ভরে নিল রিনি, আর কি্ু দরকারি জিনিসপত্র। এরপর তো আর দুজনে একসঙ্গে থাকার কোনও মানেই হয় না। অনির মনের চেহারা তো প্রকাশই হয়ে পড়ল আজ। মনের মধ্যে কতটা ঘৃণা লুকিয়ে রেখেছে! যাক্ ভালই হয়েছে, প্রকাশ হয়ে গেছে সব। সংসার বড় বিচিত্র, কে যে ভাঙে আর কে যে গড়ে। এই মুহূর্তে কোথায় যাবে ভাবল রিনি। বাপের বাড়ি যাবে ভাবল রিনি। বাপের বাড়ি যাবে না, দাদা-বৌদিরা হাসাহাসি করবে। ট্রেনে করে সোজা বড়দির বাড়ি চলে গেলে কেমন হয়? কিংবা দক্ষিণেশ্বরে স্বপ্নার বাড়িও যাওয়া যেতে পারে, কলেজের বন্ধু স্বপ্না, খুব গলায় গলায় ভাব ছিল। কিংবা একেবারে অজানা কোথাও চলে গেলেও মন্দ হয় না, কোনও আশ্রম-টাশ্রম বা কোনো লেডিস্ হোস্টেলে। অনি সারাজীবনেও আর খুঁজে পাবে না, বেশ হবে, উচিত শাস্তি হবে।

তবে যেখানেই যাক রিনি, ও ঘরে আর একদিনও না। অনির কথাগুলো কানে বিঁধছে এখনও, আবার হাতও তুলেছিল। কী আছে আর এই সংসারে? মায়া-মমতা? সাবানেব ফেনার মত তার অস্তিত্ব।

এসব ভাবতে ভাবতেই বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল। যতবারই সুটকেস্ হাতে ঘব ছেড়ে বেরোতে গেল রিনি, ততবারই হাউ-হাউ করে কান্না এল। পারছে না রিনি, কিছুতেই পারছে না, এই অগোছাল ঘরটার উপর এত মায়া পড়ে গেছে, কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে পারছে না। ঘরের কোণে কোণে কত স্মৃতি, কত মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে তার পথ আগলাচ্ছে। এই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য আর কোথায় গিয়ে যে শান্তি পাবে সেকথা কিছুতেই মনে পড়ছে না। আর সবচেয়ে লজ্জার কথা, সারাজীবনের জন্য অনিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে মনে করতেই ওর দু চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। কিন্তু আজকের ঘটনার পর একসঙ্গে তো থাকাও যায় না আর! নিজেকে খুব অসহায় আর দুর্বল লাগছে রিনিব।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই ফিরল অনি। ধীর, সংকচিত। এসে ঘরের দরজায় তালাই দেখবে ভেবেছিল, রিনিকে আর দেখতে পাবে ভাবেনি। ঘরের লাইট নিভিয়ে শুয়েছিল রিনি। অনি সুইচ টিপে আলো জ্বালল। আছে, আছে রিনি! চলে যায়নি। ওদের এই অগোছাল সংসারটা এক ঝাপটায় ভেঙে যায়নি তাহলে। অনির বুকটা তোলপাড় করে উঠল। সারদিন ধরে যে অসহ্য একটা ভার বুকে নিয়ে ফিরেছে, সহসা তার থেকে যেন মুক্তি পেল।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে অনি। রিনির সঙ্গে অনেক কথা আছে, কিন্তু কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। একটা অদ্ভুত ভয় ওর পিঠের কাছে

শিরশির করছে, কথা বলতে গেলে যদি সকালের মত আবার ঝগড়া বেধে যায়।

রিনি সেই একই ভাবে শুয়ে আছে। আগেও তো কত বাগাবাগি হয়েছে কিন্তু এরকমভাবে কথা বলার শক্তি হারিয়ে দুজনে দুমুখো, নাঃ এরকম হয়নি। তবু আজ সকালে সে নিজেকে খুব জোব সামলে নিয়েছে। বিনির গায়ে হাত তুলতে গিয়েও...,ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল অনি। রিনি সেই তখন থেকে একইভাবে শুয়ে আছে কেন? কি কৃশ দেখাচ্ছে ওকে! প্রাণ আছে তো রিনির শরীরে। ধক্ করে হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল অনির। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—'রিনি, রিনি, বিনি।' ধড়মড় করে উঠে বসল রিনি।

—'আমাকে ক্ষমা কর', অনি সম্পূর্ণ পরাস্ত।

রিনি জ্বলে উঠল না, চেঁচিয়ে উঠল না। অনির হাত ছাড়িয়েও নিল না, একটা কথাও বলল না। রিনিকে খুব কাছে টেনে এনে অনি ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি রিনি। সত্যি বলছি, ওসব আমাব একটাও মনের কথা নয়।'

রিনির চোখ দিয়ে অনবরত জল পডছিল, তাও ভেঙে ভেঙে বলল,—'কাল যদি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি..., হযতো মালাবৌদিব মত ঘব সাজাতে কোনদিনই পাবব না আমি, তবু...' ঢোক গিলে বলল, 'তোমাব হারানো কবিতা তিনটে নিশ্চযই খুঁজে পাওয়া যাবে।' অনি রিনির চুলেব মধ্যে মুখ ডুবিয়ে প্রতিবাদেব সুরে একটানা বলে গেল—'না-না-না', কিন্তু কিছুতেই বলতে পাবল না আজই অফিসের ড্রয়াবে কবিতা তিনটে খুঁজে পেয়েছে অনি।

বেশ অনেক রাত হয়েছে। অনি-রিনিদের ঘরে তখন সকালের ঝলমলে রোদ্দুব। রিনি হাসতে হাসতে চোখ পাকিয়ে বলল—'জান, আমি কিন্তু চলে যাব ঠিক করেছিলাম। তোমার ঘর বাড়িতে তুমি একাই থাকতে।'

—'আমার ঘর বাড়ি? এতদিনে তুমি এই বুঝলে। শোন তাহলে—

চমনমে ইখ্‌তালাতে রচো বুঁ সে বাৎ বন্‌তি হ্যায়
হামই হাম হ্যায় তো কেয়া হাম হ্যায়
তুমহি তুম হো তো কেয়া তুম হো।'

—'মানে?'

—'মানে—বাগানে যে ফুল ফোটে রঙ আর সুরভির মিলনেই তার সার্থকতা, তেমনি আমাদের দুজনের মিলনেই আমাদের জীবনের পূর্ণতা। একা আমি তো অসম্পূর্ণ, একা তুমিও নেহাত মূল্যহীনা।' রিনির মুখেব হাসি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পডল, অনি প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল, অবশ্যই বেসুরে।

সেই সময় সামনের ফ্ল্যাটে মালাবৌদি দামি নাইটি পরে নীলাভ বাতি জ্বেলে স্বপ্নের ঘবে একা একা শুয়ে ছিলেন। ধীমান এখনও ফেরেনি, আচারিয়াব পার্টি বোধহয় এখনও শেষ হয়নি। তার নিজেরও পার্টিতে যাবর কথা ছিল, কিন্তু ওই মিস্ বাসুকে সহ্য করতে পারেন না মালা। তাছাড়া চঞ্চলের সঙ্গে সন্ধেবেলা দেখা কবাব কথা ছিল, সেটাও ধীমানকে জানানো যায় না। হঠাৎ অনির বেমক্কা সুরে গানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে

হেসে ফেললেন মালা। ওই পাগলা ছেলে-মেয়ে দুটোকে তাঁর বড় ভাল লাগে। একটু পরে বিছানা থেকে উঠে পায়ে স্লিপার গলিয়ে পায়চারি করতে থাকলেন। নাঃ ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না। দেরাদুন থেকে কমলকে আনিয়ে কিছুদিন কাছে রাখতে হবে। ধীমান অবশ্য আপত্তি করবে, তার এখন সিঁড়িতে ওঠার ধাপে পা, এইসময় ছেলে বাড়িতে থাকা মানেই বিশ্রী একরাশ কর্তব্যের জালে জড়িয়ে পড়া, সে মোটেই পছন্দ করবে না। চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘরখানায় হাঁফ ধরে এল মালাবৌদির।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনি আর রিনি গান গাইছিল। গানের তালে তালে দুজনে নাচছিল দুলে দুলে, হঠাৎ অনির পায়ের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে থাকা একটা কাপ ছিট্‌কে ঘরের ও প্রান্তে গড়িয়ে গেল, বাসি চা চল্‌কে পড়ে মেঝের খানিকটা জায়গা অপরিষ্কার হয়ে গেল। রিনি নিচু হয়ে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল, অনি টেনে তুলে ধরল ওকে—

'আজ নয়, কাল থেকে, দুজনে মিলে।' হেসে ফেলল দুজনেই।

ফ্রুটপাঞ্চ নয়

কঙ্কাবতী দত্ত

দরজাটা ভেজানোই ছিল, আলতো করে হাতের পাতা দিয়ে একটু ছুঁতে না ছুঁতেই খুলে গেলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দীয়া দেখতে পেলো, খাকি রঙের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা গোছানো, বিবেক স্নান করে তৈরি হয়ে আছে চলে যাবার জন্য। একটা এলানো চেয়ারে বসে নীরবে সিগারেটে টান দিচ্ছে, মুখে প্রগাঢ় বেদনা। তার মনে পড়ে গেলো, যখন থেকে তাদের দেখা হয়েছে, অর্থাৎ আগের দিন বিকেল থেকে, শুধু সিগারেট, জল আর লেবু চিনির সরবৎ ছাড়া আর কিছু খেতে দেখেনি বিবেককে। আগের দিন সন্ধ্যায় ঈষৎ বিরক্তি, কৌতুক, ধৈর্য, উপভোগ, সস্নেহ পিঠে চাপড়ানো ভাব, অহঙ্কার ইত্যাদি মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে প্রায় যেন কষ্ট করে যাকে সহ্য করছিলো, হঠাৎ একটা উষ্ণতার ঢেউ বুকের মধ্যে অনুভব করলো তার জন্য।

সে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলো। মেঘলা দিন। ঘরের অন্যপ্রান্তে বিশাল জানলাটা দিয়ে একটা ঘন সবুজ আকৃতি ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে।

হাওয়ায় এদিক ওদিক মাথা হেলাচ্ছে গাছগুলো। সেখান থেকে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। গাঢ় ছাই রঙা কার্পেট পাতা লম্বাটে ধরনের ঘর। এক পাশে খাট ও বেড-সাইড টেবিল। এখনও বিছানা তোলা হয়নি। শাদা চাদরটা কুঁচকোনো, বালিশ ডেবে আছে, একজনের শরীরের তাপ মাখা ডোরাকাটা লাল কম্বলটা এলোমেলো ভাবে ছুঁড়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এক পাশে। তিন আয়নার ঝকঝকে ড্রেসিং টেবিল, তার শাদা টুলের ওপর একটা স্যাঁতস্যাঁতে তোয়ালে পড়ে আছে। রুম সার্ভিসকে ডাকা হয়নি। যদিও হোটেলের কামরা, এখানে তাৎক্ষণিকতার উপাদান নেই। ওই খাটে কেউ শুয়েছিলো, সে যেন প্রতিদিনই ওখানে শোয়, এক সিলিং দেখে রোজই ওঠে আড়মোড়া ভেঙে, ওই হলো তোয়ালে, যা দিয়ে সে স্নান করে, রোজই কাজে বেরোবার আগে। ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দীয়া বিবেকের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি তো তোমার সঙ্গে অনেক অভদ্রতা করেছি, কিন্তু তুমি তো কিছু মনে করোনি। আরো একটা অভদ্রতা করবো, যা কেউ করে না?"

"কি দিওতিমা?"

"একটা ইমপ্রপার প্রশ্ন—"

"বলো"

"এই যে, তুমি একদিনের জন্য কলকাতা এলে, তোমার কত টাকা খরচ হলো?"

বিবেক একটু হাসলো। প্রায় ভুতুড়ে বিষাদ ছিলো সেই হাসিতে। "তোমার কেন আমাকে ভালো লাগে না, দিওতিমা?"

সকাল পৌনে ন'টা। শহর এখন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে শুরু করেছে। গাড়ির হর্ন, ব্রেকের শব্দ, মানুষের কোলাহল আবছা ভাবে ভেসে আসছে কাচের ওপিঠ থেকে। অন্যান্য দিন এই সময়ে দিওতিমা কাজে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়। তৈরি হয় ওই সব মানুষদের মধ্যে মিশে যাওয়ার জন্য। মাত্র সাড়ে তিন মাস আগে আরো একজনের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করেছে সে, আর তারও কয়েক মাস আগে চলে এসেছে স্বামীর

ভালবাসা, সাহায্য স্থিতি জড়ানো আশ্রয় থেকে।

দীয়া চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খানিকটা অভ্যেসবশত, খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার দরুন আর খানিকটা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে এগিয়ে এসে তোয়ালেটা তুলে, ভাঁজ করে, ঝুলিয়ে দিলো বাথরুমের রডে। বিছানায় চাদর টেনে দিতে লাগলো। তার বাসন্তী রঙের শাড়িপড়া সুন্দর শরীরের ভঙ্গি, আঁকবাঁকগুলোর বিচ্ছুরণেই যেন ঘরের গৃহসজ্জা সম্পূর্ণ হলো। খাট, চেয়ার, ঘরের বিভিন্ন আসবাবগুলো যেন এতক্ষণ ছিলো শূন্যতায় ভাসমান, খাপছাড়া কতকগুলো আকৃতি, এবার সেগুলো সকালবেলার নিজস্ব মেজাজের সুতো দিয়ে গাঁথা হয়ে গেলো।

"কেন, দীয়া?"

"কেন, কী?"

"কেন আমাকে ভালো লাগে না?"

দিওতিমা মনে মনে বিরক্তির সঙ্গে ভাবলো "উফ্ কি মুশকিল", এক ধরনের তেতো, নার্ভাস ভালোলাগা নিয়ে সে বললো, "ওরকম ভাবে বলো না, আমার ভালো না লাগলে আমি কি আসতাম, এখানে?"

জল বা কুয়াশার মতো একটা পর্দা ছড়িয়ে পড়লো ঘরে। আত্মবিশ্বাসপূর্ণ, উদ্ধত ভঙ্গিতে বিবেক সেন্টার টেবিলের ওপর পা দুটো সোজা মেলে দিলো। নিজের সাতাশ বছরের জীবনটা নিয়ে কেমন অনিশ্চিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় লাগছিলো তার। তার এই যৌবন, এই এত সুন্দর পুরুষালী চেহারা, আর্থিক সচ্ছলতা, খ্যাতি, এসব দিয়ে দীয়াকে জয় করবে, এমন ভাবার মতো স্থূল সে নয়। তবু তার একটাই কথা মনে হচ্ছে। সে তো ছলনা করেনি। নিজেকে জাহির করেনি। বুদ্ধি-চিকচিকে কথা, বিদ্রূপ, এসব অস্ত্রও তো তার কাছে ছিলো।...আর দিওতিমা তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো, এই হলো পুরুষের ফাঁপা অহঙ্কার। নিজের কাছে পুরুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা।

অসহায় বলে কেউ যদি না থাকে, তাহলে তার উদার সাহায্যের হাত সে বাড়াবে কার দিকে? যেহেতু এই মুহূর্তে আপাতভাবে আমি নিঃস্ব, কোনো ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী নই, এক্ষুনি আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছো তুমি। আমার পায়ের কাছে নিজেকে ফেলতে অহংবোধে লাগছে না, বরং আরোই অলঙ্কৃত হচ্ছে তোমার পৌরুষ।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ানো দীয়া। ছাই রঙা আকাশের নিচে হোটেলের সুইমিং পুলের নীল গোলার্ধটা দেখা যাচ্ছে। এই একই পুলের ধারে কয়েকবার দীয়া তার স্বামীর সঙ্গে বসে সন্ধ্যা কাটিয়েছে। সিল্কের শাড়ি পরে পা ভাঁজ করে বসে আইসক্রিম আর ফ্রুটপাঞ্চ খেয়েছে। অন্য কারুর সঙ্গে কোথাও যাবার দরকারও ছিলো না, প্রশ্নও ছিলো না। যে জীবন সে ফেলে এসেছে, যথেষ্ট আয়েস ছিলো, সচ্ছলতা ছিলো তাতে। তবু কেন, বিচ্ছেদের প্রাথমিক বেদনা কাটিয়ে ওঠার পর একটা নির্ভার হাল্কা ভাব তাকে পেয়ে বসেছে? যেন সে একটা ভারি শেকড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিলো, শুধু শারীরিকভাবে নয়, এমনকি মনে মনেও নড়তে পারতো না, ডাক্তারের নাড়ি কাটার মতো কেউ কুচ করে কাঁচি দিয়ে সে ভার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

"দীয়া"...বলে বিবেক একটু থামলো। চেয়ারটা একটু টেনে সামনের দিকে ঝুঁকে বললো, "দীয়া, আমি বার বার কলকাতা আসবো তোমার জন্য, আমি বাংলা শিখবো—" বলতে বলতে একবার থামলো। বললো, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে

তো? আমাকে একবার আসতে দাও, সামনের মাসে, একবার—"

দিওতিমা বিবেকের চোখের দিকে তাকালো। যৌবনের আলোয় প্রায় জ্বরো রুগীর মতো চিকচিক করছে গাঢ় বাদামী সুন্দর চোখ দুটো। যৌবন বড়ো দুর্দান্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিপজ্জনক। মুক্তির জিনিস, বাঁধনে একে মানায় না। দিওতিমার এই মুহূর্তের ফুরফুরে জীবনে তার দায়িত্ব সে নিতে চাইবে কি? পারবে কি? বোধ হয় না।

বিবেকের গলা তার কানে এলো, "আমায় তুমি বলো—দিওতিমা, উপভোগ জিনিসটাকে তুমি এতো ভয় পাও কেন? সুখ কি তুমি চাও না?"

থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে তার কথা শোনার ভঙ্গিতে বসে রইলো দীয়া। সে কি সেইরকম সুখ যা সে পেত তার স্বামীর ঘরে, দিবানিদ্রার আমেজের পর অরেঞ্জ পিকো চায়ে?

না সেই সুখ যা পেতো ছেলেবেলায়, যখন লক্ষ্মী হওয়ার প্রাইজ হিসেবে মায়ের কাছে পুতুল উপহার পেতো, বা কৈশোর, যখন বেনামী প্রেমপত্রে প্রথম পড়লো নিজের রূপের স্তুতি। থুতনিটা সামান্য তুলে সে জানালার দিকে তাকালো। হোটেলের সুইমিং পুল ও লনের সবুজ গালিচা ছাড়িয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে অফিসপাড়ার উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর গম্বুজ। ওইখানে অলিতে গলিতে ধুলো আর রোদ মাথায় করে তাকে নানান অফিসে ঘুরতে হয়। একেকটা দিন, একেকটা যুদ্ধজয়। ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন বা গৃহসজ্জার ব্যবসা তাদের, অর্ডার অনুযায়ী হোটেল, অফিস, বিত্তবানদের বাড়ি সাজিয়ে দেওয়ার কাজ।

দরজায় কে টকটক করে টোকা দেওয়ায় দীয়া থুতনি থেকে হাত সরিয়ে ঘাড় ঘোরালো। তার ওই সচকিত ভঙ্গিতে রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য দেখতে পেলো বিবেক, দাঁতে দাঁত চাপা বীভৎস রাগে তার সেই সৌন্দর্য ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হলো। দিওতিমার বুকের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে চুল, গায়ের রং ফর্সা নয় তামাটে, কিন্তু কোথায় যেন একটা লালচে আভা আছে তাতে। চোখের লম্বা লম্বা পলকের নিচে অদ্ভুত সারল্য মাখা দৃষ্টি, তার দাম্পত্য অভিজ্ঞতার জটিলতা যাতে বিন্দুমাত্র ছাপ রেখে যায়নি। বিবেক মনে মনে একটা বিশ্রী গালাগাল দিলো। দিওতিমার উদ্দেশে। একটা তীব্র, তেতো আকর্ষণ ক্রমশ তার সচেতনতা ছেয়ে দিচ্ছিলো। ভাগ্যক্রমে দরজায় আবার টোকা, এবার জোরে।

বিবেক উঠে গিয়ে রুক্ষভাবে বললো, "কাম ইন্..."।

বেয়ারা এসে জানিয়ে দিলো, "বিল রেডি হ্যায় সাব।"

বিবেক অন্যমনস্কভাবে এ পকেট ও পকেট চাপড়ে কি যেন খুঁজলো।

চলে যেতে হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ সে কলকাতার রাস্তায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বম্বেতে নিজের বাড়ির বাথরুমে ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করছে। ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে, ঈষৎ অন্যমনস্ক, অবিন্যস্ত চেহারা নিয়ে দীয়ার পাশে পাশে লিফ্ট দিয়ে নেমে হোটেলের কার্পেট মোড়া রঙ-ঝলমলে লাউঞ্জে পা দিলো। তারপর ক্যাশকাউন্টারে এগিয়ে দিলো একগুচ্ছ ট্রাভেলার্স চেক। তার মানিব্যাগ থেকে উঁকি দিচ্ছে দিওতিমার অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় সই করা পোস্টকার্ড, যা বিবেকের তিনখানা চিঠি ও দুটি টেলিগ্রামের উত্তরে দিওতিমা লিখেছিলো। দাগ ধরা, কুঁচকোনো কাগজের ফালিটা যত্ন করে ভাঁজ করে রেখেছে বিবেক, মানিব্যাগ থেকে টেনে বার করে তাকে দেখালো।

দীয়ার মনে পড়ে গেলো সুদৃশ্য খামে নিপুনভাবে ভাঁজ করা সেই চিঠিগুলো, যা একজনের স্ত্রী হিসেবে তাকে বিভিন্ন আত্মীয় ও বন্ধু স্থানীয়দের পাঠাতে হতো বিজয়ার সময়। "প্রীতি ও শুভেচ্ছা" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আজ সে পারে যেমন তেমন হাতের লেখায়, খোলা পোস্টকার্ডে যাকে ইচ্ছে লিখতে, প্রকাশ্যে। এটা ভাবতেই বুদ্বুদের মতো কি যেন উপচে পড়তে লাগলো তার মধ্যে। দীয়া হাসতে লাগলো। "তুমি কতো সুন্দর কাগজে, ম্যাচিং খামে চিঠি পাঠালে, আর আমি কোথা থেকে একটা বিশ্রী পোস্টকার্ডে..."

বিবেক সলজ্জভাবে হাসলো। বললো, "হ্যাঁ, কাগজ, আর খামটা যে খুব সুন্দর, এটুকু স্বীকার করছি। প্যারিসে একটা ছোটো দোকান থেকে কিনি।" তারপর একটু দুঃখিত ভাবে জুড়ে দিলো, "আমার মধ্যে আর কিছুই তো তেমন চোখে পড়ার মতো না, ওই কাগজটাই যা একটু সুন্দর..."

দীয়া ধমকের সুরে বললো, "অ্যাই, আবার প্রশংসা চাওয়ার ছল করা হচ্ছে। তোমার পেছনে মেয়েরা খুব ছোটে, আমি সব খবর পেয়েছি!"

"না, না, সত্যি।" বলতে বলতে ঠোঁটের কোণে একটা লাজুক হাসি নিয়ে কাউন্টার থেকে টাকাগুলো নেবে বলে ওয়ালেটটা খুললো। মরোক্কো চামড়ার বিলিতি মানিব্যাগের ফ্ল্যাপের ফাঁকে আরো কি একটা বঙ ঝলমলে জিনিস দেখা যাচ্ছে। দিওতিমা স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহলের সঙ্গে বললো, "ওটা কি, দেখাও!"

বিবেক কৌতুকমিশ্রিত স্নেহের দৃষ্টিতে আড় চোখে একবার দেখলো তাকে। জীবনের এতোগুলো জটিল, অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দিওতিমা কি করে তার সারল্য বজায় রেখেছে কে জানে। তার বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয়, যে দীয়া একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, যে কোনো এক সময়ে বিবাহিত জীবন কাটিয়ে এসেছে। জীবনের অতি তুচ্ছ, ছোটো খাটো ব্যাপারগুলো থেকে বালিকার মতো আনন্দ আহরণ করতে পারে সে। আবার কোনো কোনো ব্যাপারে কি দারুণ অনুভূতিপ্রবণ, বুদ্ধিমতী, পরিপূর্ণ নারী। বিবেক যতোটুকু তাকে চিনেছে, তাতে জানে, ওই রঙিন কাগজের ফালিটা দেখার জন্য এই মুহূর্তে প্রাণ আঁকপাঁক করছে দিওতিমার। সম্ভবত, ওইটা দেখার বিনিময়ে সে তার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে পারে।

সে দীয়াকে খ্যাপাবার জন্যই বললো, "ওটা, আবার দেখে কি করবে?"

"দেখাবে না।" দিওতিমার গলায় ভাগ্যকে মেনে নেওয়া নৈরাশ্যের সুর। চোখের সিরিয়াস, দুঃখিত ভাবটা দেখে বিবেক হেসে ফেললো।

"এই দ্যাখো—এগুলো হলো ডাকটিকিট, মাতিসের ছবি দেওয়া..."

দীয়া মনোযোগের ভঙ্গিতে ভুরুদুটো কুঁচকে স্ট্যাম্পগুলো দেখতে লাগলো।

"তোমার ভালো লাগছে?" জিজ্ঞেস করলো বিবেক।

"না, খুব একটা না. "

"আমারও না..."

দীয়া স্ট্যাম্পগুলো তার হাতে ফেরত দিয়ে বললো, "তবে আমার ওই পোস্টকার্ডের চেয়ে অবশ্যই এস্‌থেটিক-—"

"উ?" বিবেক হাত বাড়িয়ে কাউন্টার থেকে টাকা নিয়ে নতুন নীলচে নোটগুলো মানিব্যাগে ভরলো। সে দিকে চোখ পড়ে যেতে দিওতিমার মনে পড়ে গেলো, জীবনে এই প্রথম তার ব্যাগে মাত্র সাড়ে চারটে টাকা পড়ে আছে। কোর্টনি কোম্পানী থেকে

একটা বেয়ারার্স চেক পাওয়ার কথা আছে অবশ্য। সেটা ভাঙালে তবেই ট্যাক্সি ভাড়া। এসব কথা মনে হতে কেন কে জানে ফিরে এলো সেই বুদবুদের মতো হাল্কা অনুভূতি। আসলে, সে সেই সব মানুষদের একজন, যারা নিঃস্ব থাকাটা উপভোগ করে, লক্ষ টাকা থাকলেও ফুটো পকেটে ঘুরতে ভালবাসে হয়তো কোনোভাবে এতই ধনী, নিঃস্ব থাকার বিলাসিতা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে।

ওয়ালেটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বিবেক বললো, "চলো..."

দীয়া বললো, "প্লেনে তুমি কি বই পড়বে? চলো কিনি, না কিছু লিখবে?"

বিবেক কাউন্টার থেকে কনুই সরিয়ে একটু চুপ করে থেকে বললো, "তোমার কি মনে হয়? আমি কি কিছু পড়া বা লেখার মতো অবস্থায় থাকবো?" বিবেক ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলো। পরস্পরের সান্নিধ্যে একটা অদ্ভুত উষ্ণতা অনুভব করছিলো তারা।

এক ধরনের গভীর আত্মীয়তার টান, বন্ধুতা। ভেজা ভেজা হাওয়া দিচ্ছে। কালচে হয়ে এসেছে আকাশ। বৃষ্টি নামি নামি করছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে, ঝোড়ো বাতাসে হাঁটতে লাগলো। আগের দিন সন্ধ্যায়, রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় তার পিঠে আলতো করে হাত রাখার জন্য দিওতিমা বিরক্ত হয়েছিলো বিবেকের ওপর; কিন্তু আজ, তার বেদনার্দ্র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সে সহজেই তার হাত ধরে হাঁটতে পারে রাস্তায়, আর ঠিক এই সময় যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বিবেকের অবাস্তব প্রশ্ন তার কানে এলো, "তুমি ভারতীয়, না?"

দীয়া হাসলো। "হঠাৎ একথা?"

"ভারতীয় মেয়েরা অনেক যুগ ধরে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে। অনেক জায়গায় তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিলো—ধরো খাসী বা সাঁওতাল মেয়েরা।"

"আমি সাঁওতাল! একি! আদিবাসী!" হাসতে হাসতে বললো দীয়া। "একদম এসব ট্যাক্টলেস কথা বলবে না। কোথায় প্রিন্সেস্ টিন্সেস্ বলবে।" বিবেকও হাসলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, "নিজেকে ভারতীয় ভাবতে ভালো লাগে না, তোমার?"

"তোমার লাগে না?"

বিবেক চোখ কুঁচকালো। একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, "হ্যাঁ, লাগে। যখন আমি ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াই, যখন আমি দেখি জমি, মাটি, নিছক জমি মাইলের পর মাইল ফাঁকা পড়ে আছে—কমলা রঙের রোদে ছোটো ছোটো চায়ের দোকানগুলো—দরমা কি কাঠের কিম্বা টালির চাল দেওয়া—" বলতে বলতে হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামলো। ট্যাক্সির দুই জানালায় পরস্পরের থেকে একটু ব্যবধানে বসলো তারা।

দিওতিমা অস্ফুটে স্বগতোক্তির মতো বললো, "ভাবা যায় না, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি অতো অতো মাইল দূরে পৌঁছে যাবে!"

বিবেক বললো, "কি বললে?"

দীয়া উত্তর দিলো না।

"কী? দীয়া বলো—কী বললে? ভাবা যায় না, কী?" বলতে বলতে থেমে গেলো বিবেক। বুকের মধ্যে ধকধক করা উত্তেজনা নিয়ে সে লক্ষ্য করলো, দীয়ার কালো চোখে এক ধরনের হাল্কা বিষাদ খেলা করছে। সিটের মাথায় কনুই রেখে সে দীয়ার দিকে মুখ করে ঘুরে বসলো। "দীয়া, তুমি কি সত্যি ভেবেছিলে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত, এই সাতাশ বছরে—একটি মেয়েকেও আমি চিনবো না?"

দিওতিমা তার কাজল পরা চোখ দুটো নামিয়ে বললো, "না, সেই জন্য না..."

"তবে?"

দীয়া উত্তর দিলো না। আসলে সে তার স্বাধীনতা চায়। পাগলের মতো। তার মাতামহী, প্রমাতামহী কিভাবে বেঁচে ছিলেন এই দেশে, তার বিবাহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও সে কি ভাবে বাঁচছে! বেঁচে থাকতে পারছে—সসম্মানে, উন্মাদ বিলাসে, উপভোগে, রোমাঞ্চে, মুক্তিতে। এ কি এক ধরনের প্রতিশোধ? হবে হয়তো? সাড়ে বারোটায় তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে। একটা বড় কাজ হাতে আসবে কি আসবে না, আজ জানতে পারবে। এ কাজ পেয়ে গেলে এক লাফে দাঁড়িয়ে যাবে তাদের কোম্পানি; এবং কাজটা পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অথচ, সে যখন ব্যবসা শুরু করার কথা বলেছিলো, সকলেই সস্নেহে, সকৌতুকে হেসেছিলো, "দীয়া করবে ব্যবসা। যে মেয়ে খেতে ঘুমতে ভুলে যায়!"

বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিটা একটা বাঁক নিলো। মেট্রো রেলের স্টেশনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিবেক বললো, "মেট্রো রেল চড়েছো?"

"হ্যাঁ চড়েছি—রীতিমতো ভিড় ঠেলে—অফিস টাইমে!" বিবেক নিঃশব্দে তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো। কথাটা বলার সময় দীয়ার গলায় একটা ঔদ্ধত্যের সুর ছিলো, যা এর আগে কখনও লক্ষ্য করেনি তার মধ্যে। মৃদুভাষী, কমনীয় মেয়েটির সত্তায় এক মুহূর্তে কি যেন বদলে গেলো। দীয়ার কাটা কাটা, নিখুঁত মুখ, আর সুন্দর শরীবের থেকে সে চোখ সরালো না। ঘেমো অফিস যাত্রীদের ভিড়ে দিওতিমা ঠেলাঠেলি করে বসার আসনের জন্য লড়াই করছে।

এলোমেলো হয়ে গেছে আঁচল, এই দৃশ্য কল্পনা করতে খুবই অসুবিধে হলো।

"কি ভাবছো?" বললো দীয়া।

সে অপ্রস্তুত হয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো, "না, কিছু না..."

দীয়া আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বেশ জোরে চলছিলো ট্যাক্সিটা। আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এসেছে। ধুলো উড়ছে। হাওয়ায় একটা পাতা ঘুরতে ঘুরতে উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর এসে পড়লো। দু'পাশের গাছ, রাস্তা, ফুটপাথ, দোকান হু হু করে পিছিয়ে যেতে লাগলো অতীত স্মৃতির মতো।

"তোমার ভয় করে না?"

"কী?"

'মেট্রোরেল চড়তে।'

"না তো"—

বিবেক সিগারেটটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে হাসলো। বললো, "তোমার আমাব চেনা একজন মিনিস্টার—নাম বলবো না—দিল্লিতে কি বলেছেন জানো তো! উনি নাকি চড়লেই মরে যাবেন। তাই একদিন অবশ্যই মেট্রো চেপে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যাবেন, যাতে ওঁব মৃত্যুতে খবরের কাগজগুলো কিছুদিন এমন হৈ চৈ করে যে মেট্রোরেল বন্ধই হয়ে যায়। ওটা বন্ধ করার ওই একটাই উপায়।"

এটা শুনে দিওতিমা উপভোগের সঙ্গে ভেতর থেকে হেসে উঠলো।

ট্যাক্সিটা পার্ক স্ট্রিটে এসে পড়েছে। দিওতিমা একটা লম্বা আঙুল তুলে বললো,

"ওইখানে আমায় নামিয়ে দাও—ওই যে ওই শাদা বিল্ডিংটা, ওইখানে আমার কাজ আছে।"

বিবেক বিবর্ণ মুখে তাকালো। দীয়া একটুক্ষণ, আর একটুক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে থাকো—বলতে বলতে সে উপলব্ধি করলো, যে এই সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই সে ভীষণভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে দীয়ার পাশে থাকায়। এই বিন্দু থেকে একা যেতে হবে ভেবে বেশ জোরে ধাক্কা লাগলো, যে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি, আলাদা হয়ে যেতে হবে। অনেকক্ষণ আর কোনো কথাই বলতে পারলো না সে। ট্যাক্সিটা লাল আলোয় থেমেছে। ঝোড়ো হাওয়া বার্তা আনছে বৃষ্টির। বিবেক সিটের মাথায় কনুই রেখে দিওতিমার দিকে ঘুরে বসে বললো, "প্লীজ দীয়া শোনো আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খাই, তারপর তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি তোমায় পৌঁছে দেবো, এয়ারপোর্ট যাওয়ার আগে।"

দিওতিমা বেশ অনুতাপের সঙ্গেই একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো শাদা মাল্টি স্টোরিড বাড়িটার দিকে যেখানে শাদা দেয়ালের লম্বাটে অফিস ঘরে একটা ছোটো খাটো মিটিং তার জন্য অপেক্ষমান। বিবেকের সঙ্গে কোনো নিরিবিলি, শীতল রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছিলো তার। তাছাড়া, প্রায় দুদিন একটা কিছু মুখে তোলেনি বিবেক; এখন প্লেনে ওঠার আগে একটু কিছু যদি সে খায়, দীয়া হাল্কা মনে বিদায় নিতে পারে।

কিন্তু নিজের কাজের ব্যাপারে কর্তব্যমিশ্রিত এক ধরণের আগ্রহ রয়েই গেলো। অবশেষে, আরো খানিকটা এগিয়ে ফ্লুরির সামনে সে নেমে গেলো ট্যাক্সি থেকে। হাঁটতে লাগলো। পেছনে তাকালো না। বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, এই সময় পিঠে কার হাত এসে পড়ায় চমকে তাকালো ঘাড় ঘুরিয়ে। দূরে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে বিবেক ছুটতে ছুটতে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হাঁপাচ্ছে। ছেলেমানুষের মতো ছলছল করছে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো। আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন হঠাৎ ছুটে এসেছে, দীয়া বা বিবেক দুজনের কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না কি বলবে বা করবে। এই সময় হঠাৎ কড়কড় করে বাজ পড়ার শব্দ হলো আকাশ জুড়ে। চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে আকাশের দিকে তাকালো দীয়া। আকাশ কালো করে এমন মেঘ জড়ো হয়েছে, আর ভেজা ভেজা হাওয়া দিচ্ছে, যে বৃষ্টি না পড়লেও মনে হচ্ছে একটা জম্পেশ ব্যাপার নামবে। তার ওপর কলকাতার ধুলো।

এসবের মধ্যে হাঁটু জল ভেঙে হলেও ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে তাকে।

বিবেকের প্রশ্নটা হঠাৎ কানে বাজল তার, "দীয়া, তুমি কি সুখ চাও না?" মাথাটা পেছন দিকে সামান্য ছুঁড়ে দিয়ে উড়ে যাওয়া চুলগুলো সামলাতে থাকলো। কাজে, অভিজ্ঞতায়, অনেক ছেড়ে যাওয়ায় এই বৃষ্টিমাখা ধোঁয়া আর ধুলোর দুপুরে জীবনের ভ্রূণ লুকিয়ে আছে, বেদনায় যন্ত্রণায়, কর্মব্যস্ততায়, বৈচিত্র্যে বেঁচে থাকার অবিশ্বাস্য আনন্দে। না বিবেক, সুখ নয়, রোমাঞ্চ, রস, রক্তের মতো যা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। সিন্‌থেটিক ফ্রুটপাঞ্চের মতো নয়।

স্মৃতিঘর

শুভমানস ঘোষ

ম্যানেজার ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। মাথার চুল যত পে:কছে তার চেয়ে উঠেগেছে বেশি। পাকা লোমে ভরা ভুরু কুঁচকে দেবদীপ ও সুমিলিতাকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ চেনা চেনা লাগছে আপনাদের। দাঁড়ান, গত বছর আপনারা এসেছিলেন না? একরাত ছিলেন আমার হোটেলে।

দেবদীপের পরনে জিন্‌স ও প্রিন্টেড শার্টের ওপর ব্যাগি সোয়েটার। কাঁধ থেকে ডাকব্যাকের নীল শৌখিন ব্যাগটা নামিয়ে হেসে বলল, ঠিক ধরেছেন। তবে তখন আমাদের বিয়ে হয়নি। সারাদিন থেকে বিকেলে বাসে ফিরে যাই। এই তো লাস্ট উইন্টারে।

সুমিলিতার কাঁধে ঝুলছে একটা চামড়ার বাহারি ব্যাগ। ওতে ওর সাজগোজের বিস্তর উপকরণ। ম্যানেজারকে লক্ষ করে এবাব সে মুখ খুলল, আমাদের দোতলার ছাদের দিকের ঘরটা দিতে হবে। গতবার যেটায় ছিলাম।

—এগারো নম্বর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

সুমিলিতার পরনে হালকা সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি। ওই একই রঙের ব্লাউজের ওপর খয়েরি স্লিভলেস কার্ডিগান। ওর চেহারায় চমক না থাকলেও স্নিগ্ধতা আছে। স্নিগ্ধতা মন প্রসন্ন করে। কিন্তু ম্যানেজার এককথায় ঠোঁট উল্টে দিলেন, হবে না। ওটা এখন ভাড়া দেওয়া হয় না। শিগগিরি রিপেয়ার হবে বলে ফেলে রাখা হয়েছে।

সুমিলিতা হতাশ হল, সে কী? আমরা যে—বলে দেবদীপের দিকে ফিরল, কী গো?

দেবদীপের বয়েস আঠাশ। লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান যুবক। ওর ঠোঁট দুটোয় প্রখর বাস্তববোধের সঙ্গে কিছুটা ভাব-বিলাসিতার ছাপ আছে। সব মানুষের ভেতর কোথাও না কোথাও আত্মবিরোধ থাকে। ম্যানেজারকে লক্ষ করে মাথা নেড়ে বলল, ওই ঘরটা আমাদের চাই। দরকার পড়লে একস্ট্রা কিছু দেওয়া যাবে। বুঝতেই পারছেন এটা একটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার।

ম্যানেজার বিব্রত হয়ে পড়লেন, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনারা ও-ঘরে থাকবেন কী করে? নতুন করে ওয়্যারিং হবে বলে ইলেকট্রিক-কানেকশন খুলে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া—শুনুন, আপনাদের অন্য ঘর দিচ্ছি। খোলামেলা, নতুন ঘর, অ্যাটাচ্‌ড বাথ—

—না না। সুমিলিতা ম্যানেজারের কথা কেড়ে নিল, নতুন ঘর-টর চাই না। এগারো নম্বর। ওটা দেবেন তো দিন নইলে ফিরে যাই। কী গো?

দেবদীপ ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

—মুশকিলে ফেলে দিলেন। বলে ম্যানেজার একটু চিন্তা করে। মুখ তুলে তাকালেন, বেশ আপনারা যদি থাকতে পারেন থাকুন।

—নগেন।

—'বাঁচালেন', বলে সামনের চেয়ারটা টেনে বসে দেবদীপ জিজ্ঞেস করল, বাথরুমটা ঠিক আছে তো? অ্যাটাচ্‌ড?

—বাথরুম ঠিক আছে। আপনারা বিকেলে ফিরে যাবেন তো?

দেবদীপ সশব্দে হেসে উঠল এবার। হাসতে হাসতে বলল, এখন তো আমরা রেগুলার স্বামী-স্ত্রী। ফেরার তাড়া নেই। আছি রাতে। অ্যাটলিস্ট একটা হ্যারিকেনের ব্যবস্থা রাখবেন, বড়দা।

ম্যানেজার খাতা বের করলেন। ভদ্রলোকের ডান চোখের তুলনায় বাঁ চোখটা সামান্য ছোট। প্রকৃতিতে দুটো জিনিস কেন যে হুবহু এক হয় না।

আধঘন্টা পরের কথা। হোটেলের কাজের ছেলে নগেনের পিছু পিছু দোতলার এগারো নম্বর ঘরে পা দিয়েই গা ছমছম করে উঠল সুমিলিতার। ঘরের খাট-বিছানা, ওয়্যারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ারটেবিল, এমন কি অ্যাশট্রেটাও ঠিকঠাক সাজানো আছে। থাকার মধ্যে নেই জানালার ভারী পর্দাগুলো আর দেওয়ালের ইলেকট্রিক লাইনটা। কিন্তু তাতেও এই শীতে দেখতে দেখতে সুমিলিতার নাকের ডগায় ফুটে উঠল এক বিন্দু ঘাম। দেবদীপের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিস করে উঠল, একদম সেই রকম আছে ঘরটা। বলতে বলতে তার ঘাড ঘুরে গেল চুনকাম করা দেওয়ালের একদিকে, দাড়িওয়ালা রাগি বুড়োটা পর্যন্ত আছে। সেই যে গো। দ্যাখো দ্যাখো।

আসলে দেওয়ালের ওই অংশে ড্যাম্প বা অন্য কোনও কাবণে চুনের পোঁচ হালকা হয়ে গেছে। ফলে জায়গাটা অনেকটা দাড়িওয়ালা বুড়োর মুখের মতন লাগে। নগেন বিছানার চাদর পাতছিল। চট করে একবার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে নিল। দেবদীপ হেসে ফেলল। তারিফ করার গলায় সুমিলিতাকে বলল, তোমার মনেও থাকে!

কথা শেষ করে দেবদীপ টেবিলে ব্যাগ রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সামনে নদী। তীরে কাদামাখা দীর্ঘ চওড়া খোলস খুলে রেখে রোদ পোয়াচ্ছে? এই নদীই কিছুটা তফাতে এক অতিকায় নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। স্থানীয় লোকেরা বলে সঙ্গম। ছোটখাটো টুরিস্ট স্পট। দেবদীপের ঘাড় ঘুরে গেল সুমিলিতার দিকে, এবার কিন্তু সঙ্গমটা দেখতেই হবে। সেবার হয়নি।

কয়েক সেকেন্ড। সুমিলিতার চোখে একই সঙ্গে জ্বলজ্বল করে উঠল হাসি ও শাসন। ঘুষি দেখিয়ে বলল, তোমার জন্যই তো। যা করছিলে।

দেবদীপ বিব্রত হল। নগেনকে দেখিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা ঘুরিয়ে দিল, এখানে ট্রাম কোম্পানি বাস চালু করেছে দেখেছ? গতবারে—

দেবদীপের মনে পড়ল গতবার তারা এখানে এসেছিল ওঁচা পাবলিক বাসে। সে এক বিকট অভিজ্ঞতা। একে অলস্টপ, তার ওপর বস্তা থেকে চোলাই, এমন কি, ছাগলছানা পর্যন্ত গাড়িতে তুলতে বাকি রাখেনি কন্ডাক্টর। সুমিলিতার শাড়ির ওপব একটা বাচ্চা তো বমিই করে দিচ্ছিল আর একটু হলে। ফেরার সময় অবস্থা চরমে উঠেছিল। মিছিলের জন্য পুরো একঘন্টা বাস দাঁড়িয়ে রইল মাঝখানে। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভয়ে সুমিলিতার হাতের তালু ভিজে যাচ্ছিল। দেবদীপও ঘাবড়ে-টাবড়ে একশা। দুঃসাহসিকতারও তো একটা সীমা আছে। এবার ঠিক সেই জিনিসটাই মিস

করবে তারা। দেবদীপের মনটা কেমন কেমন করে উঠল। নগেনের দিকে চেয়ে শুধোল, হয়েছে?

নগেন ঘাড় নাড়ল। ওর পরনে একটা বারমুডা ও হাতাওয়ালা গেঞ্জি। প্যান্টটা সম্ভবত কোনও পরোপকারী টুরিস্টের দান। বলল, বাথরুমের জল খাবেন না। খাওয়ার জল দিয়ে যাচ্ছি।

নগেন চলে যেতে দেবদীপ চেয়ারে বসে পড়ল। ওর খোলা গলার নীচে উঁকি দেওয়া রোমগুলো হাওয়ায় থিরথির করে কাঁপছিল। 'বেশ শীত' বলে পকেট থেকে লাইটার ও সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুমিলিতার দিকে তাকাল, নাও, এবার স্মৃতিচারণা শুরু করো। কী যেন বলে? হ্যাঁ নস্ট্যালজিয়া। যত্ত ছেলেমানুষি!

—ছেলেমানুষি! সুমিলিতার ভুরু লাফিয়ে উঠল, এমন ভাব করছ, যেন তোমার ইচ্ছা ছিল না। অ্যাই, একবার এসো না।

—এক্ষুনি? বলে দেবদীপ চট করে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে নিল, অ্যাটলিস্ট এক ঢোঁক ধোঁয়া গিলতে দাও।

সুমিলিতার নাকের ঘাম আর নেই। তার জায়গায় বিরক্তির ছোট্ট একটা দাগ ফুটিয়ে ঝংকার দিল, ওই ধোঁয়াই গেলো।

সুমিলিতা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। তারপর কার্ডিগানটা খুলতে খুলতে হঠাৎ তার চোখ চলে গেল দেওয়ালের বুড়োর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সুমিলিতার মাথার মধ্যে স্মৃতিঘরের একটা দরজা খুলে গেল। একবছর আগে এই হোটেলের এই ঘরেই ঘটেছিল ঘটনাটা। সে ছিল এক রুদ্ধশ্বাস দিন। ঘরে ঢুকে দরজাটা দেওয়ার অপেক্ষা। মুহূর্তে দেবদীপের বুকপকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা মুচড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড কাঠ হয়ে থেকে আচমকা বুড়োর দিকে চেয়ে সুমিলিতার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। দেওয়ালের বুড়ো তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। কপালে তার থাক থাক ভাঁজ।

সুমিলিতা বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সেই ভয়টা তার আবার পেতে ইচ্ছে করছে। দেবদীপকে লক্ষ করে সে ঝংকার দিল, দাঁড়াও যাচ্ছি। তোমার ধোঁয়া গেলা বের করছি।

দেবদীপ জুতো ছেড়ে চেয়ারে পা তুলে বসে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। মধ্যশীতের নদীমাখা হাওয়ায় ধোঁয়া ভেঙেচুরে যাচ্ছিল। সুমিলিতা এগিয়ে গিয়ে দেবদীপের গলা জড়িয়ে ধরল। এই তো সেই দীপ। এই তো সেই ঘর। এই তো সেদিনের মতন বাইরে ঠাণ্ডায় হিহি করছে নদী। সেই দিনটা আর একবার ফিরে আসবে না? সুমিলিতার গলায় বায়না ফুটে উঠল, দীপ, অ্যাই ফ্যালো না এটা।

দেবদীপের সামনেটা আড়াল হয়ে যাচ্ছিল সুমিলিতার মসৃণ সুন্দর দুই ঠোঁটে। 'দাঁড়াও' বলে তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামাতে গিয়ে একটু হেলে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সুমিলিতার মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেল। এ কি সেই মিলি? এই তো সেই একজোড়া চোখ। কিন্তু কোথায় গেল সেই ভয়? ইচ্ছা ও সূক্ষ্ম আমন্ত্রণের মায়া ছড়ানো মনোরম ভয়?

দরজায় টোকা পড়ল। সুমিলিতা ছিটকে গেল। নগেন। জলের জাগ আর কাচের গেলাস টেবিলের ওপর রেখে দেবদীপকে জিজ্ঞেস করল, এখানে খাবেন না নীচে?

সুমিলিতা খোঁপা খুলে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আমরা নীচে যাব। বলে রাখবে।

নগেন চলে গেল। চুলের গোড়া থেকে গার্টার খুলে বিছানায় রাখতে গিয়ে নদীর দিকে চোখ চলে গেল সুমিলিতার। রোদ্দুর-চকচক নদীর জলে কোঁচকানো কাগজের মতন স্রোতের হালকা আঁকিবুকি। সুমিলিতার চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিল। দেবদীপের দিকে ফিরে বলল, অ্যাই চান করবে তো?

—এই শীতে? বলে পরক্ষণে দেবদীপ ঘাড় নাড়ল, আচ্ছা ঠিক আছে।

সুমিলিতার মুখের ভাব বদলে গেল। খরখর করে উঠল একেবারে, তোমার ইচ্ছা নেই যেন। তোমরা ছেলেরা সব সমান।

—কী?

বাইরে থেকে বাসের দীর্ঘ হর্ন ভেসে এল। দেবদীপ গলা তুলল, ছেলেরা সমান মানে? পরিষ্কার করে বলো।

'স্বার্থপর' বলে সুমিলিতা আরও একবার বসে পড়ল বিছানার ওপর। তাবপর বাসেব হর্নের আওয়াজ শুনতে শুনতে শুযেই পড়ল।

—তাই বুঝি? বলে দেবদীপ উঠে পড়ল। সোয়েটার, জামা ও সবশেষে গেঞ্জি খুলতে খুলতে হালকা চালে বলল, ছেলেদের সম্পর্কে তোমার দেখছি খুব অভিজ্ঞতা।

সুমিলিতা গলা চড়াল, অ্যাই একদম বাজে বকবে না। আমি রেগে যাব।

নদীর চলে রিংরিঙে ঠ্যাং ফেলে ফেলে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল একটা বক। দেবদীপ বলল, রেগে যাব মানে? ফিউচার টেন্স কেন? রেগেই তো গেছ।

আচমকা উঠে বসে সুমিলিতা ফোঁস করে উঠল, রাগবই তো। তখন তোমায় ডাকলাম, এলেই না। কাছে গেলাম সাড়াও দিলে না। সিগারেটটা একটু পরে খেলে হত না?

—আমি কী করব? কাজের ছেলেটা এসে পড়ল যে।

—তা তো বলবেই।

দেবদীপ এগিয়ে এল। ওর পুরুষালি রোমশ দেহ ঠাণ্ডায় কিছুটা কাতর। বিছানায় বসে সুমিলিতার চিবুকে হাত রাখল, শোনো মিলি—

সুমিলিতা চেঁচিয়ে উঠল, সরে যাও। আমার ভাল লাগছে না।

—কী মুশকিল। দেবদীপ অবাক এবং বিরক্ত, বেড়াতে এসে এসব ভাল লাগে? চলো ওঠো।

সুমিলিতা দূরে ছিটকে গেল। বকপাখি নদীর জল ছুঁয়ে ফেলেছে।

ঘন্টাখানেক পর কিচেনে যাওয়ার পথে আবার ম্যানেজার-ভদ্রলোকের দেখা পেল ওরা। ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে দাঁড়িযে আছে আঠাশ-তিরিশ বছরের এক তরুণ। ম্যানেজার দেবদীপের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে তরুণটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে কে আছে?

তরুণটি কায়দা করে ঘাড়-ফাড নেড়ে জবাব দিল, মাই ওয়াইফ—

—কী? ম্যানেজারের গলা চড়ে গেল।

ছোকরা কেমন গুটিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেবদীপদের এক ঝলক দেখে বলল আমার স্ত্রী।

ম্যানেজারের মুখে হাসি আঁচড় কাটল, তাই বলুন। বাংলায় বললে সবাই বুঝতে পারি। কতক্ষণ থাকবেন?

দেবদীপের হাসি পেল। সুমিলিতার ঠোঁটেও হাসি উঁকি দিচ্ছিল। চান করে উঠে ও কালোর ওপর ববিছাপ শাড়ি পরেছে। ওপরে আলগা করে জড়িয়ে নিয়েছে সবুজ শাল। বলল, বাঙালিরা স্ত্রীকে স্ত্রী বলতে লজ্জা পায়।

দেবদীপ সুমিলিতার দিকে ফিরল, তুমি কিছু বোঝো না।

—অ্যাঁ?

দেবদীপ গলা খাটো করে ফেলল, তাকাও ওদিকে।

সুমিলি ্তা ঘাড় তুলে দেখল একটু দূরে বারান্দার শেষে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চশমাপরা এক মহিলা। বয়েস পঁয়ত্রিশের কম কিছুতে নয়। কোনও সন্দেহ নেই, এই সেই তরুণটির 'মাই ওয়াইফ'। সুমিলিতার মনে পড়ে গেল নিজের কথা। গত বছর এখানে ঘর নেওয়ার সময় সেও ঠিক এই ভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। এ মহিলা তো ভাল, সুমিলিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমতো ঘামছিল। দেবদীপ সাহস দিয়ে বলেছিল, একদম ঘাবড়াবে না। চুপ করে দাঁড়াও তো এখানে। মুখটা মোছো।

কথা শেষ করে দেবদীপ ম্যানেজারের টেবিলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবেলার জন্য তার একটা ঘর চাই। ম্যানেজার আড়চোখে একবার সুমিলিতাকে দেখে নিয়ে অবধারিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, সঙ্গে কে আছে?

মুখের একটা রেখা না কাঁপিয়ে দেবদীপ উত্তর দিয়েছিল, আমার উড বি ওয়াইফ।

—আজ্ঞে?

দেবদীপ হেসে ফেলেছিল, বুঝলেন না? আমার হবু বউ। সামনের বছর আমরা বিয়ে করব।

ম্যানেজার কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেবদীপকে দেখে নিজেও হেসে ফেলেছিলেন। তারিফ করার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, বাহ্, একদম পরিষ্কার কথা। খুব ভাল। আমার সবচেয়ে ভাল ঘরটা আপনাকে দেব।

দেবদীপ ঠাট্টার সুরে বলেছিল, সত্যি কথা বলার পুরস্কার?

—তা বলতে পারেন। বলতে বলতে ম্যানেজারের গলা ভারী হয়ে গিয়েছিল, এ যা চাকরি সারাদিনে কটাই বা সত্যি কথা শুনি! মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাই এখান থেকে।

তারপরেই ঘটে গিয়েছিল একটা মজার ব্যাপার। মুখ শুকনো করে সুমিলিতা দৌড়ে এসে দেবদীপের জ্যাকেট আঁকড়ে ধরেছিল। কিচেনের কাছে এইমাত্র সে তার আসানসোলের জ্যাঠামশাইকে ঘুরতে দেখেছে। তার জ্যাঠামশাই নাকি সাংঘাতিক রগচটা লোক। সুমিলিতাকে দেখতে পেয়েছেন কিনা কে জানে। দেবদীপ 'ধুস' বলে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমার জ্যাঠামশায়ের খেয়েদেয়ে কাজ নেই এখানে আসবে? কাকে দেখতে কাকে দেখেছ, দ্যাখো।

দেবদীপ ঠিকই ধরেছিল। পরে খোঁজ নিয়ে সত্যি সত্যি দেখা গেল কিচেনে একজন লোক কাজ করে যাকে পেছন থেকে অনেকটা সুমিলিতার জ্যাঠামশায়ের মতন লাগে।

—হাসছ যে?

ততক্ষণে ওরা কিচেনে ঢুকে পড়েছে। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে দেবদীপ সুমিলিতার দিকে মুখ ফেরাল, সেবারের সেই জ্যাঠামশাই কেসটা মনে আছে?

সুমিলিতা অস্পষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে মুখটা একটু ঘোরাতেই লোকটাকে দেখে ফেলল। লোকটা মেঝেয় বসে একমনে তরকারি কুটছে। এই লোকটাকে দেখে সেবার কীভাবেই না ভয় পেয়ে গেছিল! বুকখানা এমন ধড়াস ধড়াস করছিল যে দম আটকে যায় আর কী। কিন্তু এখন তো তার কিছুই হচ্ছে না। বুকখানা একবার ছ্যাঁত করেও তো উঠতে পারত।

—কী হল তোমার? মনে পড়ছে?

সুমিলিতার গলা চড়ে গেল, পড়ছে রে বাবা। চুপ করো।

বাইরে থেকে বাসের হর্ন ভেসে এল। সুমিলিতার দিকে চোখ সরু করে দেবদীপ বলল, তোমার কী হয়েছে বলো তো? এই তো বেশ হাসছিলে। এরকম করে বেড়ানোটা মাটি করছ কেন?

তরকারির স্তূপে বঁটি শুইয়ে রেখে লোকটা এগিয়ে এল। হাত নেড়ে বলল, আপনারা বসুন।

বাসের ইঞ্জিন গরগর করে উঠল। সুমিলিতা এগিয়ে গিয়ে টেবিলে বসে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, কোন গাড়ি ছাড়ছে?

লোকটা গলা তুলে উত্তর দিল, ও সি-টি-সি।

—ট্রাম কোম্পানির বাস? দেবদীপ প্রশ্ন করল।

—হুঁ। একটা চল্লিশে ছাড়ছে। ওদের একঘন্টা ছাড়া ছাড়া সার্ভিস। কী খাবেন?

আবার বাসের হর্ন বেজে উঠল। বাজছে বাজছে। বাজছে, না ডাকছে? আকুল গলায় বাস যেন কাউকে ডাকছে। কাকে? দেবদীপের বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

হোটেলেব ঘরে ফিরে দরজাটা দিয়ে বিছানায় বসতেই গাটা ঘুম ঘুম করে উঠল দেবদীপের। সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে রেখে কম্বলের ভাঁজ খুলতে লেগে গেল সে। সুমিলিতা মৌরি চিবোতে চিবোতে জানালা দিয়ে নদী দেখছিল। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেবদীপকে দেখল, এখনই শুয়ে পড়ছ যে?

দেবদীপ শুয়ে কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে বলল, খুব টায়ার্ড লাগছে। ট্রাম-কোম্পানির বাস আছে জানলে কে ওই মড়ার বাসে উঠত?

সুমিলিতা বিছানায় এসে বসল। গত বছব এখানে আসার সময় ওরা বাসে পুরো একঘন্টা দাঁড়ানোর পর জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু তাও ক্লান্তির ছিটেফোঁটা ছিল না দেবদীপের। সুমিলিতার গলায় অভিমান উঁকি দিল, এত টায়ার্ড যে সিগারেটও খেলে না। সকালে তো ধোঁয়া গেলার জন্য তর সইছিল না।

বালিশ থেকে মাথা তুলল দেবদীপ, বকবক না করে শুয়ে পড়ো। বিকেলে সঙ্গম দেখতে যেতে হবে।

সুমিলিতা আচমকা দেবদীপের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল, রাগ করেছ আমার ওপর?

দেবদীপ বলল, রাগের সিন তো তুমি একাই সকাল থেকে চালিয়ে যাচ্ছ। সরো সরো আমার ঘুম পাচ্ছে।

রাগি বুড়োর দিকে চোখ চলে গেল সুমিলিতার। বুড়ো ঢুলছে। কিন্তু ঠোঁটে যেন একচিলতে হাসি না?

ঘন্টাখানেক হবে। দেবদীপের ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। বিছানায় উলটো দিকে মাথা করে সুমিলিতা কুঁকড়ে শুয়ে আছে। দেবদীপ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ডাকল, অ্যাই মিলি। ওঠো ওঠো। এরকম করে শুয়ে আছে কেন?

সুমিলিতা চোখ মেলল। ও ঘুমোয়নি। দেবদীপকে দেখতে দেখতে বলল, আমি ঠিক আছি। তুমি ঘুমোও।

দেবদীপের গা থেকে কম্বল খসে পড়ছে। সুমিলিতার ওপর ঝুঁকে পড়ল, কতক্ষণ এভাবে শুয়ে আছ? আমায় ডাকোনি কেন?

—তুমি তো টায়ার্ড। ঘুমোও।

দেবদীপ সুমিলিতাকে সোজা করে দিল। অসহিষ্ণু গলায় বলল, আর কত রাগ করবে বলো তো? এবার এটা শেষ করো না।

সুমিলিতার চোখে বিরক্তি ঘন হয়ে এল, হাত সরাও।

—সরাব না। আগে একটু হাসো।

—দীপ ছেলেমানুষি কোরো না। হাত সরাও।

দেবদীপের চোখে ফুলকি উড়ল, ও তুমি হাসবে না? হাসবে না তো? দ্যাখো তবে। এই বলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে 'দেখি কেমন না হাসো' বলে দেবদীপ সুমিলিতাকে ধরতে গেল। কিন্তু পারল না। চোখের পলকে সুমিলিতা সরে গেছে। তারপর দেখতে দেখতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল বিছানা। বিশ্রীভাবে আর্তনাদ করতে শুরু করল খাটটা। দেওয়ালের সঙ্গে খাটের একদিকের ছতরি ধাক্কা খেয়ে বারবার শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে বেশিক্ষণ পারল না সুমিলিতা। সেই ধরাই পড়ে গেল দেবদীপের কাছে। তৎক্ষণাৎ তার ডানাজোড়া শিথিল হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, পারোও বটে।

পরক্ষণে হঠাৎ কীসের ঠেলায় দেওয়ালের দিকে মুখ তুলে স্থির হয়ে গেল দেবদীপ। ঘুমের ঘোরে রাগি বুড়োর মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে। এ কি সেই বুড়ো? ভাবতে ভাবতে দেবদীপের মাথায় ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। আজ থেকে এক বছর আগে এমনই শীতের দিনে এই বিছানায় ঘটে গিয়েছিল সেই বুক কাঁপানো আবিষ্কার। কয়েক সেকেন্ড দেবদীপের শরীরে সাড় ছিল না, পলক ফেলতেও ভুলে গিয়েছিল চোখ। তারপরেই থরথর সুখের সঙ্গে একটা পাপবোধ তার রক্তের মধ্যে ছলাৎ করে উঠেছিল। কোথায় গেল সেই মধুর পাপ? সেই দুরন্ত সুন্দর দ্বিধা, বাধা? এই তো সেই ঘর। এই তো ক্যাসেটবন্দি ফিল্মের মতন সেই দিনটা ফিরে এসেছে। কিন্তু স্ক্রিনে ছবি ফুটছে না কেন? পর্দা জুড়ে কীসের এসব হিজিবিজি দাগ?

—কী গো, কী হল তোমার? সুমিলিতা অবাক হলে গেল।

—কিছু না। কিছু না। দেবদীপ মাথা ঝাঁকাল।

—কী না? সুমিলিতা দু হাত বাড়িয়ে দিল, এখানে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে ডালপালা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল গাছ। দেবদীপ অধীর গলায় বলে উঠল, মিলি আমার ভাল লাগছে না। কিচ্ছু না।

—আমারও না। আমারও না। সুমিলিতা ডুকরে উঠল।

—তোমারও ?

—হ্যাঁ। কেন এমন হচ্ছে বলো তো? বলো না!

দেবদীপের গলা কেঁপে গেল, জানি না। চলো আমরা ফিরে যাই।

—যাবে? সেই ভাল। কিন্তু সঙ্গম?

দেবদীপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, হবে না। আর কখনও হবে না।

.াইরে থেকে বাসের হর্ন ভেসে এল। ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে যাত্রীদের ডাকছে। সুমিলিতার চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ল জল। দেবদীপকে জড়িয়ে ধরে সে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল। তবু স্মৃতিঘরের বৃদ্ধের ঘুম ভাঙল না। তবু।

অণুচ্চারিত

কাবেরী রায়চৌধুরী

তখনো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে কাকলী। অদূরে চেয়ারে হেলান দিয়ে ধ্রুবজ্যোতি। হাতের আঙুলের ফাঁকে লম্বা ছাই হয়ে নিভে গেছে সিগারেট। চোখ সিলিং-এর দিকে। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছোট্ট মিষ্টুনী; কাঁদছিল এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল কাকলী, অথচ সাড়া দিতে পারেনি সে।

আয়্যাম স্যরি কাকলী। এভাবে ব্যাপারটা....জাস্ট আমার নিজেকে....বিশ্বাস করতে পারবেনা....আমি এভাবে দেখতে চাইনি। আমি তোমাদের.. স্যরি স্যরি কাকলী। আমি পার্থর কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। তুমি জিজ্ঞেস করো, যদি বিশ্বাস না হয়।

হাজার হাজার মাইল উচু দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। এত স্বচ্ছ এত ঘন নীল আকাশ যে হতে পারে ভাবাই যায় না যেন। আর মাটির কাছাকাছি, যত ধূলো ধোঁয়া .... ! পলিউশন! উঁচুতে উঠলে বোধহয় সবকিছুই স্বচ্ছ পরিষ্কার নির্মল। জানলার কাঁচে চোখ কাকলীর।

বিমান সেবিকার গলা শোনা গেল, ইংরাজীতে। বাংলায় তর্জমা করে দিল একটু পরেই, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতবর্ষের সীমানা ছেড়ে উড়ে যাব ...., আরো কিছু বলে গেল মেয়েটি কিন্তু একটি শব্দ কানে পৌঁছালোনা কাকলীর। হা-হা করে করে উঠলো বুকের ভেতব। ভয়ঙ্কর শূন্যতা সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে ফেললো মুহূর্তে। সমস্ত শরীর হাল্কা ভরহীন!

হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমরা অতিক্রম করছি আরব সাগর, বিমান সেবিকার কণ্ঠস্বর আবার শুনছো, শেষবাবের মত দেখে নাও দেশের মাটি, দেশের জল। আবার কবে আসব এখুনি তো জানি না। পার্থর গলাও কি একটু কেঁপে গেল? জানলা দিয়ে আকাশের বুকে চোখ মেললো কাকলী। নীচের দিকে তাকালো একবার। আচ্ছন্ন দৃষ্টি। এত উঁচু থেকে আরব সাগর ফিতের মত; এ মাথা ও মাথা নেই। অক্লান্ত ভেসে চলেছে অজস্র জলরাশি। আরোও আরোও দূরে দৃষ্টিকে ভাসিয়ে দিল কাকলী। মহাকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ঠিক,আকাশের কোন জায়গায়, ঠিক কোন নীম্নভূমিতে তার সেই পাড়া। তার আবাল্য পরিচিত বাসভূমি, তার চেনা অতি-চেনা প্রতিবেশী স্বজন সব! চোখ বন্ধ করে দেখতে পেল কাকলী, সব সব একইরকম চলছে। অথচ সে নেই। মা ভাবছেন বাবা ভাবছেন দাদা বৌদি ভাবছেন তার কথা। আর কেউ? ধ্রুব ভাবছে? ভাবছে। নিশ্চই ভাবছে। এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিল ধ্রুব, হাসছে তখনো। এত স্বাভাবিক! চেকিং-এ ঢোকার পর আর পিছু ফিরে তাকাযনি কাকলী। শেষবাবের মত ফিবে দেখতে ইচ্ছা করেনি মানুষটাকে। হাসুক কাঁদুক যা ইচ্ছে করুক সে। সে আব ফিবেও দেখবেনা ধ্রুবকে। কলকাতার মাটি ছেড়েছে কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অন্য যাত্রা শুরু।

কী ভাবছো? মন খারাপ কবছে? লজেন্স? হাতেব মুঠো ভর্ত্তি লজেন্স এগিয়ে ধবলো পার্থ, নাও। ভালোবাসো তো?

একটা তুলে নিলো কাকলী। ইচ্ছা করছেনা। তবু নিতে হয়, খেতেও হয। হাসলো

সামান্য পার্থর দিকে ফিরে।

চুলে হাত বুলিয়ে দিলো পার্থ।—মন খারাপ করোনা। মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু....শবীব খারাপ করবে, তাই। লক্ষ্মীটি, প্লীজ,—উঁহু। করছিনা তো।' বলতে গিয়েই কান্নার দমক এসে আছড়ে পড়লো গলায়।

করছো, কান্না পাচ্ছে তোমার। আমি বুঝিনা? আমার ও খারাপ লাগছে। কী আছে? আমরা ওখানে পৌঁছেই না হয় সবাইকে ফোন করবো। চিঠি দেব। উঁ?

সীটে মাথা এলিয়ে দিল কাকলী। এত ঝড়ের পর শরীরে মনে সহ্য-শক্তি আর অবশিষ্ট কিছু নেই। সমস্ত ভেঙে গেছে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, প্রসাধনে চকচকে শো-কেস ম্যানিকুইন মেন। চোখ বন্ধ করলো।

—আরোও ভালোভাবে ব্যাপারটা হতে পারতো কাকলী। তোমরা একটু সাহস করে কথাটা ওপেন্ করতে পারতেনা? তাহলে আজ ....স্বগোতোক্তি করছিল ধ্রুব। আর সে তখন কেঁদে চলেছে এক নাগাড়ে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এত কান্না কোন্ সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে আসছিল? এত কান্নাও জমা থাকে!

—আমি তো বুঝতে পাবছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না তো। তোমরা দুজনেই অপ্রস্তুতে পড়তে। তোমাদের Dilema-টাও বুঝতে পারছিলাম। বলতে চাইছো অথচ বলতে পারছো না। কেন বলতে পারছো না তাও পারছিলাম। তবু....। আবাব নীরবতা। খাঁ খাঁ শূন্য ঘরে প্রকাণ্ড নীরবতা তখন।

কিছু ঠিক করেছো? কবে যাচ্ছ? পার্থর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা বসবো কোয়ালিটিতে। তুমি যাবে? আয়্যাম সরি, কাকলী, কোন ভদ্রলোকের পক্ষে আমি যা করেছি বেমানান। কোন ভদ্রলোকের অন্যের ঘরে তো দূরেব কথা, নিজের ঘরেও জানলা দিয়ে এমন ভাবে উঁকি মারা সত্যিই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।—ধ্রুবজ্যোতি বলে চলেছে এক নাগাড়ে। কখনো স্বগতোক্তি কখনো তাকে উদ্দেশ্য করে। আর সে? ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত একটা জায়গায় বসে আছে। চোখের সামনে তার সব ভেঙে গেল। বাড়ি ভেঙে গেল। হয়ত আগেই ভেঙেই গেছিল, ঘর বাড়িটার খোল অথবা নির্মাণ শৈলীটুকুই দাঁড়িয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হয়ে। আর সেই বাড়ির প্রতিটি ঘরে অতীত নিয়ে নাটকই চলছিল হয়ত। সেই নাটকের ওপর শেষে পর্দা পড়ে গেল আজ! সেই নাটকের নায়িকার ঘর ভাঙার দৃশ্য দেখতে দেখতে ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তার বুক। কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী অপমান! কী কষ্ট! কী যন্ত্রণা!

—ট্রেনটা মিস্ করলাম বলেই ভাবলাম আজ আর যাবনা। ফিরে আসি। চমকে দিই তোমাকে। বেল বাজাইনি তাই ইচ্ছা করেই। ভেজানো জানলা দিয়ে তাই ......। ছি ছি ছি! শীট্! অপদার্থ একটা আমি! একবার ও মাথায় এলোনা?'—সিগারেট ধরালো আবার ধ্রুব। ঘর ভরে গেছে ধোঁয়ায়। কষ্ট হচ্ছিল তার। কাঁদতে কাঁদতে এমনিতেই সর্দি লেগে গেছিল, তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়া। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না সে। ধ্রুবজ্যোতি দেখতে পেয়েই ফ্যান ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়েছিল। জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, কষ্ট হচ্ছে না, তোমার? স্মোকে তো তোমার ব্রিদিং ট্রাবল হয়। স্যরি।

টানা দুটো দিন একই বিছানায় একই জায়গায় বসে সে কেঁদেছিল এক নাগাড়ে। সাজানো ঘর বাড়ি ভেঙে ছত্রাখান্ তখন। মিষ্টুনী পর্যন্ত কী খেলো না খেলো সে

জানেনা। মা এসেছিলেন। অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে বলেছিলেন, আইজ থিকা আমি সন্তানহারা। মনে করুম মৃত সন্তান প্রসব কর্‌সিলাম।

—মা! কাঁদতে কাঁদতে কিভাবে যেন গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে মা চিৎকার করে উঠেছিলেন, ওই নামে আমারে আর ডাকবানা। তুমিও মনে করবা তোমার মা নাই। সে মৃতা। আমি মিষ্টুনীরে লইয়া চললাম। তোমাগো জ্বালায় মাইয়াটার খাওন দাওন নাই। আর অই পোলাটার লগে দ্যাশ ছারসো কবে? কইয়া দিও মাইয়ারে দিয়া যামু। ছি ছি ছি! অমন জামাইয়ের লগে এ হেন কাজ!

একটিও কথা বলেনি সে। মনে মনে বলেছিল, তোমরা শুধু ঘর ভাঙতে দেখলে মা। একা একা শক্ত পোক্ত একটা ঘর ভাঙা যায় মা? ভাঙা যায়? আমার মনটার খোঁজ করেছিলে কেউ? ধ্রুব যখন দিনের পর দিন কাজ আর বন্ধু-বান্ধব আড্ডা, রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, রাতের পর রাত যখন রাজনীতি প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক করে চলেছে আর আমি সিনেমায় যাব বলে সেজেগুজে টিকিট হাতে বসে আছি কখনো, খাবার নিয়ে বসে বসে মধ্যরাত পার করে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তোমরা কোথায় ছিলে মা? রাজনীতির উদ্বেগে মাসের পর মাস শান্ত শীতল আমাদের রাতের বিছানা। কথা বলার জন্য একটা লোক খুঁজেছি আমি। কোথায় ছিলে মা তোমরা? হ্যাঁ সে আমাকে ভালোবাসেনা তা হয়ত নয়, যে অন্য মহিলার প্রতি আসক্ত তা হয়ত নয়, তবু, সেটাই তো সব নয়। আর আমি তো বড় আদর কাঙাল মা। আমি ধ্রুবকেই ভালোবাসতাম। এখনো বাসি। তবু পার্থ এসে পড়েছে! পার্থর বদলে অন্য কেউও আসতোই।'—গুমড়ে গুমড়ে কথারা ভাঙছিলো তখন, আর না বলতে পারার যন্ত্রণায় কান্না দীর্ঘায়ত হচ্ছিল ক্রমশ।

সন্ধ্যে নামেছে আকাশের প্রান্তে। কতদূর যাওয়া হলো কে জানে? বিমান সেবিকার গলা, অন্য যাত্রীদের কথোপকথন কিছু কানে ঢুকছে না কাকলীর।

লেক গার্ডেন্সের বাড়িটা এত প্রিয় ছিল চূড়ান্ত ভেঙে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে বোঝেনি তো! ভেঙে যাওয়া বাড়িটাকে দেখতে দেখতে বুঝতে পারছিলো অনেক আদরের ঘর ছিল সেটা। কত যত্ন করে সে নিজের হাতে করে এই ঘরের প্রতিটি কোন্ সাজিয়েছিল!

চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে নামছিলো বোধহয়; বুঝতে পারেনি কাকলী। পার্থ আঙুল দিয়ে আলতো করে জলের ধারা তুলে নিলো। তারপর গালে ছোট্ট করে টুস্‌কি মেরে বললো, দেখো?

ভাসা ভাসা চোখ দুটো ফেরালো কাকলী। পার্থ জল মাখা আঙুলটা জিভ দিয়ে চুষে নিলো। হাসলো।

—মন খারাপ নয় প্লীজ? ফর গড্ সেক্!

মাথা নাড়লো কাকলী, করছি না।

—আই অল্‌সো ফিল ফর ধ্রুব। ও তো আমারও দীর্ঘ দশ বছরের বন্ধু! তুমি প্রেম আর বিয়ে নিয়ে যদি সাত বছর ওকে চেনো, তবে আমি দশ বছর! আমার খারাপ লাগছে না? আমি জানি কাকলী, তুমি ধ্রুবকে খুব ভালোবাসতে। এখনো বাসো। অথচ, আমিও এসে পড়েছি! সেটাও তো সত্যি! সত্যি না?

জানলার কাঁচের রঙ এখন আর ততোটা কালো নয়। ফিকে হয়ে আসছে যেন ঘন

তমসা। কাকলীর সমস্ত চিন্তা আচমকা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে যেন। মনে মনে গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে সব,—এরা কী শুরু করলো সবাই? ধ্রুব তাকে পার্থর সঙ্গে শয্যাদৃশ্যে আবিষ্কার করেও ঘৃণা করলো না! কী অদ্ভুত সহমর্মী হয়ে বোঝালো, এই ঘটনার জন্য সে নিজে দায়ী। তার বদলে অন্য যে কোন মেয়েই এই পরিস্থিতিতে একাজই করতো। সে কাকলীর প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে। এতে কাকলীর কোন দোষ নেই। বরং ওই দৃশ্য দেখে ফেলার জন্য নিজে কতবার সে ক্ষমা চাইলো। আর পার্থ? কী অদ্ভুত ছেলে? তার থেকে দু'বছরের ছোট; পুরো এশীয়া মহাদেশ থেকে নির্বাচিত ছ'জন বিজ্ঞানীর অন্যতম। নাসায় কর্মজীবন শুরু হতে চলেছে যে ছেলের, সে ও বা কম যায় কীসে? সে জানে, ধ্রুবজ্যোতিকে এখনোও সে মনে প্রাণে ভালোবাসে; তবুও একটুও রাগ, দ্বিধা, মনের দৈন্যতা নেই তার! কী অদ্ভুত! এ যেন আশ্চর্যের চেয়েও অধিক কিছু!

—একটা কথা বলবো?—দীর্ঘ বিরতির পর কথা বললো কাকলী।

—বলো, না? 'ভারী চশমার ও প্রান্তে জিজ্ঞাসু চোখ পার্থ-র।

—আমি যদি ধ্রুবকে কোনদিন ভুলতে না পারি? চোখ ছলছল করছে কাকলীর। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করবো আরোও বেশী।

—রাগ হবে না? কষ্ট?—পার্থর আঙুলগুলো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো কাকলী।

—যদি দেখতাম, আট মাসের সম্পর্কের জন্য সাত বছরকে সহজেই ভুলে গেলে, তাহলে কষ্ট হতো। ধ্রুবর জন্য কষ্ট হতো, আমার নিজের জন্যে কষ্ট হতো, আর তোমাব হৃদয়হীনতার জন্য সত্যি বলতে কি কষ্ট পেতাম। কী মনে হতো জানো কাকলী? মনে হতো প্রেম বলে কিছু নেই। নাও আই 'ফিল্' প্রাউড অব্ য়্যু।

—আমি ধ্রুবকে চিঠি দিলে তুমি রাগ করবে না তো?

—আমিও দেব। আমি তোমাকে ভালোবাসি কাকলী। যদিও ভালোবাসি কথাটা বলতে ইচ্ছা করছিলো না। কিন্তু এ মুহূর্তে এর চেয়ে appropriate শব্দ আর পেলাম না।

আমি তোমাকে ছাড়াও....কথা শেষ হবার আগেই এক সমুদ্র জলরাশি উপছে পড়লো কাকলীর দু'চোখ গড়িয়ে।

—আমিও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। ভালোবাসি—ভালোবাসি। বড্ড ভালোবাসি তোমাকে—কথাগুলো বলতে গিয়েও জিভে লজ্জার স্পষ্টতা অনুভব করলো পার্থ। বলতে পারলো না কিছুই। শুধু শক্ত মুঠোয় ধরে বইলো কাকলীর হাত।

দি নিউ মনোরমা

হেমেন্দুশেখর জানা

তিন ভাই আজ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথগন্ন হয়ে গেল।

চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী ফাটল ধরেছিল অনেক আগেই। ক্রমে রাগারাগি, রেষারেষি, স্বার্থপরতার চাপান-উতোরে সে-ফাটল চওড়া হয়েছে তারপর আরও চওড়া। তবু বাবা-মা এখনও বলে শুধুমাত্র দুবেলার অন্নে কোনোক্রমে সম্পর্কটা একটা সুতোর মতো টিকেছিল। সেটাই আজ ছিঁড়ে গেল।

তো, এই পৃথকীকরণে, ঘরদোর, সম্পত্তির মতো ভাগ হয়ে গেল বাবা-মাও।

জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানীয় হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। টিউশনের বাজারও বেশ ভালো। সকাল-সন্ধে ছাত্রছাত্রীদের ঢল নামে বাড়িতে। অঙ্কের শিক্ষক বলেই হয়তো খরচ, দায়-দায়িত্বের অঙ্কটাও সে ভালো বুঝেছে।

মধ্যমপুত্র বি কম. পাশ করে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। বাবা বাজারে মাঝারি মতো একটা স্টেশনারি গুডসের দোকান চালাতেন। তার আয়েই তিন পুত্রের লেখাপড়া ও এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তো, তিনিই সেটা লিখে গিয়েছিলেন মধ্যমপুত্রকে। ব্যাবসাটা এখন মধ্যমপুত্র ভালোই বোঝে। অতএব সাংসারিক ব্যাপারেও যে সে ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজে লাগাবে, তাতে খুব বেশি আশ্চর্যের কিছু নেই।

কনিষ্ঠপুত্র ইংরাজিতে অনার্স করে ব্যাঙ্কে ক্লার্ক-কাম-ক্যাসিয়ার পদের চাকুরে। কলকাতার অফিস করবে আর এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে, এমন কোনও সদিচ্ছা তার নেই। বউ কলকাতারই মেয়ে। বিয়ে হয়ে অব্দি একটা আইঢাই অবস্থা তার মনে। অতএব পায়ে পাথর বাঁধার মতো বাপ-মায়ের দায়িত্ব দেবে, এতটা বোকা সে নয়।

তবু বাবা-মায়ের দায়িত্ব তো একটু কিছু নিতেই হবে। সবিশেষ চিন্তা-ভাবনা করে প্রথমেই তিন ভাই একমত হল যে বাবা-মা দুজনকেই একসঙ্গে বিয়ার করা অনেক খরচ সাপেক্ষ। কেন না, জ্যেষ্ঠের পুত্রটি কলকাতায় থেকে বি.এ. পড়ছে। মেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে। মধ্যমের পর পর দুটি মেয়ে। একটি এবারেই মাধ্যমিক দেবে। অন্যটি ক্লাস এইটে। কনিষ্ঠের এখন তিন বছরের একটি মাত্র পুত্র বটে, কিন্তু কলকাতার আশপাশে জায়গা কিনে বাড়ি করা চাট্টিখানি কথা নয়। অতএব তিনজনেরই এখন সঞ্চয়ের মারাত্মক প্রয়োজন।

তাই সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, এক-এক মাসে এক-এক পুত্র বাবা কিংবা মা, যে কোনও একজনের দায়িত্ব নেবে। এবং এটা রোটেশনালি ঘুরবে। অবশ্য বাবার চারটি পুত্র থাকলে এ-হিসেবটি পূর্ণসংখ্যায় হত। কিন্তু যেহেতু তিনপুত্র, ট্যাঙ্গুলার ক্রিকেট সিরিজে একটি টিমকে পর পর দুদিন খেলার মতো, একটি পুত্রকে পর পর দুমাস দায়িত্বটা নিতে হবে। এবং আরও ঠিক হল, এ মাসে বাবার দায়িত্ব নেবে জ্যেষ্ঠ এবং মা থাকবে মধ্যমের কাছে। সামনের মাসে মা কনিষ্ঠের কাছে চলে আসবে এবং বাবার দায়িত্ব নেবে মধ্যম। তার পরের মাসে মা জ্যেষ্ঠের কাছে চলে আসবে এবং কনিষ্ঠ নেবে বাবার দায়িত্ব।

হিসেবটি সম্পন্ন করে তিন পুত্র যখন বাবা-মাকে জানাল, পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই বাবা এবং আটান্নর মা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনপুত্রের মুখগুলি একবার দেখলেন। কিছু বলতে পারলেন না। তবু জ্যেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা রাজি তো?'

খানিক সময় নিয়ে বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, রাজি। রাজি না হলেতো না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। আমাদের আরও অনেকদিন বাঁচতে বড় ইচ্ছে হয়।'

মধ্যমপুত্র বলল, 'কাল ইংরাজি মাসের পয়লা। কাল থেকেই তাহলে এ ব্যবস্থাটা চালু হবে।'

'আচ্ছা।'

'এ-মাসে তুমি দাদার কাছে খাবে, আর মা আমার কাছে।'

'ঠিক আছে।'

পুত্ররা চলে গেল। মা এবার বললেন, 'তুমি রাজি হলে?'

'না হয়ে উপায় কী বলো।'

'তা বলে বুড়ো বয়সে আমাদের আলাদা খেতে হবে।'

'আলাদা!'—শব্দটার ভয়াবহতায় চমকে উঠে পরক্ষণেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বাবা।—'তাইতো, আলাদাই তো বটে। এটা তো আগে ভাবিনি। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দেখছি পৃথগন্ন হয়ে গেলাম।"

'তুমি হাসছ!'

'না হেসে কী করি বলো। সামান্য একটা দোকান চালিয়ে যে-ছেলেদের বড় করলাম, লেখাপড়া শেখালাম, বিয়ে দিলাম, তারা আজ আবার ছেলেমেয়ের বাবাও হয়েছে, সেই তারা যে এমন নির্বোধ, এমন নির্লজ্জ হবে, তুমি জানতে?

'এসব দেখে হাসি আসবে না তো কী আসবে বলো।'

'তুমি হাসো। আমি কিন্তু মানি না এসব।'

'কী করবে?'

'বলব, আমাদেব খাওয়াতে-পরাতে যে খর্চা তোরা ধার্য করেছিস, ফেলে দে। আমরা যা পারি, করব।'

'এ তো এক রকম ভিক্ষে নেওয়া। তুমি ভিক্ষে নেবে?'

মাকে এবার বড় কাতর দেখাল। মাথাটা নুয়ে এল বুকের উপরে। আর নীরবে মাকে দেখতে লাগলেন বাবা। চুল সব সাদার দিকে। মাথা ভর্তি একরাশ পিঠ ছাপানো চুল ছিল মনুর। আজও প্রায় তেমনি। সাদাব মাঝে লাল সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে সিঁথি জুড়ে। ফর্সা কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ। বড় করে টিপ পরাটা ওর বরাবরের অভ্যেস। মানায়ও ওকে। টিপটা দেখতে দেখতে এক লহমায় বাবা চলে যান অনেকটা অতীতে। ছেলেরা তখন কেউ হয়নি। মনুর সঙ্গে তখন নানান দুষ্টুমি। মাঝে মাঝে টিপের উপর কপাল চেপে ধরে সিঁদুবের গোল ছাপ নিতেন নিজের কপালে। মা বলতেন, 'ই মা, লোকে দেখলে কী বলবে গো।'

হাসতে হাসতে বাবা বলতেন, 'বলবে না কিছু। শুধু ভাববে, কাল রাতে বউ খুব ভালোবেসেছে।'

'ধ্যাৎ।'

মায়ের লজ্জা দেখতে-দেখতে বাবা বলতেন, 'জানো তো, রাধিকার কুঞ্জ থেকে ফেরার পরেও-না কৃষ্ণের সারা মুখে, বুকে সিঁদুর আর কুমকুমের দাগ দেখা যেত।'

মা ঠোঁট চেপে হাসি চাপতেন, 'তুমি দেখেছ?'

'দেখতে হবে কেন। সব বইতেই লেখা আছে। জানো তো, আমার চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি দুষ্টু ছিল তোমাদের ওই কৃষ্ণ।'

মা খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়তেন। আর সেই অবসরে বাবা—

মুখ তুলে মা বলে উঠলেন, 'আমি কী করে ভাত তুলব বলো তো মুখে। কোনও দিন—'

গলা ধরে এল মায়ের। দু'চোখ ছলছল করে উঠল। বাবা তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। কী বলতে গিয়ে মা থেমে গেলেন, তা তিনি জানেন। তাঁকে ছাড়া যে কোনও দিন খায়নি মনু। কী দুপুর, কী রাত্রি অপেক্ষা করে বসে থাকত। পুজোর সময়, কেনাকাটার যখন ধুম লাগত খুব, দোকান বন্ধ করে তাঁর বাড়ি ফিরতে-ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে যেত। সমস্ত পাড়া ঘুমিয়ে পড়ত। তবু জেগে বসে থাকত মনু। তিনি ফিরতেন, কলতলায় গিয়ে বালতি বালতি জল ঢেলে গা ধুতেন, তারপর খেতে বসতেন। মনু থালার মাঝখানে চুর করে ভাত সাজিয়ে এগিয়ে দিত। দু-চার গ্রাস খাওয়ার পর তবে সে হাত দিত নিজের ভাতে।

ডানহাতটি বাড়িয়ে মায়ের মাথায় রাখলেন বাবা। গাঢ় স্বরে বললেন 'মনু' কত রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এতদিন এসেছি, ভাবো তো। মনে করো না, এটাও একটা সেই রকম অবস্থা। আগে থেকেই এমন করে ভেঙে পড়ছ কেন।'

মা আর কিছু বলতে পারলেন না। বাবার এই রকম কথায়, সেই প্রথম থেকেই মা কেমন যেন ছোট্ট মেয়ের মতো হয়ে যান। বাবার হাতটি দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর ধীরেধীরে মাথাটি হেলিয়ে দিলেন বাবার বুকের উপর।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। আজ থেকে মানুষটা বড়ছেলের ওখানে যাবেন আর তিনি মেজ ছেলের কাছে। কিন্তু চায়ের ব্যবস্থাটা? সেটা নিয়ে তো কেউ কিছু বলেনি! ঘুম ভাঙলেই ওনার চা চাই। প্রতিদিন তাই জল চড়িয়ে ওনাকে ডাকতেন তিনি। বড় একটা কাপে অনেকটা সময় নিয়ে তিনি চা খাবেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকবেন।

কী করবেন, রাগ করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না মা। সকালের এই চায়ের রীতিটা এ-বাড়ির বরাবরের। বিয়ে হয়ে এসে অব্দি তিনি দেখছেন। এই সেদিনও ছেলেদের ডেকে তুলেছেন চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে। তারপর বৌমারা এসেছে। মেজ, ছোট আলাদা আলাদা রান্নাঘর বানিয়ে নিয়েছে। সেই থেকে চায়ের ব্যবস্থাটা যার যার, তার তার। শুধু বাড়ির মূল রান্নাঘরটা ব্যবহার করে বড় বৌমা। এত ভোরে ওরা ওঠে না বলে কাল পর্যন্ত তিনি সেখান থেকেই চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ ঢুকতে কেমন কুণ্ঠা হল মায়ের। কালও যা নিজের ছিল, আজ মনে হল পরের।

পাশ-বালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরলেন বাবা। ঘুম ভেঙে যাবে নাকি মানুষটার! তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মা। বাড়ির কেউ এখনও ওঠেনি। চারপাশে পাখিরা খুব ডাকাডাকি করছে। হালকা একটা বাতাস বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝির করে। বারান্দা পেরিয়ে বড় বৌমার রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন মা। তবু দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আজ থেকে উনি বড়ছেলের কাছে খাবেন। সে-হিসেবে চা-টা ওনার প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর কি খাওয়া উচিত?

একা একা চা উনি খান না। তাঁকেও বসতে হয় কাপ হাতে। সকাল-বিকেল ওনার এই বিলাসিতাটা তাঁকে মানতেই হয়। এমনকী কোনও ব্রত উপলক্ষে উপবাসের দিনেও রেহাই দেন না। বলেন, চা খেলে উপবাসের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। বরং উপবাসের দরুণ শরীরে যে অবসন্নতা জমে, তা দূর হয়ে যায়।

কী করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না মা। ঠিক তখনি বাইরে বেরিয়ে এলেন বাবা। মাকে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝি একটু অবাকই হলেন, 'কী হল?'

খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন মা।—'তুমি উঠে পড়েছ! তোমার চা—বড় বৌমা—'

সদ্য ঘুম থেকে উঠে তাঁদের নতুন নিয়মটা খেয়াল ছিল না বাবার। খেয়াল হতেই একটু মুচকি হাসলেন, 'ও, আজ থেকে তো আমরা পৃথগন্ন। তা তোমাকে অত হানটান করতে হবে কেন। ওরা উঠুক-না। চায়ের ব্যবস্থা ঠিক একটা হবেই। নতুন নিয়মে প্রথম প্রথম তো একটু-আধটু অসুবিধে লাগবে।'

মা ঘরে ঢুকে এলেন। মশারি খুলে বসে রইলেন বিছানায়। চোখে-মুখে জল দিয়ে ফিরে এলেন বাবা। মা বললেন, 'আজই একটা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এসো।'

গামছায় হাত-মুখ মুছতে-মুছতে মাকে দেখলেন বাবা। তাঁর ভিতরের কষ্টটা বুঝতে পারলেন। এও বুঝলেন, সহানুভূতি দেখালেই মনুর কষ্টটা দ্বিগুণ হবে। বললেন, 'তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ বলো তো। একটু দাঁড়াও-না। সত্যি বলছি, চায়ের জন্যে আমার খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না।'

মা চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। নীরবে বালিশগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

তক্তপোষের মুখোমুখি একটা চেয়ার। তার পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলে টিভি, জলের গ্লাস, আরও কিছু টুকিটাকি। বাবা চেয়ারটাতে বসলেন।

অন্যান্য দিন এতক্ষণ মনু চা খাওয়া শেষ করে উঠোন ঝাঁট দিতে চলে যেত। ঝাঁটার শব্দ বেয়ে শিশির ভেজা ধুলো, শুকনো পাতার একটা গন্ধ ভেসে আসত নাকে। আজ এই সবেরই অভাবে বাবা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, একটা সুরে অন্তত গোটা সংসারটাকে বেঁধে রেখেছিল মনু। সেটাই আজ ছিঁড়ে গেছে। সুর যে বাঁধে, সুর ছেঁড়ার যন্ত্রণাটা তাকেই যে বেশি করে লাগে।

'বাবা, আপনার চা।'

এক কাপ চা হাতে বড় বৌমা ঘরে ঢুকে এল। টেবিলের উপর কাপটা রেখে নিঃশব্দে

বেরিয়ে গেল ফের।

মায়ের সামনে এক কাপ চা বাবাকে বড় কুঁকড়ে দিয়ে গেল। লজ্জায় মায়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না। পাছে চোখ চলে যায়, সে-ভয়েই যেন জোর করে চোখ নামিয়ে আনলেন কাপের উপর। সকালের প্রথম চা-টা তিনি বরাবরই লিকার খান। বৌমা দুধ-চা করেছে। পাশে দুটো থিন এ্যারারুট।

বালিশ, মশারি গুছিয়ে মা নেমে এলেন।

'তুমি চা খাও। আমি এতক্ষণ ঝাঁটপাট দিইগে। বেলা অব্দি বাসি ঘরে লক্ষ্মী থাকে না।'

বাবা এবার চোখ তুললেন। অপমানে কণ্ঠ বোধ হয় ভারী হয়ে যায়। বললেন, 'তুমি বলো।'

বাবার কথাকে কোনও দিনই মা অমান্য করতে পারেন না। কখনও কখনও অনেক অসুবিধে, অনেক কষ্ট স্বীকার করেও মেনে নিয়েছেন। তক্তপোষের এক কোণে পা ঝুলিয়ে বসলেন।

'কিছু বলবে?'

'না।'

'তবে!'

বাবা কোনও জবাব দিলেন না আর। বাঁদিকের জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সকালের প্রথম রোদ্দুর এসে পড়েছে কিশোর আমগাছটার মাথায়। দুটো শালিক এসে বসল তার ডালে। একটা কাক কা-কা করতে করতে উড়ে গেল। তার পায়ের ঝাঁকুনিতে সরু ডালটা কাঁপছে।

'চা খাও-না। ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

বাবা এবারও কোনও জবাব দিলেন না। মা এগিয়ে এলেন, 'কী হল তোমার?'

'কিছু না। তুমি বসো।'

'ঠাকুমা। তোমার চা এখানে দিয়ে যাব?—মেজছেলের বড় মেয়ে দরজার সামনে।

'না। আমি যাচ্ছি, চল।...কিছু বলবে?'

'না। তুমি যাও।'

মা চলে গেলেন। বাবা তবুও চুমুক দিতে পারলেন না চায়ে। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তিনি বাবা বলেই নতুন এই ব্যবস্থাতেও খুব একটা অসুবিধে কেউ ঘটাবে না তাঁর। অন্তত পিছনে যাই বলুক, সামনাসামনি একটা তোয়াজের ভাব দেখাবে সবাই। কিন্তু মনু?

দুচোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন বাবা। হাত দুটো দুপাশ থেকে আলতো করে বুকের উপর ফেলা। দুপুরে তিনি এই ভাবেই শুয়ে থাকেন।

মা ঘরে ঢুকে বিছানায় উঠে এসে পাশে বসলেন। একটু ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে?'

চোখ খুললেন বাবা, 'কেন?'

'কী দিয়ে ভাত খেলে?'

বাবার ঠোঁটে হালকা একটা হাসি ছুঁয়ে গেল।—'কেন, তরকারি পছন্দ না হলে মামলা করবে নাকি।'

'ধ্যাৎ। বলো-না।'

'তুমি তো গিয়ে একবার দেখে আসতে পারতে।'

'খুব ইচ্ছে করছিল, জানো। কিন্তু কেমন যেন একটা বাধো-বাধো ঠেকল।'

'বাধো-বাধো! কেন?'

'কী জানি।'

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। দু'চোখ থেকে তাঁর কৌতুক উঠে গেল। বুঝলেন, অতিসূক্ষ্ম একটা আড়াল ছেলেরা তুলে দিয়েছে তাঁদের দুজনের মধ্যে।

মা বললেন, 'যাইনি বলে রাগ করেছ?'

'না।'

'তাহলে বলো, কী দিয়ে খেলে।'

'আলু-পটলের একটা ঝোল করেছিল। পুঁইশাকের চচ্চড়ি, আমের—'

'মাছ ছিল না?'

'না। বড় বৌমা বলল, টিউশানি ছিল। তাই বাজার যাবার সময় পায়নি।'

বাবার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন মা। মাছ ছাড়া মানুষটা ভাত খেতে পারে না। সুশান্ত জানে। তবু প্রথম দিনটা একবার বাজার যেতে পারল না! আসলে একটু কৃপণ স্বভাব আছে ছেলেটার।

'তাহলে তো পেট ভরেনি তোমার, কী গো।'

বাবার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন মা। বাবা দুহাতে আলতো করে চেপে ধরলেন মায়ের হাতটি, 'না, ভরেছে। তোমার বড় বৌমার রান্নার জাত তো বেশ ভালো।'

'ভালো, না আরও কিছু। তার চাইতে মেজ বৌমা অনেক ভালো রাঁধে।'

'কী রাঁধলে আজ, মেজবৌমা?'

বলতে গিয়েও থেমে গেলেন মা। প্রশান্ত বরাবরই একটু খাওয়া-ধুড়কো। একদিনে মাছ, মাংস, ডিম হলেও তার আপত্তি নেই। আজ মাংস এসেছিল। শেষ পাতে আবার দই। নিরামিষ খেয়ে আসা মানুষটাকে সেসব বলবেন কী করে।

'কী গো, বলো।'

'এবার ঘুমোও তো তুমি। দুপুরে একটু না ঘুমোলে, বিকেলে আবার বলবে, গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

'কথা ঘুরোচ্ছ? আমি কিন্তু মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছিলুম।'

মা উঠে পড়লেন। চোখ দুটো জ্বালা করে জল চুয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন উঠোনের কলতলায়।

রাত্রে খেতে বসে মা বললেন, 'বৌমা, এবেলা আমাকে আর মাংস দিও না!'

'কেন মা?'

'ওবেলারটাই হজম হয়নি এখনও। গলা-বুক জ্বালা করছে। পেটটা কেমন ভার ভার।'

'কী দিয়ে খাবেন তবে। আর তো কিছু করিনি।'

'দই-টই একটু নেই? খাব তো এ মুঠো।'

'সেকী! আপনার ছেলে শুনলে আবার রাগ করবে। খান-না কিচ্ছু হবে না। ঘরে এ্যান্টাসিড, এনজাইম সবই আছে। খাইয়ে দেবেখন আপনার নাতনি।'

'না বৌমা। শুধু শুধু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে লাভ নেই।'

মায়ের এই অভিনয়টা ধরার সাধ্য মেজবৌমার নেই। কিন্তু এই অভিনয়টাই সত্যি হয়ে গেল সাতদিন পর। শরীর তাঁর ব্যস্ত হলই। তার পর মাছ, মাংস, ডিম, সেইসঙ্গে রান্নার বড্ড বেশি তেল-মশলা সহ্য হল না মায়ের পেটে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়ার কিছু গোলমাল হয়েছিল নাকি?'

মা ঘাড় নাড়লেন।

'তাহলে! এই কদিন তো তুমি ঝোল-ভাত-খাচ্ছ বললে।'

মা কোনও জবাব দিলেন না। পাশ ফিরে চোখ বুজিয়ে ফেললেন।

'তোমার ওষুধ এনেছি, মা। ওঠো। খেয়ে নাও।'—মেজছেলে ঘরে এল। পাঞ্জাবির পাশ-পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট আর একটা ক্যাপসুলের পাতা বের করে টেবিলে রাখল।

'একটা একটা করে তিনটেই খাইয়ে দাও, এখন।'

বাবা বললেন, 'এ্যালোপাথ নিয়ে এলি কেন আবার। তোর মা তো বরাবর হোমিওপ্যাথ খায়।'

'ওসব হোমোপ্যাথি ফোমোপ্যাথি ছাড়ো তো। ওতে আবার অসুখ ভালো হয়।'

মেজছেলে আর দাঁড়াল না। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাবা। তাঁদের ওষুধ খাবার স্বাধীনতাও তাহলে চলে গেল! মেজর বিশ্বাস এ্যালোপ্যাথিতে। মনুকে তাই এ্যালোপ্যাথি খেতে হবে। এর পরের মাসে মনু যাবে ছোটছেলের কাছে। তাঁর বিশ্বাস কীসে? যদি আয়ুর্বেদিকে হয়, তবে কি মনুকে এসব ওষুধ ফেলে দিয়ে আয়ুর্বেদ খেতে হবে? বড়র আবার হোমিওপ্যাথে বিশ্বাস। তখন আবার সে হোমিওপ্যাথ খাবে?

মশারির ভিতর ঢুকে ওপাশে যেতে গিয়েও মা থমকে গেলেন সেদিন। সবুজ রঙের একটা নাইট ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। ফ্যানের হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে মশারিটা। তারই ফলে বাবার মুখে একটা আলো-ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আর তাতেই কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছিল বাবার মুখটা। মা তাকিয়েছিলেন সেদিকেই। তখনি চোখ তুললেন বাবা। মাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

মায়ের ডানহাতটা উঠে গেল বাবার বুকে। আলতো করে বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ।'

'না-না, ও তোমার দেখার ভুল।'

'দেখার ভুল! এতদিন ধরে দেখছি, কোনও দিন ভুল হয়নি, আজই হয়ে যাবে!'

বাবা কোনও জবাব দিলেন না। দুচোখ বুজিয়ে ফেললেন ফের। মা বললেন, 'আসলে

সুশান্তর কাছে তোমার খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি।'

'না গো। পেট ভরেই তো খাই। আজ সুশান্ত মাছ কিনেছিল।'

'সপ্তাহে একদিন মাছ খেলে কি আর শরীর টেকে! আর দেয় তো তোমার বাড়ির মতো একটা পিস। সেদিন তো দেখলাম।'

বাবা চুপ করে গেলেন। এতদিনের মধ্যে শুধু ওই একদিনই তাঁর খাবার সময়ে মনু গিয়ে পড়েছিল। তাও একটা কাজের ছুঁতোয়। সেদিন সকালেই বাবা বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে তো যেতে পারো। ও তো একদিন তোমারই রান্নাঘর ছিল।'

মা বলেছিলেন, 'আজ আর নেই। তাছাড়া যাওয়াটা ভালো দেখায় না।'

'কেন?'

'আমি যদি ওখানে খেতাম, তাহলে একটা কথা ছিল। এমনি এমনি গেলে হয়তো ভাববে, তোমাকে কী খেতে দিচ্ছে, না দিচ্ছে, আমি তার হিসেব নিতে গেছি।'

বাবা আর কিছু বলতে পারেন নি। তবু বাবার ইচ্ছে রাখতেই মা গিয়েছিলেন। আর সেদিনের পর থেকে 'কী দিয়ে আজ খেলে'—এ প্রশ্নও করেননি কোনও দিন।

মা এবার স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'বুড়ো মানুষ, রাত্রে এক কাপ করে দুধও দিতে পারে না!'

'থাক। ওসব কথা বোল না।'

'কেন বলব না! ওর ঘরে আদসের করে দুধ আসে-না।'

'সে তোমার নাতনি খায়। সুশান্তরও তো লো প্রেসার।'

'তোমার লো প্রেসার নয়? সেবার ডাক্তার বললে, প্রেসার লোয়ের দিকে। খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু নজর দেবেন।'

'থাক-না ওসব। শরীর তো এখন আমার ঠিকই আছে।'

'মুড়ো খেতে কত ভালোবাসো তুমি। কী সুন্দর করে খাও। একদিনের জন্যেও বড় বৌমার মনে হল-না।'

প্রসঙ্গ ঘোরাতে বাবা বললেন, 'ছোট বৌমা আজ ফিরল, না?'

'হুঁ।'

'মাস শেষ হতে আর কদিন আছে বলো তো?'

'চারদিন।'

'এবার তোমার ছোটছেলের কাছে পালা। আমি খাব মেজছেলের কাছে।'

মা চুপ করে রইলেন। বাবা বলে চললেন, 'প্রশান্তরা তো ভালো খাওয়া-দাওয়া করে। দেখবে, ওমাসে আমার জন্যে তোমার আর কোনও আফসোস থাকবে না।'

মা এবারও কোনও কথা বললেন না। বাবা আবার বললেন, 'ছোট বৌমা কলকাতার মেয়ে। শিক্ষিতা। তোমারও অসুবিধে হবে না।'

'আমার এসব ভালো লাগছে না।'

মায়ের গলায় কান্না ছুঁয়ে গেল। বাবা ঝপ করে তাকালেন মায়ের মুখের দিকে। হালকা আলোয়, মশারির কমপনে বড় বিপর্যস্ত লাগছে মায়ের মুখ। কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা জোগাল না বাবার মুখে। ফ্যানের ফরফর শব্দ শুধু ভারী হয়ে চেপে বসতে লাগল

ঘররে মধ্যে। খানিক পর বাবা তাকালেন, 'মনু—'

মায়ের দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে এল গালে। বাবা এবার উঠে বসলেন মায়ের মুখোমুখি। ডানহাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, মনু?'

চোখের উপর আঁচল চেপে মা চোখ মুছলেন। অনেকটা সময় নিয়েই মুছলেন। বুঝিবা শান্ত করে নিলেন নিজেকে। তারপর বললেন, 'জানো, শেষ বয়সে আমার বাবা বাড়ি বাড়ি টিউশানি করতেন। এছাড়া তখন উপায় ছিল না। দাদাও দাঁড়াতে পারেনি। একদিন রাত্রে ফিরে এসে বললেন, আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবা একটা যন্ত্রণা চাপছেন, অপমানের যন্ত্রণা, বললেন, জানিস খুকু, টিউশানিও উঞ্ছবৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তিতে কোনও সম্মান নেইরে।

বাবা তাকিয়ে রইলেন, মায়ের মুখের দিকে। মা এবার তাঁর হাত দুটো রাখলেন বাবার পায়ে। বললেন, 'মাসে মাসে তুমি এক ছেলের কাছে যাচ্ছ, আর আমি এক ছেলের কাছে। এও তো উঞ্ছবৃত্তি। এমন করে খেয়ে বেঁচে থাকার কোন সম্মান আছে?'

চোখ নামিয়ে নিলেন বাবা। সম্মান যে নেই, তা তো তিনি জানেনই। অপমানে তাঁর ভিতরটাও কি জ্বালা করেনি। তবু বললেন, 'কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রদের ছায়াতেই তো থাকতে হয়, মনু।'

'তা বলে বাপ-মাকে ওরা ভিন্ন করে দেবে? ওরা জানে না, এ পাপ? ওরাও তো স্বামী-স্ত্রী হয়েছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন। মা বলে চললেন, 'আমরা দুজন যেন ওদের হাতের বল। একবার এ ছুঁড়ছে ওর হাতে। ও ছুঁড়ছে তার হাতে। আমাদের মন, ইচ্ছে, অনিচ্ছে বলে কিছু নেই?'

মায়ের ভিতর থেকে একটা শক্তি এবার ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, স্পষ্ট টের পেলেন বাবা। এই শক্তিটাকে খুব ভালো করে তিনি চেনেন। জীবনে অনেকবার এই শক্তিই তাঁকে পার করে দিয়েছে, এগিয়ে দিয়েছে। ব্যবসাটা শুরু করার সময়, এই বাড়িটা করার সময়, প্রাচীর দিতে গিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়ার সময়, ভাব-ভালোবাসা করে বাড়িতে না জানিয়ে অনন্ত যখন বিয়ে করে নিয়ে এল, সেই সময়। কোনও বারই মনু হেরে যায়নি। হারতে দেয়নি তাকেও।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে বলো, তুমি। কিছু ভেবেছ?'

মা এবার সরাসরি তাকালেন বাবার দিকে। বললেন, 'ওদের দয়ায় আমরা আর থাকব না। আমাদের দয়া করার ওরা কে? কেউ যখন আমাদের দুজনের একসঙ্গে দায়িত্ব নিতে পারবে না, তখন আমরা নিজেদের মতো করে আলাদা থাকব।'

'আলাদা!'

'হ্যাঁ। শাক-ভাতও তো জুটবে। তবু তো আমরা একসঙ্গে থাকব। একই রকম সুখ-দুঃখ পাব।'

মায়ের এই কথায় দারুণ এক সুখের অনুভূতি হল বাবার। সেই সুখে তাঁর দু'চোখে প্রায় জল এসে যাবার উপক্রম হল। তখুনি তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষের জীবনে কোনও কিছুই ঈশ্বরের অভিশাপ নয়, সব কিছুই তাঁর আশীর্বাদ। এমন পরিস্থিতি না এলে

তাঁদের দুজনের যে এমন নতুন করে দুজনকে চিনতে বাকি রয়ে যেত। তবু বাবা বললেন, 'সেই শাক-ভাতও কী করে জুটবে, মনু?'

'কেন?'—এক গভীর স্বর উঠে এল মায়ের ভিতর থেকে, 'তুমি আবার নতুন একটা কিছু শুরু করতে পারবে না? আমাদের বিয়ের পরে পরে যেমন শুরু করেছিলে তোমার ব্যবসাটা, আমার নামে—মনোরমা স্টোর্স! সেই রকম একটা কিছু করো-না, দি নিউ মনোরমা!'

'দি নিউ।'

'হ্যাঁ, একদম নতুন। পারবে না?'

'পারব, পারব মনু।'

ভীষণ একটা খুশি দুরন্ত গতিতে তখন ছুটে গেল বাবার শরীর বেয়ে। নবীন এক ঘোড়ার মতো। আর সেই আবেগেই বাবা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন মাকে। অনেক অনেক—অনেকদিনের পর, অনেক-অনেক-অনেকদিন আগের সেই দামাল মানুষটার মতো বাবা মায়ের কপালে কপাল চেপে সিঁদুর-টিপের ছাপ নিয়ে নিলেন।

মা বললেন, 'ই মা, লোকে দেখলে কী বলবে গো।'

বাবা বললেন, 'কিছুই বলবে না। শুধু ভাববে, কাল সারারাত বউ ভালোবেসেছে খুব।'

নির্জনে এক নদী

লীনা চাকী

ট্রেনে জানলার ধারে বসে ময়ূরী। হাওয়ায় এলোমেলো সাজানো পরিপাটি চুল। ও দু'হাতে কপাল, গাল থেকে চুল সরাতে সরাতে বলে—এবারে একটা নদী আসছে।

স্বরাজের ইচ্ছা সিগারেট ধরানোর। প্রবল হাওয়ায় চারটে দেশলাই কাঠি নষ্ট হয়েছে। জানালার দিকে পাশ করেমাথা নিচু করে আবার সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে এবং সফল হয়।

সজোরে দুটো টান মেরে ও বলে—তোমার দেখছি সব মুখস্থ!

ময়ূরী গ্রীবা ঘুরিয়ে হাসে—কতবার এলাম বল তো?

স্বরাজ ওকে ঘন দৃষ্টিতে এক পলক দেখে বলে—অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আরে আমরা যাচ্ছি তো ওখানে!

—বা রে, উত্তেজিত হব না? তুমি সঙ্গে যাচ্ছ। কত কষ্ট করে রাজি করালাম তোমাকে। গিয়ে যদি দেখি কাত্যায়ন রুখা শুখা। নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে?

—তাতে কি? প্রকৃতির নিয়মে তো সে বাঁধা।

—না, না, কাত্যায়নের নিজস্ব কিছু আচরণ আছে। ও চাইলেই ঝড় আনতে পারে। ওর শরীরের সঙ্গে মেঘের কণা মেশামেশির খেলা খেলতে পারে।

গত ছ'মাস ধরে এই ময়ূরীকে ছুঁতে পারছে না স্বরাজ। মেয়েটা অনেক কথা বলে। নানা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। কিন্তু সেই মেয়েই তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে একটা নদীকে। মায়ামহল নামে এক গ্রামের নদীটা কেমন ওদের মাঝখানে ঢুকে ময়ূরীকে অচেনা করে দিচ্ছে।

দুর্গাপুরে ট্রেন থেকে নেমে গাড়ি এবং বিয়ার—দুটোই খোঁজ করে স্বরাজ। অনেক দরাদরি করে গাড়ির ব্যবস্থা হয়। বিয়ারেরও। দুর্গাপুর ব্যারেজ আসার আগেই দাঁত দিয়ে ছিপি খোলে স্বরাজ।

ব্যারেজ পার হওয়ার পরে ময়ূরী সামান্য পান করে।

স্বরাজ বলে—তোমার গোঁসাই বাবাজীর আশ্রমে থাকবে নাকি?

—না হলে যাব কোথায়?

—কেন? দুর্গাপুরে ফিরে কোনও হোটেলে থাকব।

—এমা, তাহলে নদী দেখবে কখন?

—সারারাত কি আমরা নদীব ধারে থাকব? তা অবশ্য মন্দ হয় না। বেশ জমবে ব্যাপারটা।

ময়ূরী হাওয়ায় কথা ভাসিয়ে দেয়—তেমন যদি চাই তুমি তাহলে কতক্ষণ আমাকে সহ্য করতে পারবে?

—মানে?

ময়ূরী কেমন রহস্য করে বলে—মানে, আমি যদি সারারাত নদীর চরে শুয়ে থাকতে চাই? যদি শুধু নদীর কথাই বলি, কিংবা নদীরই গান গাই?

স্বরাজ ওর দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরে। ময়ূরী ঝকমকে চোখে বলে—এবারে একটা জঙ্গল পড়বে। শালের জঙ্গল। লাল মাটি। এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া রাস্তা। উইঢিবি। আর কী নির্জন!

স্বরাজ ওর কনুই ধরে কাছে টানে ময়ূরী বাধা দেয় না। সিটে মাথা এলিয়ে বলে—নামবো কিন্তু।

—কেন?

—লাল মাটির রাস্তা ধরে একটু হাঁটবো প্লিজ।

নামা হয়। ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করায় এমন জায়গায় যেখানে জঙ্গল বেশ ঘনই। আর লাল মাটির রাস্তাও আছে। ময়ূরী এলোমেলোভাবে ঘোরে গাছের তলায় তলায়। উঁচু ঢিবির ওপর লাফিয়ে ওঠে। স্বরাজ ওকে দেখে কিন্তু যোগ দেয় না। কলকাতায় এই মেয়েটা গম্ভীর মুখে রাস্তা পার হয়। দরাদরি করে শাড়ি কেনে। কফি হাউসে টেবিল চাপড়ে গম্ভীর কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক করে। গত ছ'মাসে অবশ্য মেয়েটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তার মধ্যে চারবার এসেছে ওই মায়ামহল গ্রামে এই বৈষ্ণবগুরুর কাছে তত্ত্ব জানতে। বৈষ্ণবতত্ত্ব জানতে চায় ময়ূরী এই সময়ের বৈষ্ণবগুরুদের কাছ থেকে। সে কারণেই দল বেঁধে রামকেলীর মেলায় যাওয়া আর সেখান থেকেই মায়ামহল গ্রামের বাবাজির ঠিকানা পাওয়া। সেখানেই কাত্যায়ন নামের এক নদীকে দেখা। যার কথা বলতে গিয়ে ময়ূরীর ঠোঁট কাঁপে, বারেবারে চিবুকে হাত রাখে যা হোক কিছুর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে স্বরাজ যদি নদীর গল্প না শোনে তাহলে চোখে জল এসে যায়। সেই নদীকে দেখতে আসা আর এই ময়ূরীর সঙ্গে দু'দিন নিভৃতে থাকবার ইচ্ছা। এখন বেশ লাগছে ময়ূরীকে দেখতে।

নরহরি দাসের আশ্রম গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে কাত্যায়নের ধারে। নির্জনবাস করবেন বলে প্রায় তিরিশ বছর আগে এসেছিলেন এখানে। তখন কাত্যায়নের শরীরে ঢোল কলমীর মত ডাঁটো যৌবন। গহীন ছিল না। কিন্তু বর্ষায় জাগত অহঙ্কারী পুরুষের মত। দুইকূলের গাছপালার শিকড় ধরে টানাটানি করত। এই কাত্যায়নকেও নিয়তি মানতে হল তার উৎসমুখ সেই দূরের অযোধ্যা পাহাড়ের গা ধুয়ে পা ধুয়ে বয়ে আনত বালি, নুড়ি। তারাই শত্রুতা করল। রাশি রাশি বালি প্রথমে নদীর ছলছলানি কলকলানি বন্ধ করল। তারপর জাগল চর। কাত্যায়নকে দমন করে তাকে করে দিল শীর্ণ। হেরো পুরুষের মত বালির স্তূপের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলল নদীটা।

প্রথমবার কাত্যায়নের ধারে দাঁড়িয়ে এ গল্প শুনতে শুনতে বড় করে শ্বাস ফেলেছিল ময়ূরী। গোঁসাই আশ্রমে নীল জলে হাত পেতে বলেছিল—ভরা পূর্ণিমাতেও তুমি জাগো না?

পরে কোন এক পূর্ণিমার রাতে ময়ূরী এসেছিল। অঝোরে বৃষ্টি সারাদিন। আর রাতে ঝকঝকে নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। ময়ূরী এসে দাঁড়িয়েছিল কাত্যায়নের কাছে। জলের মধ্যে চাঁদ ডুব মেরেছিল। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। ময়ূরী স্পষ্ট দেখেছিল

কাত্যাযন জেগেছে। ও ছোট্ট মেয়েব মত জলে পা দাপাচ্ছিল, আঁজলায় করে জল ছেটাচ্ছিল। অবগাহন করেছিল অনেকক্ষণ ধরে। মোহন-নদীর সৌন্দর্য সম্ভোগ করতে কবতে মযূবী ফিসফিসিয়ে বলেছি , 'কাত্যায়ন, চাইলে আজও তুমি জাগতে পারো।' আর কী আশ্চর্য! ও কেমন প্রথম রমণক্লান্ত নারীর মত ফিরেছিল আশ্রমে।

কলকাতায় ফিরে স্বরাজকে বলতে পাবেনি সে কথা। ও কোনওভাবেই ওই নিভৃত যাপনটুকু ব্যাখ্যা করতে পারত না। সাত বছরের সম্পর্ক যে পুরুষটির সঙ্গে তাকে শুধু নদীর গল্পই শুনিয়েছিল। ও নিজেই বুঝতে পারে না নদীটা কী করে ওর সঙ্গী হয়ে গেছে। যাকে সারাক্ষণ মনে পড়ে, মন খাবাপ করে। যার কথা ও একা একা ভাবতে চায়। আর প্রতি পূর্ণিমার রাতে হস্টেলের জানালার গরাদে গাল ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলে— 'তুমি কি জেগেছ কাত্যায়ন?'

সব শুনে বিস্মিত মালা চলেই এসেছিল। ঠিকযে সময বৈকালিক রোদ গাছের মাথায় মাথায হলুদ হতে থাকে, তেমন সময়ে ওরা দুই বন্ধু জলে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাঁটু পর্যন্তই জল। যে জল ঠাণ্ডা আর তাতে তিরতিরে স্রোত। কোথা থেকে এল একটুকরো ছাইরঙের মেঘ। সেটা কালো হল, ছড়াল পশ্চিম দিগন্তে। যেখানে জলপায়ের গোছ পর্যন্ত, সেখানে ওরা উপুড় হযে শুয়ে পডল বালি, নুড়ি বুকে চেপে দুই কনুইতে ভর দিয়ে জাগিয়ে বাখল মুখ। থুতনিটুকু থাকল জল ছুঁয়ে। হাওযায বৃষ্টির আগমনবার্তা। ওবা দেখল নদীর বাঁক থেকে দ্রুত ধেয়ে আসছে বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। বৃষ্টিব ফোঁটা ওদেব নাক বরাবর। স্ফটিক কুচি জলে মুখ ডুবিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে লাফিযে উঠে মিশে যাচ্ছে নদীতে। ওবা কোন কথা বলতে পারেনি বহুক্ষণ। অনেক পবে ময়ূরী বলেছিল—দেখ্‌লি, বলেছিলাম না কাত্যায়ন তোকে একটা রূপ দেখাবে।' মালা বলেছিল—থ্যাঙ্ক ইউ।

দাওয়ায় ব্যাগপত্তর রেখেই ময়ূরী বলল—গোঁসাই নদীতে জল কতটা?

গোসাই স্বরাজকে দেখতে দেখতে বলেন—তোমাকে ভাসাতে পারবে না।

—আমি চাইলেই পারবে।

গোঁসাই হাসেন—মেয়েটি বড় ক্ষেপী বাবা।

ময়ূরী পরিচয় দিতে চায়। গোঁসাই হাত তুলে থামান। গুণগুণিয়ে ওঠেন—জ্ঞানেতে বাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা রূপেতে রাধিকাময়। সর্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেই রাধিকা সর্বত্র রাধিকাময়। বাবাব চোঁখে রাধারাণী বাসা বেঁধেছেন যে!

সাঁঝবেলাব আগেই স্বরাজের হাত ধরে মযূবী চলল নদীর দিকে। কাঁটাঝোঁপের গা ঘেঁষে, ঘাসজমির মাঝের চিকণ পথ ধবে ওবা গিযে দাঁড়াল কিনাবায়। স্বরাজ থমকে যায। কোথায় নদী?

—জল কোথায়?

ময়ূরী আঙুল তোলে—মনে হচ্ছে ওখানে। জনমানবশূন্য নদীর পাডে দাঁড়িয়ে ওরা নদী খোঁজে। মযূরী বলে—চলো, যাবে না?

ও বালিতে পা ডুবিযে ডুবিয়ে এগোয়। স্ববাজ ওর পাশাপাশি হাঁটাব চেষ্টা করে না। এই নদী দেখাব জন্য অফিস ছুটি নিয়ে আসা? এরই গান গায মযূবী?

অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ময়ূরী জল খুঁজে পায়। জলরেখা সরে গেছে প্রায় ওপারে। তিরতিরে স্রোত নেই। যেন বয়ে যাওয়া নিয়ম তাই অতিকষ্টে বয়ে আসছে। পায়ের পাতা ডোবে না এমন জলের নিচে চিকচিকে বালির স্তর। দু'হাত চওড়া কাত্যায়ন অভিমানে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে ওর চেয়েও শক্তিমানের কাছে।

ময়ূরী ককিয়ে ওঠে—এমা, জল কই? এ কী হল? ওর খোলা চুলে বিষণ্ণ আলো। ওড়না খসে পড়ে মাটিতে। ও একছুটে জলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। যেদিকে নদী বয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়। একটা জায়গায় নদীপথ আটকিয়ে বালির স্তূপ। জায়গাটা খুঁড়ে যেন ডোবা বানানো। আর তার মধ্যে হাতির শুঁড়ের মত সবুজ পাইপ ডোবানো। পাইপটা তীরের গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডোবার ওপারে কোথাও জল নেই। শুধুই স্তব্ধ হয়ে থাকা বালির ঢেউ। ও হাতের চেটোয়, মুখ ঢাকে।

চওড়া নদীর আঁকাবাঁকা চেহারা, দু'ধারের গাছপালা, বিরাট এক ঘন-নীল আকাশ আপাতত মগ্নতা আনে স্বরাজের মধ্যে। ও জলের ধারে দাঁড়িয়ে গভীর স্বরে ডাকে—ময়ূরী।

ময়ূরী কেমন করে তাকায়। চোখ লাল ঠোঁটের রেখায় ভাঙচুর স্পষ্ট। ও ফিসফিস করে বলে—কাত্যায়ন কই? স্বরাজ জলের মধ্যে ছপছপ আওয়াজ তুলে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ময়ূরী আহত স্বরে বলে—দ্যাখো, মানুষ কেমন বন্দি করেছে কাত্যায়নকে।

স্বরাজ বলে—নদীর জল পাম্প দিয়ে তুলে নিচ্ছে। মানুষ তো চিরকাল নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে ময়ূরী।

—কিন্তু নদীটা যে শেষ হয়ে গেল। কী অন্যায় বল তো? ও খুব অন্যমনস্কের মত বলে—তোমাকে আমি নদী দেখাতে পারলাম না।

—আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। এরকম মুক্ত জনমানবহীন জায়গায় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নারীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি।

—আচ্ছা, ওই পাম্প যারা লাগিয়েছে তাদের বলব?

স্বরাজের পৌরুষে ঘা লাগে। কেন মেয়েটা এমন নদী-পাগল? এই নদী? যার শরীরই নেই তাকে ভালবাসা যায়? যে নদীর প্রবাহ নষ্ট হয়ে গেছে, যার মৃত্যু ঘটেছে তার জন্য শোকগাথা রচনা করবে এই নারী? এমন নির্জন জায়গায় কোথায় দু'জনে ঘনিষ্ঠ হবে তা নয়, হা-হুতাশ করছে সমানে। মনেই আসছে না ওর প্রেমিক কত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওর সান্নিধ্য চাইছে!

ময়ূরী বালিতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচায়। জল সামান্য ঘোলা হয়।

স্বরাজ জল ছেড়ে ওঠে—আমি আশ্রমে যাচ্ছি।

হা হা করে ছুটে আসে ময়ূরী—না, একটু থাকো। প্লিজ।

—কাত্যায়ন কি ম্যাজিক দেখাবে? ঝড় আসবে? বৃষ্টি নামবে?

—আজ পূর্ণিমা।

—ও, তার মানে তোমার কথামত কাত্যায়ন জেগে উঠবে।

—হতে পারে, হতে পারে স্বরাজ।

—এত বিশ্বাস তুমি পেলে কোথা থেকে?

—এই নদী কখনও আমাকে ফেরায়নি। দ্যাখো, আজ কিছু একটা ঘটতে পারে। ঘটবেই। আমি কখনও শূন্য হাতে ফিরিনি।

স্রেফ মায়া আর গাঢ় ভালবাসার কারণে স্বরাজ ময়ূরীব পাশে বসে থাকে। কতক্ষণ যে কেটে যায়। অন্ধকার জমাট বাঁধে চারধারে। বান আসে না। ঝড়, ওঠে না। এমনি পাতলা মেঘ মসলিনের ওড়না হয়েসারাক্ষণ আড়াল করে রাখে চাঁদকে। স্বরাজের হাতেব মুঠোর মধ্যে ময়ূরীর হাত ক্রমশ পাষাণ হতে থাকে।

যথেষ্ট মদ্যপান কবে স্বরাজ ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে গোঁসাই। ওরা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে। গরম যথেষ্ট। মশাও আছে। এসবে বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে ঘুমিযে পডেছে স্বরাজ।

এখন রাত গভীর। ময়ূরীর ঘুম ভেঙে গেল জলের শব্দে। যেন ঝরণা আছড়ে পড়ছে মাটিতে। নাকি পাথরে পাথরে জলের ধাক্কার আওয়াজ? ময়ূরী উঠে বসে। জ্যোৎস্না উঠোন, গাছপালা, গোয়াল ঘরের চালে। পূর্ণিমা অপার করুণা নিয়ে প্রকাশিত। তাহলে কী কাত্যায়ন জেগে উঠল? ময়ূবী কাঁটাঝোপ, বুনো গাছপালার মধ্য দিযে ছুটে চলে। ওড়না আঁটকে থাকে বেডার গায়ে। দু'বাব হোঁচট খায। অবশেষে পৌছয় নদীর ধারে। কোথায় কী। স্থির বালির ঢেউ জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে শুয়ে। শেষ জলকণাটুকু শুষে নিয়ে যেন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। নিষ্ঠুর গোপন খেলা সহ্য কবতে না পেরে ময়ূরী ফিসফিস করে বলে—'কাত্যায়ন। কাত্যায়ন তুমি কি আছ?'

নদীর মধ্য থেকে শব্দ ওঠে—'আমাকে মুক্ত কবো ময়ূরী।'

ময়ূরী পাগলের মত দু'হাত তুলে নদীব মাঝ বরাবব ছুটে যায়। মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে খামচে খামচে বালি তোলে। ছুঁড়ে দেয় এদিক-সেদিক। এভাবেই আঙুল দিয়ে গর্ত করে ফেলে। বালির নিচে হেরে যাওয়া নদীর এক গণ্ডূষ জল সেই গর্তে উঠে আসে। জ্যোৎস্নালোক ওইটুকু জলে প্রতিবিম্বিত হয়। ময়ূরী সেই জল আঁজলা ভবে নিযে উঠে দাঁড়ায়। গর্তের চারধারে পাক দিতে থাকে আর বলে—'হে কাত্যায়ন, আমাদেব প্রয়োজনে তোমার সৃষ্টি। জলদেবতার সন্তান তুমি। তোমার প্রকাশ তাবই শরীবেব পবিত্র অংশ থেকে। তুমি পাহাড়ের অন্তস্থল থেকে মুক্ত হয়ে ধাবমান জনপদের মধ্য দিযে। তোমার দানে, সমৃদ্ধ আমরা। তোমার করুণাব ফলবতী বৃক্ষ। মানুষেব অপার তৃষ্ণা মেটাও তুমি। তোমার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদেরই। তুমি কাত্যায়ন, তুমি আমার দয়িত। তোমার মৃত্যু অসহনীয় আমার কাছে। এই বালুকাময় চবাচরে তোমাব অস্তিত্ব প্রকাশ হোক।

ময়ূরী ঘুরতে থাকে গণ্ডূষভবা জল নিয়ে। জ্যোৎস্না জড়িযে থাকে ওব সর্বাঙ্গে। ওব খোলা চুলে জোনাকি। তারারা ঝুঁকে পড়তে চায় নদীর বুকে। কোথা থেকে সুগন্ধী পাতা পোড়ানোর গন্ধ ভেসে আসে।

ময়ূরী আবার এক গণ্ডূষ জল নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলে—'হে ধনপ্রদ শক্তিমান পুরুষ, তোমার বীররূপ প্রদর্শন কর। যে বন্ধনেব কাছে তুমি আত্মসমর্পণ করেছ সে বন্ধন থেকে মুক্ত হও।' ময়ূবী দু'হাত ছড়িযে বলে—'কাত্যায়ন প্রকাশ হও। প্রকাশ হও কাত্যায়ন।'

ময়ূরী আকাশের দিকে তাকায়। চাঁদটাও কেমন লালচে ছোপ ধরেছে। এই কি মহাযোগের সময়? ময়ূরী স্থির চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ চাঁদ রক্তবর্ণ থাকবে ততক্ষণ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রেম সম্পর্কে স্পর্শ করে থাকবে তার ষোলকলা তার ছটায় প্রকৃতি জাগবে, পুরুষ তাকে গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণ হবে দু'জনে। চাঁদের ষোলকলা তো তাকে স্পর্শ করেছে, চাঁদের গা থেকে খসে পড়া রক্তবর্ণের পাতা, জ্যোস্নাকুচি হাত পেতে নিয়েছে। তাহলে কেন কাত্যায়ন জাগবে না? যে নদীকে সে নিজে যথার্থই এক পুরুষ মনে করে আজ এই মহাযোগের রাতে সেই নদী কেন নিজেকে প্রকাশ করবে না? কেন বালির স্তূপ ফুঁড়ে জেগে উঠবে না, ভাসিয়ে নেবে না এই মেয়েটাকে?

ময়ূরী ফিসফিস করে বলে, জাগো, জাগো, কাত্যায়ন।

সময় বয়ে যায়। চারধার শুনশান। চাঁদ অপেক্ষা করে। জোয়ার এল না, উত্তাল হল না নদীর শরীর, ঘুম ভাঙল না তার।

ময়ূরী এক ছুটে পায়ের পাতা ডোবা জলে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘোর লাগা চোখে চারধার দেখে। খুব অভিমান হচ্ছে ওর। খুব। কিন্তু কার ওপর অভিমান করবে সেটা বুঝতে পারছে না। কাত্যায়নের ওপর? এই রাশিরাশি স্থির বালির ওপর? নাকি জলে শুঁড় ডোবানো পাইপটার ওপর? ও হাঁটু গেড়ে জলে বসে। হাতে ধরা রক্তবর্ণ পাতাটা স্থির, অকম্পিত জলে রাখে। চাঁদের শরীর থেকে তখন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে রক্তাভা।

রিরংসা

গৌতম ঘোষদস্তিদার

চারতলার খোলা জানলা দিয়ে হু-হু করে পাগলের মত হাওয়া আসছিল। হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মত লাট খাচ্ছিল ক্যালেন্ডারের সমুদ্র। জানলা বন্ধ করে দিলেই হয়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না ব্রতীনের। খোলা জানলা দিয়ে ভাবলেশহীন তাকিয়ে সে দেখল, একটি প্রকাণ্ড চাঁদ একটু-একটু করে এগিয়ে আসছে জানলার দিকে। যেন এখনইজানলা পেরিয়ে ঢুকে পড়বে ঘরে। হঠাৎই কেমন গা-ছমছম করে উঠল তার।

আজ বিকেলেই বাঙ্গালোর থেকে ফিরেছে ব্রতীন। দমদম থেকে সোজা বাড়ি চলে এসেছে। মনীষা যে বাড়িতে থাকবে না, তা জানাই ছিল। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আজই সে প্রথম টের পেল, তার বারোশো স্কোয়ার ফুটের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটটি একেবারে রুক্ষ ও আদিগন্ত প্রান্তরের মত ধু-ধু শূন্যতায় ঘেরা। মনীষার অনুপস্থিতিই সেই শূন্যতা তৈরি করেছে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট করে বোঝেনি ব্রতীন।

স্নান করে হুইস্কি বের করে বসেছিল। একা-ঘরে পান করতে করতে সেই নির্জনতা তাকে একটু একটু করে অধিকার করে নেয়। তখনই পরিচ্ছন্ন, ফরসা, সুগোল চাঁদটিকে সে স্পষ্ট করে চিনতে পারে। গতজন্মের স্মৃতি যেন তাকে জাগায়। মনে পড়ে, তাদের রানাঘাটের বাড়ির ছাদে এরকম একটি অপার্থিব চাঁদ ঝুলে থাকত কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে। মা লক্ষ্মীপুজো করতেন। ব্রতীনের মনে পড়ল, গত পাঁচ বছরে সে রানাঘাটে যাওয়ার সময় পায়নি। গত পাঁচ বছর মার সঙ্গে দেখা হয়নি তার। গত পাঁচ বছর চূর্ণি নদীর জলে দেখেনি চাঁদের ছায়া। মা কেমন আছে, সে জানে না। বছরখানেক মাকে টাকা পাঠানোও বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে মনীষার যুক্তি এবং বিবেক খুব পরিষ্কার। সে একদিন কী কথায় সাফ জানিয়েছিল, রানাঘাটের বাড়িব ভাগ তো আমরা নিতে যাচ্ছি না। সে-সব তো অতীনই পাচ্ছে। সো হি শুড কেপ্ট হিস মাদার! ব্রতীন শুনেছিল, কোনও মন্তব্য করেনি। মন্তব্য করেনি মানে, মেনেই নিয়েছিল মনীষার যুক্তি। আজ কেন তাহলে হঠাৎ, নির্জন সন্ধেবেলা, চারতলার আকাশে ওই গড়ানো চাঁদ দেখে তার মনে পড়ল মার কথা! খোলা জানলার বাইরে সেই ভ্রূক্ষেপহীন চাঁদের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল ব্রতীন। ডোর-বেল বেজেছিল তখনই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ব্রতীন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল, দরজার ফ্রেমে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির মত লগ্ন হয়ে আছেন পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস সেন। লালপাড় সাদা সিল্কের শাড়ি আর লাল টকটকে স্লিভলেস ব্লাউজে একেবারে প্রতিমার মত দেখাচ্ছে তাঁকে। শ্যাম্পু-করা চুলগুলি হাওয়ায় সামান্য উড়ছে। ফরসা কপালে তামার পয়সার মত লাল টিপটা জ্বলজ্বল করছে কোজাগরী চাঁদেরই মত। তাঁর হাতে সাদা লেসের ঢাকনা-দেওয়া কাশ্মীরি কাঠের ট্রে। মিসেস সেনের সামগ্রিকতার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুচ্চমকের মত ব্রতীনের মনে পড়ল, আজ লক্ষ্মীপুজো।

'আসুন, আসুন!' বিহ্বলতা কাটিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল ব্রতীন।

'একটু প্রসাদ এনেছি। মিসেস বোস কি কিচেনে?' ঘরের ভিতর পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন মিসেস সেন। 'না, মনীষা তো এখনও ফেরেনি।...আপনি এ-সব পুজোটুজো

করেন বুঝি? ব্রতীন হাসল।

'করিই তো। আমার ভাল লাগে। আপনি প্রসাদ খান তো?' মিসেস সেন ভ্রূ কাঁপালেন। 'খুব খাই। আমার মা করতেন। খিচুড়ি আর লাবড়া। ডিলিশাস!' হাসিটা ধরে রাখল ব্রতীন।

ব্রতীন শুনল, কাচের চুড়ির মত হেসে উঠলেন মিসেস সেন। ব্রতীন দেখল, হাসির গমকে তাঁর বুকের ওপর থেকে আঁচলটা সামান্য সরে গেল। মিসেস সেন এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রাখলেন। 'লক্ষ্মীপুজোর দিন ভর সন্ধেবেলা ড্রিঙ্ক করছেন!' সেন্টার টেবিলের ওপর আধখাওয়া গ্লাসের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চে বললেন মিসেস সেন।

'না, মানে, বিকেলের ফ্লাইটে বাঙ্গালোর থেকে ফিরলাম। মনীষাও বেরিয়েছে। কী করব, একা-একা, বোর লাগছিল।' ব্রতীন কেন যে কৈফিয়তের সুরে কথাগুলি বলল, নিজেই বুঝল না।

রাতে শোওয়ার আগে মুখে ক্রিম মাখছিল মনীষা। জনলা দিয়ে একটুকরো জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়েছে তার পায়ের কাছে। তার স্বচ্ছ নীল নাইটির ভিতবে ঢুকে যাচ্ছে লম্পট হাওয়া, ঘুরপাক খাচ্ছে। দূরের সোফায় বসে সিগারেট খেতে খেতে নিজের দশ বছরের পুরনো বউকে খুঁটিয়ে দেখছিল ব্রতীন। তার মনে পড়ল, বহুকাল মনীষাকে ছুঁয়েদেখেনি সে। মনীষাকে দেখতে দেখতে তার স্নায়ুর ভিতর ছড়িয়ে পড়ছিল এক ধরনের অন্ধকার, কুয়াশা। বহুকাল পর আয়নার ভিতর দিয়ে মনীষাও দেখছিল ব্রতীনকে। ব্রতীনের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মিসেস সেন লক্ষ্মীর প্রসাদ দিয়ে গেছেন, বলনি তো!'

একটু চমকাল ব্রতীন। প্রসাদ খেয়ে ডিশ আর বউল সে বেসিনে নামিয়ে রেখেছিল। মনীষাকে বলা হয়নি। 'সিঁড়িতে মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা হল, বললেন। নিশ্চয়ই খুব টেস্টি ছিল, চেটেপুটে খেয়েছ দেখলাম!' মনীষার গলায় চাপা বিদ্রূপ।

তখনই চারতলার নৈঃশব্দ্য খানখান কবে ডেকে ওঠে একটি পরিত্রাহী ময়ুর। দুজনেই সচকিত হয়ে তাকায় টিভির দিকে। দুজনেই দেখল, নিবিড় বনের মধ্যে ঝরনার জল খেতে এসেছে নকল হরিণ। তাদের জলপানের শব্দ ছাড়া অরণ্য নিথর। আর, হরিণের স্বাদ পেতে কাঁটাঝোপ পেরিয়ে রুদ্ধশ্বাসে জলের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে একটি হলুদ-কালো বাঘ, মৃত্যু। ক্যামেরা প্যান করে এবার গাছের-ওপরে-বসা ময়ুরটিকে ধরে। রূপবান ময়ুরটি চকিতে দেখেছে মৃত্যুকে। আতঙ্কে ডাকছে সে, 'ময়ুর, ময়ুর'! সেই কর্কশ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে গোটা অরণ্যে। হরিণেরা সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর অরণ্য মথিত করে দৌড়তে থাকল তারা প্রাণভয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে। বাঘটিও বিদ্যুদ্বেগে লাফ দিল জলে। শেষ হরিণটিকে ধরে ফেলল সে সহজেই। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রতীন। প্রায় বাঘের মতই বাতাসে লাফ দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল মনীষার ক্ষীণ কোমর। বলল, 'ও-সব দেখার কিছু নেই। ও-সব হল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকেব লোকদের কারসাজি। কোটি কোটি ডলার কামায় শালারা এ-সব বাঘ-হরিণের ছবি তুলে। এস'!

মনীষা ব্রতীনের শরীর থেকে হুইস্কির ঝাঁঝ টের পেতে পেতে স্পষ্ট শুনল, 'কাম অন, মিসেস সেন।' সে দেখল, টিভির স্ক্রিন থেকে হরিণের গাঢ় রক্ত ছিটকে এসে লাগল তার নীল নাইটিতে, সাদা বিছানায়। চোখ বুজে ফেলল মনীষা।

আস্তাবল

সোমক দাস

কঙ্কালসার দেহ, প্রায় হাড়ের একটা ক্ষীণ কাঠামোর ওপর চামড়া জড়ানো, সেই চামড়াও ফ্যাকাশে, জায়গায় জায়গায় ঘা, মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে তাতে; আর চোখ? কি অসম্ভব উদাসীন আর ভয়ার্ত। কোটরাগত যাকে বলে ঠিক তাই,আর সে দৃষ্টিতে কি যে শূন্যতা! তারের বেড়ার এ পাশ থেকে একমুঠো ঘাস এগিয়ে ধরেছিল অরিন্দম, কাছে আসার বদলে, মুখ বাড়িয়ে দেওয়ার বদলে—দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে। জন্তুগুলোকে ঘোড়া বলে চিনতে কষ্ট হয়। সুবিকাশ বলল, এই জন্যেই বি. আই. কোম্পানীর মুখার্জি বলছিলেন, একবার দেখে আসুন, পরিণতি কাকে বলে। ওদের সিরাম থেকে টিবির ওষুধ তৈরী হয়। রেগুলার ব্লাড টেনে টেনে বেচারা জন্তুগুলোকে শেষ করে দিয়েছে কম্পানী। অরিন্দম বলল, ভাবতে পারিস, কয়েক বছর আগে এই ঘোড়াগুলোই হয়তো রেসকোর্সের মাঠে প্রাণপণ দৌড়চ্ছিল, আর লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ে যাচ্ছিল তাদের খুরের ধুলোয়। সুবিকাশ বলল, তাই নাকি? এগুলো রেসকোর্সের? অরিন্দম বলল, হ্যাঁ, বাতিল ঘোড়া সব। মুখার্জি বলছিল, ছুটতে না পারলে নীলাম হয়ে যায়। কথাটা খট করে কানে লাগল সুবিকাশের। ছুটতে না পারলে—। মুখে বলল, কম্পানিটার নাম কি যেন বললি? অরিন্দম বলল, বি. আই. মানে বেঙ্গল ইমিউনিটি। ওষুধের কম্পানী। নাম শুনিসনি? লেবার ট্রাবল চলছে প্রচুর। যে কোনোদিন উঠে যাবে। সুবিকাশ বলল—এই ঘোড়াগুলোয় কি হবে তাহলে? অরিন্দম বলল—কি আর হবে। চরে খাবে। তখন হয়তো এগুলোর শরীর স্বাস্থ্য এখনকার চেয়েঅনেক ভালো হয়ে যাবে। সুবিকাশ বলল—আর কম্পানির লেবারগুলো? তাদের অবস্থা কি এদের মত হবে? অরিন্দম বলল—হতেই পারে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বেরিয়ে গেছে, পেপারে দেখছিলুম—প্রাণী দেহ থেকে রক্ত নিয়ে ওষুধ তৈরী করা নিষিদ্ধ করা হল। বোধহয় কোনো পশুপ্রেমিক সংস্থা মামলা করেছিল। জিতে গেছে। পশুদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চলবে না। সুবিকাশ বলল—শুধু পশুদের ওপর?

নাইট ডিউটিতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সিস্টার নীতা। কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে ঘুমটা ভেঙে গেল। আজও আস্তাবলের স্বপ্নটা আবার দেখল নীতা। বরানগর টবিন রোডের ন পাড়ার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে উত্তপাড়ায় তারা ফ্ল্যাট কিনেছে প্রায় দশ এগারো বছর হয়ে গেল। এত বছর পরেও ন-পাড়ার ঘোড়ার আস্তাবল জায়গাটা স্বপ্নে বার বার তার কাছে ফিরে আসে কেন? আজ ন-পাড়া থেকে একটা পেশেন্ট এসেছে বলে? কে জানে। হতেই পারে ছ-মাসের একটা বাচ্চার মাথার মধ্যে ইন্টারন্যাল ইনফেকশন। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছিল। কোনো ফুড নিতে পারছে না বলে স্যালাইন চলছে সমানে। সি টি স্ক্যান হয়েছে। জল জমে আছে মাথার মধ্যে কয়েক জায়গায়। কাল এম-আর আই হবে। বাঁচানো যাবে বলে মনে হয় না। উঠে তাকে দেখে আসতে গেল নীতা। স্যালাইনের বোতল নিঃশেষ। পাল্টে দেয়নি কেউ। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। পাল্টে দিতে গিয়ে দেখল স্টক নেই। এর নাম মেডিকেল কলেজ। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিজের টেবিলে ফিরে এল নীতা। এই শেষ রাতে স্টোর খুলে দেবার

কেউ নেই। সকালের সিফটে যে আসবে তার ওপর বাচ্চাটার ভবিতব্য ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কিছু করাব নেই। প্রফেসর নীলেশ দত্ত'র বুড়ো বয়সের ছেলে। ন-পাড়ার বাড়িতে গোল মতন রোয়াক ছিল। সকাল-সন্ধ্যে রোজ রোয়াকে বসে থাকতো প্রফেসর দত্ত। জিজ্ঞেস করলে বলতো—আমি তো টিউশানি করি না! নীলেশ দত্ত ছাড়া আর কোনো প্রফেসরকে সকাল সন্ধে ওরকম চুপচাপ বসে থাকতে দেখেনি নীতা। আসলে সব প্রফেশনেই জালি লোক থাকে। ক্লাসে গিয়েও বোধহয শুধু ক্লাসে্ ডিক্‌টেট করে চলে আসে। ছেলেমেয়েগুলোও কেমন যেন বেঁকাচোরা। মাথার ভেতরে ইনফেক্‌শন—বাচ্চাটার বাঁচার সম্ভাবনা কম। বুড়োবয়সে কেন যে এমন একটা করুণ ও জটিল অবস্থায় পড়ল নীলেশ দত্ত, কে জানে!

ভোরের ট্রেনে অনেক খবরের কাগজ যায়। হকারদের কাগজ গোছানোর ব্যস্ততা দেখতে বরাবরই বেশ ভালো লাগে নীতার, নাইট করে ফেরার সময়। বরানগরে, মানে ন-পাড়ায়, বাস-স্টপটার নাম ছিল ঘোড়ার আস্তাবল—সেখানে থাকার সময় এসব দেখার সুযোগ ছিল না। এক বাসেই মেডিকেল কলেজ যাওযা যেত টবিন রোড থেকে। কলকাতার ভেতরের জীবনযাত্রাটাব ছন্দটা একদম আলাদা। হাওড়া স্টেশনে পা দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। এই ভোরবেলা কত লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে হাওড়া স্টেশনে। একটু পরে কে কোথায় চলে যাবে, কে জানে। দৃশ্যটা দেখলেই নীতা কিবকম অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

অরিন্দম এসব দেখলই না। শুধু ঘুমিয়ে কাটিযে দিল জীবনটা। বললে বলবে,অত দেখার কী আছে বাবা। সবই তো বোঝা যায়। বাস্তব পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ চোখে দেখাব আনন্দটাই তো আলাদা। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই যে দেখার জিনিস তা তো নয়। ময়দানে ঘোর গ্রীষ্মের দুপুরে কোনো ঠেলাওয়ালার ঘুমিয়ে পড়াও তো দেখতে ভালো লাগে! ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফেরার বাধ্যতামূলক সুযোগ না থাকলে একসঙ্গে এত খবরের কাগজের স্তূপ, সেগুলো সাজানো, ট্রেনের কামরায় তোলা, তুলতে দেরী হলে গাড়ি না ছাড়ার জন্য ড্রাইভারকে ধম্‌কানো—এসব তো দেখাই হত না। কাগজগুলো দেখলে অন্যরকম অনুভূতিও অবশ্য হয় নীতার। মফস্বলের মানুষদের মনেই কিছুটা প্রসন্নতা এখনও টিকে আছে। সভ্যতার বিশিষ্ট অবদান—এই সংবাদপত্র, ট্রেনের কামরার পেট থেকে পড়ে—দূর সুদূর মফস্বলের ঘুম ভাঙা মানুষদের সেই দুর্লভ প্রসন্নতা ধ্বংস করে দেবে! আর, তাতেই অভ্যস্ত মানুষ। ঘুম থেকে উঠে সাত রাজ্যের গণ্ডগোলের খবর না জানলে তার শান্তি হয় না।

ন-পাড়ার ঘরটা খুব ছোট ছিল। অরিন্দমের মাকে নিয়ে এই এক চিল্‌তে বাসাবাড়িতে কি কষ্টে যে কাটাতে হয়েছে কটা বছর। আসলে শ্যামবাজারের শরিকী বাড়িটা ছেড়ে দেবার কোনো ইচ্ছে ছিল না অরিন্দমের। সকালে একদিন বাজার করতে গিযে বাব্য আর বাড়ি ফিরল না। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটা বিশ্বাসে পরিণত হবার আগেই অন্য শরিকেরা প্রায় জোর করে নামমাত্র দাম দিয়ে উৎখাত করে ছাড়ল অরিন্দমকে। নীতার সঙ্গে বিয়ের পরের বছরই। অনাথ দেব লেনের যে বাড়িতেই ঘর কম ছিল আব ঘর তো সবায়েরই দরকার। নীতাই একদিন বলল—ধুর, এত ঝামেলার চেয়ে ভাড়া বাড়িতেই থাকা অনেক ভালো। কলতলা থেকে শুরু করে সব ব্যাপার নিয়ে রাতদিন এই ছিল চেঁচামেচি ...। তখন শুবলু এসে গেছে পেটে। অরিন্দমের ভাই-বোন নেই।

ন-পাড়ার বাসাটা ঠিক করে দিয়েছিল নীতারই এক কলীগ।

শ্যামবাজারের বাইরেও যে পথিবী আছে, অরিন্দম যেন জানতোই না। পাড়ার ক্লাবের ক্যারাম পার্টনার ছাড়া বিশেষ কোনো বন্ধুও তার ছিল না। ওষুধ কম্পানীর সেলসের চাকরিটা পেয়ে তার ঘোরাঘুরি শুরু। বাবা হারিয়ে যাবার পর নিজেকে খুঁজে পাওয়াও শুরু। নীতাকে বিয়ে করার পর গুবলুকে পাওয়ার আনন্দে অন্ততঃ শ্যামবাজার ছাড়তে রাজী হল অরিন্দম। স্যাঁতসেতে অন্ধকার ও একান্নবর্তী বাড়িতে গুবলুর বেড়ে ওঠায় তার ঘোর আপত্তি।

ট্রেনটা ছাড়ার ঠিক আগে সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা একটি কুড়ি একুশ বছরবয়সের যুবতী দৌড়ে ট্রেনে উঠল। হাতে স্টেটস্‌ম্যান। মেয়েটাকে প্রায় সবাই চেনে। তারকেশ্বরে থাকে। পাগল ও অশিক্ষিত। রোজ সকালে বেরিয়ে পড়ে সেজেগুজে। হাতে ইংরেজি কাগজ। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ভঙ্গিতে কাগজটা কায়দা করে খুলে সামনে ধরে বসে থাকে। কাল সারারাত কোথায় ছিল কে জানে। নীতার পাশেই ধপ্ করে বসে পড়ে বলল, ব্যোম্ শংকর। পালিয়ে যাবি? আমাকে না নিয়ে? ইল্লি মাইরি টকের আলু! নীতা জানে একটু পরেই ও ভুল বকতে শুরু করবে। বাড়িতে বাস্তু দোষ আছে...কেউ শান্তিতে থাকবে না....দুনিয়ার লোকজন সব শালা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেছে.....বিশেষ করে ব্যাটাছেলেরা....।

উত্তরপাড়ায় নেমেই অপর্ণাদির সঙ্গে দেখা। উইমেন্স ভ্যাগ্রান্ট হোমের নতুন ম্যানেজার। হোমে এখন একশো বিয়াল্লিশটা নানা বয়সী ভবঘুরে মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে পঁচিশ জন কম বেশী পাগল। হাসিমুখে সব ঝক্কি এক হাতে সামলায় অপর্ণাদি। ঘরে বাইরে। আট বোন। এক ভাই। বাবা অভিজ্ঞ কমুনিস্ট পার্টির ফাউণ্ডার মেম্বার। জেলে থাকার সময় পাগল হয়ে যান। মারা যাবার পর থেকে বড় ভাইয়ের মতন বড়দি অপর্ণার ঘাড়ে সবার দায়িত্ব। বোনেদের বিয়ে দেওয়া, সংসার প্রতিপালন। সবার ছোট ভাই সবথেকে আদুরে। পঁচাত্তর হাজার করে দু'বার সে বড়দির কাছ থেকে নিয়েছে ব্যবসা করবে বলে। করেওছে ব্যবসা। দু-বোনের আবার বিয়ে নিয়ে মামলা। তবু হাই পাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে এক গাল হাসল অপর্ণাদি। দেখা হলেই হাসে। কি খবর? বলতেই বলল, এই, মায়ের শরীরটা একটু খারাপ করেছে। রাত্রে ভাই ট্রাংকল করেছিল। শুনে নীতা বলল, সেই পুরুলিয়া? অপর্ণাদি থেমেই বলল, কি আর করা!

আজ রিক্সা নিতে ইচ্ছে করল না।

হেঁটে যেতে হলে, অনেকগুলো রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। হাসপাতালের সামনের রাস্তাটা, যেটা কমন। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনের রাস্তাটা, যেটা আনকমন এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। আরও অন্য রাস্তা আছে, তবে সেগুলো ঘুরপথ। আজ নীতা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের রাস্তাটাই বেছে নিল।

এ রাস্তায় এলেই, একটা বাড়ির সামনে সে থম্‌কে দাঁড়ায়।

একদিন, এ বাড়িতে, তাকে ভোররাতে আসতে হয়েছিল।

ভোররাতে, বাড়িতে পাবলিকের ধাক্কা! সিস্টার, সিস্টার।

ঘুমচোখে নীতা বলেছিল—কি ব্যাপার।

—আপনাকে এক্ষুনি একবার আসতে হবে।

—কেন? কোথায়?

—ব্যানার্জিদা। মনে হচ্ছে মারা গেছে। এই সময় ডাক্তার তো পাওয়া যাবে না আপনি যদি একবার দেখে যান!

—মারা যদি গিয়েই থাকেন, আমি দেখলে তো কোনো লাভ হবে না। ডাক্তার তো একজন লাগবেই।

—সে পরে দেখা যাবে। এখন যদি আপনি একটু—।

নীতা বুঝেছিল, যেতে হবে। লোকাল পাবলিকের ডিমান্ড। এসব উপেক্ষা করতে নেই। দ্রুত পোশাক পাল্টে নিয়ে অরিন্দমকে যখন বলতে গেল—একটু আসছি—তখন উপুড় হয়ে শুয়ে অরিন্দম বলেছিল—তাড়াতাড়ি ফিরো।

ব্যানার্জিদার মৃতদেহ দেখার স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি নীতা।

সাতপুরোনো একটা বিশাল বাড়ি। ঘরের পর ঘর। সব ফাঁকা। বড় বড় জানলা। টোটাল জানালাই আছে বোধহয় বাহাত্তরটা। কে যেন বলল। বিছানার এক ধারে কেতরে পড়ে আছে ব্যানার্জিদা। সারি সারি পিঁপড়ে উঠে যাচ্ছে পা থেকে মাথার দিকে। ছেঁড়া ময়লা পাজামা। খালি গা। সর্বাঙ্গে পিঁপড়ে।

শেষদিকে দিনরাত চোলাই খেতেন ভদ্রলোক।

ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে। স্ত্রী অনেকদিন নেই। খেতেন দোকানে। বাঁধা ব্যবস্থা ছিল। আর ব্যানার্জিদা, এত বড় বাড়ি—শুধু দেখার কেউ নেই বলে—নাকি, অত কিছু? কে জানে।

বাড়িতে কড়া নাড়ার আগে, আস্তাবলের স্বপ্নটা মনে পড়ল। চারপাশের লোকগুলোকে, আস্তাবলের ঘোড়ার মতন লাগছে কেন?

এখন কাছে গেলে, অরিন্দমও কি. পাশ ফিরে শোবে?

না, পালাবে?

পিঞ্জর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

শীতের আকাশ ঝকঝকে নীল, সহ্যাদ্রি পর্বতমালার সুদীর্ঘ, বঙ্কিম চলন তাতে আরও একটু গাঢ় নীল মিশিয়েছে। খেতের আল বরাবর ঝাঁকড়া বাবলার গাছ, এখানে ওখানে সরষের হলুদ উদ্ভাসে চোখে ঘোর লাগে, যৌবনের দিন মনে আসে।

বাস চলেছে। পুরনো হলেও মজবুত বাস। ঝাঁকুনি খেয়ে তার গায়ে খরখর ঝনঝন শব্দ হলে শরীরের ভিতরেও শিরশিরানি ওঠে। কেশব বসেছেন জানালার পাশে। কানে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবুজ উলের মাফলার গলার কাছে গিঁঠ দেওয়া। সাড়ে চার ঘণ্টার রাস্তা, নন্দুরবার থেকে জাফলি। না গেলে নয়, তাই যাওয়া। আজকাল কেশব লম্বা সফরের ধকল নিতে পারেন না, তাও আবার বাস-এ। আটাত্তরে পা দিয়েছেন এই কার্তিক অমাবস্যায়, ছ' ফুটের কাছাকাছি দীর্ঘ সবল শরীর একটু নুয়ে পড়েছে রোদ জল সইতে সইতে। আজকাল রাতে কাশি হয় একটানা। পাশের ঘরে অন্নপূর্ণা বিড়বিড় করে, ঘুমের মধ্যেই। কাশির শব্দে ওর স্বপ্নে ঝাঁকুনি লাগে।

ওহে যৌবনের দিন। কোথায় চলে গেলে? রঙ রূপ শব্দ গন্ধ স্পর্শ সব খুলে কেড়ে নিয়ে ন্যাড়া গ্রানাইটের মত ধু ধু মাঠে ফেলে গেলে আমায়! আঃ, সে যদি এখন পাশে বসত? পাশের লোকটা চাষি পাটিল, শুকনো লঙ্কা বিক্রির ধান্দায় যাচ্ছে আরও দূর, জাফ্‌লি ছাড়িয়ে, ওর ঘুমভরা মাথাটা বার বার কেশবের ডান কাঁধে নেমে আসছে, ওর মুখের লালায় ভিজে যাচ্ছে শার্টের ডান কাঁধ। তুমি পাশে বসলে তোমার নরম হাতটি আমার কোলে রাখতাম, আমার ডানহাতে জড়িয়ে নিতাম তোমার ক্ষীণ কোমর, তোমার খোঁপা থেকে চাঁপার গাঢ় সুগন্ধ এসে আমার দেহে মনে ঝাপট মারত। ধরতে পারিনি, বশীকরণ জানতাম না, তাই সে আঙুল ছাপিয়ে মুঠি খুলে হারিয়ে গেল। স্বাস্থ্য ছিল, দুটো জোয়ান মোষের শক্তি ছিল শরীরে, বুদ্ধি ছিল না, বিদ্যে ছিল না, আর আমার এই মুখ! বসন্তের দাগ ধরা, খাঁদা বোঁচা বিশ্রী! কটা, সবুজ চোখ ছিল তোমার, সে চোখের চাউনি তুমুল হেসে উঠে কতবার বলেছে, বিশ্রী, বিশ্রী তুমি, হত কুৎসিত।

"বিচ্ছিরি বলেছি! কই কোথায় বললাম, বাঃ!" হাওয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে আসে তার হাসি।

ফর্সা, একটু লম্বাটে মুখ, তাতে নিখুঁত একটি নাক আর আয়ত চঞ্চল কটা দুই সবুজাভ চোখ। চোখের গাঢ় বাদামি মণি দুটি সদাই ঈষৎ বড় হয়ে থাকে। ছোট্ট গৌর কপালে কত রকম কুঙ্কুই যে সে আঁকত, নানা রঙের মালা জড়িয়ে রাখত চুলে। এখন তার ঝিকিমিকি মুখ ফুটে উঠে, উঠে মিলিয়ে যায় জানলার বাইরে শীত রৌদ্রে। কিশোরী চলেছে, নিঃশব্দে, অদৃশ্য চলনে কেশবের সঙ্গে।

কিশোরীই বটে, চিরকিশোরী। পনেরোয় বউ হয়ে এসেছিল, দশ বছর ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে গেছে কেশবকে। অন্নপূর্ণা দেখতে খুব সাধারণ, বেঁটে, ঢিলেঢালা

গড়ন। কেশব দ্বিতীয়বার পণ করেই নিয়েছিল, সাধারণ চেহারার বউ চাই তার। ওর বাপের খুঁতখুঁতুনি ছিল, প্রথম বউ ঘব ছেড়ে গেছে, যদি ফিরে আসে কোনদিন? নিজের জায়গা ফিরে চায়?

কেশবের মা শক্ত মুখ করে বলেছে, আসুক সে, এলেও তার জায়গা হবে না। ঘরকুল ছেড়ে গেছে নিজের ইচ্ছেয়। বাপের বাড়িও তো তেমন। আপন বলতে এক ভবঘুরে ভাই। বিধবা মা চেয়েচিন্তে দিন চালায়। ওদের কোনও খুঁটির জোর আছে?

অন্নপূর্ণার বাবা শোনেনি, স্ট্যাম্প কাগজে রীতিমত সই কবিয়ে নিয়েছে জামাইকে দিয়ে। গঞ্জের বড় ব্যাপারি ছিল তখন, রোয়াব ছিল। তা মুখের দিকে চেয়ে থাকার মত বউ নয়, তবে অন্নপূর্ণার কোলে সন্তান এসেছে। ছেলে আর মেয়ে। কেশবের ততদিনে বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, অত বয়সের ছেলেপুলের বড় হওয়া দেখতে পাবে কিনা এই নিয়ে মনে ভয় ছিল। সে সাধ পুরেছে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছেলেরও। তারা নিজেরাই এখন সন্তানের মা-বাপ। আর এক শান্তির ব্যাপাব হল অন্নকে নিয়ে পদে পদে ভয় নেই, জ্বলে পুড়ে মরা নেই। কে তার দিকে তাকাল, কার দিকে চেয়ে অন্নর ঠোঁটে হাসি ফুটল এসব না ভেবেই প্রায় চাবটে দশক পার করে দিয়েছে কেশব। দোকানে বসে বুক ধড়ফড় করেনি, বাড়িতে কেউ কি হঠাৎ এসে হাজিব হল—এই ভেবে। গঞ্জের সওদা ফেলে দৌড়ে, ঝাঁপিয়ে ঘরে ফেরেনি "মাথাটা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে, বউ কোথায় গেলি— একটু জল দে—"

আধ ঘোমটা টেনে অন্ন তার নিজের কাজগুলি নিশ্চিন্ত অনাগ্রহে করে গেছে দিনের পর দিন। এমনই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, যে, কোনটা মাস, কোনটা বছর তাও আলাদা করে মনে হয়নি কেশবের। অথচ যৌবনে এমন কাল গেছে যে এক একটি দিন একক আগুন শলাকার মতন নানা ভাবে বিঁধেছে কেশবকে। রাতে ঘুম হয়নি, দিনে খিদে হয়নি, হরিণ যেমন জল খেতে এসে বারবার এদিক ওদিকে চায়, চমকে ওঠে। সেইভাবে ছটফট করতে করতে শুকিয়ে মরেছে কেশব।

বাস এগিয়ে চলেছে। কোনও গুমটিতে তেল জল নিয়ে, কোথাও প্যাসেঞ্জারদের পান আর চা বিস্কুট খাইয়ে, হসুর, পালোগাম ছাড়িয়ে ধূলিওড়া পথ মাড়িয়ে নির্মম গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছে অন্যমনস্ক ভাবে। চল্লিশ বছর আগেকার ক্ষতগুলো হঠাৎ জেগে উঠে দুর্বল, মরণাপন্ন করে দিচ্ছে কেশবকে।

হ্যাঁ, না গেলে নয়, তাই যাওয়া। প্রথম প্রথম যখন বাস উঠিয়ে নন্দরবার চলে গিয়েছিল, তখন বছরে একবার আসতই। নিজেই এসে ঘর দোর ঝাঁট পাট দিয়ে, গোবর ছড়া দিয়ে থেকে যেত দু-তিন দিন। থাকা অবশ্য বলে না তাকে। আগুন লাগা মানুষের মতন রাত জেগে এ ঘর ও ঘর করা। দিনটা কোনও মতে ঘর বার করে কাটালেও, রাত কাটত না। তারপর দু তিন বছরে একবার আসা। গত পাঁচবছরে একবারও এ পথে আসা হয়নি। এবার চিন্তামন খবব পাঠিয়েছে, সংক্রান্তির মধ্যে বাড়ি চাই তাব। একেবারে খালি বাড়ি। দুই ছেলে বিয়ে করেছে, ছোট দুটো ঘরে তাদের আঁটছে না। আরে, কুলোচ্ছে না বলেই তো গতবছর নগদ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে বায়না করা। সে টাকা বুঝি কেশব খাটিয়ে ফেলেছে ব্যবসায়?

তাই আর গা নেই? চিন্তামন সম্পন্ন চাষী, সে যদি চায়, গাঁয়ে ও বাড়ি আর কাউকে বিক্রি করার হিম্মত হবে কেশবের? কেশব তো এখন বাইরের লোক, তাকে গ্রামে কে চেনে?

দয়ারামের হাতে পাঠানো চিঠিতে এই সব নানা ট্যাঁক ট্যাক করা কথা। শুনলে গা জ্বালা করে। অবশ্য সেই জন্যই লেখা। এখন তো কেশবের শাঁসালো শ্বশুর বেঁচে নেই, হাজার রকম শহরি ধান্দার চাপে পড়ে কেশবের নিজের ব্যবসার এখন-তখন অবস্থা, টাকারও দরকার। দু-তিন দিন থেকে সামান্য জিনিসপত্র যা আছে ছোট একটা ট্রাকে চাপিয়ে বাস একেবারে তুলে ফিরে আসতে হবে। দয়ারাম থাকবে, চিন্তামনের ছেলেরা আছে, সবাই একটু আধটু হাত লাগাবে।

সম্বন্ধীর লেখা কড়া হাত-চিঠি নিয়ে তার সঙ্গে চারটে খেতের মূলো; এক পা কাদামাটি দ[illegible] হাসতে হাসতে কেশবের বাড়ি।

"কি ক'রি বল তো দয়ারাম?"

"চিন্তামন-ভাউ বড় চটেছে হে, এবার তো পাঁচজনকে ডেকে বলেছে। বায়নার টাকা মার গেল। তুমি যাও, বাড়ি খালি করে দাও গে।"

বাড়ি ছেড়ে দেওয়া মানেই যে সব শেষ, তা কি আর জানে না কেশব। ওই শত্তুর-মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্কও শেষ। বাড়ির কোণে কোণে তার গন্ধ এখনও জড়ানো, ও বাড়ির মেঝেতে তার শিকড় বাকড়। এখনও ভর সন্ধ্যেবেলা উঠোনে দাঁড়িয়ে শুকনা কাপড় তোলে সে, আজও বাসন মাজে খিড়কির কুয়োতলায়। চিন্তামনের দুই ছেলে, তাদের বউ, নাতি পুতিরা ও বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে, শিমূলের সদ্যকাটা বীজের মতন উড়বে, কিশোরীর কী হবে তখন? আর কেশবই কি পাবে তাকে? যদিও দেখা কালেভদ্রে, বাড়িখানা একখানা বড়আশা ভরসা ছিল কেশবের, বুকের পাঁজরেরই মতো বলতে গেলে।

সন্ধের অন্ধকারে ঢেকে গেছে সহ্যাদি, পাহাড়ের পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে থাকা শাল, অর্জুন, পলাশ, আসনের অরণ্য। গাঁয়ের পথে বাতিগুলি হেঁটমুখে জ্বলে, ঘরে ঘরে বিজলির আলো, ছেলেরা পড়ছে, কোথাও টিভিতে সিরিয়াল চলছে। এ বাড়ির আলোহীন কপাল, বন্ধ দরজা জানালা, ধূসর অবয়ব—সবটা মিলিয়ে যেন বুড়ো কেশবের সামনে ধরা একখানি আয়না। বাড়ির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে কেশব, নির্নিমেষ। তার মনের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঝকঝকে আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা সজিনা ফুলগুলি, মাজাবাঁকা পারিজাত গাছটি যুবতী হয়ে ওঠে, চুলে ফুল পরে, সবুজ চিকমিকে গলা পারাবতরা আসে, আর ফস্ করে দেশলাই জ্বালার মনগড়া শব্দে ঝলমল করে ওঠে কিশোরীর মুখখানা, নাকের নীচে, উপরের ঠোঁট ছুঁয়ে মুক্তোর নথটি। তার পর সব, সব অন্ধকার।

দয়ারাম এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, ওর হাতে চাবি দিতে সদর খুলে দেয়। মেঝেতে অজস্র ধুলো, কুটো, খড়, বর্ষার জলের সঙ্গে উড়ে আসা অশ্বত্থ পাতা। কেরোসিনের ডিবরি জ্বেলে কুলুঙ্গিতে বসিয়েছে চিন্তামনের ছোট ছেলে, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বাড়িটার বুকের পাঁজর, কোমর, পিঠ উরু নিতম্ব...সব। আড়ামোড়া ভাঙছে নির্জন ধুলোমাখা বাড়ি, দুলে ওঠা আলো চমকাচ্ছে তার শরীরের নানা বাঁকে ..আবার কখনও

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে কোণের ঘর থেকে, কপাল ঠুকছে পাথরে গাঁথা দেওয়াল সিন্দুকে...।

নিচু নিচু ঘর ক'টি, পাথরের ফর্শি ঢাকা মেঝে। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে চৌকাঠ। এত নিচু ছাত, বলে খিলখিল করে হাসত সেই মেয়ে, ছাতে ঠেকত তার আঙুল, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ভাড়ার ঘরটারই ছাত যা একটু উঁচু, যদিও ঝুল কালিতে অন্ধকার। সংবৎসরের জ্বালানি কাঠ থাকে ঘরে, পাতা কাঠি কুটি সব, আর জল গরম করার মাটির হাঁড়ি। রাগ হলেই ও-ঘরে গিয়ে বসত মেয়েটা, ভিতর থেকে শিকল তুলে দিত, আর বাইরে ধড়ফড় করে মরত বোকা কেশব।

দোকান সামলে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরেছে, একটা দূর থেকেই ধাঁধিয়ে যেত দু'চোখ, দরজায় কে দাঁড়িয়ে ও? ওই নীল ফুল শাড়ি, খোঁপা, কানে ঝোলানো মোতির দুল—কাছে এসে রাগে ফুঁসিয়ে উঠত কেশব। নিজের বোকামিতে, ঈর্ষায়! "ও তুই, আমি ভাবি না জানি কে?"

"রোজ দেখছ, তাতেই ভুল!" খিলখিলিয়ে হেসে উঠত কিশোরী।

"চুপ কর। আজ এত সাজ কিসের, কোথায় যাওয়া হবে?"

"ও, মা," মেয়ের গালে কচি আঙুলগুলি, "কোথায় যাব? নীল শাড়িটা পরছি না কেন করে করে তো জ্বালিয়ে মারতে, না পরলে বলতে পছন্দ হয়নি। পরলে বলো, এত সাজ, অত সাজ! আর এই দুলটা তুমি নাসিক থেকে আনলে যে...মনে নেই? সেজেগুজে রুটি বেলব গো, রুটি, আর তোমার জন্য, হি হি হি, বেগুনের ভর্তা..."

এত হাসি কোথা থেকে আসে, ভাবত কেশব। ভাবত আর জ্বলে পুড়ে মরত। কেউ নিশ্চয়ই ওকে বলেছে, হাসির আওয়াজ কানে মিঠে লাগে। গরিবের ঘরের আধপেটা খাওয়া মেয়ের চামড়ার নীচে এত স্পষ্ট নীল শিরার জাল, এমন মসৃণ চুল যা খোঁপা বাধার অছিলাতেও গুটিয়ে শেষ করা যায় না, এত নরম হাত-পা...আর এ দুনিয়ার যত মানুষ কি ছাই ওকে দেখে ছুটে আসে। কই, বিয়ের আগে তো তাদের টিকিও দেখা যেত না? বুড়ো রফিকুল সে সবজির পসরা নিয়ে যাবে, এ বাড়ি পানে একবার তাকিয়ে হেসে, সামনের বাড়ির গোবিন্দ কাকা চায়ের দুধ চাইতে আসবে, চিনি গুড় ফেরাতে আসবে একশো বার। কেশবের খুড়তুতো পিসির, মাসতুতো মাসির এতগুলি জোয়ান ছেলে ছিল তাদের নাম কেউ জানত না আগে। বউদির হাতের রুটি তাদের মিষ্টি তো লাগেই, ভাজা করলাও গুড়ের চেয়ে তরিবত করে খায় এই দেওররা! বোঁচা নাকমুখ রাগে আরও কুটিল করে শুয়ে থাকে কেশব, মাথা ধরার নালিশ জানিয়ে খেতে চায় না। কিন্তু যতই শোয়ার চেষ্টা করুক ঘুম আসে না, ও ঘর থেকে মিষ্টি হাসি, বাসন-চুড়ির রিন্‌ঠিন, পুরুষ কণ্ঠের মশকরা—শুনতে রক্ত চেপে যায় মাথায়। বুক জ্বলে যায়।

কতবার মারতে হাত উঠেছে কেশবের, কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত। কতবার সাধ্যসাধনা করে ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক রাতে তাকে আদর করে খাইয়েছে কিশোরী। ভুলে গেছে বোকা কেশব। পরের দিনই হাট ফেরতা নিয়ে এসেছে নতুন বারো হাত শাড়ি কিংবা কানের গয়না—অথচ শাড়ি গয়না কিশোরীর অঙ্গে উঠতেই

আবার ঈর্ষায় ছত্রখান হয়ে গেছে তার বুক। কিশোরী অঙ্গের ভূষণ যেন সারা দুনিয়ার লোক তাকিয়ে দেখছে। আর তো কিছুই নেই বোকা, অসুন্দর কেশবের, ওই যা সব সে কিনে কিনে আনে তা ছাড়া। তা সে সবে যে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে কিশোরী, কষ্টটা শতগুণ বেড়ে যায়।

যদি কোনও গুণ থাকত কেশবের যাতে এই বিদ্যুৎকে বশ করা যেত। পুরনো হারমোনিয়াম কিনে গলা সাধার চেষ্টা করে দেখেছে লুকিয়ে। না, কোনো সুর নেই।হেঁড়ে গলা শুনলে গলির কালা বিড়ালটাও এঁটো খেতে আসে না। কেশব যদি তিনটে পাস হত অথবা কালো রোদ চশমায় তাকে যদি দেখাত সিনেমার হিরো, তাহলে যে কী ভাল হত!

তা নেই। বদলে তার থ্যাবড়া পুরু দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে যত হতকুৎসিত উচ্চারণ, যত নিন্দেমন্দ গালিগালাজ। তাই কি সন্তান এল না কিশোরীর কোলে। হবে কী করে, গভীর রাতের আলিঙ্গনে একদিন গাঢ় বিষাদে মেয়েটা বলেছিল, ভালবাসা ছাড়া হয় না এসব।

ভালবাসা নেই। নেই কি? ডিবরির দুলন্ত আলোয় ঘরের আড়ার দিকে চেয়েছিল কেশব, শুয়ে শুয়ে। বুকের উপর তার মজ্জমান জাহাজের মতো কিশোরীর সদ্য ভাঙা খোঁপা। কে আছে তার কিশোরী ছাড়া? সমস্ত রাগ, অভিমান, বিষণ্ণতা, নির্বুদ্ধিতা দিয়ে সে একজনকেই চেয়েছে প্রথম যৌবন থেকে, মা, বাপ, ছোট ভাই বোন কারও মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পায়নি, তার সমস্ত অকিঞ্চণ দিয়ে সে একটা মানবীকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে চেয়েছে, কিন্তু পায়নি। ওই সৌন্দর্যের বিভা, সে যেন এক অলীক রোদ, যা সরে গেলেই ঘন গাঢ় রাত। অনেক চেষ্টা করেও কিশোরীর হাসি, আদর, রহস্যের তল পাওয়া যায় না। দু'হাতের নখ দিয়ে, দাঁত দিয়ে ওই অতল অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে যখন কেশবের কণ্ঠ বেয়ে উঠে আসে বিষ, তখন সবাই বলে, লোকটার দশা দেখ। মনে শান্তি নেই, কেবল দুনিয়াকে দুষছে।

পাড়ার ছোকরারা হাসাহাসি করেছে, ওই ছাল ছাড়ানো গোসাপের অমন বউ! তাদের পাশদিয়ে হেঁটে যেতে কেশবের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছে, মনে হয়েছে কিশোরীকে ঘরে রেখে আসি। তখনও মেয়েরা বরের সঙ্গে হাঁটতে বোরোয় না গাঁ ঘরে, কিশোরীর যদিও বেড়ানোর ভারী শখ। কেশবের মা-ও মানা করেননি। ওকে যদি একেবারে নিজের করে নেওয়া যেত, ঢেকেঢুকে, কালো কাপড় দিয়ে মুড়ে...মাটির তলায় রেখে...কেউ যেন দেখতে না পায়,কেউ কোনও রঙ্গপরিহাস করতে না পারে...ভাবতে ভাবতেই গায়ের ঘাম ছুটে গেছে কেশবের। ছি, ছি, এ কি বিশ্রী চিন্তা! এমন ভাবতে আছে?

"বাড়িটাকে কী করে রেখেছেন কাকা," চিন্তামনের ছোট ছেলে বলছে, "এ সাফ সুরতো করতে আমাদের অনেক খসবে।" চিলতে সরু ঘরটার কয়েকটা টালি ফাঁক, ওখান দিয়ে ম্লান চন্দ্রালোক আসছে। চাঁদ ও তেলের আলোয় বোঝা যায় বর্ষার জল পেয়ে আগাছা গজিয়েছে কোনায় কোনায়। এ ঘরের এক চিলতে খাটে দু'জন ঘুমোত ওরা, কী করে ঘুমোত এত অল্প ওসারে? অন্ন আর কেশবের মাঝে যোজন সাদা বিছানা পড়ে থাকে, সেই দুস্তর নিরেট সাদা পার হয়েও ওরা দুটি সন্তান তৈরি

করেছে। কী ক'রে?

ভাঁড়ার ঘরের মেঝেটা একদম গেছে, সিমেন্ট করাতে হবে, ফর্শি ধরবে না মনে হচ্ছে, উঁকি মেরে বলে চিন্তামনের ছেলে, দেখুন কাকা! ওদিকে তাকাতে মন করেনা কেশবের, সে দেখছে খাবার জলের প্রাচীন জলায় কত মাকড়সার জাল, বলে, সিমেন্টের খরচা যা লাগে আমি দিয়ে দেব।

হাত বদল সংক্রান্ত অল্প কিছু খুঁটিনাটির পর চিন্তামনরা ভদ্রতা করে ওকে নিজেদের বাড়িতে ডাকে। "খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় এখানেই। কাল পরশু দুটো দিন আছে, কাগজপত্র ফাইনাল করতে হবে।"

কেশব রাজি হয় না। বলে "খেয়ে আসবো খ'ন, তবে শোবো এখানেই। পুরনো একটা খাটিয়া আছে, কম্বল দাও একখানা আব একলোটা খাবার জল। ব্যস্।"

কুলুঙ্গীর ওপরের দেওয়ালে প্রদীপের কালির দাগ। সেই মেয়েটা প্রদীপ দিত সাঁঝের। সারারাত ঘরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে কী? ইঁদুর? কেশবের শ্লেষ্মা জমা বুকে কি মজ্জমান জাহাজের মতো কালো খোঁপাব ভার? আবার? কি মারোনি আমায় কখনও না? কত মেরেছ, সারা পিঠে দাগ হয়ে গেছে দেখ, চুল তুলে এনেছ গোছা গোছা। গর্তে দাগে ক্লিষ্ট ওই পূব দেওয়ালটা ওই কি ওর পিঠ? অত ক্ষত? কেশবের ঘুম নেই, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভয়ে।

আমি চেষ্টা করেছিলাম। থানায় গেছিলাম আমাদের বংশে কেউ থানা পুলিশ করেনি। এত্তেলা দিয়েছি। বউকে পাচ্ছি না, ওকে খুঁজে দিন।থানায আধমন চিনি দিয়েছি, ঝাল মরিচ আখের গুড়। ভালো ফর্শি পাথর। সে কি খোঁজার জন্য, না কি না-খোঁজার জন্য কেশব? কে জানে, কেন?

সত্যি, কেন হাত উঠেছিল সে রাতে? মা গেছেন দলের সঙ্গে দেবীদর্শন করতে, খালি বাড়ি। অসহায় সুন্দরকে নিষ্পেষণে মারতে ইচ্ছে হয়েছিল। "কে ছিল ওই ছেলেটা, ট্রেনে যে তোর পাশে বসেছিল? বল বলতেই হবে!"

"কে জানে, ওকে আমি চিনি না, বলছি তো!" এক কথা একশোবার বলতে বলতে বিরক্ত কিশোরী তখনও জানে না কেশব ওর চুল ধরে টেনে তুলবে, পিঠে দাগ করে দেবে মেরে।

"বলতেই হবে, ওকে আমি শতবার দেখেছি। ওই চোখ, ওই নাক, ওই রকম ফর্সা রং। আমি বাদাম ছাড়িয়ে দেব বলে হাত ধুতে গেছি, আর এসে দেখি...দিব্যি ও পাশে এসে..."

নরম সবুজের মধ্যে দিয়ে তাদের স্বপ্নেব ট্রেন যাচ্ছিল সে বিকেলে। কামরায় ভিড়ভাট্টা, অথচ কেশব আর কিশোরী দুজনে মশগুল, শহরে থেকে সিনেমা দেখে হোটেলে খেয়ে ফিরছে, কিশোরীর চুলে জড়ানো ফুল, হাতভর্তি সবুজ কাঁচের চুড়ি। কেন বাদাম খেতে চাইল, পেট ভরাই ছিল। বউয়ের শখ মেটাতে হবে বলে ধুলোমাখা হাত বেসিনে ধুতে গেছে কেশব। এ গাড়ি দূরপাল্লার প্যাসেঞ্জার, ভাল গাড়ি, সব স্টেশনে থামে। হাত ধুয়ে, মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে ভদ্রস্থ হয়ে বেরিয়ে সিটের কাছে এসে জমে গেল কেশব। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক নওজোয়ান, বাদাম ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে কিশোরীর হাতে। ওকে দেখেও ওঠেনি লোকটা, কিশোরী

ভয়ার্ত মুখে ইশারা করছে, তাও। কী সাহস! কেশবের আংটিশুদ্ধ হাতের ঘুঁষিতে বক্তারক্তি হয়ে গেল ছোকরাব মুখ, ছিটকে পড়ল ছোকরা, তার মুখের রক্ত ছিটকে এল কিশোরীর নতুন শাড়িতে। কিশোরীর শাড়িতেই লাগবে। মাথায় খুন চড়ে গেল কেশবের, ছেলেটাকে মেরেই ফেলত, যদি না আশপাশের লোকজন চেঁচিয়ে হল্লা করে ওদের পরের স্টেশনে নামিয়ে না দিত।

পাশের গাঁ থেকে হাঁটতে হাঁটতে হা ক্লান্ত বাড়ি ফিরছে দুজনে। কিশোরীর শাড়িতে তখনও রক্ত, লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না।

এতদিন যা হয়েছে ঘরের মধ্যে, এবার যেন বাইরে ওকে বেআব্রু করল ওর স্বামী। পারলে চুলের ফুলগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে দিত ও, কাঁচের চুড়ি ভেঙে চুরমার করত রাগে।

কেশবের মা ফিরে এসে আর বউকে পায়নি।

বছরখানেকের মধ্যেই এখানকার পত্তন উঠিয়ে নতুন ব্যবসা পাতল কেশব। আগুনের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল বহুদিন, মা ধরে না পড়লে অন্নকে ঘরে আনাই হত না। কিশোবীর মা দু'তিনবাব এসেছে-গেছে, কুল পালানো মেয়ের মা হিসেবে তাকে দেওয়া হ'ত এক লোটা আলগোছে জল, আরএকটু গুড়। বলা হ'ত, মেয়ে ফিরলেও যেন সে তাকে এমুখো পাঠাবার চেষ্টা না করে।

কেশব মাঝে মধ্যে কিনে আনত নতুন শাড়ি, গয়না, সাজিয়ে রাখত আলমারিতে। কেনাও হল আবার মানুষটাকে হারাবার ভয় নেই। মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেখত তাব সাজানো ধনসম্পদ। তাতেই হয়তো মায়ের আনন্দ হচ্ছিল, আর একবার বিয়ে না দিলে ছেলের মাথাটা খারাপ না হয়ে যায়।

অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে কেশব প্রথম বুঝল সে কত নিশ্চিন্ত। কিশোরী তারই বইল, অন্নপূর্ণা তার হলই না। অন্নকে নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই, পৃথিবীর লোভী চোখ থেকে তাকে বাঁচানোর কোন দায় নেই কেশবের। কারণ অন্ন সারা দুনিয়ার ও সংসারের এজমালি, তার নয়। এইভাবে নিজস্ব অন্ধকারের খণ্ডটিকে বুকের মধ্যে রোপণ করে মন দিয়ে, নিশ্চিন্ত ব্যবসা করতে লাগল কেশব, আর ক্রমশ বুড়ো, কুঁজো, পার্থিব হতে থাকল। এত ভদ্র, শান্ত আর চুপচাপ, যে মরার আগে মা ধরেই নিয়েছিল ছেলে তার মাথাটা খুইয়েছে।

আকাশনীল ওই পাহাড় শ্রেণী, ওর বদল চোখে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। কত হাজার বছর হয়ে গেল চুপ করে শুয়ে আছে। ঘন বরষায় তার দেহে সামান্য সবুজের ছিটেফোঁটা যদি বা লাগে, শীতে হেমন্তে ন্যাড়া রুক্ষ পাথর। কেবল দূরত্বের জন্য অথবা আকাশের কাছাকাছি থাকে বলে এক নীলাভ মায়া লেগে থাকে তার গায়ে। ওই পাহাড়ের মতন নিরাভরণ, রুক্ষ, নির্জন কেশব। মানুষ নয়, যেন একটা কংকাল। কেবল হাড তার মজ্জার ভিতর। কিশোরী একদিন ছিল, আজ জীবনে নেই, তাতে কেশবের মধ্যে কিছু বদলায়নি। কেশব এতটাই প্রাণহীন যে তার বদল আর চোখে দেখাও যাবে না।

ট্রেনের ওই ছেলেটা, যে বাদাম ভাঙতে গিয়ে মাব খেয়েছিল, ও কি সত্যিই অচেনা ছিল কিশোরীর? খালি বাড়ির দরজায় পুরনো তালা লাগিযে চাবি চিন্তামনের

হাতে দিতে দিতে কেশব বোঝে সে এখনও চিহ্নহীন অতীতকে ভেবে চলেছে। ওরকম ছেলে কতবার সে দেখেছে কেশব। তাদে' সবাইকেই একরকম দেখিয়েছে কেশবের চোখে। সেই গমের মতো গায়ের রং। সুন্দর নাক, রসালো ঠোঁট, হো হো করে পায়রা ওড়ানো হাসি, টগবগে স্বাস্থ্য, চঞ্চল চোখ, কেশবেব পুরোপুরি উল্টো যারা, স্বভাবে মেজাজে মশকরায়। এরাই বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে কিশোরীকে তার কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছিনিয়ে নিতে, একবারই এদে' একটাকে নাকে ঘুঁষি মেরে কিছুটা রক্তপাত ঘটাতে পেরেছিল কেশব, নইলে সর্বদা রক্ত লেগেছে ওর নিজেরই বুকের মধ্যে। তবে সেই তো শেষবার! তারপব কেশব নিজেই প্রাণহীণ, ন্যাড়া পাথর হয়ে গেল।

ট্রাকটা রওনা করিয়ে দিয়ে এসেছে দযারাম। সামান্যই জিনিস ছিল খালি বাড়িতে। কয়েকটা আম-কাঠের সেকেলে বাক্স, ঘড়া-ফুটো হাঁড়ি ভারী পিতলের, ঠাকুরদার কালের কয়েকটা সেজবাতি, দুটো খাটিয়া, একটা লোহার খালি সিন্দুক। এবার বাসস্টেশনে যাবে কেশবকে রওনা করাতে।

"ও বাক্সটা ট্রাকে দিলে না?" দযারামের ভুরু কুঁচকে যায়।

"আমার সঙ্গেই নেব, বাসে।"

"ছাতে তুলতে হবে। আমরা বুড়ো হাডে আর পাবি নাকি তোলা-উপর করা?"

"ছাতে তুলব কেন, সঙ্গেই রাখব।" কেশব নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বলে। "আনাব সময ছাতে রেখেছিলাম, তখন খালি ছিল।"

"এখন বুঝি সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছ?"

দয়ারাম টিকিট কেটে আনতে যায়। বাড়ি পৌঁছতে বিকেল হবে বুঝে চিন্তামনেব বউ একরকম জোব করেই খাইয়ে দিয়েছে কেশবকে, চিন্তামনেব খুব ইচ্ছে ছিল না। টাকা পয়সার লেনদেন শেষ, এখন যা যাবে গাঁট থেকে। তা ছাড়া, ভাঁড়ার ঘরের মেঝের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বুড়ো কেশব। যদিও মেবামতির জন্য পাঁচশো টাকা ধরে দিয়ে গেছে দামে, ওসব পাথব কি আজকাল আব পাওয়া যায়? চিন্তামনেব বউয়ের মন বলছিল, বাড়ির মায়া কাটিয়ে যাচ্ছে, কেশবের মুখ কেমন খড়ি ওঠা, শুকনো, উপোস করলে শরীরের হাল আরও বিগড়ে যাবে।

মকর সংক্রান্তি। এদিন মুখোমুখি দেখা হলে মানুষের হাতে দিতে হয় তিল আর গুড়। বলতে হয়, তিল আর গুড় নাও, মিঠে কথা বোলো।

বিয়ের পর থেকেই একই ভাবে হেসে হেসে কিশোরী বলে গেছে, 'কত তিল দিলাম, কত গুড়, মিষ্টি কথা আর শুনতে পেলাম না।'

গলির বাঁকে এসে কেশব একবাব ঘুরে বাড়িটাকে দেখে। শূন্য পিঞ্জব পড়ে রইল। ম্লান শীতরৌদ্রে রয়ে গেল চল্লিশ বছর আগেকার কয়েকটা ছবি। দেওয়ালে কয়েকটি দাগ। কাজলের, কালির, মনখাবাপের। টাকা দিয়ে কিনেছে বটে চিন্তামন, কেশবের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই না ধূলিসাৎ হয়ে যায় এই খাঁচা। এর যে প্রাণ নেই।

বাস চলছে ফিরতি পথে। শীতের হাওয়ায় গালে, ঠোঁটে টান ধরে। চোখে জল আসে শীতবোধে। পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে হলুদ, শিশিরের গন্ধভরা চরাচরে। পরিযায়ী পাখিদের ডানার শব্দে আকাশ চমকে ওঠে ভাতঘুমে।

কেশবেরও ভাতঘুম গাঢ় হত, যদি না চিতলপুরার মোড় থেকে কনডাক্‌টার ঝামেলা শুরু করত।

দেহাতী মানুষজনের গামছাবিছানা রাখা ছিল, ততক্ষণ চোখে পড়েনি, এই লোকগুলি নেমে যেতেই কালো বাক্সটা চোখে পড়েছে। "এই এটা কার? উপরে তুলতে হবে, নামাও তোরঙ্গ।"

ঘুম জড়ানো চোখে ব্যাপারটা ঠাহর করে হাঁ হাঁ করে উঠেছে কেশব।

"হাত দিও না, হাত দিও না, বাক্স উপরে যাবে না, এখানেই থাকবে।"

তর্কবিতর্ক, ঝুটঝামেলা, নানা রকম মন্তব্য। কেশব ডবল ভাড়া দিতে চায়, মালের ভাড়াও, কনডাক্‌টর নেবে না। "এটা নীতির প্রশ্ন। বুঝলে?" হঠাৎ দেশের বিবেকের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে কনডাক্‌টর। "তুমি কি ব'লে আমাকে না জানিয়ে ভিতরে করলে এটা?"

সামান্য মালপত্র ও বেঢপ বাক্স নিয়ে ক্ষুব্ধ কেশব নেমে পড়ে। কালো ধুলো উড়িয়ে বাস চলে গেলে শিরীষের ছায়ায় বসে সঙ্গের শিশি থেকে একটু জল খায়। ফাঁকা, প্রায় স্তব্ধ চরাচরে রোদছায়ার যে গান চলেছে এখানে বসে তা শোনা যায়। কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধা চাবি বার করে বাক্স খুলে নিমগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকে কেশব।

ক'টি জীর্ণ হাড়। পাঁজরের, কোমরের, বাহুর। কিছু মাটি। মাটিতে লিপ্ত থাকা ঘাস, পাতা। ভাঁড়ারের মেঝের টালির জোড় শাবলে খুলে, মাটির হাঁ মুখ থেকে বার করে আনা। আনাড়ি বুড়ো হাতে মাঝরাতে করা সিমেন্টের জোড়াই। চিন্তামন রেগে আছে ওই মেঝে নিয়ে।

কিশোরীকে একা ফেলে আসা যেত না। ও বাড়িতে অন্য মানুষজন এলে ও মেয়ের ভাল লাগত নাকি!

ভাঁড়ার ঘরের ছাত উঁচু। তাই কি বার বার ওঘরে গিয়ে দোর দিত কিশোরী? সে রাতে নিঃশব্দে ঝুলে পড়েছিল, নীল নীল ফুল-ছাপ শাড়ির আদর গলায় জড়িয়ে।

অথচ মুক্তি পায়নি। তাকে শেকড়বাকড়ে জড়িয়ে রেখে দিয়েছে কেশব, প্রাণ ধরে ছাড়তে পারেনি। ওই ভাঁড়ারে কেশবের জন্ম হয়েছিল, ওর মেঝেতে পোঁতা হয়ে রইল কেশবের প্রাণের ভ্রমর।

এখন দুপুরে শিরীষের ছায়ায় বসে হঠাৎই এক বিরাট ফাঁকা গিলে খেতে আসে কেশবকে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে জ্বরের ভাব, রোদ্দুরের ভিতরের শীত। এত রাগ, এত ঝগড়া, এত টানাটানি—আজ ওই ক'টি নিরালম্ব জীর্ণ হাড় পড়ে আছে কেবল। ভিক্ষার পাত্রে ফুটো ক'খানি তামার পয়সার মতন।

তোরঙ্গের বন্ধ ডালার উপর মাথা নামিয়ে আনে কেশব। ভিতরের নিঃশ্বাসের শব্দ আপন মনে শুনতে শুনতে তার ঘুম পায়। 'খুব চেয়েছিলাম রে, বউ, তোকে, নিজেই জানিনি কত, রং রক্ত, মাংস, রূপ সব ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চাইতে চাইতে!' ঘুমের মধ্যে দীর্ঘ এক রেলগাড়ি কেশব আর কিশোরীকে নিয়ে ছুটতে থাকে, ছুটতেই থাকে দিগন্তের দিকে।

একদিন হৃদয়পুরে

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

মহাকাশের নিচে তীক্ষ্ণ এক চকখড়ি দিয়ে কে যেন টেনে দিয়েছে দাগ। পৃথিবীর বুক কেটে বিনা রক্তপাতে এই ট্রেন লাইনটি হৃদয়পুরের দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঠ, ক্ষেত, গাছ আর মানুষের ঘর বাড়ি। জলাশয়ে জল আদিম পৃথিবীতে ছিল, এখনো আছে। মনের ভেতর এইসব বহুকাল থেকেই ধরে রেখেছিল অজিন, ইদানীং ইচ্ছে করে, নয়নকে খুলে দেখায় সব কিছু। কথার জাদুতে বহুবার বলেছে সে, কিন্তু নয়ন নিতান্তই একটি সাধারণ মেয়ে, চোখের সামনে এই নিরুপদ্রব পৃথিবীটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি।তাই এই ভ্রমণ, এই শেয়ালদা ট্রেনে চাপা। অজিন বলল, 'বাঁচতে গেলে সবকিছু দেখেশুনে চেখে, তবেই বাঁচো নয়ন, দেখবে জীবনে একটা রহস্য আছে।'

আরো কয়েক বছর আগে হলে নয়নের কাছে ব্যাপারটা জ্ঞান দেওয়ার মতই শোনাত। কিন্তু এই দু-এক বছরের প্রেমে সে বুঝে গেছে পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আসে, তারা জগৎকে শাসন করতে ভালোবাসে। আর অন্যের মঙ্গলের জন্যই বুঝি আদব কায়দায় মাস্টারি করে পরের ভ্রম সংশোধন করার বাতিকটা চেপে যায় তাদের মাথায়। কপালের শিরা দপ দপ করে, নইলে চোখ বিপন্ন হয়।

ট্রেনটি ছুটতে শুরু করেছে। বনগাঁ লোকাল। দু'পাশে সেমি টাউন। কলকাতা শহরের বাড়তি মেদল জায়গাগুলি ছুঁয়েটুয়ে খেয়ালী মনে যাচ্ছিল। উল্টোডাঙার এখন নাম হয়েছে বিধাননগর, দমদম জংশন পেরিয়ে গেলে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন। রবিবারের সকাল পৃথিবীতে একেবারে নিষ্কলুষ হয়ে ফোটে।—এদের বয়স আর কতই বা হবে, মেয়েটি পঁচিশের মধ্যে, ছেলেটি কোনোক্রমে তা অতিক্রম করেছে। বয়স অল্প হলে কি হয়, একটি বালক খঞ্জনি বাজিয়ে গার্হস্থ্য চেতনার গান গাইছিল, তার—পয়সা চাই। যুবক-যুবতী ট্রেনের ভেতরে বসে যেন জানতে পারলে—এ পৃথিবী বহুকালের পুরনো।

কাছাকাছি ট্রেন ভ্রমণের একটি বিশেষ ধরন আছে অজিনের। বিশেষতঃ ফাঁকা সকালের ট্রেন। এরা দু'জন এসে গেটের সামনে হ্যান্ডেলটা ধরে দাঁড়াল। দু'দিকের দেওয়ালে দু'জন রেখেছে পিঠ, ফলে মুখোমুখি। আর দুরন্ত হাওয়ায় এলোমেলো করে দেয় মাথার চুল। শাড়ি শার্টের কলার উড়ে যায়। অচেনা বাড়ির ছাদের দিকে শুকোতে দেওয়া কোন শায়া বা গেঞ্জি দেখে তখন মনে হয় যেন বহুকালের চেনা বন্ধুর মত—

অজিন বলল, 'আমাকে তোমার আজকাল আর পছন্দ হয় না' তাই না?'

'জানোই তো।'

'তবু আসো কেন?'

'দায়। বহুকালের একটা দায় রয়ে গেছে। আমরা মেয়েরা খুব কোমল মনের হই, আর ফ্যাসাদে পড়ি—'

'ব্যাপারটা আমাদের বহুদিন আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল নয়ন। কেমন ভাবে জড়িয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে—'

'আমি গেলাম, না তুমিই জড়িয়ে গেলে আমার সঙ্গে?'

'তোমার কোনো সায় ছিল না, কোনা ইচ্ছে—'

'দ্যাখো, পরিস্থিতির চাপে পড়ে মানুষকে অনেক সময়ই অনেক কিছু করে ফেলতে হয়। জীবন তো আর সেভাবে এগোয় না। আবেগ এক, আর সংসার আরেক। এভাবে আমাদের আর এগোনো উচিত নয় অজিন।'

'আচ্ছা নয়ন'—

'বলো'—

'আমি তো খুব আলতো করে দাঁড়িয়েছি। একটি হাত তোমার পিঠে অন্য হাতে হ্যান্ডেল। ট্রেন কেমন জান্তব প্রাণীর মত উল্লাসে ছুটছে দ্যাখো। তুমি যদি, আমার অন্যমনস্কতায় একটুখানি ঠেলে দাও, মিটে যায় প্রবলেম। দেবে নাকি। হা হা হা'—।

'তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো, রোজ রোজ একইভাবে বিশ্রি রসিকতা করছ।'

'কেন, রোজ কোথায়?'

'আমরা যেদিন সাউথ ইস্টার্ণে ফুলেশ্বর গেলাম, সেদিনও তুমি একই কথা বলেছিলে। তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে দিতে পারি'—

'না, মানে—আমি সেকথা বলছি না।তবে যদি এটা হয়? হয় কেন, যদি ঘটে যায় তবে কেমন হয়? জাস্ট জোক, মজা করছিলাম—'

'দ্যাখো, আমার মনে হয় ইদানীং আমার সম্পর্কে তোমার কেমন যেন একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।'

'কী যা তা বলছ!'

'না না, ঠিকই বলছি।'

'বেশ বাবা, বেশ। না হয় ইচ্ছে করেই কোনো একদিন আমি নিজেই পড়ে যাবো। হলো তো?'

'আর ন্যাকামো করতে হবে না।'

'এমন সময় ট্রেন এসে দাঁড়াল দুর্গানগর স্টেশনে। আপ ট্রেনটি শহরের বিষাক্ত চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ক্রমশঃ যেন অন্য এক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বছর তিনেক আগে নয়নের সঙ্গে অজিনের পরিচয়। তখনো অজিন চাকরি পায় নি। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদটা অনুভব করল মায়ের মৃত্যুর পর। পৃথিবীতে একজনপুরুষ কতটা একা,অনাত্মীয়,সেটা বোঝা যায় মায়ের মৃত্যুর পর। পরিচয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই অজিন জেনে গিয়েছিল নয়নের সঙ্গে তার বিয়ে হবে না। কিন্তু কেন হবে না তা জানতে পারে নি। বরং ভেবেছে, কাজ করেছে, গান গেয়েছে। সময়ে অসময়ে নয়নের হাতদুটি খুব গুছিয়ে মুখের কাছে এনে বিষ খেয়েছে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নয়ন। জীবনের অনেক দিক তার পূর্ণ হয়নি, তাই লোভ রয়ে গেছে একটা। আর আকাঙ্খার যে তীব্র ঢেউ মাঝে মধ্যে হৃদয়ে

গিয়ে অচিন রাগিণীর মত বাজতে থাকে তাকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো মানে হয় না। ব্যাঙ্কে কাজ করে মেয়েটি, তাদের প্রাচীন পরিবার খুব ধীবে ধীরে জলুস হারিয়েছে। কখনো সখনো শক্তিমান যুবক মোটর বাইক উড়িয়ে, যৌবনের ধ্বজা দেখিয়ে গেলে দেখতে ভালো লাগে নয়নের। দারিদ্র এক ধরনের পাপ, সেইপাপকে জীবনে না জড়িয়ে ঝেড়ে ফেলাই বুঝি ভালো।

মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়। খিটিমিটি লাগে দু'জনের। আর তার ভেতর থেকে একেক জন কখনো কখনো নিজেকে খুঁজে পায়। পুড়ে যাওয়া, কিংবা পচে ওঠা শরীর থেকে তখন জল নামে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। এই সময় বড় খারাপ লাগে মানুষের। নরম মাখনের মত জায়গাটায় টান পড়ে।

'তুমি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ কর'—এই কথাটাই খুব আদর দিয়ে বলতে গেল নয়ন। অন্যমনস্ক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে অজিন, ট্রেনের বাইরে যে পৃথিবী দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে তারই দিকে। দরজার মুখে রাক্ষসের মত লোহার পাত। পিঠে আচমকা হাত পড়তে চমকে উঠল অজিন। যেন কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার নয়নের কাছে ফিরে এল।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'হৃদয়পুর। ওখানে চমৎকার একটা বকুল গাছ আছে, মাঠ আছে। তোমাব ভাল লাগবে।'

'এমনি করে ঘুরতে আসা'—

'কেন তোমার খারাপ লাগছে?'

'তোমাকে আমি ভালবাসি অজিন, তুমি কেন এমন করে কষ্ট দাও বলো তো?'

বিরাটী ছাড়িয়ে ট্রেন চলে এল নিউ ব্যারাকপুর এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াল। যারা যাত্রী তারা একটুঅন্য চোখে দেখছিল এই দু'জনকে। সম্পর্কটা বুঝি খুব খোলামেলা, বালকও বোঝে। বাদাম কিনে খেল নয়ন। শাড়ি উড়ে গিয়ে তল পেটের চাঁদ ছুঁয়ে হাওয়ায় উড়ল কিছুক্ষণ। ট্রেন চলতে শুরু করল, আবার ছুটল।

হঠাৎ হাত ফসকে, হ্যান্ডেল থেকে হাতটি খুলে গিয়ে চোখের মুহূর্তে পড়ে গেল অজিন।

ট্রেন যাত্রীরা হৈ-চৈ করে ওঠে, 'কী হল, কী হল?

ধড়াস করে উঠল নয়নের বুক। ততক্ষণে নিচের একটা রড ধরে কোনোমতে ফিরে এসেছে অজিন। অর্থাৎ বেঁচে আছে। আর একটু হলেই শব্দ করে ট্রেন থামত। রেল পুলিশ দৌড়াদৌড়ি করে গণ্ডগোল বাঁধাত সাত রকম। লোক, মধ্যবয়স্ক যাত্রী, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'পীরিত একবারে দরজার ধারে। অমন প্রেম নাই বা হল, প্রাণটি যেত যে লাখ টাকার।'

আরেকজন বলল, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের ভাই বলিহারি। ভয় ডর কিছু নেই, লাজলজ্জা কিছু নেই। দ্যাখো দ্যাখো, মেয়েটা কেমন দিনে দুপুরে লেপটে আছে।' এই বলে লোকটা যখন নাকের ভেতর নস্যি নিচ্ছিল ঠিক তখনই নয়ন অজিনেব পিঠে হাত রেখে বলল, 'তুমি ভাবোনি তো,আমি ঠেলে দিয়েছি তোমাকে?'

'অজিন শুধু গভীরভাবে ধরল নয়নের হাত। তবু সেই মুঠির ভেতর থেকে হাতটি যেন মোমের মত গলে আলগা হয়ে গেল। অজিন বলল 'আমরা এসে গেছি, এই তো হৃদয়পুর।

নয়ন ট্রেন থেকে নামতে নামতে বলল, আমার শরীরের রক্ত কিন্তু জল হয়ে গিয়েছিল। তুমি যে কী কর না—। এবার থেকে ট্রেনে চড়লে লক্ষ্মী ছেলের মত সিটে গিয়ে বসবে কিন্তু।

এই স্টেশনটির নাম হৃদয়পুর কিন্তু এই সবুজ, অদ্ভুত অদেখা জায়গাটিতে এসে নয়ন আর অজিন যেন একটু অন্যরকম হয়ে গেল। নয়নের বুকের ভেতর আলাদা আশঙ্কায় ভরে যায়। যদি কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেত তবে পুলিশ এসে আমাকে ধরত মার্ডারের দায়ে। অজিন কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে, না?

অজিন সিগারেট ধরিয়ে হাঁটছিল, একটা ডোবার পাড়ধরে। একটি হংস আর একটা হংসী জলে খুনসুটি করছিল। আজ যদি কিছু ঘটে যেত তবে পৃথিবী জানত, কাপুরুষ ছেলেটা আত্মহত্যা করল। কেন এভাবে তো জীবন চলার কথা ছিল না। নয়ন কেন ভালবাসল না তাকে, কেন তাকেঠেলে দিল চাকার তলায়। কেন তাকে এমনি ভাবে মরতে হল।

সারা দুপুর রোদ ঝরল শুধু, জ্বালা করল শরীর। পৃথিবীতে কোথাও কোনো শান্তি নেই, অশান্ত হৃদয়পুরে এলে টানাপোড়েন বাড়ে। একটি গাছের তলায়, খুব ছায়ায় বসে লাঞ্চ কেস খুলে হলুদ রঙেব ভাত আর মাছ খাচ্ছিল দু'জন ভাগ করে। বোধহয় কাঁকর পড়ল দাঁতে, বিষম খেল।

যেন এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের ঘাসের ওপর বসে অজিন আর নয়ন এই প্রথম বুঝতে পারল, তারা কেউ কাউকে ভালোবাসে না। শুধু আসে, বসে, খায় দায়, উঠে যায়।

নয়ন বলল, 'পেটটা কামড়ে ধরেছে—

'কোনখানটা?'

'বাঁ দিকটা দেখলে তো তাড়াহুড়োয় ট্যাবলেটটা আনতে ভুলে গেলাম—'

'খেয়ে দেয়ে বিছানায় একটু না গড়িয়ে নিলে আমার আবার চলে না।'

'কিন্তু এখানে আর আরামের শয্যাখানি কোথায় পাবে?'

'এখানে কেন, শান্তিতে যে কতকাল ঘুমোইনি তার তুমি কি জানবে নয়ন! ইদানীং ঠিকমত কাজ করে উঠতে পারি না। আর পড়াশুনো সে তো কবেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'একটি রবিবার, প্রেম করতে এসে তুমি কি এখন আমাকে এইসব শুনিয়ে জ্বালাতে চাও। সমস্যা সবারই আছে। একটু ভালো কথা শোনাতে পার না। সেই যে সঞ্জীবকুমারের 'অর্জুন' ছবিটার কথা বলছিলে সেদিন। বলো না—'

দু'জন যখন ডাউন ট্রেনে উঠল তখন দিনের আলো পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যেতে বসেছে। দত্তপুকুর লোকাল, সকালের থেকে ট্রেনটা একটু ভরেছে। তারপর জানালার বাইরে পৃথিবীতে জ্যোৎস্না নামতে দেখল নয়ন। সিট ছেড়ে উঠে এসে অজিন দাঁড়াল গেটের সামনে। পৃথিবী আবার ছুটছে। নয়ন এসে হাতটি ধরে হিড়হিড়

করে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার বসাল সিটটিতে। দু'টি বালক বালিকা মেঝেতে বসে দেখাচ্ছিল ম্যাজিক। দেখছিল ওরা দু'জন—প্রেমিক প্রেমিকা--।

একটি মেয়ে, অন্যটি ছেলে। কারোরই বয়স তেমন বাড়েনি। নিতান্তই নাবালক নাবালিকা। মেয়েটি সবাইকে বলল, 'যাত্রী সকল শুনুন—'

ছেলেটি বলল, 'এই দেখুন এই সুতোয় বাঁধা আছে দশটা ছুঁচ। কি চোখা। কি ধার এদের মুখে মুখে। এই সুতোটি, ছুঁচগুলি খাবে এই মেয়ে—

মেয়েটি বলল, 'যদি মরে যাই?'

ছেলেটি বলল, 'ভালোবাসা থাকলে মানুষ কখনো মরে না। যতদিন পৃথিবীতে তোমার কেউ আছে ততদিন তোমার মৃত্যু নেই। যেদিন প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে সেদিন মরে যাবে তোমার প্রাণ। নাও, খাও, নির্ভয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা।'

এই কথা শুনে পৃথিবীর জ্যোৎস্না যেন উঠে এল ট্রেনের কামরায়। যেন দেখতে চাইল কে এই জাদুকরী। মেয়েটি আস্তে আস্তে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নিল সুঁচসমেত সুতোটি।

অবাক চোখে দেখছিল নয়ন, দেখছিল অজিন। মধ্যমগ্রাম স্টেশন পেরিয়েছে ট্রেন। মেয়েটি দাঁতে দাঁত চাপল কচি কপালে, গালে পড়ল কষ্টের দাগ। যন্ত্রণা সারা মুখে যেন জলছবি আঁকছে। একেক বার যীশুখ্রীষ্টের মত চোখ দু'টি আকাশে তুলে মেয়েটি যন্ত্রণা দেখাচ্ছিল মানুষদের। একটি একটি ঢুকছে তার হৃদয়ে, হৃদয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, অন্তরদেশ। আর যাত্রীরা মেঝেতে বিছিয়ে রাখা গামছায় ফেলছে সিকি, আধুলি, দশ পয়সা, কেউ বা এক টাকার ধাতুমুদ্রা দিচ্ছে উৎকণ্ঠায়। চুপচাপ হয়ে গেল মেয়েটি, তারপর হাসল মানুষের দিকে চেয়ে। বলল, 'এ কি মজার খেলা দেখুন, একি মজার খেলা।' বলল, 'যদি আর না ছুঁচ পেট থেকে বেরোয়, আমি মরে যাব।'

ছেলেটি বলল, 'আকাশের দিকে চাও, আর ডাকো, দেখবে সুতোটি বেরিয়ে আসছে—

তারপর আবার মুখের ওপর দাগ পড়ল মেয়েটির। যন্ত্রণার সেই আলো আঁধারি যে জীবনের ওপর শেকড় ছড়িয়েছে। চোখের ভেতর শিরা লাল হতে থাকে। মেয়েটি সুতোটি বার করে আনে ঠোঁটের ভেতর থেকে। তারপর সেই থুতনি একটু একটু করে টানে আর বেরিয়ে আসে এক একটি সুঁচ। কিন্তু কোথাও কোনো রক্ত লেগে নেই, দেখে বোঝার উপায় নেই এগুলিই একজনের হৃদয় রক্তাক্ত করে বেরিয়ে এল।

ছেলেটি এবং মেয়েটি হাসল কিছুক্ষণ। জিভ দেখাল, দেখাল ভেতরটা। কোথাও কোন ক্ষত নেই। এইবার মেয়েটি সুতোসুদ্ধ সুঁচ দিল ছেলেটিকে।সেই তীক্ষ্ণ ধারালো দশটা সুঁচ। একটু আগে যেগুলি মেয়েটির শরীরের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, তাদের মুখে পুরে এবার যাদুকরের মতো চিবোতে লাগল ছেলেটি। একবার চোখ তুলে বলল, 'যদি মরে যাই—'

মেয়েটি বলল, 'ভালোবাসা থাকলে মানুষ কখনো মরে না। যতদিন পৃথিবীতে

তোমার কেউ আছে ততদিন মৃত্যু নেই। যেদিন প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে সেদিন মরে যাবে তোমার প্রাণ। নাও, খাও, নির্ভয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত কর—'

দমদম ক্যান্টনমেন্টের সামনে এসে ছেলেটি হোঁচট খেল গলায়। সবাই ভাবল, এই যা! যাদুকর টেনে টেনে বার করল সব ক'টা সুঁচ এবং সুতোটি। বলল, একি মজার খেলা দেখুন, একি মজার খেলা।'

হৃদয় হননের কাজ চলছিল ছেলেটির মধ্যে। এক একটা সুঁচ ভেতরে ঢুকে যৌবনের হাওয়ায় ফুলে থাকা অজস্র বেলুনকে যেন ফুটো করে দিচ্ছে, এইরকম মনে হচ্ছিল অজিনের। মানে ফুসফুসটা শেষ হয়ে যাবে। যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। এটা মার্ডার বা আত্মহত্যা নয়। নয়নের মনে হল চমৎকার খেলা।

শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে অজিন বলল, 'কেমন লাগল হৃদয়পুর?'

নয়ন বলল, 'আর কোনোদিন আসব না, কোনোদিন না।'

এই বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল নয়ন। মুখটা এই লোকজনে ভরা স্টেশনেই প্রকাশ্যে হাতের মধ্যে টেনে নিল অজিন, দেখল চোখে জল। পড়ছে না, শুধু ভরে উঠেছে। অজিন বলল, 'ভালোবাসা থাকলে মানুষ কখনো মরে না। আমাদের এত ভয় কিসের?'

নয়ন বলল, 'যদি আমি ঠেলে দিই?'

অজিন বলল, 'মরব না, বেঁচে যাবো পায়ের তলায় থাকা প্যাডেল রিং ধরে। কোনোক্রমে। তোমার এত ভয় কিসের? দেখে নিও।

কখন তোমার আসবে টেলিফোন

অরূপ সরকার

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল মনোময়—'মনোময় বলছি—'

'কি করছিলেন?'

'কিছু না। কয়েকটা ফাইল একটু উল্টে পাল্টে দেখছিলাম।'

'ব্যস্ত?'

'মোটেই না। তোমার ফোন মানেই সব কাজ ছুটি।'

'আবার ইয়ার্কি শুরু করলেন?'

'গড্ প্রমিস।'

'কবে থেকে ভগবান-টগবান মানছেন?'

'যদি বলি এইমাত্র।...শোনো, আজ আসছ কি?'

'যেতে পারি। কোথায়?'

'অ্যাকাডেমি। ছ'টায়।'

'ঠিক আছে।'—খুট্ করে রিসিভার রেখে দিল ইঙ্গিতা।

ইঙ্গিতার সঙ্গে মনোময়ের এইরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা নিয়মিতই হয়। প্রায়ই দুপুরের দিকে একজন অন্যজনকে ফোন করে। তারপর শুধু কথার পিঠে কথাচাপানো, মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথার জাল বোনা।

'দাদা, প্রেমালাপটা তাড়াতাড়ি শেষ করবেন?'—কোনো অচেনা সাবস্ক্রাইবার একদিন ক্রস্ কানেকশনে ঢুকে পড়েছিল ওদের কথাবার্তার মাঝখানে। বেচারা নির্দোষ। তৃতীয় পক্ষের যে কেউ মনোমত তার ঈঙ্গিতার দুবালাপ শুনলে ভেবে নিতে বাধ্য যে ওরা দুজনে একজন অন্যজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যারা নারী-পুরুষের যে কোনো সম্পর্কের মধ্যেই আঁশটে গন্ধ শুঁকতে ভালবাসে, তারা এই সম্পর্কে অবৈধ বা পরকীয়া প্রেম-ট্রেমও ভেবে নিতে পারে। আর অবৈধ প্রেম সম্পর্কে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালির অবস্থান খুব সন্দেহজনক। অনেকটা সেই 'আঙুর ফল টক'-এর মতো আর কী।

ঈঙ্গিতার একজন সুস্থ-সবল স্বাভাবিক স্বামী আছে। যে স্ত্রীকে সম্মান করে, বিশ্বাসকরে, সর্বোপরি ভালবাসে। সচ্ছল সংসার ওদের। খুব শিগগির ওর স্বামী ফোরহুইলার কিনবে। ইঙ্গিতাও আর পাঁচটা অতি সাধারণ মেয়ের থেকে একেবারে অন্যরকম। শিক্ষিতা, রুচিবোধ প্রখর। খুব অল্প বয়সে ভালবেসে, বিয়ে করা থেকে আজ পর্যন্ত স্বামী ইন্দ্রাশিস ওর প্রধান অবলম্বন। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওরা একশোভাগ তৃপ্ত আর সুখী।

একই কথা বলা যায় মনোময়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে। মনোময়ের স্ত্রী একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের। কথাবার্তায় পরিশীলিত তো বটেই, স্বল্পবাকও। মনোময় ভালবাসে ওর স্ত্রী অদিতিকে ঠিক তেমনই, যতটা ভালবাসা পেলে কোনো বিবাহিতা নারী

নিজেকে তৃপ্ত মনে করতে পারে। শুধু মন নয়, শরীর দিয়েও সে ভালবাসার প্রকাশ ঘটায় মনোময়, প্রায় প্রতিদিন। ও বলে, 'ভালবাসার পরিপূর্ণতা তো শরীর আর মন—এই দু'য়ের মিলনেই।'

মনোময় আর ঈপ্সিতার তবুও এই যে গভীর সম্পর্ক, প্রচলিত চেনা ছকের বাইরে এই যে মেলামেশা, মেলামেশায় কোনও জাগতিক চাওয়া-পাওয়া নেই, কোনও সংশয় আর সঙ্কোচের আড়াল নেই, নেই কোনও শঠতা কিংবা চতুরতার আশ্রয়—সেই ধরনের সম্পর্ক এই ছিন্নমস্তা পরিবেশে, এই হা-হা সময়ে নিজেদের কাছেই যেন অলৌকিক মনে হয়। ঈপ্সিতাকে কয়েকদিন দেখতে না পেলে মন খারাপ থাকে মনোময়ের, দেখতে পেলেও কিন্তু স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়না।ওর সঙ্গ, ওর নৈকট্য, ওর অস্তিত্ব ভালো লাগে, উপভোগ্য মনে হয়—এই যা। বহুবার ভেবেছে মনোময়, তবে কি ঈপ্সিতার প্রতি অবচেতনে জন্ম নিয়েছে প্রেম? নাকি দুজনের কিছু না পাওয়ার ক্ষত আছে, যা একজন অন্যজনকে শুশ্রূষা দিয়েছে, কাছাকাছি এনেছে? কোনোবারই মনের ভিতর আলোড়িত এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর পায়নি সে।

একদিন, সেদিন একটু বেশিমাত্রায় মদ্যপান করেছিল মনোময়। হঠাৎ রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে ফোন করে বসেছিল ঈপ্সিতাকে—রিসিভার ও প্রান্তে তোলামাত্র মনোময় বলেছিল, 'কাল তোমাকে আসতে হবে। কোনো অজুহাত নয়।' ঈপ্সিতা আপত্তি করেনি। শুধু বলেছিল, 'আজ কতটা খেয়েছেন?' মনোময় বলেছিল, 'মদ খেলে আমি মাতাল হইনা তুমি জানো। আজও হইনি। সম্পূর্ণ সুস্থ মাথাতেই বলছি—কাল তুমি আসবে।' 'আচ্ছা' বলে রিসিভার রেখে দিয়েছিল ঈপ্সিতা।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মনোময় সারারাত ঠিকমত ঘুমোতে পারেনি। একী করল সে। ঈপ্সিতা পরস্ত্রী। তাছাড়া এই মুহূর্তে কিছুটা অসুস্থও। কোন্ অধিকারে, শালীনতার মাত্রা কতটা ছাড়িয়ে সে ঈপ্সিতাকে এভাবে হুকুম করল। কেনই বা সে একাজ করল। কোনও নারীই তো আরও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নয়। তাদের যেমন শরীর আছে, প্রলোভন আছে সেই শরীরের, তেমনই তো মন বলে একটা বস্তু আছে বুকের গভীরে। সে মনের তল পেতে কোনও দিন তো অসুবিধা হয়নি মনোময়ের। স্ত্রী অদিতির প্রতিটি চাহিদা মনোময় অনুভব করে, উপভোগও করে। নারীকে ভোগ্য হিসাবে ভাবতে তো' সে শেখেনি কোনওদিন। তবে কেন সে আজ নিজে ভেঙে ফেলল শালীনতা বা রুচির সেই ঘেরাটোপ। পাকস্থলীতে অ্যালকোহলের উস্কানিই কি এরজন্য দায়ি? তবে কি সে আজকাল বেশি মদ খেলে মাতাল হয়ে যাচ্ছে? ভিতরে জেগে উঠছে পশুত্ব কিংবা শরীর সঙ্গ লাভের লোভ?

সেদিন সারারাত নিজেকে চূড়ান্ত নিগ্রহ করল মনোময়। নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকা অদিতির পাশে বসে একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে গেল সে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এলে জোর করে শরীরটা বিছানা থেকে তুলে ঘরময় পায়চারি করল বহুবার। দেওয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বারবার তিরস্কৃত করল। ঘুমন্ত অদিতির কানের কাছে মুখ নিয়ে গাঢ় অস্ফুট স্বরে কতবার বলল সে, 'দিতি বিশ্বাস করো, তুমিই আমার প্রথম আর শেষ প্রেমিকা।' মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অদিতির

উন্মুক্ত নাভিমূলে চুম্বন করল বারবার।

সকালবেলা বাজারে যাওয়ার পথেই সামনের পি সি ও থেকে ঈপ্সিতাকে ফোন করল মনোময়। সাধারণত এত সকালে ঈপ্সিতা ঘুম থেকে ওঠেনা। আজ রিং হওয়া মাত্র রিসিভার তুলল ঈপ্সিতা—'হ্যালো'—

'মনোময় বলছি'

'স্ট্রেঞ্জ! আপনি কি করে জানলেন আমি উঠে পড়েছি?'

'টেলিপ্যাথি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই এটাও জানেন আপনার মতই কাল সারারাত আমিও ঘুমোইনি!'

'সত্যি জানতাম না। শোনো, কাল রাতের ফোনটার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমার তোমাকে ওভাবে বলাটা ঠিক হয়নি।'

'কেন ঠিক হয়নি।'

'জানি না। তবে এটুকু জানি, আজ তুমি আসছ না। এই সপ্তাহেই আসছ না। আসছ সুস্থ হলে। তোমার যেদিন খুশি।'

—মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। তারপর ও প্রান্ত থেকে দূরাগত ক্লান্ত স্বরে ঈপ্সিতা বলে, কিন্তু আমি যে ওই ফোনটা পেয়ে খুশি হয়েছিলাম মনোময়দা। কাল সারারাত যে সেই খুশিতে আমি ঘুমোতে পারিনি। মনোময়দা বিশ্বাস করুন, আমি যে খুব বেশি খুশি হয়েছিলাম...খুব... ... ...।'

ভ্রমর আসে

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে নিজেকে খুব ভিখিরির মতো মনে হয়, মানিনীর পায়ের কাছে বসে বলতে ইচ্ছে করে, মুখ তোলো, মানিনী! দয়া কর আমাকে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, বিশ্বাস কর। স্বীকার করি, ভুল আমারই। তোমাকে আমি কখনও ভালবাসার কথা ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারিনি, বলতে পারিনি প্রতীক্ষার কথা। সামান্য একটা ভুলের জন্য শীতাংশু তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এ আমি সহ্য করতে পারি না! আমার দিকে তাকাও, দেখ কীরকম তছনছ হয়ে আছে আমার ভেতরটা!

এই কথাগুলো কতদিন মানিনীকে বলবার কথা ভেবেছে মধুকর, বলা হয়নি। পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে মিউজিয়ামের দিকের গেটটায় দাঁড়িয়ে আছে সে, পর পর তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে, মুখ তেতো, চতুর্থ সিগারেটটা ধরাবার আগে নীচে সিঁড়ির দিকে তাকাল। ওই তো মানিনী। ঘড়ি দেখল মধুকর। প্রায় চল্লিশ মিনিট সে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। কত চেষ্টাচরিত্র আর অনুনয়বিনয়ের পর মাত্র আধঘণ্টার জন্যে দেখা করতে রাজি হয়েছে মানিনী। তাও এল এত দেরি করে। টেলিফোনে মানিনীর কণ্ঠস্বর এত সুদূর মনে হয়, অভিমানে বুক ভারী হয়ে ওঠে মধুকরের।

অনেকদিন পর হলেও অল্প সময়ের জন্যে আসে মানিনী। সিগারেট ধরিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মধুকর। ফুটপাতের ধারে পার্ক করা আছে তার মোটরবাইক। সিটের ওপরে হেলমেটটা রেখে এসেছে ভুলে। মেট্রোর গহ্বর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে মানিনী হাসে, আর অমনি পৃথিবীর সব মুগ্ধকারী আলো এসে পড়ে তার মুখে। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে মানিনী বলে, আজ কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না, মধুদা!

ব্যাকুল গলায় মধুকর বলে, কেন মানিনী? শীতাংশু না এখন গৌহাটিতে! সাতদিনের আগে তো ওর ফেরবার কথা নয়!

অবাক দুটি চোখ তুলে মানিনী বলে, এত খবর রাখ কী করে তুমি?

কী করে যে রাখে এত খবর—সেসব কথা কি মানিনীকে বলা যায়? চুপ করে থাকে মধুকর। শীতাংশুকে কোনওদিন দেখেনি সে, দেখবার ইচ্ছেও হয়নি। মনে মনে দীর্ঘকান্তি এক পুরুষের ছবি এঁকে নিয়েছে। উন্নত নাসা, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে এসেছে, দু'চোখে উদাস দৃষ্টি। এরকম না হলে কি মানিনীর পাশে মানাবে শীতাংশুকে?

মাথায় হেলমেট পরে নেয় মধুকর। সিটের পেছনে বসে আলতো করে তার কোমর জড়িয়ে ধরে মানিনী। আহত সিংহের মতো গর-গর করে ডেকে ওঠে মধুকরের মোটর বাইক। এক লহমায় বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ে পার্ক স্ট্রিটে। হ্যাঁ, একদিন মধুকরকেই তো মনে মনে কামনা করেছিল মানিনী। হারিয়ে গিয়েছিল মধুকর, মেজদার বন্ধু মধুকর রায়। যখন ফিরে এল তখন মানিনীর সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবু তার

ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না এখনও সে। পাপ হয়। কতবার প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে আর কখনও আসবে না এভাবে। তারপর ফোনে মধুকরের গলা শুনতে শুনতে কী যে এক সম্মোহনে পেয়ে বসে...

খুব বেশি দূর যায় না মধুকর। ক্যামাক স্ট্রিটের ভারি নির্জন একটা রেস্তোরাঁর পরদাঢাকা কেবিনে মুখোমুখি বসে দুজনে। পাশের চেয়ারে হেলমেট নামিয়ে রাখতে রাখতে চিন্তিত মুখে মধুকর বলে, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর, মানিনী?

ম্লান হেসে মানিনী বলে, হঠাৎ এ কথা?

ঠিক এর পরই মধুকর ইচ্ছে করলে বলতে পারে, মুখ তোলো মানিনী! দয়া কর...কিন্তু কিছুতেই কথাটা বলা হয় না তখন। ডান হাতের তেলোতে চিবুক, পাতলা ঠোঁট, বাঁশির মতো নাক, চোখের গভীর কালো মণি আর বড় বড় পাতায় কৌতুক নাকি করুণা ঠিক বোঝা যায় না, মানিনীর ধনুকের মতো বাঁকা ভুরুদুটি সামান্য কুঁচকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে থাকে। কপালে কালচে লাল টিপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রীতিনীতি তুচ্ছ করে স্থির হয়ে আছে, তার ওপরে সরু সিঁথিতে সিঁদুরের অল্প আভা। মানিনীর গায়ের রং ফরসা বললে সবটুকু বলা হয় না, মধুকরের বলতে ইচ্ছে করে, মানিনী তুমি আসলে সোনালি এক মেয়ে! আমি জানি এ পৃথিবীর তুমি কেউ নও, অন্য কোনও গ্রহ থেকে কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ এখানে। যে কোনও দিন তুমি তোমার পিঠের লুকনো ডানা মেলে উড়ে যাবে। তার আগে একবার শুধু দয়া কর আমাকে। না, বলা হয় না কিছুই। এত গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি মধুকর।

পরদা সরিয়ে অর্ডার নিয়ে যায় বেয়ারা। একটু পরেই খাবার সাজিয়ে দিয়ে যায় টেবিলে। মধুকরের অস্থির দৃষ্টি, মুখের লালচে আভা, এলোমেলো চুল, স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড দেখে মানিনী। তার বুক টনটন ক   তখন বাইরে শরতের চমৎকার একটা দুপুর বয়ে যেতে থাকে। গভীর   শ্বাস কেবিনের আধো অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে দিতে ঘড়ি দেখবার চে   ।নী, একটু পরেই কিন্তু আমি উঠে পড়ব, মধুদা।

কাঙালের মতো মধুকর বলে, বসো, আর   সা, মানিনী! চার মাস পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। এই চার মাস আমি   ছিলাম কই একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না তুমি?

মানিনী এবার শব্দ করে হাসে, তুমি এখন ও সেই আগের মতো আছ, মধুদা! সেই দশ বছর আগে, সেই যেদিন মেজদার সঙ্গে প্রথম আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে এসেছিলে, সরস্বতী পুজো ছিল সেদিন, মেজদা বলেছিল খুব ছেলেমানুষ...এখনও সেরকম অবুঝ আর ছেলেমানুষ রয়ে গেছ তুমি!

সুদীপ্ত বলেছিল বুঝি?

মধুকরের গলায় বেদনার স্পষ্ট আভাস। মেঘের ছায়া যেমন করে ধানখেতের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যায় তেমনই এক চকিত-ছায়া তার মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মানিনী তার ঠোঁটের কোণে ভয়ংকর সুন্দর সেই হাসিটিকে ধরে রেখেই বলল, রাগ করলে?

নাহ্। অভিমানী গলায় মধুকর বলে।

রাগ করো না, প্লিজ! আমার দিকটা একটু বোঝবার চেষ্টা কর!

মধুকর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মানিনীর চোখের দিকে, অসম্ভব সেই উন্মাদের দৃষ্টি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না মানিনী, টেবিলে ঠাণ্ডা হয়ে আসা একরাশ খাবারের দিকে চোখ নামিয়ে এনে শান্ত ধীর গলায় বলে, তোমাকে একটা কথা বলব, মধুদা?

বলো।

রাগ করবে না তো?

না।

আমার একটা কথা রাখতে হবে তোমাকে। বলো, রাখবে?

রাখব।

আমাকে কথা দাও আর কোনওদিন তুমি আমাকে এরকম করে ডাকবে না, দেখা করতে চাইবে না!

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মধুকর, তোমার এ কথা আমি রাখতে পারব না, মানিনী! তার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ, তুমি আমাকে বরং মরে যেতে বল। আমি পারব, মানিনী। আমার কোনও মৃত্যুভয় নেই, বিশ্বাস কর!

ভয়ে শিউরে উঠে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টেবিলের উল্টোদিকে বসা মধুকরের ওষ্ঠ ছুঁয়ে দেয় মানিনী, ছি, ওরকম করে বলো না!

যেন অভিমানী শিশুকে প্রবোধ দিচ্ছে মা। হাত বাড়িয়ে মানিনীর ঠাণ্ডা কোমল হাতখানি ধরে থাকে মধুকর। হাত ছাড়াবার চেষ্টাও করে না মানিনী। না, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় না মধুকর। মানিনীর শীতল স্পর্শ তার শরীরের ভেতরেও যেন সঞ্চারিত করে অদ্ভুত এক অবসাদ আর ঘুম। যেন ওই হাত আর কিছুক্ষণ ধরে থাকলেই অতল এক ঘুমের জগতে ঢুকে পড়বে সে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওঠবার উপক্রম করে মানিনী, কাতর গলায় মধুকর বলে, তুমি কিন্তু কিছুই খেলে না!

কী ভেবে বোনলেস চিলি চিকেনের একটা টুকরো তুলে মুখে দেয় মানিনী, এক চুমুক জল খেয়ে আলতো করে রুমালে ঠোঁট মুছে নেয়, তারপর হঠাৎই চেয়ার ঠেলে উঠে পড়তে পড়তে বলে, চলি, মধুদা!

মধুকর কিছু বুঝে ওঠবার আগেই হরিণীর মতো দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় মানিনী। এরকম করেই আসে মানিনী, এরকম করেই চলে যায়। চিনে রেস্তোরাঁর আধো-অন্ধকারে কৃত্রিম ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মধুকর। তারপর বিল মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। শরতের রৌদ্রে ঝলমল করছে কলকাতা। উৎসবের ঋতু শুরু হল। চোখেমুখে দুপুরের উষ্ণ হাওয়া এসে ঝাপটা দিয়ে যায়। ভ্রূক্ষেপহীন মধুকর রাস্তা ক্রস করে এসে পার্কিং-এ দাঁড়ায়, হেলমেট পরে নিয়ে এক পলক দেখে নেয় তার মোটরবাইকটিকে। সিটে বসে কিক্ করতেই গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে মধুকরের মোটরবাইক। ব্যাঙ্গালোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর কিছুদিন সেখানেই একটা ছোট কোম্পানিতে চাকরি করেছিল মধুকর। কলকাতায় ফিরে এসে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবার আগে পণ্ডিতিয়া রোডের কার-বাজার থেকে এই সেকেন্ড-হ্যান্ড মোটরবাইকটা কিনেছিল সে। বাইকটা বিগত-যৌবন, তবু গর্জন করতে করতে প্রাণপণ ছোটে। রেসকোর্স পেরিয়ে উঠে পড়ে হাওড়া দ্বিতীয় সেতুর ওপর। পেছনে পড়ে থাকে কলকাতার অসহ্য ভিড়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, টেম্পো, ম্যাটাডোর। হাওড়া দ্বিতীয় সেতু

যেন এক লহমায় অতিক্রম করে যায় মধুকর। বকুলতলা পেরিয়ে ছোটে বোম্বে রোডের দিকে। বুকে অসম্ভব তৃষ্ণা, রক্তাভ চোখ দুটিতে পাগলের দৃষ্টি। একটু আগে রেস্তোরাঁর আধো-অন্ধকারে যাকে প্রায় ভিখিরির মতো দেখাচ্ছিল, এখন তাকে দেখাচ্ছে পেশাদার খুনির মতো। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে মধুকব। স্পিডোমিটারেব কাঁটা একশো অতিক্রম করে যায়। দুপুরের নির্জন বোম্বে বোড ধরে প্রায় উড়ে যাচ্ছে মধুকর। হ্যাঁ, খুনই করবে সে একদিন! শীতাংশুকে।

দুই

ভরদুপুরবেলায় ফোনটা বেজে উঠল।

মধুকরেরই ফোন হবে। এইমাত্র স্নান সেরে বেরিয়েছে মানিনী। ভুরু কুঁচকে ফোনটার দিকে তাকায় সে। জাপানি কর্ডলেস ফোন, কোন চোরাবাজাব থেকে শীতাংশু কিনে এনেছিল কে জানে। ভারি মিষ্টি শব্দটা। কলকাতার নানা বাজারে ঘুরে ঘুবে এরকম ছোটখাটো কত যে শখের জিনিস কিনে আনে শীতাংশু। সবই মানিনীকে সুখী করবার জন্যে। ড্রেসিংটেবিলে থরে থরে সাজানো সব কসমেটিকস, বিলিতি নাইটি, ঘড়ি, রোদচশমা—সবগুলো ভাল করে দেখাও হয় না মানিনীর। তবু আনে শীতাংশু। সামান্য চাকরি শীতাংশুর, মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের। দিশি কোম্পানি, খাটুনিও বেশি। মাঝেমাঝেই ট্যুরে যেতে হয় তাকে। শিলিগুড়ি, গৌহাটি, ইম্ফল, কোহিমা, আগরতলা। খুব গোছানো ছেলে শীতাংশু। অপব্যয় করে না, বাজে নেশা নেই, মাত্র ছ'বছর চাকরি করেই লোন নিয়ে কিনে ফেলেছে এই দু'ঘরা ফ্ল্যাটটা। শুধু এই একটা শখ, বিদেশি ছোটখাটো জিনিস দেখলে লোভ সামলাতে পারে না সে। এবার ট্যুরে গিয়ে শিলিগুড়ির বাগডোগরা মার্কেট থেকে একখানা এস্কিমো কম্বল এনে হাজির করেছে। কলকাতার পলাতক শীতে ও জিনিস খুব একটা কাজে লাগবে না, তাছাড়া মানিনীর নিজের ভাল লাগে লেপের ওমের ভেতরে ঘুমোতে, তবু সে বলেছিল, ভারি সুন্দর তো জিনিসটা! কী নরম!

তাতেই কী খুশি শীতাংশু! শান্ত, নম্র, ছোটখাটো চেহারা শীতাংশুর। বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক, খুব একটা সচ্ছলতা দেখেনি কখনও সে। ভাল করে শোক, দুঃখ কিংবা উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করতে শেখেনি। মানিনীর কথা শুনে বলেছিল, এর পরের বার গেলে বাবা-মার জন্যে আর একটা কিনে আনব। কোরিয়ান জিনিস, বুঝলে, নেপালের ধুলাবাড়ি দিয়ে স্মাগল্‌ড হয়ে সব ঢোকে, কলকাতায় এসব জিনিস লোকে চোখেই দেখেনি। সোদপুরের বাড়িতে দেখেছ তো, শীতকালে রোদ ঢোকে না, ঠাণ্ডাও পড়ে মারাত্মক। বাবা-মার খুব কাজে দেবে।

মানিনীর ইচ্ছে হয়েছিল বলে, এটাই দিয়ে এস না। আমাদের জন্যে পরে না-হয় আর একটা এনো।

বলা হয়নি কথাটা। বললে শীতাংশু এমন করে তাকাবে যেন মায়েরবকুনি খাওয়া শিশু, চোখ দুটি ছলছল করে উঠবে। ম্লান হেসে মানিনী শুধু বলেছিল, এর পরের বার যেন আবার ভুলে যেয়ো না।

দূরমনস্ক শীতাংশু বলেছিল, বড়দা-বড়বউদি তো বাবা-মাকে দুবেলা দুটো খেতে দিয়েই যেন উদ্ধার করছে। সেদিন হঠাৎ করে গিয়ে দেখি বাবার গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে,

মায়ের পায়ে চটি নেই। সব কিনে দিয়ে এলুম। আর একজন আছেন ছোড়দা, চাকরির ছুতোয় তার একবারও বাড়ি আসবার সময় হয় না জামশেদপুর থেকে! কাকে কী বলব বল।

বলতে বলতে মুখ ভার করে ফেলেছিল শীতাংশু। শ্বশুর-শাশুড়ি এ-বাড়িতে এসে থাকবে না, মানিনী জানে। থাকবার কথা উঠলেই বলবে, চারতলার ওপরে তোর ওই দু-ঘরা ফ্ল্যাট, বড্ড দমচাপা লাগে রে! তার থেকে এই বেশ আছি। বাপঠাকুরদার ভিটে, খোলা হাওয়া।

খোলা হাওয়া না ছাই! উত্তরে খাটাল, দক্ষিণে এঁদো ডোবা। আর চারিদিকে গায়ে গায়ে সব শ্রীহীন বাড়িঘর। আসল কথা ছেলের সংসারে থাকার ইচ্ছে নেই। মানিনীর কোনও আপত্তি ছিল না। সে মানুষ হয়েছে বড় একটা একান্নবর্তী পরিবারে, অনেক ভাইবোনের সঙ্গে। এই ফ্ল্যাটটায় প্রথম প্রথম এসে কী যে ফাঁকা আর শূন্য মনে হত চারদিকটা। তারপর হঠাৎ এরকমই এক নির্জন দুপুরে মধুকরের ফোন এল। বোধহয় মেজদার কাছেই ফোন নম্বর পেয়েছিল সে। ভয়ে ভয়ে ফোনটার দিকে তাকাল মানিনী। বাজতে বাজতে কেটে গেছে লাইনটা। মানিনী অপেক্ষা করে থাকে, একটু পরে আবার বেজে উঠবে ফোনটা। এত সহজে ছাড়বে না মধুকর।

শীতাংশুকে একদিন কথায় কথায় মধুকরের কথা বলেছিল মানিনী। ভুলে যায় শীতাংশু, ভুলে গেছে। সেই এস্কিমো কম্বলটার কথা ভুলে গেছে কবে। শোবার ঘরে খাটের নীচে প্যাকেটবন্দি হয়ে পড়ে আছে সেটা। আরও কত কিছু ভুলে গেছে শীতাংশু, শুধু মানিনীর সুখের কথা ভোলে না কিছুতেই। প্রেম নয়, সম্বন্ধ করে অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছিল মানিনী আর শীতাংশুর। তার পর থেকে সমস্ত কাজের মাঝে মানিনীর সুখের কথাই শুধু ভাবে বোধহয় সে। শীতাংশুর জন্যে অদ্ভুত এক করুণায় বুকের পাত্রখানি মাঝে মাঝে ভরে ওঠে মানিনীর, খুব বলতে ইচ্ছে করে, আমার জন্যে এত করো না, শীতাংশু। আমি যে কোনওদিন তোমায় প্রতিদান দিতে পারব না গো!

ফোনটা আবার বেজে ওঠে।

মধুকর যতই ডাকুক আজ কিছুতেই বেরোতে পারবে না মানিনী। সকালে অফিসে বেরোবার সময় শীতাংশু বলে গেছে আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে সে, বিকেল চারটের মধ্যে যেন তৈরি হয়ে থাকে মানিনী। কোথাও একটা যাওয়া আছে আজ। কোনও সিনেমায় কিংবা থিয়েটারে, রাতে কোনও চিনে রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে ফেরা হবে হয়তো। এরকম প্রায়ই করে শীতাংশু।

ডিসেম্বর শেষ হয়ে এল। বহু বছর পর এবার জাঁকিয়ে শীত পড়েছে কলকাতায়। বিছানার ওপর থেকে শালটা তুলে গায়ে জড়িয়ে নেয় মানিনী। দক্ষিণ শহরতলির এ জায়গাটা এখনও ঠিক জমজমাট হয়ে ওঠেনি। আশেপাশে অনেকগুলো প্লট ফাঁকা পড়ে আছে। দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বহু দূরে একটা ঝিলও চোখে পড়ে। ধার ঘেঁষে রেললাইন। শীতাংশু একদিন বলেছিল ওই ঝিলটাও নাকি প্লটে ভাগ হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে।

আলতো হাতে ফোনটা তুলেছে মানিনী, হ্যালো!

আমি মেজদা বলছি রে। ওপারে সুদীপ্তর গলা। একটু নিশ্চিন্তবোধ করে মানিনী।

মধুকর যদি সত্যি সত্যি ডাক দিত, তাকে ফেরাতে কি পারত সে? ছোট একটা শ্বাস ফেলে মানিনী বলে, কী ব্যাপার রে, মেজদা?

ভুলে গেছিস? সাতাশে ডিসেম্বর বাপ্পার জন্মদিন। মানে পরশুদিন। বিউটি এবার মোচ্ছাব লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে।

তাই বুঝি? কই, কদিন আগে আমার সঙ্গে গড়িয়াহাটে দেখা হল, কিছু বলল না তো বউদি?

দুর, বলবে কী করে? কালই তো মাত্র ব্যাপারটা মাথায় এসেছে ওর। বিউটি কীরকম ছেলেমানুষ জানিসই তো। একটা কিছু মাথায় ঢুকলে সেটা না করা অবধি শান্তি নেই। তুই শীতাংশুকে নিয়ে সন্ধে ছটার মধ্যে চলে আসবি।

দেখি। দেখি কী রে!

ওর ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে কদিন। অফিসে কীসব কাজের কথা বলছিল।

পরশু সন্ধেবেলায় শীতাংশুর কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা মানিনী জানে না। তা ছাড়া মেজবউদিকে একটু এড়িয়েই চলতে চায় মানিনী। মেজদার প্রেমের বিয়ে। বড়লোকের মেয়ে মেজবউদি, বিয়েতে ওদের বাড়ির মত ছিল না। একটু অহংকারও আছে মেজবউদির। ইচ্ছে করেই ছোট্ট মিথ্যেটা বলেছে মানিনী। ওপারে সুদীপ্তর গলায় একটু উদ্বেগের ছোঁয়াও—শীতাংশুকে আমার নাম করে একটা সি-এল নিতে বল পরশুদিন। না এলে বিউটি কিন্তু খুব রাগ করবে!

অনেক লোক নেমন্তন্ন করেছে বুঝি বউদি?

অনেক আর কোথায়? আত্মীয়স্বজন কজন, আমাদের বাড়ির সকলকে বলা হয়েছে, বিউটি ওর বাপের বাড়ির কাকে কাকে বলেছে ঠিক বলতে পারব না। বাইরের লোক বলতে একমাত্র মধুকর। ফোনে বলে দিয়েছি। মহা বাউণ্ডুলে ছেলে, ও ব্যাটা আসবে কিনা কে জানে! হয়তো ভুলেই মেরে দেবে!

মানিনী চুপ করে থাকে। অকারণেই ভেতরে একটা আনন্দের বুজকুড়ি ওঠে, আবার ভয়ও করে একটু। শীতাংশুর সামনে মধুকর আবার কী কাণ্ড করে বসে কে জানে! মেজদার স্কুলের বন্ধু ছিল মধুকর। তখন কতবার এসেছে ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। প্রথম যেদিন এসেছিল, সেই এক সরস্বতী পুজোয়, সেদিনই বোধহয় ভালবেসে ফেলেছিল মানিনী। গভীর গোপন সেই অনুভবের কথা কাউকে কোনওদিন বলা হয়নি। মধুকর কি টের পেয়েছিল? বাইরের ঘরে অঙ্ক কষতে বসে ঘন ঘন জল তেষ্টা পেত মধুকরের। ভেতরের বারান্দায় প্রস্তুত হয়েই থাকত মানিনী, মেজদার হাঁক পেলেই জলের গ্লাস নিয়ে হাজির। দুচোখে অসম্ভব তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকত মধুকর। আর মানিনীর মনে হত অচেনা কোনও সমুদ্রের বড় বড় সব ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তার ভেতরে।

জয়েন্টে মেজদা চান্স পেল যাদবপুরে, মধুকর চলে গেল বাঙ্গালোরে। যাবার আগে একদিন শুধু দেখা করতে এসেছিল গোপনে। স্কুল ছুটির পর গেটের কাছে এসে সেদিন ভয়ংকর চমকে উঠে মানিনী দেখেছিল মধুকর দাঁড়িয়ে আছে। একা। কোনও ভূমিকা না করে মধুকর বলেছিল, কাল আমি চলে যাচ্ছি, মানিনী। না, কোনও প্রতীক্ষার কথা বলেনি সে। বলেনি, চিঠি দিয়ো!

কথাটা বলে আর দাঁড়ায়নি মধুকর। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গিয়েছিল

অফিস-ভাঙা মানুষের ভিড়ে। মধুকর যখন ফিরে এল ততদিনে জীবন বদলে গেছে মানিনীর। বাবার মৃত্যুর পর দাদারা সব একজোট হয়ে তার বিয়ের জন্যে লেগে পড়ল। মেজদারই অফিসের এক কলিগ প্রস্তাবটা এনেছিল। শীতাংশুর। মানিনীকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজনই বোধ করেনি।

ওপার থেকে সুদীপ্তর গলা পাওয়া যাচ্ছে, ব্যাটাকে ফোনে পাওয়া মুশকিল। মোবাইলে ধরলাম শেষে। বোম্বে রোডের পাশে ধুলাগড় না কী একটা জায়গা আছে না, সেখানে নাকি ফ্যাক্টরি করেছে মিনারেল ওয়াটারের। ওসব জিনিসের এখন রমরমা বাজার। গলফ গ্রিন থেকে রোজ বাইক চালিয়ে যায় সেখানে, ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। ওই নিয়েই আছে। কদিন আগে লিন্ডসে স্ট্রিটে দেখা হল, বললাম এবার তোকে জোর করে একটা বিয়ে দেব, শুনে হা হা করে হাসল...এখনও সেরকমই আছে, আধপাগলা আর অস্থির!

সুদীপ্তর বয়ঃসন্ধিকালের বন্ধু, উচ্ছ্বাস আর শেষ হতে চায় না। মানিনী চুপ করে শোনে। মেজদাটা চিরকালই এরকম, বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, হঠাৎ কী খেয়াল হতে বলে, রাখছি রে। ছটার মধ্যে চলে আসবি কিন্তু!

লাইনটা কাটা যায়। মানিনীর হঠাৎ মনে পড়ল প্রায় দু-সপ্তাহ হতে চলেছে মধুকর ফোন করছে না। একটু দুশ্চিন্তা হয়। মধুকরের মোবাইল নম্বর আছে, তবু তাকে ফোন করতে কেমন ভয় ভয় করে মানিনীর। ফোনে অবশ্য সামান্যই কথা হয়, মধুকর হয়তো বলে, ভাল আছ, মানিনী?

হ্যাঁ।

আজ সারা সকাল শুধু তোমার কথা মনে পড়েছে। আবার কবে দেখা হবে তোমার সঙ্গে? কাল আসবে একবার অ্যাকাডেমির সামনে? দুপুর দুটোয়? আধঘণ্টার বেশি ধরে রাখব না তোমাকে।

জোর করেই হাসে মানিনী, নাই বা হল আর দেখা! তুমি বড় অবুঝ, মধুদা! আমার অবস্থাটা একটু বোঝবার চেষ্টা কর। এভাবে দেখা করা কি উচিত? তার চেয়ে বরং তুমি একটা বিয়ে কর, মধুদা...

খুব উৎসাহ নিয়ে বলবার চেষ্টা করে মানিনী। ও প্রান্তে মধুকরের ম্লান গম্ভীর মুখখানা দেখতে পায় মনে মনে। আবোলতাবোল কত কি কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী ভেবে থামে খানিক। বিষাদগ্রস্ত গলায় মধুকর বলে, রাখি, মানিনী। তোমাকে আর বিরক্ত করব না কোনওদিন!

ওটা কথার কথা। মানিনী জানে। আবার ফোন করবে মধুকর, নির্জন কোনও দ্বিপ্রহরে। করেও।

ঘড়ি দেখল মানিনী। দেয়ালের কোয়ার্টজ ঘড়িতে মোটে বারোটা বাজে। ব্যালকনির খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢোকে ঘরে। শীত করে মানিনীর। দূরে ঝিলের ওপরে গাঢ় নীল আকাশে কয়েকটা চিল ঘুরে ঘুরে ওড়ে। দুপুরের ফাঁকা নির্জন ফ্ল্যাট, বুকের ভেতরটা রিক্ততায় খাঁ খাঁ করে ওঠে মানিনীর। বুককেস থেকে একটা বাংলা উপন্যাস বের করে পড়বার চেষ্টা করে। মন বসে না। শোবার ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, গভীর এক দৃষ্টিতে নিজেকেই দেখে খানিক, তারপর মনে

মনে নিজের প্রতিবিম্বকেই প্রশ্ন করে, তুমি কাকে ভালবাস, মানিনী? শীতাংশুকে না মধুকরকে?

প্রতিবিম্বের ঠোঁট কাঁপে, মুক্তোর মতো দাঁতে অধর কামড়ে ধরে, বোধহয় বলতে চায়, পারব না, আমি বলতে পারব না!

তিন

উৎসাহটা যে সুদীপ্তরই বেশি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

নীচের হলঘরটা জন্মদিনের জন্যে বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ডেকোরেটরকে দিয়ে। বেলুন আর রঙিন কাগজের শেকল এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত টানা। মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিলে সাজানো হয়েছে জন্মদিনের কেক। সুদীপ্তর বউ বিউটি বোধহয় পার্লার থেকে খোঁপা করিয়েছে, দামি একটা কাঞ্জিভরম পরে সে অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা দেড়শোর কম হবে বলে মনে হল না মানিনীর। মেজদাটা চিরকালই ধান্দাবাজ। ঢাকুরিয়ার বাড়িতে থাকতেই সন্তোষপুরের সার্ভে পার্কে এই প্লটটা কিনে রেখেছিল লুকিয়ে, বউদিকেও জানায়নি। বাড়িটা যখন হয় তখনও সাড়াশব্দ বিশেষ করেনি। মানিনী শুনেছে একদিন হঠাৎই নাকি বোমটা ফাটিয়েছিল খাবার টেবিলে। শুনে বড়দা আর ছোড়দা স্তম্ভিত। কারও মুখে কোনও কথা ফোটেনি। সবে বাবা মারা গেছেন, মা তখনও শোক সামলে উঠতে পারেননি। তার ওপর ডায়াবিটিস আর ব্লাডপ্রেসার এই দুই কালান্তক রোগে কাহিল। তার জন্যে পরোযা করেনি মেজদা, এক মাসের মধ্যে উঠে এসেছিল এ-বাড়িতে। মেজদা অবশ্য পৈতৃক বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়েছে। তবে সেটা বড় কথা নয়, এভাবে লুকিয়ে বাড়ি কববাব জন্যে অন্য ভায়েরা কথা শোনাতে ছাড়েনি। হোক না একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াব, সরকারি চাকরি করে এত টাকা পায় কোথায় ও? নিশ্চয়ই উপরি আছে! বাবা সারাজীবন কলেজের মাস্টারি করে গেছেন, তখন এত টিউশানির রমরমা ছিল না, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইদের আয়ও ভাল ছিল না, বলতে গেলে একাই যৌথ পরিবারের বোঝা টেনে গেছেন, কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি জীবনে। তার ছেলে ঘুষ খায়! এ সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে মেজদা। একটাই বুলি মেজদার—আনন্দে থাকো!

মধুকর এল রাত ন'টার পর। ততক্ষণে কেক কাটাফাটা হয়ে গেছে। লাস্ট ব্যাচের কজনের মাত্র বসার বাকি তখন। তার মধ্যে শীতাংশু আর মানিনীও রয়েছে। মধুকরের সেই উদভ্রান্ত চেহারা, উসকোখুসকো চুল। গায়ে লেদারের জ্যাকেট, বাঁ বগলে হেলমেট। নিজের শোবার ঘরে বোধহয় ঘনিষ্ঠ কজন বন্ধুকে নিয়ে পানে বসেছিল সুদীপ্ত, মধুকবের হাঁকডাক শুনে ছুটে এল—এতক্ষণে আসবার সময় হল তোর, রাস্কেল!

কী করব বল? ওয়েস্ট বেঙ্গলে কারখানা চালানোর হ্যাপা তোরা কী করে বুঝবি? খোঁজখবর তো কিছু রাখিস না!

জিঞ্জার মার্চেন্টদের শিপিং-এর খবর নিয়ে কী হবে?

অন্যমনস্ক মধুকর বলে, জন্মদিনে হেভি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিস মনে হয়? আর তোদেরই তো দিনকাল এখন!

লাজুক হাসে সুদীপ্ত, না, তেমন আর কী! বিউটিরই পরিকল্পনা এসব। ছেলেকে

নিয়ে ওর একটু আদিখ্যেতা আছে, জানিসই তো।

মধুকরের চোখ উৎসবের আলোয় মানিনীকে খোঁজে আর ঠিক এসময় শীতাংশুর ওপর চোখ পড়ে তার। প্রায় ফাঁকা হলঘরটার এক কোণে চুপ করে বসে আছে শীতাংশু। চারদিকে ছড়ানো ডেকোরেটরের চেয়ার। দু-তিনটে ষণ্ডামার্কা ছেলে, সুদীপ্তরই চামচে হবে বোধহয়, একটু দূরে বসে নিচু গলায় গল্প করছিল। এখন সবাই মধুকরের দিকে তাকিয়ে আছে। হাতের ইশারা করে সুদীপ্ত ডাকে, এসো, শীতাংশু, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই!

বাধ্য ছেলের মতো উঠে আসে শান্ত, নিরীহ, ভিতু শীতাংশু। তার কাঁধে হাত রেখে সুদীপ্ত বলে, এই যে, এ হচ্ছে মধুকর রায়, আমার বন্ধু, ইঞ্জিনিয়ার কাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট!

দু হাতে শীতাংশুর হাত চেপে ধরে মধুকর, হঠাৎ তার ভাষা হারিয়ে যায়, কী বলতে হবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না, অসম্ভব জোরে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, মানিনী কোথায়?

দোতলার সিঁড়ির দিকে ফিরে সুদীপ্ত চেঁচায়, মানু! মানু! দেখবি আয় কে এসেছে!

অল্প নেশা হয়ে এসেছে সুদীপ্তর, একটু জোরেই ডেকেছে সে। দোতলার বসবার ঘরে বসে বোধহয় বিউটির সঙ্গে গল্প করছিল মানিনী। তিনজনেরই দৃষ্টি এখন দোতলার সিঁড়ির দিকে। ধীর পায়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে মানিনী। পরনে চন্দন রঙের বালুচরী, আঁচল ঘুরিয়ে এনে কোমরে গোঁজা, একটা হাত আলতো করে রেখেছে মেহগিনি রঙের রেলিং-এ। সামান্যই প্রসাধন করেছে মানিনী, তবু কী যে অসামান্য দেখায় তাকে। মনে মনে শীতাংশু বলে, মানিনী, তুমি আমার। আমার একার! মধুকরের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, হে সোনালি মেয়ে, আমি জানি এ পৃথিবীর তুমি কেউ নও, অন্য কোনও গ্রহ থেকে কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ এখানে! একদিন তুমি ঠিক পিঠের লুকনো ডানা মেলে উড়ে যাবে ফের! তার আগে একবার শুধু দয়া কর...

সুদীপ্তই গলা তোলে, হেভি মাঞ্জা দিয়েছিস তো মানু আজ তুই!

নিজেকে সামলে নিয়ে মধুকর বলে, এসো, নেমে এসো, মানিনী! মনে হচ্ছে কত যুগ পর তোমাকে দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে থমকে দাঁড়ায় মানিনী। মহা-মিথ্যুক মধুদাটা! তিনদিন আগে দেখা হয়েছে। ফোন করে করে বিরক্ত করেছে দুদিন। বাধ্য হয়েই গিয়েছিল মানিনী। আলিপুর জুর ভেতরে ঝিলের ধারে পুরো এক ঘণ্টা ছিল সেদিন। ঘরে ফিরে প্রতিজ্ঞা করেছিল মানিনী, এই শেষ। আর কোনওদিন যাব না, মধুদা! শীতাংশুর প্রতি অন্যায় করতে বলো না আর আমাকে!

মিন মিন করে শীতাংশু বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে, মেজদা। এরপর কি আর ট্যাক্সি পাব?

হ্যাঁ, ওপরে গিয়ে বসে পড় তোমরা এবার। লাস্ট ব্যাচ বসছে বোধহয়।

বলে মধুকরকে টানতে টানতে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায় সুদীপ্ত। সেখানে স্কচের ফোয়ারা ছুটেছে আজ। নিজের সবটুকু সুখ বন্ধুকে মেলে না দেখানো পর্যন্ত যেন শান্তি হচ্ছে না সুদীপ্তর।

ফেরার সময় ট্যাক্সিতে শীতাংশু বলে, তোমার দাদার বন্ধুটিকে কিন্তু বেশ দেখতে। নায়ক নায়ক চেহারা।

দূরমনস্ক মানিনী শুধু বলে, হুম্!

এভাবেই দিন কাটে মানিনীর। দীর্ঘ এক একটা দিন। সকাল দুপুর রাত্রি। মাঝে-মাঝে মধুকরের ফোন আসে ভর দুপুরবেলায়। দেখা করার জন্য বায়না করে। শীতাংশুর মুখখানা মনে পড়ে, তখন পাপবোধ হয়, এড়িয়ে যায়। আবার এক একদিন যখন সম্মোহনে পেয়ে বসে, দেখাও করে। অবুঝ অস্থির মধুকর, স্পষ্ট করেও কোনও দিন কিছু চায় না সে। শীতাংশু ট্যুর থেকে ফিরে এলে গভীর রাতে তাকে জাগিয়ে অনেক আদর করে মানিনী। ঘুমভাঙা দুচোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে শীতাংশু, ঠিক যেন চিনতে পারে না মানিনীকে। ভোরবেলায় যখন নতুন আর একটা দিন শুরু হয় সব ভুলে যায় শীতাংশু। অফিস ছুটির পর খিদিরপুরের চোরাবাজার ঘুরে মানিনীর জন্যে কিনে আনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিদেশি জিনিস। চিনেমাটির জার্মান পুতুল, বিলিতি ঘড়ি, জাপানি নাইটি। একদিন পার্ক স্ট্রিটের একটা নিলামের দোকান থেকে কিনে ফেলল একটা মেহগিনি কাঠের পুরনো রকিং চেয়ার। মুটেরা সন্ধেবেলায় এসে পৌঁছে দিয়ে গেল চেয়ারটা। দক্ষিণের ব্যালকনিতে চেয়ারটা পেতেছে শীতাংশু। বউকে বলেছে, যেদিন খুব জ্যোৎস্না হবে সেদিন এই চেয়ারটায় বসে দোল খেয়ো, মানিনী।

এ ভাষা শীতাংশুর নয়, মানিনী অবাক হয়ে তাকিয়েছে। লজ্জা পেয়ে শীতাংশু বলেছে দক্ষিণের ওই ব্যালকনিতে তো কোনও বসবার ব্যবস্থা ছিল না, তাই নিয়ে এলাম এটা। গ্রীষ্মকালে হাওয়া খেতে পারবে।

সেদিনই সন্ধে সাতটা পনেরোর দার্জিলিং মেলে শিলিগুড়ি যাবে শীতাংশু। টিফিনকৌটোয় যত্ন করে রাতের জন্যে পরোটা আলুর দম গুছিয়ে দিতে দিতে চোখ দুটি ভারী হয়ে ওঠে মানিনীর। একটা কথা গলার কাছে উঠে এসে আটকে থাকে— এত যে কর আমার জন্যে আমি তো কোনওদিন তার প্রতিদান দিতে পারব না, শীতাংশু!

শীতাংশু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ মন খারাপ হয়ে থাকে মানিনীর। দক্ষিণের ব্যালকনিতে সদ্য আনা রকিং চেয়ারটায় বসে দোল খায় খানিক, তারপর কী ভেবে শোবার ঘরে এসে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়ায়, মনে মনে সেই পুরনো প্রশ্নটাই করে আবার, কাকে ভালবাস তুমি, মানিনী?

প্রতিবিম্বের ঠোঁট কাঁপে, কিছুই বলে না।

চার

তারপর একদিন জুলাই মাসের এক মেঘলা দুপুরে অমোঘ নিয়তিব মতো দৃশ্যটা দেখতে পেল শীতাংশু।

হেড অফিসের জরুরি কল পেয়ে দুদিন আগেই শিলচর থেকে ফিবতে হয়েছিল শীতাংশুকে। হোটেলে রাতেই মেসেজটা পেয়েছিল সে, ফোন করে আর জানানো হয়নি মানিনীকে। কোম্পানির লোক এসে হোটেলেই টিকিট দিয়ে গেছে, সকালের ফ্লাইট। শেষরাতের দিকে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে শিলচরে, ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতেই

ব্রিফকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল শীতাংশু, তখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি চলছে। একটা অটো ধরে এয়ারপোর্টে এসে দেখল খারাপ আবহাওয়ার জন্যে ফ্লাইট ডিলেড হয়ে গেছে দু ঘণ্টা। দমদমে নেমে আর দেরি করেনি শীতাংশু, সোজা চলে গিয়েছিল বি.বি.ডি বাগের হেড কোয়ার্টারে।

দুপুরে কাজ সেরে মিনিবাসেই ফিরছিল শীতাংশু। ধাবমান বাসের জানালা থেকেই দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। মেঘভাঙা ক্ষণিক আলোয় ঝলমল করে উঠেছে চারদিক আর সেই আশ্চর্য আলোর প্লাবনের মধ্যে ভিজে রেড রোড ধরে তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে মধুকরের মোটরবাইক। মাথায় ইস্পাত রঙের হেলমেট, পরনে নীল জিনস, বুকখোলা শার্ট, সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে আছে মধুকর আর ডান হাতে তার কোমর আঁকড়ে ধরে পিঠের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে আছে মানিনী। তার জংলাছাপের সিন্থেটিক শাড়ির আঁচল হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে। না, শীতাংশুর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এরকম অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য সে জীবনে কখনও দেখেনি। মাত্রই কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী একটা দৃশ্য, তবু শীতাংশু টের পায় সহসা এক তীব্র অভিঘাত তার মাথার ভেতরে একটা ফিউজ কুট্ করে কেটে গেছে।

মিনিবাসের সামনের দিকে জানালার কাছে একটা সিটে বসেছিল শীতাংশু। কোলের ওপরে তার ভ্রমণসঙ্গী ব্রিফকেস আর ছোট্ট সাইডব্যাগ। জানালা দিয়ে হু হু করে গঙ্গার ভিজে হাওয়া ঢুকছিল। আর অপরূপ সেই আলো। সামনের সিটের পিছনে লোহার রডটা দু হাতে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজল শীতাংশু। মাথার ভেতরটা ফাঁকা, সেখানে কোনও চিন্তা নেই, স্বপ্ন নেই, কোথাও যাবার কোনও তাড়া নেই, শুধু প্রাচীন এক ঘড়ির একটানা টিক টিক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। ঘড়িরই শব্দ নাকি দ্রুত রক্ত চলাচলের শব্দ কে বলবে?

দাদা, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে?

চোখ মেলে পাশের লোকটির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকায় শীতাংশু। ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা, নিজেকে বড় উজবুকের মতো মনে হয়। কোনও শোক নয়, দুঃখ নয়, বুকে হঠাৎ প্রবল কোনও ধাক্কা খাওয়ার অনুভব নয়, যেন অবচেতনে শীতাংশুর জানাই ছিল এরকম কোনও দৃশ্যের মুখোমুখি একদিন তাকে হতেই হবে। শুধু মাথার ভেতরে ছোট্ট ওই ফিউজটা...

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শীতাংশু। ভুরু কুঁচকে মাঝবয়সী লোকটা আবার বলে, শরীর খারাপ লাগছে? খুব ঘামছেন কিনা তাই বলছিলাম।

অস্পষ্ট একটা 'না' বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে শীতাংশু। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরেটা চেনার চেষ্টা করে। রাসবিহারী মোড় পেরোচ্ছে বাসটা। চারদিকে কলকাতার সেই পরিচিত ভিড়-হল্লা। মনস্থির করতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় নেয়, তারপর দুম করে নেমে পড়ে পরের বাস স্টপে। খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। সদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটে, লেকের ধারে এসে বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে থাকে। দুপুর গড়িয়ে যায়, আকাশে মেঘ ঘন হয়ে আসে। বৃষ্টি হবে। তবু কোনও তাড়া বোধ করে না সে।

সন্ধের মুখে ঘরে ফেরে শীতাংশু। চারতলায় উঠে সহজেই প্রথম একটু হাঁপ ধরে তার। বেল টেপার আগে একটু অপেক্ষা করে। মাথার ভেতরে কোনও চিন্তা নেই, স্মৃতি নেই, বোধ নেই।

বেল টিপে দাঁড়িয়ে থাকে সে। আইহোলের ওপারে চোখ রেখেছে মানিনী। শীতাংশু টের পায়। দরজা খুলে অবাক মানিনী বলে, তুমি?

এই চলে এলাম। ম্লান হাসে শীতাংশু।

অভিমানভরা গলায় মানিনী বলে, ফোন করে আমাকে জানাওনি তো!

অন্যমনস্ক শীতাংশু বলে, ভুলে গিয়েছিলাম, মানিনী।

আহত মানিনী হাতের ব্রিফকেস আর সাইডব্যাগ নিয়ে গুছিয়ে রাখে যত্ন করে। তারপর রান্নাঘরে ঢোকে। শীতাংশু ট্যুরে চলে গেলে শুধু একার জন্যে কিছুই রান্না করতে ইচ্ছে করে না। একটু ডালভাত কিংবা ভাতে ভাতে হলেই চলে যায়। এক একদিন শুধু নুডলস খেয়েও শুয়ে পড়ে। আজ দুপুরে অবশ্য মধুকর তাকে নিয়ে গিয়েছিল বাসবিহারী অ্যাভিনিউর একটা বিখ্যাত সাউথ ইন্ডিয়ান ফুডের দোকানে। একরাশ অর্ডার দিয়েছিল মধুকর। কারওই কিছু খাওয়া হয় না, তবু দেয়। আজ একটা ইডলি খেয়েছিল মানিনী। সেই জন্যেই ভেবেছিল রাতে আর কিছু করবে না। শীতাংশুর জন্যেই ফ্রিজ থেকে মাছ বার কবে রাঁধতে বসে মানিনী।

নিঃশব্দে স্নান সেরে ধোওযা পাজামা পাঞ্জাবি পরে দক্ষিণের ব্যালকনিতে রকিং চেয়ারটায় গিয়ে বসেছে শীতাংশু। আজ আর অন্য দিনের মতো রান্নাঘরে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায়নি। জানতে চায়নি জরুরি কোনও ফোন এসেছিল কিনা। মানিনীর বুক কাঁপে। শীতাংশু কি বদলে যাচ্ছে?

বদলেই যায় শীতাংশু। বর্ষা গিয়ে শরৎ আসে। আকাশে অলস সাদা মেঘের দল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে উৎসবের সাজ। দূরে ঝিলের চারপাশ কাশফুলে ছেয়ে যায়। ফাঁকা প্লটগুলোতে একটা দুটো করে ফ্ল্যাটবাড়ি ওঠে। কালীপুজোর পরপরই এবার উত্তর দিক থেকে শীতের বিখ্যাত হাওয়া এসে ঢোকে কলকাতায়। আজকাল আর নিয়ম করে অফিসও যায় না শীতাংশু। অনেক রাত অবধি ব্যালকনির হিমে রকিং চেয়ারটায় বসে থাকে একা। উৎকণ্ঠিত মানিনী কাতর গলায় জিজ্ঞেস করে, ওগো তোমার কী হয়েছে বল!

বিচিত্র এক হাসি ফুটে ওঠে শীতাংশুর ঠোঁটে, বলে, কই, কিছু না তো!

একদিন সত্যি সত্যি চাকরিটা ছেড়ে দেয় শীতাংশু। তার দু-একজন কলিগ বাড়ি এসে বোঝায়। শীতাংশু হাসি হাসি মুখ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা কী বোঝে কে জানে, হতাশ হয়ে ফিরে যায়। খবর পেয়ে সুদীপ্ত আসে একদিন, জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। বড় ডাক্তার অনেকক্ষণ ধবে পরীক্ষা কবে ওষুধ লিখে দেয়। মানিনী নিয়ম করে সেসব ওষুধ খাওয়ায় শীতাংশুকে।

তবু বদলে যায় শীতাংশু।

নরম ঘাসের মতো দাড়িগোঁফে ঢেকে যায় তার মুখ। গভীর রাতে দক্ষিণের ব্যালকনিতে রকিং চেয়ারটায় বসে আপনমনেই বিড বিড় করে। তাব চোখের কোণে জেগে ওঠে অমোঘ পিচুটি।

ভরদুপুরবেলায় এখনও মাঝে মাঝে ফোন আসে মধুকরের, মানিনী কতদিন তোমাকে দেখি না!

নিঃশব্দে ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে চোখের জলে ভেসে যায় মানিনী, মনে মনে সে বলে, আর কোনওদিন আমাদের দেখা হবে না, মধুকর।

চালশে

অভিজিৎ তরফদার

পায়ের কাছে জানলা। জানলা গলে চৌকো একটা রোদ্দুর লেপের ওপর এসে পড়ছিল। যেন তাড়াহুড়ো করলে উড়ে যাবে, সন্তর্পণে লেপ সরাল উৎপল, পা দু'খানা বাড়িয়ে দিল রোদে।

ঘড়ি দেখল। অন্যদিন হলে রেকসিনের ব্যাগটা বগলে ঠেসে এতক্ষণ ওভারব্রিজ, অথবা লেট হয়ে গেলে রেললাইন পার হয়ে ওপারে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো কারও দিকে হাতটা বাড়িয়ে—দাদা, অথবা ট্রেনের মধ্যে ডান হাতের কনুই অবধি গুজে বাকিটা পতাকার মতো বাইরে উড়িয়ে দিয়ে শিয়ালদা, কিংবা...। লেপটা পিঠে টেনে পিঠটা এবার রোদের দিকে সরাল। আজ রবিবার। পূবের জানলা। শীতের কুয়াশা। পোষা কুকুরের মতো পায়ে পায়ে গড়ানো রোদ্দুর। ওপরে মেঘহীন আকাশ। মনটাকেও ওই রকম ঝকঝকে পরিষ্কার করে মেজে নিল উৎপল।

অনেকক্ষণ থেকেই চাপটা টের পাচ্ছিল। বাথরুমে যেতে যেতে আড়চোখে দেখে নিল, সীমা রান্নাঘরে, টুং টাং শব্দ। চেয়ারের কাঁধে রাখা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে দেখল বিছানার পাশে টিপয়ে চা, ডিশ উপুড় করে চাপা দেওয়া। এবারে উপুড় হল উৎপল। পা দুটো ছড়িয়ে দু'হাতের কনুই-এ ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল, তারপর কাগজটা বিছানার ওপর রেখে পড়তে শুরু করল। চোখ থেকে কাগজের দূরত্ব হাতখানেক। নির্বাচন, আই এস আই, সেনসেক্স, সৌরভ। ছ'ইঞ্চি নামতে না নামতেই ঝাপসা। চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ক'দিন ধরেই হচ্ছে। কাগজ, বইপত্তর, অফিসের ফাইল। কিছুক্ষণ পড়লেই ঝাপসা। বিশেষ করে চোখের কাছে আনলে। মাথা টিপটিপ করে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে, দু আঙুলে কপালের দু'পাশে চামড়া টানে। অস্বস্তিটা চলে গেলে আবার চোখের কাজ শুরু করে। ভাবছে, এবারে দেখিয়ে নিতে হবে, সময় হচ্ছে না।

ছুটির সকাল, শীতের রোদ, সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ। চটকে গেল। বেজার মুখে, উঠে বসল উৎপল। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ডিশ তুলে চুমুক দিল।

অখাদ্য! এটা চা! একডেলা চিনি আর একহাতা দুধের শরবত। চা-টাও যদি ঠিকঠাক বানাতে পারত! কেরোসিন কাঠে ড্রেসিং টেবিল হয়? থুঃ! সকালটাই বরবাদ।

জানলা দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইরে গলিয়ে দিল। একটা শীতের সকাল টলটল করছে। ভেতরে?

একটু আগেই বাথরুমে গিয়েছিল। বেসিনে হলুদ ছোপ, মেঝেতে শেওলা, তোয়ালেয় গন্ধ। ভুল করে হয়তো বলে ফেলেছে, তেড়ে এসেছে সীমা—কী ভেবেছ কি তুমি? এটা হোটেল? দেখছ তো দিনরাত মুখে রক্ত তুলে মরছি। একটা মুহূর্তও দম ফেলার ফুরসত পাই? তুমি কি রাজকার্যটা করছ এখন শুনি? ঠ্যাং ছড়িয়ে কাগজ মুখস্থ না করে একটু গতর নাড়লেও তো পার। সাবান আর ব্রাশ দিচ্ছি। যাও, বাথরুমের বেসিনটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার কর। বুঝব, তবু কিছু একটা করলে।

দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেছে সীমা, কাঠ হয়ে বসে থেকেছে উৎপল। একটা মাত্তর রবিবার। কাগজ নয়, টিভি নয়, আড্ডা নয়, ঘুম নয়,—বাথরুম? বলা-ই বন্ধ করে দিয়েছে উৎপল।

চায়ের কাপে সর জমছিল। তাকিয়ে দেখে বুক হিম হয়ে গেল। আসার সময় হয়ে গেছে। এসেই—কী হল? চা-টা কে খাবে? বানাতে কষ্ট হয় না? চা-চিনি-দুধ মাগনা আসে? অতখানি দুধ-চিনি সমস্ত নষ্ট? রোজ রোজ সাত সকালে উঠে চা তৈরি করে তোমার মুখের কাছে ধরব, আর এক চুমুক খেয়েই ফেলে দেবে? মজা পেয়েছ? হাঁ কর, আজ তোমার গলায় ঢালব ওই চা। হুকুম করার সময় মনে থাকে না? এই বসলাম। খাইয়ে তবে উঠব।

ছুটে বাথরুমে ঢোকে উৎপল। বেসিনে চা ঢেলে কাপ খালি করে, কল খুলে কাপ-বেসিন পরিষ্কার করে ধোয়। গুটি গুটি ঘরে ফিরে কাপ-ডিশ সাজিয়ে রাখে।

চা। এক কাপ চা-ও কতখানি সুষমামণ্ডিত, কতখানি শিল্পসম্মত হতে পারে দেখত যদি সীমা।

রানু। কল্লোলের বউ। এক কাপ ধূমায়িত চা। সোনার বরণ। যতখানি লিকার, ততটুকুই ফ্লেভর। চায়ের পাতা যতক্ষণ ভেজালে তার নির্যাসটুকু বেবিয়ে আসবে, তেতো কলতানিটা নয়, ঠিক ততক্ষণই ভেজানো। চিনি দেড় চামচ। দুধ নিক্তিতে মাপা। চমৎকার একখানা ঝকঝকে কাপ, তার কানা ভাঙা নয়, কড়ায় পুরনো চায়ের দাগও লেগে নেই। ডিশখানা অনুভূমিক, এক ফোঁটা চা-ও চলকে পড়েনি। পাশে দুটো এনিটাইম বিস্কুট। আব সবকিছুর ওপর যে চা-টা ধবে নিয়ে আসছে তার মুখেব হাসি। কী নেই তাতে? আবেদন। নিবেদন। আর্তি। ভক্তি। ভালবাসা। চা তো নয়, একটা মানুষের সমস্ত সৌন্দর্যের নির্যাস। আর সেই চায়ের ঠোঁট ডুবিয়ে দেওয়া। আহা! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল উৎপলের। আব সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল খালি চায়ের কাপটার দিকে। বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল।

—ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখেছি, ক'টা বাজল খেয়াল আছে? এরপর বাজারে গেলে খালি হাতে ফিরতে হবে।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল। রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর। সীমা থেকে উৎপল। উঠে পড়ল। বাজার মানে শুধু বাজার নয়, মুক্তি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট। টেনে লম্বা করে সেটা একঘন্টাও করা যেতে পারে, কিন্তু এই পর্যন্ত। বেশি বাড়ালে—কী ব্যাপার? পাঁচ মিনিটের রাস্তা, আধঘন্টার বাজার। এতক্ষণ কী করা হচ্ছিল, মাছউলিদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই—নেহাৎ শীতকাল, না হলে বাদল দিনের প্রথম কদমফুল। দোতলার বারান্দা বনাম একতলার ফুটপাথ। একঢাল চুল মাথা থেকে গড়িয়ে নামছে ব্যালকনির আলশেয়। চুল বেয়ে নেমে আসছে চিরুনি। যেদিকে চিরুনি সেদিকে ঘাড়, এই রকম ঘাড়কেই কি গ্রীবা বলে? ছোট্ট কপাল, বড় বড় কালো কালো চোখ, সেই চোখে কথা। উৎপল তো কোন ছাব, রাস্তায় ঘুবে বেড়ানো রাম-শ্যাম-যদু কার সাধ্য সে চোখেব ভাষা বোঝে। যে বোঝে তার পায়ে জিনস,

কোমরে স্কুটার। চোখে সানগ্লাস। গড়িয়ে আসা সমস্ত বাণী শুষে নিচ্ছে সানগ্লাস, ফিরিয়ে দিচ্ছে সিগন্যাল। এই দেওয়া-নেওয়া দেখতে দেখতে উৎপলের চুয়াল্লিশ বছরের পুরনো বুকের খাঁচাতেও কী একটা থেমে গিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

অথচ বছরখানেক আগেই একটা সুযোগ এসেছিল। নরেন্দ্রপুর। উন্মেষ, উৎপল-সীমার একতম প্রডাক্ট নিজের ক্ষমতাতেই ঢুকে পড়ল। একটা বিরাট চিন্তার বোঝা নেমে গেল। সীমাও পুজোয় কেনা নতুন বালুচরী শাড়ির মতো খবরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সকলকে দেখাল। উন্মেষকে দিয়ে এসে কটা দিন আনমনা হয়ে রইল, সময়ে অসময়ে কেঁদে ভাসাল। উৎপল সময় দিল। উৎসাহ ও বিচ্ছেদ থিতিয়ে এলে সীমাকে কাছে টানল। এবং এত বছর পরে, কাছ থেকে সীমাকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল—সীমার সিঁথিতে বালিয়াড়ি, চোখের নীচে কালি, আঙুলে হাজা, গালে মেচেতার চিহ্ন। ফিরে গেল উৎপল।

—ট্যাংরা কত?

ডিমভর্তি মাঝারি সাইজ, ছোট নয় বড়ও নয়, এগুলোই ফেভারিট উৎপলের।

আবার আঙুল তুলল উৎপল, এই যে ভাই, ওই ট্যাংরাগুলো কত করে?

উৎপলকে ভেদ করে কাকে যেন খুঁজছিল মাছওলা। উৎপলকে ঠেলে সরিয়ে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই দুচোখে টুনি বাল্ব লাগিয়ে নিল মাছওলা—বলুন স্যার, পার্শে আছে, গুরজালি আছে, ফার্স্টকেলাস ট্যাংরা আছে। দেব এক কেজি করে?

বামেশ্বর সাউ দেশলাইয়ের ভাঙা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দাঁতের ময়লা বের করছিল। জিভ দিয়ে ঠেলে ছুঁড়ে দিল বাইরে। উৎপলের নাকের এক ইঞ্চি সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'শুয়োরের বাচ্চা' চোয়ালে চিবিয়ে কথাগুলো বলে সরে গেল উৎপল। না শুনুক, বলা তো গেছে, মনটা হালকা হল তাতেই। মনকে প্রবোধ দেয়, দাম জেনেইবা কি করত? হয়তো একশো কুড়ি, পঁচিশ-এর কমে বেচবে না। শালা সব পিক আওয়ারের ট্যাক্সি—সল্ট লেক, যাদবপুর, এয়ারপোর্ট; মরে হেজে গেলেও কাছাকাছির প্যাসেঞ্জার নেবে না।

ঘুরতে যাচ্ছে—শান্তনু।

—কি রে কি মাছ কিনলি?

—কিনিনি এখনও, দেখছি ঘুরে ঘুরে।

—কিনিসনি? ভাল করেছিস। ওই দিকে দ্যাখ, নীল স্যান্ডো গেঞ্জি, হারু, চিতলপেটি নিয়ে বসেছে। নিয়ে যা, একদম ফ্রেশ। বউকে বলবি, চিতলের মুঠা। বলিস, শান্তনু বলে দিয়েছে, পরে একদিন গিয়ে খেয়ে আসবে।

চিতলের মুঠা, চিংড়ির মালাইকারি, ইলিশ-পাতুরি, সর্ষে-পারশে। শুনে শুনে কান পচে গিয়েছিল। আসলে শান্তনুটা চিরকালই একটু বারফট্টাই করতে ভালবাসে। বাড়িয়ে বলা, সাজগোজ, পারফিউম। পড়াশুনোয় খুবই সাধারণ। কিন্তু ওই চলন-বলন দেখিয়েই একটা ওষুধ কোম্পানিতে ঢুকে পড়ল। আরও বেড়ে গেল বাইরের পালিশ। আর বাজারে দেখা হলেই হাজারটা প্রিপারেশন, অর্ধেকের নামই শোনেনি উৎপল। একদিন

মনে হল, বাড়িয়ে বলছে না তো? রোজই টানাটানি করে, শেষ অবধি চলেই গেল।

সুতপা। শান্তনুর বউ। সাদামাটা ছিপছিপে চেহারা। আটপৌরে শাড়ি। হালকা প্রসাধন। কপালে ঘাম, আঙুলে হলুদ। দু-চারটে মামুলি কথাবার্তা—আপনার কথা অনেক শুনেছি। তারপর খাবার টেবিল। ফ্রায়েড রাইস, ভেটকি ফ্রাই, ইলিশ-ভাপানো, চিকেন চেকোশ্লোভাকিয়া, চাটনি আর দই। মেনুটা অবধি এখনও মুখস্থ উৎপলের। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তবু ইচ্ছে করছে আবার গোড়া থেকে শুরু করে। মুচকি হেসে শান্তনু এগিয়ে এসেছে, কেমন লাগল ব্রাদার?

বাড়িতে একদিন মিনমিন করে তুলেছিল কথাটা। জবাবটা বুলেটের মতো উৎপলের দিকে ফিরে এল—এনো। ফর্দ দিয়ে দেব। গরমমশলা, এলাচ, দারচিনি, কাজু, কিশমিশ। আরও অনেক কিছু, ভেবে বলব। মুরোদ আছে? একদিনের রান্নায় একমাসের মাইনে গলে বেরিয়ে যাবে। রোজ রোজ জিরেবাটা-কাঁচালঙ্কা-চারাপোনা খেয়ে অরুচি ধরেছে! আর আমার? চব্বিশ ঘণ্টা-তিরিশ দিন-বারো মাস তোমাদের সংসারের জোয়াল টেনে যে অরুচি ধরেছে? যাই? নুড়ো জ্বেলে চলে যাই যেদিকে দু'চোখ যায়?

শান্তনু দাঁড়িয়েছিল সামনে। ঘাড় নাড়ে উৎপল, যার অনেক রকম অর্থ হয়। গুটি গুটি স্যান্ডোগেঞ্জি হারুর দিকে এগোয়। আড়চোখে শান্তনুকে লক্ষ করে। শান্তনু মাছের বাজার থেকে বেরোতেই ঝটপট আড়াইশো করে চারাপোনা আর তেলাপিয়া নিয়ে থলেতে ঢোকায়।

বাড়ি ফিরে দ্যাখে হুলুস্থুলু কাণ্ড।

বিছানার তোশক ওল্টানো,বালিশ-চাদর-বেডকভার ছত্রাখান, বইপত্র মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, চেয়ার-টেবিল একপাশে সরানো, জামাকাপড় আলনা থেকে নামিয়ে একপাশে জড়ো করা।

উৎপলকে দেখে সীমা খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল—হাতে ঝাঁটা, উস্কোখুস্কো চুল, সিঁদুরের টিপটা ঘামে লেপ্টে গেছে, দুটো চোখ করমচার মতো লাল।

—দেখেছ?

—কী দেখব?

—কানের দুল।

—তোমার কানের দুল আমি কি করে দেখব?

—কি করে দেখবে জানতে চাইনি, দেখেছ কিনা সেটাই জিজ্ঞেস করছি।

সীমার দিকে তাকাতেই দেখতে পায় উৎপল—ও তো কানেই রয়েছে।

—হ্যাঁ, ডান কানেরটা। অন্য দুলটা গেল কোথায়?

—দ্যাখো, নিজেই কোথাও খুলে রেখেছ।

—দেখেছি, তন্ন তন্ন করে সমস্ত জায়গা খুঁজেছি। নেই।

—বাথরুমে দেখেছ?

—বাথরুম, রান্নাঘর, শোবার ঘর কিচ্ছু বাদ দিইনি।

উৎপলের বিরক্তি লাগছিল। বাইরে এসে চেয়ারে বসল। নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝেই হয়। হারিয়ে ফেলে সীমা। গ্যাসের বই, ইলেকট্রিক বিল, ব্যাঙ্কের চেকবুক।

চিরুনি-টুথব্রাশ-চুলের ক্লিপ তো অহরহ। তোলপাড় করে। সবাইকে ব্যস্ত করে মারে। তারপর খোঁজাখুঁজি নিজে থেকেই যখন বন্ধ হয়, উৎপল বুঝতে পারে, জিনিসটা পাওয়া গেছে।

—কী হল, কানে ঢুকল না কথাগুলো?

আজ নিস্তার নেই দেখছি, উৎপল ঘুরল, সিরিয়াস হবার চেষ্টা করল—অত চিন্তার কি আছে? কতই তো হারায় তোমার, আবার পেয়ে যাও, চুলের কাঁটা, সাবান...

—থামবে? চুলের কাঁটা আর কানের দুল এক হল?

—তফাৎ কোথায়? দুটোই হারায়।

--তফাৎ কোথায় সেটা যদি বুঝতে! জীবনে হাতে করে কিছু এনেছ? কোনওদিন কিছু গড়িয়ে দিয়েছ? যেটুকু যা হাতে গলায় আছে বাবার দেওয়া, বিয়ের সময়। হারিয়ে গেলে মুরোদ আছে আর একটা দুল গড়িয়ে দেবার? সোনা আর লোহার তফাৎ বোঝা তোমার মতন ভিখিরির কাজ নয়।

—কী বললে, আমি ভিখিরি?

—তুমি ভিখিরি, তোমার চোদ্দো পুরুষ ভিখিরি। আমার জীবনটা ঝরঝরে করে দিল।

ব্যস, বাজনা শুরু হয়ে গেল।

বাজনা থামলে নদীতে বান আসবে। অন্তত একঘণ্টা। আনা বাজার থলিতে ঝুলবে। রান্নাঘরে কাক ঘুরে বেড়াবে। বেলা গড়িয়ে দুপুর, কখনও বিকেল। সন্ধে হলে মুড়ি কিংবা চিড়ে।

উঠে পড়ল উৎপল। রোববারটাও শ্মশানে কাটানোর কোনও মানে হয় না। জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল।

গয়না! ওসব গয়নাটয়না সব ফালতু কথা। বাবার দেওয়া, ওটাই আসল। হত যদি উৎপলের দেওয়া—গেছে গেছে আপদ গেছে, এতক্ষণে খেয়েদেয়ে ঘুম মারত। হয়নি, সেই পিওরসিল্কটার বেলা? নতুন কাজ করতে এল হরির মা, এক মাসও হয়নি, হাওয়া। খোঁজ পড়ল যখন, ততদিনে আবিষ্কার হল সীমার পিওরসিল্কটাও নেই। হায় হায় করেছিল উৎপল, সীমার মুখচোখ দেখে মনে হয়নি বিশেষ দুঃখটুঃখ পেয়েছে। আর গয়না-গয়না করছে—তিনবেলা খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, টিভি দেখাচ্ছি, বছরে একবার বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি, ছেলেকে দামি ইস্কুলে পড়াচ্ছি, এগুলো মাগনা আসে?

মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। রোদ উঠে গেছে, শীতটাও রাস্তা থেকে সরে গেছে। গরমই লাগছিল। শালটা খুলে কাঁধে নিল। একটুখানি গলি, তারপরেই বাসস্ট্যাণ্ড। শহরতলির রাস্তা, ছোট, তবু বাস চলে একখানা। পার্থরা দুটো স্টপ পরে থাকে, হেঁটেই যাওয়া যায়। তবু রাস্তায় আসতেই বাস পেয়ে গেল।

—আরে উৎপলদা। আপনি না, কী বলব, একশো বছর বাঁচবেন। আজ চিকেন রোস্ট বানিয়েছি, ও এখুনি আপনার কথা বলছিল, আপনি ভালবাসেন, এলে বেশ হত। আমি বললাম, ফোন করে দাও। বলতে বলতেই দরজায় বেল।

রমা। কেউ হাসিতে এত আলো ছড়ায় না দেখলে বিশ্বাস করত না উৎপল।

আসলে ম্যাজিকটা নামেই। এককালে আর এক রমার নামে পাগল ছিল উৎপল। সপ্তপদী, হারানো সুর, সাত পাকে বাঁধা। কত বার যে দেখেছে। নামটাও মনে গেঁথে গেছে। সময়ে সব চাপা পড়ে গিয়েছিল।

চমকে উঠল বিয়ের আসরে। সম্বন্ধ করে বিয়ে। সীমা ছোট মাসির ননদের কী যেন হয়। ছবি দেখে পছন্দ। বিয়ের আগে একটু কথাও বলেছিল। আহামরি কিছু নয়, তবে উৎপলের প্রত্যাশাও তো আকাশছোঁয়া ছিল না। বিয়ের দিন গিয়ে বসেছে, সীমাকে তখনও নামানো হয়নি, হঠাৎই কে যেন নিয়ে এল—এই যে, সীমার বোন রমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

দেখল উৎপল। আর দেখতে গিয়েই বুঝতে পারল, এখনই, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা ও করতে চলেছে। তখন আর ফেরার পথ নেই। মন্ত্রটন্ত্র কী পড়েছিল স্মরণে নেই, কিন্তু চোখদুটো সমস্তক্ষণ রমার মুখের ওপর ঘোরাফেরা করেছিল।

মনের কোথাও যে প্রত্যাশা ঘাপটি মেরে ছিল না, বলতে পারবে না। বিশেষত কে যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—শালি, আধি ঘরওয়ালি। আশার গোড়া উপড়ে দিলেন সীমার বাবা বছরখানেকের মধ্যেই। পার্থ আর সীমাই খোঁজখবর করে উৎপলকে তাড়া দিয়ে ওদের এনে ফেলল দু'স্টপের দূরত্বে।

—আসুন দাদা, এসে যখন পড়েছেন, আজ না খাইয়ে ছাড়ছি না।

—আরে না না, ওদিকে তোমার দিদি না খেয়ে বসে থাকবে। আর একদিন খবরটবর দিয়ে...

—যাও তো, রমার দিকে ফেরে পার্থ—একটা ফোন করে দিদির পারমিশন নিয়ে নাও।

চেয়ারে বসতে বসতে উৎপল ঘাড় ঘোরায়—মুম্বাকে দেখছি না?

—ওর বন্ধুর বার্থডে পার্টি, আজ সারাদিন ওখানেই থাকবে।

—এই তো, আমি এসে কাবাব মে হাড্ডি হয়ে গেলাম। উঠি ভাই, তোমরা মুম্বার অ্যাবসেন্স সেলিব্রেট কর।

হাত ধরে টেনে বসাল পার্থ—আর কি সে দিন আছে? দেখতে দেখতে মুম্বারই এগারো হয়ে গেল। না দাদা, আজ আসুন, আমরাই দু'জনে রবিবারের দুপুরটা সেলিব্রেট করি।

বলতে বলতে গ্লাস-টাস সাজিয়ে ফেলে পার্থ। ঘরে ঢোকে রমা—আরে, সাত সকালেই শুরু করে দিলে? আর উৎপলদা যে ওদিকে দিদির সঙ্গে কাজিয়া করে বেরিয়ে এসেছেন, সেটা কি জানিয়েছেন তোমাকে?

—বাঃ বাঃ, এক্সেলেন্ট। দুঃখ ভোলার এর চেয়ে ভাল টনিক আর কোথায় পাওয়া যাবে? যাও তো ভ্যাজর ভ্যাজর না করে ঝটপট চিকেন রোস্ট সাপ্লাই কর।

পার্থ গ্লাসে ঢালে, এগিয়ে দেয়। নিতে নিতে চোখ ঘোরে উৎপলের। রান্নাঘর, শোবার ঘর, বারান্দা, ড্রয়িং রুম। বেলা যত বাড়ে নেশাও তত জমতে থাকে। চাঁই চাঁই বরফের মতো। চোখে রামধনুর খেলা শুরু হয়ে যায়। প্রজাপতি? না, না, পাখি।

দোয়েল? টুনটুনি? পার্থ কী সব বলে। দেশ-কাল, রাজনীতি, বাজারদর। দেখতে থাকে উৎপল। মাঝে মাঝে বিবক্ত লাগে। অত ঘোরাঘুরির কী আছে? এইখানে, ওই সোফায়, উৎপলের মুখোমুখি একটু বসলেও তো পারে। উৎপল যে মরে যাচ্ছে। ও কি কিছুই বোঝে না?

বরফ জমতে জমতে যখন এভারেস্ট হল, ততক্ষণে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে। সন্ধেও গড়িয়ে যাচ্ছে রাতের দিকে, উঠে দাঁড়াল উৎপল, আটটা, আর নয়। দারুণ কাটল দিনটা, থ্যাঙ্ক ইউ, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্, টু বোথ অব ইউ।

হাত নাড়তে নাড়তে দরজার বাইরে বেরিয়েই মনে হ. একটু নেশা হয়েছে। পার্থ বার বার বলেছিল—একটু এগিয়ে দিই দাদা। উৎপলই তেড়ে উঠেছে—খবরদার না, দশ মিনিটের রাস্তা। ঠিক চলে যাব। আমি কি মাতাল নাকি?

বাসে কন্ডাক্টরকে ইংরিজিতে ডিরেকশন দিল। হেল্পারকে বলল নামিয়ে দিতে। সবই নেশার লক্ষণ, উৎপল জানে। কিন্তু পা টলছিল না, মাথা সোজা ছিল, বাসের নম্বর ভাল পড়তে পারছিল, গলিটা চিনতেও কোনও অসুবিধে হয়নি।

গলিটা ছোট, বাস-লরি ঢোকে না, কিন্তু ছোটখাট প্রাইভেট কার যাওয়া-আসা করে। গাড়িটা কি হেডলাইট নিভিয়ে আসছিল? হর্নের আওয়াজও শোনেনি উৎপল। কিছু বোঝার আগেই ছিটকে পড়ল রাস্তার ধারে। একটা সিমেন্টের চাঙর দিয়ে ম্যানহোল ঢাকা ছিল, মাথাটা ঠুকে গেল সেটায়। তারপর সব অন্ধকার।

পরের ঘটনাটা কিছু শুনে, বাকিটা বুঝে জুড়ে নিয়েছিল উৎপল। রোববারের রাত সাড়ে আটটা, শহরতলির রাস্তা, রাস্তাও নয় গলি, সেইখানে পড়ে রইল উৎপল। গাড়িটাকে কেউ দ্যাখেনি, কাজেই পড়ে থাকা মানুষটাই দৃশ্যের একমাত্র উপাদান। মাতাল হতে পারে, নেশা কেটে গেলে নিজেই উঠে চলে যাবে। কেউ কেউ মাথা নামিয়ে কাছে এনেছে নিশ্চয়। রক্ত দেখে যারা ভেবেছে ছুরি কিংবা বোমার কেস তারা হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টও ভেবেছে নিশ্চয় কেউ, নিজে যে পড়ে নেই সেই সৌভাগ্যে নিজস্ব ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেছে তারাও।

তবু কিছু মানুষ তো রয়েই গেছে যাদের আমরা, পরিবারগত মানুষেরা হঠকারী বলি। তাদেরই একজন সারদা, মোড়ের মাথায় সিগারেটের দোকান, উৎপল যার বাঁধা খদ্দের। দোকান বন্ধ করে গান গাইতে গাইতে ফিরছিল সারদা, উৎপলের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নেয়। মুখ দেখে চিনতে পারে। আরও কয়েকজনকে জড়ো করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে উৎপলের জামা তুলে গেঞ্জির রং পরীক্ষা করে জানা যায় সেটা লাল, সবুজ, গেরুয়া কিছুই নয়, বেবাক সাদা। অতএব হাসপাতালে অজ্ঞান অর্ধমৃত উৎপলের জায়গা হয় না। সসঙ্গী সারদাই এরপর তাকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে গেঞ্জির রং নয়, ট্রাউজারের মেক যাচাই করা হয়। তারপর রোগীকে সোজা চালান করা হয় কার্পেট-ঢাকা একটি ঠাণ্ডা ঘরে। সেই ঘরে রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর আত্মীয়স্বজনকে আর একটি প্রকোষ্ঠে আখমাড়াই মেশিনে ফেলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়।

সারদা উৎপলকে ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকিয়ে ছোটে বাড়িতে। সীমাকে খবর দেয়। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় সীমাকে নার্সিংহোম অবধি পৌঁছে দেবার দায়িত্বও সারদা নেয়। উৎপল পরে জেনে আশ্বস্ত হয়েছে, আর কখনও উৎপল তার দোকান থেকে সিগারেট নাও কিনতে পারে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এইরকম খবর সারদার সামনেই সীমাকে জানানোর পরেও সারদা যতটুকু পেরেছে, যখন পেরেছে, সীমাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছে।

সীমার দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়ে আরও অনেকে এসেছে। তাদের মধ্যে পার্থ ও রমাও ছিল। সমবেদনা জানিয়েছে। অনেকে অনেক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তারপরে প্রত্যেকেরই হাজারটা কাজের চাপে আসা আস্তে আস্তে কমে এসেছে।

সীমা থেকেছে। পনেরো দিন। হয়তো পনেরো রাতও। ডুবে যেতে যেতেও চেতনার অতল থেকে ভেসে উঠেছে উৎপল, চোখ মেলে তাকিয়েছে, দৃষ্টিহীনতার সীমানায় দাঁড়িয়ে স্যালাইনের বোতল, নল, অক্সিজেন, নার্স ডাক্তারকে দেখেছে। আবার ডুবে গেছে। এইভাবে ডুবতে ভাসতে ডুবতে ভাসতে জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আর একটা মুখও দেখেছে উৎপল। সেই মুখে মেচেতার দাগ, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, কপালে ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুর, চোখের নীচে কালো হয়ে জমে থাকা উদ্বেগ।

এইভাবেই কখন কোথা দিয়ে পনেরোটা দিন কেটে গেছে টেরও পায়নি উৎপল। জ্ঞান পুরো ফিরতে দেখল—মাথাটা অসম্ভব ভারী, এককাপ চা ঠোঁটে তুলতে গেলেও হাত কাঁপে, দুটো পায়ে কোনও জোর নেই।

ডাক্তারবাবু এলেন, পাশে বসলেন, বললেন, ভয় নেই, মাথার মধ্যে একটা রক্তের ডেলা জমেছিল, অপারেশন করে বের করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ফিরে কটা দিন রেস্ট নেবেন, তারপর একটু ফিজিওথেরাপি। সব ঠিক হয়ে যাবে। জোর ফিরে পাবেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তারপর উৎপলের দিকে ফিরে বললেন, কী করে হল? কিছু দেখতে পাননি?

ঘাড় নেড়েছিল উৎপল—রাস্তার আলোগুলো সব জ্বলছিল না, একটু কুয়াশাও হয়েছিল। তবু না দেখতে পাবার কথা নয়। কোথা দিয়ে যে এল...। পড়ে যেতে যেতে গাড়িটার পেছনটুকু দেখতে পেলাম। তারপর কিছু মনে নেই।

—ছুটির আগে চোখটাও একবার চেক আপ করিয়ে যাবেন, ডাক্তারবাবু উঠতে উঠতে বলে গেলেন।

চোখের ডাক্তারবাবু এলেন। চোখ এনে টর্চ ফেলে দেখলেন। তারপর চোখের ভেতর দেখলেন যন্ত্র দিয়ে।

দেখা শেষ হলে উৎপল জিজ্ঞেস করল, খারাপ কিছু?

হাসলেন ডাক্তারবাবু, না, না। চিন্তার কিছু নেই। এই বয়সে সকলেরই কমবেশি হয়। প্রেসবায়োপিয়া, চালশে। দূরের জিনিস ঠিক দেখা যায়, কাছে এলেই ঝাপসা। জোর করে দেখতে গেলে আই-স্ট্রেইন হয়, মাথা ধরে। পাওয়ারটা একদিন চেক করিয়ে নেবেন। চশমা লাগবে। তারপর দেখবেন, কাছের জিনিস দেখতে আর অসুবিধা হচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু উঠে গেলে উৎপল ভাবল, ঠিকই। গাড়িটা খুব কাছে চলে এসেছিল, দেখতে পায়নি। বোঝার আগেই মেরে দিয়ে চলে গেছে।

বিকেল শুকিয়ে আসছে, বারান্দায় চেয়ারে বসেছিল উৎপল। এখনও আলো আছে, তবে অল্প ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। এমনিতে শীতটা প্রায় চলেই গেছে, দিনের বেলা গায়ে কিছু লাগে না। উৎপল চাদর জড়িয়ে নিল, ঠাণ্ডাটা বেশিই লাগে ওর আজকাল।

আজই দুপুরে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল সীমা। ফেরার সময় চশমাটা নিয়ে এসেছে। চশমা চোখে লাগিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করেছিল উৎপল, একটু ..গেই, শরদিন্দু। এত ভাল লাগে এখনও। পড়তে গিয়ে দেখল অসুবিধাটা হচ্ছে না। তবে কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত লাগল। বইটা মুড়ে রেখেছে পাশে। আকাশের রং বদল দেখছিল, সীমা এসে বসল।

সীমা একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, উন্মেষকে খবর দেয়নি। সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। তার পরেই নিয়ে আসবে ক'দিন। কথা বলছিল না, সীমাও তাকিয়েছিল দূরে। যে কথাটা ক'দিন ধরেই জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল, করা হচ্ছিল না, আজ, এই বিকেলবেলা সেটাই জানতে চাইল উৎপল—কত খরচ হল?

—জেনে কী হবে?

চুপ করে রইল উৎপল। তারপর বলল, না, মানে আমি তো আন্দাজ করতে পারি খরচের অঙ্কটা। কোথা থেকে জোগাড় হল এই এত সব?

জবাব না দিয়ে দূরেই তাকিয়েছিল সীমা, হঠাৎই অনেকদিন পর ভাল করে সীমাকে দেখল উৎপল। আর দেখতে গিয়েই চমকে উঠল। কান, গলা, হাত সমস্ত খালি।

—এ কী, তোমার চুড়ি, কানের দুল, গলার হার সব কোথায় গেল?

তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে কান-গলা আড়াল করল সীমা, হাতদুটো ঢেকে ফেলল শাড়ির আড়ালে।

—সমস্ত ঢেলে দিয়ে এলে হাসপাতালে? কী দরকার ছিল? বলতে গিয়ে গলাটা ভেঙে গেল উৎপলের।

হাসছে সীমা। শেষ বিকেলের আশ্চর্য আলো এসে পড়েছে গালের এক পাশে। কী সুন্দর। প্রাণ ভরে দেখল উৎপল।

সীমা কাছেই বসেছিল। উৎপল পরেছিল নতুন কেনা চশমা। তাই, দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

বিপ্রলব্ধা

চন্দ্রা ঘোষ মিত্র

শেষ বেলাকার রোদ্দুর টেবিলের কোণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শিরীষ গাছের মাথায় তার সপ্তাশ্ব রথ এসে গেছে, ক্ষুরের অধৈর্য আঘাতে ধুলো হয়ে যাচ্ছে মেঘ, পশ্চিম থেকে পূবে অনেকটা পথের উড়ান, সময় নষ্ট করার মোটেই সময় নেই। রোদ্দুরের বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। দিনের কাজ সারা, দরজা অবধি গিয়েও কি মনে করে আবার ফিরে আসা, দু চারটে দরকারি কথা, আবার তেমন দরকারি নয়ও, শুধু একবার পিছন ফিরে তাকান, করমর্দনের ভঙ্গিতে একটু ছুঁয়ে যাওয়া।

ঠিক তখনই মনের কথার টুকরোটা পেয়ে গেল রুমেলি। মরিস ডবের তিনশো বারো আর তেরো নম্বর পাতার কোলে, ছোট্ট একটা চিরকুট। কোনও সম্বোধন নেই, না কোনও স্বাক্ষর, স্পষ্ট গতিময় হস্তাক্ষরে কেবল দু-চার পঙ্‌ক্তি।

"কাল তোমাকে দেখলাম, কফি হাউসের সিঁড়িতে। ডাকতে যাব, তুমি বললে ওপরে বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, আমি যাই। আমিও পিছনে পিছনে যাব কিনা ভাবছি। তোমার চটির তলায় একটা কাঁকর আটকাল। তুমি দু-পা পিছোলে, পা-টা ঠুকলে মেঝেতে দুবার, তারপর এক ঠেলায় গড়িয়ে দিলে কাঁকরটা। দৃশ্যটা দেখে ইস্তক আমার আর ভরসা হল না যেতে। তোমার ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে যে রূঢ়তা ছিল সেটাই রুখে দিল আমাকে সিঁড়ির মুখে। যদি কোনওদিন এমন হয়, ওই ইটের টুকরোটার মতো?। আমাকে টপকে, আমার পাশ দিয়ে অনেকে উঠে গেল। খাকি রংয়ের ডেনিমের শার্ট পরা একটা ছেলে, ভয়ানক ওপর-চালক গোছের, তোমার কনুই ছুঁয়ে তোমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আমি এটা বরাবর লক্ষ করেছি যে এই ছেলেটা তোমাকে কোনও না কোনওভাবে একটু ছুঁয়ে যাবেই যাবে। তুমি খেয়াল কর না, না? একদিন বাসে ভিড়ের মধ্যে পেয়ে ওর পা-টা এইসান মাড়িয়ে দিয়েছি না। তবে বদমাসদের চামড়া মোটা। যাক, আমার তো জ্বালা খানিক জুড়োল।"

চকিত চমকে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রুমেলি। কেউ কি লক্ষ করছে তার প্রতিক্রিয়া? প্রেরক কি কাছেপিঠেই আছে কোথাও? এতক্ষণে ইউনিভার্সিটির অনেক ডিপার্টমেন্টই ছুটি হয়ে গেছে, দু এক জায়গায় ওয়ার্কশপ চালু আছে হয়তো, লাইব্রেরিও জনবিরল হয়েগেছে। জনা কয়েক অধ্যাপক এদিকে ওদিকে গভীর অভিনিবেশে বই পড়ছেন। তাঁদের নিষ্ঠা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞানলাভই তাঁদের একমাত্র অভীষ্ট। তাছাড়া প্রত্যেকেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ডানদিকেব কোণে থার্ড-ইয়ারের সোমনাথদা আর শমপাদি একটা মোটা বই খুলে কথা বলে যাচ্ছে, কোনও শব্দই নেই তাতে, ফিসফিসও নেই, একদম পিঁপড়িদের মতো। তিন বছর ধরে জোড় বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য নির্দিষ্ট সব জায়গায়. ঘুরে ঘুরে এখন লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছে। পিঁপড়ের ভাষাটাও শিখে নিয়েছে এই ফাঁকে। সোমনাথদা ভাষাটাও শিখে নিয়েছে এই ফাঁকে। সোমনাথদা কখনওই এই চিঠি লিখবে না। দুটো টেবিল পরে বসে

আছে ফিলজফির ছ'জনের ওই গ্রুপটা। ওই ছ'টি মেয়ে মিলিটারি প্যারেডের মতো তালে তালে পা ফেলে, একসঙ্গে ডানদিকে ঘোরে, একসঙ্গে বাঁয়ে। কৌস্তুভ একদিন ওদের ব্যূহ ভেদ করে আলাপ করে এসেছে কিন্তু কার কি নাম জানতে পারেনি। এই নিয়ে বেচারিকে প্রচুর আওয়াজ দিয়েছে কৌশিক এমনকি রুমেলিও। যাকগে, পাবেনি। যাকগে, পারিসনি, পারিসনি, চেপে যা, তা না কৌস্তুভও ওদের স্বপক্ষে প্রকারান্তরে নিজের স্বপক্ষে বলে যেতে লাগল, ওরা আসলে খুব ভাল মেয়ে। সবুজ শাড়ি-পরা মেয়েটি তো অত্যন্ত সহজ সরল, আর বেগনি-সাদা সালোয়ার-কামিজ ভীষণ হাসিখুশি। ওদের সঙ্গে আর দ্বিতীয় দিন কথা বলার সাহস হয়নি কৌস্তুভের, কিন্তু ওদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, সাধারণত কৌস্তুভের সহজ-সরল বা কৌস্তুভের হাসিখুশি— এইরকমভাবেই বোঝান হয়। যাই হোক এই চিঠি সহজ-সরল বা হাসিখুশিরা লিখবে না। একে তো ওরা মেয়ে, তার ওপর কোনও সস্তা রসিকতা করা—ওদের স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আচ্ছা, কে বলেছে, সেই দুর্বৃত্ত এই রিডিং রুমের মধ্যেই বসে আছে? চিঠিটা বইয়ের ভাঁজে গুঁজে দিয়েই হাওয়া হয়ে যায়নি তো? আর তাকেই বা কে বলে দিয়েছে, রুমেলি বাড়ি যাবার পথে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আসবে, গোদ্ধর মরিস ডবের বইখানাই ওল্টাবে, শেষবিকেলের রোদ্দুর তিরকাঠি হয়ে দেখিয়ে দেবে তিনশো বারো নম্বর পাতা?

কে তাকে এত নজরে নজরে রেখেছে, কে ঘোরে তার সঙ্গে ছায়ার মতো? ভাবতে বসে রুমেলি। কাল? কফি হাউস? চটিতে ঢিল-মত-কী আটকে গিয়েছিল, ঠিকই, খুব কদর্যভাবে তাকে ছুঁড়েছিল কি? কে আর জানে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। খাকি রংয়ের ডেনিমের শার্ট পরেছিল বটে অনুরাগ, কিন্তু ছুতোনাতায় শরীর ছোঁয়ার মতো বদ অভ্যেস তো তারমোটেই নেই। ওপর-চালাকও কখনওই নয়, বরং সত্যিকারের সহজ সরল বলতে গেলে অনুরাগই। চিঠির লেখক আবার একটু বেশি দেখে। বেশি শোনেও। ঘটনা যা বলছে আদ্যোপান্ত সত্যি হলেও সিঁড়ির নীচে কারওকেই 'ওপরে বন্ধুরা বসে আছে, আমি যাই' এমন কথা বলেনি রুমেলি। কিন্তু যে-ই হোক সে তার খুব নিকট্-কথা জানে, এমনকি যে কথা বলা হয়নি—তাও।

দুই

বসন্তসেনা হইহই করে এসে হাজির, একেবারে লাইব্রেরির রিডিং রুমে। বসন্তসেনা মানে সৌন্দর্যের সমুদ্র। ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হবে না এমন মানুষই নেই। ওর জন্য কোনও নিয়মই নিয়ম নয়। যেমন, এখানে 'সাইলেন্স' বোর্ডটা টাঙান আছে। কেউ কোনও আপত্তি করবে না, বসন্তসেনা যদি আশি ডেসিবেলে কথা বলে। রুমেলির সামনে খোলা বইটা টেনে নিয়ে নামটা দেখেই ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভ্রূতে অদ্ভুত বিভঙ্গ আনল, মাইগড, মরিস ডবের পাব্লিক ফিনান্স। বিশল্যকরণী আনতে গন্ধমাদন? তুই কি গোটা 'ক্যাপিটাল' পড়ে মার্কস-এর ইকনমি পড়াবি? আমার বাবা বেদ ওই স্যামুয়েলসন। আর নোটস্। চল, চল এত পড়লে তুই পাগল হয়ে যাবি।

বসন্তসেনা রুমেলিকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মিলনদার ক্যান্টিনে এনে হাজির

করল। এখানে আগে থেকেই কৌশিক, কৌস্তভ, অনুরাগরা বসে আছে। কিছু খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, ওদের হাতে তার টোকেন ঘুরছে। রুমেলি আসাতে আর এক প্রস্থ হইহই শুরু হল। আজ মাত্র দুটো পিরিয়ড হয়ে ক্লাস মুলতুবি হয়ে গেছে। সামনের সেমেস্টারের আগে দুই সপ্তাহ ছুটি। তার মানে বন্ধুদের মধ্যে রোজকার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। তাই দিনটা ওরা একটু উপভোগ করে নিতে চায়। অন্য অন্য টেবিলেও ওদেরই ক্লাসের আরও কয়েকজন বসে আছে। এদের মধ্যে কেউ? কে?

কৌশিক তাকে দেখিয়ে বলল, এটাকে কোথায় ডিসকভার করলি?

লাইব্রেরিতে, একগাদা বই মুখে করে বসে।

হোয়াট আর ইউ ডুইং দেয়ার? ফান্‌ডা বাড়াচ্ছিলি? হোয়াট টু ডু উইথ ফান্‌ডা? ওসব পরীক্ষার পরের জন্য, বুঝলি? আগে ওনলি সাম কোশ্চেনস্ এন্ড সাম চোথা।

কি উত্তর দেবে রুমেলি। এদেরকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। এরা সব এক একটি সবজান্তা।

অনুরাগ একটু খোঁচা মেরে বলল, কিরে, কী ভাবছিস?

ওর পাশ থেকে একটু সরে বসে রুমেলি বলল, এই, তুই এই সাদা পাতায় বাংলায় ভয়ে আকার লেখ তো।

তারপর বসন্তসেনাকে বলল, তুই লেখ 'ল'।

ইতিমধ্যে কৌশিক আর কৌস্তভ ধোঁয়া-ওঠা চাউমিন এনে হাজির করল টেবিলে। তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিল 'বা' আর 'সা'। যেমন না শব্দটা তৈরি হল, ওরা চারজন হাততালি দিয়ে উঠল, কনগ্র্যাট্‌স রুমেলি, তুই প্রেমে পড়েছিস? হু ইজ দি লাকি চ্যাপ?

কে সে? কে-ই বা জানে! যদি বলা যায় রোদ্দুর, শিরীষ পাতার ছায়া, বা ঝিলের জালে ঢেউয়ের বৃত্ত, ঢেউয়ের মাথায় হিরের চুমকি, কিংবা জলফড়িংয়ের পাখনা কাঁপান—বিশ্বাস করতে কারও বয়েই গেছে।

তিন

আজকে অ্যাডাম স্মিথ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপ্পান্ন-সাতান্ন।

"কাল আমার রুটিনটা কি শুনবে? সকাল ছটায ঘুম থেকে ওঠা, পড়তে বসার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। বইটা খুলে বসতেই ল্যাব খেয়ে গেলাম। কিচ্ছু পড়া হল না, শুধু উল্টেপাল্টে রেখে দিলাম। কিন্তু হল না দেখে দুপুরে ঘুম। অল্প টিভি। তারপর রাত দেড়টা অবধি সলিড পড়া।

"ওঃ, তোমাকে সেদিন যা দেখাচ্ছিল না। ওই যে সেদিন—যখন সন্ধ্যা নেমেছিল ঝিলের ওপর। তার দ্বিধা থরো থরো পায়ের পাতা যেই না ছুঁয়ে দিল ঝিল, তাকে কৃতাঞ্জলিপুটে ধরে নিয়ে আঙুলের ওপর ওষ্ঠ রাখল জল। আমূল শিহরিত হয়ে উঠল সন্ধ্যা। তার সেই রোমাঞ্চ জেগে রইল রাস্তার ধাবে বাতিস্তম্ভে। কারও খেয়াল নেই সাঁকোর ওপর তখনও বিকেল, তুমি আর বসন্তসেনা পার হয়ে যাচ্ছ। কথা বলতে বলতে এক সময় তুমি ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে হেলান দিলে। বুকটা ধড়াস করে উঠল, মনে হল এইবার বুঝি উল্টে জলে পড়ে যাবে। তারপর তলিয়ে যাবে কোথায়, ঝিল যত

গভীর নয় তার থেকেও নীচে। আর সেখানে গিয়ে তুমি মৎসকন্যা বনে যাবে। কেননা, তোমার মাথায় চুড়ো করে জড়ো করা ছিল চুল, দু'পাশে শ্যাওলার মতো নেমে আসছিল চুলের জালি। কড়ির মালা দুলছিল গলায়। শাড়িতে কাপড়ের টুকরো জুড়ে তাতে গাঁথা ছিল কড়ি ও কাচ। বসন্তসেনাও সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। তবে ও কোনদিন মৎসকন্যা হবে না। তোমাকে নিয়ে আমার সে ভয়টা আছে।"

খুব খুঁটিয়ে হাতের লেখাটা লক্ষ করে রুমেলি। অনুরাগ ভয়ে আকার লিখেছে, কেমন তালগোল পাকানো। ভ আর ত-এ তফাত করা যাচ্ছে না। আর এ ভ-এর প্রথম টানটা নাচের মুদ্রা প্রসারিত হাত পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করছে যেন নর্তকী। কৌস্তভের দন্ত স—মধ্যযুগের কলকাতার বাবু। লুটিয়ে পড়া কোঁচার খুঁট হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেছেন বুকের কাছে। এরা কেউ এই চিঠি লেখেনি। লিখলেই কি খুশি হত রুমেলি? কেন এই নৈব্যক্তিক চিঠি এরা লিখবে, সোজাসুজি কথা বলার যখন এত সুযোগ আছে?

গতকাল ছিল ছুটির দিন। রুমেলিও কি ভাবেনি অনেক পড়বে? কিন্তু কার্যত কী হল—মা ঝুনুমাসির বুটিকে দুপুরবেলা যাবে কি যাবে না; না, না তুমি যাও, পুজোর আগে এই সময়টা যা ভিড় না, একা সামলাতে ঝুনুমাসি হিমসিম খাবে। তেরও তো পরীক্ষা। এখন আর পরীক্ষার আগে মাকে লাগে না, না? তারপর নির্জন ফ্ল্যাটে, ততোধিক নির্জন ঘরে বুকের নীচে বালিশ চেপে সামনে অবশ্যই বই খোলা, শুধু স্বপ্ন দেখা, দেদার স্বপ্ন। ধু ধু ধানক্ষেতের মধ্যে থেকে আচমকা বকের ওড়া, উড়তে উড়তে রোদ্দুরে ঝাপসা হয়ে যাওয়া। রোদ্দুর এখন শিরীষ গাছের ছায়াবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্মণরেখার মধ্যে ঢুকতে পারেনি। একটা বুলবুলি কোথ্ থেকে উড়ে এসে ডালে বসল, বাকিংহাম প্যালেসের প্রহরীদের মতো উঁচু টুপি মাথায়, পিছন পিছন তার প্রেমিকা। পাখিরা বড় ভালবাসাবাসি করে, যদি পাখিদের মতো ভালবাসা যেত!

'কৌশিকের ফোন এল।'

কি রে তোর গলাটা এত ভার ভার লাগছে কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিল? ওঃ, না ঘুমোবি কি? তুই তো প্রেমে পড়েছিস।

আর কিছু?

কাঁচা প্রেমের বড় আঠা।

আর পাকলে?

খসে পড়ে যায়। পাকা ফল দেখিসনি?

চার

ইউনিভার্সিটি ফেস্ট চলছে। এই মহাপার্বণে সবাই একটু খোলামেলা। সারা রাত ধবে চলছে গানের জলসা। কে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমোবে ঠিক করে নিয়েই বসছে পাশাপাশি। ভোররাতে জলসা ভাঙলে শতরঞ্চির সঙ্গে গুটিয়ে যাচ্ছে এমন ছেলেমেয়েও আছে দু চারটে। মাস্টারমশাইরা দেখেও দেখছেন না। তাঁরাও টুকিটাকি প্রেম সেরে নিচ্ছেন এই ফাঁকে। রুমেলির রাত্তিরে থাকা চলবে না, কড়া হুকুম আছে মায়ের। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রাত জাগার যে কী মজা, মা সেসব বুঝবে না! জলের মধ্যে কালপুরুষের

ছায়া দেখলে মানুষ নাকি ঘরছাড়া হয়। কতদিন ভেবেছে ঝিলের জলে তারা ভাসা দেখবে, কিংবা ক্যাম্পাসের গা ঘেঁষে যে রেললাইন, শুনবে সেখান দিয়ে দিনের শেষ রেলগাড়ি যাওয়ার আওয়াজ—মা'র অসহযোগিতায় সেসব আর এ জীবনে হওয়ার নয়। সেই দুঃখ ভুলবার জন্য পোশাকে যতটা পারা যায় খোলামেলা হবার চেষ্টা করল সে। শখ করে একটা স্প্যাগেটি স্ট্যাপ টপ্ কিনেছিল পুজোর সময়, পরা হয়নি, আনকোরা পড়েই ছিল আলমারির কোণে, জিনসের ওপর সেটাই পরে নিল। চুলটা যে কী করা যায়? চুলগুলো নিয়ে মহাসমস্যায় পড়ে যায় রুমেলি, একঢাল ভ্রমরকৃষ্ণ চুল তার। কিছু ঠিক করতে না-পেরে পার্লারে গিয়ে কান ছোঁয়া ব্লান্ট কাট দিয়ে এল। মায়ের তো দেখে মাথায় হাত, এ কী মূর্তি হয়েছে তোর? রাত্রে থাকতে দিচ্ছি না বলে প্রতিশোধ নিলি? যা, যা পারিস কর।

ঠিকই বলেছে মা, প্রথম রাগটা মায়ের ওপরই হয়েছিল। তারপর গিয়ে পড়ল চুলের ওপর। এখন রাগ হচ্ছে সবার ওপর। শেষ বিচারে নিজের ওপরই। গান্ধী ভবনের সামনের মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তারা। মাউথ অর্গ্যানে সুর তুলছিল কৌশিক। একটু দূরে অন্য দলে বসেছিল অনির্বাণ, দীপশিখারা। ওরা পরের ব্যাচের। দীপশিখা গলা তুলে ডাকল, কৌশিকদা, আমাদের এখানে একটু। বিনা বাক্যব্যয়ে কৌশিক উঠে গেল। মাউথ অর্গ্যান হাতে থাকলে কেউ ওর বন্ধু না, কিংবা সবাই বন্ধু। বসন্তসেনাও উশখুশ করছিল। বলল, তোরা সিগারেটের ধোঁয়ায় এত পলিউশন করেছিস, আমার চোখ জ্বালা করছে। এই কৌস্তুভ, চল ফুচকা খেয়ে আসি, না হলে আমি দেখতে পাব না।

কৌস্তুভ বলল, রুমেলিও চল।

ঘাড় নাড়ল রুমেলি। সেই মুহূর্তে তার উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বসন্তসেনা কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, 'মা মানা করেছে, নাকি? মাদার্স চাইল্ড।' হেসে উঠল অনুরাগ আর কৌস্তুভ। এরপর আর যাওয়াই চলে না। রুমেলি রাগ করেছে বুঝতে পেরে উঠেও আবার বসে পড়ল অনুরাগ। বসন্তসেনাও মত পাল্টে ফেলল। কেউ যাচ্ছে না দেখে রুমেলিকেই আবার জোর করতে হল। শেষ পর্যন্ত বসন্তসেনা আর কৌস্তুভ গেল। শর্ত রইল এই, ওদের আনা চুড়মুড় খেতে হবে রুমেলি আর অনুরাগকে। অনুরাগকে নিয়ে সমস্যা নেই। সে সবেতেই রাজি। কিন্তু রুমেলির রাগ চলে গেলেও নিমরাগ থেকে যায়। কারও সঙ্গে কথা বলবে না ঠিক করে সে পাশে পড়ে থাকা বই, কার জানা নেই, তুলে নেয়। ইন কোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস। এটা আবার-কোন পরীক্ষায় লাগে? বইটা খুলতেই মাঝখানের পাতা বেরিয়ে পড়ে। সেই মনের কথা। এখানেও? অনুরাগকে লুকিয়ে চুপি চুপি পড়ে নেয় সে।

"শরীরে এত সম্পদ তোমার, অনেকেই তৃপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। ভালমানুষের মতো মুখ করে বসে রয়েছে যে-ছেলেটি, সে তো তোমার পাশ ছাড়া হচ্ছেই না। কেন এসব পরো? শাড়িতেই তো বেশ ছিলে।"

দ্রুত হাতের টানে দু-চার লাইন। কতক্ষণই বা লাগে পড়তে। ছুঁড়ে বইটা ফেলে দেয় রুমেলি। বড় সাহস বেড়েছে, এখন আবার শাসন হচ্ছে। এদিকে সামনে আসার সাহস নেই। জ্বলন্ত চোখে তাকায় রুমেলি। রোদ্দুর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বকুলের ওপর।

সম্ভোগ-পরিতৃপ্ত তরুণীর মতো বকুলের পাতা স্থির, নিষ্কম্প। সব পারে রোদ্দুর, আজ শিরীষ, কাল কৃষ্ণচূড়া, পরশু বকুল, সবাইকে ছুঁয়ে যেতে পারে কেবল রোদ্দুরই। আর তার বেলা? তুমি অনন্যা হও। কেন? বেশ করবে অনুরাগকে বলবে, এই চল তো, আমায় বাসে তুলে দিবি। অন্যদিন সে দিব্যি নিজেই বাসে উঠে যায়, কেউ তুলতে যায় না।

মৃদু আপত্তি করল অনুরাগ, দাঁড়া, ওরা চুড়মুড় নিয়ে আসুক।

কৌশিক রুমেলির রাগের কারণ কিছু জানে না। আবার এই দলে ফিরে এসে বলল, এখনই যাচ্ছিস কেন, এখনও তো সন্ধেই হয়নি? একটু দাঁড়া, আমিও যাব একসঙ্গেই।

কোনও কথায় কান দিল না রুমেলি, গটগট করে হেঁটে চলে গেল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

বন্ধুদের কাজ বাড়ল। পরদিন দলবেঁধে বাড়িতে এসে রাগ ভাঙিয়ে গেল।

দুদিন পরে এক সকালে রুমেলি ফোন করল কৌশিককে, আজকের দিনটা মনে আছে তো?

কেন, কী আছে আজ? আকাশ থেকে পড়ল কৌশিক।

বাঃ, আমার জন্মদিন না?

তুমি কে বাবা হরিদাস, তোমার জন্মদিনটা বিশ্বসুদ্ধু লোককে মনে রাখতে হবে?

অ্যাই, কানমলা খাবি বলে দিচ্ছি। বিকেলে আসবি কিন্তু, আমি আজ আর ক্লাসে যাব না।

খ্যাটনটা কেমন হবে আগে বল।

মোগলাই পরোটা, মটন চাপ, আইসক্রিম।

ছ্যা, ছ্যা---

তাহলে, মটন বিরিয়ানি, চিলি চিকেন।

ওয়াক থুঃ।

তাহলে ডাল, রুটি, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা।

ওঃ ফাইন, ফাইন।

আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গিয়ে মনটা ঝলমল করে উঠল রুমেলির।

পাঁচ

কৌস্তভের বাড়ি থেকে বেরিয়েই রুমেলি আর বসন্তসেনা দেখল আকাশ প্রচুর সাজগোজ করে তৈরি। এক্ষুনি বর্ষাবাহিনী এল বলে। ওরা দৌড়পায়ে হেঁটেও বাসরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, তার আগেই চড়বড় করে বৃষ্টি এসে গেল। কারওর কাছেই ছাতা নেই অবধারিতভাবে। কী করি, কোথায় যাই—করতে করতে ওরা একটা দোকানের আতপত্রের তলায় আশ্রয় নিল। সেখানে ইতিপূর্বেই আরও দু'চারজন দাঁড়িয়ে আছে। এই দুজন নবোদ্ভিন্ন যুবতীকে পেয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল নিঃসন্দেহে। মানুষের পক্ষে সেটা কিছু এমন দোষের নয়, বিশেষত বসন্তসেনা যখন রয়েছে। এখন আবার একটা নিলে, অমনই মেলে আর একটা, সেভাবে গিঁট বেঁধে রয়েছে রুমেলি। কিন্তু বৃষ্টির বাড়াবাড়িটা কি সহ্য হয়? অশোকবনে তাদের দুজনকে বন্দী করে রাবণের অনুচররা

রাক্ষস-নৃত্য জুড়েছে। ঝলসে উঠছে তাদের তলোয়ারের মুক্ত ফলা, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে তারা, মেঘে মেঘে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের হাসির আওয়াজ, আসন্ন সম্ভোগের আনন্দে আত্মহারা তাদের হাত, হাতের আঙুল ছুঁয়ে দিচ্ছে'পা, পায়ের পাতা। জল ক্রমশ বাড়ছে, নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে উপর্ঝরণ। রুমেলি নিশ্চয় করে বলতে পারে, আর যারা নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখ একটা স্বাদু খাদ্য পেয়েছে। বসন্তসেনা অস্বস্তিবোধ করছে, দু একবার বিরক্তিও প্রকাশ করে ফেলল। রুমেলিকে যদি একা দাঁড়িয়ে থাকতে হত এখানে, ওর অবস্থাও এরকমই হত। এখন না হয় বসন্তসেনার উপচ্ছায় অঞ্চলে ঢুকে পড়ে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক বোধ করছে। এতে তো খুশি হওয়ারই কথা, কিন্তু গোপন ঈর্ষার মতো কী এক গভীর দুঃখ বৃষ্টির ছাঁটের মতো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রুমেলিকে। ওর উসকো-খুসকো চুলে ধুলোর মতো লেগে আছে জলকণা। বসন্তসেনা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। মুখের মোচড়ে ঝরে পড়ল অসহিষ্ণুতা। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে নাম্বার টিপতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই ....।

হাই ইন্দ্র, তুমি একটু গাড়ি নিয়ে আসবে?

ইন্দ্রের তরফে কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছে না রুমেলি। বসন্তসেনার উত্তরের ফাঁকগুলোতে নিজের মতো করে টীকাটিপ্পনি বসিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রটা আবার কে? বসন্তসেনার আপৎকালীন প্রেমিক বোধহয়। নিশ্চয়ই কোনওদিন প্রাণ-টান দেবে এমন প্রতিজ্ঞা করেছিল। আজ তবে তার সেই পরীক্ষা দেবার দিন। এই দুর্যোগ মাথায় করে, জল ঠেলে ঠেলে সদানন্দ রোডে পৌঁছতে পৌঁছতে তার প্রাণটা থাকলে হয়। কেন, বসন্তসেনাদের নিজেদের গাড়ির কী হল? ও, সেটা বুঝি হালকা-পলকা। জলে ভেসে যাবে। দেখা যাক, ইন্দ্র কীরকম জবরদস্ত গাড়ি আনে। সে আসবে এই সম্ভাবনাতেই তার দূতেরা, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। তাণ্ডব যেন বা কিছু কমের দিকে। কি রে বাবা, ইন্দ্র কি দেবতা নাকি?

বসন্তসেনা বলল, কি রে কমেলি, কী ভাবছিস? খুব ভাবনায় পড়েছিস মনে হচ্ছে।

রুমেলির মন তখন দূরে কোথাও, কোনও দুর্নিরীক্ষ্য দূরত্বে, যা দূরেও হতে পারে আবার একই সঙ্গে খুব কাছেও। যেখান থেকে কেউ একজন খুব গভীর দৃষ্টিতে ধরে রেখেছে তাকে। সে আর একা নেই।

বসন্তসেনা তাকে আশ্বস্ত করে ডোন্ট ওরি। আমরা তোকে ঢাকুরিয়ায় ড্রপ করে দিয়ে যাব। ঠিক আছে?

রুমেলির দৃষ্টিতে তখন জলের ফোটা। দোকানের সামনে টিনের ছাউনি। তার ধারটা সরু কাঠ দিয়ে মোড়া। সেই কাঠের রেখা বরাবর জলের ফোঁটা দৌড়ে আসছে দু দিক থেকে। এক সময় দুটো মিলে একটা বড় ফোটা তৈরি হচ্ছে। তারপর টুপ করে ঝরে পড়ছে। ততক্ষণে পিছনে পিছনে ফোটাদের লাইন পড়ে গেছে। অপ্রতিরোধ্য মিলন টানে তারা ধরে ফেলেছে একে অপরের হাত। তারপরই মরণ-ঝাঁপ।

সেই বৃষ্টি চলল পরদিন, তার পরদিন, তারও পরদিন। এ বছর সারা বর্ষাকাল জুড়ে

ভালই বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশির ভাগ নদীই বইছিল বিপদসীমার ওপর দিয়ে, এবার বাঁধভাঙা জল এসে বান ডাকিয়ে দিল। রেল লাইন ভেঙে দিয়ে জল ঢুকল গ্রামে। ঘর-বাড়ি ভেঙে, মানুষ, গরু-মোষ ভাসিয়ে, শস্যক্ষেত ডুবিয়ে জল সমুদ্র হয়ে শুয়ে থাকল। এমনি না-ছোড়, কিছুতেই যাব না, একদিকে ঠেলা খেলে ফুঁসে ওঠে আর এক দিকে।

এর মধ্যেই কৌশিক, কৌস্তুভরা পূজোর কটা দিন হলদিয়ায় কাটাবে ঠিক করেছে। ওদিকে বন্যা হয়নি। বসন্তসেনাও নাকি যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। গেলে ওর বোনকেও নিয়ে যাবে। রুমেলিকে ধরেছিল খুব করে। গেল না বলে একটু রাগারাগিও হয়ে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই তার। একে তো তাদের বাড়িতে মা-বাবা, ক'জন বন্ধু মিলে বাইরে রাত কাটাবে, এই প্রস্তাবেই আঁতকে উঠবে। তার ওপর, প্রত্যেক বছর পূজোয় কৃষ্ণনগর যাওয়া রুমেলিদের পরিবারের রীতি। সেখানে অবশ্য বন্ধুরা যেতে পারে। গেলে সবাই খুশিও হবে খুব। কিন্তু সে কেউ যাবে? তার বেলা, না।

এবার বাবা-মা, কাকু, পিসি যে যেখানে ছিল সবাই খুব উদ্বিগ্ন, এই অবস্থায় কৃষ্ণনগরে দিদান কি করছে, আর মন্টুকাকাই বা সামলাচ্ছে কি করে সবদিক। সৌভাগ্যক্রমে পূজো আসতে আসতে জলটা নামতে শুরু করল। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা খানিকটা স্বাভাবিক হতেই সবাই মিলে হুড়মুড় করে এসে হাজির হল দিদানকে দেখতে। দিদানের বাড়ির ভিত খুব উঁচু, জল ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি কিন্তু দালান ছুঁয়ে গেছে। শিবুকাকারা পাশেই থাকে। তাদের মাটির দেওয়াল, ঘড়ের চালের গোয়াল আর রান্নাঘর ধ্বসে পড়েছে। জল ঢুকে গেছে ধানের মরাইতে। এখন জল নেমে যাওয়াতে কাকিমা আর ও বাড়ির দিদা সারা উঠান মেলে ভেজা ধানের আলপনা দিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক পায়রা এসে বসছে আর কাকিমা 'হুস' করে দৌড়ে যাচ্ছে। নেড়ি কুকুরটাও ফিরে এল একদিন. দিদান তাকে খুব খাতির করে খাওয়াল দাওয়াল।

সবকিছু আবার আস্তে আস্তে জীবনের ছন্দে ফিরে যেতে লাগল। এর মধ্যে রাংতা এল একদিন। ওর বরকে নিয়ে, বিয়েব পর প্রথম। বড়পিসিমার মেয়ে রাংতা, একদম রুমেলির বয়সী। সারা পুজোর ছুটিটা রুমেলি আর রাংতা হাতে হাত পেঁচিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই রাংতার মুখে রুমেলি যেন আবিষ্কার করল সেই আশ্চর্য রোদ্দুর। অমনি দুদ্দাড় ছুটি একেবারে ছাদে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সারা ছাদময় একটা মন-কেমন-করা আকাশ।

সাত

দু দুটো মাস পার হয়ে গেল পরীক্ষা আর রেজাল্ট বার হতে হতে। এই দুটো মাস ইউনিভার্সিটির মুখ দেখেনি রুমেলি। এতদিন পর সব কেমন অচেনা লাগছে। নতুন একদল ছেলেমেয়ে ঢুকে লবিতে জায়গা দখল করে নিয়েছে। গেটের পাশে রবার গাছটা আরও একহাত লম্বা হয়ে গেছে। ঝিলের যত শাপলা শামুক উজাড় করে রাখা হয়েছে ধার বরাবর। লাইব্রেরির পিছনে আখাম্বা একটা বিল্ডিং উঠছে। সবচে' বড় কথা শম্পাদি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। রুমেলিকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কেমন রেজাল্ট হয়েছে তোর? তোদের ব্যাচে ক'টা ফার্স্ট ক্লাস? সোমনাথদা ধারেকাছেও নেই। বসন্তসেনা মডেলিং-এ চলে গেছে। সম্প্রতি একটি

সাবানের বিজ্ঞাপনে টি.ভি-তে তাকে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। স্নানদৃশ্যে ক্যামেরা তার পিছু ধাওয়া করে নদীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে একেবারে। আর রুমেলি নয়, বসন্তসেনাই অবিকল মৎস্যকন্যার মত সাঁতার কাটতে কাটতে কখনও ফেনা হয়ে যাচ্ছে, কখনও ফেনার মধ্যে থেকে ভুস করে বেরিয়ে এসে দর্শকদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে সাবানের প্যাকেটসুদ্ধ হাতটা। আবার কি কোনও উথাল-পাথাল বাদল দিনে বসন্তসেনা ডাক পাঠাবে ইন্দ্রকে? কৌস্তুভ চলে গেছে ম্যানেজমেন্ট পড়তে। কেবল কৌশিকই এম এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাল রেজাল্ট করেছে ও। পি. এইচ. ডি. করে নিয়ে অধ্যাপনা করার ইচ্ছে আছে ওর। সেইটা মাথায় রেখেই এগোচ্ছে ও। অনুরাগ বাবার ব্যবসায়। ওর আর ডিগ্রির দরকার নেই।

ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কৌশিকের খোঁজ করতে হল। বি. এম ক্লাস নিচ্ছেন তখন। ওকে দেখতে পেয়ে কৌশিক ভেতর থেকে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বলল। চারতলার ব্যালকনির একেবারে কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল রুমেলি। এই জায়গাটারই নাম আন্টার্কটিকা। শীতকালে কোনও কোনও দিন এখানে বরফ পড়ে আর সেই' সঙ্গে হু হু হাওয়া। আজ সেইরকম একটা দিন। এক অতীন্দ্রিয় রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। এত অপর্যাপ্ত, কিন্তু একটুও গায়ে লাগছে না। গায়ের ওপর চাদরটা টেনে নিয়ে তৃষিত চোখে দূরের রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বি.এম বেরিযে যেতেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে কৌশিক।

কি রে, এতদিন পরে থোবড়া দেখালি যাহোক! তোকে ফোনেও পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা কী?

ঠিক আমার না থাকার সময়টায় ফোন করলে ওরকমই হয়। মা বলছিল, কৌশিক তোকে প্রায়ই ফোন করে। সেইজন্যেই তো এলাম দেখা করতে। বল, কী বলবি বল।

কিছু বলতেই হবে? কেন, এমনি আসা যায না? মাসিমা বলছিলেন, তুই নাকি প্রায়ই সাইবার কাফেতে যাচ্ছিস চ্যাট করতে।

হ্যাঁ, ওই আর কি। পাড়াতেই খুলেছে একটা।

তাই মানুষ ছেড়ে যন্ত্রের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া। তুই ভাত-টাত খাচ্ছিস, না সাইবার চিপ্‌স্?

ফোনে পাচ্ছিস না, তো একবার বাড়ি গেলে কি হয? ফার্স্ট হয়ে খুব পায়াভারি হয়েছে না তোর?

পায়াভারি? না, এই দ্যাখ একই রকম আছে, পাটা একটু তুলে ধবে কৌশিক, ভারি তো একটুও হয়নি। সেই জিনস মেলা থেকে হাফ দামে তুই আর আমি যে প্যান্টটা কিনেছিলাম, সেটাই তো পরে আছি।

সুস্মিতাদি একগাদা খাতাপত্র নিয়ে তড়িঘড়ি ক্লাসে ঢুকলেন, ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলো দাঁড়িয়ে বসে কথা বলছিল এর-ওর সঙ্গে। সুশৃঙ্খলভাবে বসে গেল যে যার সিটে। দু-একটি ছেলে বেরিয়ে চলে গেছিল কমনরুমের দিকে দু-চার টান ধোঁয়া ছাড়ার জন্য, তারাও কয়েক কদম সিঁড়ি টপকে টপকে উঠে আসতে লাগল ক্লাসরুমের দিকে।

সেই দিকে ইঙ্গিত করে রুমেলি বলল, যা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।

কৌশিকের কোনও তাড়া নেই। ও তখনও কথা বলে চলেছে, তোকে দেখে সবাই কি বলছে বলত? ফোবোস এক ফিরে এসেছে। ফোবোস দুইটা আসবে কি পিছু পিছু?

মানে? সরল জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে রুমেলির চোখে।

বুঝতে পারছিস না? একদম টিউব লাইট হয়ে গেছিস তুই। মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠানো মাহকাশযান। এরা মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, ফোবোস এক তুই হারিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিস। বসন্তসেনা ফোবোস দুই।

রাগের চোখে তাকায় রুমেলি, কিন্তু মুখের হাসিটা চাপতে পারে না।

যা, যা ক্লাসে যা। ফালতু বকিস না।

ব্যালকনির অ্যালসের ওপর রাখা ছিল রুমেলির হাত। কৌশিক নিজের হাত দিয়ে ঢেকে দিল সেটা। আঙুল দিয়ে তার পিঠে লিখল এল ও এল।

আবার বিস্ময় বিস্ফোরিত হ'ল রুমালির চোখে।

মানে? এল ও এল কি ইনটারনেটের ভাষা? লটস্ অফ লাফ্, অনেক হাসি? হাসছিস কেন?

এত মানে মানে করলে ঝাড় খাবি কিন্তু রুমেলি। এল ও এল হচ্ছে লটস্ অফ্ লাভ্।

হাতের ওপর ছোট্ট চাপড় মেরে দৌড়ে ক্লাসরুমে ঢুকে গেল কৌশিক।

রুমেলি গিয়ে বসল লাইব্রেবিতে। তার সেই পুরনো চেয়ারে, শিরীষ গাছের দিকে মুখ করে। অত্যন্ত সাধারণ রেজাল্ট করেছে সে, এম. এ.-তে ভর্তির প্রথম লিস্টে তার নাম নেই, সেকেণ্ড লিস্ট করে বেরোবে জানা নেই শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষাতে তার মন ওঠে না। বুকের মধ্যে 'কী জানি, কী যেন' শিহরন, তলপেটে অসহ্য সুখের মত কষ্ট। নিশ্চয়ই সেই মনের কথার টুকরো পড়ে আছে বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। এই দুমাসে মনে মনে জমে গেছে কত কথা। অস্থির হাতে পাতা উল্টে যায় রুমেলি। মরিস ডব্—হল না, এ্যাডাম স্মিথ—কোথায়, কোথায়—নেই তো, স্যামুয়েলসন.... কোথাও নেই, কো-থা-ও নেই। শীতবেলায় সূর্য পাটে বসেছে, দক্ষিণায়ন হয়েছে তার, রোদ্দুর সরে গেছে অন্য টেবিলে, রং লাগান শেষ করে শিল্পীর তুলি ঝাড়ার মতো নিভে আসা আকাশের গায়ে রঙের গোল্লা, সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে এক ঝাঁক পাখিদের ঘরে ফেরা।

লাইব্রেরির রিডিং রুমেও আলো জ্বলে গেছে। রুমেলির সামনে ডাই হয়ে পড়ে আছে একগাদা বই। সেখানে কোনও পাতার ভাঁজে আর মনের কথার চিহ্নমাত্র নেই।

শেষ বৃষ্টি

সৌমিত্র শংকর দাশগুপ্ত

বিয়ের দিন সকালে, তখন বোধহয় দশটা-টশটা হবে, তিন্নি এসে হাজির হল দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে। ওর হাসিতে এমনই একটা ফিচেল ভাব যে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল, একবার ভাবলাম, দু-কথা শুনিয়েই দিই খুব আচ্ছা করে। কিন্তু কাজের বাড়ি, চারধারে লোক। তাছাড়া, যতই হোক, তিন্নি আজ এখানে অতিথি। মনকে বোঝালাম, রেগে আর কি হবে? দোষ কি আর তিন্নির? দোষ তো আমার।

কাছে গিয়ে খুব চাপা গলায় বললাম—'চিঠিটার উত্তরই দিলিনা যে? এত ব্যস্ত? তিন্নি আবারও ফিক-ফিক করে হাসল। তারপর বলল—'উত্তর দিইনি তো কি হয়েছে? খবর আছে......খবর!'

ছোটকাকার যেমন কাণ্ড! সকাল থেকেই দেশসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে বসে আছে! মেয়ের বিয়ে তো রাতে, অথচ সকাল থেকেই লোকজনে গমগম করছে বিয়েবাড়ি। এরই মধ্যে রায়কাকি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে 'ওমা তুলি, তুই কত মোটা হয়েছিস রে? তা তোর ছেলেমেয়েরা কই?' বলে ঝড় তুলে দিল। সেই ঝড় ঠাণ্ডা হতে-না-হতেই ভেতরের ঘর থেকে আমার বর শুভেন্দু বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগল—'চিরুনিটা কোথায় রেখেছ অ্যাঁ? আমার ব্রিফকেস তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাচ্ছিনা।'

চিরুনিটা কে যে আমার হ্যাণ্ডব্যাগে চালান করে দিয়েছিল জানিনা। খুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসছি, ছোটকাকি এসে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল—'তুলি, একবার যা না মা, তোর ছোটকাকাকে গিয়ে ঠাণ্ডা কর। মাছ নাকি কেজি দুয়েক কম দিয়েছে, এদিকে বাড়ি-ভর্তি লোক, কি করি বলতো?'

রান্নাঘরের পেছনে এক ফালি জায়গায় বিশাল বিশাল চটিতে মাছ কোটা হচ্ছিল। বাবা আর ছোটকাকা সেখানে দাঁড়িয়ে। আমি গিয়ে কি-ভাবে কি বললে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় ভাবছি, হঠাৎ ছোটকাকা নিজেই বলল—'তোর কাকি তোকে পাঠিয়েছে তো? আমার মাথা খুব গরম, তাইনা? মাথা আমার এমনিতে গরম হয়না। এগারোটা বেজে গেল, মোগলসরাই থেকে বেনারস কত দূর রে? এখনও ছেলেব বাড়ি থেকে তত্ত্বটা পাঠাতে পারলনা? তুই একবার যা তো, আমার তো ফোনটাও খারাপ, অগস্তি আঙ্কেলের বাড়ি থেকে ও বাড়িতে একটা ফোন করে খবর নে, যা যা, দেরি করিস না....'

উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে আসছি, আরও সব কারা এসে পড়েছে, অত খেয়াল করিনি। হঠাৎ-ই তিন্নি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠল—'হোটেল নিশান।'....মাথাটা কি বোঁ করে ঘুরে উঠল আমার? গেটটা ধরে সামলে নিলাম। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। মনে হচ্ছিল, রাস্তাটা বোধহয় পার হতে পারব না। চোখ দুটো কি রোদে ঝলসে গিয়েছিল? সব কেমন ঝাপসা দেখছিলাম। তবুও পার হয়ে একটা, দুটো তিনটে কোয়ার্টার্স বাদ দিয়ে অগস্তি আঙ্কেলের কলিং বেল

বাজালাম। ফোন-নাম্বারটা? সর্বনাশ! ওটা আবার কোথায় ফেললাম? এদিক-ওদিক খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওহো, বাঁ-হাতের চেটোয় লিখে নিয়েছিলাম তো! বাঁ-হাত খুললাম। ঘামে ভিজে গিয়েছে হাতের চেটো। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে নাম্বারটা তবুও আন্দাজেই ডায়াল করে একটু ইতস্তত করেই বললাম—"হ্যালো....'

২

কবে থেকে শুরু হয়েছিল আমার অসুখটা? কি জানি! ধরা তো পড়েছিল হঠাৎ-ই একদিন। ৫-ই অক্টোবর, শনিবার। আমার মেয়ে রুম্পার স্কুলে গার্জিয়ান মিটিং ছিল। সময়টা বেলা এগারোটা হবে। হরিশ মুখার্জি রোড ধরে তর-তর করে এগিয়ে যাচ্ছিল আমার ট্যাক্সিটা. জানলা দিয়ে অলসভাবে দেখছিলাম চেনা কলকাতার চেনা দৃশ্য। কিংবা, হয়তো কিছুই দেখছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ-ই একটা দোকানের সামনে তোমাকে দেখলাম। মুখটা একটু ঘোরান ছিল বাঁ-পাশে। কিন্তু, আমার তো ভুল হবার কথা নয়। হঠাৎ-ই 'রোক্কে' বলায় চমকে উঠেছিল ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা। একটু বিরক্তও হয়েছিল বোধহয়। কিন্তু আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে তোমার আকাশি রঙের শার্টের হাতাটা টেনে ধরে বলেছিলাম—'এই সুদীপ। তাকাও, তাকাও বলছি আমার দিকে!'

সে ঘুরে তাকিয়েছিল। ভুরুদুটো সামান্য কুঁচকোন। আর তাতেই আমার চোখ নেমে গিয়েছিল রাস্তার দিকে। চাপা গলায় শুধু বলেছিলাম—'সরি।' ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা ভেতর থেকে ডাকছিল—ও দিদি, কি হল?' তারপর বোধহয় বেগতিক দেখে চ্যাঁ করে খুব জোরে হর্ণ বাজিয়েছিল। পরমুহূর্তে দেখলাম, আবার ট্যাক্সিটা চলছে। আমি বসে আছি ভেতরে। আমি—চোদ্দ বছর ধরে জনৈক শুভেন্দু মুখার্জির স্ত্রী, যার ডাকনাম তুলি, পোষাকি নামটা খুব ওজনদার, মনিকঙ্কনা, বয়েস ছত্রিশ, যার ছেলে রন্টির বয়েস তের, আর মেয়ে রুম্পার বয়েস দশ।

মজা করতে গিয়ে সেদিন ভাল করিনি সুদীপ। ভেবেছিলাম, এত বছর পর তোমাকে চমকে দিয়ে মজা দেখব। আর কিছুনা। বুঝিনি, এত হতাশায় পেয়ে বসবে আমাকে। নয়তো রাত্রে খাবার টেবিলে বসে শুভেন্দুকে বলতেই পারতাম—'জান, আজ না একটা কাণ্ড করে ফেলেছি! ছি ছি, কি লজ্জার ব্যাপার.....'। কিন্তু, এ-কথা তো কাউকে বলা যাবে না সুদীপ। আমি যে তোমাকে খুঁজতে নেমেছিলাম। খুঁজে না পাওয়ার লজ্জা, দুঃখ সবটাই আমার।

ভাবছি, এ কোন্ তুলি এতদিন ধরে খাপটি মেরে বসে ছিল আমার ভেতর? এই চোদ্দ বছরে সে ক-বার তোমার কথা ভাবার সময় পেয়েছে? সুখের সময় তোমাকে খুঁজে পাইনি, দুঃখেও না। সেবার যখন শুভেন্দুর ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের পার্টনার ওকে ডিচ্ করল, ব্যবসা ডুবতে বসেছে প্রায়, আমার সমস্ত মন জুড়ে তখন তো শুভেন্দু আর শুভেন্দু! কিংবা, দু-বছর আগে রুম্পার যখন জ্বর হল, ডাক্তার সন্দেহ করলেন ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, আমি আর শুভেন্দু সারারাত জেগে বসে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় টেম্পারেচার নিচ্ছি, মাথায় জলপট্টি দিচ্ছি, তখনই বা তুমি কোথায়? কত.......কত ঘটনার প্রবাহ এই চোদ্দ বছরের দাম্পত্য জীবনে, কত মুখের সারি, কিন্তু কই সুদীপ, সেই ভিড়ের মধ্যে তোমার মুখ কোথায়?

কিন্তু, কোথাও হয়তো ঠিকই তুমি ছিলে। ভিড়ের মধ্যে নয়। একা। তুমি যে সুদীপ! তাই তো বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার মধ্যে রাত কাটে। সামান্য খুটখাট শব্দেই জেগে উঠি। ভাবি, কি ভেবেছিলাম নিজেকে? সব আগুন নিভে গিয়েছে? এখন তুলি মানে শুধুই শুভেন্দু, রন্টি আর রুম্পা? তাই এতদিন পর বুঝিয়ে দিলে তুলি মানে শুধু তুলি, কারোর মা আর কারোর বউয়ের বাইরে সে অন্য কেউ?

কেন যে মরতে সেদিন নেমে পড়েছিলাম ট্যাক্সি থেকে! মজা করতে গিয়ে বুঝতে পারিনি, তোমার সঙ্গে মজা হয়না। আর চিনতে যদি ভুল করেই থাকি, তবে সে ভুলটাকে ভুলতে পারলাম না কেন? কেন তারপর থেকে রাস্তায় বেরোলেই আমি তোমাকে খুঁজতে লাগলাম? এই তো সেদিন স্প্ল্যানেডের ফুটপাথে একটা পার্স দর করছি, হঠাৎ মনে হল, ব্রিফকেস হাতে নিয়ে ওই যে লোকটা লিন্ডসে থেকে পার্ক-স্ট্রিটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, ওর চলার ধরণটা যেন অনেকটা তোমার মত! তারপর সেই লোকটা যখন একটা রানিং বাসে উঠে হঠাৎ-ই উধাও হয়ে গেল, আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল.... 'তুলি, ছেড়ে দিলে লোকটাকে?'....... আর সেদিনের সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারটার মতই দোকানদারটা তাড়া মেরে বলল—'ও দিদি, কিছু বলেন?' আমি সামলে নিয়ে দায়সারা ভাব করে' বললাম—'কি আর বলব বলুন তো? আপনি যা দাম হাঁকছেন!'

কাজের মধ্যে থাকাই ভাল। কিন্তু কাজই বা আর কোথায়? যেটুকু যা, শুভেন্দুর বেরোন আর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত। তা-ও ছেলে এখন লায়েক হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারে আমার টিকটিক পছন্দ করেনা। আগে দুপুরে টিভি দেখতাম। এখন ভাল লাগে না। চুপচাপ শুয়ে থাকি। শুয়ে-শুয়ে ভাবি, হঠাৎ কোথাও আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে। কোথায়? মেট্রো রেলের সিঁড়িতে, নাকি এই কলকাতাতেই নয়, অনেক....অনেক দূরে....অন্য কোথাও? সেখানে কি আছে? পাহাড় না সমুদ্দুর?

তারপর হঠাৎ-ই লাফ দিয়ে উঠি, আরে! পাগলই হয়ে যাব নাকি? উঠে খামোকাই ঘর গোছাই। কাচের জানালার আড়ালে দেখি, হঠাৎ-ই বৃষ্টি নেমেছে। মনে পড়ে, বেনারসের রামাপুরায় তোমাদের বাড়ির বিশাল ছাদটার কথা। সেই ছাদে একবার প্রথম বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। মনে হয়, চলে যাইনা সেখানে। বোসকাকু, মানে তোমার বাবা, মোগলসরাই থেকে রিটায়ার করে ওখানেই চলে গেছেন। সেখানে গেলেই তো দেখা হয়ে যায়! তারপর একসঙ্গে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আবার বৃষ্টিতে ভিজি।

....এমন সময় টুংটাং করে ডোরবেল বেজে ওঠে। তারপর আপনা থেকেই খুলে যায় আমার ফ্ল্যাটের দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে তুমি! আরেঃ, কি আশ্চর্য! এত জায়গা ছেড়ে শেষে নিজের ঘরেই দেখা! তুমি মজা করে বেল বাজাতে থাক, বাজাতেই থাক। টুংটাং....টুংটাং.....। তখন ধড়মড় করে উঠে বসি। আরেঃ! সত্যিই তো বেল বাজছে! দরজা খুলে দিতে রুম্পা এসে ঢোকে। চারটে বাজে। আমি বলি—'কতক্ষণ এসেছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টিফিন খেয়েছিলে? আজ আর পেট ব্যথা হয়নি তো?'

হাসছে সুদীপ? হাস। স্বাভাবিকের অভিনয় করতে-করতে যেদিন সত্যিই অস্বাভাবিক হয়ে যাব, সেদিন আরও হেস। এই তো, যেমন তিন্নি হাসছে। খুব মজা পেয়েছে তো। এদ্দিন পর তুলিদিদির লাভারকে মনে পড়েছে। আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই, সবাই

হাসছে। শুভেন্দু, রন্টি, রুম্পা। শুধু একজনই বোধহয় হাসছে না। ঠাণ্ডা, কঠিন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। বলছে.....তুলি, আবারও?.....আমার মা।

তবুও যদি সামলাতে পাবতাম নিজেকে। ভাবলাম, চিঠি লিখব, কিন্তু কোথায়? তোমাদের রামাপুরার বাড়িতে গিয়েছি অনেকবার, কিন্তু ঠিকানাটা তো কখনও জেনে রাখিনি। তাছাড়া, তুমি যে ওখানেই আছ, তারই বা গ্যারান্টি কি? শেষে হঠাৎ-ই মনে পড়ল তিন্নির কথা। আমাদের হাঁটুর বয়সী। তবে বরাবরই খুব পাকা। তোমাকে আর আমাকে একসঙ্গে দেখলে ওই বাচ্চা বয়সেও ঠোঁট টিপে-টিপে হাসত। ওর বড়দি তিতলি আমাদের বন্ধু ছিল। ওদের বাবা, চ্যাটার্জীকাকু, রামাপুরায় তোমাদের প্রতিবেশী। শেষ পর্যন্ত ওকেই লিখলাম। অবশ্য, সোজাসুজি নয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। লিখেও এক সমস্যা। পুরনো ডায়েরিটা উধাও। শেষে বেলেঘাটায় মাকে ফোন করে ঠিকানাটা যোগাড় করলাম।

আর তারপর থেকে দু-হপ্তা যেতে-না-যেতেই নিচের লেটারবক্স হাঁটকাতে থাকি। হাজারো কিসিমের চিঠিপত্র আসে। এমনকি, আমার তের বছরের ছেলের গার্লফ্রেণ্ডেরও। শুধু তিন্নির চিঠি আর আসেনা। দিন, মাস ঘুরে যায়, তবে বছর পার হবার আগেই হঠাৎ একটা চিঠিতে মোগলসরাই ছাপ দেখে চমকে উঠি। চিঠিটা খুলে দেখি ছোটকাকার। খুড়তুতো বোন ছবির বিয়ে। ছোটকাকার অভ্যাসমত গুরুগম্ভীর ভাষায় লেখা।—'মনে রাখিও, ববি তোমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী। তাহার বিবাহ দিয়া রিটায়ার করিব। শরীরও ভাল থাকে না। তোমার ও শুভেন্দুর উপর বিশেষ নির্ভর করি.....' ইত্যাদি।

বিয়ের দিন ভোরে এসে মোগলসরাই পৌঁছলাম। তখনও জানিনা তিন্নি আসবে কিনা। মন একদিকে বলছিল, না এলেই ভাল, সব চুকেবুকে যাক। আবার অন্যদিকে ভাবছিল, আসবে না? তিন্নি এল। টেলিফোন করে ফিরে আসছি, আবারও চেয়ার ছেড়ে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। বুকটা ধক করে উঠল আমার। আবার কি বলবে? ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল—'ঠিক সন্ধে ছটা।'

৩

কি চমৎকার দিন আর সময়টা বেছেছিলে সুদীপ! বললে তো বলবে—'বিয়েটা কি তোমার যে তুমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না?' এখনও মনে হয় একইরকম আছ। কি করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাঙ্ক-অফিসারের দায়িত্ব সামলাও? তিন্নিকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে সারলে—'হোটেল নিশান, সন্ধে ছটা।' জায়গা আর সময় সবই ঠিক আছে, তবুও সময় যে পার হয়ে গিয়েছে, এ খেয়াল আর তোমার হল না। ছোটবোনের বিয়ের দিন গোধূলিলগ্ন ওর বড়দিভাইয়ের অভিসারে যাবার সময়ই বটে!

কি ভাবছ, সুদীপ? প্রমোশান কি শুধু তোমরা যারা চাকরি কর, তাদেরই হয়? আমাদের হয়না? চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে শুধু সংসার করেই অনেকগুলো প্রমোশান পেয়ে গেছি। এই বিয়েবাড়িতে সকলের বড়দিভাই। শ্বশুরবাড়িতে কারও জেঠি, কারও মামী, এমনকি কোন্ একটা দূরসম্পর্কে দিদিমা পর্যন্ত! কিচ্ছু ভাবলেনা, কিচ্ছুনা! এত তাড়া তোমার! বিয়েবাড়ির হুল্লোড়, আর 'তুলি এটা কি করব', 'বড়দিভাই,

ওটা কোথায় রাখব'-র মধ্যে যখনই হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ছে, দেখেছি টিকটিক করে সময় ঠিকই এগিয়ে চলেছে। খেয়ে উঠলাম, তিনটে বেজে গিয়েছে। বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুচ্ছি, আয়নায় দেখছি নিজেকে।.......হোটেল নিশান, সন্ধে ছটা।.. ..চিনতে পারবে তো, সুদীপ? অনেক মোটা হয়ে গিয়েছি এই ক-বছরে, চুলও আর আগের মত লম্বা নেই, উঠে যাচ্ছিল বলে ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে দিয়েছি। চিনতে পারবে তো? কিংবা, আমারও ভুল হবে না তো তোমাকে চিনে নিতে? তুমিও তো বদলে গেছ। একা-একা বাথরুমের বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিলাম। হাঁ করে শ্বাস ফেললাম আয়নার কাচে। সব ঝাপসা। তুলি এইখানে, একা।... ...হোটেল নিশান, সন্ধে ছটা।.....কে যেন দুম-দুম করে ধাক্কা মারল বাথরুমের দোরে। চমকে উঠে বললাম—'আ-স-ছি।'

আমাদের বিয়ে কোনদিনই হতনা সুদীপ। সে তুমি চাকরি পাও, আর না-ই পাও। আমাদের দুই মায়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রেষারেষি ছিল কোথাও। মানুষের সম্পর্কগুলোর ভেতরে কত যে চোরাস্রোত থাকে! বাইরে দুজনে 'হ্যাঁ দিদি, ও দিদি' করছেন, অথচ আড়াল হলেই গালমন্দ। তোমার মা নাকি দেমাকী, আর ছেলেটি অতি অসভ্য! এই যে রায়কাকি, আজ এসে কত হেসে-হেসে গল্প জুড়েছে আমার সঙ্গে, সুযোগ বুঝে কম ভাংচি দিয়েছে মা'র কানে? দিনকে রাত করেছে। যে হোটেল নিশানের ভেতরটা দেখলামইনা কখনও, সেখান থেকে আমাদের একসঙ্গে বেরোতে দেখেছে! আর মাকেও বলিহারি! আমার ব্যাপারে রায়কাকির কথাই বেদবাক্য! তারপর আঁচড় খাওয়া বিড়ালীর মত ফোঁসফোঁস। হিসহিস করে বাবাকে বলা—'পড়ত আমার চোখের সামনে! দুটোকেই কচুকাটা করে মনের সাধ মেটাতাম। অসভ্য মায়ের অসভ্য ছেলে!' আর আমাব বাবা, রেলের চার্জম্যান, ইঞ্জিনের ভালমন্দ ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, বাইরের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করত। দাদা তখন রাঁচিতে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। বিয়েও তো করল প্রেম করে। মা কিচ্ছুটি বললনা। অথচ, আমার বেলায়....

অবশ্য, তোমার মাকেও আমার খুব সুবিধের ঠেকত না। তোমাকে কিছু বললে তুমি এড়িয়ে যেতে। বলতে—'মার কথা বাদ দাও।' বাদ দেওয়া যেতনা, সুদীপ। পরের জন্মে নিজে মেয়ে হও, তখন বুঝবে। ছোট-খাট অপমানও যে কিভাবে এসে বেঁধে!

তবুও তো আমরা কেউ কাউকে ছাড়তে পারলাম না, সুদীপ! শেষ পর্যন্ত অবশ্য জোর করে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। তবে এতদিন পর কেন যে মিলতে চাইলাম! সময়ের স্রোতকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে তুমি সঙ্কেত পাঠালে—'হোটেল নিশান, সন্ধে ছটা।'—সন্ধে ছটা! গমগম করছে তখন বিয়েবাড়ি। সাজগোজ, হইচই, ব্যস্ততা। চতুর্দিকের 'বর এসেছে, বর এসেছে' রবের মধ্যে আমি ছুটে যাচ্ছি শাঁখ নিয়ে, 'এস এস' বলে বরের হাত ধরে বসবার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি.....বিদ্যুতের ঝলকের মত জ্বলে উঠছে ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট.....আমি বরের জন্য মিষ্টির থালা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই কারা সব চেঁচিয়ে উঠছে—' বড়শালি এসেছে.....বড়শালি......এবার দেবে জামাইয়ের কান মূলে.......'। আর একজন, বোধহয় ওদের পুরুতমশাই, হঠাৎ-ই হেঁকে বললেন—'ছটা ছাব্বিশ।' .... ছটা ছাব্বিশ! আমি তখন বরকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছি। ববির মাসতুতো ভাই টুকলু ক্যামেবা তাক করে বলছে—'বড়দিভাই, এদিকে, মুখটা একটু এদিকে ঘোরাও, এদিকে.......'

৪

গুম গুম শব্দ তুলে রাতের অন্ধকার আর নৈঃশব্দ ভেদ করে ছুটে চলেছে হাওড়ামুখী কালকা মেল। এইমাত্র বোধহয় করমনাশা নদীর ওপর ব্রিজটা পার হল। বিয়েবাড়ির অনিয়ম আর খাটুনির পর সবাই ক্লান্ত। ট্রেনটাও মোগলসরাই এল রাত এগারোটার পর ঘণ্টা তিনেক লেট করে। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা, বাবা, শুভেন্দু, রন্টি, রুম্পা,। নীল আলোয় ছেয়ে আছে কামরাটা। বাইরে নিষুতি রাত। চড়বড়-চড়বড় করে জানলার কাচে কিসের শব্দ হল। বৃষ্টি......বৃষ্টি নেমেছে। কদিন খুব গুমোট চলছিল। মাইলের পর মাইল লাইন ভেঙে বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেনটা পাগলের মত ছুটে চলেছে। কেবিন থেকে সবুজ সঙ্কেত পাঠিয়ে বলা হচ্ছে—'এস, চলে এস!'

তুমিও আমাকে সবুজ সঙ্কেত পাঠিয়েছিলে সুদীপ। মনের মধ্যে সেই সঙ্কেত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু, বাইরে চারধারে নিষেধের অসংখ্য লালবাতি জ্বলছিল। তুলি এগোতে পারল না এক ইঞ্চিও। বোধহয় কোনদিনই পারেনি। অনেক আতঙ্ক, অশান্তি আর অনিশ্চয়তার জালে বন্দি হয়ে থেকেছে, কিংবা, সুখী, নিশ্চিন্ত জীবনের লোভ তার মধ্যেও কোথাও ছিল, আজ তার মাশুল দিতে হচ্ছে। ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে ওঠা স্বামী আর একটু-একটু করে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়ের মাঝখানে নিঃসঙ্গতার চোরা হিমস্রোত কি অল্প-অল্প করে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে তার ছত্রিশ বছরে জীবনের ঘাটটাকে? কি জানি! এখনও শুনলাম বিয়ে করনি। নিজেকে অপরাধী লাগে। নিশান হোটেলের সামনে স্বার্থপর, ভীতু মেয়েটা তোমাকে সারা জীবন দাঁড় করিয়েই রাখবে নাকি।

কতক্ষণ.......কতক্ষণ সেদিন দাঁড়িয়ে রইলে সুদীপ? একটু একটু করে সময় এগোতে লাগল। ছোটকাকা এসে বলল—'বরযাত্রীদের একটু দেখিস তুলি। নিন্দেমন্দ না করে।' খুব কষ্ট হচ্ছিল মানুষটার জন্য। সারাদিন উপোস করে আছে। এদিকে গ্যাস্ট্রিকের রুগী। অসুস্থই হয়ে পড়বে কিনা কে জানে। বললাম—'কিছু ভেবনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ, আমার ভেতরটা মুচড়ে অন্য কে যেন বলতে চাইছিল—'আমাকে তোমরা ছুটি দেবে একটু? একটুখানি? তুমি, বাবা, মা, শুভেন্দু, তোমরা সবাই?'

তিন্নি এসে হাজির হল রাত আটটা নাগাদ, খুব সেজেছে। আমাকে দেখে চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল—'গিয়েছিলে?' আমি বলেছিলাম—'চুপ কর্।' তিন্নি নিভে গিয়েছিল। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায়নি। শুধু যাবার আগে বলেছিল—'তোমার জন্যই এসেছিল। কাল ভোরেই চলে যাবে।' কোথায় চলে যাবে আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনে হয়েছিল, অনেক দুর্বলতা দেখিয়েছি হাঁটুর বয়সী ওই মেয়েটার কাছে, আর নয়। অথচ দ্যাখো, এখন মনে হচ্ছে, কি ক্ষতি হত আরও একটু ছোট হলে?

আসলে, সব কথা সবাইকে বলা যায়না সুদীপ। সবাইকে দিয়ে বলানও যায়না। তিন্নি তোমাকে কি করে বোঝাবে আমার কথা? তার চেয়ে ওর কিছু না বলাই ভাল। আমার কথা কি আমি নিজেই বলতে পারব গুছিয়ে? সবই তো কেমন এলোমেলো। তুলির ভেতরে আর এক তুলি অবিশ্রাম কথা বলে চলেছে, বৃষ্টির মত অঝোরে, ফেনিয়ে ওঠা সেই সব কথা বন্ধ চোখের পাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে এই গভীর রাত্রে, গলে জল

হয়ে যাওয়া সেই সব কথার কোন ছাপ তো কোথাও থাকবে না। এত কথা কি কোনদিন গুছিয়ে লিখতেও পারতাম, সুদীপ? কলমের ডগায় সব না-বলা কথা জমে ববফ হয়ে যেত। চিঠি লিখলেই বা সেই চিটি পাঠাব কোথায়? তোমার ঠিকানা তো জানিনা। আবাব কি তবে তিন্নিকেই লিখব—'ঠিকানাটা জানা?'

লাভ নেই কিছু। মনের এমন কিছু কথা আছে যা বোধহয় শুধু মনে-মনেই জানান যায়। বাইরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে.....তুমুল বৃষ্টি.......বছরের প্রথম বর্ষা। হয়তো কালও বৃষ্টি হবে পরশুও। শুধু আজকের এই রাতের মত রাত কি আর মিলবে? তুলির বৃষ্টির এই যে শেষ রাত! রাতের নৈঃশব্দকে ভেঙে অজানা পথ, পাহাড় পার হয়ে ছুটে চলেছে কালকা মেল। মাইলের পর মাইল বিছিয়ে থাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সঙ্গে তার কি এত কথা?

তবু তারই অবিশ্রাম শব্দের মধ্যে আমি মিশিয়ে দিলাম আমার কথাকে। বৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেল, হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল। আজ রাতে যদি আকাশের দিকে তাকাও সুদীপ, বিদ্যুতের মধ্যে দেখতে পাবে। শত-শত মাইলের দূরত্ব পেরিয়ে আমার সব কথা কি তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছল সুদীপ? বলো? চিঠি যদি তোমাকে দিয়েই থাকি সুদীপ, তো মনে-মনেই লিখে দিলাম। তুমিও মনে-মনেই পড়ে নিও।

হিমকন্থা

হর্ষ দত্ত

ঘাটের এই কোনাটা গঙ্গা একটু একটু করে খেয়ে ফেলেছে। কোম্পানির আমলের সরু সরু ইঁট দিয়ে বানানো সোপানগুলো ঝুলে আছে ভারি বিপজ্জনকভাবে। যে কোনও সময় হুড়মুড় করে সলিলসমাধিতে নেমে যাবে। মানিকচাঁদের ঘাট বলতে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এখানটায় কেউ ঘাট-সারাতে আসে না। সকলেরই প্রাণের ভয় আছে। একমাত্র মহেশী ভোরবেলা থেকে এই ভাঙা জায়গাটার দখল নেয়। ওর কোনও ভয়-ডর নেই। মহেশী যত রাজ্যের কাজ এখানেই সমাধা করে। নিজের ঝুপড়ির ফোকর থেকে সাধু বামনানন্দ প্রতিদিন দেখে। মহেশী এঁটো বাসনকোসন নিয়ে এলো। মেজে-ঘষে, কোমর দুলিয়ে চলে গেল। হয়তো এর কিছুক্ষণ পরেই কাদের সব রঙ-বেরঙের জামাকাপড় ঘাটে এনে ফেলে। ধপাধপ আছাড়ি-পাছাড়ি মেরে ধোয়াধুয়ি করে। তারপর চলে যায়। সারাদিন ওখানটায় মহেশী কিছু-না-কিছু করেই। ওর কাজের কোনও বিরাম নেই।

প্রদোষকালে সাধু বামনানন্দের ধ্যানের সময়। গুরুর নির্দেশ দিনে অন্তত একবার আসনে বসতে হবে। তা সেটা প্রত্যুষে হলেই ভাল হয়। তখন মন বড় পবিত্র থাকে। সূর্যের আলো তখনও গায়ে লাগে না বলে যত সব কামাদি কুসুম পাপড়ি বুজিয়ে রাখে। বামনানন্দ গুরুবাক্য স্মরণ করে, জপাৎ সিদ্ধি বলে বসে পড়ে। ঝুপড়ির অন্ধকারে ভোরের গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আসে। কোনও কোনওদিন শ্মশানযাত্রীদের স্নানের উল্লাস। রাতভর মড়া পুড়িয়ে দামাল ছোকরাগুলো গঙ্গার বুকে দাপাতে নামে। ওঃ সে কী স্নান! ধ্যানাসনে বসে বামনানন্দের খর্বুটে বেঁটে দেহটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এদিকে জপ-ধ্যানে কোনওদিনই তেমন মন বসে না। বসে থাকাই সার হয়। মনের গতি বড়ই বিচিত্র। ইষ্টনাম জপতে বসলেই যতসব আগড়ম-বাগড়ম চিন্তা মন জুটিয়ে নিয়ে আসে। বামনানন্দের ভারি আশ্চর্য লাগে! তার ওপর আছে মহেশী। ভোরের আলো ফুটলেই ধ্যানীর চোখের পাতা আপনি খুলে যায়। ঝুপড়ির ফোকর দিয়ে চোখ চলে আসে ভাঙা ঘাটের দিকে। মহেশী আর চোখ বন্ধ করতে দেয় না। কতক্ষণ এভাবে ঠায় বসে থাকে বামনানন্দ বলতে পারবে না। তারপর একসময় নিম্নচাপের ধাক্কায় বামনানন্দ উঠে পড়ে। দিনের পরদিন এইভাবে কেটে যাচ্ছে। এ জন্মে আর সাধু হওয়া হল না।

আজ সকালে বামনানন্দ একেবারেই আসনে বসতে পারেনি। কাল রাতে মহেশী আটখানা রাধাবল্লভী, একবাটি ছোলার ডাল, একগাদা ঘণ্টাপাকানো তরকারি আর বোঁদে-রসগোল্লা, ভাঙাচোরা সন্দেশ মিলিয়ে এই এতগুলো ওর ঘরে দিয়ে গেছিল। আশপাশের কোনও শ্রাদ্ধবাড়ির উচ্ছিষ্ট। এসব দেবভোগ্য খাবার-দাবার ন'মাসে-ছ'মাসে একবার-আধবার জোটে। বামনানন্দ চেটেপুটে খেয়েছে। ছোলারডাল দিয়ে রাধাবল্লভীর স্বাদই আলাদা। তখনই মহেশীকে দীর্ঘজীবনের বর দিয়েছে বামনানন্দ। এই শ্মশানতল্লাটে

এই মেয়েছেলেটাই ওকে একটু গন্যিমান্যি করে। সাধু বলে মানে। সুযোগ পেলেই সাধুসেবা করে। দু'গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বামনানন্দ শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুশকিল বাধল ভোর রাত থেকে। পেটটা দু'বার মোচড় দিয়ে উঠল। বাপের নাম-ভোলানো মোচড়। আর শুয়েথাকা সম্ভব হয়নি। ঘাটের দু'পাশে লোহার জলে আর বড় বড় পাথর ফেলে তৈরি বোল্ডারের ফাঁকে বসে তিন-তিনবার পেট খালি করে যেতে হয়েছে। ভয়ংকর দাস্ত। এবার নিয়ে চতুর্থবার। শরীর কাঁপিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ির পাপ হড়হড় করে নেমে আসছে। প্রতিবারই মনে হচ্ছে, শাস্ত্রে একেই বলেছে ভগবৎদর্শন। উবু হয়ে বসে থাকতে কী ভাল লাগছে। এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

এবার অবশ্য বামনানন্দের ভয় ধরে গেল। এমন জলের মতো পায়খানা হওয়া ঠিক নয়। গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রাণবাবাজি ল্যাটা মাছের মতো সড়াৎ করে বেরিয়ে যেতে পারে। বোল্ডারের ওপর বসে থাকতে থাকতে মৃত্যুভয় বামনানন্দকে বেশ কাবু করে দিল। এখান থেকে ঘাটের ভাঙা দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ মহেশী এখনও আসেনি। কুখাদ্যগুলো খেয়ে ও মাগীও হয়তো ঘটি ছুয়ে বসে আছে। আর নডতে চড়তে পারছে না।

লোভ বড় বিষম বস্তু। বামনানন্দ ওর বিচিত্র জীবনে অনেকবার দেখেছেলোভের ফাঁদ বড়সাংঘাতিক।একবার তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষে নেই। কাল রাতে অতগুলো না খেলেই হত। মহেশীর আক্কেলই বা কেমন! একেবারে ঢেলে দিয়ে গেল। আর কিছু না হোক, মিষ্টিগুলো অন্তত দু'তিনদিন কৌটোয় রেখে রয়ে-সয়ে খাওযা যেত। এখন কী যে হবে, গুরুই জানেন। এটা কদিনের ধাক্কা—বামনানন্দ ঠাহর করতে পারল না। লোকের চোখ এড়িয়ে আরও কতবার আসতে হবে কে জানে। ডোমেদের ছোঁড়াগুলো আবার মহাপাজি। বারবার এইভাবে বসতে দেখলে ঢিল ছুঁড়বে। কিংবা গালাগালি দিয়ে অণ্ডকোষ লক্ষ করে আধ্লাও মারতে পাবে। কিছুই বলা যায় না। ওঃ একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বসিরহাট লাইনের শিহড়ে গুরুর ডেরায় যখন বামনানন্দ ছিল, সে সময় যেমন যোগশাস্ত্র শিখেছে, সেগুলো এখন কোন কাজেই আসে না। অর্ধেক ভুলে গেছে, মরচে পড়ে গেছে অর্ধেকের গায়ে। এ তল্লাটের লোকজন ওকে সাধু বলে মানলই না। ওর মতো বেঁটে মর্কুটের যেন সাধু হতে নেই। বামনানন্দের জীবনে দুঃখ অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুঃখ ওর এই তিন ফুট সাত ইঞ্চি মাপেব শরীরটা। আগে তো বটেই, এই সন্ন্যাসীবেশ নেওয়ার পরও দেহটা জাতে উঠল না। এখনও লোকে হাসে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। পেন্নাম করা তো দূরে থাক, সাধু বলে মানতেই চায় না। গঙ্গা আর শ্মশান ঘিরে পড়ে থাকা আর পাঁচটা ভিকিরি-নিকিরির যে দশা, বামনানন্দেব অবস্থা তার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। অথচ সাধু দক্ষানন্দ মহারাজের কাছে সাধুগিরিব দীক্ষা নেওয়ার সময় বামনানন্দ ভেবেছিল, এবার কপাল ফিরবে। কতো ভেকধারী সন্নেসী শিষ্য-সাবুদ জুটিয়ে করে খাচ্ছে। ওর পূর্বাশ্রমের নাম ধরে ডেকে শুকদেব একদিন বলেছিলেন, বাবা রাখালদাস, এই বামনাকৃতি দেহই তোমাব মহা সহায় হবে। তুমি দেখে নিও ভক্তবৃন্দ তোমাকে ভগবান বিষ্ণুব সাক্ষাৎ বামনাবতার রূপেপূজা করবে। এমন দেহ ধারণ করাও পূর্বজন্মের সুকৃতি। মা শুচ—শোক কোবো না।

আমার আশীর্বাদে তোমার কোনও কিছুরই অভাব হবে না। রাজদ্বারে এবং শ্মশানে তুমি একই রকম আপ্যায়ন লাভ করবে। আজ থেকে তোমার নাম হল সাধু বামনানন্দ।

আরও খানিকটা জল শরীর থেকে পিচকিরির মতো বেরিয়ে এলো। বোল্ডারের ফাঁকফোকর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ওই জল মা গঙ্গার গায়ে গিয়ে পড়বে। বামনানন্দের মনে হল, দাঁড়িয়ে ওঠার শক্তিটুকুও আর নেই। যে-হারে জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাতে শরীর আর কত টান্‌তে পারে। শালার গুরুদেবও একচ্যামনা। ওর আশীর্বাদ একটুও ফলেনি। রাজদ্বার তো দূরের কথা, এই শ্মশানে প্রায় প্রতিদিন তাকে যে-হেনস্থা সহ্য করতে হয়, তা দেখলে মড়া মানুষের চোখেও জল আসবে। এখন এক একসময় মনে হয়, আগের জীবনই ভাল ছিল। রাখালদাস মান্নার জীবন। তখন প্রফেসর খাটুয়ার দি গ্র্যান্ড ভিলেজ সার্কাসে জোকারের খেলা দেখাত রাখালদাস। গ্রামের লোকেরাই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল, সার্কাসের দলে নাম লেখা। জোকারগিরি ছাড়া তোর দ্বারা আর কিছু হবে না। তোকে খেয়েপরে বেঁচে থাকতে হবে তো। অনেক ভেবেচিন্তে রাখালদাস প্রফেসর খাটুয়ারদলে ভিড়ে গিয়েছিল। মা-বাবা, দাদারা—কেউ আপত্তি করেননি। ওরএকটা হিল্লে হতে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। অথচ শরীরের এই বেইমানির পেছনে রাখালদাসের কোনও হাত নেই। একদিন ও নিজেই আবিষ্কার করেছিল, বয়স বাড়ছে, কিন্তু শরীর বাড়ছে না। তিন ফুট সাত ইঞ্চিতে থুপ মেরে বসে আছে। ডাক্তার-বদ্যি-ওঝা—কেউ কিছুই করতে পারেনি। দিন দিন বয়স বেড়ে গেছে। কেবল ওর বাড়-বাড়ন্ত হওয়ার ইতিহাস থমকে গেছে আচমকা।

প্রফেসর খাটুয়া ওকে মান্নাবাবু বলে ডাকতেন। লোকটা এমনিতে খুব গুণী, কিন্তু ভারি কৃপণ। দলের লোকেদের যা পরিশ্রম করাত, তার তুলনায় খাওয়া-পরা-মাইনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। প্রায়ই দলের ছেলে-মেয়েরা কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও সার্কাস পার্টিতে নাম লেখাত। রাখালদাস দল ছেড়ে দিয়েছিল ঘেন্নায়। দর্শকদের সামনে প্রতিদিন একই ধরনের বদ রসিকতা করতে করতে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তার ওপর সার্কাসের তাঁবুর জীবন রাখালদাসকে শান্তি দেয়নি। প্রায় ওর চোখের সামনে অন্য খেলোয়াড়রা আশনাই করত। গভীর রাতে মদ খেয়ে প্রফেসর খাটুয়া বেহুশ হয়ে গেলে যে যার মনের মানুষকে নিয়ে শুয়ে পড়ত তাঁবুর পর্দা ফেলে দিয়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ওর আর সুবলের তাঁবুটা। দুই জোকারের এই তাঁবুতে মেয়েগুলো ভুলেও আসত না। এক-একদিন সুবল কামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে উঠে রাখালদাসকেই টানাটানি করত।

এসব কতকাল আগের কথা। বামনানন্দ হয়ে যাওয়ার পরও রাখালদাস সেসব ভুলতে পারে না। এখানকাব কাউকে সেই সব ফেলে আসা জীবনের কাহিনী এখনও পর্যন্ত বলেনি। হয়তো এখনও মহেশীকে বলবে। মেয়েলোকটার শ্রদ্ধাভক্তি আছে। একদিন সময় করে ওকে সব বলবে। বলে একটু হালকা হবে। মহেশী নাকি বালবিধবা। তবে বিধবার মতো থানটান কখনও পরে না। গঙ্গার পাড়ে যেদিকটায় সার সার খড়ের গাদা রাখা আছে, সেখানকার একটা ঝুপড়িতে মা'কে নিয়ে থাকে। লোকে বলে মহেশী গতর খাটিয়ে ইনকাম করে। কথাটার অনেক মানে। মেয়েদের গতর খাটানোর অনেক পথ। বামনানন্দ অবশ্য খাবাপ কিছু ভাবে না। মেয়েলোকটার বড্ড

দয়ার শরীর। তবে ভীষণ মুখরা। কাউকে বেয়াৎ করে না। কেউ কিছু বললে বাপ-বাপান্ত করে মুখ খারাপ করে। শ্মশানের রেজিস্টারবাবু দু'-একদিন ওকে ধমকধামক দিয়ে বলেওছেন এমন অশ্রব্য গালিগালাজ করলে এ অঞ্চল থেকে বের কবে দেবো। ভদ্রভাবে থাকবে বলে দিচ্ছি।

মহেশী এসব বকাঝকা কান করে শোনে বলে মনে হয় না। ওরও দোষ আছে। গঙ্গায় নেমে প্রায় উদোম হয়ে চান করবে। মহেশীর বয়স কত কে জানে। বালবিধবাব বয়স বোঝা ভার। ওকে এই অবস্থায় দেখে চ্যাংড়া ছোঁড়ারা পেছনে লাগতে ছাড়ে না। আর তখনই যত বিপত্তি। বামনানন্দ ভেবে রেখেছে, একদিন ওকে সন্ধ্যেবেলার নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে বলবে, দ্যাখ মহেশী, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—অর্থাৎ গঙ্গায় নাইতে নেমে যে-নারী দেহ প্রদর্শন করে, আমি তার উপর রুষ্ট হই। তাহার সাধুসেবা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব তুই এমনটা করিসনি। অবশ্য মহেশী যদি একটু ধৈর্য ধরে শোনে। বামনানন্দ সব সময় ওর ভাল চায়। মহেশী হয়তো ওরই মতো দুঃখী।

কোনও রকমে ঢাল বেয়ে জলের ধারে গিয়ে বামনানন্দ শৌচক্রিয়াদি সারল। পারাপারের প্রথম খেয়ার মাঝিরা সবে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত-পা ধুচ্ছে। মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে, পুবের আকাশে তাকিয়ে সূর্যপ্রমাণ সেরে মুখ ফেরাতেই বামনানন্দ দেখল, একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মহেশী হাসছে। কোমরে গামছা জড়ানো। হাতে দাঁতন কাঠি।

বামনানন্দ রাগ করে চোখ নামাল। মহেশী বলল, কি গো সাধুঠাকুর, আজ যে একেবারে ভোরবেলায় জল সরতে এয়েছো। জপ-ধেয়ান করলে না! এ কী গা, তোমার চোখমুখ এমন শুকনো লাগছে কেন? অসুখ করল নাকি!

পেটের কাছটায় খামচে ধরে বামনানন্দ বিকৃত গলায় বলল, কাল রাত্রে ওসব বিষ কেন দিয়ে গেলি? ভোর রাত থেকে পেট ছেড়ে দিয়েছে। এই নিয়ে চার বার হল।

—ওমা, তাই নাকি! আহা রে! তা আমি নয় দিয়েছি, কিন্তু তুমি কোন্ আক্কেলে অতগুলো রাক্ষসের মতো গিল্‌লে! ওইটুকু পেট। খাবাব দেখলে আর নোলা ঠিক রাখতে পারে না—মরণ আর কি!...তা যা হয়েছে, বেশ হয়েছে, মাঝে মধ্যে দাস্ত হওয়া ভাল। জমানো মল বেরিয়ে যায়। মহেশী হেসে বলল।

—রাস্তা ছাড় দেখি, আমাকে উঠে যেতে দে। গুড়গুড়ে দেহটা এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে বামনানন্দ বলল।

—যাও না, এই তো এতটা জায়গা বয়েছে। আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরেআছি! মহেশী খরখর করে উঠল। তবে যাওয়ার রাস্তাটা কিন্তু ছাড়ল না। ভেতরের দাঁত দিয়ে নিমডালটাকে ভাল করে পিষে নিয়ে বলল, শুনেছ গরমেন্ট নাকি এক নতুন নিয়ম করেছে। আমি কালই কুটিঘাটায় শুনেছিলুম। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

—কী? বামনানন্দের পেটের দপদপানি মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। গরমেন্টের নিয়ম মানেই তার মতো গরিব-গুরবোদের ওপর খাঁড়ার ঘা।

কলকাতায় নাকি নিয়ম হয়ে গেছে, এবার থেকে মড়ার খাট-বিছানা সব পুড়িয়ে

ফেলতে হবে। লেপ-তোশক-বালিশ কিচ্ছু বাইরে বের করতে দেবে না। এবার এখানকার শ্মশানেও এই নিয়ম চালু হবে। মহেশী চোখ বড় বড় করে বলল।

—তাতে তোর কি? দিক না সব পুড়িয়ে।

—বা রে, তুমি তো বেশ কথা বলবে। গঙ্গার পাড়ের এই ঝুপড়িগুলোয় কি মকমলের বিছানা পাতা আছে? সব তো এই শ্মশান থেকে চেয়েচিন্তে, কিংবা দু'পাঁচ টাকায় কেনা। এবার কী হবে বলো তো! আমাদের সুখের শয্যা গরমেন্ট কেড়ে নিচ্ছে গা! তোমাকে এই শীতে একটা লেপ পাইয়ে দেবো ভেবেছিলাম। আগডোম বুদ্ধিনাথকে আমি বলেও রেখেছি। তোমার কম্বলটার যা দশা। মাগো! একেবারে শতচ্ছিন্ন!

আগডোম মানে অগ্রডোম। মানে ডোমেদের সর্দার। বামনানন্দই মহেশীকে কথাটা শিখিয়েছিল। শিহড়ের আশ্রমে থাকতে দক্ষানন্দ একটু-আধটু সংস্কৃতচর্চা করেছিলেন। শ্লোকফ্লোক যা মুখস্থ আছে, তার জোরে এখনও বামনানন্দ মহেশীর ভক্তি আদায় করতে পারছে। খবরটা খুবই দুঃখের। গরমেন্টের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এবার মড়ার পেছনে কাঠি করতে লেগেছে। বামনানন্দ শুনেছে, দেশের বহু বড়লোক মানুষ নাকি মরার আগে ডাক্তারি-বিদ্যার পড়ুয়াদের জন্যে দেহ দান করে যান। অন্ধদের জন্য চোখ লিখে দেন। তখন সেই বড় মানুষকে আর পোড়ানো হয় না। আচ্ছা, এখন যদি কেউ তাঁর বিছানাপত্তর গরিবদের জন্যে দলিল করে যান, তখন কী হবে? গরমেন্ট আর পোড়াতে পারবে। বামনানন্দ ধন্দে পড়ে গেল। কয়েক ধাপ উঠে এসে মহেশীকে জিজ্ঞেস করল, কেন পুড়িয়ে দেবে?

—সে এক মজার যুক্তি গো সাধুঠাকুর। ওই সব খাট-বিছানা নাকি রোগভোগ ছড়ায়! শোনো কথা! মড়ার আবার রোগ! কেউ মরে যাওয়া মানেই তো রোগ-রুগী দুই শেষ। তাই না। গরমেন্টের মাথায় গরুর নাদা পোরা আছে। ব্যাটাছেলে গরমেন্টের সঙ্গে একবারটি দেখা হলে, আমি এসব শুধোতাম।

—অগ্রডোম খবরটা জানে?

—জানে না আবার। ওরা তো খুব গজগজ করছিল। ওদের যে দু'পয়সা কামানোর পথ বন্ধ হয়ে গেল গো।

—বুঝলি মহেশী, মা যা করেন, তা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যে। তবে ধৈর্য ধরে থাক, দেখবি একদিন এসব নিয়মকানুন লাটে উঠে গেছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা দূর্গা নিজের মুখেই বলে গেছেন ঃ খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ...ব্যচরৎ তদা। মানে বুঝলি?

সাধুঠাকুরের মুখে সংস্কৃত আর শুদ্ধভাষা শুনলে মহেশী ভারি খুশি হয়। গদগদ ভক্তিতে ওর মাথা নুয়ে আসে। লোকটাকে তখন আর বেঁটেবামন বলে বোধ হয় না। জ্ঞানীগুণী যথার্থ সাধু বলে মনে হয়। ওরা যারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাদের ধরেধরে তখন চড় মারতে ইচ্ছে করে মহেশীর। এই পোরা জায়গাটায় আছে কি! যতসব ধান্দাবাজ, কামুক, ছ্যাঁচোড়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে এই মানুষটাই একমাত্র সাধুপুরুষ। কারোর সাতে-পাঁচে নেই। সারা দিন পুরনো অশ্বত্থ গাছটার তলায় পুজো পাঠ দিয়ে পড়ে আছে। একমাত্র এই মানুষটার চোখে কোনও কু-ইঙ্গিত ঝিলিক

মারে না। বাদবাকি সবাই খাইখাই করে ঘুরছে। ছেলে-মেয়ে হল না বলেই হোক কিংবা রোগজ্বালা নেই বলেই হোক, দু'কড়ি বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও মহেশীর শরীরের বাঁধনগুলো এখনও তেমন আল্‌গা হয়নি। চান করার সময় বুড়োহদ্দগুলো যেভাবে তাকিয়ে থাকে, তাতেই মহেশী টের পায়। দেহটা নিয়ে বাজারে নামলে বেশ কিছুদিন করে খেতে পারত। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মহেশী বলল, এই শোলোকের মানেটা কী ঠাকুর?

আকাশের দিকে হাত তুলে লুঙ্গির মতো করে পরা গেরুয়া কাপড় সামলে একটু যাত্রার ঢঙে বামনানন্দ বলল, মা দুর্গা স্বয়ং বলে গিয়েছেন, খট্টাঙ্গ, মানে শ্মশানেব খাট-বিছানা যারা গরিবদের বঞ্চিত করে পুড়িয়ে দেয়, তাদের আমি অচিরেই বধ করব—কুর্বতী ব্যচরৎ তদা। তদা অর্থাৎ কিনা তাদের—দুষ্ট লোকদের।

—যাক বাবা, তাহলে তো মিটেই গেল। মা যখন বলেছেন। কথা বলতে বলতে সাধুঠাকুরের পাশ দিয়ে ঘাটের ভাঙা অংশটার দিকে নেমে গেল মহেশী। ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, আজ সারাদিন কিছু খেয়ো না গো। রাতে সাবুর খিচুড়ি করে নিয়ে আসব।

বামনানন্দ চোখ সরু করে দেখল, কাপড় তুলে পায়ের গোছ বের করে মহেশী জলের মুখোমুখি বসছে।

বিহারের রাজমহল থেকে প্রতিবছর ওই ঢাউস নৌকোটা মানিকচাঁদের ঘাটে এসে ভেড়ে। প্রায় মাসখানেক থাকে। বর্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার মুখটায় ওটা আসে। এই সময় মা-গঙ্গা জলে টইটম্বুর। জলের তলায় থাকতে থাকতে ঘাটের সিঁড়িগুলোয় শ্যাওলা পড়ে যায়। রাজমহল থেকে নৌকোটা বস্তা বস্তা সুপুরি নিয়ে আসে। ফড়েরা ক'দিন ধরেই ঘুর ঘুর করে। পাটাতন সরিয়ে দেহাতি মাল্লারা যখন বস্তাগুলো বের করতে থাকে, তখন সে এক দেখবার জিনিস। ছোট ছোট চটের বস্তা। নৌকোর পাট থেকে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। যেন শেষ হতে চায় না। ওপাশের গলুইয়েব ওপরে এসে একজন পাঁড়ে, সফেদ ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, নিলামদারের মতো দর হাঁকে। লাল খেরোর খাতায় দাম টুকে রাখে। একসময় মাল সব খালাস হয়ে যায়। ক'দিন ঝিম মেরে শূন্য, হালকা নৌকোটা জলের ওপরে ভাসে, হাওয়ায় দোলে। তারপর ফেরার সময় জল-কাদা খাওয়ানো সবুজ-হলুদ পোক্ত বাঁশ, খড় আর নারকোল-ছোবড়ার কাতা নৌকোর গায়ে-পিঠে-পেটে বোঝাই করে মাঝি-মাল্লারা রাজমহলের দিকে ভেসে যায়।

অশ্বত্থ গাছটার তলায় বসে বামনানন্দ সারাদিন বড় নৌকোটার কাণ্ডকারখানা দেখে। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়। ক্ষুদ্র, ভগ্ন, উপেক্ষিত মানিকচাঁদের ঘাটে নৌকোটাকে মোটেই মানায় না। আশপাশের খেয়া নৌকোগুলোকে ওটার পাশে ভিখিরির মতো লাগে। রাজনৌকোটা অন্য কোনও ঘাটে গিয়ে নোঙর ফেলে না কেন?' বামনানন্দ প্রতিবারই ভাবে পাঁড়েজিকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু একথা-সেকথায় ভুলে যায়। বড নৌকোর মাল্লারা জাতে মুসলমান। সকাল-বিকেল পাটাতনের ওপর সাব দিয়ে বসে আজান দেয়। ওরা নৌকো থেকে বড় একটা নামে না। আর নামলেও বামনানন্দেব

সঙ্গে কথা বলতে ওদের বয়ে গেছে। ওর সঙ্গে এখানকার চেনা লোকজনই যেখানে ভাল করে বাক্যালাপ করে না, সেখানে দূরদেশের মাঝি-মাল্লারা তো অনেক পর, অচেনা মানুষ।

বামনানন্দ ক'দিন ধরে লক্ষ করে দেখছে, এবারের যাত্রায় সেই সৌম্যকান্তি, কপালে হরিদ্রা আর চন্দনের তিলককাটা পানখেকো পাঁড়েজি আসেনি। লোকটা মরে গেল নাকি! দিনকাল যা পড়েছে, তাতে আর আশ্চর্য কি! শ্মশানের বিছানার দিকে যেখানে গরমেন্টের নজর গেছে, সেখানে ভালমানুষের মরতে কতক্ষণ! ঘোর কলিকালের আর কিছু বাকি থাকল না। বামনানন্দ কার কাছে যেন শুনেছিল, পাঁড়েজি রোজ সন্ধ্যেবেলায় তালপুকুরের দিকে ফূর্তি লুটতে যেত। তা যাক। জলে জলে যাদের মাসের পর মাস থাকতে হয়, তাদের ওসব একটু-আধটু না করলে চলে না। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, জীবনের এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে জলবারিধি আগুন নেভাতে পারে না, বরং উস্‌কে দেয়। গুরুদেব বলতেন, বাবা রাখাল, কামাগ্নি বড় ভয়ানক জিনিস। বড় রহস্যময়। ওই আগুন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়ায় সারাজীবন জ্বলে। নিভতে চায় না। বড্ড বেয়াড়া। তা, পাঁড়েজি বেয়াড়াপনা করুক আর যাই করুক, দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল। প্রতিদিন গঙ্গার জলে চান করত। ধূপ আর নকুলদানা চড়িয়ে অশ্বত্থতলার দেবস্থানে পূজা দিয়ে যেত। যেদিন মন-মেজাজ খুব ভাল থাকত, সেদিন বামনানন্দের এনামেলের থালাটায় ঠকাস্ করে ফেলেদিয়ে যেত একটা কাঁচা টাকা। রাজনৌকো মাসখানেক থাকলে পাঁড়েজির কাছ থেকে সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলো টাকা সে পেতই। এবারে সব ভোঁ ভোঁ। নৌকো এসেছে, সুপুরিও এসেছে, কেবল পাঁড়েজি বাদ। কী দুর্দৈব। পাঁড়েজির বদলে এবারে একজন উড়ুম্বর গোছের মাঝবয়েসী লোক এসেছে। বেশ লম্বা-চওড়া। মাথার চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, কিন্তু ঠোঁটের ওপর মিশমিশে কালো গোঁফ। গালের দু'পাশে গোঁফজোড়া ছড়িয়ে আছে। লোকটা এখানে নোঙর করার পর ক'দিন ঘাটের আশপাশে একা একা ঘোরাঘুরি করল। শ্মশানের দিকটায় গিয়ে দু'দিন মড়াপোড়ানো দেখল ঠায় দাঁড়িয়ে। একদিন গলুইয়ের কিনারে পা-ঝুলিয়ে বসে অপলকে তাকিয়ে ছিল মহেশীব দিকে। মহেশী তখন সেই কাপড়-চোপড় আলগা করে চান করছিল। গত পরশু বামনানন্দ অশ্বত্থতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল পেটভর্তি ছাতু আর গুড় খেয়ে। তিন-চার ফোঁটা বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেছিল বামনানন্দের। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখেছিল, দেবস্থানের চাতালে বসে রাজমহলের লোকটা আপনমনে সিগ্রেট ফুঁকছে। বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এবারে নৌকোটা কবে এসে মানিকচাঁদের ঘাটে কাছি বাঁধল? বামনানন্দ দিনক্ষণ মনে করতে পারল না। খুব সম্ভবত যেদিন ওর পেট ছেড়ে দিয়েছিল, সেই দিন। কেন না, রাতের দিকে সাধুর খিঁচুড়ি দিতে এসে মহেশী বলেছিল, সাধুঠাকুর, আসার পথে দেখলুম মাঝগঙ্গায় লাল আলোর হেরিকেন জ্বলছে। অন্ধকারে বুঝলুম না, মনে হচ্ছে সেই গহনাটা এয়েছে।

রাজমহলের বড় নৌকোটাকে মহেশী বলে গহনা। বামনানন্দ কোথায় যেন শুনছিল, পারাপারের অতিকায় তরুণীগুলোকে বলা হয় গহনার নৌকো। মহেশী এ ভাষা কোত্থেকে জানল কে জানে। আজ সকাল থেকে তিরতিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

শীত পড়তে এখনও মাসখানেক দেরি। ঘণ্টাখানেক আগে রাধামাধবের দোকানে গরম চা খেতে গেছিল বামনানন্দ। আদার গন্ধ মাখানো ছোট্ট একভাঁড় চা খেয়ে তৃষ্ণা তো মেটেইনি বরং শীত-শীত ভাবটা গায়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে লাগছে। আর একবার চা খেতে পেলে ভাল হত। রাধামাধব লোকটা বিনে পয়সায় একদম কিচ্ছু দিতে চায় না। সাধুসন্তকে এক ভাঁড় চা খাওয়াবে, কতই বা এর দাম, তবু লোকটার স্বভাব—ফেল কড়ি মাখ তেল। কোনও মানে হয়! লোকের দেওয়া ভিক্ষের পয়সা বামনানন্দের হাত থেকে তুলে নিতে রাধামাধবের লজ্জাও করে না। অবশ্য শুধু ওকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে! বিনে পয়সায় আজকাল কেউ কিছু দিতে চায় না। সে তুমি সাধুই হও, আর অসাধু! গেরুয়া ধারণ করে একদমই সুবিধে হল না। ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে বামনানন্দ দেখল, একটা সিকি পড়ে আছে। অথচ প্রতি ভাঁড় চায়ের দাম চল্লিশ পয়সা। রাধামাধব দেবে কি? দেখাই যাক্। বাকিতেই খাবে। ও তো আর এ-তল্লাটে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। বামনানন্দ ওঁ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ বলতে বলতে উঠে পড়ল। খড়গাদাগুলো ছাড়িয়ে একটু বাঁদিকে গেলেই চায়ের দোকান। অগ্রডোম বুদ্ধিনাথ যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—এমনভাবে চা-দোকানের বাখারির বেঞ্চি থেকে উঠে এসে বলল, এসো গো সাধুবাবা, এসো। গরম গরম চায়ে পিয়ে যাও। হোই রাধামাধো, সাধুকে বঢ়িয়া চায়ে দেও।

বামনানন্দ দেখল, বেঞ্চিতে সেই রাজমহলের লোকটা বসে আছে। এতক্ষণ হয়তো বুদ্ধিনাথের সঙ্গে কথা বলছিল। ছোট ছোট পা ফেলে কাছে এসে বামনানন্দ একটু অবাক হয়ে বলল, কে খাওয়াবে? তুমি! আমার কিন্তু পয়সা নেই!

—আরে বাবা পয়সার কী দরকার আছে? লাখনবাবু তোমাকে সেবা দেবে। আরে এখানে বোসো। হাঁ, হাঁ লাখনবাবুর পাশে।

—আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও। এ মহাপাপ। বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে নেমে বামনানন্দ কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল।

বুদ্ধিনাথ ওকে খামচে ধরতে যাচ্ছিল। বামনানন্দ বিপদ বুঝে হড়কে সরে যেতেই অগ্রডোম চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়া হারামি তোকে দেখাচ্ছি। তুই কী করে এই ঘাটে থাকিস হামিও দেখে লেবো। শালা বাঁটকুল, তোর সাঁধুগিরি ছোটাচ্ছি। বেটা, মহেশী কা নাঙ্!...চলিয়ে লাখনসাব, দিওয়ানাকে লিয়ে দুসরা রাস্তা মিল জাতা হ্যায়।

খড়ের গাদার আড়ালে, প্রায় সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে বামনানন্দ দেখল রাজমহলের অতিথিবাবুটিকে নিয়ে ডোমের পা মহেশীর ঝোপড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও নিশ্চিত, পরদেশী লাখনকে ওই বুদ্ধিনাথই নাচিয়েছে। মহেশীর ওপর এখানকার প্রতিটা পুরুষের চাপা রাগ আর লালসা। মহেশী কারুর ধার ধারে না। কাউকে পাত্তা দেয় না। আবার ওর কাছে গিয়ে সুপ্রস্তাব বা কুপ্রস্তাব দেবে তেমন সাহসও কারোর নেই। বুদ্ধিনাথ এবার একটা মওকা পেয়েছে। আর ছাড়বে না। মহেশীকে নষ্ট করে দিয়ে কাম-ক্রোধের শোধ তুলবে।

সারা দিন ভেবে ভেবে বামনানন্দ কোনও কুল-কিনারা পেল না। প্রতিদিনের মতো অশ্বত্থতলায় গেল, নুড়ি-পাথরের দেবদেবীর পুজো করল ফুল-বেলপাতা দিয়ে, দুপুরে রামঅবতারের দোকান থেকে গরম গরম চাবটে ঠেকুয়া আর চাটনি কিনে

এনে খেলো ঝাল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, স্নানার্থীদের দেওয়া পেলার পয়সা গুনে তুলে রাখল—সব করল। কিন্তু মন পড়ে রইল মহেশীর ঝুপড়িতে। বিপদ তো শুধু মহেশীর একার নয়, বামনানন্দের নিজেরও। বুদ্ধিনাথ শাসিয়ে রেখেছে। কী করবে বলা মুশকিল। আজ বিকেল থেকেই হয়তো ওর পিছনে লাগতে শুরু করবে। মহেশীকে জড়িয়ে-মাড়িয়ে ওর নামে রটিয়ে দেবে নোংরা কুৎসা। আবার যে কোনও ছল-ছুতোয় ধরে ঠ্যাঙাতেও পারে। ঘাট-শ্মশানে ওদেরই তো রাজত্ব। বামনানন্দের মনে হল, গরমেন্ট ঠিক করেছে। মরা মানুষের লেপ-তোশক বেচে ওই ব্যাটারা সারা বছর ধরে কম কামায়! শুধু তুলোই বেচে পাঁচশো-ছ'শো টাকার। এ সব অবশ্য বামনানন্দের অনুমান। তবে বুদ্ধিনাথের ছেলেরা যে রকম কাপ্তেনি করে ঘুরে বেড়ায়, তাতে যে কেউ বলবে, ওদের হাতে অনেক কাঁচা পয়সা। ওরা যদি সত্যিই এখানে থাকতে না দেয়, তাহলে এখানকার পাঠ উঠিয়ে বামনানন্দ আবার শিহড়ের দিকে গুরুর আশ্রমে চলে যাবে। অবশ্য সে আশ্রম যদি এখনও থাকে। গুরু দক্ষানন্দ এতদিনে নিশ্চিত দেহ রেখেছেন। বামনানন্দ যখন শিষ্যত্ব নিয়েছিল, তখনই তাঁর অনেক বয়স। শিহড়ে যদি স্থান না হয়, কুছ পরোয়া নেই। এধার-ওধার ভেসে বেড়াবে। তখন ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। সাধু সন্ন্যাসীর যা রীতি।

মহেশীকে সকালের দিকে প্রতিদিন যেমন দেখে তেমনই দেখেছিল বামনানন্দ। ওই ভাঙা জায়গাটায়। কিন্তু তখনও এইসব দৈবী দুর্বিপাক ঘটেনি। আবার আজ সারাদিনে একবারও মেয়েলোকটা ঘাট সারতে এলো না। কোথায় গেছে কে জানে। ঠিকে ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে হয়তো দূরে কোথাও চলে গেছে। মহেশীকে সতর্ক করে দিতে পারলে খুব ভাল হতো। আজ রাত্রেই কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। গঙ্গারপশ্চিম পাড়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। একটু পরেই সব আলো মুছে যাবে। বামনানন্দের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এখন ভগবানই ভরসা।

সন্ধের মুখে হঠাৎ এক পশলা ভারী বৃষ্টি হয়ে গেল। সকালের দিকে যেটাকে শীতের আমেজ বলে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির পরে তাকেই মনে হচ্ছে মাঘের শীত। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মানুষ আর প্রকৃতি—দুজনে মিলেই আজ উল্টোপাল্টা কাজ-কারবার আরম্ভ করেছে। ঝুপড়ির ভেতর ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েও বামনানন্দ কেঁপে উঠল।

বামনানন্দের নীচু, ছোট্ট ঝুপড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে মহেশী ভয়ার্ত গলায় ডাকল, ও সাধুঠাকুর, সাধুঠাকুর।

—কে, কে? বামনানন্দ ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—আমি, মহেশী গো! আজকের রাতটা তোমার এখানেই থাকতে হবে। একটু লম্পোটা জ্বালাও দিকিনি।

ওষুধের ছিপি ফুটো করে বানানো কেরোসিন-কুপিটা জ্বালিয়ে বামনানন্দ দেখল মহেশীর চোখ-মুখে ভয়ের চিহ্ন। কিছু বুঝতে না পেরে ও জিজ্ঞেস করল, এত রাতে কোত্থেকে এলি? নিজের ঘরে না গিয়ে..।

—আর বোলো না গো ঠাকুর, ব্যান্ডেলে নাইট শোতে সিনেমা দেখতে গেছিলুম। চপলারা বললে খুব ভাল বই—বেদের মেয়ে জোছনা। তা ভালোই লাগল। কিন্তু

এদিকে ফিবে আসার আর ট্রেন পাই না। নাইনে গণ্ডগোল। শেষকালে গুঁতোগুঁতি করে লাস্ট ট্রেনে এলুম গো।...একটু জল খাবো সাধুঠাকুর। দেবে?

মহেশী জল খেলো। জলের ছিটে দিল চোখে-মুখে। তারপর একটু দম টেনে আরও নীচু স্বরে বলল, রাস্তায় আসতে আসতে দূর থেকে দেখি আমাদের ঝোপড়ির কাছে দুটো লোক দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে। অন্ধকারে বুঝতে পারলুম না। এগিয়ে আসতে শুনলুম একটা লোক বলছে, শালা রেণ্ডি মহেশী বিলকুল হাপিস হো গিয়া। লোকটা হিন্দুস্তানী। গলার স্বরটা চেনা-চেনা লাগল।

—চিনতে পেরেছিস! দম বন্ধ করে বামনানন্দ জানতে চাইল।

—না গো! তবে চেনার অত দরকার কি? বেশ বুঝতে পেরেছি, ওদের বদ মতলব আছে। থাক্ বেটারা দাঁড়িয়ে, আমি ঘুর পথে তোমার কাছে চলে এলাম। এই রাতটুকু থাকতে দাও গো। রাতের অন্ধকারে কে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে। তবে একবারটি ভোর হতে দাও, আমি তারপর দেখছি লোকগুলো কত বড় বাপের বেটা। ধরতে পারলে ওদের হাগিয়ে-মুতিয়ে খাওয়াবো...।

কথা থামিয়ে মহেশী লম্বা হাই তুলল। মুখের কাছে তুড়ি মেরে বলল, নাও ঠাকুর, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো। আজ আবার অকাল শীতে কাঁপাচ্ছে।

মহেশী দেহ পেতে দেওয়ার পর আর কয়েক বিঘৎ জায়গা অবশিষ্ট আছে। তার মতো মানুষেরও শোওয়া অসম্ভব। বামনানন্দ হঠাৎ খুক খুক করে হেসে বলল, মায়ের কি অদ্ভুত ইচ্ছে! মাগো, ইচ্ছাময়ী তারা—কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে করো অধোগামী।

তারপর ছেঁড়া কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বামনানন্দ মহেশীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, আমার আর হিমকন্থার প্রয়োজন নাই।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মহেশী জিজ্ঞেস করল, হিমকন্থা কি গো!

—ওরে, আমরা যাকে লেপ বলি, দেবভাষায় তাকে বলে হিমকন্থা। মহেশী, তোর মাথার দিব্যি, অগ্রডোমের কাছ থেকে তুই কখনও লেপ চাইবি না। আমরা জিয়ন্তে মানুষ, মড়ার লেপ কেন গায়ে দেবো? বল্!

বুকের কবোষ্ণতায় বামনানন্দকে দু'হাতে ঠেসে ধরে মহেশী বলল, ঠিক বলেছ। আমাদের ওসব লেপের দরকার নেই।

বামনানন্দ দেখল, কুপির আলোটা দপ্‌দপ করছে। যে কোনও সময় নিভে যাবে।

কমলে কামিনী

শিবতোষ ঘোষ

নিয়ন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল। আমি ওর বিয়ে থেকে আছি। নিয়ন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমরা এক কলেজে পড়াই।

গলায় মালা, গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, কোনওটাই সেরকম দামি জিনিস নয় তবু নিয়নকে বিরাট মূল্যবান দেখাচ্ছিল।

সিগারেট বের করল, দুজনে সিগারেট ধরালাম। আজ ফুলশয্যে, আমি ভাবলাম নার্ভাসনেস, মনে মনে হাসছি। জিজ্ঞেস করলাম—কী?

—শোন একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

ঝামেলা বলতে গ্রামের পলিটিক্স হতে পারে, গ্রামের কোনও অনুষ্ঠানে এখনও এসব দেখা যায়। কিংবা খাবারদাবার শর্ট পড়ল না তো? শুনেছি গাঁয়ের লোক খাওয়ান বাড়িতে একটু বেশি খায়, হিসেব বহির্ভূত।

—কি ঝামেলা হল?

বলতে দ্বিধা করছিল, বলল।

—ওরা মেয়ে বদলে বিয়ে দিয়েছে! ও মেয়ে নয়!

—কী?

আমার মনে হয় খাওয়ান চত্বরে হ্যাজাকে পাম্প দিচ্ছিল কেউ, বেশি পাম্প দিয়ে ফোলায় সেটা বাস্ট করে গেল! কিন্তু না, গ্রাম হলেও এখানে ইলেকট্রিক এসে গেছে, টুনি বালবের একটা গেট বানিয়েছে নিয়নের বউভাতে। লাল-হলুদ আলো জ্বলছে।

—কী বলছিস তুই?

—আমি সেন্ট পারসেন্ট সিওর!

আমার আর সহ্য হল না, একজন অধ্যাপক, সে যে এ ধরনের কথা বলতে পারে...বললাম—তুই বিয়ের সময় দেখিসনি, শুভদৃষ্টির সময়ও দেখিসনি? কী রে?

—আমার সন্দেহ হয়েছিল।

—এর পর বাসরঘরে আড্ডা হয়েছে, নতুন বউ গান করছে, তুই বাহবা দিয়েছিস! দেখলাম নিয়ন ঘাড় নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

নিয়ন অবিবেচক নয়, ইললজিকও নয়। হেসে বললাম—তোর বউ কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। বদলাক আর যাই করুক, আমার বেশ ভাল লেগেছে!

—যাক দেখিয়েছিল, তুই দেখিসনি, সে...

—কিন্তু, তবু তুই তাকে চিনতে পারলি না!

—চিনেছি!

—আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এ যুগে কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে এভাবে মেয়ে বদলে বিয়ে দেওয়া হয়!

—তোর মতো আমিও অবাক হয়েছিলাম, সেজন্য ভাবতে ভাবতে কখন দেখি বিয়ে হয়ে গেছে।

—অসম্ভব! পার্বতী শিক্ষিতা মেয়ে, কোনও শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে এ অসম্মান সহ্য করা সম্ভব নয়!

—এটা ভুল হয়েছে, আমার সার্টিফিকেট দেখা উচিত ছিল।

নিয়ন চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে টেনে ধরলাম।

—কী পাগলামি করছিস, আর দু'ঘণ্টা বাদে তোদের ফুলশয্যে। একটা মেয়ের স্বপ্ন-প্রিন্স নিয়ন এভাবে তুই...। সত্যি-মিথ্যে জানি না যদি ঘটেও থাকে তবু তোর এসব এখন মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। হেসে বললাম—চল্!

তাকে টেনে বউভাতের খাওয়ানশালের দিকে নিয়ে গেলাম।

কাজের বাড়িতে শোওয়ার অসুবিধে থাকবেই। কিন্তু মানুষের শোওয়ার ব্যাপারটাই সবচেয়ে প্রিয় ব্যাপার। নিয়ন জানে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে শুতে। নিচে, মেঝেয় বড় করে বিছানা পেতে দিয়েছে, ওতেই আমাকে নিয়ে চারজনকে শুতে হল। পাশে শুয়েছে ওর কাকার সম্বন্ধি। ভদ্রলোকের নাক ডাকে কিনা কে জানে। ভদ্রলোক পুলিশ ইন্সপেক্টর।

বিয়ে না করে বিয়ে বাড়িতে গেলে বেশ মন খারাপ লাগে, আমাব তো লাগে। কিন্তু আমার আজকের মন-খারাপটা যেন আরও বেশি মনে হচ্ছে।

জীবনের সবচেয়ে মধুর রাত হচ্ছে ফুলশয্যে। ওই একটাই রাত। নামটাও চমৎকার, ফুল—শয্যে, ফুলের বুকে নাক ডুবিয়ে শুয়ে থাকা!

নাঃ সনকাটা বড্ড সেকেলে, বিয়ের আগে কিছুতেই...। ভাল করে চুমুই খেতে দিতে চায় না, বলে—এতে তোমারও কষ্ট বাড়বে, আমারও কষ্ট বাড়বে।

দুজনে পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, গুড়গুড় মেঘ ডাকছে, রাঙামাটি-ধোঁয়া জল বাংলোর পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ঝরনাব মতো। আমি বলছিলাম—এই। চোখে-মুখে ভীষণ আকুলতা নিয়ে ডাকলাম। সনকা তাকাল। আমি হাতটা বাড়িযে ওর হাতটা চাপ দিচ্ছি,. একটু-একটু করে ওর শবীরটাকে টানছি আমার দিকে। পৃথিবী যেমন জ্যোৎস্নাকে টানে।

—সনকা!

কিন্তু ও বলল কোনও কারণে যদি আমাদেব বিয়েটা না হয়, তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে!

কোথাও বাজ পড়ল।

আমি হাতটা ছেড়ে দিলাম।

পুলিশ ইন্সপেক্টারের কাছে কিছুতেই ঘুম আসছিল না, আমি লড়াই করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটু পরে নিয়ন এসে ডাকল—অনু! অন্য কারও যাতে ডিসটার্ব না হয় সেজন্যে আমার ঘাড়ের কাছে নুয়ে এসে ডাকছে—অনু!

—কী হল?

—ঘুমিয়ে গেলি?

—কেন, কিছু বলবি?

—না এমনি, আজ বড্ড গবম নাকি বল তো? আয় একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। আমার ভয় হচ্ছে নিয়নের মাথা থেকে পাগলামিটা গেল, না যায়নি।

বাইরে বেরিয়ে প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গেলাম। ওর বাড়ি, ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের দেশে আমার আর এগোতে সাহস হচ্ছে না, জিজ্ঞেস করলাম—কিছু বলবি? ঘড়ি দেখলাম একটা-দশ।

কুয়োপাড়ের দিকে গেল নিয়ন। হাতে টর্চ আছে, কুয়োতলায় লাইটও ছিল, সে আর জ্বালালো না। চারদিকে কালো চাপ-চাপ, গাছগুলো কালো দৈত্যের মতো। অন্ধকারের গাছ যে এত ভয়ঙ্কর হয় আগে কখনও দেখিনি। কুয়োয় একটা শব্দ হল কব্‌, চমকে গেছি, না বোধহয় ব্যাঙ।

আমাকে বলল—বোস।

ওর সামনেই বসলাম চাতালটার ওপরে। জিজ্ঞেস করলাম—তুই শুসনি?

—শুয়েছিলাম।

—আর পার্বতী একা আছে, তুই চলে এলি!

—শোন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—কী?

—ওই যে...

—তোর মাথায় গোলমাল হল, আজকেব দিনে কেউ একথা জিজ্ঞেস করতে পারে, ছিঃ!

—পার্বতী কিন্তু অস্বীকার করছে।

আমি উত্তেজিত—কী স্বীকার করেছে?

—আমাকে অন্য মেয়ে দেখানো হয়েছিল!

—পার্বতী কিন্তু স্বীকার করেছে?

—আমাকে অন্য মেয়ে দেখানো হয়েছিল!

—অসম্ভব। পার্বতী তোকে রেগে গিয়ে বলেছে।

—না, যাকে দেখানো হয়েছিল তার নাম পার্বতী নয়, সুস্মিতা।

আমার কিন্তু উলটে পার্বতীর ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। সহজেই বলতে পারত—না না, তোমার দেখার ভুল, তখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠেছি, ফ্রেস চেহারা, তারপর মেকআপ-টাপ নিয়ে বিকেলের গোধূলি আলোয়...শুয়ে শুয়ে বুকের লোমে বিলি কাটত, তা হলেই...নাঃ মেয়েটা বোকাও আছে দেখছি, স্বীকার করতে গেল কেন? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম—দ্যাখ তোর দোষও আছে, তুই শুভদৃষ্টির সময় বেরিয়ে আসতে পারতিস!

—আমার চেয়ে সহস্রগুণ দোষ ওদের!

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নিয়ন—অনু, তুই বুঝতে চাইছিস না, তখন থেকে শুধু পার্বতীর পক্ষ নিয়ে কথা বলে যাচ্ছিস। ও একটা ইতর-ছোটলোক, না হলে এরপরেও কেউ বাসরঘরে গান গাইতে পারে! আমি এ-বিয়ে মানি না।

চলে যাচ্ছিল, আমি হাতটায় ধরে ফেলেছি।

—তা হলে পার্বতীর কী হবে? নিয়ন ভেবে দেখ, হয়তো ওর মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সবাই চাপ দিয়ে...

—এখানে পার্বতী তো কোনও ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টার আমি। আমি তাকে চিট্ করিনি, সে-ই আমাকে চিট্ করেছে।

তবু আমার পার্বতীর জন্যই দুঃখ, নিয়ন আবার তার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু পার্বতীর? ওর হয়তো এখনই সব শেষ!

জিজ্ঞেস করলাম—তা হলে তুই কী করবি?

—আপাতত শোবো কোথায় বুঝতে পারছি না। যা তুই শুয়ে পড়, অনেক রাত হল। হঠাৎ ঘুরে আমাকে বলল—তুই পারবি সনকাকে ছেড়ে পার্বতীকে বিয়ে করতে? ধর যদি...

—সনকার সঙ্গে আমার অনেকদিনের সম্পর্ক!

—সম্পর্ক মানে তো প্রেম! কারোর সারাজীবনে হয় না, কারো পাঁচ মিনিটে। ধর্ আমারও সুস্মিতার সঙ্গে, ধর তোদের মতোই গভীর...তা হলে মুক্তি পাবো তো!

নিয়ন আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল বাগানের দিকে। আমি আলোটা জ্বালালাম। বালতি থেকে জল নিয়ে নিয়ে অত রাতে অনেকক্ষণ ধরে মুখে-চোখে জল নিতে থাকি।

২

কলেজে আমার একজন সাঁওতাল ছাত্রী আছে, দেখতে কালো কুচকুচে, সুইট গলা, দুর্ধর্ষ রবীন্দ্রসংগীত গায়। বিহার থেকে এসেছে, তার বাবা খুব বড় সরকারি অফিসার।

আমি একদিন তাকে বলেছিলাম, তার নাম তপেশ্বরী হাঁসদা। তপেশ্বরী নিমতলায় দাঁড়িয়ে হাসছে, কালো আকাশে যেন বিদ্যুৎ হানছে। আমি তাকে জয়দেব বোঝাতে বোঝাতে কালো রূপের প্রচণ্ড প্রশংসা করেছিলাম, সেই থেকে তপেশ্বরী আমার ভক্ত হয়ে যায়। আমি কোট করেছিলাম : নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্, ধারয়তি কোকনাদ রূপম। হে তন্বি, তোমার নীল পদ্মের মতো নয়ন অনুরাগে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে।

আমি সহজেই, ব্যাকরণসম্মতভাবেই তপেশ্বরীর প্রেমে পড়তে পারতাম, দুর্বলও হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সনকার জন্য সম্ভব ছিল না। ওর বাড়িতেও সকলে জানে, আমার বাড়িতেও সকলে জানে। আর শুধু জানা নয়, আমরা ছাড়া কেউ বিশ্বাসই করে না যে, আমাদের কোনও দৈহিক সম্পর্ক ঘটেনি। অন্য কোনও কারণে কখনও গা বমি-বমি করলে তার মা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, কী ট্যাবলেট আছে সেগুলো তো খেতে পারিস, তোদেরকে আমরা উপদেশ দেব!

তপেশ্বরী এক রোববার দীঘা যেতে চাইল আমার সঙ্গে। আমি তাকে ইয়ার্কি করে বললাম—হ্যাঁ সমুদ্র! খুব খিলখিলিয়ে হাসল তপেশ্বরী। একটা গানও গাইল। তবু আমার দীঘা যাওয়া হল না, সনকা তো জানবে আমি তপেশ্বরীকে নিয়ে...। কীরকম যেন একটা ভয় পেলাম।

—নিয়ন, তুই আমার একটা উপকার করবি?

তপেশ্বরীকেও ডাকলাম—তপেশ্বরী শোনো!

—হঠাৎ মায়ের খুব অসুখ, চিঠি পেলাম, আমাকে বাড়ি যেতে হচ্ছে। তপেশ্বরী দীঘা বেড়াতে যাবে, তুই কাল সঙ্গে করে...হোটেল বুক করা আছে!

বাড়ি থেকে ফিরে এসে শুনলাম, নিয়ন বেরিয়েছিল কিন্তু তপেশ্বরী শেষ পর্যন্ত নাকচ করে দিয়েছে।

তপেশ্বরী যে কারণে নিয়নকে নাকচ করল, ঠিক সেই কারণেই নিয়নও নাকচ করছে পার্বতিকে। তা হলে?

যাক্‌গে পার্বতীর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, নিয়নের অধিকারে আমার অধিকার, সেই যদি ত্যাগ করে তা আমি কেন মিছিমিছি...নিয়ন আমার কলিগ্‌, বন্ধু। আমি বেশি মূল্য দেব নিয়নকে। তার সুখ আগে ভাবব।

এক এক মাসে ছুটি নিয়েছিল, বিয়ের আগে পনেরো দিন, পরের পনেরো দিন। কলেজে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে আমিই ছুটে গিয়ে দেখা করলাম।

—কী রে কখন এলি?

—সকালে।

—এভরিথিং ও-কে?

—ও-কে!

আমার ক্লাস ছিল, বললাম ক্লাস সেরে আসছি, কথা হবে।

নিয়ন হাসল।

থার্ড ইয়ার অনার্সের ক্লাস। ক্লাসের সবচেয়ে আকর্ষণ রণ আর চারুলতার প্রেম। রণ অন্ধ, চারু বোবা। একসঙ্গে থাকে না, চারুলতা ধরে ধরে নিয়ে যায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে বিয়ে হবে। মেয়েদের আলাদা বেঞ্চ, ছেলেদের আলাদা, আই বদলে ওদের দুজনকে আইম একসঙ্গে বসতে বলেছি। একজন শোনে, একজন নোট করে, রণের অদ্ভুত ভাল স্মৃতিশক্তি।

ওদের ডেকে একদিন বলেছিলাম—তোমাদের বিয়েতে আর কাউকে না ডাকো, আমাকে ডাকবে। রণ আমার চেয়ে খুব বেশি হলে দু'-এক বছরের মাত্র ছোট হবে, তবু সে পায়ে হাত দিয়ে প্রমাণ করল। রণ মাটিতে হাতড়াচ্ছে, আমার পা খুঁজে পায়নি, ওর আগ্রহ আর উচ্ছ্বাস দেখে আমি নিজেই সেদিন পা দুটো এগিয়ে দিয়েছিলাম।

রণ জিজ্ঞেস করল—স্যার আমরা সুখি হব তো?

—নিশ্চয়! তোমরা সুখি না হলে পৃথিবীতে সুখ জিনিসটা থাকা উচিত নয়!

আজ ক্লাসে এসে দেখলাম রণ আসেনি, চারু একা। জ্বরটর হল নাকি? তবে আজ তিন বছর ধরে দেখছি অ্যাবসেন্ট হলে দুজনেই অ্যাবসেন্ট।

আগে রোল কল্‌ করে নিলাম, রণের নামের কাছে এসে থমকে গেলাম। এ-পাতায় তার একটাও ফুটকি নেই, এই প্রথম পড়ছে।

চারুকে জিজ্ঞেস করলাম—রণের কী হয়েছে। ও এল না, শরীর খারাপ?

চারু বোবা মানে হাফ বোবা, হাফ কালা, যুক্তাক্ষর বেশি বলতে পারে না, সরল

অক্ষর কিছু আ-আ করে বলতে পারে, একটু জড়িয়ে যায়, একটু বেশি সময় নেয়। সেজন্য তার কথা বলা হাফ ইশারা, হাফ শব্দ।

রণের বাড়িতে কারা এসেছে সেজন্য সে আসতে পারল না।

চারু হাসল।

বাইরে থেকে দেখলে চারুর কোনও ডিফেক্ট আছে বলে মনে হবে না। চুল খোলা বা বেণী দোলানো থাকলে আমার তো বেশ লাগে।

কিন্তু আমার পড়াশোনায় মন বসছে না। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে রণ কী করবে! তারপর রণ আর চারু না থাকলে...ওদের জন্যে আমার ডিসকাস করতে হবে, ওদের বাদ দিয়ে আমি ভাবতেই পারি না।

আজকের আলোচনা ছিল একজিসটেন্সিয়ালিজম—অস্তিত্ববাদ, উঠে পড়লাম, বললাম—আজ থাক্, রণ আসুক।

সকলে বলল—ঠিক আছে স্যার।

নিমতলা দিয়ে যাচ্ছি, পেছন থেকে হঠাৎ চারু—স্যার!

বৃদ্ধ নিমগাছ। অনেক প্রেমের সাক্ষী আছে, প্রতি বছর অন্তত খান-দশেক প্রেম দেখি। কিছু করতে হয় না, তলায় একটু মন খুলে বসলেই হল। সবসময় শান্ত ছায়া, ঝিরঝিরি বাতাস বইছে, বেশ ঝাঁকড়া গাছ, সবসময়ই কোনও না কোন পাখি, এক কথায় পরিবেশ তৈরি। নিমতলায় চাতালও বাঁধানো আছে, ইচ্ছে করলে একসঙ্গে জনাকুড়ি বসে আত্ম বিনিময় করতে পারে।

কিন্তু চারু 'স্যার' ডাক আমি এতবার শুনেছি তবু চমকে গেলাম। যেন কোনও মন্দিরের ভেতরে পাথরের থালা ফেলে দিল কেউ।

হাতে ডাস্টার-চক, রোলকলের খাতা। আমার বাঘা যতীনের মতো আঁচড়ানো চুল, অথচ বাঘ নই, বড় মোলায়েম চবিত্রের লোক আমি। আমার নিজেকে-নিজে খারাপ লাগে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল চোখ, আমার সবচেয়ে ভাল ঠোঁট আর চিবুক। তবে নিয়ন আমার চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে, অনেক সুন্দর।

নাঃ ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমি তাড়া দিলাম নিজেকে। ওর চোখ-মুখ দেখে তো মনে হল পিসফুল, হাসল। বিয়ে করে বউয়ের সঙ্গে হনিমুন সেরে ফিরে এসে লোকে যেমন হাসে, নিয়ন সে-রকমই হাসছে কমনরুমে।

দিগিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী নিয়ন কেমন মধুচন্দ্রিমা কাটল?

—খুব ভাল।

—বাইরে কোথায় গেলে?

—ঘাটশিলা গেছলাম।

—সে কী, স্বর্ণখনিকে নিয়ে তাম্রখনিতে!

সকলে হো হো হেসে উঠল।

বিয়ে বাড়ি থেকে আমি পরের দিনই সকালে উঠে চলে এসেছি। পার্বতীর সঙ্গে আর দেখা করিনি। নিয়ন মোটর সাইকেল নিয়ে আমাকে বাসে তুলে দিয়ে গেল। ও সারারাত কী করছে জানি না, আমি কুয়োপাড় থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

বাসে ওঠার আগে নিয়নের একটা হাত চেপে ধরলাম, দ্যাখ, যদি পারিস তাহলে আমি ভীষণ ভীষণ খুশি হব! হৃদয়াবেগ চোখের পাতায় গুঞ্জন করে উঠতে যাচ্ছিল।

নিয়ন তা হলে পেরেছে?

চারু ডাকছে, দাঁড়ালাম।

পার্বতীর মুখটা হঠাৎ চারুর মধ্যে হেঁটে আসছে যেন, তেমনি ক্লান্ত-বিষণ্ণ। দুঃখে সমস্ত মেয়েদের চেহারাই বোধহয় এক হয়ে যায়।

—কিছু বলবে চারু?

—স্যার বাড়িতে আত্মীয়...

—হ্যাঁ আত্মীয় এসেছে সেজন্য রণ এল না।

চারুকে কোনও কষ্ট দিতে চাই না, ও একটু ধরিয়ে দিলে আমি পুরো বাক্যটা গঠন করে দিই।

—কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, স্যার!

—এ্যাঁ...

আমার নিজেরই সব গুলিয়ে যায়।

—রণের কিছু হয়নি তো?।

মাথা নাড়ল।

—না ও ভাল আছে।

—তবে?

—ওকে দেখতে লোক এসেছে।

—দেখতে?

আমি চমকে গেলাম।

—হ্যাঁ।

আমি চেচিয়ে উঠলাম—কেন?

—রণ বিয়ে করবে।

—না, এ হতে পারে না।

—তাদের মেয়ে বিয়ে করলে বণকে বাইরে নিয়ে গিয়ে চোখ অপারেশানের সমস্ত খরচ দেবে।

—তোমাকে কে বলল এসব কথা?

—রণই বলেছে স্যার, আমি ওকে নিতে গেছলাম, ও আমার হাতদুটো জড়িয়ে ...কিন্তু রণ আবার দেখতে পাবে স্যার...রণ আবার দেখতে পাবে...

৩

বাবার বন্ধুর মেয়ে সনকা, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, একসঙ্গে দুজনে একটা ট্রেনিং-এ ছিলেন। আমি যখন তাঁদেরকেই কলেজে যাচ্ছি তখন কী জানি কী খেয়ালে হঠাৎ বাবার মনে পড়ে গেল। বাবা একটা চিঠি লিখে দিলেন বন্ধুকে, যদি দরকার হয় দেখা করিস, রবীন্দ্রনগরে থাকে।

কাজের তুলনায় বাচ্চা প্রফেসর, পাশ করেই চাকরি। প্রথমে ছেলেরা মানত না, বেশ বড় বড় ছেলেমেয়ে। তারপর যখন শুনল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, তখন সকলে কুঁকড়ে গেল। মফস্বলের ছেলেরা ফার্স্ট ক্লাসকে খুব সমীহ করে।

সব শহরেই বাড়ি পাওয়া মুশকিল, এখন ছোট শহরে আরও। আমি বটতলাচককে মহামায়া হোটেলে গিয়ে উঠলাম। নীচে রান্নার গন্ধ, খাওয়াদাওয়া, চেঁচামেচি—তিন নম্বর—পাতা-ভাঁড়-লেবু, কালিয়া-হাফ তরকারি, একস্ট্রা ভাত দু' হাতা। আমার ভাল লাগত না। আমি ঘরকুনো পড়ুয়া ছেলে, বাইরে বাইরে থাকতে পারতাম না। কলিগদের কয়েকজনকে বলেছি মেস হলেও চলবে। হোটেলের গন্ধ আর দিনরাত পাত-ভাঁড় শোনা যাচ্ছে না। তাঁরা বলেওছেন, দেখছি।

ছাত্রজীবন জুড়ে মুখস্থ করার দিকে এত প্রবণতা ছিল যে তখন প্রেম করতে গেলেও বোধহয় মুখস্থ করে বসতাম। দু'একজন যে কেউ আসেনি তা নয়, আমার সদ্য বুকে লোম বেরিয়েছে, বাবার ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে কীটস পড়ছি, একটা হালকা বাতাসে একটু কাঁপন লেগে গেল লোমগুলোয়। ওইরকম আলতোভাবে ছুঁয়ে যাওয়া অদিতি, একেবারে বাচ্চাবেলায় খেলতে খেলতে ঝগড়া করে কামড়ে দিয়েছিল। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলছি—তোকে বিয়ে করব, তোকে ঠিক বিয়ে করব! তারপর বাবা সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে যান, আমারও পড়াশোনার খাতিরে প্রতিশোধ নেবার কথা আর মনে রইল না।

আর একজনের, নাম জানি না, গল্পটা মনে আছে। যাদবপুর থেকে ক্লাশ করে ফিরছি, দুপুরের দিকে, পাতলা বাস। লম্বা সিটগুলোয় বসেছি, আর ওদিকে লেডিজ সিট। মোটামুটি অপর্ণা সেনের মতো দেখতে, গলায় লকেটটা নিয়ে খেলছে। অপর্ণা সেনের কৈশোর। লকেটটা আলতো করে ঠেলে দিচ্ছে আর সেটা বুকের ওপরে পেণ্ডুলামের মতো দুলছে।

হঠাৎ নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ফেলেছে অপর্ণা। আমিও হেসে ফেলেছি।

কিন্তু দেখতে দেখতে এমন হয়ে গেল, সেও হাসে আমিও হাসি, চোখাচোখি হলেই...

গড়িয়াহাটার মোড়ে অপর্ণা নেমে যাবে, আমার কী হয়ে গেল, আমি বিদ্যুৎপিষ্ঠ লোকের শেষ ঝাঁকুনির মতো ছিটকানো হয়ে চলে এলাম জানলার ধারে, ডবল সিটের বেঞ্চটায়।

অপর্ণা বাস থেকে নেমে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু' তিনবার লকেটটা দোলাল, হাসল।

কিন্তু আমি কী করব? হাত থেকে নোটখানা পড়ে গেল, কুড়োচ্ছিলাম, বাস ছেড়ে দিল। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে অপর্ণা ছোট্ট করে হাত নেড়ে আমাকে ডেকেছিল। আমি পরের স্টপেজে নেমে দৌড়ে ফিরে এসেছিলাম, কিন্তু—বড্ড দেরি হয়ে গেছল।

ভাগ্যিস শহরে বাসাবাড়ি সুলভ ছিল না, নইলে সনকার সঙ্গেও কী কোনওদিন...

লোডশেডিং ছিল, কড়া নাড়লাম।

দুজনকে জিজ্ঞেস করেছি—রবীন্দ্রনগর, শ্রীমহাদেব রায়।

—কাকে খুঁজছেন?

বাবার ঠিকানাটা আবার দেখে নিলাম, সহদেব নয়তো।

—শ্রীযুক্ত মহাদেব রায়।

—কিন্তু উনি অসুস্থ!

— ও...আচ্ছা।

অসুস্থ লোককে তো আর বাড়ির প্রবলেম বলা যায় না।

বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে, সেই ছিল পরবর্তী কালের সনকা।

হঠাৎ আমার মনে হল, ভীষণভাবে মনে হল, আমি এরকম একজনকেই যেন খুঁজছিলাম।

যাকে খুঁজি তাকে যদি পেয়ে যাই তাহলে সেই পাওয়ার মুহূর্তটায় বড় নার্ভাস লাগে। কী করব না বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—বাবাকে কিছু বলব?

আমি চলে আসছিলাম, একটু ফিরে গেলাম।

—এই চিঠিটা ওঁকে দিয়ে দেবেন!

তারপর নাকি সবাই মিলে চারদিকে অনেক খুঁজেছে, পায়নি। পরের দিন সোজা কলেজে, সনকাই এসে পাকড়াও করল।

আমি ক্লাস থেকে ফিরছি, নিমতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাসে যাওয়ার সময় কিংবা ফেরার সময় আমি কখনও ঘাড় তুলে হাঁটি না। কোথায় ছেলে-মেয়েদের প্রেমদৃশ্য দেখে ফেলব, লজ্জায় পড়ে যাব। আমি এখনও সনকাকে যেদিন চিঠি লিখি লুকিয়ে লিখি। এক-একজন একেবারে জড়িয়ে বসে থাকে, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্তোষ বলে একটি ছেলে সে বিপিনবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিল—স্যার, আমাদের কেমন মানিয়েছে বলুন তো? বিপিনবাবু থ'। পাশকোর্সের এই সন্তোষ আর বায়ো-সায়েন্সের একটি মেয়ে নিমতলায় কোলে মাথা দেওয়া-দেওয়া হয়ে শুয়ে থাকে। এই সব নানা কারণে আমার ঘাড় নোয়ানো অভ্যেস হয়ে গেছল।

একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।—শুনুন।

আধখানা ঘাড় তুলেই চিনতে পেরেছি।

—চিনতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ!

—বাবা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে।

আমি চমকে একটু হাসলাম।

—কাল দু'মিনিটও হয়নি বেরিয়ে দেখি নেই, কোথাও খুঁজে পেলাম না। আপনি বলবেন তো দিলীপকাকুর ছেলে।

হেসে বললাম—খাতাটাতাগুলো রেখে আসছি।

সনকার মা-বাবা দুজনেই গোঁ ধরলেন—আমরা থাকতে থাকতে তুমি হোটেলে থাকবে, এ হতে পারে না।

সনকা বলল—বেশ তো ছিলেন, তা হলে চিঠি নিয়ে এলেন কেন? আমরা তো মহামায়ায় আছেন না নর্দমায় আছেন খুঁজতে যাইনি!

কথা হল, সবাই মিলে বাড়ির জন্য চেষ্টা করা হবে, পেয়ে গেলে—হ্যাঁ তখন আর আটকাবে না।

মাত্র কয়েক মাস ছিলাম, লাফিয়ে লাফিয়ে এর পর সনকার প্রেমে পড়তে লাগলাম। শুষ্ক জীবনে ফুল ফুটল।

বইপড়া ছেড়ে দিয়েছি, অর্জিত বিদ্যার জোরেই ক্লাসে নোট দিয়ে যাচ্ছি। আমার এমন ইনটিউশন বেড়ে গেছল যে, ঘরে বসে বলে দিতে পারতাম সনকা আটটা ছাব্বিশে আসবে না সাতাশে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হত একটা ফুলভর্তি ডাল। জগৎ চরাচর ভুলে আমি গন্ধে আমোদিত হতে লাগলাম।

পুজোর ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছি, সনকাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, বিজয়ার পর চলে আসব।

—তোমার কলেজ খুলবে তো ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর?

—আমিও চলে আসব, কলকাতা আর ভাল লাগে না।

আমার বাড়ির লোকেরাও বুঝে গেল আমি সনকার ব্যাপারে অন্ধ। মা সনকার হাতে আমার বেড-টি পাঠায়।

গঙ্গার ধারে বিজয়া দেখতে গিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাঞ্চনগাছটার তলায় সনকার গায়ে হাত রেখেছিলাম, কিন্তু সনকা অতি সযতনে তার গায়ের হাতটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে দেয়। তার একটাই অনুরোধ বিয়ের আগে আমি যেন কোনওরকম—

আমি খুব আহত হয়েছিলাম, সেই ছিল আমার প্রথম অন্য গায়ে হাত রাখা। তাবপব গোটা বিজয়াপর্বটাই আমার কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ লেগেছিল।

ফিরে এসে মরিয়া হয়ে আট দিনের মধ্যে একটা বাড়ি খুঁজে ফেললাম। ব্রোকার নিল পাঁচশো টাকা।

কবে যাব কিচ্ছু না, তার আগের দিন জাস্ট কাকাবাবুকে গিয়ে বলে নিলাম বাড়ি পেয়ে গেছি।

—কোথায় পেলে?

—কলেজের কাছকাছি, রাজাবাজারে।

—জলটা দেখে নেবে, এখানে মাঝে মাঝে জলের খুব ক্রাইসিস যায়। ভাড়া কত?

—সাড়ে তিনশো।

—একখানা রুম, একটা কিচেন, সাড়ে তিনশো ভাড়া।

হঠাৎ সনকা পেছন দিক থেকে আস্তে করে বলল—ওটা ফিক্সড রেখে দিলেও তো পরে কাজে লাগত!

রিক্সা এসে গেলে, বেডিংটেডিংগুলো নিয়ে যাব। কাকিমা, সনকা ওরা এসে দাঁড়িয়েছে, আমি রিক্সায় উঠে পড়েছিলাম, রিক্সাওলাকে থামিয়ে দিয়ে দেখি সনকাও উঠে বসল। তার মাকে বলল—মা, আমি গোছগাছ করে দিয়ে আসছি।

এখন মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হয়, এর পর কবে—কোথায় আসবে বলে যায়, আমি সেইমতো কখনও গির্জার ধারে, কখনও বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের সামনে..আমরা

বেড়াতেও গেছি, দীঘায় রাত কাটিয়েছি, জ্যোৎস্নায় কাঁকড়া ধরেছি, ঝাউবনে লম্বা হয়ে শুয়ে থেকেছি, সমুদ্রের ঢেউ শুনেছি, ওর মুখে গীতা দত্তর গান শুনেছি, শরীর আসক্তিতে ফেটে পড়েছি।

আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল।

সনকা আমার হাতটায় আলতো ছুঁয়ে বলে—আর দুটো বছর প্লিজ।

৪

কলেজ ছুটির পর নিয়নকে নিয়ে বেরোলাম। সে নামে মেসে থাকে, বেশির ভাগ দিন আমি টেনে নিয়ে আসি। আজ মাংস, কাল ইলিশের এক্সপেরিমেন্ট, পরশু কদমতলা বেড়াতে গিয়ে রাত হয়ে গেল।

নিয়ন আমার ঠিখ পরের বছর কলেজে এসেছে। খুব সুন্দর চেহারা আর সমবয়সী বলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। হুগলির ছেলে।

আমরা প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে বসেছি রিল্যাক্স মুডে। আমার খাটের পাশে আমার সনকার একটা ছবি, কেদার-মেলায় গিয়ে তুলেছিলাম। ওর শখ হল মেলায় একটা ছবি তুলব। খুব শস্তার ছবি, কিন্তু আমার প্রেমের এখনও পর্যন্ত একমাত্র ছবি।

হঠাৎ নিয়ন বলল—তুই একটু বোস, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।

—কোথায় যাবি?

—আসছি।

নিয়ন বেরিয়ে গেল।

এক বুড়ি মাসি আছে দু' বেলা রান্না করে দিয়ে যায়, বাসন মেজে দিয়ে যায়। মাসিকে ডেকে বললাম—নিয়ন ক মাস পর এল, ওকে ভাল কী খাওয়ানো যায় বলো তো?

—তা বউমাকে নিয়ে এলনি?

তাই তো, পার্বতীকে নিয়ে এল না। বিয়ের আগে নিয়নের সঙ্গে কথাও হয়েছিল এখন কিছুদিন আমার এখানে থাকবে, বড় রুম, মাঝখানে একটা কাঠের পার্টি নিয়ে নেব। বুড়ি মাসির মনে আছে।

—ওই যে কীসব আছে না, দ্বিরাগমন...তাই হয়তো...

ভেবেছিলাম নিয়ন আমার ওপর রাগ করবে, আমি ওর বিরুদ্ধে পার্বতীর পক্ষে গেছলাম। কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার এখনও কোনও সম্পর্ক ঘটল না আর আমি মেয়ের পক্ষ নিয়ে যাচ্ছি, বোকা আর কাকে বলে। যাই হোক, নিয়ন ব্যাপারটাকে ইজি করে নিয়েছে, আমাকে তেমন সঙ্কোচে পড়তে হয়নি।

মাসিকে বললাম—একটু মুরগিটুরগি করতে পারলে ভালো হত। কষা মাংস আর লুচি।

মাসি বলল—কোনও চিন্তা নেই, আমার মেয়ে এসেছে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বাজারে যাচ্ছি। ও ততক্ষণে মশলাপাতিগুলো করবে, ময়দা মাখবে...

—ফুলকুসুম।

মনে মনে বললাম—খালি কুসুমে রক্ষে নেই আবার ফুলকুসুম।

বললাম—আচ্ছা।

কুসুম এসে-না-এসে কাজে লেগে গেল। জল নিয়ে আসছে বাতি ভরে। এক হাতে শাড়ি ধরেছে, এক হাতে বালতি। একটু নুয়ে নুয়ে আসছে, ঠোঁট কামড়ে। সে ভাবল আমি তার শাড়ি ওঠা জায়গাটা দেখছি, সেজন্য অন্যদিকগুলো আর খেয়াল করেনি। আমারও কিন্তু সব মিলিয়ে মন্দ লাগল না, আমি টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে মনে মনে জয়দেব আওড়াতে লাগলাম—নীলমলিনাভমপি...

নিয়ন রিক্সো থেকে নামল। ব্যাগে বড় একটা হুইস্কির বোতল। বোতলটা খাটের তলায় রাখতে রাখতে বলল—আজ একটু ড্রিঙ্ক করব, তোর আপত্তি আছে?

আমরা যে খাই, তাও না, আর একেবারে যে খাই না, তাও না। বিশেষ বর্ষার দিনে, কারও বিশেষ-মন-খারাপে, হয়তো প্রচণ্ড টেনশানে ভুগছি কেউ, তবে সব মিলিয়ে বছরে এই দশ থেকে বারো দিন। যে যাই বলুক শিক্ষকদের মদ খাওয়া উচিত নয়।

নিয়নের দিকে তাকালাম—কী ব্যাপার?

—না তোর সঙ্গে এমনি গল্প করব।

হঠাৎ মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম—পার্বতী কেমন আছে?

—পার্বতীরই গল্প।

নিয়ন চেঁচিয়ে বলল—মাসি, একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস, আর বাদাম-চানাচুর কী আছে, নিয়ে এস।

মাসির বদলে কুসুম এল। নিয়ন লাফিয়ে উঠল দেখে—আরে ফুলকুসুম তুমি?

একদিন কি দু'দিন দেখেছে, ওতেই নিয়নের নামটাও মনে পড়ে গেল। স্মৃতিশক্তি বেড়েছে তো!

জিজ্ঞেস করলাম—মাসি ফেরেনি?

—হ্যাঁ।

—তোর জন্যে আজ মুরগি হচ্ছে।

—ওয়াণ্ডারফুল। মাসি তাড়াতাড়ি।

—আমি যাচ্ছি। শশা আছে কুচিয়ে দেব?

—দাও।

আমরা স্টার্ট করে দিলাম।

বাইরে অন্ধকারের ঢল নামছে চতুর্দিকে।

নিয়নকে বললাম—বল্।

—হ্যাঁ।

শুরু করল পার্বতীর গল্প। কিন্তু দু' পেগ চড়তে-না-চড়তেই চলে যাচ্ছে সুস্মিতার গল্পে। আমি খেই ধরিয়ে দিলে আবার পার্বতীতে ফিরে আসে।

—পার্বতীকে নিয়ে গেছলাম ঘাটশিলা। ঘর পাওয়া কী যাচ্ছেতাই...তিন ঘণ্টা ঘুরেছি রোদে রোদে।

জানিস একদিন হঠাৎ মনে হল সুস্মিতা। একটা দোকানের পিছনে শালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি রিক্সোয় যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম, দৌড়ে গেছি, গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা আপনার নাম সুস্মিতা?

আমি সুস্মিতার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তাকে আবার পার্বতীর প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনি।

—ঘর পেলি?

—হ্যাঁ, বহুকষ্টে একটা পেলাম। মাইরি জঘন্য ঘর, একটা জানলা, একটা ক্যালেন্ডার...

—তারপর?

—আর কী, প্রতিদিন গলা পর্যন্ত মদ গিলে এসে বিছানায় বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। পার্বতী ওঠার আগেই মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়তাম।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—এই তোর হনিমুন।

নিয়ন চেঁচিয়ে ডাকল—ফুলকুসুম, আর দু' পিস।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম নিয়ন আমার হাতটায় ধরে ফেলে।

—শোন, এর পরেরটা শোন না। পার্বতীই একদিন দুপুরে খেতে খেতে আমাকে বলল—আর ভাল লাগছে না। হাঃ হাঃ হাঃ।

আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম, ইচ্ছে হল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই।

কুসুম প্লেটে করে মাংস নিয়ে এসেছে। আমি বললাম নিয়নকে দাও।

—তুমি?

—আমি একটু ছাদে যাচ্ছি।

আমিও মাতাল হয়ে গেছি, পা টলছে। সিঁড়ি ধরে ধরে বহুকষ্টে উঠলাম। ছোট শহর অথচ বেশ এলোমেলো শহর। গোছানোর কেউ নেই, দূরে জল-ট্যাঙ্কের আলো, একটা কি বিশাল গাছের মাথার ওপরে একটা নক্ষত্র।

আমি ছাদে একেবারে মাঝখান দেখে বসলাম। বলা যায় না, মাতালরা নাকি চাঁদ ধরতে লাফিয়ে পড়ে। ভাল করে ওপরটায় তাকিয়ে নিলাম, না আকাশে কোনও চাঁদ নেই।

এখন আমার সনকার চাইতে বেশিবার মনে পড়ছিল পার্বতীর সেই ক্লান্ত মুখটা। ঘাটশিলা থেকে নিশ্চয় আরও ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। আমার নিজের কাছে কোনও ছল নেই, সনকা মাঝখানে না থাকলে আমি সত্যি পার্বতীকে...। নিয়নের যাকে এত খারাপ লাগছে, আমার কিন্তু তাকে...আরও আশ্চর্য, আমি তার জন্য রীতিমত আকুলতা অনুভব করছিলাম।

ছাদে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না, মনে হল আমার এক্ষুণি কিছুএকটা ডিসিশান নেওয়া দরকার, এক্ষুণি।

হঠাৎ লোডশেডিংও হয়ে গেল।

আমি নেমে এসে দেখি, নিয়ন আর ফুলকুসুম, অন্ধকারে পাশাপাশি বসে হাসছে।

আমি দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—মাসি, মোমবাতি জ্বালো। মোমবাতি জ্বালাতে পারছ না!

সকলে ভাবল আমি পড়ে গেছি। ছুটে এসেছে সকলে।

তারা মা-মেয়ে খাওয়া-দাওয়া করে রাত দশটার দিকে চলে গেল। বাসে চলে যাবে, মাত্র একটা স্টপেজ। আমার সামনেই ফুলকুসুমকে কাল আবার আসার জন্য বলে দিল নিয়ন—আসা চাই।

একটাই বড় খাট, মাঝখানে বালিশ, নিয়ন মেসে ফিরে যাবে ঠিক করেছিল, আমিও আপত্তি করিনি। যেতে দিল না কুসুম, না আপনি যেতে পারবেন না, তারপর মেসের সকলে হাসাহাসি করবে! নিয়নকে খাইয়ে দাইয়ে ধরে ধরে এনে শুইয়ে দিয়ে গেছে কুসুম।

হঠাৎ মাঝে কীভাবে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাথরুমে যাব, আলো জ্বেলে দেখি নিয়ন জানলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বাথরুম থেকে পিরে এলাম, জল খেলাম, তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি ডাকলাম, কী হল শুবিনে?

—হুঁ।

এসে শুলো। আমি আলো নেভালাম।

হঠাৎ আমার হাতটায় ধরে ফেলল নিয়ন।—আমার একটা উপকার করবি।

এত রাতে ওর উপকার করব!

—কী?

—পার্বতীর কাছ থেকে সুস্মিতার ঠিকানাটা এনে দিবি?

—পার্বতী কোথায়?

—ঘাটশিলা থেকে এসে একদিন ছিল, তারপর বাপের বাড়ি চলে গেছে!

থাকতে পারলাম না, বলেই ফেললাম—সনকা তোর সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছে জানিস, তোকে তার ঘেন্না হয়।

—আমার নিজেরই হচ্ছে! যার বউ বদল হয়ে যায় তাকে লোকে ঘেন্নাই করে!

—পার্বতী যাওয়ার সময় তোকে কিছু বলেনি?

—কেঁদেছিল।

—তবু তাকে তুই...

আমি রেগে আবার আলো জ্বাললাম। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলব—রাস্কেল!

—আমি দুর্গাপুরে আর কিছুতেই যেতে পারব না, প্লিজ অনু, একমাত্র তুই পার্বতীব কাছ থেকে ঠিকানাটা আনতে পারিস!

আমি ভেতরে ভেতরে চাইছিলাম পার্বতীর সঙ্গে আমার একবার দেখা হোক...তার সেই বিষণ্ণ-ক্লান্ত মুখ আমি ভুলিনি!

হঠাৎ আমার অত চড়াও রাগটা কমে এল বললাম—এখন ঘুমো! আলো নেভাচ্ছি!

৫

—রণ, কাল কী হয়েছিল?

নিমতলায় চারু-রণ।

—হ্যাঁ স্যার।

একটু জবুথুবু লাগছে। রণ এমনিতে বেশ গুছনো কথা বলে, কম বলে, হয়তো একটু বেশি সময় নিয়েও বলে, চোখে দেখার সুযোগটা তো ও পাচ্ছে না, কিন্তু বেশ ওজন থাকে ওর কথায়। বোঝা গেল কালকের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গটা ওদের কাছে বড় দুঃখজনক সেজন্য এড়াতে চাইছে।

লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস আছে, আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা ক্লাস করছ তো সব?

—হ্যাঁ স্যার।

হঠাৎ স্যার স্যার করে হাতড়ে হাতড়ে আসছে রণ।—স্যার!

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

আমাকে অবলম্বন করে হাঁটছে।

—স্যার কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না!

—কী?

—চোখ বড় না চারু বড়?

আমি থামলাম। বললাম—নিশ্চয় চারু বড়! তোমাকে কত ভালবাসে, এ-এক ঐশ্বরিক...

চারু নিমতলায় একা দাঁড়িয়ে আছে, সে বুঝেছে রণ আমাকে আলাদা করে কিছু বলতে চায়। আমার ওপর চারুর বিশ্বাস আছে, আমি এমন কথা বলব না, যা তার পক্ষে কোনও ক্ষতি হতে পারে।

আমি রণের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ঘাড় ঘুরিয়ে চারুকে ডাকলাম—রণকে এসে নিয়ে যাও! চারু এসে যখন রণের হাত ধরল তখন পৃথিবীর অনন্ত শোভার মধ্যে আরও এক শোভা দেখতে পেলাম।

কমনরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। পর পর দুটো ক্লাস অফ। নিয়নের অফ ডে, তা না হলে দুজনে সময় কেটে যায়। নিমতলায় ছায়ার দিকে আসছিলাম, এখানে এখন কারা কারা বসে আছে!

কোনও রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসব।

তপেশ্বরী দলবেঁধে মেয়েদের সঙ্গে সেভেনটিন-এ ক্লাসরুমের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ফাঁকা সময়টাকে আমার এত ভয় করল যে আমি বড় বেমানানের মতো এখান থেকেই ডেকে বসলাম—তপেশ্বরী!

গাছ দেখছি। নিমফুল ফুটেছে, অসংখ্য মৌমাছি। নিম ফল-ফুল, ইভন্ পাতা, আমার নিমগাছের সবই ভাল লাগে। আজ গোটা গাছ জুড়ে প্রেম, তলাতেও সন্তোষ আর বায়ো-সায়েন্সের লাল শাড়িপরা দুর্বার সেই মেয়েটি শুয়ে আছে।

তপেশ্বরীকে বললাম—আমার সঙ্গে একটু যাবে?

—কোথায়?

—যেখানে খুশি, একটু ঘুরব!

তপেশ্বরী আমার দিকে তাকাল। আমি মনে মনে বলছি—আমি অশুদ্ধ হইনি তপেশ্বরী, এখনও হইনি, বিশ্বাস করো!

তপেশ্বরী চটি থেকে পা বের করে আঙুলে মাটি খুঁড়ছিল, কাঁকর মাটি, মাটি উঠছে না, কিন্তু পায়ের ছাল-চামড়া উড়ে যাবে যে!

খুব আস্তে, খুব ছোট্ট করে বলল—আমাকে মাপ করবেন স্যার! বলে দিয়েই ছুট,

এক ছুটে দলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে গেল।

আমি হয়তো চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, হয়তো নিজের নাম ধরেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম! সন্তোষ আর বায়ো-সায়েন্সের মেয়ে একসঙ্গে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে—কী হল স্যার?

—ডোন্ট মাইণ্ড স্যার, আমরা এমনি বসে গল্প করছিলাম।

আমি পুরো নিমতলাটাকেই ভয় পেয়ে বেরিয়ে পালিয়ে এলাম।

একটা মেডিসিনের দোকানে এসে সনকাকে ফোন করলাম—সনকা! হ্যালো থ্রি-ফাইভ-টু?

—ইয়েস।

—আমি অনু বলছি, সনকা আছে?

—আমি সনকা বলছি!

—সনকা!

কিন্তু গলাটা অন্য রকম লাগছে!

—আমার কয়েকটা কথা আছে বলার, ভীষণ জরুরি।

—বলো!

নাঃ গলাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম!

—হ্যালো থ্রি-ফাইভ-টু?

—ইয়েস।

আমি দু' তিনবার ঝাঁকুনি দিলাম রিসিভারটায়, বিগড়ে গিয়ে রেখে দিলাম।

আমি নিশ্চিত, এ কিছুতেই সনকা হতে পারে না, এ রঙ নাম্বার, ঘটনাচক্রে নাম দুটো মিলে গেছে, যে ফোন ধরেছে সে সনকা, যে ফোন করছে সে অনু।

দুটো টাকা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এখনও প্রচুর সময়, পৃথিবীতে সময়ের দামই সবচেয়ে বেশি, অথচ কখনও কখনও এই সময়টাই মাথার ওপরে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে যত মূল্যহীন তার তত বেশি সময়। কিন্তু আমি তো আর ঢিল ছোঁড়া প্র্যাকটিশ করতে পারব না, কী করব?

একটা পাগলা গারদ আছে তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম, একটা ভাঙা পুরনো জেলখানা আছে, ওতে আর কয়েদি থাকে না কিন্তু কী জানি কেন এখন আমার কয়েদি দেখতে ইচ্ছে করছিল। কলেজ হস্টেলের সামনে তিনটে তেঁতুলগাছ, সবাই বলে ওরা নাকি একটা ফ্যামিলি, মা-বাবা মেয়ে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, সেরা সিম্বল। দেখতে দেখতে হসপিটাল রোড, হসপিটাল পেরিয়ে রেডক্রশ, জেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের বাচ্চা সেগুনগাছের চারা, আজ পাঁচ বছর ধরে দেখছি বাচ্চাই আছে, বাড়ছে না কেন? কিন্তু উঃ কিছুতেই যে এই নব্বুই মিনিট আর শেষ হচ্ছে না! আমি পথে সমস্ত সময়টা নষ্ট করে দিতে চাই! তপেশ্বরী যেন আমার ঠিক খোলা হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেছে, থেঁতলে দিয়ে, সে-সময়ই নিমতলায় আমি অ্যাঁক করে উঠেছিলাম। সন্তোষ আর বায়ো-সায়েন্সের মেয়ে চমকে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, আমি যখন কলেজ কম্পাউন্ডে ফিরে এলাম তখন কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই, ফাঁকা নিমতলার ছায়ায় একটা কুকুর শুয়ে আছে। কুকুরটার খুব খিদে, পেট ঢুকে গেছে, শুয়ে-শুয়ে হাঁপাচ্ছে। আমি শেষ দিকটায় ঘড়ি দেখতেই একদম ভুলে গেছলাম! কিংবা যতবারই দেখেছি ততবারই ভুল দেখেছি!

কী আর হবে, ভালই হয়েছে। নির্জন নিমতলা দেখে লোভ হল, বসে পড়লাম। এখন শুধু কুকুর আর আমি, আর কেউ নেই। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

আমার বাসায় ফিরতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল।

ফিরে এসে দেখলাম নিয়ন আমার ইজিচেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছে আর ফুলকুসুম তার মুখের সামনে চায়ের কাপটা ধরে আছে।

এমন অসময়ে চা! গ্রিল-ঘেরা বারান্দা, আমি দেখতে পেয়ে গেছি।

দুজনেরই কিছুটা অস্বস্তি হল। আমি ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম।

মাসি আসেনি, ফুলকুসুম রান্না করছে।

আমি পার্বতীর কাছে যাব কি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না; সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

আমাকে জিজ্ঞেস করল—চা খাবি?

—না! শোন্ কাল ছ'টার ট্রেনে আমি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—দুর্গাপুর।

নিয়ন ততটা খুশি হল না মনে হল, সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

—তোকে তপেশ্বরী ফোন করেছিল।

—ও...

আমার ফোন নেই বাড়িওয়ালার ফোন, কেউ ফোন করলে ডেকে দেয়।

—তপেশ্বরী তোকে ডেকে দিতে বলতে ওপরের বাচ্চা মেয়েটা আমাকে ডেকে দিয়েছে।

—কী বলল?

—গলা শুনেই ধরে ফেলল, কিছু বলল না!

নিয়নকে বললাম—কাল আমাদের ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দিবি বিশেষ কারণে আমাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে, হয়তো পরশু-তরশুও হয়ে যেতে পারে।

সন্ধে হতে-না হতে মদ খাওয়ার আয়োজন হতে লাগল। আজ আমিই বেশি উৎসাহী। হুইস্কির অর্ধেকটা এখনও আছে, তার মানে আজও কালকের মতো মাতাল হওয়া যায়।

তবে বুঝতে পারছি কী কারণে নিয়ন আজ ততটা খুশি নয়। ও খাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে, আমার দু' পেগ হলে ওর এক পেগ, রান্নাঘরে দু'বার উঠে গেল, চাইলেই জল পেত, কিন্তু নিজে গেল মগ নিয়ে।

আমি আমার নিজের খেয়ালে ছিলাম অত মাইন্ড করলাম না, আমি তালাদের সেই

বিখ্যাত আমার প্রিয়—তুমি সুন্দর যদি নাহি হও, গানটা গাইছিঃ

তুমি সুন্দর যদি নাহি হও
তাই বলো কী-বা যায় আসে
প্রিয়ার কি রূপ সেই জানে, সেই জানে
যে কখনও ভালবাসে।

গুড নাইট বলে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ফুলকুসুম চলে গেছে, নিয়নকে বললাম—শোয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিস!

ঘড়ির ডাকে উঠলাম। উঠে দেখি নিয়ন নেই। দেখি একটা চিঠি। নিয়ন লিখেছেঃ অনু, তোকে বলতে পারছি না, আমার জীবনে দ্রুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমি ফুলকুসুমের প্রেমে পড়ে গেলাম। আমি ফুলকুসুমকেই বিয়ে করব, সুতরাং আমার আর সুস্মিতার ঠিকানার দরকার নেই। আমরা মর্নিংওয়াক সেরে আসছি, একসঙ্গে চা খাব, কোথাও বেরোস না! নিয়ন।

নিয়ন ফুলকুসুমকে বিয়ে করবে, যে পার্বতীকে অপছন্দ করে! ফুলকুসুম কালো, ওই কাজের মেয়ে যে টাইপের হয়। বিয়ে হয়েছে স্বামী হয়তো মারধোর করে সেজন্য পালিয়ে আসে। কিন্তু নিয়ন ওকে...ও কী দেখতে পেল! ওই ধরনের একটা বিয়ে-করা মেয়েকে সাত কাণ্ড করে...তা হলে প্রোফেসর মহল, ছাত্রমহল, বন্ধুমহল কারও কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে! নিয়ন সব তুচ্ছ করে...শেষ পর্যন্ত সুস্মিতাকেও তুচ্ছ করে দিল!

কিন্তু এবার আমাকে তো কিছু-একটা করতে হয! দৌড়ে ওপরে উঠে গেলাম ফোন করতে।

—হ্যালো, থ্রি-ফাইভ-টু?

—ইয়েস!

—আমি অনু বলছি, অনু! হ্যালো...

—আমি সনকা বলছি...

নাঃ! ও সনকা নয়, কিছুতেই নয়, রঙ নাম্বার। পরিষ্কার অন্য গলা। গলার ব্যবহারটাও কীরকম অন্যরকম। আমি সনকার গলা চিনব না৷ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—না, তুমি সনকা নও, কিছুতেই নও! আবার দুদ্দাড় করে নেমে এলাম।

নিয়ন চিঠিটা টেবিলে ওয়েট পেপার চাপা দিয়ে গেছে, এমন জায়গায় রেখেছে যেন আমি উঠলেই দেখতে পাই। পেয়েও গেছি। কিন্তু অবিকল সেই ভাঁজে, সেই ওয়েট পেপার চাপা দিয়ে রেখে দিলাম।

আমি ওদের আসার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি চিঠি পাইনি—এই সাত অক্ষরের একটা মিথ্যে লাইন পার্বতীর জন্য বলা যায়।

৬

পার্বতীর বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন দুপুরের চড়া রোদ। দুর্গাপুরের রোদ খুব বিখ্যাত। আমি ননীর পুতুল ছেলে, তেতে-পুড়ে পিঙ্গল হয়ে গেছি। খুঁজতেও হল অনেক,

পার্বতীর বাবা সাধারণ স্টোব কিপাব, ভাড়া বাড়িতে থাকেন, সামনে হটং হটং একটা সবকারি টিউবওয়েল।

চলে তো এলাম, চিনতে পারবে? দু'দিনে মোট তিনবার দেখেছি, তাও আমি দেখেছি, পার্বতী ক'বার দেখেছে? না মশাই আপনাকে তো ঠিক...ও আপনি জামাইয়ের বন্ধু, মানে ছোটলোকস্য ছোটলোক ..। ভয় কবছে যদি অপমান হয়ে এই বোদে ফিবে আসতে হয়!

কাকে ডাকব, কার নাম আব জানি. শেষ পর্যন্ত পার্বতীকেই ডাকলাম। কড়া নাড়লাম। পার্বতী বেরিয়ে এল।

—কে?

কে বলেই চমকে গেছে। আপনি?

—চিনতে পেরেছেন?

ঘাড় নাড়ল, হাসল। তারপর বাপের বাড়িতে মেয়েরা যেমন খলখল করে ওঠে, জল-পাখা. .দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। আমার খুব খাবাপ লাগছে, আমি এতটা আশা করিনি।

—এত বোদে কোত্থেকে আসছেন?

—কোত্থেকে মানে? আমি তো আপনার কাছেই এসেছি।

—ও কিছু বলেছে বুঝি?

—কে ও? ও...

হা হা করে হাসলাম।

—হ্যাঁ, না মানে...

সিগারেট ধরাতে গেছলাম. ধরাতে দিল না পার্বতী টানতে লাগল—এখন আর সিগারেট খেতে হবে না, উঠুন উঠুন, আপনার তো স্নান হয়নি।

স্নান, খাওয়াদাওয়া করে এসে শুয়েছি। দেওয়ালে, ভক্তিপরায়ণা এক সাধিকার ক্যালেন্ডার, হয়তো খুব বিখ্যাত হবে আমি চিনি না। আমি শুয়ে শুয়ে পর পর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি, পার্বতীব জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে পার্বতী এল। এব মাঝে আমি জল খেয়েছি, অস্থিরভাবে পায়চারি করেছি, পার্বতীকে কী বলব বিহার্সাল দিয়েছি।

দূবে একটা গাছে অসংখ্য সাদা ফুল। কী ফুল অত সাদা হয়ে ফুটে থাকে? আমি আগে এত সাদা ফুল ফুটে থাকতে দেখিনি।

আমার সনকাব কথা মনে পড়ল, আমাব বিকোয়েস্টে সনকা নাক ফুড়িয়েছে, নাকে সুতো বাঁধা, আছে। এত বয়সে কান ফেঁড়াব? আমি হাত দুটোয় ধবে বললাম—প্লিজ! এজন্য হযতো লজ্জায এ-কদিন বেবোচ্ছে না। কিন্তু নাক শুকোলে সুতো কেটে সে যখন বেরোবে তখন আমি যদি...সনকা জানে না, মানুষ হাবায়, ফুবোয়, মানুষেব কত কী হয়।

ফুলকুসুম কিন্তু আমার ছিল. একটু অধিকাব বিস্তাব করলে নিযন আউট হয়ে যেত। আমি কল্পনাই কবতে পারিনি ওব সঙ্গে প্রেম কবা যায়! তা হলে আজ আব এত দগ্ধ বোদে দুর্গাপুরে ছুটে আসতে হত না।

এক এক সময় সনকা-পার্বতী-ফুলকুসুম সবাই এক হয়ে যায়, সবাই এক।

পার্বতী এল। আমি উঠে বসলাম। সে খাটের একটা কোণায় ঠেস দিয়ে বসল। সামনে একটা গোলাপফুল-আঁকা বালিশ। জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন? সাধারণ লৌকিক জিজ্ঞাসা। পার্বতী চুপ করে থাকে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রশ্নটা ঠিক হয়নি। তাড়াতাড়ি ওটাকে চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—শরীর কেমন?

—ভাল। আপনারা কেমন আছেন?

হেসে বললাম—আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন!

—আপনার বন্ধু?

সেই সৌন্দর্যময় ক্লান্ত মুখ, জল ভরা চোখ, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

—ভালই আছে।

– ও আপনাকে পাঠিয়েছে?

খুব গম্ভীরভাবে বললাম—কেন, আপনাকে দেখতে আসতে পাবি না?

পার্বতীও খুব গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বুকের ভেতর পর্যন্ত আওয়াজ পেলাম।

জানলার পাশে দেখলাম কয়েকটা কাচ্চাবাচ্চা, একজন বউ, সকলের ওৎসুক্যটা বুঝতে পারছিলাম।

কিন্তু না, আমি হেরে যাব বলে এত কষ্ট করে আসিনি।

বলেই ফেললাম—নিয়ন আমাকে পাঠিয়েছে, সুস্মিতার ঠিকানাটা ওর দরকার। কী করে বিশ্বাস হয়েছে আমিই একমাত্র আপনাব কাছ থেকে...

না বলে কাজ হলে আর এই নির্মম কথাটা বলতাম না। সুস্মিতার ঠিকানা নিয়নের তো আর দরকার নেই। আমি পার্বতীর মনে নিয়নকে আরও কুকুর-বেড়ালের মতো করে দিতে চাই! এতেও কাজ না হলে শেষ পর্যন্ত ফুলকুসুমের গল্পটাও বলে যাব।

সে খাটের কোণায় মিশে যাচ্ছে দেখে হাতটায় ধরে ফেললাম, বললাম—তবে আমি কিন্তু সুস্মিতার ঠিকানা নিতে আসিনি, ঠিকানা না হলেও আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই!

আমি হাসলাম।

পার্বতীও হাসল। বলল—কিন্তু আপনার বন্ধুর তো ক্ষতি হবে!

বোধহয় ঠিকানা লিখে নিয়ে আসতে উঠে গেল। দূরে ওই সাদা ফুলগুলোর সঙ্গে পার্বতীর কোথায় যেন একটা মিল আছে বলে মনে হল। আমি ফুল থেকে চোখ সরিয়ে নাগরিক ঘরবাড়ি দেখতে লাগলাম।

কিন্তু আমি সুস্মিতার ঠিকানা নিয়ে কী করব?

আমার আর অনাবশ্যক একা বসে থাকা চলে না, উঠতে যাব পার্বতীর বাবা এলেন।

মাঝারি বয়সেব চালাক মানসিকতার ভদ্রলোক। চালাক ছিলেন কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ইদানীং বেশ বোকা হয়ে গেছেন। একটা বেড়াল হঠাৎ ডেকে উঠতেও উনি চমকে গেলেন।

আমার হাত দুটোয় ধরে ফেললেন বয়স্ক ভদ্রলোক। বড় সাধ করে পার্বতী নাম রেখেছিলেন, হিমালয়-কন্যা পার্বতী, ভেতরে হাসি পেল।

—কী ঘটেছিল বলুন তো, সত্যি কি আপনারা...

—আমার দোষ বাবা, পুরো আমার দোষ পার্বতী কিছুই জানত না, পর পর তিনটে সম্বন্ধ যখন নাকচ হয়ে গেল. .যা শাস্তি হয় তোমরা আমাকে শাস্তি দাও কিন্তু এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে...

মেয়ের সারা জীবন নষ্ট করে ভদ্রলোক অনুতাপ করতে বসলেন। ভদ্রতাবশত যতখানা শোনা যায়, শুনে শুনে যখন আর পারলাম না থামিয়ে দিলাম। বললাম—নিয়নের আশা ছেড়ে দিন, ও ডিটারমাইণ্ড, আপনারা অন্য ছেলের সন্ধান করুন।

ভদ্রলোক আমার হাত দুটোয় ধরলেন। আমি তাঁর কূট-ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম, আমিও ইঙ্গিতে বোঝালাম—দেখি!

সন্ধে হল।

দুর্গাপুরের সন্ধে একটু অন্যরকম। রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে পড়ে, এখন ইনডাসট্রিয়াল টাউন। এই সব টাউনগুলো বড্ড মেকি হয়, মানুষ এখানে লাইফ পায় না। তবু কী আর করব, যাই কাছাকাছি একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু বেরিয়ে দেখি পার্বতী। নিশ্চয় তার বাবা তাকে ঠেলে-গুঁজে পাঠাচ্ছেন আমার সঙ্গে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে গেছল, পারল না। বিষণ্ণতার একমুঠো কালো ধুলো উড়ে এল মুখে, চোখ নামিয়ে নিল।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি বেরোবেন?

সত্যি বলতে কী, একা বেরোতে গায়ে যেন জ্বর নামছিল।

—এখান থেকে ব্যারেজ কত দূর হবে?

—অনেক দূর।

—যাবেন?

—বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে করে তবে যেতে হবে।

—রিক্সো নিয়ে যাওয়া যায় না?

সেখানে তো শুধু জল আছড়ে পড়ার শব্দ, আমার ভাল লাগে না!

একটা রিক্সো নিলাম, পার্বতী আমাকে গেস্ট হাউস ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা ভয়ঙ্কর নির্জন জায়গায় নিয়ে এল। চারদিকে বড় বড় গাছ, মাঝখানটা ফাঁকা। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একটা সিমেন্টের চাতালের ওপরে বসলাম। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

ইচ্ছে হল একবার, বলি—তোমাব বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তোমার মতামত থাকলে. .নিয়ন ফুলকুসুমকে বিয়ে করে যদি কলেজ করতে পারে তা হলে আমিও পারব পার্বতীকে বিয়ে করে...। কিন্তু আমার কিছু বলার আগেই পার্বতী নিজের হাঁটু দুটোয় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

—কী হল, এই!

পিঠে হাত রাখলাম। ডাকলাম—পার্বতী!

কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল—আমাকে মাপ করবেন!

—কী, কিসেব মাপ?
--ও একদিন ফিবে আসবে, ঠিক
—যদি না আসে?
--কেমন বিহ্বল হয়ে গেল।
আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—তুমি আমাকে শ্মশানে নিয়ে এলে কেন? পাবর্তী!

সকালে চা খেয়ে বেরোচ্ছি।
পার্বতীর বাবা বললেন—বাবা, আসবে।
আমি কিছু বললাম না।
—পার্বতীব সঙ্গে দেখা কবলে না?
—তাব আব দরকাব নেই।

রিক্সোতে উঠতে যাব একটা বাচ্চা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। রিক্সোতেই খুলে দেখলাম, চিঠি নয় সুস্মিতাব ঠিকানা।

দূবে সেই সাদা ফুলগাছটা দেখা যাচ্ছে। আমাব বুকে একটা চাপা কান্নাব চাকা ঘুবছে, তোলপাড় কবে ঘুবছে।

ঠিকানাটা আব দবকাব নেই তবু অনর্থক তিন-চাব বাব পড়লাম প্রায় মুখস্থ কবে ফেললাম। রিক্সোঅলা যখন জিজ্ঞেস কবল কোথায যাব, বলতে যাব বাস স্ট্যান্ড বলা হয়ে গেল আঠাশনম্বব বিধাননগব।

আমি রিক্সোব মুখটা আব ঘোবাতে পাবলাম না, ববং ঠিকানা বুক পকেটে টিপে নিয়ে, রিক্সোব বাতাসে পাছে উড়ে যায, দু' হাত দিয়ে চেপে বসে বইলাম।

মনে হতে লাগল এই ঠিকানাটা ছাড়া আমাব আব কিচ্ছু নেই, একেবাবে কিচ্ছু নেই।

বেলা-অবেলা

স্বপ্না গুপ্ত

সামান্য একটা ডায়েরিই তো বটে। নিছক একটা রং চটা ডায়েরি। সালটা অস্পষ্ট হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে—১৯৬৮। ডায়েরিটা আমি 'প্রেজেন্ট' করেছিলাম বিতানকে। বেশ মনে পড়ছে, তার দু'বছর আগে ভর্তি হয়েছিলাম অনার্স ক্লাশে। টালিগঞ্জের মজা গঙ্গার ওপারে চাঁদার গ্রামে ছিল বিতানের বাড়ি। বিধবা মা থাকতেন সম্ভবত মসলন্দপুরের কাছে ওদেব দেশের বাড়িতে। এখন আব সব ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। তবে ওর বড়মামাকে বেশ ভালো মনে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী। যশোরেব কাছে অমৃতবাজার গ্রামে আদি বাড়ি ছিল। যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। সে-সব গল্প ওনার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। আরও শুনেছি, বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের বেশ কিছু বিশ্বাসহীনতার কথা। এ সব বলতে বলতে ষাটোর্দ্ধ মানুষটা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। বৃটিশ কারাগাবে বন্দি হয়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল। ওটায় পাথর বসানো ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ণ শুনতে চাইতেন নবীন প্রজন্মের কাছে গভীর আগ্রহ নিয়ে। পাথরেব চোখটাও মনে হতো তখন যেন নড়ছে-চড়ছে। না-কি সেটা আমার মনেব ভুল, বা বিশ্বাসের। বিতান যখন পুবোপুবি বাড়ি ছেড়ে দিলো, তাবপরও বেশ কয়েকবার বড়মামার কাছে গেছি—কী এক অদৃশ্য টানে। হয়তো বিতানকে ফিবে এসেছে দেখবো মনে করেই। এ-সময় বড়মামাকে কিন্তু বিতান সম্পর্কে কোনো অনুযোগ করতে দেখিনি। ববঞ্চ বলতেন—আমবা পারিনি। তাই জায়গা ছেড়ে দিতে হযেছে। ওরা হয়তো পারবে বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসটুকুই বড় কথা। বিশ্বাসযোগ্যতা আপনিই নিজেকে মানিয়ে নেয়। এ-মানুষটাকে একদিনই আমি ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম, যেদিন উনি নিজে আমার বাড়িতে এসে এই ডায়েবিটা পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বিতানের কোনো এক বন্ধু এসে ওনাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমাকে ডায়েরিটা পৌঁছে দিতে বিতানই না-কি ' বলেছিল।

সেটা তিয়াত্তর সাল হবে বোধহয়। বিতানের কোনো খোঁজ ছিল না ওর বন্ধুর কাছে। কারণ ও সবে বাঁকুড়া জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বড়মামাও কিছু বলতে পারলেন না।

সাতাত্তর সাল পর্যন্ত পুরোনো বাড়িতেই ছিলাম। ডায়েরিটা সযত্নেই বাখা ছিল। মাঝেমধ্যে হাতে তুলে দেখতাম। তারপর নতুন সংসার—নতুন বাড়ি। জীবনেব নতুনতা তখন সবকিছুতেই। পুরাতন ঢেকে যায়। এ-বাড়িব স্টোররুমে কযেকটা পুবোনো বইয়ের ট্রাঙ্ক ছিল। পরিষ্কাব করতে বের করেছিলাম আজ সকাল সকাল। ওর মধ্যে ডায়েরিটা ছিল। চোখে পড়তেই—বিতানের বড়মামাব সেদিনের ছবিটা ভেসে ওঠে। সুঠাম দেহের মানুষটা যেন ভেতবে ভেতরে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছেন। শুধু ধাক্কা দেওয়াব অপেক্ষা। ধবা গলায় বললেন—নীলাঞ্জনা, তুমি হয়তো ওব খুব কাছেব

মানুষ ছিলে, তাই কিছু একটা অন্তত পাঠাতে ভোলেনি...। ওর মামিমাকে এ-পর্যন্ত কোনোদিন চোখের জল ফেলতে দেখিনি। কোনো কোনো অমাবস্যার রাত্রে শোবার ঘরের মাথার দিকে খোলা জানলার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ডায়েরিটা পেয়ে খুব কিছুক্ষণ কাঁদলেন। বড়মামার মন্তব্যটা আজ আবার মনে পড়ে যায়। মনটা এলোমেলো হয়ে পড়ে।

স্বামী মৃন্ময় ট্যুরে গেছে অফিসের কাজে। খোকন হোস্টেলে। অনেকটাই সময়। ডায়েরির পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখি। অনেকগুলো তারিখকে কলমের কালিতে কেটে নতুন করে বসানো। জীবনও কি তাই? কেটেকুটে সন-তারিখ কি উল্টেপাল্টে দেওয়া যায়? তাই-বা কী করে বলি! ও ডায়েরি লেখা শুরু করেছে ১-লা এপ্রিল। ও-দিনটা যে আমার জন্মদিন তাও কি ওর খেয়াল ছিল? কারণ, ও-ই তো আমায় 'এপ্রিল ফুল' বলে খ্যাপাতো। চোখটা আমার থেমে পড়েছে ১-লা এপ্রিল তারিখটার ওপর—

আমি যেদিন টালিগঞ্জের হাজামজা গঙ্গার ধারের আস্তাবলে পচা খড়ের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সাদাকালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছিলাম, সেদিন সূর্য ওঠেনি। সন্ধে না-হতেই আঁধার এসে দাঁড়িয়েছিল গুটিগুটি। পচা খড়ের রং ছিল কালচে, থেমে থাকা গঙ্গার জল ছিল পাঁক-কালো, আর আমার তো পা থেকে মাথা অবধি ওই রঙেরই প্রাধান্য। এ তো গেল বহিরঙ্গের কথা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাকিটা ধরা পড়েছিল। রাস্তার বাতি নেবা, সে-রাতে তারারা গা-ঢাকা দিয়েছিল। বুঝি-বা সাক্ষী দেওয়ার ভয়ে। আশ্চর্য, ওই হাড়-জিরজিরে ঘোড়টাকে প্রথম যখন দেখি, তখন সাদা রঙের প্রাধান্য ছিল ওর দেহজুড়ে, কিন্তু লাগাম হাতে নিতেই সে যেন তার প্রথম পদক্ষেপেই খাবলা মেরে তুলে নিলো মিশকালো খানিক রং রাতের বুক থেকে। ওর হাড়-গিলগিলে চেহারা, তাতে নিকষ কালো আবরণ, আর তার তলায় গোটানো ছিল তার পক্ষীরাজের ডানা। আঁধারের কত গুণ কালো সে আবরণ, সেটা কখনও অবিশ্যি ভাবিনি।

তারপর? তারপর হাড়ের ঠোকাঠুকি আর বাতাস চিরে দৌড়োনোর যে সুতীব্র শব্দ তা প্রতিমুহূর্তে আমায় সজাগ করে তুলছিল। শব্দগুলো ব্লটিং পেপারের মসী শোষনেব মতো নিমেষে শুষে নিচ্ছিল কালো রাতের হৃদস্পন্দন। আশ্চর্য, জানলার পাশ দিয়ে চলে গেছে অন্তহীন আঁধার পথ, সে-কথা তো কই জানা ছিল না? বড়মামিমা অর্থাৎ বিক্রমপুর পরগণার সীতাশাল গাঁয়ের বিনোদিনী বলতেন—'দিন রাইত, রাইত দিন হগল ওই ভগার খেলা—ভগার মায়া। চক্ষু বোজাইলেই, অথচ কী-বা রাইত, আর কী-বা দিন?' কিন্তু আমার তো চোখ খোলা। তবে? ছুটে চলেছে ভেঙে পড়া আস্তাবলের ঘোড়া। অন্ধকারের বুক চিরে মুহুর্মুহু ঘোড়ার অবয়ব ফুটে উঠছে। ও যেন দৈর্ঘে, প্রস্থে, উচ্চতায় ছাপিয়ে উঠেছে। তবে কি গতি তার দেহে নিয়ে এলো নতুন জীবনের স্পন্দন!

আমি এবার নিজের দিকে তাকাই। কিন্তু আশ্চর্য, দেহটা আছে, তবু মনে হয় সেটা শুধুই এক আভাস মাত্র। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে তখনি ব্যাপারটা যাচাই করার কথা ভাবি। কিন্তু পবক্ষণেই অনুভব করি—কোথায় লাগাম? আমার পোষ মানানো অহংকার 'যে আমি এই ধাবমান অশ্বকে চালনা করছি বা ওর গতিই আমার গতি' তা প্রবলভাবে ধাক্কা খায়। লাগাম-ফাগাম 'ফুঃ' ওর গতির কাছে। দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। লাগামহীন ঘোড়ার পিঠে আমি। চলেছি, সে এক আঁধাব পথ বেয়ে। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য হয়তো নেই। শুধুই গতির সুখে মাতোয়ারা? কিন্তু আমি?

জানালার ধারে বসে যুগ যুগ স্বপ্ন দেখেছি—আমি বন্দিবীর। একদিন ঠিক ভেঙেচুরে বেরিয়ে পড়বো। বড়মামিমা এক স্বপ্নবীজ পুঁতে দিয়েছিলেন খোকার স্যাঁৎস্যাতে ভিজে মন-মাটিতে। ইচ্ছে করলেই না-কি সব হয়। তবে ইচ্ছেটা হতে হবে সেই রত্নদ্বীপের অন্ধ রাজকুমারের মতো। চোখ ছিল না। ছিল না অস্ত্রশস্ত্র, প্রজা-পরিষদ, তবু সে হাঁটা ধরেছিল সব বাতি নিভে যাওয়া পথ ধরে। কত বছর সে হেঁটেছিল। আর, একদিন সতিাসত্যিই সে খুঁজে পেয়েছিল তার স্বপ্নশহর। অন্ধ হলেও রাজকুমারের তো স্বপ্ন দেখতে কোনো বাধা ছিল না।

অশ্বের লাগাম একদিন টেনে ধরলাম। ওকে বলি—আমার দিকে ফিরে চাও! কোথায় নিয়ে চলেছো? এ পথ কি রত্নদ্বীপের সেই পথ?

অশ্বের গতি শ্লথ হয়ে এলো। ওব ভাষা বুঝতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যদিও ওর ভাষা ছিল অব্যক্ত, তবু দেহজুড়ে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তিতে নিহিত ছিল ওব বক্তব্য; সে অনেক আগের কথা আমায় ফেলেই ওরা চলে গেল। আমায় চিনতে ওরা ভুল কবেছিল। ভেবেছিল নিতান্ত দুর্বল ঘোড়া। শুধুই বোঝা। ওরা জানতো না, দুর্ভিক্ষের দিনে আমি মূকসাক্ষী ছিলাম অগণিত মানুষের হাহাকার আর কান্নার। ওদের জানা ছিল না, আলোপথ ছাড়া আঁধারপথ ধরেও পৌঁছোনো যায় এক নতুন পৃথিবীতে। অচেনা পথ বলে হয়তো শঙ্কা আর শঙ্কার হাত ধরেই আসে যাবতীয় সংশয়। ওরা চলতে চায় শুধুই চেনাপথ ধরে। অশ্বের হ্রেসা কানে আসে—ও হে নতুন সওয়ার, আমি অপেক্ষায় ছিলাম; কে তুলে নেবে আমার লাগাম? কার স্পর্শ পড়বে আমার রেকাবে? তুমি সাহস করে তুলে নিয়েছো। কালক্ষেপেব সুযোগ নেই, এগিয়ে চলো। বিশ্বাসের লাগাম এখন তোমার হাতে।

অশ্বের তো ভাষাই গতি; আর আমার ভাষা কেবলই স্পর্শ। আমি দেহখানা মেলে ধরি ওর পিঠে। ওকে উৎসাহ দিতে চিবুক স্পর্শ করাই ওর চিক্কণ স্কন্ধে। জিজ্ঞেস করি—আর কতদূর? অশ্ব তার গতি বাড়িয়ে দ্যায়। গতিই হয়তো ওর একমাত্র উত্তর। দূরাগত এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। ক্রমে তা অস্পষ্টতায ভেঙে পড়ে। মায়ের কণ্ঠস্বর—খো..কা! খো..কা! আঁধার গিলে ফেলছে সে কণ্ঠস্বর। কালসাগরেব বুক

থেকে শব্দ ঢেউ উঠে এসে ভেঙে পড়ছে খান্ খান্ হয়ে। ধীরে ধীরে আমি সোজা হয়ে বসি। সরবে আবৃত্তি করি জীবনানন্দ থেকে—

"একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রেব আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে।
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রে চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়—"

বাহ্! হঠাৎ অশ্বের গতি থেমে স্তব্ধ হলো। তবে কি গন্তব্য এসে গেল? বোঝার উপায় নেই। সামনে ধোঁয়াশার যবনিকা। অশ্বই কি তবে আবৃত্তি করতে শুরু করেছে—

"তুমি তো জানো না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই; বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়; মানুষ অপরিজ্ঞাত সে-অমায়, তবুও তাদেব একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়!
আহা তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না-জেনে কোথায় চলেছি!...
(সূর্য নক্ষত্র নাবী)

ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে ডাক ছাড়ি—মামিমা, দ্যাখো আমি চলেছি রত্নদ্বীপের আঁধারপথে।

সময়ের মাপকাঠি চুলোয় গেছে। জানি না কোন্ শতাব্দী, কোন্ বছর কোন্ মাস? ঠিক মালুম হয় না পেরিয়ে এলাম কত পথ? জানি না আর কত বাকি? ঘোড়া যখন তীব্র বেগে এগিয়ে চলে, তখন উত্তব খুঁজে পাই যেন লক্ষ্যভেদী তীব চলেছে। নতুন বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে আবার গুছিয়ে বসি। টের পাচ্ছি চেনামাটির গন্ধ যেন গাঢ়তব হয়ে উঠেছে। তবে কি দেশমাতৃকা পিছু টানছে? ছেড়ে এলাম চেনা সীমানা।

আঁধারপথের দূবেই শাযিত ছিল অগুনিত গোরস্থান। সংখ্যাহীন শ্মশানের চিতা আর ছাই ঢাকা ঢিপি। মা জ্যাঠামশাই বাবা দাদা কেউই পিছু ডাকছে না, তবু স্মৃতিতে বয়ে নিয়ে চলেছি এক অনাবিল স্মৃতিগন্ধ। মাতৃভূমিব স্মৃতিগন্ধ ধরা আছে মনের ইজেলে। একদিকে শ্মশানভূমি, উড়ো ছাই, আর পাশাপাশি চাপা কান্না ভেজা গোরস্থান—অন্যদিকে মেদুর স্মৃতি-সুখ। ওই যে দূরে দ্যাখা যায় দিগন্ত জুড়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত—'আর একবার, মাত্র একবারই। দাও জিয়নবারি।'

এখন আমি হঠাৎ উপলব্ধি করতে শুরু করেছি আমার কালো ঘোড়ার গতি থেমে আসছে। আর ঠিক সেই ক্ষণেই ফুটে উঠলো লাল এক দিগন্তরেখা। কালো ঘোড়া থেমে গেল। চাঁদার গ্রামের বাড়ি থেকে অনেকবার সূর্যকে মাটির কাছাকাছি নেমে

আসতে দেখেছি। কিন্তু আজ? আজ দেখলাম সূর্যের হামাগুড়ি দিয়ে মাটির ছোঁয়া। কবরের অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে যারা, থমকে দাঁড়িয়ে তাদেব দিকে চেয়ে আছে সূর্য। সূর্যও যে কথা বলে জানলাম সেই প্রথম। লক্ষ লক্ষ ইচ্ছে আড়মোড়া ভেঙে যেন বলছে—সূর্য! আমাদের জীবনকাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে তোলো! ওদের প্রতি সহানুভূতি আমি প্রাণভরে দেখলাম। ওরা জেগে উঠেছিল সত্যিসত্যিই। সূর্য চলে যেতেই বিষাদের ঘন ছায়া নেমে এলো চারিদিকে। যাবা জেগেছিল, তারা আবার ঘুমিয়ে পড়লো। এ কিসের ইঙ্গিত! তবে কি ওদের মৃত্যু হয় না, ঘুমিয়ে থাকে যুগ যুগ ধরে শ্মশানের ছাই ঠেলে উঠে আসা কোনো অঙ্গীকাবের অপেক্ষায়!

কৃষ্ণকায় অশ্বের হ্রেসা। মাথা দুলিয়ে আবার চলতে শুরু করলো। শিগগির দৌড় শুরু করবে। এবার বেছে নিয়েছে অন্য এক নতুন পথ। এ এক কঠিন পথ—যেখানে মাটি নেই, নেই নিশানা, মাথায় অবিশ্যি আকাশের ঝোলানো চাঁদোয়া। শুধুই অশরীরী হাহাকার—তবঙ্গের আকারে ভেসে আসে। উৎকট ইচ্ছাজালে জড়িয়ে পড়ে শিথিল হয়ে আসবে হয়তো কোনো সময়ে অশ্বেব গতি। এখনকার এ দুর্বার গতি দেখে আমি বলে উঠি—সামাল, সামাল; এ গতি তো আগে ছিল না! আমারও ক্লান্তি কোথায যেন উবে গেছে। অন্ধকারেব বুক চুঁইয়ে নির্গত হয় দীর্ঘশ্বাস—আমাদের নিয়ে চলো তোমাব সাথে। এ পথে আসে না কেউ, তুমি যখন এসেছো, নিয়ে চলো। অসংখ্য অশবীবী আত্মা তোমায বলীযান করবে। আমাদের সঙ্গী করো হে নতুন পথের পথিক।

ভাবনার দুলুনি যেন অনুভব করি অচিরে—সময়ের লাগাম ছিঁড়ে ফেলেছে আমার কালো ঘোড়া। থামা বা না-থামার মালিক আমি না-কি? আমি তো সওয়ার মাত্র। ও যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকে যেতে বাধ্য। মহাকালের সেই সন্ধিক্ষণে অশরীরীদের দেওয়া ইচ্ছে লাগাম আমার হাতে। থম্‌কে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠি—উত্তিষ্ঠত! জাগো...! আমাব অশ্বের ক্ষুরে জোগাও নতুন চালিকা শক্তি। হাতের লাগাম করো আরও শক্ত। তোমরা আমায় ঋণ দাও তোমাদের প্রাণে ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছে শক্তি। হয়তো-বা ইচ্ছে বীজ। মনে পড়ে, সেই কোন্ যুগে ভগীরথের বয়ে আনা পূতবারি-স্পর্শে'প্রাণ ফিরে পেয়েছিল লক্ষ লক্ষ সাগরপুত্র। মহাকালের অশ্বের স্পর্শে এবারে বেঁচে উঠবে হাজার হাজার মৃতের ইচ্ছে—জীবন দাও। আলো দাও। শব্দ দাও। দাও আনন্দ।

বেশ কিছুক্ষণেব বিরতি। আবাব শুরু হলো ছোটা। মহাকালের ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে তুলে দিয়ে ওরা আমায় ছুটিযে নিযে চললো দিগন্ত অভিমুখে। ভাঙছে পাহাড়, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সম্রাজ্যের আকাশছোঁয়া লোহার বেষ্টনি। জানা ছিল না লোহা এত ভঙ্গুর। তবে ভাবতে থাকি—লাগাম যখন হাতে, পা যখন রেকাবে, তবে সংশয়ের কী আছে, শঙ্কার কী আছে? আরও বন্ধুর পথে হাঁটতেও কোনো বাধা নেই।

ঘোড়ার পিঠে বুক মাথা সেঁটে, দু'হাতের বেড় দিয়ে কোলের শিশুর মতোই জড়িযে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন যেন। ঘুম ভেঙে শুনছি ছুন্‌ছুন্ শব্দ। মনে পড়ে গেল—মামিমার পায়ের রুপোর ঘুঙুরের শব্দ। হেসে উঠে বলি—মামী, চললে কোথায?

—মানকচু তুইলতে সিথায় বিলধারে। মামা-ভাগিনায় গেল দেশোদ্ধারে...। বারবার মুক্তাঞ্চলের ডাক হইতাছে। কচু না-তুইল্যে দিমু কী পাতে? চাউল বাড়ন্ত কদ্দিন...। খুদ-কুঁড়ায়ও তলানি...।

ফিক্ করে হেসে বলে উঠি—ঘুঙুর পেলে কোথায়?

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো। কী আশ্চর্য! কখন হলো এ পটপরিবর্তন? পালাবদল কিসের? সাগরের ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়ছে চোখের পাতায়। আকাশ মুছে গেছে মুছে গেছে মাটি, পথ-বনানী...। আছে শুধু এক কুয়াশার চাদর। ঘোড়া চলছে কুয়াশা ফুঁড়ে। ছুন্ ছুন্...সেই আবার পুরোনো স্বর। স্বর অনুসরণ করি। এবার ঘোড়াবই পায়ে যেন নুপূরের শব্দ। একই প্রশ্ন করি কালো ঘোড়াকে—দুর্ভিক্ষের ঘোড়া, তুমি নুপূর পেলে কোথায়? কে তোমায় পরিয়ে দিলো এ নুপূর?

কালো ঘোড়া মাথা দোলায়। যেন হেঁয়ালি করছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করি। এ যেন এক কঠিন ধাঁধা। আমি উত্তর পাবার আশায় সস্নেহে ঘোড়ার পিঠে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরি। সেই স্পর্শ ভাষা হয়ে ঢুকছে ওর চেতনায়। ফুটে উঠছে অশ্বের ভাষা ছবি হয়ে চোখের তারায়—জানিস খোকা, আমার জন্মলগ্নে সূর্য আমার পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল আলোর ঘুঙুর। ছোট্ট পা-গুলি তখন শূন্যে ছুড়ি আর ডেকে উঠি—আমায় কেন বেঁধে রাখো? সওয়ার দাও, আমার যে এদিকে আর তব সয় না। আকাশ ডাকে হাত বাড়িয়ে যেন। সুদুর কোনো বনানীব ডাক শুনতে পাই যেন। শুনতে পাই ফেলে আসা কোনো জন্মের চেনা দুর্গের হাহাকার। কারা যেন আমায় আটকে রেখেছে। ওদের ভয়, আমার পায়ের তলায় ওদের যত্নে গড়া অহঙ্কারের সাম্রাজ্য যদি থেঁতলে যায়। জেগে উঠে চায় অধিকার, চায় ন্যায্যতা। তারপর একদিন কারা যেন এলো। ওরা এসেছিল ঝড় হয়ে—আমার মাথায় বেঁধে দিলো লাল শালুর ফেট্টি। পিঠ চাপড়ে বললো—অশ্বমেধের ঘোড়া। আজ শুরু যজ্ঞ। হাতে তলে নিলো লাগাম। তারপর শুধুই ছোটা আর ছোটা। সাওয়াবকে প্রশ্ন করার অধিকার থাকে না অশ্বের। সে কি প্রশ্ন করতে পারে—সওয়ার তুমি কি জানো সঠিক দিশা? পথ? লক্ষ্য? একদিন আমার সওয়ার আমায় পরিত্যক্ত এক আস্তাবলে ফেলে চলে গেল। আস্তাবলের দেওয়াল সুউচ্চ। আলো আর বাতাস মাথা কোটে দেওয়ালে। আমার দেহ জুড়ে প্রাণ জুড়ে খিদে, গতির খিদে। তৃষ্ণা নতুন পথের। ঘনিয়ে এলো দুর্ভিক্ষ। আমি দুর্ভিক্ষের ঘোড়া একটু একটু করে চলেছি ক্ষয়ের পথে। দুর্ভিক্ষের সেই কালগ্রাসী সময়ে সূর্যের দেওয়া সেই ঘুঙুর হারিয়ে গেল। আজ ঠিক কত বছর তা জানি না, কত জন্মের আগের সে সূর্য আবার এসেছিল, ফিরিয়ে দিলো হারানো নুপূর।

এখানেই লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। পাতার শেষে নীল কালিতে তারিখ লেখা—১৩-ই আগস্ট, ১৯৭১। আরও হয়তো বিতান কিছু লিখতে চেয়েছিল। সময় পায়নি, বা ইচ্ছে করেই লেখেনি। কাশীপুর-বরানগর-বেদিয়াপাড়ার খবর আমরা জেনেছি। বিতানও কি খবর পেয়েছিল, না-কি নিজেই খবরের তলায় চাপা পড়েছিল? আগে

অনেকবার ভেবেছি। আজ আবার ভাবনার দোলাচল অনুভব করি খাতাটা হাতে পেয়ে। যাক। দুপুর গড়িয়ে পড়েছে কখন যেন ওই ঢাউস ফ্ল্যাট বাড়িটার ঘাড়ে। বিশালকার লন্‌ভর্তি ছায়া বাঁকা হতে শুরু হয়েছে দূরে আরও একটু দূরে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। বৃথা চেষ্টা। 'মনোরূপা' নামের ফ্ল্যাট বাড়িটা'ই বড় বাধা। উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি কখন যেন জানলার গ্রিলের সামনে। বিতানের প্রিয় কবির নাম ছিল, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা। ওর কবিতা খুব আবৃত্তি করতে ভালোবাসতো ও। সে-সব খেয়াল পড়ছে এক-এক করে। আরও কত স্মৃতি, মেদুরতা। পাতার শেষে খানিকটা খালি জায়গা আছে আজ এ-মুহূর্তে লিখতে ইচ্ছে করে—

"আমি যদি চলে যাই
আমার জানলাটা খুলে রেখো।
কমলালেবুর রসে দিন ভোর করে শিশুরা
আমার জানলা থেকে দেখা যায়,
স্বর্ণাভ মাঠ ভবে কৃষকের ধান কাটা গান
আমার জানলা থেকে শোনা যায়।
আমি যদি আর না-থাকি
তোমরা আমার জানলাটা খোলা রেখো।"

(ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা)

অথবা, লোরকার উদ্দেশ্যে ওডের কবিতার কটা লাইন লিখে ফেলেছি কখন যেন আনমনে—

"...যদি পারতাম, রাত্তিরে, অন্তহীন একা,
কালো এক কুপি দিয়ে
স্তূপ কবে রাখতে ছায়া আর ধোঁয়া আর বিস্মরণ
যব রেলগাড়ি আর জাহাজের ওপর,
ভস্ম চিবিয়ে
আমি তবে তা-ই করতাম..."

ডায়েরির পাতাগুলো হলদে হয়ে গেছে। অক্ষরগুলোও অস্পষ্টতার দিকে। তবু 'বিতান' নামটা আজও আমার কাছে একই স্পষ্টতা দাবি করে। কারণ ওই নামটা আমারই দেওয়া। এ-মুহূর্তে ভাবতে ভালো লাগছে, আসল নামটা কেউ কোনোদিনই জানতে পাববে না। আমাব নীলা নামটাও ওরই দেওয়া। কালের অতল গহ্বরে কেমন যেন তলিয়ে গেল নাম দুটো ধীবে ধীরে—পেছনে শুধু পড়ে রইলো উপলক্ষ হিসেবে এই ডায়েরিখানা আর এক কৃষ্ণকায় অশ্বের প্রতিচ্ছবি, যা একরকম বহু অবসর মুহূর্তে আমায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। বেলা-অবেলার গুণটানা মাঝি সময়ের অপেক্ষা করে।

ভালোবাসার ডালপালা

সুদর্শন সেনশর্মা

অমলা বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই। যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

সমীর বলল, 'জয়ন্ত চলে যাবার পর চিঠি দেওয়া হল। আমি জি.পি.ও.তে গিয়ে নিজে পোস্ট করেছি। তারপর টেলিগ্রাম করা হল—'

'কতসব কাণ্ড ঘটে গেল। জয় কি অসুস্থ হয়ে পড়ল? চিঠিপত্রের যা অবস্থা, চিঠি না পেতে পারে, কিন্তু টেলিগ্রাম? সমীর, জয়ন্তর এক বন্ধু আছে না কাছাকাছি, ওর কাছে খবর নে না বাবা' মা বললেন।

সমীর ন্যাড়া মাথায় সদ্য গজানো কুচো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'সেও তো বিরাটি! বনগাঁ লোকালের যা অবস্থা মা! তাও যেতে হবে। জয়ন্তই বলেছি- জুলাই-এর শেষাশেষি আসবে। ওর কলকাতায় ট্রান্সফারের ব্যাপাবে রাইটার্স, স্টিফেন হাউস দু'জায়গাতেই তদ্বির করার আছে। নিজে না এলে কিছু হবে না, ও তো জানে। এতসব কাণ্ড ঘটে গেল। জানানোও হল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই..'

অমলা বলল, 'জয়ন্তর ওখানে কাউকে যদি ফোনে ধরা যেত। ফোন নাম্বার তো কিছু দিয়ে যায়নি। ও তো এস.টি.ডি হবে, তাই না?'

সমীরের মা বললেন, 'বাবা, আর্জেন্ট টেলিগ্রাম না হয় আর একটা কব না। বলবি আমি খুব...'

অমলা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'না মা, আর মিথ্যে টেলিগ্রাম আমি করতে দেব না। দেখলেন কি কাণ্ড হ'ল।'

জ্যোতিবালা ম্লান হেসে বললেন, 'না হয আমি মরেই যাব। মরলে মরব। মরতে তো হবেই...'

অমলা দু'হাত নাড়িয়ে বলল, 'না মা তা হবে না। তার চেযে বরং আপনি আপনার ছেলেকে ভাই-এর খোঁজে জলপাইগুড়ি পাঠান...'

সমীর অসহায়ের মত বলল, 'দেখলে মা, অমলা কেমন বলছে, আমার এদ্দিন কামাই হয়ে গেল, আমি এখন কি করে যাই..'

জ্যোতিবালা বললেন, 'তুই বিরাটিতে একটা খোঁজ নে না তবে। জয়ের চুপচাপ হয়ে যাওয়াটাই কেমন লাগছে! ওর তো আসাব কথা ছিল এমনিতেই...তাব ওপর...বৌমা দেখতো কিসের শব্দ? কলিং বেল বাজছে না? দেখতো কে এল...'

অমলা পর্দা তুলে জানলা দিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে বলল, 'না মা কেউ না। পারুলের ভাই দিব্যর সাইকেলের ক্রিং। কলিং বেল নয়।' অমলার দিকে সমীর তাকাল। অমলা কি কিছু ভাবছে?

প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেছে জয়ন্তর জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় ফিরতে পারছে না! ওয়াটার ওয়ার্কস, ডিপ টিউবয়েল-এর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিযার। ট্রান্সফাবের

তদ্বিবেব জন্য কলকাতায় ছোটাছুটি দবকাব। খালি নাকি জয়ন্তর প্রোপোজালেব ফাইল হারিয়ে যায়। এপ্রিলের শেষেব দিকে স্টিফেন হাউসে সমীরই গেছিল, ওর আর এক বন্ধুর কাছে, সে বলল, 'জয়ন্তকে একবাব আসতে বলুন। মনে হয় এবার ট্রান্সফাবের প্রোপোজালটা ও কে কবিয়ে নেওয়া যাবে, একদম খাস কলকাতায় না হলেও কাছাকাছি ওর হয়ে যাওয়া উচিত। আপনি জয়ন্তকে একবার তাড়াতাড়ি দেখা কবতে বলুন। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। একটা টেলিগ্রাম কবে দিন না, কেউ অসুস্থ বলে।'

টেলিগ্রাম অফিস থেকে তাব ঠিক পরদিন সমীব আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে, 'জয়ন্ত কাম শার্প। ফাদার হজ ইল'। জয়ন্ত টেলিগ্রামটা পরদিন বিকেলেই পেয়ে যায়। তার পবদিন রকেটে কলকাতা পালিয়ে আসে স্টিফেন হাউসে যায়। রাইটার্সে যায়। পারুলের ভাই এব সঙ্গে একদিন ডায়মন্ডহারবারও ঘুরে আসে। পারুলেব সঙ্গেও একদিন অফিসে দেখা করে-- (অমলাব খবর যদি সত্যি হয় অবশ্য)।

পাঁচদিন ছুটি নিয়ে জয়ন্ত এসেছিল। অমলা একদিন বলল, চল জয়ন্ত, আমরা সবাই মিলে একদিন ঘুরে আসি।' তারপব জয়ন্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে অমলা আস্তে করে বলল, 'পারুলকে বলব তো...?'

জয়ন্ত বলল, 'কী যে বলে না বৌদি। পারুলেব বয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে যেতে...।'

'তুমি নির্ঘাৎ কিছু গণ্ডগোল ।'

'ওদেব বাড়িব অবস্থা তো তুমি জানই।'

'বাড়ি ধুয়ে জল খাবে? আচ্ছা জয়ন্ত, অফিসে তোমায় কেউ বিয়ের জন্য কিছু বলে না। ধর কলিগরা..'

'সবাই তো জানে আমি বিবাহিত।'

অমলা চোখ মটকে বলে, 'পারুলও তাই জানে?'

বাবা বললেন, 'আমি কিন্তু বেশীদিন নেই। কলকাতকায় এসে, যাকে খুশী...'

অমলা বলল, 'যাকে খুশী মানে বাবা? ওর তো ঠিকই আছে...আপনি জানেন না? না আপনার...'

বাবাও মাথা নাড়িয়ে বলেন, 'না, না আমার আপত্তি কিসের!'

অমলা জয়ন্তর দু-কাঁধ আঁকড়ে বলে, 'বেশি দেবি কর না..পারুল কিন্তু...

জয়ন্ত হাসল, 'অসুখের ডিপো একটা।'

অমলা বড় ডাক্তাবেব মত আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি বলছি বিয়েব পর সব অসুখ সেরে যাবে...'

সবাই হেসে উঠেছিল।

বাবা-ই জয়ন্তকে দার্জিলিং মেলে তুলে দিয়ে এলেন। পবদিন সকালে বাবার একটু পেট ব্যথা হ'ল। সামান্য। সমীব অফিস গেল। অমলা, 'বাবা এমন কেমন আছেন?' বলে, নিউ মার্কেট এবং পারুলেব অফিস কর্পোরেশন-এ একবাব ঢুঁ মেরে এল। পারুল চেয়ারে ছিল না।

বিকেলে বাবা বমি কবলেন। পেটে সাংঘাতিক ব্যথা। অফিস থেকে ফোন পেয়ে

ছুটে আসতে সমীব দেখল বাড়ির গেটে ভিড়। বাবা দু'বার অনেকটা টাটকা রক্ত বমি করে তুললেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হ'বার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব শেষ। কষ্টের মধ্যে শুধু বাবার ব্লাডপ্রেসার একটু বেশী ছিল। সেজন্য চিকিৎসা তো চলছিলই...

তারপর কাজ, শ্রাদ্ধ এসব মিটে সব স্বাভাবিক হ'তে আরও পনেরো দিন চলে গেল। সমীর চিঠি দিয়েছে, পারুল নিজেও ক্যুরিয়ারে চিঠি পাঠিয়েছে। সমীর টেলিগ্রাম করেছে—জয়স্ত নট নড়নচড়ন তাও।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

শ্রাদ্ধের দিন সব পাট চুকে গেলে পারুলের বাবা নিত্যানন্দবাবু সমীরের পিঠে হাত রেখে বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। জয়ন্ত কেন এল না, খবর কেন পেল না, এসব নানা বিষয়ে তাদের কথা হ'ল। অমলা বলল, 'কাকাবাবু পারুল এল না কেন?' নিত্যানন্দবাবু একটু বিষণ্ণ মুখে খানিকক্ষণ কথা হারিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে অমলার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বড় কষ্টে যেন বলে ওঠেন 'পারুলকে নিয়ে আসার দায়িত্ব তো মা এখন তোমার। তুমি তো জানো ওদের সম্পর্ক বহুদিনের।' নিত্যানন্দবাবু এরপর চলে গেলেন। পারুল একবারও আসেনি।

দুই

বনগাঁ লোকালে বসার জায়গা পায়নি সমীর যথাবীতি। তাকে ঠেলে সবাই উঠে গেল। ধুন্ধুমার কাণ্ড। লোক নামার আগেই ঠেলতে ঠেলতে, ধাক্কাতে ধাক্কাতে সব সীট দখল করছে। অফিস থেকে একটু আগে বেবিয়ে সোজা শেয়ালদা চলে এসেছে সমীর। এসে বুঝল আরও বেশ খানিকটা আগে বেরিযে এলে হয়তো অফিস ফেরৎ ভিড়টা এড়াতে পারত সে। ট্রেনে উঠেই সমীরের মন খারাপ হয়ে গেল। অল্পবয়সী, এমনকী মাঝবয়সী লোকগুলো এমন ভাষায় কথা বলে। জানলার দিকে সীট দখল করা চারটি কুড়ি বাইশ কি পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দুই ভদ্রমহিলার সঙ্গী এক ভদ্রলোকের একপ্রস্থ ঝগড়া হল। তারা ট্রেন থেকে এখনও নামতে পারেননি। ওই চারজন তাদের ধাক্কা দিয়ে নাকি জায়গা দখল করেছে।

'একি অসভ্যতা আপনাদের! সঙ্গে ভদ্রমহিলা রয়েছেন।'

'একদম বাজে কথা বলবেন না। ট্রেনে কি আজ প্রথম চড়লেন।'

'প্রথম চড়তে যাব কেন, তবে এরকম অসভ্যতা আগে দেখিনি।'

'অত খুঁতখুঁতে হলে এরোপ্লেনে চাপবেন, বনগাঁ লোকালে নয়। ননীর শবীব আপনাদের।'

'স্কাউনড্রেল, ভালভাবে কথা বলুন।'

তখন চারজনেই মারমুখী হয়ে ওঠে। সঙ্গে মেয়ে থাকায় বোনাস কিন্তু এবাব পেয়ে যাবেন। এখুনি যদি না নামেন—নামিয়ে দেব কিন্তু।'

'দেখি তো কত ক্ষমতা আপনাদের।' ভদ্রলোক তেবিযা হয়ে উঠতে মহিলা দু'জনই ওকে শান্ত করে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নেমে যাওয়ার পরও জানলা দিয়ে রিমলেস চশমা, দাড়িওয়ালা ছেলেটি ভদ্রলোককে স্রেফ বক দেখাল। দেখিয়ে বসে পড়ল।

আব একজন বলল, 'যান, যান তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বাতাসা আর আঁচলের বাতাস খান।'

আর একটি খ্যানখ্যানে গলা বলল, 'তোরা এততো কথা খরচ করিস কেন বুঝি না. কেলিয়ে দিলেই হত..'

দমদম জংশন পেরতেই রিমলেস চমশা দাড়িওয়ালা ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সমীরকে বলল, 'দাদা আপনি বসুন।'

সমীর বলল, 'আপনি নামবেন!'

'না না, আমি পরে নামব, আপনি বনগাঁ লোকালে চাপেন না?'

একজন বলল, 'দাদা ডি.পি. নয়।' সমীর বলল, 'আপনি বসুন না। আমি বিরাটি নামবো তো...আর তো বেশী বাকি নেই।'

'অহ্ আপনি বসবেন না, দাদা আপনি তবে বসুন।'

'বনগাঁ লোকালেই এটা পাবেন, আর কোন ট্রেনেই কেউ এমন নিয়ম করে উঠে জায়গা ছাড়বে না!'

এক বৃদ্ধ সমীরকে অফার করা জায়গায় বসতে বসতে রিমলেস চশমা, ব্যাগি প্যান্ট, দাড়িওয়ালাকে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ।'

'না-না, একটু মনুষ্যত্ব থাকলেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বসে যাওয়া যায়।'

বৃদ্ধ ফোড়ন কাটেন, 'সবাই কিন্তু ছাড়ে না বাবা।'

'আসলে ডি.পি. হলে, মানে ডেলি প্যাসেঞ্জার হলেই জায়গা ছাড়বে।'

বৃদ্ধ বসে পড়ে পাশের লোকটির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন। সেই চাউনিতে পাশের লোকটি অস্থির হয়ে একটু বাদেই মজার গলায় বলে উঠল, 'দাদু, অমন করে আমায় দেখবেন না। আমি অনেকদূর যাব। সময় হলেই ঠিক উঠে দাঁড়াব। আমি কিন্তু দাদু এখনই মনুষ্যত্বের লিমিট ক্রস করে অমানুষ হযে যাইনি।'

দাড়িওলা, লোকটির দিকে তাকাল। সমীর মুখ ঘুরিয়ে একটু হেসে নেয় তখন।

বিরাটি স্টেশনে নামতেও কম ধকল গেল না সমীরের। ওভারব্রিজ ক্রস করে প্ল্যাটফর্মে নেমে একজন অ্যাড্রেস লেখা কাগজটা দেখিয়ে জায়গার হদিশ চাইছিল—এসময় একজন এগিয়ে এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি, সমীরদা না?'

'ঠিক চিনলাম না।'

জয়ন্তর বয়সী ছেলেটি হেসে বলল, 'না চেনাটাই স্বাভাবিক, একবারই দেখেছেন।'

'ওহো দেখেছ আর একটু হলেই তো মিস করছিলাম। আপনিই তো উৎপল; তাহলে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আপনি বলবেন না। কি হযেছে সমীরদা? চুল...সেই জন্যই প্রথমটায়...'

'বাবা মারা গেছেন!'

'সে কী, জয়ন্ত কিছু বলেনি তো! অবশ্য...'

'আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। ও ফেরৎ যাবার পরদিনই বাবা হঠাৎ

মারা যান। কী হল আমরা যেমন জানি না, ডাক্তাররাও। অবশ্য পোস্টমর্টেম হলে...ডাক্তাররা রিকোয়েস্ট করেছিল.. রাজী হইনি—হঠাৎ কিছু না—কোত্থেকে কি হয়ে গেল। জয়ন্তকে তিনটে চিঠি, টেলিগ্রাম, ক্যুরিয়ার মেসেজ সব পাঠানো হয়েছে। ওকি কিছুই পায়নি? জয়ন্ত কেমন আছে উৎপল?'

'আমার ট্রেন আসছে সমীরদা। আমি আজই রাতের বাসে ফিরে যাব। আপনিও তো ফিরবেন শেয়ালদায়। চলুন যেতে যেতে কথা হবে। টিকিট কাটতে হবে ত আপনার।'

'আমি ভাই রিটার্ন টিকিট কেটে নিয়েছি।'

'বেশ তো চলুন একটু এগিয়ে দাঁড়াই।'

জয়ন্ত বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েছে, না পায়নি উৎপল ঠিক করে বলতে পারল না।

'আচ্ছা উৎপল তুমি আসার সময় জয়ন্ত তোমাকে কিছু বলে দেয়নি? একবার যেমন তোমার হাতে চিঠি দিয়েছিল।'

উৎপল একটু ইতস্তত করে বল, 'মানে আমিই আসার আগে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—জয়ন্ত তোর বাড়িতে গিয়ে কিছু বলতে হবে? ও বলল, না না, কি আর বলতে হবে।' সমীর অধৈর্য হয়ে বলল, 'ওর শরীর ভাল আছে তো উৎপল? মা খুব চিন্তা করছেন। ব্যাপারটা তো বোঝই, বাবা মারা গেলেন, ও একবার এল না! টেলিগ্রাম, চিঠি, ক্যুরিয়ার কিচ্ছু বাদ রাখিনি।'

উৎপল জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাইরে থেকে শরীর খারাপ বলে তো কিছু মনে হচ্ছে না..ওর ভেতরে ভেতরে...'

'ভেতরে ভেতরে কী উৎপল?'

'নাহ্ কিছু না।' উৎপল স্বগত ভাষণের মত খুব আস্তে আস্তে এবার বলে 'পাল্টে যাচ্ছে। খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে..'

সমীর খুব ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, উৎপলের হাত ধরে বলল, 'উৎপল ভাই কিছু লুকিও না, আমায় সব বল, আমার একটা মাত্র ভাই...বরাবর আমার খুব ন্যাওটা ছিল জয়ন্ত!'

উৎপল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'আচ্ছ জলপাইগুড়িতে আপনাদের কোন আত্মীয় থাকেন?'

'..জলপাইগুড়িতে? না তো..আমি তো '

উৎপল প্রত্যয়ের হাসি হেসে বলল, 'থাকেন। আপনি আপনার মাকে জিজ্ঞেস করবেন! আপনার বাবার কোন আত্মীয়? জলপাইগুড়ির এক নামকরা ডাক্তার শশধর মল্লিক..এখন মারা গেছেন, তিনি আপনাদের আত্মীয়।' কখনও এই নামটা..শশধর মল্লিক সমীর হ্যাঁ হ্যাঁ করে, অথচ ঠিক মনেও করতে পারে না। বাবার মুখে না মার মুখে নামটা শুনেছে...সমীর করে, কখন? করে! কখন! হ্যাঁ মনে পড়েছে।..

উৎপল বলে, 'জয়ন্ত পাল্টে গেছে। আমাদের সঙ্গে বড় বেশী একটা মিশতে চায় না। শশধর মল্লিকের এক নাতনী আমাদের ব্যাঙ্কে একবার আসে। আমার সঙ্গে

আলাপ হয়। ওর ঠাকুরদার একটা চেক ক্লিয়ারেন্স নিয়ে কি একটা ঝামেলা হচ্ছিল। মেয়েটি আমায় ধরে। আমিই জয়ন্তর সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়েছিলাম এক ফাংশনে। ওরা দু'দিকেই আত্মীয়তা বের করে ফেলেছে। প্রথমে অল্প এক-আধদিন ও বাড়িতে যাতায়াত। এখন, আপনাকে বলা উচিত—জয়ন্ত পুরোপুরি মেসের পাট তুলে দিয়ে ও বাড়িতেই উঠেছে।'

'উৎপল', ব্যাকুল গলায় সমীর বলে 'ঠিকানাটা আমায় দাও।'

'ও ঠিকানা চান, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ... আমি বলছি, দরকার নেই। আপনার মাকে জিজ্ঞেস করলে বা অন্য কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে জেনে যাবেন...'

...'তুমিই দাও।'

ঠিকানাটা লিখতে লিখতে মুখ তুলে হঠাৎ উৎপল জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা জয়ন্ত আপনার আপন ভাই তো?'

'এ তুমি কি বলছ উৎপল, আমার একমাত্র ভাই, আমার কত ছোট—সাবাক্ষণ আগলে রেখেছি।'

উৎপল বলল 'কিছু মনে করবেন না সমীরদা। আমার মনে হয় আপনারা কেউ জলপাইগুড়িতে ওর সঙ্গে দেখা করুন। জয়ন্ত আমার বন্ধু। জয়ন্ত খুব রেসপন্সিবল খাটিয়ে ছেলে ছিল। কিন্তু ও দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আচ্ছা, পারুল কেমন আছে?'

সমীরের মুখ থম থম করছে। উৎপল অনেক কিছু জানে। জয়ন্ত বলে দিয়েছে?

শেয়ালদায় নেমে উৎপল বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। বাস ধরতে সে এসপ্ল্যানেডে ছুটবে। সময় বেশী নেই। সমীরের মাথা অজানা আশঙ্কায় টালমাটাল। কোনক্রমে চার-পাঁচ লাইনের একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল উৎপলের হাতে।

'আচ্ছা ও ট্রান্সফারের কথা কিছু বলে না, উৎপল?'

'জয়ন্ত আর কলকাতায় আসতে চায় নাকি? ও তো বলেছে জলপাইগুড়ি নাকি আর ওকে ছাড়বে না—'

'আসলে ও জলপাইগুড়ি ছাড়তে চায় না, সেটাই ওভাবে এখন ঘুরিয়ে বলে।'

উৎপল শেষ প্রশ্নে আবার জানাল সে অনেক কিছু জানে, 'আচ্ছা সমীরদা, জয়ন্তর আপনার মার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?'

সমীর দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'আমার মা তো জয়ন্তরও মা উৎপল।'

'তা তো আমরা জানি। অনধিকার চর্চা হলে ক্ষমা করবেন। আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। অবশ্য কলকাতায় আসব শুনেই ও ব্যাঙ্কে এসে আমায় বলে দিয়ে গেছে আমি যেন আপনাদের সঙ্গে দেখা না করি। মায়ের প্রসঙ্গে ওকে প্রায়ই রেগে উঠতে দেখা যায়।'

সমীর বলল, 'এসব সত্যিই আমার জানা নেই উৎপল। সত্যি আমার জানা নেই।' উৎপল হাসল। হাসির অর্থ অনুধাবন করে সমীর আরও অপমানিত বোধ করে যেন। উৎপল স্টেশন পেরিয়ে গেল। সমীর বলল, 'চিঠিটা দিও কিন্তু।' উৎপল হাত নাড়ল।

তিন

সমীর সাড়ে আটটা নাগাদ ঘরে ঢুকে জ্যোতিবালাকে বলল, খুব স্বাভাবিক গলায়

বলল, 'বাবার ডাইরিটা, যেটা তুমি খুঁজে পাচ্ছ না সেটা গতবার এসে তোমার ছোট ছেলে সরিয়েছে।'

'তাই নাকি? ওর কোন খোঁজ পেলি।'

'যা অমলা জানে না, তাই জয়ন্ত জেনেছে। জলপাইগুড়ির অনেকে জেনেছে!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পাবি না।'

'জয়ন্ত শশধর মল্লিকদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। শশধর মল্লিকের নাতনীর সঙ্গে জয়ের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।'

'মা, শশধর মল্লিক কে?' অমলা জিজ্ঞেস করল।

'তোমার শ্বশুরমশাই-এর আগের পক্ষের শ্বশুর। তার নাতনী জয়ন্তর মামাতো বোন হবে সম্পর্কে!'

অমলা একটু সাহস করে বলে, 'পারুলের বাবার যেমন আপনি, অনেকটা সেইরকম না মা?'

'সেইজন্যই তো পারুলেব সঙ্গে সম্পর্কে মত দিই নাই। তর বাবাই পোলাডারে উস্কাইছে।'

অমলা অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'থাক মা বাবাকে আব শুধু শুধু দুষবেন না। মরে বেঁচে গেছেন।'

'তোমার সঙ্গে জয়ন্তর সম্পর্ক খারাপ সেটাও উৎপল আন্দাজ করেছে।'

অমলাকে আশ্চর্য করে দিয়ে সমীর বলে উঠল, 'আমরা, মানে আমি জয়ন্তর সহোদর হলেও যে আমাদের বাবা এক নন, সেটা অমলা জানে না। জয়ন্ত জেনে গেল? আমার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার সময় বাবা আমায় বলেছিলেন। নয়তো আমিও জানতুম না। তোমাদের যখন বিয়ে হয় আমাব বয়স কত। দুই না তিন? আমি মায়ের বিয়ে দিয়েছি!'

জ্যোতিবালা বলে উঠল, 'তুই বড় গৌরচন্দ্রিকা করস্।'

সমীর ম্লান হাসল বলল, 'তুমি বিয়ে করেছ আবার, তাতে আমি খুশীই, কেননা তা না'হলে এমন বাবা পেতাম না। বাবা আমাকেই জলপাইগুড়িতে নিয়ে গেছেন, আমার তখন ছয় বছর বয়স। শশধর মল্লিক আমায় খুব আদর করেছিলেন। বাবা বললেন, প্রমাম কর।' তিনি বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্য। তোমার মাতামহ আমারই হবার কথা ছিল।'

'তর বাবার পিছুটান ছিল। আমার কিছু ছিল না!'

অমলা বলে উঠল 'আহ্ মা। আবাব।'

সমীর বলছে 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মা তুমি বল তো জয়ন্তকে কেন ঠিকমত ভালবাসতে পারলে না? ও আমার কত ছোট। তোমাদের শেষ বয়সের...জয়ন্তকে মা তুমি কেন অবহেলা করতে! আমি বুঝতে পাবি না। অথচ বাবাও আমাকেই...

'আমার কাছে তরা দুজনেই সমান।'

'না মা', অমলা মাথা দোলায়। 'বড ছেলের ব্যাপাবে আপনি বড় এক-চোখা। জয়ন্ত তো সব কিছু আমাকে বলে, বলত, দুঃখের কথা—আব্দারেব কথা।'

'তদের সব বুঝবার বয়স হয় নাই।'

সমীর বলল, 'এখনও না হ'লে আর কবে হবে?'

'বেশ ঠিক আছে। আমি স্নানে যাচ্ছি। কি করা উচিত, তোমার কি ইচ্ছা সব ঠিকঠাক ভেবে ফেল, গুছিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে গেছে। বিপদ হতে পারে। এই অমলা, তুমি একবার পারুলের কাছে যাবে?'

'আর যেতে হবে না' অমলা বলল।

হাত থেকে সাবান পড়ে যায় সমীরের। সে আঁৎকে উঠে বলে, 'মানে?'

অমলা সাবানটা তুলে দিতে দিতে বলে 'ভয় পাচ্ছ কেন মিছিমিছি? আমি পারুলের কাছ থেকে ঘুরে এসেছি। কথা আছে। তুমি স্নান সেরে এস।'

চার

অমলাকে দেখে পারুল চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছিল।

অমলা বলল, একটু সময় নিয়ে আয়, কোথাও একটু বসি। তোদের অফিসের ক্যান্টিনে বসা যাবে না? ট্রেজারির চৌখুপি ছেড়ে পারুল উঠে এল, তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমি তো তোর বৌদি—তুই আমায় সব খুলে বলবি তো! নয়তো কি বলব বল? আগেরবার তোকে কিছু বলে যায়নি?'

'কী?'

'ওর কলকাতায় ফেরার কথা। তোদের বিয়ের কথা।'

পারুল বিষণ্ণ হাসল, বলল, 'বৌদি, বহুৎ চালিয়াৎ তোমার দেবরটি। সব সময়ই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি টাইপের কথাবার্তা।'

'শোন পারুল, আহাম্মকটাকে ধরে আনতে আমরা জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?'

পারুল ম্লান হাসি হাসে। একটু ইতস্তত করে। আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ায়। তারপর সময় নিয়ে বলে, 'না যাব না, গিয়ে লাভ নেই। তোমার দেওর আমায় ভুলে যাচ্ছে।' তারপর একটু দ্বিধায় ব্যাগ খুলে চিঠিটা বের করে দিয়ে বলল— 'দেখ না কী চিঠি লিখেছে পাজীটা। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না!'

'আমি পড়ব?' অমলার দ্বিধা।

'আহ্, পড়তেই তো দিলাম, পড় না তুমি'—পারুল বলল, 'গতকালই পেলাম। এই বোধহয় শেষও। ভাগ্যিস পেলাম। অফিসেব চিঠি মাঝে মাঝেই মার যায়।'

জয়ন্তের চিঠি

পারু,

জলপাইগুড়িতে ভালোবাসার হাত-পা গজাতে দেখলাম। এতদিন তোমাকে ঝুলিয়ে রেখেছি, নিজেকেও। আমি কী যে চাই তার কোন ধারণা এতদিন ছিল না, কেননা আমি কি কি পাইনি তারও পরিমাপ ছিল না। আমার পাওয়া বলতে কলেজে তুমি আর অমলা বৌদি। অমলা বৌদিকে আমার

মা ই বলা উচিত। জননী সম্পর্কে আমার যদিও ধারণা নেই, ছিল না, কলকাতায় গেলে অমলা বৌদি বুঝতে দেয় না ছোটবেলায় আমি ওই দাদাকেই কোলবালিশ করে ঘুমোতাম। আমার এক জীবিতা গর্ভধারিণীও আছেন। যা বললাম জলপাইগুড়িতে আবার ভালোবাসার হাত-পা গজাচ্ছে। তোমার আমার সম্পর্কে বহুদিন ধরে যে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে সেটার দাঁড়ি বসিয়ে দি এমন স্পর্ধাও আমার নেই। পারু যে জয়ন্তর কোথায়, পারু জানে না। জয়ন্তও জানে না। অথচ দেখ, ট্রেজারির অফিসার তোমায় ভি আই পি ব্লকের খেলা দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়ে, ওমর বিসর্টে প্রমোদ ভ্রমণে নিয়ে যেতে চেয়ে ফেড আপ হয়ে শুকিয়ে গেল, ক্যাকেক্সিয়া রোমান্টিকা হল (জলপাইগুড়ির এক ডাক্তার আমায় টার্মটা শিখিয়েছে) — তুমি একটু তাকে ইন্ধন দিলেই প্রেমানলে ট্রেজারি পুড়ে যেতে পারত। আমি কি করব, তোমারও বলে দেওয়া উচিত।

গতবার গিয়ে, কলকাতায় গিয়ে বড্ড ভয় পেয়েছি। আমি ভয়ে ব্যথায়, এক দুর্মর আবিষ্কারের বেদনায় মনে মনে কঁকিয়ে উঠেছি। আমার প্রাণাধিক মাতৃসমা অমলা বৌদি আর লিখতে পারছি না।

আসলে ভালোবাসা। ভালোবাসার বাসনা অক্ষমতার আড়ালে কঁকিয়ে মরে। অথচ জলপাইগুড়িতে ভালোবাসার দিব্যি হাত পা গজাচ্ছে। তুমি জলপাইগুড়িতে আসবে? তবে ভালোবাসার হাত পা গজানো নিজের চোখে দেখে যেতে পারতে। অমলা বৌদিকে আমি চিঠি লিখতে পারব না। তোমার চিঠির আশায় থাকব। অমলা বৌদি কেমন আছেন? পারু আমায় জানাবে।

জয়ন্ত

সমীর চিঠিটা সঙ্গে নিয়েছিল। নিজে পড়েনি। পড়তে হচ্ছেও হয়নি পুঁচকে ওইটুকু ভাই এর প্রেমপত্র। অমলা একটা সিন করেছে। চিঠিটা বুকে চেপে ধরেছিল, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। সমীর বলল, 'আমার বোকা ভাইটাকেও তুমি যে ভালোবাস, চোখের জল ফেলে তাই বোঝাতে হবে?'

অফিসের মিসেস মজুমদারের পরামর্শমত সমীর সাইকিয়াট্রিস্ট বিসর্জন চক্রবর্তীর কাছে গেল। চিঠিটা পড়তে সে সময় নিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হেঁড়ে গলায় বলল, 'আপনি পড়েছেন? চিঠিতে ভালোবাসার হাত পা গজাচ্ছে বারবার লেখা। এর একটা মানে আছে। কী মানে! ভাবতে হবে।'

বিসর্জন চক্রবর্তীর একদম আধপাগল চেহারা। 'আপনে রোগী আনেন নাই। প্রেমপত্র এনেছেন। আপনার স্ত্রীকে এবং পারুলকেও একদিন মিট করতে চাই। কয়েকটা প্রশ্নের চটপট জবাব দিন দেখি?'

'আপনার ভাই কি ভণিতাপ্রবণ?'

'না তো।'

'সব সময় কি অপরকে খুশি কিম্বা প্রভাবান্বিত করতে চান?'

'না তো!'

'আপনার ভাই কি সব সময় তার প্রতি মনোযোগ যাচ্ঞা করে?'

'না 'তো...'

বিসর্জন ঝামরে ওঠেন, 'সব ন্যা ন্যা করলে কী করে হবে!'

'আপনার ভাই শৈশবে মায়ের যত্ন, আদর, সেবা পেয়েছে?'

সমীর বলল, 'না পায়নি।'

'কেন কেন কেন?'

'মা খুব রুগ্ণা ছিলেন। ভাই-এর শৈশব, বাল্যকাল সময়টা ধরেই মা খুব অসুস্থ ছিলেন।'

'আপনার ভাই কি এখন আপনাদের এক্সপ্লয়েট করছে? আপনার ভাই কি পরশ্রীকাতর?'

'কক্ষনো না।'

বিসর্জন পেনের পেছন চিবুকে লাগিয়ে চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। 'তারপর রোগী কোথায়' হুঙ্কার ছাড়েন হঠাৎ।

'তাকে তো আনা হয়নি।'

'তাকে তবে নিয়ে আসুন।' বিসর্জন কিছু ভাবছেন, 'ইটস এ পিয়োর কেস অব পার্সোন্যালিটি ডিসর্ডার।'

'আচ্ছা আপনার ভাইকে তো এখনও বিয়ে দিতে পারেননি।'

'না'

'চেষ্টা করেছেন।'

'করেছি, ও এড়িয়ে গেছে, একটু অ্যাম্বিশাস টাইপের, নানা রকম কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে...'

'আসলে', বিসর্জন যেন টেপ চালিয়েছে 'হিসটেরিকাল মেন হ্যাভ ডিফিক্যাল্টি ইন এস্টাব্লিশিং ক্লোজ রিলেশন উইথ ওয়ান উয়োম্যান, অ্যান্ড মে সিক ইন্টিমেসি ইন এ সিরিজ অব অ্যাটাচমেন্ট অব শর্ট ডিউরেশন।'

সমীর হঠাৎ খুব রেগে গেল। একশো টাকার নোটটা টেবিলে রেখে চিঠিটা তুলে পালিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিসর্জন তখনও চোখ বুজে বিড় বিড় করে যাচ্ছে..

বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে সমীর একটু দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে মায়ের গলা ভেসে আসছে, 'এই, বৌমা তোমার কেমন ব্যাভার..নিজের জিনিস নষ্ট করে ফেলছ।'

'সব ভেঙে ফেলব, এসব কার জন্য, আমাদের তো ছেলেপুলে নেই' অমলা গরজায়, 'হতভাগার যখন সুবোধ নেই অমন ভালবাসা বাসতে কে বলেছে?'— অমলা জলভর্তি কাচের গ্লাসটা পা দিয়ে ঠেলে গড়িয়ে দিল মেঝেতে।

দরজা খুলে দিয়ে জ্যোতিবালা বলল---'ঘরে তো প্রলয় কাণ্ড বাঁধিছে। দ্যাখ দিনি কাণ্ড।'

সমীর সব দেখে থ। ছুটে এসে সে অমলাকে মেঝে থেকে তুললো, 'যা বাবা তুমিও পেগলে গেছ। ডাক্তার বলে দিল জয়ন্তর পার্সোন্যালিটি ডিসর্ডার হয়েছে। তোমার তো দেখছি প্রলয়াইটিস হয়েছে। কিন্তু কেন? থালা গ্লাস বাটি ভাঙছ কেন?'

অমলা চোখ মুছতে মুছতে হাসল, বলল, 'জয়ের ওপর রাগে।' তারপর বলল, 'হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম, কেন এমন হ'ল বলতো? শোন, কালকেই একটা টেলিগ্রাম করবে, লিখে দেবে অমলা বৌদি ইজ ডাইং। কাম শার্প, পাক সিকস ইওর হেল্প। আরজেন্ট কিন্তু।'

সমীর বলে উঠল, 'ধ্যাস্ শালা, আমি তো টেলিগ্রাম কবেই করতে চাইছিলাম।' অমলা বলল, 'মাদার ইল লিখলে কিন্তু ঘণ্টা হবে।' অমলা বৌদি ইজ ডাইং'— সমীরকে ঝাঁকিয়ে বলল অমলা, 'বল না কালকে পাঠাবে তো। তারপর দেখি পাজীটা কি করে? পাগলা, বদমাশ ছুঁচো একটা!'

'বেশ বেশ শুয়ে পড় এবার। টেলিগ্রামে না হয় তোমাকেই এবার মেরে দেব।' সমীর নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমার আপত্তি নেই।' তাবপর ঘরময় ভাঙা বাসনপত্র পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে।

অন্তঃশীলা

সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায়

মিঃ আব গোমেস বসে আছেন চেয়ারে। মাথায় কাশফুল রঙা অভিজ্ঞ কেশ। শরীরের চামড়া চুঁয়ে বেরোচ্ছে রক্তবর্ণ ভাস। কপালের দীর্ঘরেখাগুলো মানুষের দাম্পত্য জীবনেব বিচিত্রতা নিযে অপেক্ষা কবছে যেন।

হাতেব ঘড়িটা দেখে নিলেন। তারপর পাশের চেয়ারে বসে থাকা সঙ্গী মহিলাকে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বাঁ হাতে ফাইল। ডান হাতে বল পেনের মাথা নিজের বব-কাট চুলের মাঝে ঢুকিয়ে চুলকোতে চুলকোতে সঙ্গী মহিলা চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিযে উঠে শ্বেতাকে বলল, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, একটু তাড়াতড়ি করুন।

সরকারি ফ্ল্যাট। ডাক নাম হাউজিং। টাইপ-'ই'। একতলার এই ফ্ল্যাটটা শ্বেতার। শ্বেতার এখানে বাস দশ বছর। বাসিন্দাদেব অনেকেই 'ঘর' না বলে এগুলোকে 'দেশলাই-বাক্স' বলতে ভালবাসে। শ্বেতা তা বলে না। কেননা ওর কোন অসুবিধা হয় না। ছোট হোক তাই বা পাচ্ছে কোথায়। দুটো ঘর। সপ্তার অধিকাংশই ও একা।

ঘরে বাইরের হাওয়া খেলে না। পাশ ফিরতে গেলে দেয়ালে ঘসা লেগে চামড়া ছিঁড়ে যায়।

যারা এসব কথা বলে তাবা কিন্তু ফ্ল্যাট ছাড়ে না। ছাড়লে অন্য কেউ পেতে পারে। যাদেব লাইনে নাম আছে।

শ্বেতা রসিয়ে বসিয়ে গল্প করে বিজনের সঙ্গে। এদের প্রত্যেকেব নিজস্ব বাড়ি আছে। ধান্দাবাজি করে ফ্ল্যাট বাগিয়ে নিয়েছে। না পোষালে ছেড়ে দিতে পারে।

সপ্তার শেষে এসে শ্বেতার মুখে হাউজিংয়ের নানান গল্প শুনতে বিজন মজা পায়, আবার মাঝে মাঝে রেগেও যায়।

নাহ এ সংসারে তোমার আর অন্য কোনও কথা নেই। কেবল হাউজিং আর হাউজিং। সোম থেকে শুক্রর ঘটনা। এই এটা হয়েছে, সেটা হলো।

ঘরের খাটে বসে জানলা দিযে দেখা যায় বেল-স্টেশনের সঙ্গে যোগকারী রাস্তা। দবজা খুললে সিঁড়িব তলা। পাশ দিয়ে বাইবে বেবনোর প্যাসেজ। বাইরে বেবিয়ে, গেটের দুপাশে কিছুটা মাটি।

প্রতি শনিবাব সকালে কোদাল দিযে বিজন কোপায়। মাটি তৈরি করে। গাছ কোমর করে আঁচল বেঁধে পাশে দাঁডিযে থাকে শ্বেতা। শক্তি যোগান দেয় বিজনকে।

জমি তৈরি। তারপর চাবা লাগানো। তারপর ফুল ফোটা পর্যন্ত পরিচর্যা। আশপাশের ফ্ল্যাটবাসীরা রাস্তায় পাযচারি করতে করতে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। দু-চোখ মেলে দ্যাখে। বাব্বা দাদার যে একেবারে বিশ্রাম নেই। কর্তাগিন্নি মিলে এযে নন্দন কানন বানিয়ে ছাড়বেন দেখছি। সপ্তা শেষে শুক্রবাব রাতে ফেরেন। শনিবাব ভোর থাকতেই লেগে

পড়েন। বিকেলেও কামাই নেই।

আর বলেন কেন ঘোষবাবু। আমার কোনও দিনই ফুলের সখ ছিল না। শ্বেতার পাল্লায় পড়ে এই অবস্থা।

তা ভালো, মিষ্টি হাসে ঘোষবাবু। শ্বেতার দিকে তাকায়। শ্বেতার চোখ দুটো নেচে ওঠে। বিজনের দিকে ছুঁড়ে মারে। ওর ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ে। বিজন শুনতে পায় ছোট গলায়, অসভ্য কোথাকার।

ঘোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বিজন বলে গোলাপফুলের ওপর চড়ুই পাখির বড় লোভ।

কারই বা না আছে!

সে তো সবারই আছে। তবুও...এই চড়ুইই অনিষ্ট করে বেশি।

একটা একটা করে ঝাঁটা-কাঠি বিজনের হাতে তুলে দেয় শ্বেতা। গোলাপ গাছকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে পুঁততে থাকে বিজন।

ঘোষবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে।

বাঁ হাতের কবজিতে যতবার চোখ পড়ে ততবারই শ্বেতার মনে খোঁচা মারে পুরনো দিনের কথা। দগদগিয়ে ওঠে বুকের ঘা। কবজিতে সেঁটে থাকা ক্ষতটা চঞ্চল করে দেয় ওকে। তবুও...

তুমি বিশ্বাস কর। মা যা বলছেন তা সত্যি নয়।

কী বললে? মা মিথ্যে কথা বলছে! আমার মাকে তুমি মিথ্যাবাদী বললে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে নিরঞ্জন।

ছিঃ ছিঃ আমি আবার তা বললাম কখন!

একটা চড়। সজোরে নিরঞ্জনের একটা চড় শ্বেতার গালে বসে। টেবিলের ওপব বিয়ের একটা ছবি। বাঁধানো। নিবঞ্জন তুলে ধরে সেটা। তারপর আছাড়। কাঁচ ভেঙে যায়। ছবি ভাঙে না। মুক্ত হয়। সেই ছবিটা সোম থেকে শুক্র প্রতিদিন একবার দ্যাখা চাই। দ্যাখে শ্বেতা।

শাশুড়ি রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে। ওদের ঘরে। তখন অশান্তি চরমে। শাশুড়ির হাতে গরম খুন্তি। কেড়ে নেয় নিরঞ্জন। তাবপর শাবল বসানোব মতো বসিযে দেয় ওর হাতে, বাঁ হাতের কবজিতে।

আর সেই থেকে শ্বেতার ঘড়ি পড়া ডান হাতে। তা নিয়ে কলোনির লোকেরা কম কথা শোনায়নি। কখনও সরাসরি, কখনও আড়ালে।

এই জন্যই ছুঁড়ি বরের কাছে নিত্যদিন ঠ্যাঙান খায়।

চাকরি করে বলে দ্যাখো দেখি আদব কায়দা।

মাথা কিনে নিয়েছে।

বরটাও তেমনি। বউয়ের কামাই খেলে যা হয়।

নাভির নিচে কাপড়। ডান হাতে ঘড়ি—রাণী চললেন কামাই করতে।.. রাণী ফিরলেন।

চাকরি যেন আর কোনও মেয়ে করে না।

দ্যাখগে, চাকরি ছাড়াও ওভার টাইম কিছু আছে কিনা।

এই 'ওভার টাইম' বিষয়টা জানতে চায় শাশুড়ি। খোঁজ নিতে বলে নিরঞ্জনকে।

নিরঞ্জনের কাছ থেকে 'দ্রৌপদী' নামের কুৎসিত ইঙ্গিত পেয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে শ্বেতা।

একটা মাছ দেখতে পায় চোখের সামনে। ঝোলানো আছে শূন্যে। নিচে, জলে তার প্রতিবিম্ব। মাছ না। মাছের চোখ। গোল কয়েন। টাকা।

লক্ষ্যভেদটা তুমিই করেছিলে। এখন বলো কিনা, চাকবি ছেড়ে দিতে। লজ্জা করে না তোমাব?

মুখ সামলে কথা বলো। তুমি কি সম্পূর্ণ মাইনেটা আমায় দাও? বাকি টাকা যায় কোথায়?

সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব না। যে নাকি গান ভালোবাসে, ফুল চর্চা করে তার এই ব্যবহার!

বাগান চর্চা থামিয়ে বিজন শ্বেতাব হাত থেকে কাপ নেয়। চাযে চুমুক দেয়। এঃ জল হয়ে গেছে। যাক্ আর জল দিতে ভুল কব না।

শ্বেতা গোলাপ গাছে হাত বুলোয়। হঠাৎ টেনে নেয় হাত। কাঁটা। সূঁচলো কাঁটা।

মিঃ গোমেস আবার তাড়া লাগান সঙ্গী মহিলাকে। মহিলা গলা ছাড়ে শ্বেতার উদ্দেশ্যে। রান্না ঘরে কাপ প্লেটে ঠোকাঠুকির শব্দ হয়। সংযত গলা শ্বেতার। এই তো হয়ে গেছে—যাচ্ছি—

স্টেশনে, রাস্তায়, বাজারে মাঝে মাঝে শ্বেতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পুরনো এলাকার লোকজনের। তাদের সঙ্গে কথা হয়। কেউ দেখামাত্র নাক বেঁকায়। পরে মুখ ঘোরায়। কালুর মা কিন্তু সোজাসুজি কথা বলে ওর সঙ্গে। যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকেই। খোঁজ খবব নেয়। কেমন আছ? খোকন এখন কত বড় হযেছে? শ্বেতা ভিড় এড়িয়ে কথা বলতে কালুর মার হাত ধরে রাস্তার ধাবে নিয়ে যায়।

তা দেখতে দেখতে ষোল বছর হয়ে গেল।

কোন ক্লাসে পড়ে?

এবারে মাধ্যমিক দেবে।

তোমার কাছেই থাকে তো। নাকি?

ইছাপুরে থাকে।

বাপের বাড়ি?

হ্যাঁ।

নিরঞ্জন কিন্তু ভালো নেই। বেশ বুঝতে পারি। তুমি চলে আসার পর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। মা মবাব পব মাথাটাও...। তোমার কথা খুব বলে এখনও...।

শ্বেতার শোনার আগ্রহ দেখে কালুব মা বলতে থাকে—আমাকে প্রাযই তোমার গল্প করে। বলে, লোকের পাল্লায় পবে নিজের পায়ে কুডুল মেরেছি। খোকনটাও

যদি আসে। কত বড় হলো, কী করছে, কোনও খবরই পাইনা। তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে এ কথা বলা যায় না।

হার্ট অ্যাটাকে নিরঞ্জন কাবু হয়ে পড়েছে। পাড়ার ছেলেরা হাসপাতালে দিয়ে এসেছে। তুমি একবার চোখের দ্যাখা অন্তত দেখে এসো।

মাস তিনেক হয়ে গেল। শ্বেতা দেখতে যায়নি। যেতে পারেনি।

কী করবে। আদালত সাক্ষী। যে কোনও অত্যাচারিত মানুষ চায় অত্যাচার মুক্ত হতে। শ্বেতা সই করেছে মাত্র। রক্তের উন্মাদনায় ওকে আদালতে হাজির করিয়েছে নিরঞ্জন। খোরপোষ দাবী করেনি শ্বেতা। কেবল নিরঞ্জনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক আইনের দোহাইয়ে ছিন্ন হয়ে গেল। দু'বছরের খোকনকে কোলে নিয়ে আদালত থেকে বেরনোর সময় নিরঞ্জনের কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, আইন-ই কি সব? আর কিছু নেই? নিরঞ্জন উত্তর দেয়নি। দিতে পারেনি।

ও তোমাকে ত্যাগ করেছে ঠিকই। দ্বিতীয় বিয়ে কিন্তু করেনি। বা সেরকম খারাপ কিছু শুনিওনি ওর নামে।

হিংস্র কোনও এক পশুর ধারালো নোখ দিয়ে শ্বেতার হৃদয়কে কে যেন খামচায়।

দ্যাখো, শ্বেতা, আইনগতভাবে তোমাকে ত্যাগ করলেও এখনও কিন্তু নিরঞ্জনের বউ তুমিই। মানুষে মানুষে সম্পর্ক। আইন কী করবে।

তোমার কি হয়েছে শ্বেতা? মন খুলে বলো দেখি। শ্বেতা বিজনের কথায় উত্তর দেয় না।

সপ্তায় আড়াই দিন থাকি। তাতেও যদি মুখ ব্যাজার করে থাক...

বিজনের পাশে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল শ্বেতা। চা করার ছুতো নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। পেছন পেছন বিজন—একি! তোমার চোখে জল! কী হয়েছে? বার বছর ঘর করছি, কোনও দিন যা দেখিনি...

শ্বেতার চোখের জল শুষে নিল হঠাৎ কোনও এক অদৃশ্য কাগজ, ব্লটিং পেপারের মতো। সমুদ্রের গভীরের গোপন পাহাড়ের মতই রহস্য-গম্ভীর ওর চাহনি।

বিজনের দু'সপ্তা দেখা নেই। কোনও খবর পাঠায়নি। শরীর খারাপ নিয়ে গেল। পরিচর্যার অভাবে বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে শ্বেতার মনটা খারাপ। কালুর মায়ের সঙ্গেও দেখা হচ্ছে না বহুদিন। মন খারাপ হলে শ্বেতা ক্যাসেট চালায়। রবীন্দ্র সংগীত। আজও তাই চলছিল। কালুর মা হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। এসেই শ্বেতাকে বকুনি। তোমার শরীরে কি একফোঁটাও মায়াদয়া নেই। মানুষের যা থাকে।

শ্বেতা চমকে ওঠে কালুর মার কথায়। বোবা হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্য।

তোমাকে এত করে বললাম। তুমি একটিবার চোখের দেখাটা পর্যন্ত দেখতে গেলে না লোকটাকে।

লজ্জায় পড়ে যায় শ্বেতা। কতদিনের জমা থাকা প্রশ্ন, যা নিজের মধ্যেই স্তুপাকার নিচ্ছিল তা ওগরাতে থাকে এবার।

বলতে পারেন কাকিমা, রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন কেন?

হঠাৎ এই প্রশ্নে কালুর মা প্রথমটায় চমকে যায়। তুমি জান না?

আপনি বলুন না দেখি, আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

কালুর মা সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করে। বাবার জন্যে।

সীতা বনবাসে যান কার জন্যে?

এসময়ে এসব প্রশ্ন তোমার আসছে কেন? আগে বলো তো।

শ্বেতা আবদার মাখানো গলায় পুনরায় অনুরোধ করে।

বেশ বুঝতে পারছি। একটা রহস্য আছে।

শ্বেতার তর সয় না। ধুর, বলুন তো।

রামের জন্যে—

রাম কাকে খুশি করার জন্য এ ধরণের আদেশ দিয়েছিলেন? না প্রজা খুশি করার জন্য। তাই না?

কালুর মা ঘাড কাত করে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। কোনটা ভালো? বনে গিয়ে প্রকৃতির রাজগৃহে বাস করা, নাকি নির্মম রাজপ্রাসাদে থেকে শিঙি-হানা অন্তঃশূলনি ভোগ করা?

ওসব বাদ দাও তো। একটু চা খাওয়াবে? নাকি চলে যাব?

না না বসুন। আমি এখুনি চা করে আনছি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কালুর মা বলে, সে তো পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। খোঁজ খবর কিছু রাখ?

রক্তশূন্যতার রোগীর ছাপ পড়ে শ্বেতার মুখে।

লোকে বলে, পয়সা থাকলেই সব হয়, তা হয় না শ্বেতা। সেবা পাওয়া যায় না। সেবার নামে অষ্টরম্ভা। লুটেপুটে খাচ্ছে সব। ওব ঘরে গিয়ে দেখি, হেগে মুতে মাখামাখি করে একসা। বেচারাকে দেখে ভীষণ কষ্ট লাগল। কেউ নেই যে দেখবে।

একটু জিরিয়ে নেয় কালুর মা।

বললাম, শ্বেতাকে খবর দিই। রাজি হলো না। এখন খবর দিলে লোকে বলবে অসময় তাই...

আবার একটু বিশ্রাম।

ছুটে এলাম তোমার কাছে।

একটা শিলা। ধোঁয়াটে ধূসর বর্ণের শিলা। যার উচ্চতা দু'ফুট কি সোয়া দু'ফুট। আনমনা শ্বেতাকে দেখে কালুর মার মনে হয়। ধাক্কিয়ে চেতন আনার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

আমি বলি কি, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এবার বাড়ি যাও। ওখানে গিয়ে থাক। নয়তো নিরঞ্জনকে নিয়ে এসে তোমার কাছে রাখ।শিলার ভাব নমনীয় হতে থাকে। কালুর মা অভিজ্ঞতায় টের পায়। শ্বেতার অন্তরের অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে ক্রমশ।

নিজের মানবিক বৃত্তি থেকে যন্ত্রণার পাপড়িটাকে না খসানো পর্যন্ত কালুর মা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে অনবরত।

বিজন থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। অকস্মাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে ঝড়ের দাপটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন কাঁপে। রাগে টগবগ করে ও ফোটে। আশ্চর্য। কে এই লোকটা। এটাই তাহলে খোকনের বাবা! খোকনের সঙ্গে দেখা হয়েছে ক-বার। মাঝে মাঝে আসে। সে কথাও জানে। মায়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যায়। কিন্তু...

মাত্র দু'সপ্তাতেই এত কাণ্ড! তুমি আগে বলতে পারতে। আমি আর আসতাম না। আমি শালা নিজের বউ ছেলে মেয়ে ফেলে ছুটে আসি কীসের টানে!

ওভাবে বলো না। কাকুতি মেশানো শ্বেতার মোলায়েম কণ্ঠে বিজন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। খেদ ছড়াতে থাকে। যার ছাঁট বৃষ্টির অনুবিন্দুর মতো হয়ে শ্বেতার গায়ে সূঁচ বেঁধায়। লক্ষ্মী সোনা রাগ করো না। হিংসে না। মানুষটাকে দ্যাখো কি অবস্থায় পড়ে আছে। আমি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, বলো!

তুমি কি আমাকে বাচ্চা ছেলে ভাব। আমি বুঝি না কিছু?

নিজের তর্জনী নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে শ্বেতা। আস্তে আস্তে কথা বলো। মানুষটা শুনতে পায়।

শুনুক। বিয়ের পর থেকে যে তোমাকে—

শ্বেতা হাতের চেটো দিয়ে চাপা দেয় বিজনের মুখ। অসাবধানতায় চোখ থেকে ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। মুখে তার চিহ্ন নেই। মুখে পোষা হাসিময় স্নিগ্ধতা। বিজনের চোখেও জল। তুমি বোকা নাকি? মুছিয়ে দেয় নরম স্নেহমাখা হাত দিয়ে।

নিরঞ্জন দাঁড়াস সাপের মতো মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ইচ্ছে করে ওদের দুজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়! সে সম্বল নেই। মাজা পড়ে গেছে।

ফ্ল্যাটের পেছনের অংশে চারফুট-দশফুট বারান্দা। তক্তপোস একটা। তার ওপব শুয়ে শুয়ে দিন কাটে নিরঞ্জনের।

মল-পাত্র হাতে ধরে শ্বেতা। অফিস যেতে পাবে না। খাইয়ে দেয। ওর কোলে মাথা রেখে খেতে খেতে নিরঞ্জন কেমন যেন হয়ে যায়। ওর চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় শ্বেতা, নিজেরটা তখন বাঁধ মানে না। শব্দহীন ওর চোখের ভাষা বড় অসহায় করে দেয় শ্বেতাকে। নিয়েলে যখন, বারান্দায় কেন? ঘরে তোল।

বিজন বারান্দায় যেতে চায় না। যেতে হয়, বেসিনে হাত ধুতে। বেসিনের ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দড়িতে গামছা মেলতে। উল্টো দিকে তাকায় না। তাকালে দেখতে পেত। নিরঞ্জন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, বুঝতে পাবত না, ও-চোখ ঘৃণার, না কৃতজ্ঞতার।

কলকাতায় নিরঞ্জনের অফিসে গিয়ে চূড়ান্ত অপমান সহ্য করতে হয় শ্বেতাকে। শ্বেতা বিপরীত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ছুটি-ছাটা নিয়মিত করতে হবে না। যতদিন চলে চলুক, না হলে স্বেচ্ছা-অবসর তো আছেই।

কাঁচা রক্তের রাগ নিরঞ্জনের মধ্যে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে চাইল। পারল না শুয়ে পড়ল আবার। গজরাতে থাকে শুয়ে শুয়ে। কী! আমার অফিসের লোক আমার বউকে অপমান করেছে, ঠিক আছে, দেখছি আমি। দেখাচ্ছি।

শ্বেতা অ-প্রকাশে হাসে। অনুচ্চারণে বলে, সারা জীবন তোমার বউকে ভাবি দেখেছ। এখন কি দেখার আছে আমি জানি।

শ্বেতা ছুটে যায় নিরঞ্জনের কাছে। বুঝতে পারে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে উত্তেজনায়। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনে।

শ্বেতা, তুমি এখনই ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে যাও। রি-ম্যারেজ করতে গেলে কী করতে হবে জেনে এসো। ব্যবস্থা করো।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে শ্বেতার।

তার আর কার নেই। এই বেশ আছি।

না না আছে। আমি আর কদিন। এরপর খোকনের ভবিষ্যৎ আছে। তোমার কিছু একটা

একটু দম নিয়ে আবার বলে, আমি রিটায়ার করলে পেনসন, পাওনা টাকা পয়সা পেতে তোমার কোনও অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে যাব। না হলে ওই শালারা তোমায় কিচ্ছু দেবে না।

লোকে ভাববে

যা খুশি ভাবুক।

মিঃ গোমেসের কথা মতো সঙ্গী মহিলাটি শ্বেতাকে সই করানোর পর বারান্দায় গিয়ে ফর্মটা এগিয়ে ধরে নিরঞ্জনের সামনে। নিরঞ্জন তাকিয়ে আছে প্যাট প্যাট করে। পাথুরে স্তব্ধ দৃষ্টিতে খোদিত অন্তহীন তারা-খসা প্রশ্ন।

স্বপ্নবীজ

সুরঞ্জন প্রামাণিক

আবীরের হাতে কাগজের ভাঁজগুলো খুলে যাচ্ছে। গোপা নিথর। শ্বাসরুদ্ধ মুহূর্ত গুনছে। যেন তীব্র একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। আর তাতে জন্ম হবে আশ্চর্য এক নদীর কিংবা দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উঠে আসবে তুমুল হাওয়া। আবার এমনও হতে পারে এখনই জেগে উঠবে পূর্ণিমা চাঁদ। অথবা এ রকমই অন্য কিছু, যা আজও তার কল্পনার বাইরে।

গোপা লক্ষ্য করেছে আবীর একবারও তার মুখের দিকে তাকায়নি। অথচ মিনিট দুই আগেও মুহূর্ত কয়েক পর পর গোপার দৃষ্টি ছুটছিল রাস্তা বরাবর। রাস্তার পূবদিকে রেলকোয়ার্টার সংলগ্ন একখণ্ড বেড়া ঘেরা জমি—সেই বেড়ায় একটা সরু মন্দার একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়েছে—বারবার সেই ফুলে আটকে যাচ্ছিল দৃষ্টি আর জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঘড়ি দেখছিল—সে চাইছিল অন্তত পাঁচটা মিনিট আগে আসুক আবীর, একবার তার মুখের দিকে তাকাক আগে যেমন তাকাত, হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীতে যেমন সাড়া পড়ে যেত—তেমন হোক—

কাগজটা ভাঁজ করতে করতে আবীর বলল, 'একেবারে আনাড়ী।' বাড়িয়ে ধরা কাগজটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কথা ভাবল গোপা। কিন্তু সীনক্রিয়েট হবার ভয়ে ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিল। আরও দু'একটা কী সব বলল আবীর। মাথায় ঢুকল না। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা গোপাকে ঘিরে ফেলেছে। আবীর মাস্টারমশাই ঢঙে বলল, 'শব্দচয়ন আর ছন্দে গোলমাল আছে।' গোপা বোকা ছাত্রীর মতো কেবল শুনল কথাটা।

আবীরের সঙ্গে দেখা হয় এখন খুব কম সময়ের জন্য। সকাল আটটা পর্যন্ত আবীরের টিউশনি থাকে। তারপর সাড়ে আটটায়। আটটা তেইশে গোপার ট্রেন। পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে প্রায়ই আবীর পৌঁছে যায়। প্লাটফর্মে উঠে তাকে না-দেখলে গোপা টিকিট ঘরের সামনে ওই চাতালটায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখন বুকের ভেতর 'চোখ গেলো' পাখির ডাকাডাকি—চোখে প্রায় জল এসে গেছিল, তখনই ধুলো উড়িয়ে ট্রেন ঢুকল।

ফেরার পথে তিনদিন দেখা না-হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওই তিনদিন আবীরের পড়ানো থাকে সন্ধেবেলা। আর দুদিন অনেকটা সময় পাওয়া যায়। এক-একদিন আবীর তাকে প্রায় বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। সবাই দেখছে। জানে। তবু আবীর কেন যে তাদের বাড়িতে যেতে চায় না! ইদানিং গোপার মনে হচ্ছে, এই যে তাদের দেখা হওয়া—একটা অভ্যাস কিংবা ভদ্রতারক্ষা করে চলা—কোন কথা নেই, গল্প নেই। কথা নাকি লতার মতো—একদিন গোপা বলেছিল, 'আমাদের কথারা আর বাড়ে না কেন?'

আবীর বলেছিল, 'অপুষ্টি।'

—'ইয়ার্কি করছ?'

—'কি বলব আর!'

—'সব কথা ফুরিয়ে গেল।'

—'খুব কি কথা ছিল কখনো?'

আর কথা এগোয়নি। তারপর চলতে চলতে যত কথা সব নিজের সঙ্গে। মনে মনে আবীরের সঙ্গেও—

হয়ত ছিল না। কিন্তু এতটা কি নীরব ছিল? কথা থাক না-থাক, টুকরো-টুকরো কবিতা ছিল। সেই কবিতাকথায় তোমার মন বুঝতাম। খুব কি ভুল বুঝেছি আবীর? ভুল বুঝলে কি এতটা পথ একসঙ্গে হাঁটা যেত!

এরকম অন্তর্গত সংলাপে নৈঃশব্দ্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই কদিন আগে গোপা বলেছিল, 'প্রেম গভীর হলে, সত্যিই বোধহয়, মুখে কোন কথা থাকে না।' আবীর ওই কথায় কোন সাড়া দেয়নি। অথচ গোপা আশা করেছিল, আবীর গেয়ে উঠবে, 'যদি কাগজে লেখো নাম—'

এভাবেই কি 'প্রেম ধীরে মুছে যায়।' তারপর আমরা কেউ আর খুঁজব না কাউকে।

আবীর কবিতা বোঝে। খুব ভালো বোঝে। কবিতা নির্মাণের কোন ব্যাকরণ গোপা জানে না। আবীরের মুখে কবিতার টুকরো শুনে, তার কাছ থেকে দু-একটা কবিতার বই উপহার পেয়ে কবে একদিন নিজের বলা কথা কবিতার মতো করে লিখেছিল। আবীর বলেছিল, 'তুমি কবিতা লেখো!' তার চোখ মুখ থেকে বিচ্ছুরিত আলো ছড়িয়ে পড়ছিল গোপার হৃৎপিণ্ডে। গোপা বলেছিল, 'এটাই প্রথম।' ততক্ষণে আবীর একটা লাইন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে—তুমি আছ তাই অহং আমার ভঙ্গিল পর্বত শিখর—মুগ্ধ দৃষ্টিতে গোপাকে দেখছিল আবীর—কতদিন ওই দৃষ্টিতে আর দেখেনি— গোপা বলেছিল, 'কবিতা লিখব বলে কিন্তু লিখিনি।' আবীর বলেছিল, 'সে কী আর বুঝিনি!'

অথচ আবীর, আজ বুঝলে না—কবিতা না-হয় না-ই হল, আমার নির্লজ্জ হওয়াটা বুঝলে না!

একরাশ লজ্জা আর অপমান গোপাকে জাপটে ধরল।

আবীরের সঙ্গে গোপার আলাপ চ্যাটার্জী কমার্শিয়াল কলেজে। আবীরকে একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল—প্রথম দর্শনে ওকে যে-কেউ বাফটাফ ভাববে। দাড়ি এমনভাবে রাখে দেখে মনে হয় কয়েকদিন শেভ করায়নি। চুল এলোমেলো। কার্লি বলে ভ্রম হয়। উন্নতনাসা। চোখ দুটো গর্তে ঢোকানো। তাতে কী এক রহস্যময় গভীরতার আভাস—এটা অবশ্য গোপা পরে আবিষ্কার করেছিল, এক বৃষ্টির দিনে—ঝিরঝিব বৃষ্টিতে রুমাল মাথায় বিছিয়ে আবীর হাঁটছিল। স্টেশন থেকে চ্যাটার্জী কমার্শিয়ালেব দূরত্ব সাত-আট মিনিট। যেতে যেতে একেবারে ভিজে যাবে—এরকম ভেবে গোপা দ্রুত পা চালিয়ে ওর পাশে গিয়ে বলেছিল, 'ছাতাটা ধরুন।' সেই প্রথম দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্য। সরাসরি গোপার চোখে। অদ্ভুত এক আলো জ্বলে উঠেছিল গোপার বুকের মধ্যে—সেই আলো কল্পনায়, আজও গোপার চোখের সামনে যিশুর হৃৎপিণ্ডে দীপ শিখার মতো একটা ছবি ভেসে ওঠে—আবীর খুব অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি আমি—

টাইপ করতে কবতে কখন আঙুলগুলো থেমে গেছিল, এক হাত অন্যমনস্ক পড়ে আছে কোলের ওপর, অন্যটা টেবিলে—এই অফিসে টাইপিস্টের পরীক্ষা দেবার সময় আবীর সঙ্গে এসেছিল, পরীক্ষাব পরে ভিক্টোবিয়া—আবীরের পাশে নিবিড় বসে থাকতে থাকতে গুন গুন করে উঠেছিল,—দূর নক্ষত্রের দ্যুতি দেখেছি/তোমার দুই চোখে—ভেবেছিল তার নতুন লাইন পাওয়ার আনন্দ আবীরকেও ছুঁয়ে যাবে কিন্তু সে ছিল অন্যমনস্ক—ফেরার পথে কী এক মনখারাপের মধ্য থেকে পরেব লাইনগুলো উঠে এসেছিল সাবলীল কিংবা ট্রেনের জানলা দিয়ে আসা হু হু হাওয়া দিয়ে গেছিল,—আলো জ্বললই যদি/ছায়া নেই কেন/দৃশ্যশূন্য কেন এই পর্যটন—একটা ঝড়ো দীর্ঘশ্বাস ঝরতেই আঙুলগুলো আবার অক্ষরের ওপর নাচতে থাকল।

কাজটা শেষ করে অফিসারের ঘরে ঢুকল গোপা। ফাইলটা রেখে বেরিয়ে আসছিল, সাহেবের ডাকে ফিরে তাকাল। বসার নির্দেশ ইশারায়। বসল। সাহেব ম্যাটারটা দেখছে।

—'উঁহু! মিস রায়—' টাইপ করা কাগজটা হাতে ধরিয়ে দিল, 'বি কেয়ার ফুল!'

—'সরি। সরি স্যার।'

টেবিলে ফিরে গোপা দেখল, পুরো দুটো লাইন সি-কপি হয়ে গেছে। পুরোটাই আবার টাইপ করতে হবে। অনেক্ষণ সে চুপচাপ বসে থাকল। মাথাটাকে কবিতা শূন্য করতে চাইছে।

কবিতা মানে আমার আনন্দ, আমাব বিষাদ, কবিতা মানে আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বপ্ন—আর সবেতে ছড়িয়ে আছ, জড়িয়ে আছ আবীর, তুমি— কেবল তুমি—কবিতা গোপাকে আরও জাপটে ধরছে।

শিমূল মন্দার ফুটেছে খুব কাঞ্চন
ফুলে ফুলে মধু গুঞ্জন

শিমূল যখন ফোটে, মন্দারের পাপড়িকে তখন মনে হয় আগুনের শিখা—এই মনে হওয়াটা আবীরের কাছ থেকে পাওয়া—কমার্শিয়াল কলেজে যাওয়ার পথে একটা পুরনো মন্দার গাছ ছিল, সেবার নানান কাণ্ড করে, শরীরের নানা জায়গায় বিন্দু বিন্দু বক্ত ফুটিয়ে একটা মঞ্জরী পেড়ে এনে আবার বলেছিল, 'দেখেছ, পাপড়িগুলো যেন আগুনের শিখা।' গোপা আগুনেব শিখা-ই দেখেছিল। ওই ফুল দেখলে আবীরের বুকের মধ্যে নাকি মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সেদিন দুটো ফুল গোপার খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল আবীর। তো, গোপারও কী যেন হয়—যদি ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়া যেত কিংবা ওই আগুনে আবাব ওপব দুজনে শুয়ে থাকা যেত—এবকম ভাবনা থেকে লাইন দুটো লিখেছিল, বসন্ত বোঝাতে—এবকমই মন্দাব ফোটা সময়ে, আবীর তাকে প্রথম আদর কবেছিল—সেই প্রথম কোন পুরষের স্পর্শ—অকারণে গোপা বুকের আঁচল টানল—এমন সময়ে সেই আবীর নীবব। যেন হেমন্তেব বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে—ওই মনে হওয়া বোঝাতে সে লিখেছে

তুব কথা
শীত ঘুমে চলে গেছ আজ

কদিন আগে গোপা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আবীর, আমি কোন দোষ করিনি তো।'

—'এরকম ভাবছ কেন?'

—'এত কোল্ড বিহেভ করছ!'

—'খুব উষ্ণ ব্যবহার করতাম নাকি কখনো?'

গোপা তখন মনে করার চেষ্টা করছিল, শেষ কবে আবীর তার হাত ধরেছিল! মনে পড়ছিল, তার চোখের পাতায় আবীরের ঠোঁট। মনে পড়ছিল, আবীরের কথা 'নিদাঘ রাত্রে আমার খুব হাওয়া হতে ইচ্ছে করে—যদি হতে পারতাম, ঢুকে পড়তাম তোমার ঘরে, ঝড় হয়ে ভাসাতাম তোমাকে—' আর বুঝি হাওয়া হতে ইচ্ছে করে না আবীর!

কতদিন কোন স্বপ্ন দেখিনি। তোমার ব্যবহারই তো আমাকে স্বপ্ন দেখাত। চাকরি পাওয়ার প্রথমদিকে দেখা একটা স্বপ্ন মাঝেমধ্যে গোপার মনে পড়ে; অফিসে বেরোনোর আগমুহূর্ত। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলছে। কী যেন কী একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। আবীরের বাড়ানো হাতে রুমাল—রুমালটা নিতে নিতে গোপা মুখটা বাড়িয়ে দিল। আবীর তার কপালে, চোখে চুমু এঁকে দিচ্ছে...স্বপন যদি মধুর এমন, কেন এত স্বল্পায়ু ঘুম ভাঙার পর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেছিল, কল্পনায় পরের অংশটুকু দেখতে চেয়েছিল—আবীরদের বাড়িতে আজও যাওয়া হয়নি, বাড়িঘর সম্পর্কে কোন কথাও বলেনি আবীর, তবু উঠোন তো থাকবে একটা—উঠেনের শেষ সীমায় গিয়ে ফিরে তাকাবে গোপা, হাত তুলবে, আবীরও হাসি মুখে—অথবা, এরকম হতে পারে, আবীর রিক্সাস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তার সঙ্গে যাবে—সকাল থেকে গোপার মনে হচ্ছিল, স্বপ্নকথা আবীরকে না-জানালে সুখানুভূতির প্রকৃত রূপ যেন অধরা থেকে যাচ্ছে সেদিন গোপার আগে আবীর পৌঁছেছিল। তার চোখে কোন পথচাওয়া ছিল না। আত্মমগ্ন ছিল—এক সময়, প্রতীক্ষার যে-রঙ আবীরের চোখে ফুটে উঠত, এখন তা বিবর্ণ, হয়ত গোপারও, তবু সেদিন আবীরকে দেখা মাত্রই ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল, একটু ছুটে যাওয়া ফুটেও উঠেছিল আঁচলে। তখন সিগন্যাল সবুজ। একটু সময় না-নিয়ে কথাটা বললে, সেই রূপ না-ও ফুটে উঠতে পারে—এরকম ভেবে, তখন সে আবীরের খুব কাছে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তার ঠোঁট, চোখ, চিবুক দেখতে-দেখতে নিজের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে আবেগকে সংহত করে বলেছিল, 'একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছে।' আবীরের চোখে কোন আগ্রহ ফুটে উঠল-কি-উঠল না সে খেয়াল না করে গোপা বলেছিল, 'ফিরে বলব।'

স্বপ্ন কথাটা শোনার পর অনেকক্ষণ আবীর কোন কথা বলেনি।

গোপা তার প্রতিক্রিয়া জানতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল?'

—'ভাবছি—তুমি খুব রোমান্টিক।'

—'আহা। তুমি যেন কম।'

এসব মনে পড়লে, বীজের মধ্যে প্রাণের কোলাহলের মতো স্বপ্নের অস্তিত্ব তবুও টের পায় গোপা। আর হয়ত সেকারণে অদ্ভুত এক শব্দ পেয়ে গেছিল। স্বপ্নবীজ। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের শর্তগুলো মনে পড়ছিল আর লিখেছিল।

স্বপ্নবীজ আলো আর ওম যাচে
নিজেকে গালি দিল, নির্লজ্জ বেহায়া। তবু পরের লাইন
চুপকথা, কথা বলো। কথা বলো চুপকথা!

নিজের মনে বলতে বলতে গোপা টের পেল দুচোখ ভরে উঠছে জলে। শেষ লাইনটাও আটকে গেল গলায়।

দুই

'তবু কথা/শীত ঘুমে চলে গেছ আজ'—লাইনটা মাথায় নিয়ে হাঁটছিল আবীর—'কথা' মানে আমি আবীর রায়চৌধুরি—বসন্তেও আমার রক্তে প্রেম জাগছে না—আমি শীতল শোনিত গোত্রভুক্ত কোন প্রাণী হয়ে যাচ্ছি—এরকম ভেবে গোপা হয়ত লেখেনি, তবু আবীর ভাবছে। এই তো কদিন আগে দোলপূর্ণিমা গেল, আবীরের একবারও মনে হয়নি গোপাকে আবীর মাখাতে। এর আগের বছরেও না। অথচ তার আগে আবীর ভর্তি তার দুহাত ভরা জ্যোৎস্নায় গোপার মুখ নিয়ে খেলেছে খুব—হয়ত সেসব স্মৃতি মনে করেই গোপা লিখেছে স্বপ্ন বীজ আলো আর ওম যাচে।

নিজেকে আর প্রবল পুরুষ ভাবতে পারছি না। প্রশস্ত কাঁধ, চওড়া বুক, শক্ত কব্জি—এসব নেই আমার। নারীর জন্য দৃঢ় ছাদের আশ্বাস, সুরক্ষার অঙ্গীকার—এসব না থাকলে পুরুষ হয়ে ওঠা যায় না। যে স্বপ্নকথা একদিন আমাকে জানিয়েছিলে, তুমি জানো না গোপা, কতখানি অপমান লুকিয়েছিল তাতে। তবু, তোমার স্বপ্নের সঙ্গে নিজেকে মেলাতেও চেয়েছি—তোমার ফেরার পথ চেয়ে আছি, হয়ত তখনও আমি টিউশনি করব, হয়ত বাড়িতেই পড়াবো—ক্লান্ত তুমি ঘরে ঢুকেই কাঁধের ব্যাগটা কোথাও ফেলে হাত পা ছেড়ে টানটান—আমি তখন ফ্যানের সুইচ অন করে দেব, এক গ্লাস জল নিয়ে আসব, চায়ের জল চাপাব—তখন কী কথা হবে আমাদের? কতবার ভেবেছি ওই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

অথবা, ভোর—সেই যে সেবার দীঘা, তোমরা মেয়েরা এক ঘরে আর তোমার পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে আমি অন্যঘরে—তখন ভোর, তোমাকে ডাকছি, তুমি দরজা খুললে—ঘুম আর স্বপ্নমাখা তোমার চোখ, মুখের দুপাশ ঢেকে ফেলা এলোচুল—কী যে দেখলাম ভোরের আলোমাখা ওই মুখে—পরে ভেবে দেখেছি, ওরকম রূপ জীবনে বোধহয় একবারই দেখা যায়, আর তার রেশ থেকে যায় আমৃত্যু—তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে আছি, তুমি আছ স্বপ্নঘোরে, ভোরের আলো যেমন যেমন বদলে যাচ্ছে তেমন তেমন রূপান্তর তোমার মুখে—তোমাকে না-জাগিয়ে আমি উঠি, চা করি, তারপর তোমাকে ডাকি—এসব কল্পনা করতে একটুও অসুবিধা হয় না—রোজগারে বের না-হওয়া নারীর যা-যা কাজ, আমি করার কথা ভাবি—ভাবনাটা ঢুকিয়েছে আমার পিসতুতো বোন, সে একটা স্কুলে পড়ায়—তাকে কে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল বেকার ছেলেকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি আছে কি না, সে বলেছিল, 'আপত্তির কী আছে, যদি সে ঘর সামলায়।' আমি ওই ঘর সামলানোর কথা ভাবি।

আব ওরকম ভাবনায় মাঝে মধ্যে দুঃস্বপ্ন, দুটো রক্তাক্ত আঙুল—

দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়তেই আবীর ককিয়ে উঠল, 'ওঃ ঈশ্বর! গোপাকে রক্ষা করো!' কোথাও একটা ভালো স্বপ্ন নেই।

'স্বপ্নছাড়া কীভাবে বাঁচে সভ্যতা!'

আবীরের মনে হচ্ছে শেষ লাইনটা খুবই সুন্দর। বারবার বলা যায়। তবু, তার মনে হচ্ছে, লাইনটা আরোপিত। কথা বলার জন্য আর্তি জানানো লাইনটার পর ফাঁক— তারপরে এক লাইনের ওই স্তবক—ওই ফাঁক যেন দীর্ঘ গভীর খাদ—ওটা পেরিয়ে কিছুতেই শেষ লাইনে পৌঁছতে পারছে না আবীর।

দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে নির্দিষ্ট বেঞ্চটাতে বসল—কেন এই আসা, এরকম বসে থাকা? কোন কল্পনা নেই। জানানোর মতো কোন গল্প নেই। কিছু জানা বা শোনার প্রত্যাশা নেই। গোপা ফিরলে, ওর ক্লান্তি স্পষ্ট টের পায় আবীর। ক্লান্তির ছায়া সরিয়ে দেয়ার মতো কোন একটা উপায় সে খোঁজে, খুঁজতে খুঁজতে নীরবে পথ হাঁটা, একে অন্যের দীর্ঘশ্বাস শোনা। কখনো বা নিতান্ত মামুলি দু একটা কথা। অথচ কথা থাকেই, গত পরশু যেমন গোপাকে মনে মনে বলছিল আবীর,—সকালে তোমাকে দেখতেই মনে হল তুলোফলের মতো তুমি ফেটে আছ—আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল ঝড় হতে—হব ঝড়! আর পরক্ষণেই নিজের সঙ্গে কথা,—একটা মানুষ তার যোগ্যতা জানা সত্ত্বেও কেন যে আকাঙ্খার সীমা বোঝে না!

ইচ্ছেগুলো তীব্র হয়ে উঠলে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় আবীর। একটিও কবিতা নেই যা থেকে দু-একটা লাইন গোপাকে শোনাতে পারে কিংবা নিজেকে।

তিন

আজ কথা ছিল। এখনো শুরু করা গেল না। গোপা একটা কথা বলেছিল, 'সাইকেল আনোনি?' সাইকেল যে আনেনি, সে-তো দেখতে পাচ্ছ—কেবল কথার কথা। আবীর বলেছিল, 'না, ভাই নিয়ে বেরিয়েছে—' তারপর মিনিট দুই হাঁটা হল।

গোপার খুব ইচ্ছে করছে আবীরের হাত ধরতে। আশা করছিল, আবীর তার হাত ধরুক, যেমন ধরত—তাহলেই কথা শুরু হয়ে যাবে।

এক সময় আবীর বলল, 'কবিতাটা নিয়ে ভাবলাম বুঝলে!'

একটু যেন দখিন হাওয়া। নক্ষত্রেরা আরও উজ্জ্বল। তবু গোপা চুপ থাকল। আবীর কোন সাড়া না পেয়ে বলল, 'শেষ লাইনটা মনে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আসেনি।'

গোপা বলল, 'না। আমি তা মনে করছি না।'

আবীর চুপ হয়ে গেল।

অথচ গোপা চাইছিল প্রতিক্রিয়া। মুহূর্ত কয়েক পর সে বলল, 'চলো, দেশপ্রিয়তে একটু বসি। খিদেও পেয়েছে।'

কোণের দিকে একটা টেবিলে দুজন মুখোমুখি। আবীরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে গোপা মনে মনে বলল,—তোমাকে ছাড়া এখন আর নিজেকে ভাবতে পারি না অথচ—আবীরকে শোনালো, 'আমাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে—এটা কি বুঝতে পারছ আবীব?'

আবীরের মনে পড়ল, ফাঁক। বলল, 'পারছি।'

—'কারণ জানো?'

আবীর মাথা নাড়ল।

—'কাঁচা বয়সের আবেগ থেকে আমরা কিন্তু মেলামেশা শুরু করিনি—তাই না? তখন আমরা যথেষ্ট অ্যাডাল্ট, পুরনো প্রবাদ মতো আমার তো বুড়ি হয়ে যাওয়ার কথা—তবু, আমার মনে হচ্ছে, আমরা কেউ কাউকে ঠিকভাবে জানিনি।'

—'হতে পারে।'

—'শোন আবীর, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না-হয়, যদি ভালোবাসতে না-ই পারো, অভ্যাসের দাসত্ব করো না।'

আবীরের বসার ভঙ্গিটি মুহূর্তের জন্য ভেঙে গেল।

—'জানি না ভালোবাসা বলতে তুমি কী বোঝ—আমি বুঝি পূর্ণ হাওয়া—আমি মনে করি নারী-পুরুষের সম্মিলিত মেধা-মননে সুন্দর একটা পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব—নারী রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, নরকের দ্বার—এই ধারণা যেন আমাতে না-বর্তায়, ওই বিষয়ে আমি সচেতন থাকার চেষ্টা করি। প্রেমহীন যৌনতা আমার পছন্দ নয়। বীরত্বের 'ধারণাকে আমি পাশবিক মনে করি।'

—'এসব কথা কেন উঠছে?'

—'বুঝতে পারছ না!' গোপা নিজের স্বরে নিজেই চমকে উঠল। মাঝে একটা টেবিল পর দুজন বসে ছিল, তারাও ফিরে তাকিয়েছে। গোপা সঙ্কোচ বোধ করল। এই সময়ে অর্ডার সার্ভ করে গেল ওয়েটার। গোপা বলল, 'সমস্ত কবিতার সঙ্গে শেষ লাইনটার সংযোগ বুঝতে আমাদের পরস্পরকে জানা জরুরি—'

আবীর সেই খাদের সামনে।

—'নিজেকে জানানোর চেষ্টা করেছিলাম।' হতাশ ভঙ্গিতে বলল গোপা। আবীর চুপ। প্লেটে পকোড়া। কফি। খিদেটা যেন হঠাৎ মরে গেছে গোপার। বাঁ হাতে চামচ তুলে নিল গোপা—কাপে টুংটাং শব্দ, কফি ঘুরছে—যেন মন্থন—

গোপার আঙুলগুলো দেখছে আবীর—আঙুলগুলোকে খুব যত্নে রাখে গোপা—এরকম আঙুলকেই বোধ হয় চাপাকলির সঙ্গে তুলনা করা হয়—দেখতে দেখতে আবীর স্পষ্ট দেখতে পেল ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা রক্তাক্ত—অবচেতনের স্তর ভেদ করে উঠে আসছে গোপার ভেঙে পড়া শোক—ওই আঙুল আর অক্ষরের ওপর নাচবে না—বৃত্তিচ্যুত হয়ে যাবে গোপা—ভরসা হাত গোপার মাথায়, সান্ত্বনা জানাচ্ছে আবীর—

ওই দুঃস্বপ্নের পর থেকেই কেন যেন আবীর নিজেকে ভিলেন মনে করে হাঁটতে হাঁটতে হাত ধরার ইচ্ছে হলেও, সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে—হাত ধরলে যদি আঙুলগুলো রক্তাক্ত হয়ে যায়,—'উঃ!'

—'কী হল!'

আবীর মুখ তুলে তাকাল। গোপার চোখে চোখ রেখে বলল, 'নারীর জন্য আমি যুদ্ধ চাই। অথচ আমি এক নিধিরাম।'

—'সে নারী যদি আমি-ই হই, যুদ্ধের কারণ হব না।'

—'আমি তোমাকে টোপ করতে চাই। অথচ আমার কোন মৃগয়াভূমি নেই।' আবীর কফিতে চুমুক দিল।

পুরনো জীবনবোধেব অবশেষ বয়ে বেড়ানো একটা মানুষের ক্লান্ত বিবর্ণ অস্তিত্বের ভাঙচুর টের পেল গোপা। তাব দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মায়া, মমতা মাখিয়ে বলল, 'সংযোগ বুঝতে পারছ?'

আবীর আবারও সেই খাদের সামনে।

শীতঘুম থেকে সে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

—'চুপকথা। কথা বলো!'

আবীবেব চোখের সামনে এখনো সেই আঙুল দুটো।

—'বুঝতে পারছ? একটাই তো জীবন আবীর, তা-ও খুব ছোট—একটা এক্সপেরিমেন্টেব মধ্য দিয়ে না-হয় বাঁচলাম আমরা—'

খাদের ওপব একটা সেতু জেগে উঠছে—ছাযাছায়া।

কথাগুলো বলাব পব, সেই সকালের মতো শ্বাসরুদ্ধ মুহূর্ত গুনছে গোপা।

দুর্বল সেতুর ওপব আবীব, সেতুটা দুলছে। কী এক আর্তি মিশিযে সে বলল, 'থেমো না গোপা, বলে যাও, আরও বলো—'

স্বপ্নবীজের মধ্যে জেগে উঠছে কোলাহল।

আলোক সমুদ্দুর

দেবনারায়ণ চক্রবর্তী

একটু আগেই নাকি অমরাবতী নিজের চেম্বারে ছিল। একমাত্র এই অফিসের বড় কর্তার সঙ্গে মিটিং ছাড়া তাকে বাইরে বেরুতে হয়না। সে ডাকলে অফিসের যে কেউ ফাইল-পত্র নিয়ে তার চেম্বারে ছুটে আসতে বাধ্য। তবু ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের—আমি যখনই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসি, বেশির ভাগ দিনই অমরাবতীকে চেম্বারে পাইনা। ওর পিয়ন, সেক্রেটারী সবাই বলবে, ম্যাডাম এই তো ছিলেন। একটু বেরিয়েছেন।

টেলিফোনে রোজই অমরাবতীর সঙ্গে আমার কথা হয়। যেদিন ওকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে, সেদিনই ছুটে আসি। এই দুপুরে—বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। যেন লু বইছে। কলকাতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। এখন কেউ ঠাণ্ডা ঘর ছেড়ে বেরোয়! আমি তো ছুটে আসি প্রাণের টানে।

আমি ছাড়া অমরাবতীর এই দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ কোথাও নেই। দূর সম্পর্কের কয়েকজন তুতো-ভাই আছে বটে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিক সেদিক। কিন্তু কেউই অমরাবতীর খোঁজ-খবর তেমন রাখে না।

ওর সঙ্গে আমার বিয়েটা আগামী মাসের পনের-ষোল তারিখ নাগাদ হতে পাবে।

অমরাবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় সে অনেক অনন্ত দিনের।

শ্যামল দীঘল—পাঁচ-আট হবে বোধহয়। তন্বী নয়। চেহারাটা একটু ভারির দিকে। কবে কোথায় কোন বন্ধুর মাধ্যমে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে আমার মনে নেই। শুধু স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে—খুব দামী একখানা শাড়ি পরেছিল। এলো-মেলো আনস্মার্ট। মাথার চুল আশ্চর্য রকমের কার্লড। বলতে গেলে প্রায় ক্যারিবিয়ানদের মতো। সূচাল চিবুক। চোখ দুটো একটু ছোট হলেও—এত নরম চাউনি যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সে মুগ্ধতার কথা আমি কোনদিন অমরাবতীকে বলতে পারিনি। অনেক রিহার্সাল দিয়ে, অনেক আয়োজন করে, বন্ধুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে, নেশার ঝোঁকে, সিনেমা হলে পাশাপাশি অন্ধকারে বসে।

কোন অনুষ্ঠানে আমাকে দেখলেই বন্ধুদের বৌরা এ ওর গায়ে খোঁচা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। শতদ্রুর বৌ মেঘা-টা মহা ফাজিল, সে অনেক রকম ভাবে আমাকে খোঁচা দিয়ে না পেরে শেষে হাল ছেড়ে—এক অনুষ্ঠানে বলেই বসল—অমরাবতী ছাড়া কী আর দুনিয়ায় কাউকেই তোমার চোখে পড়ে না দিব্যেন্দু। আমরা কী এতই কুৎসিৎ!

প্রথম যৌবনে আমি অনেক বন্ধুর প্রেমপত্র লিখে দিয়েছি, কিন্তু নিজের বেলায়—। আমার বন্ধুরা অনেকে বলেছে, আমরা বলছি অমরাবতীকে। আমিই রাজি হইনি। অথচ কী যে অস্থির হয়ে পড়ি ওকে কয়েকটা দিন না দেখলে। টেলিফোনে কথা না বললে।

শেষে এক বন্ধুর মাধ্যমে অমরাবতীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাই।

ভয়ে কটা দিন বুকের মধ্যে দুরু দুরু—। বার বার বন্ধুটিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছি, অমরাবতী বিয়ের প্রস্তাবে কেমন করে রিঅ্যাক্ট করল।

আমি দিন পনের ওর সঙ্গে দেখা করা তো দূরেব কথা, ফোন করে ওর গলা ভেসে এলেই লাইন কেটে দিয়েছি।

শেষে সাহস করে একদিন বিকেলে ছুটির আগে ওর অফিসে গিয়ে হাজির হই। ব্যাপারটার একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া উচিত। নিজের সব কাজ পণ্ড হচ্ছিল।

ও আমাকে দেখে খুব খানিক হাসল। পবিত্র নির্মল হাসি। আমার সাহস বেড়ে যায়। বলি চল কোথাও গিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে। যেন অমরাবতীর সর্বসত্ত্ব—আমার হাতের মুঠোয়।

এমন অনেক দিন অফিস ছুটির পর, আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি। কথা বলা মানে নতুন রিলিজ হওয়া কোন ছবি, নতুন পড়া কোন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা। কোন কোন দিন পকেটে থাকে কোন নাটকের টিকিট। আজকের কথা অবশ্য আলাদা। তখনই অমরাবতীর হাতটা খুব ছুঁতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ওর টেবিলটা এত বড়, তাই ভাবলাম—।

সেদিনই নতুন মডেলের একটা গাড়ি অফিস থেকে উপহার দিয়েছে। অন্যান্য দিন ও পিছনেব সিটে গিয়ে বসে। আজ অমরাবতী সামনে আমার পাশে এসে বসল।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিলাম কোন কথার ছলে অমরাবতীর হাত ছোঁয়া যায়। শেষে মাথায় এল, পার্কসার্কাস ময়দানে প্রতিবছরের মতো এবারও সার্কাস পার্টি এসেছে। সার্কাস দেখতে গেলে হয়। বামন ক্লাউনগুলো রণপা লাগিয়ে কেমন হিং বিং করে স্টেজের ওপর হেঁটে বেড়ায়, আমার খুব দেখতে ভালো লাগে। সেদিন ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে অমরাবতীও খুব হাসছিল মেঘের আড়াল সরিয়ে। আমি সেই ফাঁকে অমরাবতীর হাত ছুঁয়ে দিয়েছিলাম।

—আপনি স্যার ম্যাডামের চেম্বারে গিয়ে বসতে পারেন। মহিলা কণ্ঠস্বং চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, অমরাবতীর সেক্রেটারী।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখানে দাঁড়িয়ে গরমে বোর হবার চেয়ে—,

যাব বলে এক পা বাড়িয়েছি সবে, তখনই দেখা গেল দূরে সে ফিরছে। অন্যমনস্ক। কেমন একটা ঘোবের মধ্যে আছে যেন। মুখখানা ঘামে চক্ চক্ করছে।

অমরাবতীকে—দেখে খুব মায়া হল আমাব। খুব বকাবকি করব ভেবেছিলাম, কিন্তু মুহূর্তে আমার মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

ও মুখ তুলে আমাকে দেখে ম্লান হাসল।

জিজ্ঞেস করি,—কোথায় গিয়েছিলে এই রোদের মধ্যে?

ও সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—কতক্ষণ—হল এসেছ?

অমরাবতীকে অনুসরণ করে ওর চেম্বারে—এসে বসলাম।

ঠাণ্ডা পানীয় গলায় ঢালছি, এমন সময় ওর একটা ফোন এল। আমাদের আলোচনায়

ছেদ পড়ল। আমাদের বিয়ের আর মাত্র মাস খানেক দেরী। কিছুই গোছানো হয়নি। কয়েকটা হোটেলের মেনু কার্ড নিয়ে বসে ঠিক করছিলাম—ওর আমার পছন্দের মেনু। সেই অনুযায়ী অর্ডার দিয়ে—। সম্ভাব্য দিনটির কদিন আগে কোন হোটেল বুক করতে হবে? বন্ধুরা কে কে থাকবে? দু-তরফের আত্মীয়-স্বজন মিলে মোট কজন হচ্ছে? দুজনের অফিসের কারা কারা নিমন্ত্রিতের তালিকায় থাকবে—এসব নিয়েই অমরাবতীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল।

ও ফোনে কথা বলছে, আমি ওর ঘরে চোখ বোলাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছবিটায় চোখ পড়তে, বুকের মধ্যেটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কম্পিউটারের টেবিলের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান একটা ক্যানভাস। সদ্য সদ্যই মনে হচ্ছে আঁকা ছবিটা। গত সপ্তায় এসেছিলাম, কই এ ছবিতো দেখিনি। খুব বলিষ্ঠ একখানা হাত, বাহু থেকে ছিন্ন করা—রক্তের ধারা নেমেছে সারা—ক্যানভাস জুড়ে। ছবির হাতের আঙুলগুলোয়—দগ্‌দগে বীভৎস ঘা। তেল রঙের আঁকা ছবি। তখনই কানে ছিটকে এল, অমরাবতী ফোনে বলছে—হ্যাঁ বলছিতো যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ছবিটা বিক্রি করার ব্যবস্থা করছি। কত কী দাম পাব তা তো বলতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। পরে ফোন করিস তুই। ঠিক আছে রাখলাম। অমরাবতী টেলিফোন নামিয়ে রেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্লান হাসল আমার দিকে চেয়ে।

ছবিটা আমায় এত মুগ্ধ করেছে, আমি ওর হাসিতে সাড়া দিতে পারলাম না। ওর মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি।

ও বলল—তোমার খুব ভালো লেগেছে ছবিটা, না?

আমি ঘোর কাটিয়ে উঠে বলি—আদিত্যের ছবি না?

—হ্যাঁ।

—কি করে সে এখন?

—একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজিং এজেন্সিতে হোর্ডিং আঁকার চাকরি করে। ভোরবেলা বেরিয়ে রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ছবি আঁকে। ক্রিয়েটিভ কাজ করার সময় তার ঐ টুকুই। ওর মা খুব অসুস্থ। চিকিৎসা করানোর টাকা নেই। তাই আজ ছবিটা এনে আমায় দিয়ে গেল। ছবিটা বিক্রি করে যদি কিছু টাকা হয়, তাহলে। আমি বলি,—কলকাতায় তো শিল্পীদের অনেক গ্রুপ আছে, কোন গ্রুপের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দাও। চল আজই ছবিটা নিয়ে এ্যাকাডেমীতে যাই। এখন নিশ্চয়ই কোন না কোন গ্রুপের ছবির প্রদর্শন হচ্ছে।

অমরাবতী বলে—যাকগে সে পরে হবে। তোমার কোন বন্ধুকে বোল তো যদি ছবিটা কেনে।

আমি বলি,—ঠিক আছে, আমিই না হয় ছবিটা কিনে নেব। আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে রাখব।

—নতুন ফ্ল্যাট মানে!

—সে কী, তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে! বিয়ের পর নতুন সংসার গোছাব বলে সাড়ে নশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বুক করে রেখেছি। চল, একটা ছুটির দিন

দেখিয়ে নিয়ে আসব। তাছাড়া আমাকে ফোনও করেছিল প্রমোটার। ড্রাইরুম, বেডরুম, কিচেন কোথায় কি হবে, তোমার পছন্দ মতো বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। চল তুমি কবে যাবে? কত জরুরী প্রোগ্রাম করার থাকে, মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে আসি। এখানে এলে তোমাকে না পেলেই মেজাজটা বিগড়ে গিয়ে সব ভুলে যাই।

অমরাবতী নিস্পৃহভাবে হাসে, বলে—তুমি ঠিক করে এসো, তাহলেই হবে। আমি কখন যে যাই!

আমি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি—কেন আগামী মাসে দু-তিনটে ছুটির দিন পড়েছে একসঙ্গে। একদিন গেলে হবে।

ওর ঠোঁটে লজ্জিত হাসি, বলে—ওহো তোমাকে তো বলাই হয়নি। ঐ ছুটির দিনগুলোয়—যে আমি আগে থেকেই এনগেজ হয়ে আছি। কোয়েলদের দেশের বাড়ি—যাব। ওর কাছে কথা দেওয়া আছে।

এভাবেই অমরাবতী আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। উঠে পড়ি। তখনই মনে পড়ে যায়—। অফিসে অনেক কাজ পড়ে আছে। কোন মিটিং আছে কিনা সেলস অফিসারদের সঙ্গে, সেও তো ভুলে বসে আছি!

রবিবার ছাড়াও দুতিনটে ছুটির দিন হাতে পেলেই অমরাবতী ওদের গ্রামের বাড়ি চলে যায়। গ্রামের নামটাও খুব সুন্দর—বীনাধাম। আমবা একবার বন্ধুরা মিলে সেখানে ফিস্ট করতে গিয়েছিলাম। সত্যিই খুব লোভনীয় ওদের বাড়িটা।

এক বুক গভীর ভালবাসার—দিঘী ঘিরে—নানা ফল ফুলের বাগান আর বাড়ি। উত্তর দক্ষিণ লম্বা দিঘী। দক্ষিণে সর্বসাধারণের স্নানের ঘাট। উত্তরপ্রান্তে বাড়ির চাতাল থেকে বাঁধান সিঁড়ি নেমেছে জলে। পাড়ের নারকেল, সুপারী গাছের সারির আলপনা বুকে নিয়ে শান্ত স্ফটিক জলের দিঘী, মাঝে মাঝে হেসে ওঠে মাছেরা ঘাই মারলে। অমরাবতীর বাবার অমলে নাকি ওদের রাজহাঁস ছিল। তারা জলে সাঁতার কেটে বেড়াত। অমরাবতী অবশ্য বলেছিল ঐ শান্ত দিঘীর বাড়িতে কোথাও কোথাও বড় বড় শ্যাওলার ঝোপ আছে। অসাবধান হলেই সেই শ্যাওলারা মানুষকে [illegible] ধরে অক্টোপাসের মতো। মানুষটা বাঁচার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, সেটাই ওঁদের খেলা। তারপর নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে সে মানুষ তো মাটির ঢেলা। তখন ছেড়ে দেয়। প্রাণহীন দেহ ভেসে ওঠে জলে।

ঐ শিশু গাছটা দেখছ, যার অর্ধেক-শিকড় নেমে গেছে জলে—ঐ যে দেখছ শিকড়ের সঙ্গে একটা রঙিন কাপড়ের টুকরো বাঁধা। ওখানটায় একটা যুবতী বৌকে অক্টোপাশে চুষে খেয়েছিল!

অমরাবতী এমন করে বলছে যে ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। মেঘার ছেলে বিশপ আমার ভয় ভাঙিয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

—মাসী তোমাদের দিঘীতে জল-দেবতা আছেন বল!

ওদের বাড়িটাও অদ্ভুত। অনেকগুলো ঘর, কিন্তু সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে। কেমন রহস্যের ঘেরাটোপ। আমি নতুন গিয়েছি বলেই হয়তো আমার ওরকম মনে হচ্ছিল।

গ্রামেরই বরদা মাসী বাড়ি দেখাশোনা করে। সে ঐ বাড়িতেই একটা ঘর নিয়ে থাকে। বরদা মাসী নিঃসন্তান। দূর সম্পর্কেব এক ভাইঝীকে কাছে এনে রেখেছে। অরুনীমা ঐ গ্রামেরই স্কুল শেষ করে এখন কলেজে।

আমাদের পৌছতে রাত হয়েছিল। বরদামাসীর রান্না ডিমের ঝোল ভাত খেতে খেতে পরের দিনের ফিস্টের আয়োজন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। মাসী বলল, লালুকে দিয়ে সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। তবু অমরাবতীর—যেন ভরসা হয়না। সে বলে—একবার আদিত্যকে খবর দেওয়া যায় না মাসী? তাহলে তোমকে আর ছুটোছুটি করতে হত না। কাল রবিবার আদিত্যরও ছুটি আছে।

মাসীর যেন তেমন আস্থা নেই আদিত্যর ওপর, বলে—সে যা আপনভোলা মানুষ। তাকে দিয়ে কী আর এসব দায়িত্বের কাজ হবে? সে কখন বেরোয় কখন ফেরে।

—কেন আদিত্য তোমাদের খোঁজখবর নেয়না? আমি যে বাব বার করে ওকে বলে দিয়েছিলাম।

অমরাবতীর কথায় হেসে ওঠে অরুনীমা, বলে হ্যাঁ খবর নেবেনা আবার। দু'এক রবিবার পর পর আসে। মাসীর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে চলে আসে। জলের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মাসী চা করে ডাকে তবু আসেনা। তারপর কখন না বলে চলে যায়। অরুণীমার বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলাম। মেঘাটাতো ফাজিল, সে বলল—

—সত্যিই এ বড় অন্যায় আদিত্যর। তুমি থাকতে জলের দিকে চেয়ে বসে থাকে। অমরাবতীর মুখ কঠিন, বলে চল, খেয়ে উঠে যাব আদিত্যর বাড়ি। এই সেই আদিত্য। সেদিন আদিত্যকে বাড়িতে পায়নি ওরা। ওর মা বলেছে, গতকালই কী কাজ নিয়ে যেন বাইরে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

সোমবার সকালে সবাই কলকাতায় ফিরে গেল। অমরাবতী ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। সে থাকবে। আমাকেও থাকতে হবে পিড়াপিড়ি করতে লাগল সে। কিন্তু আমার অত ছুটি নেবার উপায় নেই। আবার অমরাবতীর সঙ্গসুখ, লোভও সামলাতে পারছিলাম না।

আমি থাকব শুনে শতদ্রুর বৌ মেঘা বলল, সে থাকবে। ছেলে বিশপের স্কুল ছুটি। এত সুন্দর জায়গা। শতদ্রু সহ সব বন্ধুরা হৈ চৈ করতে লাগল—সত্যিই মেঘা তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আর কবে হবে?

মেঘা ঠোঁট ফুলিয়ে কৃত্রিম অভিমানে গলা ভারি করে বলে—আমি ভাই ওদের একটুও ডিসটার্ব করব না। এত বড় বাড়ি ওরা যেখানে যা খুশি করুক।

মেঘা বরদা মাসির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ধান ক্ষেত দেখতে গেল, বিশপকে আমাদের জিম্মায় রেখে। কলকাতার মেয়ে, ধানক্ষেত সে দেখেনি তা নয়। জীবনে মাত্র কয়েকবার দেখেছে, তার আশ মেটেনি। অরুনীমা কলেজ যাবার আগে একটা আমগাছের নিচু ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা করে দিয়েছে বিশপের জন্য। সেও দোলনা ছেড়ে মার সঙ্গে যেতে রাজি হল না।

আমি আর অমরাবতী সারাদিন গল্প করে কাটালাম। ওর শৈশবের, বাবা, মা'র—বার বার ঘুরে ফিরে এল আদিত্যের গল্প। প্রাইমারীতে দু'জন এক সঙ্গে পড়ত।

হাইস্কুল থেকে দুজন দুদিকে। ছোটবেলায খুব দামাল ছিল আদিত্য। স্কুলে প্রতিদিন এব তার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি। সে ঝগড়া মেটাতে হত অমরাবতীকে। হাইস্কুলে গিয়েও কি নিস্তার আছে আদিত্যর দৌবাত্ম থেকে। সকাল তখন নটা, কুয়াশাব সোহাগ ভাসছে আলোয। জলেব আয়নায় সূর্যমুখী মেঘের ছায়া। দিঘীর উত্তর পাড়ে জল সোহাগী নত নিমগাছটার পাতা হালকা হাওয়ায় তির তির করে কাঁপছে। তখন স্কুলে যাবে বলে স্নান কবতে আসত আদিত্য। বাঁধান স্নানের ঘাট দিয়ে জলে নেমে খানিক ডুব সাঁতার কিংবা চিৎ সাতার—জলেব সঙ্গে খেলা করে স্নান সেরে বাড়ি ফিরবে তাহলে তো হয়েই যেত।

পূর্বপাড়ে আগে একটা সাঁইবাবলাব গাছ ছিল। আদিত্য সেই গাছের কাঁটা ডাল বেয়ে উপরে উঠে যাবে, সেখান থেকে ঝাঁপ দেবে জলে। সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়নায় মেঘ ভেঙে যেন আবির গোলা। জলের পোকাটাকে দেখা যাবে না জলে ঝাঁপ দেবার পর অনেকক্ষণ। জল তোলপাড়, ঢেউগুলো এর ওর গায়ে আছড়ে পড়বে। জলের পোকাটা তখন ডুব সাঁতারে—চলে আসবে ঐ নিমগাছটার ছায়ায়, জল যেখানে একা, মগ্ন। সেই নিঃসঙ্গতার বুক ফুঁড়ে মাথা তুলবে আদিত্য। আর তখনই ক্লাশ নাইনের পড়ায় মগ্ন মেয়েটার ইতিহাস ভূগোল সব একাকার হয়ে যাবে। রাগ করে পডা ফেলে, নিজেও স্নান করতে নামবে নিজেদের উত্তরের ঘাটে।

অমরাবতীকে দেখে সাঁতরে এ ঘাটে চলে আসবে আদিত্য। জলে ডোবা সিঁড়ির পাড়ে হাতের ভর রেখে, মাথা তুলে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করবে—অনু তোদের ফাইনাল পবীক্ষা কত তারিখে রে? এত তাড়াতাড়ি স্নান করতে এলি যে? তুই তো বাবার স্কুটারে যাবি। ভালো করে পড়াশোনা কর। তোরা সব ব্রাইট মেয়ে।

ব্যাস কথা শেষ। আবার দুহাতে স্ট্রোক করতে কবতে সোঁ সোঁ করে দক্ষিণে এগিয়ে যাবে আদিত্য। মেয়েটাকে একা ফেলে রেখে।

সেই দামাল আদিত্য একেবারেই পাল্টে গেল ওর বাপ মাবা যাবার পর। তখন সবে ওদেব স্কুল শেষ হয়েছে। আদিত্য পড়া ছেড়ে দিয়ে কী কাজে যেন ঢুকল। মা ছেলের সংসার চলবে কী করে?

আদিত্যর সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেক সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাতে।

হঠাৎ করেই একটা রবিবার বিকেলে চোখে পড়ল, আদিত্য দক্ষিণের ঘাটে বসে কী যেন লিখছে। ছুটে আদিত্যর কাছে এসেছে অমরাবতী। সে একটা সাদা প্যাডে পেন্সিল স্কেচ করছে নিবিষ্ট মনে। দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত হাত চলছে। প্রাইমারী স্কুলে ছবি আঁকার পরীক্ষায় আদিত্য বরাবরই এক নম্বরে থাকত। সেই ছবি আঁকার হাত আর বড় হলে কজনের থাকে?

পেন্সিল চালাতে চালাতেই—আদিত্য জিজ্ঞেস করে—অনু কলেজে ভর্তি হয়নি?

—হ্যাঁ। তুই কি কাজ করছিসরে এখন?

—করি একটা যা হোক কিছু। পেট তো চালাতে হবে। ছবি আঁকার কাজ পাইয়ে দেবে বলেছে একজন। তাই হাত তৈরি করছি। তুই এখন যা, আমাকে বিরক্ত করিস

না। আমাকে এখন অনেকগুলো স্কেচ করতে হবে। প্রতিদিনই স্কেচ করার কথা। আসা যাওয়ার পথে, কাজের অবসরে—তা তো আব হয়ে উঠে না। অনেকগুলো স্কেচ কালই তাকে দেখাতে হবে।

অমরাবতীর কেমন জেদ চেপে যায়—ওদেরই দিঘীব ঘাটে বসে ছবি আঁকছে আবার ওকেই চলে যেতে বলছে। সাহস তো মন্দ নয়। সে সরে এসে ছোট ছোট ইঁটের টুকরো দিঘীর জলে ফেলতে থাকে। অল্প শব্দ হয়ে জলে তলিয়ে যায় সে টুকরো। কিন্তু জলে নারকেল গাছের ছায়া ভেঙে ভেঙে যায় ঢেউয়ের বৃত্তে। আদিত্য শুধু অমরাবতীকে দেখে, গভীর চোখে দেখে, কিছু বলে না। আস্তে আস্তে উঠে চলে যায়।

অমরাবতী প্রথমে এখানকার কলেজে ভর্তি হয়েছিল, তারপর—কলকাতার কলেজে সুযোগ পেয়ে—হোস্টেলে চলে যায়। কিন্তু শনিবাব হলেই তার মন ছট্‌ফট্‌ করে, বাড়ি ফেরার জন্য। তার বুকের মধ্যে ছোট ছোট ব্যাথার বৃত্ত কাঁপতে কাঁপতে বড় হয়ে মিলিয়ে যায়।

সে রবিবারও অমরাবতী অনেকক্ষণ ধরে উত্তরের ঘাটে বসে আদিত্যর ছবি আঁকা দেখছিল। এখন আর ও বিরক্ত করতে পারে না। শুধু দূব থেকে দেখে। সেদিন কী যে হল। ছুটে গেল আদিত্যর কাছে। না গিযে উপায় ছিল না। কোন বিরক্ত কিন্তু সেদিন করেনি আদিত্যকে। ঝগডা করার জন্য যেন জিভ চুলকোয় ছেলেটার। বলে, আবার এসেছিস বিরক্ত করতে।

—আমি তোকে বিরক্ত করলাম। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার ছোটবেলাব অভ্যাস এখনও তোর যায়নি। একটু এসে দাঁড়ালে কী হয়। সবে স্কেচিং শুরু করেছে তাই এত অহঙ্কার। আঁকতো আমার ছবি। বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় অমরাবতী। চোখ ভিজে উঠেছে মেয়ের।

আদিত্য বলে—দাঁড়া এই স্কেচটা শেষ করতে দে।

কিছুক্ষণ পরই আদিত্য ওর শরীবে দৃষ্টি ফেরালো—সেই খুব চোখের তীবে ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকে অহঙ্কারী অমরাবতী। তীরবিদ্ধা ছুটে পালায়। দাঁড়িয়ে থাকবে সে সাধ্য তার ছিল না।

—বলতে বলতে অমরাবতীর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। দেখে আমি অনেক কষ্টে হা হা করে হেসে উঠি। হাসির দাপটে আমার চোখে জল এসে যায়। বিশপ দোলনা থেকে নেমে আমাদের কাছে ছুটে আসে। বিস্ময়ে সে আমাব মুখে চেয়ে বলে—কাকু তুমি এমন করে হাসছ যে! তখনই একটা মাছরাঙা পাখি ছো মেরে একটা ছোট মাছ ঠোঁটে নিয়ে পালায়। বিশপ হাততালি দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ হেসে ওঠে দিঘীর পাড় কাঁপিয়ে। আমি রুমালে চোখের কোন মুছে নিয়ে বলি—কী হল থামলে কেন? বল—।

অমরাবতী লজ্জা পেয়ে আমার হাত চেপে ধরে। যে হাত ছোঁবার জন্য আমাকে এক সময় কত ফন্দী ফিকির করতে হয়েছে।

হাত কাঁপছে অমরাবতীর বলে,—তোমাকে ছাড়া কাকেই বা বলব!

তখনই মেঘাবা ফিবে আসতে অমরাবতীর আদিত্য বৃত্তান্ত আর শোনা হল না। রোদে পুড়ে মেঘার চোখ মুখ লাল টক্‌টক্ করছে। সে অমরাবতীর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল—তোমাব আবার কী হল? ঝগড়া করছিলে না কি দিব্যেন্দুর সঙ্গে?

দেখি সত্যিই অমরাবতীব চোখের পাতায় কান্না লেগে আছে। মেঘার জিভের ধার, কি বলতে কী বলে বসে, আমি অমরাবতীকে আগলাই—বোধহয় শরীরটা ওর খারাপ হযেছে। জ্বর আসতে পারে। এত বারণ করা সত্ত্বেও দিঘীতে স্নান করল কাল। আমার কথা আলাদা, এখন তো আর অভ্যাস নেই।

অমরাবতী বুঝতে পেরে বলে—সত্যিই জ্বর জ্বর লাগছে।

বিকেলে আমি আর অমরাবতী বিশপকে সঙ্গে নিয়ে কানামাছি খেলছিলাম বাগানে। মেঘা অরুনীমাব সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছ ফুল চিনছিল। মেঘা বার বার অরুনীমাকে বলছিল তোমাদের গ্রামে নদী থাকলে একটা নৌকা এনে দিঘীতে ভাসানো যেত।

অরুনীমা বলেছে নৌকা চালাবে কে? তখনই মেঘার মনে পড়েছে—শতদ্রু থাকলে ও চালাতে পারত। দিব্যেন্দুটা ভীতুর ডিম। ওকে দিয়ে হবে না। অমনি শতদ্রুর জন্য মন খারাপ হয়ে উঠেছে মেঘার। বার বার বলতে লাগল, এখানে কোথাও টেলিফোন নেই? অমরাবতী তো একটা টেলিফোন নিয়ে নিতে পারে। টেলিফোন থাকলে শতদ্রুর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারতাম। সঙ্গে সঙ্গে ও মন স্থির করে ফেলল, কাল সকালেই কলকাতা ফিববে। তাছাড়া বিশপের পড়া কামাই হচ্ছে। শতদ্রুটা সুযোগ পেলেই অনিয়ম করে।

সন্ধ্যাবেলা সত্যি সত্যিই অমরাবতীর জ্বর এল। সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। ও আমাকে চুপি চুপি বলল,—আজ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার ঘরে এসো। আদিত্যর বৌকে দেখাব। পূর্ণিমার রাতে সেই হতভাগী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠি, কিন্তু হেসে বলি—তুমি অমরাবতী বসু, ঝক্‌ঝকে অ্যাকাডেমিক ট্রাক, সিভিল সার্ভিসে তুখোড় রেজাল্ট। তুমি এসবে বিশ্বাস কর!

—না বিশ্বাস করার তো কিছু নেই। আমি আদিত্যর বৌকে খুন করেছি। ওর পেটে বাচ্চা ছিল, যখন ও এই দিঘীতে ডুবে মরে। সেজন্য ওর মুক্তি হয়নি। এই অবস্থায় মরলে কোন নারী মুক্তি পায়না।

ওর ঘরের জানলা দিয়ে পুরো দিঘীটা দেখা যায়। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। নারকেল-সুপারী গাছের লম্বা ছায়া কাঁপছে দিঘীর জলে। কাছাকাছি কোথাও কামিনী ফুলের গাছ আছে। মিষ্টি গন্ধ, মায়া ছড়াচ্ছে। মেঘা অরুনীমাকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে গেছে। বিশপ ছুটেছে ওদের পিছু পিছু।

আমি একটা [illegible]কদাবা এনে অমরাবতীব মাথার কাছে বসলাম। এখন ওকে একা ফেলে যাওয়া উচিৎ নয়। ওদের বাড়ির চাতাল, যেখান থেকে দিঘীর ঘাট নেমে গেছে, সেখানে একটা আলো আছে. পুরো ঘাটটাকে আলো করে রেখেছে। আমি ভেতব থেকে আলোটা নিভিয়ে দিলাম। অমনি বাঁধভাঙ্গা জ্যোৎস্না এসে লাফিয়ে

পড়ল। আমি অমরাবতীকে বললাম—ঐ দেখ চাঁদ উঠেছে, আলোয় ভেসে যাচ্ছে তোমার দিঘী। কই দেখাও তো আদিত্যর বৌকে।

ও জানলায় বাইরেটা দেখে বলল—এখন আসবে না। রাত গভীর হোক। সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক।

—কে বলল তুমি খুন করেছ। সে নিজে ডুবে মরেছে। যত সব ভুল বিশ্বাস আঁকড়ে তুমি কষ্ট পাচ্ছ! আমাকে বরদা মাসী তো তাই বলল। আমি বরদা মাসীর নামে মিথ্যে বলি।

অমরাবতী ভিজে গলায় বলে—হ্যাঁ, বিশ্বাস কর। আমিই খুন করেছি। আমার খুব হিংসা হত আদিত্যর বৌকে দেখলে। তখন আমি চাকরিতে জয়েন করিনি। ট্রেনিং শেষ করে ছুটিতে আছি। একটা রবিবার আদিত্য তার বৌকে নিয়ে স্নান করতে এসেছে—আমি ঘরে এই খাটে বসে সাঁতার শেখান দেখছিলাম। বৌটার হালকা পলকা রোগা শরীরটা আদিত্যর দুটো বলিষ্ঠ হাতের দোলনায় দোল খাচ্ছে জলের ওপর। বৌটা হাত পা দাপাবে খানিক জলের ওপর। তারপর ইচ্ছা করেই আদিত্য ছেড়ে দেবে। কিছুটা দূর হাত পা দাপাতে দাপাতে এগিয়ে যাবে। তখন আদিত্য নিজেই গিয়ে বৌটাকে টেনে এনে গলা জলে দাঁড় করাবে। বৌটা খানিক বিশ্রাম নেবে। তারপর চলবে—। সে কী হাসি চিৎকার খুনশুটির সাধের মধ্য দুপুর। অসহ্য লাগত আমার। প্রতি রবিবারই ওরা আসে।

সেদিনই হঠাৎ বৌটা অনেকটা দূর চলে গেছে। আদিত্য তো তাড়াতাড়ি যাবে। তা না তো সে বলছে—হাত পা ছোড় জলের ওপর। ওভাবেই ঘুরে ফিবে এসো। এই তো এই তো, একটু জল না খেলে সাঁতার শেখা যায় না। সে ফিববে কি, ভয় পেয়ে কিংবা অনভ্যাসে হাত পা বোধহয় তার অসাড়। সে একবার জলে ডুবছে একবার উঠছে।

আমি পাড় ধরে ছুটে এসে জলে ঝাপিয়ে পড়লাম। আদিত্যও এসে গেছে সাঁতরে। আমি ধরছি বলে আদিত্য আমাকে ঘিরে জলের ওপর পাক খাচ্ছে বলছে—চুলের মুঠিটা ধর অনু।

বৌটা আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে আক্টোপাশের মতো শক্ত হাতে। আমি জানি ডুবন্ত মানুষকে বাঁচান খুব কঠিন। ও নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে না বুঝে। আমি ওর চুলের মুঠি ধরবার সুযোগ পাচ্ছি না। চিৎকার কবে যে আদিত্যকে বলব তুই চুলটা ধর। সে ক্ষমতাও আমার নেই। তখন কনুই দিয়ে বৌটাব কণ্ঠার কাছটা চেপে ধরতে—আস্তে আস্তে হাত দুটো তার শিথিল হয়ে গেল। আমিও ছাড়া পেয়ে, তাকে জাপটে ধরব বলে জলের মধ্যে আতিপাতি করে খুঁজছি কিন্তু সে কোথায়?—ততক্ষণে তলিয়ে গেছে।

আমি মাথা তুলে চিৎকার করে উঠি—আদিত্য সে কই?

সঙ্গে সঙ্গে জলের পোকা সেই দামাল আদিত্য ডুব দিয়ে জল তোলপাড় করে খুঁজতে থাকে। আমিও। কিছুক্ষণ পর দুজনই মাথা তুলছি যদি তাকে দেখতে পাই।

সে ভেসে উঠল পরের দিন সকালে।

রাত যত বাড়তে থাকে—অমরাবতীর জ্বরও বাড়তে থাকে। ও বার বার বলে আমিই আদিত্যর বৌকে খুন করেছি। এই কনফেসনটা আমার আদিত্যর কাছে করা উচিৎ কিন্তু সে তাহলে আমাকে ঘৃণা করবে।

আমি অনেক বোঝাই তুমি তো নিজেকে বাঁচাবার জন্য—। দেখ মানুষ যদি এক একটা সময়ে এক একরকম ভাবে নিজেকে আবিস্কার করতে না পারে তাহলে যে থমকে দাঁড়াবে। প্রকৃতিকে দেখছ না। বর্ষার স্মৃতিকে যদি ভুলতে না পারে, তাহলে শরৎ-এ তার নতুন সৃষ্টি থমকে দাঁড়াবে না? আমার এ সব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ তার কানে পৌঁছায় না।

পরদিন সকালে আমি অমরাবতীকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে এসব ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হল ওকে কিন্তু একা বীনাবাস-এ যেতে দেওয়া উচিৎ নয়। আজেবাজে চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এত দিন কেন ওকে বারণ করিনি। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল।

অফিসে এসেই ওকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু রিসেপসন থেকে বলল, ম্যাডামের লাইন এনগেজ। আমিও অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই হুড়মুড় করে কাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘাড়ের ওপর।

পরের দিন ওকে ধরলাম—এই শোন অমরাবতী, আগামী মাসে দুতিনটে যে ছুটির দিন পড়েছে ওটা কত তারিখে? আচ্ছা সতেরো-আঠারো তারিখ নাগাদ আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে না? ছুটির দিনের তারিখগুলো দেখে রেখো তো। আমি পরে তোমায় ফোন করছি। আর হ্যাঁ, আদিত্যর জন্য ওর ছবি বাবদ একটা মোটা অঙ্কের চেক আমি সই করে রেখেছি—কিভাবে ওর কাছে পাঠাবে। চিন্তা করে বলো। পরে ফোন করছি।

দাস সভ্যতা

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

এর আগে আমি বেশ কয়েকবার আন্দামান এসেছি। আমার মতে বেড়ানোর জন্যে এরকম জায়গা সারা দেশে কমই আছে। যদি সব ক'টা দ্বীপ ঘুরে ঘুরে দেখা যায়, একমাত্র তা হ'লেই হয়তো বোঝা যাবে এই আশ্চর্য সুন্দর জায়গাটি তা'র যাবতীয় রহস্যময়তা নিয়ে কোনও কুহকিনীর সুদূর গানের মতো কেন এখনও, এই বিজ্ঞাপনী অতিরঞ্জনের যুগেও অতুলনীয়া।

অবশ্য কোনওবারই আমার ডিগলিপুর যাওয়া হয়নি। এমনকি এই নামে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কোনও জায়গা যে আছে, তাও জানা ছিলো না। জানার কথাও নয়। কিন্তু এবার পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছেই যে ডিগলিপুর রওনা হলুম, তা'র প্রথম কারণ, যাবার অনুরোধ ক'রে অভিজিৎ সেনগুপ্ত বারবার চিঠি লিখেছে, এবং দ্বিতীয় কারণ, অভিজিতের আতিথেয়তা গ্রহণ ক'রে ডিগলিপুরের চারপাশে দ্বীপগুলো ঘোরা।

আমি যতবারই আন্দামান এসেছি, যাওয়া-আসা করেছি জাহাজে। জাহাজেব এক নিজস্ব আকর্ষণ আছে। তা'র ওপর অত কাছ থেকে সমুদ্রকে দেখার সুযোগ, তা'র অনন্ত রূপের খেলা, ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে যে মাদকতা রয়েছে, তা'র সিকিভাগও প্লেনে চড়লে মিলবে না। তাই, সময় এবং অর্থ, দুইই অনেক বেশি খরচ হওয়া-সত্ত্বেও, জাহাজই আমার অনেক বেশি প্রিয়।

অভিজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ আমার দ্বিতীয় আন্দামান যাত্রার সময়। সেটা আজ থেকে প্রায় বছর ষোল-সতের আগের কথা। আমি যাচ্ছিলুম আন্দামানেব পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখবো ব'লে অঞ্চলটা ভালো ক'রে দেখে আসতে। আলাপ হবার পর আমার সাহিত্যিক পবিচয় পেয়ে অভিজিৎ একেবারে গ'লে গেল। যেন চোখের সামনে সাক্ষাৎ ভগবান দেখছে, এমন ভাবভঙ্গি করতে লাগলো। এইসব পরিস্থিতি আমার একইসঙ্গে ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিকর লাগে। জানি না এ'ধরনের আদিখ্যেতা ক'রে মানুষ কী মজা পায়। প্রথম আলাপে লোকটাকে একেবারেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু পাঁচদিন একটানা জাহাজে থাকতে থাকতে অভিজিতের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেলুম। এবং তারপর দেখলুম মানুষটা ঠিক ততটা বাজে নয় যতটা মনে হয়েছিলো প্রথমে। ভুল বললাম, 'বাজে' তো নয়ই, বরং খুবই ভদ্র এবং আন্তরিক। কেমন দেখতে, তা'র বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না, যেহেতু অভিজিৎ সেনগুপ্তর মধ্যে একজন গড়পরতা বাঙালির বৈশিষ্ট্য ছাড়া বাড়তি আর কিছুই নেই। অভিজিৎ বললো গত দশ বছর ডিগলিপুরে ও বসবাস করছে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে। এইভাবেই ডিগলিপুরের কথা প্রথম জানতে পারি।

এরপর মাত্র একবারই অভিজিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়। কলকাতায় আমার বাড়ি এসেছিলো। এছাড়া যোগাযোগ বলতে শুধু চিঠিই—তা'ও অধিকাংশই অভিজিতের দিক থেকে। আমার লেখালেখিব ব্যাপারে ওর বেজায় উৎসাহ এবং একজন বিখ্যাত

সাহিত্যিকের সঙ্গে যে ওব ঘটনাচক্রে এমন 'অন্তরঙ্গ' আলাপ হ'য়ে গেছে, সেটা ও কিছুতেই ভুলতে পাবে না। প্রথম প্রথম আমিও দু'চারটে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে ভদ্রতা বক্ষা করতুম, কিন্তু তারপব অনেককিছুর মতো সেটাও ত্যাগ করেছি। তবু এ'কথা ভেবে অবাক হ'য়ে যাই যে এতদিন ধ'রে কী আশ্চর্যভাবে অভিজিৎ প্রায় একক ক্ষমতায় যোগাযোগ রেখে গেছে। আমি মাঝেমাঝেই আন্দামান বেড়াতে যাই শুনে বহুবার অনুরোধ করেছে ডিগলিপুর ঘুরে যেতে। কিন্তু যে মানুষটার প্রতি বাড়তি কোনও আকর্ষণ বোধ করি না, তা'র আতিথেয়তা গ্রহণ করতে মন সায় দেয়নি। কিন্তু এবার যে ডিগলিপুর গেলাম, তা' মূলত এইজন্যেই যে ~।। গেলে একটি মানুষের আন্তরিকতাকে শুধু অগ্রাহ্যই নয়, অপমানও করা হবে।

একটু বেশি গ্রামঘেঁষা শহরতলি বলতে যা' বোঝায়, ডিগলিপুর জায়গাটা অনেকটা তা-ই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে কোনও কলোনি এলাকা, যেখানে এখনও সবুজের সমারোহ, নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহমান।

আমাকে পেয়ে অভিজিৎ যে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। যদিও বিয়ে করেনি, কিন্তু আমার যা'তে অসুবিধে না হয় সেইজন্যে ও নিজের হাতে এমন ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলো, যা' আক্ষরিক অর্থে নিখুঁত বললেও কম বলা হয়। বাড়িতে কাজের লোক বলতে একটা আধবুড়ো স্থানীয় আদিবাসী। অভিজিৎ তা'কে এমনভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলো যে অষ্টপ্রহর সে আমার পেছন পেছন ঘুরতো আমার সুখ-সুবিধে দেখার জন্যে।

একদিন রাত্রে খেতে ব'সে বললুম, "আপনাদের এই জায়গাটা কিন্তু সত্যিই দারুণ, অভিজিৎবাবু। ভাবছিলাম এখানেই কাটিয়ে দিলে কেমন হয়।"

মৃদু হাসে অভিজিৎ। "সেটা আপনার এখন মনে হচ্ছে। কিন্তু নিজের দেশ ছাড়া কোনও জায়গাতেই কি মন বসানো সম্ভব?"

আমি অবশ্য অভিজিৎকে এ'কথা বোঝানোর চেষ্টা করলুম না যে ডিগলিপুর ভাবতবর্ষের বাইরে নয। তা'ছাড়া, 'নিজের দেশ' কথাটা অর্থহীন ব'লে মনে হয় আমার। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার ভেতর আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি ব'লে সেই জায়গাটাকেই 'সকল দেশের সেরা' ব'লে মনে করার কোনও কারণ দেখি না। যাইহোক, এমন কথা সকলের সঙ্গে আলোচনার নয়। তাই জিগ্যেস করলুম, "আপনার বোধহয় এখানে ব'সে আমাদের বাংলার কথা খুব মনে পড়ে?"

"চব্বিশ ঘণ্টাই আমি কলকাতার জন্যে মুখিয়ে থাকি বলতে পারেন।"

"তা হ'লে ফিরে যাচ্ছেন না কেন কলকাতায়?"

"যাবো, নিশ্চয়ই যাবো একদিন। না গেলে যে বেঁচে-থাকাটাই দায় হবে মশাই।"

এবং এরপর আমরা আস্তে আস্তে কলকাতার গল্পে ডুবে গেলুম। অভিজিৎ ওর একসময়ের কলকাতা-জীবনের কাহিনী শোনাতে লাগলো—ওর তখনকার চেনাশোনা মানুষজন, সিনেমা-থিয়েটার, কফি হাউসের আড্ডা, এইসব আর কি। বুঝতে পারলুম তখন এমন অনেকের সঙ্গে ওর আলাপ ছিলো যারা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। আবও অবাক হলুম অভিজিতের মুখে বিশেষ কিছু মহিলার নাম শোনার

পব, যাদেব কথা এহ, বহুদিন আগে আমাদের বন্ধুমহলেও মুখে মুখে ফিবতো। তা' হ'লে কি অভিজিৎও আমাদের মতো একই বৃত্তে ঘোরাফেবা করছে? আমি কি তা'হ'লে আজকের এই গড়পরতা মামুষটাকে, এক অখ্যাত জাযগার নগণ্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটিকে আগে দেখেছি? কিন্তু কোথায়? কবে? কখন? খুঁটিয়ে অভিজিতের মুখ লক্ষ্য করার চেষ্টা করলুম—যদি কোনও হদিস পাওয়া যায়, যদি কোনও ঘুমন্ত অতীত ঠেলে কোনও অজানা তথ্য বেরিয়ে আসে! ওকে দেখে মনে হ'লো একইসঙ্গে ক্লান্ত অথচ সপ্রাণ, বিমর্ষ অথচ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। উশকো খুশকো চুলে ক্রমাগত বিলি কেটে চলেছে আধবোঁজা চোখে।

বাড়ির সামনে একফালি জমিতে বাগান করেছে অভিজিৎ। সেই বাগানময় উড়ে বেড়াচ্ছে ঠাণ্ডা, নোনা বাতাস। কী একটা নাম না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে—মৃদু, নেশাধরানো। শূন্য দৃষ্টিতে অভিজিৎ তাকায় আমার দিকে। মনে হয় ও আমার চোখের মধ্যে, আমার বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা বহু, বহুদিন আগেকার প্রিয় শহরটার ছবি একটু একটু ক'রে দেখতে পাচ্ছে—সেই মানুষের ঢল-নামা পথঘাট, উৎসব-মুখর ময়দান, উজ্জ্বল তরুণ তরুণীব ভিড়।

হঠাৎ অভিজিৎ জিগ্যেস করে, "আচ্ছা, আপনি শেখর হালদারকে চেনেন, ওই যে প্রতি শনিবাব বিকেলে কলেজ স্ট্রীট মোড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকাব ক'রে কবিতা পড়তো?"

"হুঁ, মনে আছে বইকি।"

"সেই আগের মতো এখনও কি রাগী কবিই আছে, নাকি ধরনধারণ বদলেছে একটু আধটু?"

"চুল পেকে গেলে কবিরা কি আর ততটা রাগী থাকে?" মুচকি হেসে বলি।

"আর বিপ্লব—বিপ্লব সাহা—'খেলাঘর' নামে একটা নাটকের দল করেছিলো, মুক্তাঙ্গনে পরপব কযেকটা শো ক'বে হইচই ফেলে দিয়েছিলো চারদিকে—তা'র খবর কী?"

"আছে একরকম। তবে যদ্দুব জানি অফিস ক্লাব ছাড়া কোথাও আর নাটক করে না আজকাল।"

"এবার আসল খবরটা দিন! সেইসব নায়িকারা কোথায়—আমাদের নিজস্ব নারীরা কী করছে এখন?" সমসাময়িক এক কবির বহুল পরিচিত একটি লাইন আওড়ায় অভিজিৎ।

"কোন নারীর কথা জানতে চান বলুন? দেখি কোনও হদিস টদিস দিতে পারি কিনা।"

"কা'কে ছেড়ে কা'র কথা জিগ্যেস করি বলুন তো?" যেন খুব বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে, এভাবে অভিজিৎ হাসে। তারপর বলে, "আচ্ছা, বলাকা সান্যালের কথাই বলুন আগে—মনে পড়ছে তো, সেই যে ফিফ্‌টি নাইনের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হিস্ট্রির ব্যাচ?"

"বলাকা সান্যালের জন্যে অত সালতামামির প্রয়োজন নেই। আপনাব মনে আছে আশাকরি ওকে নিয়ে ক্যাম্পাসে কোন কথাটা চাউর ছিলো।"

"আছে বইকি—'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার'।"

"অবশ্য এখন সেই তলোয়ারে মবচে ধ'রে গেছে অভিজিৎবাবু। কিছুদিন আগে গড়িয়াহাটে দেখা হযেছিলো—মেয়ে জামাই নাতনি সমেত পুজোব বাজার করছে।"

"ঈশ্বর।" হাসিহাসি মুখে অভিজিৎ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে।" আর শর্মিষ্ঠা দত্ত?"

"ঠিক বলতে পারবো না। তবে যদ্দুর জানি মৃণালেব সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি।"

"বেচারা। কিন্তু সেটা কী ক'রে সম্ভব—ওরা তো খুবই—"

হঠাৎ চুপ ক'বে যায় অভিজিৎ। তারপর গাঢ় স্বরে বলে "যাক্ গে, শর্মিষ্ঠাব কথা আর শুনতে চাই না—খারাপ লাগে।" বুঝতে পারি ওর এবারের দীর্ঘশ্বাসে কোনও কপটতা নেই।

আমরা যে ঘরে খেতে বসেছি, এটাই অভিজিতের শোবার ঘর। এক ঝলক দেখলে ঘরটাকে কোনও 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' মনে হওয়া বিচিত্র নয়। এমন অদ্ভুত সব জিনিস—কাঠের টুকরোর ওপর হাতের কাজ, পরিচিত আধা-পরিচিত কিছু ছবির অনুকরণ, দু'দুটো বিশেষ আকারের ছোরা, একটা কাপড়ের ওপর নক্শা-বোনা—পুরো জিনিসটা একটা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো, এইরকম টুকিটাকি অনেক কিছু, কারও সঙ্গেই কারও মিল নেই, ঘরময় ছড়ানো-ছেটানো। ঘরে আলো জ্বলছে, তবু যেন মনে হচ্ছে ঘরটা কোনও রহস্যময় জগৎ।

দোনামনা ক'রে কথাটা ব'লে ফেলি শেষ পর্যন্ত। "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস কববো অভিজিৎবাবু?"

সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে অভিজিৎ আমাব দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বলি, "আচ্ছা, কেউ কি—মানে কোনও নারী কি কখনও আপনাকে আঘাত দিয়েছে?"

অভিজিতেব বাড়ি যেখানে, সেখান থেকে সমুদ্র খুব দূরে নয়। যদিও হেঁটে যেতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। অথচ আমাব মনে হ'তে লাগলো এই দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেই দেখতে পাবো অভিজিতের বাগানে সমুদ্রেব ঢেউ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে, জলপরীরা লুকোচুবি খেলছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

ম্লান হেসে অভিজিৎ বললো, "আপনি কি জানেন জয়তী চৌধুরি বেঁচে আছে কিনা?"

"আপনি কি গায়িকা জয়তী চৌধুরির কথা জানতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"অবশ্যই বেঁচে আছেন, এবং যে কোনও পঞ্চাশ-পেরোনো বাঙালি মহিলার তুলনায় তিনি এখনও ঢের বেশি সুন্দরী।"

"আপনি চেনেন ওকে?"

"অল্পবিস্তর।"

অভিজিৎ একটু ইতস্তত ক'রে জিগ্যেস করে, "তবু যা জানেন, বলুন।"

"বিশেষ কিছুই বলাব নেই, শুধু এটুকু বলতে পারি বিষ্ণুপুরী ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে যে ক'জনকে নিয়ে আমবা এখনও গর্ব করতে পাবি, জয়তী তাদেরই একজন—

এবং সেইসঙ্গে বহু পুরুষের হৃৎস্পন্দন, আজও অনেকের কাছেই তিনি রূপকথার রাজকন্যা।"

বিড়বিড় ক'রে অভিজিৎ বললো, "আমি জয়তীকে ভালবাসি।" কিন্তু ওর অস্ফুট কথাটা এমন শোনায় যেন ও বলছে, 'আমি ম'রে যাবো।" তারপর ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বলতে থাকে, "একসময় জয়তীকে একদণ্ডও চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারতুম না। টানা তিন-তিনটে বছর কাটিয়েছি একসঙ্গে। এসব প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা। তখন আমার লেদার গুড্স-এর রমরমা ব্যবসা, জয়তী সবে কনফারেন্স-এ একটু আধটু নাম করতে শুরু করেছে। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসতুম পাগলের মতো। ঠিক কীরকম সেটা, হয়তো আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আর বললেও হয়তো বুঝতে পারবেন না। শুধু এটুকু বলতে পারি—এক ধরনের ভালবাসা আছে যা' দুটো হৃদয়ের আকর্ষণ বই কিছু নয়; সেসব ভালবাসা জোলো, ঠাণ্ডা, ভ্যাদভেদে। এইসব ভাব-ভালোবাসা সাধারণত বিয়ে-টিয়েতেই শেষ হয়—স্রেফ একটা মাঝারিয়ানা, কেজো, বাজারচলতি। আর একধরনের ভালবাসা হ'লো বন্য, লাগামছেঁড়া, কোনও হিসেব টিসেব মেনে চলে না। এই ভালবাসা এমন দুটি হৃদয়ের মধ্যে ঘ'টে থাকে, যাদের কোনওদিকেই কোনও মিল নেই; পরস্পরকে একইসঙ্গে পীড়ন করতে আবার ভালবাসতেও বদ্ধপরিকর। এই ভালবাসার মানুষ দুটি তীব্রভাবে পরস্পরকে ঘৃণা করে আবার ভীষণভাবে ছুটে যায় পরস্পরের দিকে।

"ওই তিন বছরেই জয়তী আমাকে শেষ ক'রে দিয়েছিল। আমার নিজস্ব সাড়ে ছ'লাখ টাকা নিশ্চিন্তে, নির্লিপ্তভাবে উড়িয়ে দিয়েছিলো—অথচ আমি কিছু বলতে পারিনি। ওর ঠোঁটের একচিলতে হাসির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব ভুলেছিলুম।

"আপনি তো বলছেন জয়তীকে চেনেন। তা' হ'লে নিশ্চয়ই এ'কথা স্বীকার করবেন যে জয়তীর মধ্যে এক দুর্মর শক্তি আছে যা' মানুষকে চুম্বকের মতো আঁকড়ে রাখে ওর চারপাশে? কিন্তু ওই শক্তির উৎস ঠিক কোথায় আমি জানি না। ওই বাদামী চোখদুটো—যা' একবার কারও বুকে তীরের মতো গেঁথে গেলে উপড়ে ফেলা কঠিন, নাকি ওই বিধ্বংসী হাসি যা' একইসঙ্গে উদাসীন অথচ কামুক—কোনও আদিম উপজাতির রহস্যময় মুখোসের মতো যা' ওর মুখে লেগে থাকে সবসময়? আপনি ওর দিকে টানা আধঘণ্টা তাকিয়ে থাকুন, দেখবেন ওর চালচলন, হাবভাব কখন কোন নেশাধরানো সুগন্ধী ফুলের মতো আপনার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, আপনার নিজস্ব চিন্তাশক্তি তালগোল পাকিয়ে মিলিয়ে গেছে কোথায়, আপনি ছায়ার মতো ওর পিছু পিছু হেঁটে চলেছেন।

"এই তিনটি ভয়াবহ বছর জগৎসংসারে ওকে ছাড়া আর কিছুই চিনতুম না, জানতুম না। অথচ টের পেলুম প্রতি পদক্ষেপে জয়তী আমাকে আরও অসংখ্য পুরুষের মতোই ঠকাচ্ছে দ্ব্যর্থহীনভাবে। মাঝে মাঝে থাকতে না-পেরে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠতুম : 'তুমি একটা নীচ মেয়েছেলে, শস্তা বেশ্যা!'

আমার কথায় জয়তী রাগ করতো না। শান্তভাবে হেসে বলতো, 'আমরা আশাকরি বিবাহিত নই যে তুমি আমার জীবনযাপন নিয়ে এমনতর কথা বলবে, তাই না?'

"আমরা যখন একসঙ্গে কোথাও বেরোতুম, জয়তী পথচলতি পুরুষদের দিকে এমনভাবে তাকাতো যেন ওদেব প্রত্যেকে সঙ্গেই ওর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমি জ্ব'লে পুড়ে যেতুম এসব দেখতে দেখতে। তবু কিছুতেই ওকে ছাড়তে পারতুম না। যতই মনে হ'তো আমি ছাড়া ওই মেয়ে মানুষটার ওপর সকলেরই অধিকার রয়েছে, ততই আরও বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরতুম ওকে—তখন আর নিজের ঠিক বেঠিক, ভালো মন্দ কিছুরই হুঁশ থাকতো না। যদিও এ'কথা ভালোই জানতুম আমার চোখের আড়াল হওযামাত্রই জয়তী অন্য পুরুষের সঙ্গে ঠিক একই ব্যবহার করবে।

"একসময় আমার শেষ আধুলিটাও যখন জয়তীর পেছনে খরচ হ'য়ে গেছে, তখন ও খুবই সোজাসাপটাভাবে বললো : 'দেখ, মানুষ তো শুধু হাওয়া খেয়ে বাঁচে না। আমি তোমাকে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসি এ'কথা ঠিক, কিন্তু আমাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে। এইরকম কষ্ট ক'রে, দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাকতে আমি নারাজ। তাই, আমাকে অন্য পথ দেখতে হচ্ছে।'

"কিন্তু আপনি যদি জানতেন ওর জন্যে আমি কী না করেছি! ওর সামান্যতম ইঙ্গিতে আমি নরকের শেষপ্রান্ত অবধি হেঁটে যেতেও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরকম কথা শোনাব পর মনে হ'লো আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা একটু একটু ক'রে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হ'লো ওকে বুকে চেপে ধ'রে পিষে মারি, কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে মিশিয়ে দিই মাটির সঙ্গে। সেই মুহূর্তে জয়তীর মধ্যে আমি সেই আদিম বন্য নারীকে দেখতে পেলুম যাকে পাবার জন্যে সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে পুরুষ হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেরিয়েছে।

"তারপর একদিন সব ছেড়েছুঁড়ে চ'লে এলুম এইখানে। একসময় যেটা ছিলো শখ, অবসরের খোরাক, সেই হোমিওপ্যাথিই প্র্যাকটিস শুরু ক'রে দিলুম উপার্জনের তাগিদে।

"আর আজ, এত বছর কেটে যাবার পরেও মনে হয় জয়তীকে আগের চেয়েও বেশি ভালবাসি।"

রাত এখন অনেক। সমুদ্রের বুকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে ব'সে ব'সে আমি শুনে যাই এক বন্দী, নির্যাতিত হৃদয়ের হাহাকার। অবশেষে বলি : "জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে আপনার কি ইচ্ছে আছে এখনও?"

"অবশ্যই। এখানে ব'সে ব'সে অ্যাদ্দিন খেয়ে না-খেয়ে লাখদুয়েক টাকা জমিয়েছি। আরও লাখখানেক জমাতে পারলে এখানকার জিনিসপত্র বেচেটেচে ওর কাছে ফিরে যাবো। ওই টাকা নিয়ে, আশাকরি বছর দেড়েক হেসে খেলে জয়তীর সঙ্গে কাটানো যাবে। আর তারপর—"

"তারপর কী?"

"তারপর—তারপর জানি না কী করবো। হয় আত্মহত্যা করবো, নয় জয়তীকে বলবো : 'মোহে চাকর রাখো জী।' " অভিজিতের মুখে এক অসহায় হাসি খেলে যায়।

তিন পাহাড়ী দক্ষিণের বিল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাজিরগঞ্জের আকাশটা অনুপমার কেমন ফ্যাকাশে লাগে। তাদের বাড়ি বেলুড়ের আকাশের মতো নীল নয়। মেঘগুলোও ধূসর, সাদা-পালকের রং নয়। তবু এখানে কিছুদিন থাকতে হবে অনুকে। পিসীমা ওর মা-বাবাকে রাজি করিয়েছে। প্রধানত পিসির ইচ্ছেতে অনু নাজিরগঞ্জে এলেও সে এখানে আসায় সবচেয়ে খুশি হল পিসতুতো দাদা শঙ্কর। একমাত্র সন্তান হওয়ার জন্য বাবা-মায়ের স্নেহপ্রশ্রয় সে যতই পাক, ভেতরে ভেতরে বড় নিঃসঙ্গ, একাকী ছিল। মা, বাবা যত কাছের হোক না কেন, সব কথা কি তাদের বলা যায়? তাছাড়া পিঠোপিঠি ভাই-বোনের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে যে আনন্দ তার রস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল এই নবীন যুবক। অনুপমা এ বাড়ি আসায় সে সব সময়ের সঙ্গী পেল। শঙ্করের বয়স আঠারো, অনুর চেয়ে চার বছরের বড়। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার চলছে। বাংলায় সাম্মানিক। সে একটু পড়ুয়া ধরনের ছেলে। সিলেবাস ও তার বাইরে সে নাটক, নভেল পড়েছে অনেক। এসব পড়ে তার ধারণা জন্মেছে যে সে নরনারীর অন্তর্নিহিত সম্পর্কের তাবৎ রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। মনের বিভিন্ন স্তর এবং এর গতিপ্রকৃতি তার মতো অনুধাবন করতে কেউ পারে না। বাড়িতে তেমন সঙ্গী নেই তাই বইকে করেছে সাথী। ফলে একটা রোমান্টিক ঘোর-লাগার মধ্যে সে বেড়ে উঠেছিল। তার দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অচলা রোহিনীর কথা ফিরে ফিরে আসে, লাবণ্য তার কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে। এইরকম এক সময়ে ফুলের মতো মামাতো বোনকে সবসময় কাছে পেয়ে তার মন ভরে ওঠে। একটা কীসের যেন অভাববোধ তাকে নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি এতকাল। অনুপমা এ বাড়ি আসার পর তার সঙ্গে ক্যারাম খেলে, গল্প করে, বই পড়ে ও আরও হাজারো দৈনন্দিনতায় সে বুঝতে পারে এতদিনের অভাব ছিল একজন ভালো সঙ্গীর, যার সঙ্গে কথা বলে সে উদ্দীপিত হবে, যে তাকে বুঝবে, জুগিয়ে যাবে সাহচর্য। সময় কেটে যায় হু-হু করে ঘোরের মধ্যে। শঙ্কর মায়ের ওপর কৃতজ্ঞ হয়। মায়ের জন্যই অনু এ বাড়িতে এসেছে। শিখার খুব মেয়ের শখ ছিল। কিন্তু মিসক্যারেজ হয়ে সে কী বিপত্তি। যমে মানুষে টানাটানি চলেছিল দিন পনের। সেই ভয়ানক স্মৃতি তাকে কষ্ট দেয়। এদিকে মেয়ের শখ। তার সংসারে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। স্বামী পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফোরম্যান। অফিসের কাজ, আড্ডা নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। ছেলে বড় হতে কেমন যেন পর হয়ে গেল। শিখার অফুরান সময় কাজের অভাবে মলিন হয়ে যায়। ভালো লাগে না একঘেয়ে দিনযাপন। তার প্রবল বাৎসল্য রস তীব্র বেগে ভাইঝি অনুপমার দিকে ধাবিত হয়। মেয়েটাকে দেখতেও খুব মিষ্টি। অতি কষ্টে, অনেক যত্নে ভাজকে রাজি করিয়ে সে অনুকে এক বছরের জন্য নিজের বাড়ি নিয়ে এল। আসলে রাখার ইচ্ছে এক বছরের অনেক বেশি। কমিয়ে বলেছিল যদি গররাজি হয় বেশি বললে! তার মিসক্যারেজের ব্যাপারটা বোধহয় ভাজ বিভার মনে থাকবে। গাইগুঁই করলেও নাকচ করেনি। অনুপমার দাদা অমরেশ ওর চেয়ে

দুবছরের বড়। সুতবাং এক সন্তান তো কাছে রইল হামেশা। শিখা এভাবেই বোঝাবার চেষ্টা কবেছিল। দাদা আপত্তি করেছিল, কিন্তু মা মেয়েব মত আছে দেখে আব বাধা দেয়নি।

সেই থেকে অনু পিসির বাড়িতে। বছর দেড় কেটে গেছে। তাকে নাজিরগঞ্জের মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে পিসীমা। শিখাই অনুকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা কবে। কাছছাড়া কবতে মন চায় না। মনে হয় বিপদ যেন ওত পেতে আছে সর্বদা. সামান্য সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আগলে রাখে সবসময়। মেয়েটা লেখাপড়ায ভালো। স্কুলে সবার মন জয় কবেছে। সে যখন বেণী দুলিয়ে ড্রেস পরে ক্লাসে যায় শিখার মন ভরে ওঠে।

এ বাড়িতে এসে অনুপমার একটা সমস্যা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই তার হাতের কাছে জুটে যায়। না চাইলেই সে পেয়ে যায় অনেক কিছু। আবার কারণে অকারণে পিসতুতো দাদার কথায় হাঁ হাঁ করতে হয়। তার মতের সঙ্গে মিলুক না মিলুক মাথা নাড়তে হয়, হাসতে হয। যেমন সেদিন শঙ্কর ভোম্বলের দোকানের চপ নিয়ে অনুপমাকে বলল, কী দারুণ, না? বারবার শঙ্কর তার প্রিয় স্বাদের মনোহারিত্ব নিয়ে আবারও জিগ্যেস করে কী সুন্দর বল। খেলে মুখ ছেড়ে যায়, তাই না? কী বলবে অনুপমা! আসলে যে কোনো কড়া জিনিস বা ঝালের বিপরীতে তাব অবস্থান। তাব স্বভাব যেমন মিষ্টি তেমনি রসনারও তৃপ্তি মিষ্টিতে। মনের ভাব চেপে বেখে সে সুব মেলায়, সত্যি ভোম্বল ছাড়া এ চপ কে বানাবে!

হিন্দি গান নিযমিত শোনা শঙ্কবের আব এক প্রিয় ব্যসন। বোম্বেব তাবৎ কণ্ঠশিল্পীর একনিষ্ঠ অনুবাগী শ্রোতা সে। হাম তেরে সাথ রহেগা জনম জনম—এ জাতীয় গমগমে গান তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝনঝন করে বাজে। অনু হয়তো সে সময় একান্তে বসে নিবিষ্টভাবে বেলুড়ের বাড়ির কথা ভাবছে। এখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে। দাদা মাঠ থেকে খেলে ফিরছে। তারা ভাইবোন একসঙ্গে বসে খাচ্ছে কিছু। মা সন্ধ্যাআহ্নিকে বসেছে—এবকম খণ্ড খণ্ড চিত্রের স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন সে স্তব্ধ হয়ে বসে ভেবে চলেছে। তাকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখে ওদিকে শঙ্করের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। সে ভেবে নেয় তাব মতোই অনু চলতে থাকা গানের সুরে মগ্ন। তাই তাল মেলাতে যায়—সত্যি কী দরদী গলা! মন ভরে যায়, না? বিস্মিত অনু সজাগ হয়ে শঙ্করকে দ্যাখে। অন্য কিছু বলে তার মনে ব্যথা দিতে চায় না। সে বলে. আমিও সেটাই ভাবছিলাম। অপরের মনের গতিপ্রকৃতির তাবৎ হদিশ জানার স্বঘোষিত সক্ষমতার এ দু-একটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণ মাত্র। শঙ্কব নিজের ভাবেই বিভোব হয়ে থাকে এবং ধরে নেয সে যা করেছে বা করছে তাতে সম্পূর্ণ সানন্দ সম্মতি আছে অনুর। অনেক সময় অনু অন্যরকম বলে, কিন্তু তার স্বভাব অনুযায়ী সেটা এত মৃদু এবং নিরুচ্চার যে তা শঙ্করের কানে পৌঁছয় না। ফলে শঙ্কর নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

মাঝে মাঝেই শঙ্কর মামাতো বোনকে নিয়ে বেড়াতে যায়। অবশ্য দৌড় বেশিদূর নয়। এপাশে নাজিরগঞ্জের ফেরিঘাট ওপাশে বোটানিক্যাল গার্ডেন। এবার অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে টাইটানিক ছবিটার কথা। একদিন মায়ের সম্মতি নিয়ে সে দুপুরে

অনুকে নিয়ে টাইটানিক দেখতে যায়। মায়ের সামনে সে কখনই খুব উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয় না, ফলে শিখা তাদের মেলামেশায় বাধা দেয়নি।

টাইটানিক দেখে দুজনেরই খুব ভালো লাগে। এ ছবির বিপুল আয়োজন, বিশাল প্রস্তুতি এবং নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে তারা অভিভূত হয়। রোজ-জ্যাকের ভালোবাসার দৃশ্যে শঙ্কর প্রফুল্ল হয়। পরিণতির পথে ব্যাপক বাধায় সে কষ্ট পায়। আসলে তার স্বভাবই এমন—অল্পে চঞ্চল হয়ে ওঠা।

ফেরার পথে বড় বাধা। বাবুঘাট থেকে লঞ্চে উঠেছে, বৃষ্টি এল। বোটানিক্যাল গার্ডেন ফেরিঘাটে যখন নামল জলে ঝাপসা চারদিক। যদিও ছাতা ছিল, কিন্তু প্রবল বর্ষণ থেকে হাল ফ্যাশানের বহুবর্ণে চিত্রিত ছাতা কতটা বাঁচাতে পারে? ফলে ঝাঁকড়া জারুল গাছের তলায় আশ্রয় নিলেও ভিজে গেল দুজনেই। আর সেই বর্ষণসিক্ত অনু এক নতুন চেহারায় ধরা দিল শঙ্করের চোখে। চুল ভিজে গেছে খানিক, দু-একটা চূর্ণ কালো কুন্তল তার গোলাপি কপালে পড়েছে। তাতে ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরবিন্দুর মতো ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু! অনুর দীঘল আঁখি কালো পল্লবে ঢাকা। ঠোঁট ভেজা ভেজা। অবিশ্রান্ত বর্ষণে গঙ্গার ওপার কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেসব দেখাও দরকার নেই শঙ্করের। আপাতত তার কাছে এপার আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে চেতনায়। শঙ্কর অপলক দেখছে অনুকে। আস্তে করে সে অনুর চিবুক তুলে ধরে। ধীরে ধীরে তার ঠোঁট ছুঁয়ে যায় অনুর ঠোঁট। শরীরে প্রচণ্ড তাপ টের পায় সে। জীবনে প্রথম চুম্বনের স্বাদ তাকে অস্থির উন্মাদ করে দেয়। তার হাত নিশ্চিত অমোঘ আকর্ষণে অনুর বুক খুঁজে নেয়। তার ঠোঁট সারা মুখে ঘুরে বেড়ায়। বিপুল তৃষ্ণাতাড়িত সে অনাস্বাদিত আবেগে কেঁপে ওঠে।

লবণাক্ত একটা স্বাদ টের পায় অনু তার জিভে ঠোঁটে...তারপর সমস্ত অবয়বে সেটা ছড়িয়ে যায়। মৃদু একটা অসহ্য অনুভব তিরতির করে ফেরে। শঙ্কর যে এমন করবে সে ভাবতে পারেনি। পিসতুতো এই দাদা বড় আবেগপ্রবণ সেটা অনু বোঝে, কিন্তু অপরপক্ষও সেই আবেগে জারিত হচ্ছে কিনা এটা কেন শঙ্কর বোঝে না? এরকম করলে সে আর আসবে না এটা ঠিক করে নেয়, এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। অনু আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ়ভাবে বলে, এমন করলে আমি আর তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব না।

শঙ্কর বিস্মিত হয়। অনুর এমন দৃঢ় অভিব্যক্তি সে আগে দেখেনি। তাই বিস্ময়েব মাত্রা বেশি। তার মনে হয় অনু জোর করে নিষেধের বাতাবরণ তৈরি করছে তাদের মধ্যে। চেষ্টাকৃত বলে তা অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই অস্বচ্ছতা কাটাতে পারলেই দেখা যাবে আসল অনু তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে—ঝলমলে সকালের প্রথম রোদেব মতো।

মে মাসে স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে। দুপুরের দিকে রোদ্দের তাপ বেশি। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। বারান্দায় বসে টের পাচ্ছে অনুপমা। উপরে ছাদ, সরাসরি তাপ আসছে না, তবু গরম একটা হল্কা উঠে আসছে মাটি থেকে। বাতাস গরম লোহার মতো গায়ে বিঁধছে। পিসি দুপুরে ঘুমোয়। তার ঘুম আসছে না বলে বাইরে বারান্দায় এসে বসেছে। চোখে পড়ে ভরদুপুরে একটা মেয়ে ছাতা মাথায় যাচ্ছে। কিছু ফেরি

করছে বোধহয়। মাথার ছাতা রোদ, তাপ থেকে খানিক রক্ষা করছে। সত্যি, তাপ থেকে বাঁচার জন্য ছায়ার বড় প্রয়োজন। নাহলে শরীর মন পুড়ে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। অনুপমার জীবনে ছায়া আছে। বাড়িতে বাবা-মা, এখানে পিসীমা ছায়া দিয়ে চলেছে। তবে ছায়া বেশি হলেও যেন সবকিছু আগলানো আগলানো মনে হয়। তার যে এত ছায়া চাই না। এইসব কাঠফাটা গরমের দুপুরে দাদার কথা বড় মনে আসে। গরমের ছুটিতে সে আর দাদা কতরকমভাবে সময় কাটাত, ভাবতেই মন কেমন করে ওঠে। এইরকম কত দুপুরে তারা পড়েছে টেনিদা, ফেলুদা বা কাকাবাবুর রোমহর্ষক কাহিনী। দুপুরের তাপকে কোথায় ফেলে রেখেছে—তেঁতুল, আমসত্ত্ব আচারের টান। মা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের দুপুরের রুটিন শুরু হয়ে যেত। পাকা তেঁতুলে কাঁচা গুঁড়ো লঙ্কা, আদা তেল পেঁয়াজ দিয়ে যা আচার তৈরি করত অনু! সঙ্গে আমসত্ত্ব থাকলে তো কথাই নেই। এর ওপর ছিল মায়ের তৈরি করে রাখা কুলের আচারের আস্বাদ লুকিয়ে নেওয়া। তখন মনে হয় কোথায় গরম, কোথায় তাপ! এরকম ছুটি থাকুক চিরকাল আর তাবা খেয়ে যাক আমসত্ত্ব, চুরাণ, কুলী। মাঝে মাঝে গরমের ছুটিতে চলে যাওয়া হত মন্ত্রেশ্বরে। ওদের দেশের বাড়ি। সেকানেও বড় সুন্দর কেটে যেত সকাল থেকে সন্ধে। সকালে বাড়ির ঠাকুরদালানে পুজো দেখে খানিক পড়া। তারপর বড়রা অফিস চলে গেলেই নানারকম খেলা তাদেব ডেকে নিত—শিরোগিজো, বাঘবন্দী, কবাডি। দাদা প্রায়ই ক্রিকেটও খেলত। তখন অন্যদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা। এক-একদিন চলে যেত বড় বাগানের পুকুরে চান করতে। ওখানে তার সাঁতার শেখা সর্বানীর কাছে। প্রথম প্রথম সে কী মুগ্ধতা জলে নামলে। ঘন্টা-দুয়েকের আগে চান সারা হত না কখনও। সেবার সোনা কাকিমার মুখে বড়বাগানের দিঘির সর্বনেশে কথা শুনেও সাঁতারের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। সোনা কাকিমা বলেছিল ওই দিঘির তলায় গোপন সুড়ঙ্গ আছে। মাঝ বরাবর একটা গোল মুখ হাঁ করে থাকে। সেখান দিয়েই নেমে গেছে সুড়ঙ্গের সিঁড়ি। ওই গোলকধাঁধা নাকি দুজনকে টেনে নিয়েছে গত ক-বছরে। তবে সুড়ঙ্গ কেন তৈরি হয়েছিল বা কী যে আছে নিচে সেটা সঠিক কেউ জানে না। এক-একজন এক এক রকম বলে।

এসব ভাবতে ভাবতে মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে অনুপমার। এখানে থাকতে আর ভালো, লাগছে না। এবার দাদার জন্মদিনে বাড়ি গিয়ে আর আসবে না এখানে। দাদার জন্য থেকে থেকেই মন আনচান করে ওঠে তার।

—কী রে, কী এত ভাবছিস তখন থেকে? মন খারাপ?

শঙ্করের প্রশ্নে চমক খায় অনু। তাড়াতাড়ি বলে, না কিছু নয়। ঘুম আসছে না, তাই একটু বাইরেটা দেখছিলাম।

—যাঃ তুই লুকোচ্ছিস আমার কাছে। আমি অন্তত মিনিট পাঁচ ওপাশে দাঁড়িয়ে তোকে লক্ষ করছি। তোর হুঁশ নেই কোনো। কেমন যেন একটা বেদনার ছায়ায় ভরেছে তোর মুখ, ভেবে চলেছিস আনমনে। অ্যাই অনু, তোর খুব দুঃখ, তাই না? তাকা আমার দিকে। চ, সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যাব। যাবি?

অনুর দুখী দুখী ভাব দেখে শঙ্করের খারাপ লাগে। মনটা যদি ভালো না থাকে তবে কীসের টানে এখানে থাকবে। এটা কাটানো দরকার তাড়াতাড়ি।

—সে আবার কোথায়? অনু ভেতরের ভাব লুকোনোব জন্য ঈষৎ কৌতূহল দেখায়। শঙ্কর উৎসাহিত হয়, সে খুব ভালো জায়গা। তিনপাহাড়ী দক্ষিণের বিল বলে সকলে।

—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো!

—হ্যাঁ, নামের চেয়ে জায়গাটা বেশি সুন্দর! বাসরাস্তা থেকে দক্ষিণে আবও দুমাইল যেতে হবে। তারপর বাঁদিকে সরু রাস্তা ধরে শর্টকাট দিয়ে মিনিট কুড়ি হাঁটলেই তিনপাহাড়ী। তিনটে বিশাল বটগাছ একসঙ্গে আছে জাযগাটায। তাই এরকম নাম রেখেছে লোকে। ওটাকে ডাইনে রেখে একটু গেলে বিশাল বিল। শীতে কত যে পাখি আসে কী বলব! অত বড় বিল, তার জল অব্দি দেখা যায় না, এত অগুনতি পাখি। এখন গরমে পাখি অত নেই কিন্তু পরিষ্কাব টলটলে জলে আকশেব মুখ দেখা যায়। মাঝখানে একটা টিলা মতো আছে। কিছুদিন থেকে বোটিং-এর ব্যবস্থা হযেছে। দশ-মিনিট দাঁড় বাইলেই সেই মাঝের দ্বীপ। ব্যাস কেউ নেই কোথাও। যেন চারপাশের চেনাশোনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল।

—কী আছে সেই দ্বীপে? অনু বর্ণনা শুনে উৎসাহিত হযেছে।

—কিছু নেই, বিলকুল ফাঁকা। একদম মাঠ নয় অবশ্য, অজস্র গাছ সারি দিযে আছে। তাই তো এত ভালো! শুধু বসে চারপাশ দ্যাখো তারপর একঘেয়ে লাগলে বোটে চেপে ফেরত চলে এসো। তিনপাহাড়ীতে ঘুরে বেড়াও ইচ্ছে মতো। শুনে ভালো লাগছে তো? গেলে আরও ভালো লাগবে। সুন্দব তো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায না পুরোটা। শঙ্কর অনুব মুখেব দিকে তাকিযে মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে।

—হ্যাঁ ভালো তো লাগছে। একবার গেলে হয। অনু যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বলে ফেলে!

—নিশ্চয়ই শিগগির নিয়ে যাব তোকে। দেখবি ফিবে আসতে মনেই চাইবে না। এত অফুরান আনন্দভাণ্ডারের জোগান সেখানে।

—শঙ্করদা ওটা কী পাখি?

—কোনটা? শঙ্কর আঁতিপাতি করে পাখি খোঁজে।

—ওই যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর পাখিটা ..সাদা কালোতে মেশানো, লম্বা ল্যাজ। ল্যাজের শেষটা দ্যাখো কেমন লম্বা, ডানায় সাদা কালো ছিট-ছিট, যেন তুলি দিয়ে এঁকেছে কেউ, চেরা মাথায় সাদা দাগ...

—ওহ্ ওটা তো স্পটেড ফর্কটেইল। পাহাড়ী অঞ্চলের পাখি। শীতে এখানে খুব আসে। আমি চিনতাম না। গতবার এখানে দেখে গিয়ে বইতে ছবি দেখে নামটা জেনেছি। তাও এখন সবে আসতে শুরু করেছে একটু একটু করে। ডিসেম্বরের শেষে খালি পাখি আর পাখি। তখন খুব সুন্দর লাগে।

দুজনে এগিয়ে যায়। তিনপাহাড়ী পেরিয়ে বিলেব জলে ভাসে। দুচারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে এপাশ ওপাশ ঘুবছে। বিলটা বেশ বড়। নৌকোয় দাঁড় বেয়ে একসময় মাঝদ্বীপে পৌঁছয়। মোটর নেই, শব্দ এখানে শান্ত সমাহিত ভাব নষ্ট করবে। দ্বীপটা একদম নির্জন। গাছগাছালিতে নিবিড়ভাবে ঢাকা। নিচে ছিমছাম পথে মোরাম বেছানো। ওপরে

নভেম্বরের নীল আকাশ। যেন কাছে নেমে এসেছে গাছেদেব সঙ্গে কথা বলবে বলে। সাদা হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, ফলে একটু হাওয়া দিলেই তিবতির করে কেঁপে পাতারা শন শন ধ্বনি তুলছে। যেন অভ্যাগতদের সমাদরে ডাকছে। বড়-বড় গাছ মাথা তুলে আকাশেব নীলিমা স্পর্শ করতে চাইছে। যাব জন্য নিজে পথটা একটু অন্ধকার। তবে এ আঁধার ভয় দেখায় না, কাছে টানে। ডোবায় অতল টানে। সবুজ দ্বীপে মোরামের রাস্তায দুই যুবক যুবতী যাচ্ছে। হঠাৎ করে দেখলে চিত্রটি মনোরম। কিন্তু দুজনের মধ্যে কত ব্যবধান। পৃথিবীতে এবকম কত ভুল খণ্ডচিত্র যে বচিত হয়!

একটা বড় চাঁপা গাছের নিচে বসে ওরা। শঙ্কর খুব উৎফুল্ল। অনুরও ভালো লাগছে। এত কাছে বেড়ানোর এরকম আয়োজন! শঙ্কর বিপুল উৎসাহে কথা বলে যায়। কত কী যে জমে আছে তার আঠারো বছরের ভাণ্ডারে। আজ অনুকূল পরিবেশে সব হু হু করে বাইরে আসতে চায়। কোনটা আগে, কোনটা পরে বলবে ঠিক করতে দিশেহারা হয়ে যায়। সময় গড়ায়। বিকেলের আলো কমে আসে। তখন শঙ্কর অনুর হাতটা মুঠিতে নিয়ে বলে, কী রকম লাগছে? আবার আসতে ইচ্ছে করছে না?

অনুর অত আবেগ আসে না। তার চিন্তাভাবনা শীতের নদীর মতো তিরতির খাতে বয়ে চলে। জাযগাটা তারও পছন্দ হয়েছে। সে আস্তে বলে, হ্যাঁ সুন্দর তো লাগছেই।

শঙ্কর উৎসাহিত হয়। বাড়ির চাপা পরিবেশে যে কথাটা বলি বলি করেও চাপা ছিল, সেটা এই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসে অক্লেশে। সে অনুকে অপাঙ্গে দে..ে নিয়ে বলে, একটা কথা বহুদিন বহু চেষ্টা করেও বলতে পারিনি। তোকে ছাড়া অ... কী হবে? আমি তোকে ভালোবাসি অনু, ভীষণ ভীষণ...

ঠিক এইটাই ভয় পাচ্ছিল অনু। তাই এখানে আসতে তার দ্বিধা ছিল। সে না শোনার ভান কবে দূরে দৃষ্টি ফিরিযে নিশ্চুপ হযে রইল।

অধৈর্য শঙ্কর তাকে বলে, তুই কী বলিস?

অনু কী আর বলে? সে যেন সবে এইমাত্র শুনছে এবকম কবে বলে, ভালোবাসা! কী জানি তেমন কবে ভাবিনি তো কোনোদিন কাকে বলে। তাছাড়া প্রেম, ভালোবাসা এসব তো সরলেব মতো সোজা নয়। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ঠিক মিলে যাবে...

আহত শঙ্কর ধীরে ধীরে তাব বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি মেলে অনুর মুখে। তারপব আঁতিপাতি করে সেখানে কী যেন খোঁজে। অস্ফুটে বলে, আমি কি এতটাই ভুল ভেবেছি!..

—মা তোমার চিনির শিশিগুলো নোংরা হয়েছে। ধুয়ে রাখি। মা বিভা অনুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজ করতে ইচ্ছে করছে? ধোও তাহলে।

মেয়ে দুদিন হল বেলুড়ে এসেছে। দাদার জন্মদিন আজ, সেইজন্য। পিসেমশাই দিয়ে গেছে। ঠিক আছে পিসীমা এসে নিয়ে যাবে। ভাইপোর জন্মদিনে আসা আর অনুকে নিয়ে যাওয়া দুটো কাজ হবে। কটা দিনেব জন্য এসেছে অনু, বিভা তাকে কী কাজ করতে দেবেন? কিন্তু মেয়ে যে শোনে না। খালি মায়ের কাছাকাছি থাকছে। কাজ দিতে বলছে। কিছু কি বলতে চায় ও, বিভা ভাবেন, দেখা যাক অপেক্ষা করে।

শিশি ধুয়ে অনু বলে, মা এবার একটু আলু কেটে দি তরকারির জন্য?

বিভা শশব্যস্ত হন, না না আঙুলে নোংরা লাগবে। তাছাড়া কেটে গেলে তোর নরম চামড়ায় কত লাগবে।

অনু আস্তে বলে, তুমি দেখিয়ে দিলে কাটবে কেন মা। আমি তোমার আনাজ কেটে দেব, শিশি ধুয়েদেব, আরও কাজ করব। শুধু এখানে থাকব মা। পিসির বাড়ি আর যাব না।

বিভা বিস্মিত হয়ে অনুকে দেখেন, কেন রে কী হয়েছে?

অনু তার বড় হরিণ চোখ মেলে ধরে, আমার ওখানে থাকতে ভালো লাগে না মা।

বিভা দেখেন সেই ফর্সা মুখে মেঘ ছেয়ে এসেছে। আর বাজালে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। তিনি হেসে মেয়েকে আদর করেন, বাঃ তোর যখন ইচ্ছে, তুই এখানেই থাকবি। এমনিই থাকবি, কিচ্ছু করতে হবে না। আমি আছি কী জন্য? সময় হোক তখন করবি।

অনু মায়ের কাঁধে মাথা রাখে, তুমি কী ভালো মা।

শিখা খুব সুন্দর একটা জামা নিয়ে এসেছে অনুর জন্য। ঘি আর লাল রঙে মেশানো লেহেঙ্গা চোলি। সামনে সবুজ প্রজাপতি আঁকা। সেটা অনুকে পরাতে সে নিজেই একটা প্রজাপতি হয়ে গেল। উড়ে উড়ে ঘুরছে যেন। শিখা তো অবাক। এ যে চেনা অনু নয়, অচেনা সুন্দর দূরের প্রজাপতি। ধরতে গেলে যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়। শিখা কত বোঝাল, চোখের জল ফেলল তবু সে ধরা দিল না। তখন শিখা বিভ্রান্ত মুখে ভাজের দিকে তাকাল। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। এবার কিছু বলা দরকার বুঝে বিভা শান্ত স্বরে বলেন, ছেড়ে দাও দিদি, যেতে মন নেই জোর করে কী লাভ? এখানেই থাকুক এখন থেকে। তুমি ওকে প্রজাপতি আঁকা জামা দিয়েছ না? ওটার মতো বোধহয় ডানা মেলে দিয়েছে।

শঙ্কর অনুর ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে নাজিরগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। একটা গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে, যাতে বোঝা না যায়। মাকে একা আসতে দেখে তার মনটা মুচড়ে ওঠে। ব্যথা ছড়িয়ে যায়। এ এমন দুঃখ কাউকে বলা যাবে না। নিজেকেই বয়ে বেড়াতে হবে একা একা। জীবনে এই প্রথম তার আঘাত পাওয়া। তার দুঃখে বোধহয় গাছের পাতা কেঁপে উঠল শনশন হাওয়ায়। এপাশ-ওপাশ নুয়ে বলতে চাইল, এই তো শুরু। তুমি মানুষ হচ্ছ না।

শঙ্কর চেয়ে রইল। ফাঁকা ধূ ধূ দক্ষিণের বিল। কোথাও পাখি নেই। তাহলে কি মরশুম আসেনি? কে জানে!

অন্য প্রেম অন্য প্রজন্ম

গৌতম দে

কার্লোসের ব্যাট থেকে ছুটে আসা লাল গোলার মতো বলটা লীনার মুখে সরাসরি আঘাত করলো।

লীনা চিৎকার করে উঠলো। স্বপ্ন ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়লো।...স্বপ্নাবিষ্ট লীনার চোখে মুখে তখনও আতঙ্কের হাঁটাহাঁটি। পাখি-মা তার শাবকদের রক্ষা করতে যেভাবে ডানা দিয়ে দুর্গ প্রাকার গড়ে তোলে, লীনাও সেভাবে দুটি হাত দিয়ে তার পেটটাকে আড়াল করতে চাইলো। তারপর স্বপ্নের ঘোর খানিকটা কাটিয়ে লীনা বিছানায় উঠে বসলো। আকাশ পাগল মানুষ যেভাবে তাঁবু ছিঁড়ে আকাশ দেখতে চায় লীনাও তেমন ত্রস্তভাবে পেটের নিচ পর্যন্ত শাড়ি শায়া নামিয়ে পেটটাকে মুক্ত করলো। তারপর স্নেহ-মমতায় হাত ভিজিয়ে আস্তে আস্তে সেই হাত পেটের ওপর বুলোতে লাগল।

সময় এখন সন্ধ্যে ছুঁয়েছে। লীনার ঘরে এখনও বাতি জ্বলেনি। অন্ধকারে দেহ ডুবিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে। অন্ধকার এবং নির্জনতা স্মৃতিচর্চার প্রশস্ত প্রান্তর। অতীত সমুদ্রের গভীর অন্ধকার থেকেই তুলে আনতে হয় স্মৃতির মণিমুক্তা।—এই চার তলার ফ্ল্যাটটিতে লীনা একাই থাকে। যদিও লীনা তার একাকীত্বকে কোনও দিনও স্বীকার করে না। তার মনে হয় একাকী মানুষকে সঙ্গ দেয় তার আশৈশব স্মৃতি। আর সমস্ত স্মৃতিরই উপাদান প্রকৃতি অথবা মানুষ। যদিও এখন লীনা শরীরী অর্থেই একক নয়। তিলে তিলে বেড়ে ওঠা একটা ভ্রূণ এখন তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এবং অপরাপর স্মৃতির মানুষ-প্রকৃতির পাশাপাশি একজন কালো মানুষের স্মৃতিও তার প্রায় সব সময়ের সঙ্গী।

লীনা কার্লোসের ফ্যান। কার্লোসকে বলা হয় 'মেসিন অব রানস্।' ক্রিকেট দুনিয়ায় দ্রুততম সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব ওঁরই। বিপক্ষের বোলিং আক্রমণকে ভেঙে তছনছ করে দিতে ওঁর জুড়ি নেই। সানির মতো অত বেশি টেস্ট-সেঞ্চুরি করার রেকর্ড না থাকলেও ব্যাটিং এভারেজ ওঁর সানির চেয়েও ভালো। ওর শারীরিক গঠনটা কালো পাথরের মতো। চকচকে। কঠিন। পৌরুষদীপ্ত। অনায়াসে ও রামকিঙ্করের একটা সাবজেক্ট হতে পারতো।...ঠোঁটটা পুরু। ওল্টানো। একমাথা কালো চুল। যেন কেউটে সাপের সদ্যোজাত শাবক কিলবিল করছে। দাড়িগুলো যেন ওর কৃষ্ণবর্ণ মুখের আরণ্যক অলঙ্করণ। চোখ দুটো অপূর্ব সুন্দর। মনটা কার্লোসের আশ্চর্য রকমের কোমল। মনে হয় না এই মানুষটাই মাঠের স্কোর বোর্ডটিকে ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলে। লীনা তার মনের সন্ধান পেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষটা কত অসহায়। যে কোনও নারীর স্নেহচ্ছায়া পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে—জীবনের রৌদ্র দাহে এমনই ক্লান্ত সে। আশ্রয়হীন। অনেক নারীই পুরুষের আশ্রয়হীনতার সুযোগ নেয়। আশ্রয় চাইলে তাকে আরও নিরাশ্রয় করে তোলে। লীনা তা পারেনি। কার্লোসের এই ব্যাথার ধু ধু মাঠে একটা তাঁবু টাঙিয়ে দেবার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল

সে। পরিচয়টা নেহাতই অটোগ্রাফ শিকারীর ভূমিকা থেকে। সে-ই-ই ইডেনে নেট প্র্যাকটিসের দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্বের বয়েস আট মাস। লীনাব দেহে আজ সেই বন্ধুত্বেরই স্মারক চিহ্ন!

লীনা বাংলা সিনেমার উঠতি নায়িকা। ইদানীং টিভি সিরিয়াল করে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যদিও সে গ্রুপ থিয়েটারের মেয়ে। তাই আদর্শ আর বাণিজ্যের মধ্যে একটা রফা-সংগ্রাম তাকে চালাতেই হয় এখনও। আর যেমনটা হয় আর কি—একটু একগুঁয়ে, জেদী, প্রচলিত নিয়মগুলোকে ভেঙে তছনছ করবার বয়েসি আবেগ, এলিয়েনেশন, একজিস্টেনসিয়ালিজম, লিভ-টুগেদার, কফি হাউস, নন্দন, টালিগঞ্জ, গলফগ্রীন, আবার মধ্যবিত্ত পিছুটান, সংস্কার ইত্যাদির আবর্তনে পড়ে আছে সে। লীনার একা থাকার মধ্যে কাজ করে অভিমান ও স্বেচ্ছাচারিতা। যে দুটোর জন্ম তার পরিবার ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে। পূর্ব ইতিহাস না টেনেও বলা যায় লীনা এখন সুখে আছে। এবং দুঃখে আছে। নিজের কাছে কখনও সহায় এবং অসহায় হয়ে আছে।

তার স্ফীত পেটের ভেতর ভ্রূণের প্রতি যে মমতা তা আত্মপরায়ণতার সামিল—একথা লীনা স্বীকাব করে। এবং জানে যতদিন শিশুর মধ্যে অহং জন্মলাভ না করে ততদিন সেই শিশু মায়েরই দেহের অংশ বিশেষ। আসলে মা শিশুকে ভালবেসে প্রকারান্তরে নিজেকেই ভালবাসে। লীনা তার নগ্ন পেটেব ওপর থেকে সহসা হাত সরিয়ে নিল না। কিন্তু মস্তিষ্কে এই জাল বুনে চলল যে, কার্লোসের বেপরোয়া ব্যাটিং-এর বিপক্ষে তাকে অসহায় ফিল্ডার করে তুলল কেন এই স্বপ্নটা। কার্লোসের কাছ থেকে স্বপ্নে এই আঘাত পাওয়াটা কোন্ পরিণামের বার্তাবহ।

একথা সকলেরই বোঝার অপেক্ষা রাখে না যে, লীনা এবং কার্লোস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়নি। এদেশে 'কুমারী মাতা' ব্যাপারটা একেবারে নতুন না হলেও এখনও পাবলিক বেশ খায়। পাঠকেরা চোখ দিয়ে চেটে নেয় কাগজের এইসব রসালো গসিপগুলো। তার ওপর দু'জনেই স্টার। বিশেষত কার্লোস। কাগজওয়ালারা তাই খবরটা বেশ ফলাও করে ছাপছে। পারলে যেন লীনার প্রতি মাসের প্রেগন্যান্সি নিয়ে একটা 'ক্রোড়পত্র' বের করে ফেলে। যদিও লীনা এ-নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। কেননা তাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পাবলিসিটিটা একটা মেন ফ্যাক্টর। গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটাই দাঁড়িয়ে আছে প্রচারের কাঁধে ভর দিয়ে। অন্তত ফিল্ম লাইনে যে এইসব পার্সোনাল স্ক্যাণ্ডাল-এর প্রচারের ফল বেশ ভালোই তা লীনা ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে। নতুন ছবির অফার আসছে। সাইন হচ্ছে।...কিন্তু মূল প্রশ্ন তো সেখানে নয়। আত্মীয়-পরিজন, পরিচালক-অভিনেতা, বন্ধু-হিতৈষী সকলের কাছ থেকেই অ্যাবরসনের অনুরোধ আসছে। লীনা তাতে একেবারেই রাজি নয়। তাদের দেওয়া যুক্তি-বুদ্ধি সে মেনে নিতে পারছে না। সে বিভোর হয়ে আছে স্বপ্নে। তার মনে হয় একটা ভ্রূণ মানে তো শুধুমাত্র মানুষের অঙ্কুর নয়। একটা ভ্রূণ মানে স্বপ্ন। শুধু অস্থি-মজ্জায় নয়, স্বপ্নের ক্রম-আস্তরণেও সে বেড়ে ওঠে। তার প্রসবের আনন্দ যেন কোনও অভিনেত্রীর মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবির মতো।

তার এই যে স্বপ্ন বা আশা তাকে আর একটা স্বপ্ন প্রতিপক্ষের মতো এসে এভাবে

আঘাত করে কেন লীনা তা ভেবে পায় না। কার্লোস তো তার প্রতিপক্ষ নয়। আসলে বোধহয় পরিপার্শ্বের বিষোদগার তার অবচেতনে কার্লোসকে প্রতিপক্ষ করে তুলেছে। আর কী নিষ্ঠুর সে। ক্রিজে দাঁড়িয়ে তার আক্রমণের সমস্ত লক্ষ্য হয়ে উঠেছে লীনা নিজে। এমনকি তার সন্তান পর্যন্ত! নিরুচ্চারিত হলেও 'সন্তান' শব্দটি লীনার সারা শরীরে অনুরণন তোলে। লীনা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় তার সন্তান যেন কার্লোসের মতো শক্তির অধিকারী হয়। তার মতো বড় হয়ে ওঠে। 'তার সন্তান' কথাটি লীনাকে এক নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কার্লোসের কেন নয়? কার্লোসেরও তো। তার এই ভাবী পিতৃত্ব তো আসমুদ্র হিমাচল রটে গেছে। কিন্তু কার্লোসের তাতে কী-ই বা যায় আসে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে আছড়ে পড়েছে কি এই ঢেউ। প্রফেশনাল ক্রিকেটারদের কাছে জয়ের স্বাদটা যেমন ক্ষণিকের, তেমনি পরাজয়টাও। কিন্তু জীবনের জয় পরাজয়ের ইনিংসটা যে অনেকদিন ধরে খেলতে হয়। ক্রিজে দাঁড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন মনোসংযোগের দরকার হয়। কিন্তু এখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটা উঠল কেন—লীনা তা ভেবে পায় না। যদি ওঠেই তবে সিরিজ জিতল কে—কার্লোস, না লীনা? স্থানীয় কাগজগুলোর এমনকি তার শত্রু মিত্র সকলেরই ধারণা লীনারই পরাজয় ঘটেছে। আসলে লীনা পরাজয়ের স্মারক বহন করছে। কিন্তু, লীনা তা মানে না। কেননা, লীলা স্ব-ইচ্ছায় কার্লোসের সন্তানের মা হতে চেয়েছে। কেউ, এমনকি কার্লোসও, তাকে প্ররোচিত করেনি। তার অবৈধের প্রশ্নটিকেও লীনা আমল দেয় না। মানে না।

কার্লোস বলতো, তারা হাসি শিখেছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের কাছে। ঝড়ের কাছে তারা ফাস্ট বলের ট্রেনিং নেয়। উঁচু বাড়ির ছাদে টাঙানো বজ্ররক্ষীর কাছে শেখে কিভাবে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসা বল তালুবন্দী করতে হয়। স্রোতের বিপক্ষে সাঁতরে চলা দক্ষ সাঁতারুর প্রত্যয় তাদের ব্যাটিং অনুপ্রেরণা। আর তারা ভালবাসা শেখে নদীর কাছে। অরণ্যের কাছে নেয় যৌনতার পাঠ। ক্যালিপসো-র সুরে সুরে জীবনটাকে উপভোগ করে তারা।...কার্লোসের কথার মধ্যে জাত্যাভিমান থাকলেও লীনা তার সংসর্গে থেকে এর অনেকটাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। লীনার মনে হয়েছে কার্লোসের মতো ক্যারিবিয়ান পুরুষই তার যোগ্য। কার্লোসের কাছে আজ আর তার কোনও প্রত্যাশাই নেই। জীবনে হয়ত আর দেখাও হবে না। কোথায় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আর কোথায় এই কলকাতা। সে তার প্রেগন্যান্সির সংবাদটাও জানে না। জানায়নি সে। জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ, যখন সে এই চারতলার জানালা থেকে ফুটপাতের ওপর ছেঁড়া মাদুর পেতে ঝুপড়ির এক সন্তানসম্ভবা বাসিন্দাকে রোদে শুয়ে থাকতে দেখে এবং তার স্বামী যখন তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পেটের ওপর কান দিয়ে তাদের ভাবী সন্তানের স্পন্দন শুনে খুশিতে খিলখিল করে হেসে ওঠে তখন অনিবার্যভাবেই কার্লোসের কথা মনে পড়ে যায়। একটা শূণ্যতা তাকে গ্রাস করে। ঈর্ষা হয় ওই ফুটপাতের বাসিন্দাদের ওপর।

লীনার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল হাতের ওপর পড়তেই সে সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। এতটা সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। এখনও

অনেকটা পথ। কাপড় গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে সে। একটু পায়চারির ভঙ্গিতে মাথাটাকে সামান্য পেছনে হেলিয়ে দুটি হাত ঝুলিয়ে ঘরের মধ্যেই হাঁটতে থাকে। দেহের ভারসাম্য রেখে এখাবেই ডাক্তার হাঁটতে বলেছে তাকে। হঠাৎ বমি বমি পায়। একটু দ্রুত, খানিকটা টলতে টলতে বেসিনে গিয়ে বমি করে। প্রতিটি ওয়াক-এ পেটে হাত দেয়। যেন ওই ঝাঁকুনিতে ভ্রূণের কোন ক্ষতি না হয়। চোখে মুখে জল দিয়ে আবার টলতে টলতে এসে ডাইনিং রুমের একটা সোফার ওপর বসে পড়ে। ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও একটা সিগারেট তুলে নেয় মুখে। আগুন জ্বালে। ধোঁয়া ছাড়ে। নিজের তামাম অসহায়তা দূর করতে চায়। যথাসম্ভব সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করে।

লীনার ফ্ল্যাটের নিচেই নার্সিং হোম রয়েছে। সন্দেহ নেই এই নৈকট্য তাকে এ অবস্থায় অনেকটা বল জোগায়। ইন্টারকম-এ যোগাযোগ করলেই ডাক্তার চলে আসে। রাতে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে। ফলে এ-ব্যাপারটায় কোনও অসুবিধে নেই। এ ছাড়া একজন ঠিকে কাজের লোক আছে। রান্না-বান্না, ঘর-গেরস্থালি যতটুকু থাকে তা সামলে দুপুরের দিকে সে চলে যায়। সকালে এবং বিকেলে শিল্পী সংঘের কেউ কেউ আসে। তার শরীর, ইতি কর্তব্য এবং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে টুকটাক কথা হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা আগে দু'একজন আসতো। যে কোনও কারণেই হোক এখন আর কেউ আসে না। লীনাও চায় না তারা আসুক। এলেই তারা গর্ভপাতের অনুরোধ করে। বাইরের পৃথিবীর বিরূপ সমালোচনা শুনিয়ে তার মন ভেঙে দিতে চায়। লীনা এতে উত্যক্ত হয়ে ওঠে। অবাঞ্ছিত মনে হয় এই সব হিতৈষীদের।

সিগারেটটা খানিকটা খেয়ে অ্যাশ ট্রে-তে গুঁজে দেয়। চকিতে সেন্টার টেবিলের নিচ থেকে রাইটিং প্যাড আর পেন বার করে। চিঠি লিখতে বসে কার্লোসকে। ..ডিয়ার কার্লোস, তুমি কেমন আছ? এখানে আমার খুব বিপদ। ভীষণ একা। তুমি শীগগির চলে এসো...। এই পর্যন্ত লিখে চিঠিটা মুহূর্তেই ছিঁড়ে ফেলে লীনা। কি ছেলেমানুষী করছে সে। একি কটক যে, বাই উঠলেই আসা যায়? তা ছাড়া ওর ওখানে টেস্ট সিরিজ চলছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ভীষণ ব্যস্ত ও। সে কি কখনোই ভেবেছিল যে, কার্লোস আর পাঁচটা স্বামীর মতো তার ডেলিভারি রুমের সামনের করিডোরে অস্থিরভাবে পায়চারি করবে? ভাবে নি। তাদের সংসারের জন্য কার্লোস রোজ বাজার যাবে। আলু-বেগুন তেল-নুন কিনে আনবে। অফিস যাবার আগে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসবে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে তাগাদা দেবে...এসব কোনওদিন সে ভাবেনি। সে নিজেও কি কখনও সেভাবে কারও বউ হতে চেয়েছিল? সেভাবে গুছিয়ে সংসারী হতে? অথচ তার এখনকার প্রতি পলের অনুভূতি যে পৃথিবীর কোনও সংসারী মেয়ের চেয়ে আলাদা নয় তা সে বোঝে। ফুটপাতের সন্তানসম্ভবা বাসিন্দাটির থেকে তার আসন্ন মাতৃত্বের স্বাদ একটুও ভিন্ন নয়। যে শিশু জন্ম নেবে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার স্বপ্ন আর পাঁচটা মায়ের মতো তারও। তথাকথিত সংসারী হতে না চাইলেও এই মুহূর্তে ওই সংসারের প্রতিই সে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে।

ইদানীং আর একটা চিন্তা তাতে অশান্ত রাখে। অ্যাবরসনের পথে না হয় সে গেল না। যদিও আর বোধহয় যাওয়া সম্ভবও নয়, কিন্তু যে শিশু জন্ম নেবে সমাজে তার পরিচয়টা নির্ণীত হবে কিভাবে? সে যদি বলে চিত্রাভিনেত্রী লীনা গুপ্ত আমার মা, যদি বলে পৃথিবী বিখ্যাত ক্রিকেটার কার্লোস আমার বাবা—তবে কি এই আমুদে সমাজ হেসে উঠে তার চারিত্রধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো সুযোগ ছেড়ে দেবে? ব্যঙ্গে বিদ্রূপে সেই শিশুর কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্বকে অস্থির করে তুলবে না? ওফ্, ভাবা যায় না। কিন্তু, লীনা এটা বোঝে যে আসলে একটা মধ্যবিত্ত হীনমন্যতার বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রগতি চেতনা। অগ্রবর্তী ভাবনার প্রতি পদক্ষেপে পিছু টানের কূট প্রভাব লীনা হাড়ে হাড়ে টের পায়। কিন্তু একে অস্বীকার করারও উপায় নেই। বোঝে, এই টানাপোড়েনেই জিতে নিতে হবে জীবন-ঘটনার সিরিজগুলো। যেভাবে ক্যারিবিয়ানরা জিতে নেয় টেস্ট বা একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজগুলো। ক্যারিবিয়ানরা, বিশেষত কার্লোস লীনার জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল এতদিন। হয়ত আজও। কিন্তু ভারতীয় স্পিনের বাঁকা পথে কেমন যেন ভুলের ফাঁদ। এখানে জটিলতা বেশি। ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে ব্যাটিং করবার সাহসটুকুই এখানে যথেষ্ট নয়। কৌশলে সুচতুর দক্ষতায় স্পিন ভেঙে চুরমার করে তবে এগোতে হয়। কার্লোস খেলার মাঠে ভারতীয় জটিল স্পিনের বিরুদ্ধে বহুবার সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু লীনা ক্রিজে দাঁড়িয়ে একা। অসহায়। সর্পিল কুচক্রী বক্র স্পিনের কাছে বিপর্যস্ত সে। এভাবে বিপর্যস্ত হতে হতে অস্তিত্বের সারাটা মাঠ জুড়ে চিৎকার ওঠে মাঝে মাঝে—"হাউজ দ্যাট", "হাউজ দ্যাট"! শুধু তার মনের বোধি আম্পায়ারটার মাথা নড়ে না। সোচ্চার আউট-এর আবেদনে সে কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়লেও নিস্পন্দ থেকে জারি করে যায় নট আউট-এর ফতোয়া। তখনকার মতো নিশ্চিন্ত থেকে আবার যেন নতুন করে গার্ড নিয়ে ব্যাট করতে থাকে লীনা।

এখন যেমন। লীনা নতুন করে গার্ড নিয়ে ব্যাট করতে থাকে। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে বলগুলো সাপেব মতো হিস্ হিস্ করতে করতে ছুটে আসে। ছোবল দিতে চায়। লীনার ভয় করে। আজ নিজেকে নিয়ে যতটা ভয়, তার চেয়েও' বেশি তার আগামী সন্তানকে নিয়ে। এরই মধ্যে লীনা হঠাৎ অনুভব করে ভ্রূণটি পেটের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ছে। এতে লীনার ব্যথা লাগে। কিন্তু এই আঘাতেও অদ্ভুত এক সুখানুভূতি হয়। আগামী মাতৃত্বের লজ্জায় মুখটা কেমন লাল হয়ে ওঠে। তার মনে হয় জরায়ুর ভেতর একটি শিশু যেন নেট প্র্যাকটিস করে চলেছে। জীবনের টেস্ট ক্রিকেটের আসরে সে অভিষেকের অপেক্ষায়। কিন্তু তার সে অভিষেকের পরিণাম যদি সুখের না হয়, তবে কি উচিত নয় হিতাকাঙক্ষী হিসেবে এই নেট প্র্যাকটিসের আসর থেকেই তাকে চিরতরে সবিয়ে দেওয়া। কথাটা ভাবতেই লীনার বুক কেঁপে ওঠে। আবার পাশাপাশি নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট পদ্ধতি হিসেবে ভাবতে থাকে—সে যেন একটা মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। শূণ্য রানের ইনিংস খেলে ব্যর্থ মাতৃত্বের লজ্জা নিয়ে যেন সে প্যাভেলিয়নে ফিবে আসে।—এইসব কূট ডেলিভারিব তীব্র প্রত্যুত্তরের মতো ভ্রূণটি লীনার পেটেব ভেতর উপর্যুপরি পা ছুঁড়তে থাকে। এতে লীনা ব্যথায় ককিয়ে উঠলেও

মনে মনে আকাশ ফাটিয়ে হাসতে থাকে। তার স্বপ্নের স্কোর বোর্ডে দ্রুত গতিতে রান উঠতে থাকে। খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে সে। উঠে গিয়ে তার ফ্ল্যাটের সমস্ত লাইট, এমনকি টয়লেটের লাইটগুলো পর্যন্ত এক এক করে পট পট জ্বালিয়ে দিতে থাকে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে বসে। ভীষণ সাজতে ইচ্ছে হয়। আয়নার দিকে তাকিয়ে অথচ আয়নায় ফুটে ওঠা আত্ম-প্রতিফলনকে আমল না দিয়ে লীনা ভাবতে থাকে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল দিনের কথা। তখন সে গর্বে চিঠি লিখবে—কার্লোস, অবশেষে আমি তোমার উত্তরপুরুষকে পেয়েছি। সে সবসময় আমার কোল জুড়ে থাকে। তার চোখদুটো ঠিক তোমার মতো সুন্দর। ঠিক ক্যারিবিয়ান সাগরের মতো।

স্মৃতিকণা ও স্বপ্নের পুরুষ

দেবদাস কুণ্ডু

শহরতলীর এই ছোট্ট স্টেশনটা বড় প্রিয় স্মৃতিকণার। দুদিকে প্ল্যাটফর্ম। শেড দেওয়া ওভারব্রীজ। টিকিট কাউনটার। সামনে ছোট্ট টি স্টল। পাশে ম্যাগাজিনের দোকান। এপাশে ওপাশে দু'চারটে ফলের ডালা। স্টেশন চত্বরের বাইরে রিক্সা স্ট্যাণ্ড। বাজার। প্ল্যাটফর্মের বুকে মাপা মাপা দূরত্বে কৃষ্ণচূড়া গাছ। নীচে বসার বেঞ্চ। লাল সিমেন্টের গোল বেদি। তারই এক কোণায় বসে স্মৃতিকণা। ওপারে প্ল্যাটফর্মের গায়ে ছোট পুকুর। পুকুর ঘিরে বৃত্তাকারে গাছ। শান্ত জলের বুক ছুঁয়ে উড়ে যায় মাছরাঙা, দু'একটা পাখী। এসব আনমনে দেখছিল স্মৃতিকণা।

সময় পেরিয়ে, ট্রেন না আসায় যাত্রীরা ক্ষুব্ধ। বিরক্ত মুখে গিলে করা ভাঁজ। ঠোঁট ছুঁয়ে দু'একটা অশ্লীল মন্তব্য। স্মৃতিকণার সেদিকে খেয়াল নেই। অন্যমনে চুপচাপ।

ছোটবেলা থেকে একটু কল্পনাপ্রিয় স্মৃতিকণা। নির্জন দুপুর আনে তার মনে গভীর নিঃসঙ্গতা। মেঘলা দিনের আলো-আঁধারিতে তার বুকের ভিতর ঝরে পড়ে টুপটাপ বিষণ্ণতা। রোদ মাখা দিনে বাতাসে বেঁচে ওঠার ঘ্রাণ নেয় সে। চুপচাপ। একাকীত্ব প্রিয়। স্টেশন থেকে তাদের বাড়ি দূরে নয়। তবে কাছেও নয়। রাতের ট্রেনের ঝম্ ঝম্ শব্দে খুশির জলতরঙ্গ বেজে ওঠে তার মনের নির্জন ঘরে।

স্মৃতিকণা দেখতে তেমন সুন্দরী নয়। খুব সাধারণ। মাঝারি গড়ন। চাপা নাক। হালকা গোলাপী গায়ের রং। মাথায় মাঝারি চুল। পরণে হলুদ শাড়ী। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। ভেতরে বই-খাতা। খোলা প্ল্যাটফর্ম। বাতাস এসে উড়িয়ে দেয় স্মৃতিকণার আঁচল। আবার মুখে এসে পড়ে। চোখের ওপর আড়াল সরিয়ে দেয়। একটু সচেতন হয়। হাত ঘড়ি দেখে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ায় প্ল্যাটফর্মের ধারে আসে। ঝুঁকে তাকায়—ট্রেন আসছে।

যাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততা চোখে পড়ে। হঠাৎ চোখ আটকে যায় সেই লম্বা পুরুষটির দিকে। প্রথম দিন চমকে উঠেছিল স্মৃতিকণা। তার স্বপ্নের পুরুষ এইখানে! তিন হাত দূরে! মুখ না দেখা পর্যন্ত বুকে আশঙ্কা ওৎ পেতে ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল এপাশে তাকিয়ে। মুখ দেখল স্মৃতিকণা। একরাশ বিষণ্ণতার কুয়াশা তার মনকে আচ্ছন্ন করল। রুক্ষ চুল। গালে বিবর্ণ দাড়ি। শীর্ণ মুখ। মুখে, চোখের নীচে সবুজ কালচে আভা। বেশি সময় চোখ রাখলে ভ্রু কুঁচকে ওঠে। বিরক্ত করে।

সেদিনের পর আর পুরুষটির দিকে তাকায়নি স্মৃতিকণা।

বুকের ভিতর স্বপ্নের পুরুষ। জেগে ওঠে। বার বার। সুদর্শন চেহারা। লম্বা। স্বাস্থ্য উজ্জ্বল। চওড়া শক্ত কাঁধ। মসৃণ মুখে ব্যক্তিত্বের লাবণ্য। ঢেউ খেলানো ঘন কালো চুল। চোখে নীলাভ কাঁচ। নিখুঁত গোঁফ। মনোরম মুখশ্রী।

দু'তিনটি প্ল্যাটফর্ম নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসেছে ট্রেনটি। এই স্টেশনের মুখে থেমে রয়েছে অনেকক্ষণ। জ্যৈষ্ঠের তাপ আর ট্রেনের দেরীর জন্য অনেক অফিসযাত্রী বিরক্ত।

স্মৃতিকণার কোন ভাবান্তর নেই। নির্বিকার। জানালায় মুখ রেখে বাইরের রোদ দেখছে নির্লিপ্ত চোখে। কলেজে দেরি হচ্ছে—অথচ কোন উত্তেজনা নেই। এই ট্রেন থেমে যাওয়া বেশ লাগছে তার। যেতে যেতে একটু থামতে হয় পথে। কোথাও অল্প সময়, কোথাও বেশী। জীবনের সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে। এই থেমে পড়া, এই অপেক্ষা—এরই ভিতর একদিন সে খুঁজে পাবে তার স্বপ্নের পুরুষ। তাকে নিয়ে যাবে অন্য এক জীবনের সুখের উপত্যকায়। সেখানে সতেজ বাতাস। সবুজ বনানী। মাথার উপর নীল আকাশ। বাতাস থেকে মাঝে মাঝে সেই জীবনের অদ্ভুত সুখকর গন্ধ কুড়িয়ে নেয় স্মৃতিকণা।

পনেরো মিনিটে ট্রেন শেয়ালদা এসে থামল। গাড়ির পেট থেকে বেরিয়ে এল অগণিত মানুষ। ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে স্মৃতিকণার হঠাৎ মনে পড়ল, মান্থলি শেষ হয়েছে তিন দিন। রিনিউ করা হয়নি। দু'টো টিউশনির টাকা সংসারের পেটে চালান হয়ে গেছে কবে। বাকিটার টাকাটা এখনো হাতে আসেনি। অথচ মান্থলিটা করা দরকার। এইভাবে ভাবতেই শরীরে আতঙ্ক খেলে গেল। মার উপর রাগ হল। টাকাটা এ মাসে দিতে চায়নি সে। না দিলে চলবে কেমন করে?—মা বলেছিল। তা আমি কি জানি? স্মৃতিকণার জবাব। তুই বড় হয়েছিস্ কিসের জন্যে? একটু সাহায্য করবি না সংসারে?—হুঁ আমাকে কে সাহায্য করে? স্মৃতিকণা এত কিছু বলার পরও মা টাকাটা তার ব্যাগ থেকে তুলে নিয়েছিল গোপনে। মার ওপর দোষ দেওয়া ছেলেমানুষী কাণ্ড। বাবার ব্যবসা চলছিল না। মাথায় কি এল যে বাবার। পার্টনার নিল। সেই ডোবালে। এখন সার্ভিস করেন। কপাল। এসব তার কপাল। কোথায় একটু পড়াশুনা শিখে ভাল চাকরি নিয়ে সুস্থ-সুন্দর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়বে—তা-না...। দুঃখ আর চাপা যন্ত্রণা অসহায় ভিখারীর মতো গুমরে মরে বুকের ভিতর।

এখন বুঝতে পারল স্মৃতিকণা, লোকের ঠেলাঠেলিতে সে গেটের কাছে এসে পড়েছে। চেকারটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সেও ঠোঁটে মৃদু হাসি ছড়িয়ে দ্রুত গেটটা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এভাবে আর ক'দিন...। নিজেকে বড় ছোট মনে হল তার।

দুই

আজকাল কলেজের আবহাওয়া গরম। সামনে ইলেকশন্। ছাত্র পরিষদ আর এস. এফ. আই.-দুই দলে তীব্র প্রতিযোগিতা। চাপা বিক্ষোভ। ক্লাস আজকাল হয় না। কলেজ জুড়ে শুধু পোস্টার। আর মিছিল। র‍্যাগিং নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল গত বছর। এসব পছন্দ নয় তার। বেছে বেছে তাই এই কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। তখন কলেজটা ছিল স্কুলের মতো। ক্লাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কোলাপসিবল গেট বন্ধ। খুলতো চারটের পর। ক্লাস ফাঁকি, যখন তখন বেরিয়ে আসা—এসব সুযোগ ছিল না। তখন স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি ছিল। গত বছর হঠাৎ গজিয়ে উঠল ইউনিয়ন। কিভাবে হল তা অন্য গল্প। এখন কলেজে না আসলে মাঝে মাঝে যে নোটস্ দেওয়া হয় তা হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে স্মৃতিকণা আসে।

কলেজে ঢুকতেই স্মৃতিকণা দেখল—সিঁড়ির মুখে যাদব দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে হাসল,—আজ দেরি করলি যে?

স্মৃতিকণার এই গায়ে পড়া ব্যাপাবটা অসহ্য। এড়িয়ে যেতে গিয়েও উত্তর দিল—ট্রেন লেট ছিল।

—আজ তো ক্লাস হচ্ছে না।

—কেন?

—মিটিং আছে।

স্মৃতিকণা কিছুক্ষণ কি ভাবল। তাবপর সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল।

—চল না কফি হাউসে যাই। আড্ডা দেওয়া যাবে।

ঘুড়ে দাঁড়াল স্মৃতিকণা, তাকাল যাদবের দিকে। শরীরে তার জ্বালা করছে। লম্বা, পাতলা, বসন্তব দাগভরা একটা মুখ এভাবে তাকে কাছে টানতে চাইছে—এটা ভেবেই তাব শরীর গবম হয়ে উঠল। তবু ঠোঁট দু'টোকে সংযত করে জবাব দিল—এখন সময় নেই। দ্রুত উপরে উঠে গেল।

প্ল্যাটফর্মে পাতলা অন্ধকার। আলোগুলো জ্বলে ওঠেনি এখনো। লোডশেডিং চলছে। ট্রেন থেমেছে কি থামেনি বুঝতে না পেরে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে বিপদটা ঘটেছিল। বাঁ-পাটা মেঝে ছুঁতে ডান পা-টা টান পডল শাড়িতে। আর একটু হলে...স্মৃতিকণাকে কেউ পিছন থেকে ধরল। শক্ত দু'হাতে। স্মৃতিকণা ঘুরে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে ব্যাগের ফিতেটা কাঁধের উপর ঠিক করে রেখে এবার পিছন ফিরে তাকাল।

প্রথম দিন যাকে দেখে সে ভেবেছিল স্বপ্নেব পুরুষ। সেই পুরুষটি তার দিকে তাকিয়ে। শীর্ণ মুখ। চোখের নীচে সবুজ কালো রেখা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে বিরক্তি লাগে। এই মুহূর্তে স্মৃতিকণাব তাকে ধন্যবাদ দেওযা দরকার, তা না করে, কপালের জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এলো স্টেশন চত্বরের বাইরে।

বাড়িব কাছাকাছি আসতেই রমার সঙ্গে দেখা হল তার।

—কিবে স্মৃতি? আজ এত দেরি হলো?—পাড়ার বন্ধু রমা বলে ওঠে।

—কলেজ করে, কোচিং সেরে ফিরছি। তুই টিউশনি যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। তুই আজ যাবি না?

—না গিয়ে উপায আছে? এ হল নাগপাশ। হাসল একটু স্মৃতিকণা।

—একটা টিউশনি দিবি?

—দেখব।

বাড়িতে ঢুকে দেখল স্মৃতিকণা, মা মেশিনের পাটাতনে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড কষ্ট হল মাব জন্য তাব। সারাদিন কোমর ব্যাথা করে সেলাই, আবার রান্না। ছোট বোন দু'টো বাইরে খেলছে। সেজো আর মেজোটা পাশের বাড়িতে টি ভি দেখছে।

পায়ের শব্দে বনলতার ঘুম ভাঙল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—এত দেরী হল কেন?

—কোচিং ছিল না।,

—তুই এত দেরি করে ফিরিস কেন? আমার চিন্তা হয়।

—আমি কি ইচ্ছে করে দেরি করি?

—ওখানে কোচিং করতে হবে না।

—কোচিং না করলে পাশ করবো কি করে?

—সবাই কি কোচিংয়ে পড়ে? তারা পাশ করে না?

খেতে খেতে কথা বলছিল স্মৃতিকণা। মাকে এসব বোঝানো যাবে না! কথা বাড়ালে ঝগড়া বাড়বে। অশান্তি শুরু হবে। এই সন্ধ্যায় খেতে ইচ্ছে করছে না তার। বমি বমি আসছে, গা গুলিয়ে। উঠে পড়ল স্মৃতিকণা। কলতলায় এঁটো বাসন কোসন রেখে হাত মুখ ধুলো।

খাটের উপর শরীরটা এলিয়ে দিতে অবসন্নতা নেমে এল শরীরে। এখন টিউশনি যেতে ইচ্ছে করে? তিনটে পর পর। তারপর রাতে নিজের পড়াশুনা, এই ক'খানা হাড় নিয়ে শরীরটা এত কষ্ট সহ্য করছে কিভাবে—সেটাই স্মৃতিকণার কাছে মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল স্মৃতিকণা।

তিন

রাত এখন অনেক। পুকুরের পাড়ে জ্যোৎস্নামাখা গাছগাছালির ফাঁক-ফোকরে জোনাকি পোকার আনাগোনা। গাছগাছালির ছায়ায় পুকুরের জলে ঘন অন্ধকার। চার পাশ আলো অন্ধকারে মাখা। ঘরে সবাই ঘুমে অচেতন, স্মৃতিকণা জেগে। জানালার ধারে বসে। আনমনে বাইরে তাকিয়ে। বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে নি। বন্ধ চোখের পাতায় দৃশ্যটা ভেসে ওঠে বার বার। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে খেলে যায় শীতের প্রথম বাতাসের কাঁপুনি। সেই লম্বা, পাতলা, বসন্তমুখ ছেলেটি। হ্যাংলার মতো চাউনি। সেই ছেলেটা তাকে বাঁচালো? আর একটু হলে... এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হতো। বোমটা যে আচমকা তারই পায়ের কাছে এসে পড়বে সেটা কে ভেবেছিল? বন্ধুদের নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বন্ধুরা যেতে রাজি হয়নি। অগত্যা সেও দাঁড়িয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারির ভাষণ শুনছিল। অনেক ছাত্রছাত্রী ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল গেট মিটিং-এ। সেক্রেটারি পরিতোষদা বিপক্ষ দলের কূটনীতিজ্ঞ। ছাত্রদের শোষণ, শিক্ষকদের রাজনীতি—সব কিছুই চেঁচিয়ে, গলা তুলে বলে যাচ্ছিল। বেশ শান্তই ছিল পরিবেশটা। হঠাৎ বিকট আওয়াজ হল রাস্তার ধারে। ধোঁয়ায় সামান্য ঝাপসা হয়ে এল জায়গাটা। ভীড়ের ভিতর ঠেলাঠেলি। হুড়োহুড়ি। আবার একটা। এটা ঠিক স্মৃতিকণার পায়ের কাছে—ঠিক তখনই যাদব তাকে টেনে নিয়ে ক্যানটিনের ভিতর ঢুকে পড়ে। স্মৃতিকণা, তখনকার মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা কবতে পারবে না—শুকনো ঠোঁট ভিজিয়েছিল যাদবের এনে দেওয়া গ্লাস ভরা জলে।

অবাক চোখে যাদবের দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময় হয়েছিল—যাদব কোথায় ছিল! কিভাবে ঐ ভীড়ের থেকে তাকে টেনে আনল। এ সব কিছুই কেমন রহস্যময় লাগছে তার কাছে। এখন ঘটনাটার কথা ভাবলেই তাব বুকের ভিতর ফুলে ওঠে চাপা যন্ত্রণা। যাদব তাকে বাঁচিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরে তার উপর রাগ হয়েছিল। যাদব যদি না আসতো তবে সেই স্বপ্নেব পুরুষ...সে ঠিকই আসতো! আর যদি না আসতো তবে? বড় মানসিক দ্বন্দ্বে বেসামাল স্মৃতিকণা। এরপর যাদব হয়ত ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করতে চাইবে। সে কিভাবে এড়িয়ে যাবে? সাঁকোর এপারে যাদব, ওপারে স্বপ্নের পুরুষ। স্মৃতিকণা মাঝখানে। কোন দিকে যাবে সে?

বাইরে নিস্তব্ধ রাতের বয়স বাড়ছে। শরীরের আড়মোড়া ভেঙে মৃদু পায়ে হেঁটে নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল স্মৃতিকণা।

চার

আজ তিনটে টিউশনি করে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তৃতীয় টিউশনিটা শেষ হয়েছে সময় মতোই। কিন্তু কলেজের গণ্ডগোলের ঘটনাটা বলতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। তবে তেমন দেরি হয়নি।

রাস্তায় এসে বুঝতে পারল স্মৃতিকণা, জোরে বাতাস বইছে। একটু পরেই হয়ত বৃষ্টি নামবে। দূরের আকাশে, গাছপালার ফাঁকে আলো ঝিলিক দিচ্ছে। গুরু গুরু শব্দ। তাড়তাড়ি পা চালাল স্মৃতিকণা। এক দু'পা যেতে না যেতেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা গায়ে, মুখে, চোখে এসে বিঁধল। তবু কিছুটা হাঁটল সে। এবার অভিমানী মেয়ের কান্নার মতো ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ল। একটা বাড়ির শেডের নীচে দাঁড়াল সে। কিন্তু উপায় নেই। তিন চারটে বখাটে ছেলে হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়ছে বার বার। দু'একটা অশ্লীল সংলাপ। একবার ধারালো চোখে ছেলে তিনটেকে দেখে বৃষ্টির ভিতর নেমে হাঁটতে লাগল বড বড় পা ফেলে। ছেলে তিনটে কিছু বলল হয়ত। স্মৃতিকণা শুনতে পেল না।

ব্যানার্জীপাড়ার বাঁ দিকের গলিটা বড় নির্জন। অথচ এই গলি দিয়ে বাড়ি যেতে হবে তাকে। আজ ভয় হচ্ছে। অন্যদিন লোকজন থাকে, আজ বৃষ্টিতে ফাঁকা। বটগাছটার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেই সে বুঝল শাড়ি ভিজে জব্ জব্ করছে। নিজেরই কেমন সংকোচ হল শরীরের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ পিছনে ঘাড় ঘোরায় স্মৃতিকণা—দুটো ছেলে এগিয়ে আসছে বড় বড় পা ফেলে। ভয়টা আষ্টেপৃষ্টে ভিজে শাড়ীর মতো জড়িয়ে ধরল যেন। সেও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পারল না। ভেজা শাড়িতে পা আটকে যাচ্ছে। ছেলেদুটো ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—এই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যাচ্ছো? এসো না একটু ছাউনিতে দাঁড়াই। স্মৃতিকণা চারপাশে তাকাল। ফাঁকা রাস্তা। অন্ধকার। বৃষ্টিব ছাটে দূরের কিছুই তেমন চোখে পড়ে না। দু-পাশের বাড়ির জানালা বন্ধ। দৌড়ে কোন বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দেবে, নাকি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে, দিশাহারা স্মৃতিকণা তা ঠিক করতে পারছিল না। এমন বিপদের মুখোমুখি সে তো কখনো হযনি। বুকের ভিতর সাহসের ধস্ নামিয়ে একটু একটু

তুষারপাত হচ্ছিল। তবু দৃঢ় গলায় সে বলল—পথ ছাড়ুন। কিন্তু বুকের ভেতরের শীতলতার ছোঁয়ায় নিজের আওয়াজই অচেনা লাগল। এগিয়ে যেতেই আবার বাধা পেল স্মৃতিকণা। এবার ছেলে দুটো স্মৃতিকণার সামনে এসে কাঁধটা ধরার জন্য হাত এগিয়ে দিল। ঠিক এসময়ে ওপাশের একটা বাড়ির দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে কিছু আলো এসে পড়ে মিশকালো অন্ধকারটাকে অনেকটা পাতলা করে দেয়। ছেলে দুটো শান্ত হয়ে দাঁড়াল নিজেদের একটু আড়াল করে।

লোকটি নিজের প্রয়োজনেই আনমনাভাবে হেঁটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। স্মৃতিকণা তাকাল। লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলে দু'টোকে দেখল। স্মৃতিকণা কিছু বলার আগে ছেলে দুটো অনায়াসে অন্ধকারে মিশে গেল, ব্যাপারটা আঁচ করতে পেলে লোকটি বলল—ওরা নিশ্চয় আপনার...

—হ্যাঁ।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—সামনেই আমার বাড়ি। টিউশনি থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি...।

এতক্ষণ পরে লোকটির খেয়াল হল, মেয়েটি ভিজছে। সে বলল—আপত্তি না থাকলে ছাতার তলায় আসতে পারেন।

স্মৃতিকণা এগিয়ে গেল। পাশাপাশি হাঁটতে থাকল দু'জনে।

—আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো?

প্রশ্ন করে অচেনা লোকটি।

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

—স্টেশন।

—ঐ পর্যন্ত দিলেই চলবে। বাকিটুকু আমি যেতে পারবো।

বৃষ্টি থেমে এসেছিল। ষ্টেশনের আলোয় লোকটির মুখ দেখল স্মৃতিকণা। চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ। ইস্পাতের মতো চওড়া কপাল। কালো ঘষামাজা চেহারা। স্মৃতিকণার কেন যেন মুখটি বড় চেনা মনে হল। দু'তিন বার সে দেখেছে, কোথায়? কিন্তু স্মৃতি হাতড়ে এক কণাও যোগসূত্র খুঁজে পেল না।

রাত বেশি হয়ে যাচ্ছিল বলে স্মৃতিকণা ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

পাঁচ

সবুজ উপত্যকা। বহুদূর বিস্তৃত টিলাভূমি। শেষ প্রান্তে দীর্ঘকায় ঘন অরণ্য। মাথাব উপরে মুক্ত নীল আকাশ। একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নের পুরুষ। দু'হাত প্রসারিত। একটা গাছের ছায়ায় বসে স্মৃতিকণা। উঠে এগিয়ে গেল। প্রাণচঞ্চল কিশোরীর মতো। পুরুষটি দ্বিতীয় টিলায় গিয়ে দাঁড়াল। স্মৃতিকণা দৌড়ে গেল। পুরুষটি তৃতীয় টিলার উপর দাঁড়াল। স্মৃতিকণা দৌড়ে গেল আবার। পুরুষটি আবার টিলার...স্মৃতিকণা দৌড়ে...অদ্ভুত এক খেলা। এবার অরণ্যে প্রবেশ করল পুরুষটি। স্মৃতিকণা খুঁজছিল অরণ্যের ভিতর। এত দৌড়দৌড়িতে বুক ওঠানামা করছে। শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ছুটতে ছুটতে একটা দীর্ঘকায় বৃক্ষের শরীরে ক্লান্ত মাথাটা ধাক্কা লাগল...।

বিছানা থেকে উঠে বসল স্মৃতিকণা। অপলক চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। অসাড় হাতটা অন্যমনস্ক ভাবে তুলে কপালে বাখতেই বুঝতে পারল সে স্বপ্ন দেখছিল।

উঠে এসে জল খেল স্মৃতিকণা। জানালার কাছে দাঁড়াল। বাইরে গাছ গাছালিতে ফিকে হলদে রং ধরছে। ভোরের হালকা আলো গায়ে মেখে পাখিরা উড়ছে। চারপাশ বড় শান্ত, শিশুর মতো কোমল।

বাইরের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা ভাবল—কেন সে এমন একটা স্বপ্ন দেখল! মনে পড়ল যাদবের বসন্ত মুখ। সেই সঙ্গে মনে পড়ল ষ্টেশনের লম্বা সেই পুরুষটির মুখ। আর আশ্চর্য এবার সে বুঝতে পারল কেন গতকাল ঐ পুরুষটির মুখ তার চেনা মনে হয়েছিল। যাদব, ষ্টেশনের সেই লম্বা পুরুষের শীর্ণ মুখ আর গতকালের পুরুষটির মুখ যেন এক। তিনজনের মুখের আদলে আশ্চর্য এক মিল।

কলেজে গেলে মিটিং, মিছিল, ক্যান্টিনের টেবিল, কমনরুম, অথবা ক্লাসের বেঞ্চের কোণায় এক জায়গায় যাদবের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে গিয়ে বেঞ্চের পাশে কৃষ্ণচূড়ার নীচে বসন্তের দাগওয়ালা সেই চেনা মুখের ঠোঁট যে কোনদিন ট্রেনেব অপেক্ষায একের পর এক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দেবে ওপরের আকাশে। কোন একদিন ছাত্রী পড়িয়ে ফেরার পথে ঐ চেনা দরজা খুলে অন্য একটি পুরুষ রাস্তায পা রাখবে। স্মৃতিকণা আবার মাথার নীচে হাত রেখে, ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখবে সেই স্বপ্নের পুরুষকে। একটা টিলা থেকে আর একটা টিলা। তারপর আরও দূবত্ব। আরো দীর্ঘ দূরত্ব।

মুহূর্তেব মধ্যে স্মৃতিকণা চোখ মেলে তাকায়। জানালা দিয়ে ভোরের প্রথম আলোয় দেখে গতরাতের বৃষ্টিভেজা বাইরের মুক্ত জগতটাকে। আবার চোখ বোজে স্মৃতিকণা—বুক ভরে মাটিব গন্ধ নেয়। বৃষ্টিভেজা মাটি। সত্যিকারের মাটি।

পরকীয়া প্রেম

উজ্জ্বল কুমার দাস

অনেক অভিধান ঘেঁটে আমার স্ত্রীর নাম রেখেছিল আমার শ্বশুরমশাই 'মধুমতী'। তখন অবশ্য সবই জড়পিণ্ড। অয়েল ক্লথের উপব এক টুকরো ছোট কাঁথা আর তার উপর আমার প্রাণের বউ। কিন্তু তিনি যেই ধেড়ে হলেন, ব্যস্!

যখন আমি বিয়ে করবার জন্য আমার স্ত্রীকে প্রথম দেখতে গেলাম, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম্, কি নাম আপনার? তখন লাজুক লাজুক মুখে বেশ মিহি সুরে টেনে বলল 'মধুমতী সাহা'।

আমার কানে তখন এমন সুর বেজে উঠল, যে মনে মনে বললাম আহা আহা...। কিন্তু বিয়ের তেরাত্তির পেরোতে না পেরোতেই মধুমতী, মধুমতীর প্যালস ছেড়ে সংসারের সার্কাসে ভানুমতীর খেলা দেখাতে শুরু কবে দিল। তখন মধুমতীর কোথায় সেই মধু, আর কোথায় সেই মতি। সব গুবলেট।

তারপর তো কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার স্ত্রীর শবীরে যাবতীয় রোগের আড্ডা বাসা বাধতে শুরু করল। দিনে দিনে গাযে গতরে ফুলতে শুরু করল যেন ঠিক বম্বের টুনটুনের দ্বিতীয় সংস্করণ। তারপর এসে উপস্থিত হলো বাত, দন্তশূল, অম্বল ইত্যাদি। সব যেন হাত ধরাধরি করে লাইন ধরে আসছে আর যাচ্ছে। এ যেন এক নিরন্তর গতি। জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভাবি বিয়ে করে কিই না ভুল করেছি। কিন্তু এ ভুল সংশোধন করবার কোন উপায় নেই। ভুল সংশোধন কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় চলে, কিন্তু জীবন খাতায় একদম চলে না।

কিছুদিন হলো আমাদের পাশের দোতালায় হরিহরবাবুর একখানা ঘরে একজন আটাশ-তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মহিলা ভাড়া এসেছেন, একলাই থাকেন। ঘরটা আবার আমার শোবার ঘর থেকে বেশ পরিষ্কাব দেখা যায। দেখতে খুব একটা মন্দ নয়। ছুটির দিনে প্রায়ই আমি লুকিয়ে লুকিযে দেখি। একদিন আমার শ্যামলী ও ঘরের মধ্যে হালকা সুরে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা গেয়ে চলেছে। আর আমি ওর দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি আমার পিছনে আমার স্ত্রী মধুমতী কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে বলল, 'কি গো, কখন থেকে যে ডাকছি বাজারে কখন যাবে, তা কানে কোন কথাই ঢুকছে না, ঐ দিকে কি অতো মন দিয়ে দেখছ দেখি, বলে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে শ্যামলী নেচে সেই গানটা গাইছে, ব্যস—'

'হ্যাঁ, তাইতো', বলে চোখগুলো বড় বড় করে বলল, 'আমার কথা শুনবে কি করে', আমি গোবেচারির মতো বললাম 'কেন কেন কি হয়েছে?'

—কি আর হবে, ভাগ্যিস আমি দেখলাম। আরো পরে দেখলে কি সর্বনাশই না হয়ে যেত।

—কেন, কি সর্বনাশ?

—দেখো অত ন্যাকামো কোর না তো। সকালবেলা ঐ জানলা দিয়ে ঐ ছুঁড়িটার নাচ দেখছিলে না? ভাবো আমি কিছু বুঝি না? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, না?

সব বৌদেরই এই একই রোগ, নিজের শাড়ীব মতো নিজের স্বামীটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে, অন্য কেউ তা গায়ে জড়াক, তা তারা মোটেই পছন্দ করে না।

থাক্, স্ত্রীর ধাতানী খেয়ে লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবীটা গলিযে বাজারের থলিটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা দিচ্ছি, ঠিক এমন সময় রান্না ঘর থেকে সাতবাড়ি শুনিয়ে মধুমতী বলল, 'রুই মাছের মাথা এনো কিন্তু।'

মাসের শেষ, রুই মাছের মাথা? মনে মনে গালাগাল দিয়ে বললাম, 'রুই মাছের মাথা না এনে তোমার মাথা আনবো।' বলে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় নেমেই আবার চোখটা চলে গেল সেই হরিহরবাবুর দোতলার বারান্দায়। তাকিয়ে দেখি শ্যামলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল। যেন কোন তেল কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মডেল। আমার দিকে চোখ পড়তেই শ্যামলীর ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল। হঠাৎ আবার মধুমতীর কথা মনে পড়তেই, পেছনের দিকে আমার বাড়ির বারান্দায় তাকিয়ে দেখলাম মধুমতী দাঁড়িয়ে আছে কি না। না নেই। তাই আমিও শ্যামলীর দিকে একটু মুচকি হেসে বাজারের দিকে রওনা হলাম।

প্রতি রবিবারই বাজার সেরে আসবার সময় শম্ভুর দোকানে কাঁচাপাকা দাড়িগুলো একটু কামিয়ে আসি। সেদিনও শম্ভুর দোকানে গিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে কিরকম বুড়ো বুড়ো বলে মনে হলো। সারা মাথায় কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি। গালে এক গাল দাড়ি। পাকা চুল নিয়ে আর যা কিছু করা যায় কোন সুন্দরী যুবতীর হৃদয় কখনই জয় করা যায় না। স্বামীর চুল পেকে গেল, বৌরাই ঘ্যানঘ্যান করে, আর প্রেমিকা! ওরা তো পাত্তাই দেবে না। যাইহোক, শম্ভুকে বাকীতে চুলটা ভালো করে কলপ করিয়ে নিয়ে, মুখের দাড়ি কেটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। বয়স যেন অনেক কমে গেছে। যাইহোক খোশ মেজাজ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা এগারোটা। আমার পায়ের শব্দ শুনেই মধুমতী মধু বর্জন করে চীৎকার করে বলল, 'কি হলো, বাজারে গিয়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

—তোমাব মাথা আনতে গিয়ে সরি, রুই মাছের মাথা আনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

মধুমতী কথা বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একবারে 'থ'। তারপর বলল "একি পাকা চুল কালো, হলো কি করে? কলপ করেছ নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে বললাম, "আমায় বেশ যুবক যুবক মনে হচ্ছে না?"

—যুবক! তোমায় ঠিক দাঁড়কাকের মতো দেখাচ্ছে। ময়ুরের পুচ্ছ লাগালে যেমন দাঁড়কাক ময়ুব হয় না, তেমন আধবুড়ো পাকা চুলে কলপ দিলে যুবক হয় না।

শুনলেন তো, আমার স্ত্রীর কথা। সব সময়ই বাঁকা বাঁকা কথা। কোথায় একটু আমায় যুবক বলে প্রশংসা করবে, তা না, শুধু সব সময় খোঁচা মেবে কথা।

আজকাল একটু স্মার্ট হয়ে চলতে চেষ্টা করি। মেয়েবা আবার একেবারে ল্যালাক্যাবলা ছেলে একেবারেই পছন্দ করে না। তাই ধুতিব বদলে একটু প্যান্ট সার্ট সঙ্গে বুট পরে অফিসে বেরই। এই দেখেও স্ত্রী-এর মনে জ্বালা। হঠাৎ একদিন বলল "কি হয়েছে বলতো। তোমায় আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য কবি বুড়ো বয়সে ছোঁড়া সাজবাব সখ হয়েছে। প্রেমে টেমে পড়লে নাকি?'

আমি একগাল হেসে বললাম, "ঘরে এমন সুন্দরী থাকতে, অন্যদিকে কি করে তাকাই। আর তাছাড়া এখন কি আর প্রেমের বয়স আছে।" অমনি গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, 'ছ্যা, প্রেমের আবার বয়স। তোমাদের পুরুষ জাতটাকে একদম বিশ্বাস করি না। যত বুড়ো হয় তত বেশী বজ্জাত হয়।

ওমনি আমার মাথাটা টগবগিয়ে ফুটে উঠল। 'দেখ জাতটাত তুলে কথা বলবে না। আর তাছাড়া তোমার মতো এরকম খিটির-মিটির করা বউ ঘরে থাকলে, স্বামীরা তো বিগড়ে যাবেই।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমার মধুমতী গর্জে উঠে এমন বলল, 'কি আমি তোমার সাথে খিটিব মিটির কবি।' এই আওযাজে পাডাব যেন একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে বেরোচ্ছি, ঠিক এই সময় আমাব গিন্নী গ্যাসের চোতাটা ধবিযে দিয়ে বলল, যাওয়ার সময় একটু বুক কবে যেয়ো। ব্যাস। অফিসেব বাবোটা, ভাগ্যিস সরকারী অফিসের কেরানী।

তারপর নাচতে নাচতে গিয়ে হাজির হলাম গ্যাস দাদার কাছে। পাড়ার কাছে একটা বাড়ির গ্যারেজ ঘরে গ্যাস ঘর। ঐ ঘরে একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে আছেন আমাদের গ্যাসদাদা, আর তার সামনে এক বিশাল লাইন। গ্যাসের লাইনে সবাই প্রশ্নকর্তা, আর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চলেছেন গ্যাসদাদা। সব প্রশ্নকর্তারই একই প্রশ্ন, দাদা কবে পাঠাচ্ছেন? বাচ্চারা কাঁদলে যেমন বড়রা টফি নিয়ে বলে "আর কেঁদো না সোনা! আর কেঁদো না—" ঠিক তেমনি গ্যাসদাদা সবাইকে বলে চলেছেন, 'এই দু-চার দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।' ছেলেদেব লাইনের সাথে ফুবফুবে সব সুন্দরী মহিলাদের লাইন। সব নতুন সংসার করছে। স্বামীবা সব অফিসে বেরিয়েছে। আর গিন্নীরা সুন্দর পারফিউম মেখে গ্যাসের দোকানে লাইনে। হঠাৎ দেখি লাইনে সেই আমার পাশের বাড়ির শ্যামলী।

শ্যামলীকে দেখেই মনটা কি রকম পাক দিতে শুরু করল। কি করে শুরু করি কথা, যদি কথা বলতে গিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি, তাহলে তো আর রক্ষা নেই। এই বয়সে পাবলিকের হাতে মার খেয়ে আমাকে এই ধরাধাম ত্যাগ কবতে হবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি আমাব পায়ের সামনে একটা সুন্দব রুমাল পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি তুলে শ্যামলীর দিকে হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'এটা কি আপনার?'

শ্যামলীও হাসিব বিনিময়ে হাসি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার। তারপর আমার হাত থেকে রুমালটা নিল। রুমালটা নেওয়ার সময় শ্যামলীর নরম নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার শরীবেব রক্তে এক শিহরণ খেলে গেল।

তারপর ধীবে ধীরে শ্যামলীর সাথে আলাপ জমাতে শুরু করলাম। আর মনে মনে আমার মধুমতীকে ধন্যবাদ দিলাম। মধুমতী যদি আমায় আজ এই গ্যাসদাদার কাছে না পাঠাত তাহলে শ্যামলীর সাথে আলাপ করার সুযোগই পেতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনেরই গ্যাসদার সাথে কথা চুকে গেল। তারপর ঐ গ্যারেজ ঘর থেকে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে এবং দিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালাম।

শ্যামলী আমার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

—আমি ডালহৌসী।

—ভালই হলো। আমিও ঐ পথেই যাব। চলুন একসাথে যাওয়া যাক।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম বাস স্ট্যান্ডে। লোকে লোকারণ্য। সবাই বাসে উঠবে। বাস আসছে, কিন্তু তাতে খুব কম লোকই উঠতে পারছে। বেশীর ভাগ বাসই বাদুড়ঝোলা।

তারপব অনেক কষ্টে একটা বাসের মধ্যে আমি আর শ্যামলী দেহের কসরৎ দেখিয়ে উঠলাম। বাসে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। শ্যামলীর শরীরটা আমার শরীরের উপর লেপটে আছে। আমার বুকের উপর পড়ে আছে ওব সুগন্ধী একরাশ কালো চুল। তার গন্ধে আমি মোহিত হযে উঠেছি। জীবনটা যেন মনে হচ্ছে কবিতা। হঠাৎ মনে হয় একি করছি আমি। এ পাপ। ঘরে আমার স্ত্রী আছে। শ্যামলীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। কিন্তু নিরুপায়। বাসের ভীড়ে এপাশ থেকে ওপাশ হবার উপায় নেই। কি সুন্দর নরম তুলতুলে শরীর। মনে হয় যেন ভগবান মোম আর মাখন মিশিয়ে শ্যামলীব শরীর তৈরী করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলাম ডালহৌসী। সময় যেন হুস্হুস্ করে চলে গেল। রোজ বাসে যেতে যেতে জ্যামে পড়তে হয়। কিন্তু আজ একদম জ্যাম নেই। বাস থেকে আগে নেমে বাস্তায পা রেখেছি। শ্যামলী নামতে গিয়ে হঠাৎ দেখি পড়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতটা এগিয়ে দিলাম। আমার হাতের উপর ভর দিয়ে টালটা সামলে নিল। এদিকে আমার হাতটাও ধন্য হলো।

তারপর দুজনে নেমে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। আমি আমার অফিসে ঢুকে গেলাম, আর আমার অফিসের পাশের বিল্ডিং-এ একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে শ্যামলী। সত্যি, একথা ভাবা যায় না। যাক্, আসবার সময় আবার আমরা দুজনে ফিরি। শ্যামলীর অফিসে রোজ নটায় হাজিরা। কিন্তু আমার সরকারী অফিস। যখন হোক গেলেই হয়। বডিটাকে একসময় অফিসের মধ্যে শো করতে পারলেই ব্যাস্। মাঝে মাঝে অবশ্য অফিসের হেডক্লার্ক থাকে, আমরা সম্মান দিয়ে বড়বাবু বলি। তিনি আমায় অনেকদিন বলেছেন যে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। কিন্তু আমি ওসব কথায় কোনদিনই কর্ণপাত করিনি। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেল সব কথা কানে

তুলতে নেই। যদিও বা ঢোকাই তা অপর কান দিয়ে আবার বাতাসে ছেড়ে দি। আমার দেরীতে আসার সুবাদে অনেকেই আমায় মাঝে মাঝে রঙ্গরসিকতা করে (অর্থাৎ যার অপর কথা টিপ্পনী কাটে)। আমার নাম দিয়েছিল 'লেটুবাবু'। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যেমন চলছি তেমন চলব। চাকরী তো যাওয়ার কোন ভয় নেই। এতো আর প্রাইভেট ফার্ম না। যে একটু দেরী হলেই মাইনে কাটা। তারপরেও যদি বেয়াদপি করি, চাকরী নট্। এ হচ্ছে সরকারী অফিস। একদিনের কাজ দশদিনে করবো, মাঝে মাঝে 'ওভারটাইম' করবো। আর মাঝে মাঝে অফিস থেকে মাইনে বাড়ানোর দাবীতে বিরাট মিছিল করে সারা কলকাতার বুকে ট্রাফিক জ্যাম করে অবশেষে এসপ্ল্যানেড ইষ্টে বিরাট জনসমাবেশে যোগ। বড় বড় নেতাদের বড় বড় বুলি। আমি অবশ্য বড় বড় নেতা না হলেও ন্যাতা তো বটে। অফিসে রাজনীতি করি। তাই রাজনীতির নেতাদের আজকাল খুব একটা কেউ ঘাঁটাতে চায় না। একটা প্রচলিত কথা আছে যে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর আজকালকার রাজনীতির দাদারা ছুঁলে একশ ঘা।"

যাক্, আপনাদের সামনে আমার উপর বৈপ্লবিক চরিত্রের পরিচয়টা দিতে চাই না।

এবার আমার ফুলটুসি, আমার প্রাণকুমারী শ্যামলীর কথা বলি। এখন রোজই সকাল আটটার মধ্যে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই। ঐসময় শ্যামলীও বাসে ওঠে। একই সাথে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কখনো বা ভাগ্যে কুলোলে পাশাপাশি বসে দুজনে সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে অফিসে যাই। এ যে কি থ্রিলিং তা ঠিক মুখে বলা যায় না।

আমাকে এত সকাল সকাল দেখে অফিসের লোকেরা তো একেবাবে 'থ'। কি হলো! আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো এর রহস্য। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না।

অফিসে ফেরার সময়ও প্রায়ই আমরা একটুখানি হেঁটে আউটট্রাম ঘাটে গিয়ে পাশাপাশি বসতাম। নানারকম কথা বলতাম। সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে ওর দিকে হাত বাড়াতাম। শ্যামলী অবশ্য এসব কিছু আপত্তি করত না। মনে হত শ্যামলীও বোধহয় আমাকে ভালবাসতে চাইছে। কেউ কি কোনদিন একা বাঁচতে পারে। সবাই সঙ্গ চায়, সঙ্গী সঙ্গীনী চায়। প্রায় লক্ষ্য করতাম, শ্যামলীর মধ্যে একটা পাপের প্রবল আকর্ষণ আছে।

মধুমতী দু-চারদিনের জন্য তার পিত্রালয়ে গেছে। আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা। একদিন রবিবার শ্যামলী আমায় সকালে চা জলখাবার নিমন্ত্রণ করেছে। সকাল সকালই চলে গেছি. গিয়ে দেখি চারদিক নিস্তব্ধ। কাউকে না ডেকেই ঘরে ঢুকে দেখলাম, শ্যামলী বড় লোভনীয় ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে আছে। বুকের ওপর থেকে শাড়ির আঁচলখানা সামান্য সরানো। পরনে লাল রঙের ব্রাউজ। শরীরটা যেন সেই ব্রাউজ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কিরকম ওঠা-নামা করছে। কি করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমার পায়ের আওয়াজে শ্যামলী

চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই আমায় জিজ্ঞেস করল, কি কতক্ষণ এসেছেন?

—এই এইমাত্র। আপনি ঘুমোচ্ছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। এই একটাই তো ছুটির দিন।

তারপর শ্যামলী এক মাবাত্মক ভঙ্গীতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। আমি সেই সুযোগে শ্যামলীর গোপন জায়গাগুলো দেখবার অবসর পেলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে শ্যামলী কলঘরে গেল। তারপর বেশ ফ্রেশ হয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল 'কি, চা না কফি?' আমি উত্তর দিলাম 'কফি'। আমার উত্তর নিয়ে আবার জোরালো গতিতে কিচেনে চলে গেল। ইতিমধ্যে খবরের কাগজওয়ালা ছুঁড়ে কাগজখানা ঘরে দিয়ে গেল। একটু হলেই আমার নাকে এসে লাগত। ভাগ্য ভালো লাগেনি। খবরের কাগজখানা তুলে পড়তে লাগলাম। ইতিমধ্যে শ্যামলী কফি আর অন্য খাবার নিয়ে এসে হাজির।

শ্যামলী একগাল হেসে বলল, নিন, খেয়ে নিন।

আমি তো খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক। আমি ভদ্রতার খাতিরে হেসে বললাম, 'আমার জন্য আবার কষ্ট করে এতসব করতে গেলেন কেন?'

—'না কষ্ট কিসের, আমার আবার নিত্যনতুন খাবারদাবার তৈরী করতে খুব ভালো লাগে। তখন আমার মধুমতীর কথা মনে পড়ল। মধুমতীব কাছে সকালে সামান্য একটু চা চাই। তার বদলে পাই এক কাপ ঘৃণা।

আমার চোখ দুটো ঐ খাবাবের প্লেটের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ধীরে ধীবে খাবাবগুলোকে আমার নবম আঙুল দুটো মুখেব ভিতরে চালান করে দিতে লাগল। তারপর এল রসবড়া। আমি মুখে পুরে দিয়ে বললাম—দারুণ হয়েছে। এ যেন ঠিক মনে হচ্ছে প্রেমেব রসবড়া।

আমার কথা শুনে শ্যামলী তো হেসে কুটিপাটি।

—'কেন ভুল কথা বললাম'।

—'না তা কেন! আপনি বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন বটে।

তারপর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ। এবার আমি আর শ্যামলী গল্পের পর্বে। শ্যামলী বিছানায় আর আমি হাত কযেক দূরে সোফাতে গা টাকে এলিয়ে বসেছি। গল্পের মাঝে মাঝে শ্যামলী বিছানায় গড়াতে গডাতে এমন এক একটা ভঙ্গী করছে, যেটা অনেক সময় বাজারের কোন চালু বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। আর উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভবাট হযে উঠছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তেজনা কাটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না।

আবার কথা। একথা থেকে সেকথা, আর সে কথা থেকে একথা। শ্যামলীর বুকের নীচে একটা নরম বালিশ। দু' কনুই বিছানার উপর গেঁথে রাখা। হাতের চেটোয় মুখখানাকে ধরে রাখা। ঘাড়ের পাশ দিয়ে কালো চুলের ঢল নেমে এসে গড়িয়ে পড়েছে বালিশের উপর। পা দুটোকে ভাঁজ করে একটু একটু করে দোলাতে শুরু করেছে শ্যামলী। শাড়িটা কুচিয়ে হাঁটু অবধি এগিয়ে আসায় শুভ্র নরম পা দুটেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ও দুটোকে জড়িয়ে ধরে খেলা করতে ইচ্ছে করছিল। অথচ

নড়বার ক্ষমতা তখন হারিয়ে ফেলেছি। বুকের ভেতরটা টেনশনে দপদপ। কেমন যেন একটা উত্তেজক শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী শরীর দেখাতে জানে। অপরের শরীরে আগুন ধরাতেও জানে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। আর ঠিক সেই সময় শ্যামলী আবার অন্য পোজ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাঁকা হয়ে একপাশে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়ে দুষ্ট-মিষ্টি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছেন?'

আমি যে শ্যামলীর কাছে ধরা পড়ে গেছি তা আর বুঝতে দেরি হলো না। আমি তাই আমার...ঢাকবার জন্য আমতা আমতা করে বললাম, 'কই কিছু না তো।'

—কিছু না তো মানে, এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলেন। আপনার না বয়স হয়েছে। আপনার ঘরে স্ত্রী আছে।

একথা শুনে না আমার মাথা দিয়ে আগুন বেরোতে শুরু করল। ঘরে স্ত্রী আছে ঠিক কথা। কিন্তু আমার বয়স তুলে কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। আমার কি এমন বয়স হয়েছে। দু-একটা চুল পেকেছে। কিন্তু সে তো আমি কলপ করে চুল কালো করে দিয়েছি। তুমিই বা কি এমন কচি খুকি? তোমার বয়সও তো পেকেছে। চামড়ার চেকনাইকে কসমেটিক্স দিয়ে বাড়াতে হয়। যেসব জায়গায় যৌবন, সে সব জায়গাগুলোও সামান্য ঝুলে পড়েছে। তুমি কি ভাব তোমার আর সে বাজার আছে যে তোমাকে দেখে দুনিয়ার যুব সমাজ হামরে পড়বে? আমার বউটা নেহাত আমায় গাল-মন্দ দেয়। একটু সোহাগ টোহাগ করে না। তার উপর অনেকদিনের পুরনো মাল। তাই একটু নতুনের স্বাদ পাবার জন্য তোমার কাছে আসা। না হলে, তোমার কাছে আমার আসতে বয়েই গেছে।

আমার উপরিউক্ত কথাগুলো অবশ্য সবই মনে মনে। ভাষায় প্রকাশ করলেই এক্ষুণি এমন এক ক্যাঁত করে লাথি কষাবে না। পাক খেতে খেতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে সেই নর্দমায়। তার থেকে চুপ মেরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাছাড়া মেয়েছেলের কথায় বেশী কান দিতে নেই। কান দিলেই অশান্তি।

আমি আবার খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই আমি যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। যাক্, শ্যামলীর সাথে কথা না বাড়িয়ে একটু চা খাবার প্রস্তাব রাখলাম।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি চা তৈরী করতে গেল। হঠাৎ একটা উঃ উঃ করে শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি বাঁ হা· দিয়ে ডানহাত খানা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। চোখ ছলছল্।

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? কোথাও পুড়ে গেল নাকি?

শ্যামলী ডান হাতের মাঝখানটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে এইখানটা পুড়ে গেছে। জ্বালা করছে।

পুড়ে যাবার বিশেষ লক্ষণ আমার অবশ্য চোখে পড়ল না। হাতের মাঝখানে সামান্য একটু ফোসকা।

তবুও দরদী কণ্ঠে বললাম, 'ইস, খুব জ্বালা করছে তাই না? কি করে পুড়ল?'

—এই একটু পাঁপড় ভাজতে গিয়েছিলাম, আর তেল ছিটকে এসে পড়েছে।

—কি দরকার ছিল। একটু আগেই তো এত সব খেলাম। এখন শুধু চা হলেই হতো।

—থাক, চলুন বার্নল জাতীয় মলম আছে?

—হ্যাঁ আছে, কিন্তু ও তো লাগালে খুব জ্বলবে।

—আরে, না না, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আমি শ্যামলীকে রান্নাঘর থেকে এনে ধীরে ধীরে নরম বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে শ্যামলীর নগ্ন হাত। আমি বার্নলের টিউব থেকে মলম নিয়ে হাতে বার কয়েক ঘষতেই হাতের জ্বালাটা ক— গেল। শ্যামলী মিষ্টি হেসে বলল, আপনি বেশ যাদু জানেন দেখছি। আমার জ্বালাটা অনেকটা কমে গেছে।

—আপনার জ্বালা জুড়োবার জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা। যেদিন থেকে শুনেছি আপনার প্রেমিক আপনাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে, আর সেই দুঃখে আপনি এখনো বিয়ে করেন নি, সেদিন থেকেই বুঝেছি আপনার কত দুঃখ, কত জ্বালা।

শ্যামলী বলল, "নিন্, এবার হাতটা ছাড়ুন, অনেকক্ষণ ধরে আছেন।"

—হাতটা ছাড়তে প্রাণ চায় না, মনে হয় চিরকাল ধরে রাখি। কি সুন্দর আপনার হাতখানা, কি নরম। ঠিক মাখনের মতো।

শ্যামলী মুচকি হেসে বলল, "তাই নাকি! আপনার স্ত্রী-এর হাতও তো ঠিক এইরকম তাই না।"

—কি যে বলেন। সে হাত তো শিলনোড়ার মতো শক্ত পাথর। আদর করে ধরলে হাতের মালিক খ্যাঁক করে ওঠে। আমার কথা শুনে শ্যামলী বলল, আপনারও খুব দুঃখ তাইনা।

—হ্যাঁ, কে আর বুঝলো বলুন।

এদিকে শ্যামলী আমার পাশে এসে, গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে। আর তখনই আমার একমাত্র স্ত্রী মধুমতীর কথা মনে পড়ছে। গায়ে গায়ে শ্যামলী। ত্বকে ত্বকে শ্যামলী, দেহের উত্তাপ, চুলের সুগন্ধ, শরীরের পাহাড়-পর্বত উপত্যকায়।

ধ্যাত তেরিকা, মধুমতী মোটা, অম্বল, বাতের রুগী। ধীরে ধীরে আমার একটা হাত শ্যামলীর কাঁধ আর খোঁপার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আঙুলগুলো ওপাশের বুকের ওপর খেলা করছে। এদিকে শাড়ির একটা দিক খুলে পড়েছে। শ্যামলীর বিশাল খোঁপাসহ মাথা আমার কাঁধে। উত্তেজিত গরম নিঃশ্বাসে আমার বুক ওঠা নামা করছে। খোঁপা খুলে গেছে, তখন আমি ভাবছি, শ্যামলী কি সুন্দরী।

শ্যামলীর লাল টুকটুকে ঠোঁটের ওপর আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট। আমার জিভ ক্ষুধার্তভাবে চলে এলো শ্যামলীর সুগন্ধী মুখের ভেতরে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো সুন্দর সাবিবদ্ধ দাঁত, জিব, ঠোঁটের ভেতরের নরম জমি। এতো শুধু সুখ নয়, স্বর্গসুখ। ঘরের বউকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সাথে...বেশ ভালই লাগে।

আমি শ্যামলীর কানের কাছে মুখ রেখে বলি—শ্যামলী তুমি কি দারুণ। আমার কথা শুনে শ্যামলী খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

আর তখনই আমার চুলের পেছনের দিকে একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করি। ঐ টানেই আমার দেহখানি শ্যামলীর দেহ থেকে আলাদা হয়ে সোজা মাটিতে। দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। তারপর পিছনে ফিরে দেখি আমার বিয়ে কবা একমাত্র স্ত্রী মধুমতী।

মধুমতী আমায় শ্যামলীর সাথে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ব্যাস! শুরু করে দিলে—

'ও শ্যামলীর সাথে এত দূর। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি। আজই আমি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবো। তখন বুঝবে ঠেলা। কত ধানে কত চাল, স্ত্রী হত্যার দায়ে জেলের ঘানি টানতে হবে বারো বছর।

তা অবশ্য ঠিক কথা। স্ত্রী এখন জনগণের সম্পত্তি। গায়ে একটু আঁচড় লাগলেই প্রথমে জনগণের প্যাঁদানি। তারপর আদালতের কাঠগড়া। কিন্তু ওনারা আমার মাকে কাশীবাসী করাবেন। আমাকে সারা জীবন হামনদিস্তে ফেলে পিষবেন। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। সারাজীবন শুধু বলির পাঁঠার মতো ব্যা ব্যা করে চল।

অতঃপর কি আর করা যাবে। সুবোধ বালকের মত আমি আবার হতাশ মনে আমার স্ত্রীর হাত ধরে বাড়ির মুখে চললাম।

আমি অনামিকা

উৎপলেন্দু মণ্ডল

আমার মা বলত—খুকু তোর মনে বড়ো দোষ।

আসলে সেই ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে একটু পিটপিটানি ছিল। এ জিনিস ছোঁব না। ও জিনিস খাব না, আরও কতো বায়না। সামান্য ঘটনাতে মন খারাপ হতো।

হয়তো একটু ইনট্রোভার্টও ছিলাম। সঙ্গী ছেলেদের বা মেয়েদের কাছে সময় কাটাবার থেকে আপন মনে সেলাই কিংবা বই পড়তে ভালবাসতাম। আম‍্দের এই প্রত্যন্ত গ্রামে গান বাজনার যে খুব চল ছিল তা নয়—তবু আমি প্রায় গুণগুণ করতাম। অনেকটা বাথরুম সিঙ্গার আর কি! কোথায় যেন এক অনির্দেশ যন্ত্রণা আমাকে আনমনা করে দিত। এভাবেই আমার দিন কাটছিল। তা স্বভাবের যে খুব পরিবর্তন হয়েছিল এমন না। বরং আরও একগুঁয়ে, মনখারাপ রোগ আবও আমাকে কাবু করত। সকল লোকের মাঝে আমি কেন এমন একাকী—আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে ভাবতাম আমি কি মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছি। মা প্রায় বলত—কেন তুই ঘরে বসে থাকিস র‍্যা। দেখ দেখি সোমা, কাকলি এরা সব কোম্পানির বাঁধে ঘুরছে—শ্বশুর ঘরে গেলে তুই কি যে করবি। তোর বাবা আমাকে বলে আমি না কি কিছু বলি না তোকে।

আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে বোঝা হয়ে যাচ্ছি। আমার হাতে টেবিল ক্লথ। দাদার ‹'বল'টা কি রকম ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে। টেবিল ক্লথে কাশ্মীর স্টিচ করছি। এই সেলাইয়ের মধ্যে আমি যেন প্রাণ খুঁজে পাই। আমি সোমা, কাকলিদের মতো নিজের দেহসৌষ্ঠবকে মেলে দিতে পারিনে। আমার কি আছে না আছে, বা আছে অক্রান্ত যৌবন। এরকম হাড্ডিসার রিকেট শরীর নিয়ে আমি কোম্পানিব বাঁধে, পড়ন্ত বিকেলে গিয়ে কি করব। সুখের বসন্তে আমার আহ্বান কোথায়। ভালবাসার বিভব বৈষম্যে আমি কতটা প্রবাহমান হতে পারি। বরং এইই বেশ। নিজের...অন্তরালে ভালই আছি। কাজ কি অন্য অন্য সবাইকে বিরক্ত করা।

কয়েকদিন আগে রেডিওতে শোনা রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা লাইন খুব নাড়া দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ, আলখাল্লা পরা ওই ঋষি মানুষটা—সকল মানুষের সকল বেদনা যেন তিনি আগাম প্রকাশ করে আমাদের সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছেন। 'তাই আপন মনে বসে আছি কুসুম বনেতে।' একেবারে আমার মনের কথা। কয়েকদিন ধরে খুব গুণগুণ করছিলাম। বোধহয় রেডিওতে সুবিনয় রায়ের কণ্ঠে শুনেছিলাম। গানের মধ্যে আমি অনেক শুশ্রূষা পাই, যা কাকলি, সোমা এদের সঙ্গে গল্প করে আমি পাই না।

বাংলা সাহিত্যের যে একটা ইতিহাস আছে তা আমি আগে জানতাম না। আমাদের বাংলা পড়ান কল্পতরু স্যার। কি সুন্দর বাচন ভঙ্গি, গলার স্বরও যে...। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তাঁর কণ্ঠস্থ। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা তিনি যখন তখন উদ্ধৃতি দিতে পারেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমাব নিজস্ব জগৎ যেন পেয়ে গেছি। বাইরেব কোলাহল আমাকে খুব বেশি আব জ্বালাতন কবে না। দখিনা বাতাসে কোন এক বিরহী'র

উত্তরীয় যেন আমার চোখের সামনে ভেসে আসে। আমাদের দখিনমুখো বারান্দায়—আম কাঁঠালের ছায়া ভরা মাঠটার দিকে যখন চেয়ে থাকি তখন কোন এক রাজপুত্তুর যেন তার পক্ষিরাজ ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে আসে আমাদের বাড়ির দিকে। আমি ভাবতাম এটা আমার মনের অসুখ। হয়তো এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম। এসব ব্যাপারে তো কাউকে জিগ্যেস করতে পারি না।

মন যখন খুব উতলা হয়ে ওঠে তখন রবীন্দ্ররচনাবলী নিয়ে বসি। সুদূর দিগন্তে চেয়ে আমি শুধু কল্পনায় অবগাহন করি। কিন্তু শ্রাবণের মেঘের মতো তাকে দেখতে পারি তাকে ছুঁতে পারি কই। একবার তো মাকে বললে হয় তাহলে ছেলে দেখতে শুরু করে। শুধু শুধু নীল দিগন্তে ম্যাজিকের মতো দৃষ্টি বিভ্রম জাগিয়ে নিজেকে ছোট করি কেন? ভালবাসার অমল আলোয় তাহলে কিসের অন্বেষণ?

রবিবার দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সামনে পরীক্ষা। কি হবে—কে জানে। ভয় আর বিষণ্ণতা আমাকে এক ঘোরের মধ্যে ফেলে। সবে বোধহয় ঝিমুনি এসেছিল। ছোট বোন কোত্থেকে ছুটে এসে আমাকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে।

এই দিদি দাদা এসেছে, দাদা এসেছে, মা তোকে ডাকছে। শিগগির। আমি ইচ্ছে করে শুয়ে ছিলাম। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পরীক্ষার ভয় যেন আমাকে একেবারে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

না উঠেও কি নিস্তার আছে। মা এখুনি বক্ বক্ করতে করতে এসে পড়বে।

উঠে বসে বসে কাপড়টা ঠিক করছি। দরজার সামনে দাদা। সঙ্গে আরও একজন। মনে হয় ওদের সঙ্গে কলেজে পড়ে। লাস্ট বাসে এসেছে।

—প্রবাল আমার বোন খুকু এবার বারো ক্লাস দেবে।

—একমুখ হাসি নিয়ে আমাকে নমস্কার করে। আমি হতচকিত হয়ে আড়ষ্টভাবে একবার হাতজোড় করি। তখন বিকেল।

২

কলকাতার ছেলে। গ্রাম দেখতে এসেছে। সঙ্গে ক্যামেরা। দাদার ঘরের দিকে চেয়ে দেখি—সিগারেটের ধোঁয়ায় আচমন সারছে। টিফিন, চা, বোনকে দিয়ে পাঠাই। বছর পাঁচেকের মেয়েটা খুব বুদ্ধিমান। আমার কাছে এসে বলে লজ্জা করছে। এই দিদি বল না। লজ্জা করছে।

—না। চুপ করবি? আমি গম্ভীর হয়ে বলি। বিনু চলে যায়। আমি পড়তে বসি। পরীক্ষায় পাস করতে হবে। একটা চাকরি অবশ্যই যোগাড় করতে হবে। এই রিকেটি চেহারা নিয়ে কে আর 'বরণমালা' গলায় পরিয়ে দেবে। সামনের ছাপা অক্ষরগুলো যেন আর চিনতে পারি না! সামনে পরীক্ষা তবু যেন সব নতুন লাগে। ইতিহাসের সাল তারিখ গুলিয়ে যাচ্ছে। অত যে প্রিয় বিষয় আমার বাংলা তার যেন আর কূল খুঁজে পাই না। রাগ হয় দাদার ঘরের দিকে তাকালে। ওদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে? কি মজা। বড়ো লোকের ছেলে গ্রাম দেখতে বেরিয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতো ভাবনা নেই। কাঁধে ক্যামেরা দিনরাত টইটই করে ঘুরছে। আর জ্বালাচ্ছে আমাকে। সময় অসময় নেই—

খুকু দু'গ্লাস সববত কববি। দাদা থাকলে হয়তো মুখ ঝামটা দিয়ে না বলতে পারতাম। কিন্তু সঙ্গে সে একজন চেলা নিয়ে এসেছেন। বাইরেব ছেলের সামনে কি করে মুখের উপর না করি। বিনুটাও হযেছে তেমনি। কোন জিনিস দিতে বললে—যানা তুই যা না। লজ্জা করে। একদিন তো প্রবালদা'র সামনে বলেই দিল। জানো দিদির লজ্জা করে। আমি মরমে মরে যাই। কি সব্বনেশে মেযে বাবা। বাবা আর দাদা বেশি পাত্তা দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছে।

আমার ফাইনাল পরীক্ষার একমাস আগে প্রবালদা চলে গেছে। রেখে গেল অনেকদূরের আলোকবর্ষ থেকে প্রবাল রঙের আলো। যে আলোর দীপনমাত্রায় আমি প্রতিনিয়ত আলোকিত হচ্ছি। না পরীক্ষা খুব ভালো হয়নি। তবু মনে আশা পাস ঠিক করবই। দাদা এখন আর বাডিতে থাকে না। কলকাতার কাছে পিঠে কোথায় মেস বাড়িতে থাকে আব চাকরির পরীক্ষা দেয়। বাবা'র যা সামান্য জমি ছিল গত দু'বছরের বন্যায তা প্রায বিক্রি কবাব সামিল। সারা বৎসবেব খোরাকপাতি যা হোক করে হয়। কিন্তু বাজাব খবচ, আমাব পডার জন্য পয়সাকড়ি সব মিলিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা। দাদা মাঝে মাঝে সামান্য কিছু পাঠায়।

আমি গ্রামের মধ্যে একজন উঠতি ধনি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেব পড়াই। নিজের হাত খবচাটা ওঠে। আমাদের কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাকে হেল্প কবেন। এভাবেই দিন চলছিল। প্রবালদা চিঠি দিত। খুব ভাল চিঠি লিখতে পারত। মেযেবা যে কথা বুক ফাটলেই মুখে বলতে পাবে না—প্রবালদা'র চিঠি পড়ে আমি অবাক হতাম। তখন আফশোষ হতো। আমাদেব বাড়িতে এতদিন ছিল কেন আরও তাকে বেশি করে নিইনি। আমার সকল তুচ্ছ অনুযোগ অজুহাত—তাকে সম্পূর্ণ করে পেতে দেযনি।

দাদা বোধহয় কোন কাবণে সেদিন বাড়িতে ছিল না। ঘরে প্রবালদা একা, বিনু সকালে চা জলখাবার দিয়ে এসেছে। দুপুবে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম দিয়েছে। বিকেল হতে দেবি আছে। আমি ইচ্ছে কবে বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়েছিলাম। নিজের ঘরে তখন খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষার পড়া পড়ছিলাম।

..বিনু.. এ বিনু...বি...নু...। বিনু চলে আসে। দরজা'র শেকল হাতের নাগাল পায় না। অগত্যা আমাকে ছুটতেই হয়।...খুলে দিয়েই আমি লম্বা দৌড়।

প্রবালদা ঠিকই বুঝেছিল। মাঝে মাঝে বিকেলে, আমি, দাদা, প্রবালদা কোম্পানির বাঁধের দিকে বেডাতে যেতাম। কোম্পানির বাঁধে বাংলার শেষ সূর্যাস্ত। প্রবালদার ক্যামেরায় ধবা আছে। ভাবি আমাকে কি তুলে নিযেছেন ওর ক্যামেবায়...

তুলে তো নিয়েছিল কোম্পানির বাঁধে আমার, বিনুব দাদাব গ্রুপ ফটো এখনও আমাদের ঘরে। কোম্পানির বাঁধ গত কয়েক বছরে অনেকবার সংস্কার হয়েছে। জাগতিক নিয়মে অনেকবাব সূর্যাস্ত হয়েছে। না কোন ফটোগ্রাফাব এসে আমাদেব ফটো আর তোলেনি।

সোমা, কাকলিবা আমায খ্যাপাত। কি রে কোথায় গেল তোর প্রবালদা। ততদিনে আমাব কলেজ জীবন শেষ করে ফেলেছি। বান্ধবীদেব বিয়ের খবর পাই। বিনু এখন

অনেক বড়ো। ক্লাস এইটে পড়ে। রাতে আমার কাছে শোয়। বিকেলে মাঝে মাঝে কোম্পানির বাঁধে বেড়াতে যাই। কোম্পানি বাঁধে এখন সারা বছর মিষ্টি জল।...ধান চাষ করে সবাই। লেবার প্রবলেম বলে বাবা সব জমি চাষ করতে পারে না। কোম্পানির বাঁধে টলমল করে জল। তাতে ঘাই মারে বড়ো বড়ো মাছ। নিথর কালো জলে এক একবার নিজের মুখ দেখি। ভাবি প্রবাল রঙের আলো এখনও কতো আলোকবর্ষ দূরে।

অনেকদিন চিঠি পাই না বলে, দাদা বাড়িতে এলে লজ্জার মাথা খেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম—প্রবালদার কথা। দাদা যা বলল আমি অবাক হলাম। প্রবালদা তো একবার জানায়নি যে সে চাকরি পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে অভিমান হয়। যে মানুষটা এত কথা জানায় আর এই কথাটা জানাতে পারে না। আমি রেগে গিয়ে একটা চিঠি লিখি—প্রত্যুত্তরও আসে। লিখেছে ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফার। ঠিক চাকরি নয়। কোনো কাগজের স্টাফ ফটোগ্রাফার হলে অবশ্য জানাবে এবং তাদের বাড়িতে যাবে। এখনও কোম্পানির বাঁধের ল্যান্ডস্কেপটা তাকে না কি ভাবায়।

তাঁদের কোম্পানির বাঁধের কথা এখনও মনে রেখেছে। নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করি। তাদের জল হাওয়ার অনেক জায়গা আছে। সোমা সেদিন এসেছিল আমার কাছে। দামী আর্ট সিল্কের উপর কাথা স্টিচ করা শাড়ি। সোমাকে মানিযেছে দারুণ। আমাদের গ্রামের স্কুলের নতুন মাস্টারকে বিয়ে করেছে। সোমাকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বিয়ের পিড়িতে তাড়াতাড়ি বসেছে। পরনে সিল্কের শাড়ি কপালে সিঁদুর। আসলে আমাদেব মতো তো আর সে রিকেটি নয়। সারা দেহে পুষ্টির দাক্ষিণ্য। চোখে সুষম ক্যালরির সঠিক বিন্যাস। কথায় কথায় জিগ্যেস করে প্রবালের কথা। আমি আব কি বলব। একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার। তার কথা কি করে বলব। জিগ্যেস করছিল আমার চাকরির খবরের কথা। সোমাকে বলব। বাবার সাতবিঘা জমির টাকা এই গার্লস স্কুলে। বাবা ভেবেছিলেন তার রিকেটি মেয়েটা একটা চাকরি-বাকরি কিছু হলে বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না। আসলে সব স্বপ্ন সত্যতায় পৌঁছায় না। প্রবালদা একবার চিঠিতে লিখেছিল—একটা শট নেওয়ার সময় কম্পোজ করলাম একরকম, লেন্সে প্রকাশ পেল অন্য ভাবে। বাবার'ও বোধহয় হিসেবে মিলল না। দাদাও বোধহয় গ্রামে ফিরে আসবে না। তাছাড়া ফিরে এসেও বা কি করবে। গ্রামে যা লেবার প্রবলেম তাতে জমি চাষ ওর দ্বারা হবে না। ভয় বিনু'র জন্য। সকাল সকাল ভাল পাত্র দেখে বোনটাকে বিয়ে দিতে পারলে বাবার দুশ্চিন্তা কমে।

প্রবালদাকে লিখেছিলাম তুমি যেমন ফ্রিল্যান্স। আমিও তেমনি। কোনদিনও বোধহয় স্থায়ী হতে পারবো না। চিরকাল বোধহয় সংগঠক শিক্ষক হয়ে কাটাতে হবে। আমাদের কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামের মেয়েদের তিনি স্বশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের টাকায়, বিল্ডিং, হোস্টেল, সবই হয়েছে। আমাদের ছাত্রীরা মাধ্যমিক দেয় পাশের স্কুল থেকে আমরা শুধুই সংগঠক। স্কুল কোন দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যুক্ত হবে কি না কে জানে। প্রশাসক দলের মেয়েদের শিক্ষিকা হিসেবে নিলে এতদিন আমরা সাকার হয়ে যেতাম। আসলে ইগো'র লড়াই। স্যার কোনও ভাবে কম্প্রমাইজ করবেন না। আমরা পড়েছি মহাফাঁপরে। কতদিন এভাবে আর নকল

দিদিমণি সেজে থাকব। আসলে বাবার সাতবিঘা জমির সবটাতো এই প্রতিষ্ঠানে। আমি কি করে চলে যাই এখান থেকে। আব কার কাছেই বা যাব। সেই প্রবাল রঙের আলো'র কাছে। সেও তো ফ্রিল্যান্স। অনেক অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

সেদিন আমরা ঠিক করেছিলাম। ডি আই অফিসে ধর্না দেব। বীণাদি বাধ সাধলো। চল ধর্মতলার মোড়ে কিংবা শিয়ালদায় অথবা সিধু কানু ডহরে অনশন করি। তাহলে বলা যায় না সবকারের হয়তো টনক নড়বে। আমরা সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বলে শিয়ালদার সামনে জায়গা পেলাম না। বাধ্য হয়ে কার্জন পার্কের সামনে ধর্না দিলাম। অদূরে রাজভবন। অফিস ফেরত লোক একবার দেখে যায়। কার্জন পার্কের কোলাহল আমাদের কাজে আসে। মাঝে পুলিশের কর্তারা এসে আমাদের অনশন বন্ধ করতে বলে। কংগ্রেস, সি পি এম সব দলের জনদরদী নেতারা আসে। শান্তভাবে বোঝায়। আবার সময় হলে চলে যায়। বেশ চলছিল আমাদের আন্দোলন। শহরের আধুনিকারা একবার ভ্রু-প্লাগ করা আঁখিপল্লব উঠিয়ে দেখে যান আমাদের। মাঝে মাঝে প্রেসের লোক আসে। আমরা আমাদের দাবি জানাই।

কার্জন পার্কে তখন শেষ বিকেল। গলায়, কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে প্রবালদা। অনেকগুলো ছবি নিল। কোন কাগজে বেরুবে কিছুই বলতে পারছে না। সবার সামনে কিইবা বলব। তবু কতদিন পর আজ দেখলাম। সেই কবে কিশোরী সকালে আমাদের দেখা। তারপর কোম্পানির বাঁধে ফটো তোলা। বীণাদিকে বলে একটু বাইরে গেলাম। শহীদ মিনারে নবম আলো। ডানলপের আলোর বঙ পাল্টেছে। আমরা কার্জন পার্কের ঘাসে বসি। জিগ্যেস করি চাকরির স্থায়িত্ব নিয়ে। কোন সম্ভাবনা নেই। কাগজগুলোর অবস্থা খুব ভালো নয়। সবাই প্রায় ফ্রিল্যান্স দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে চায়। অন্য চাকরি করতে পারবে না। অন্য চাকরি তার ভাল লাগে না। দশটা পাঁচটা অফিস তার ধাতে নেই। অতএব এভাবে চলছে। মাথার উপর বোঝা বাড়ছে। তবুও অন্য পথ নেই। যে পয়সা সে ফ্রিল্যান্স করে পায়—তাতে তার খারাপ চলে না। তবে শরীর খারাপ হলে বাড়ি বসে থাকলে তো আব কেউ পয়সা দেবে না।

আমি আর বেশি কিছু জিগ্যেস কবতে পারি না। এই সেদিন সব লজ্জা যেন আমার গায়ে চেপে বসেছিল। আমি সংকোচে ভাল করে কথা বলতে পাবছিলাম না। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে তাকে জোর কবব। আমার এই রিকেটি শরীরে কিছুতো নেই। কি দিয়ে তার কাছে জোর করব। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। কথা বলতে পারছিলাম না। প্রবাল কখন আমাব আঙুলে আঙুল রেখে দূর আলোকবর্ষ থেকে নেমে আমাকে আদর করছে। এব আগে যে ক'বার আমাদেব বাড়িতে এসেছে। প্রবাল বড়ো তাড়াতাড়ি চলে গেছে। আজ যেন অনেকটা তাব কাছে পেলাম। তবু যেন দুজনের মাঝখানে ক্ষীণ জনস্রোত।

আমি তাকে কি কবে বা জোব করব। কিংবা বলব যে অন্ততঃ আমার জন্য একটা ভাল চাকরি দেখো। ওর ভালো লাগা মন্দলাগা'র উপর আমার আধিপত্য কোথায়। তাছাড়া যে মানুষটা দশটা পাঁচটা অফিস-এর নিশ্চয়তা ছেড়ে এক অনিশ্চয় কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে সে কি করতে পারে। এটাতেই তার প্রাণের আরাম সে কি করে রোধ করবে।

সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন। আমাদের বীণাদি এবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন—ত্রিস্তরের একেবারের নিম্নস্তরে। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রশাসনে নিযোজিত সরকার। আমরা একটু আশার আলো দেখছি। কোম্পানির বাঁধের উপর দিয়ে এখন পিচঢালা রাস্তা। সরু কালো ফিতের মতো রাস্তা চলে গেছে বহুদূরে। কলকাতার বাবুঘাট থেকে সরাসরি এখন এখানে আসা যায়। শীতের রোদ ঝলমলে সকালে এখানে বহু পিকনিক পার্টি আসে।

ইদানীং পঞ্চায়েত ভোট কভার করতে গাড়ি করে কাগজের লোকরা আসছে যাচ্ছে। আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকি কোম্পানির বাঁধের দিকে। সেই ছোট বেলার স্বপ্নর মতো। না এখনও সেই ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার একবারের জন্যও আসেনি কোম্পানির বাঁধে। শুনেছি বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে চলে গেছে বোম্বে। এখন কদাচিৎ দু-একটা চিঠি আসে আমাদের বাড়িতে। আমিও উত্তর দেওয়ার গরজ করি না। তাছাড়া বাড়িতে আমি ক'ঘণ্টা বা থাকি স্কুলের বোডিংয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি। প্রাণ ধারণের গ্লানিতে। কোম্পানির বাঁধের স্থির জলে শালুক ফুল ফোটে। দখিনা বাতাস জলে কাঁপন তোলে। এখনও সূর্যাস্ত হয়। কখনও বর্ষশেষের কিংবা বর্ষ শুরুর।

আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সময়কাল আফটার ইলেকশন হয়তো আসল মাস্টারনী হতে পারব। তারপর সব হ্যাল ফ্যাশনের আধুনিকাদের মতো সন্তোষী মা, সালোয়ার কামিজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা করেই হয়তো কাটাব। চোখে চশমা, আর রিকেটি শরীর নিয়ে কাটিয়ে দেব বাকি সময়টা।

আমি জানি কোম্পানি'র বাঁধে তখনও যাবো। দূরে ফিতের মতো রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এখনও কি খুঁজে পাব বহুদূরের আলোকবর্ষ থেকে আসা প্রবাল রঙের আলো। অমল আলোয় উজ্জ্বলতর হবে ভালবাসার বিভববৈষম্য।

জাড়কাঁটা

মুর্শিদ এ. এম.

খবরটা কী করে যেন পৌঁছে গেছে হামিদার কানে—শোহরাব আসছে। তারপরই শুরু হয়ে গেছে খলবলানি।

একমনে গান গাইতে গাইতে নাড়া কাটছিল মাঠে। ও আর ওর চাচার মেয়ে সাবেরা, সঙ্গে পাড়ার নয়িম গাজিব মেয়ে খতেমন। ফসল তুলে নিয়ে গেছে চাষী, পড়ে আছে যৌবনের থুতনিতে নতুন কেশচিহ্নের মতো ধানের গোড়ার বিঘতখানেক টুকরো—নাড়া। সুর করে গাইছিল ওরা রূপবানের পালা থেকে—

বাব দিনের শিশুর সাথে গো
ও দাইমা—ক্যামনে হবে বিয়া গো,
ও মোব দাইমা—
দাইমা গো—।

তালে-তালে কাস্তে। পোঁচে-পোঁচে মাঠ হয়ে উঠছিল আরো শাদা মাটিসার। ভরে উঠছিল ঝাঁকা।

আরও কিছুদিন যেতে দিয়ে মাঠে নামবে নতুন ফসল—মাসকলাই, বিউলি। ছেয়ে যাবে সবুজে, মাঠের পব মাঠ, বাদাব পব বাদা। তখন শুরু হবে ওদের কষ্টের। আকাশে রোদ্দুবের হলকা উঠবে ধুলোর গন্ধ মেখে। শক্ত হয়ে যাবে বাদার ঢেলা মাটি। থির থির কাঁপবে বাদাব দিকে পেছন ফেবা গাঁ, নারকেল তালের সারি।

এখনও কোথাও জমিতে জল আছে একটু-আধটু। নাড়াগুলো কোনওটা ভিজে। ছোট ছোট কুনি-ডোবার চারপাশে নাবাল জমিতে রয়ে গেছে জলের পাতলা আস্তর। দিনে দিনে তা হাত পা গুটিয়ে ডোবার ভেতব সরে যাবে। এখানেও কষ্টের শুরু।

তা জমিব মাটি শক্ত হয়ে গেলে, জল কমে এলে, কিংবা সবুজের আয়োজনে হামিদাদের কষ্টের শুরু হবে কেন? সাফসুতরো জবাব হলো, বর্ষা বা শীতের কিছুদিনই পাওয়া যায় জলা থেকে সামান্য খুদকুঁড়ো। টানাপোড়েন বেঁচে থাকার যা একান্ত সম্বল। এই যেমন নাড়া। শুকিয়ে গেলে জ্বালানি হয়। উঁচু জমির আলে বা চাষ না হওয়া পতিত জমিতে লম্বা সরু নলের মতো ঘাস জন্মায়—চুঁচকো, বেনা ঘাস। কেটে এনে কুচিয়ে দিলে বর্ষার চবা কবতে না পারা গরুছাগলেব মুখে দেয়ার মতো খোবাক। তাবপর কুনির মোন থেকে ঘুনি পেতে ধরা কুচো চিংড়ি, পুটি খলসে, মৌটি মাছ। আঁটলে শোল, বোল, উলকো—। সবই ঐ বর্ষার দিকে কিংবা শেষাশেষি সময়ে। আবও আছে। পনের-বিশ ফুট লম্বা, ফুটদেড়েক চওড়া জাল, ধানখেতের মাঝে পেতে রাখা। জলের একধারে টিপলির টানে লম্বা লম্বি ঝুলে রইল মাটিমুখো-মাটি ছুঁলো না। টিপলি রইল ভেসে। কইমাছ ভাসতে ভাসতে কানকো লাগিয়ে দেয়। সকালে গুটিয়ে তুলে আনলে গোটা পাঁচ-ছয় নাদুসনুদুস কই উঠে আসে। বাজারে নিয়ে যেতে পারলে দর। কখনও পাড়াতেই বেচে দেয়া। কারও আত্মীয়-কুটুম এসেছে, যোগাড়-যন্তর নেই—তখন। এসব মাছ শিকারে হ্যাপা আছে।

কনকনে আঙুলকাটা জলে ভোর রাতে নেমে যেতে হয়। অন্ধকারে জলের রং কালো। হাঁটুসমান ফসল, ঘাসঝোপ, সাপ। এসব বাঁচিয়ে তারপর মাছেব তদ্বির। সারা দিন চোখ পেতে বসে থাকতে হয়। নইলে চোরের ওপর বাটপাড়ি। জাল আঁটল তো একজনের নয়। গাজিপাড়ার হরেক মানুষের ঐ একই ফন্দি-ফিকির। কষ্ট এতেও কম না।

কিন্তু চোত মাসের কাঠফাটা গরমে জোগাড়পাতি না করতে পারাটাই আরও কষ্টের।

এ হলো আমড়াবেড়ের কলজে ছেঁড়া কান্নার কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হদ্দ গাঁ। বেশি ভাগ মানুষই নিম্নবিত্ত। কিংবা বিত্ত থাকলে তবেই না তার উচ্চ-নীচ। বিত্তই নেই, অতএব গরিব গুরবো। আর জমির অধিকারী—ধনী। ফাবাক বলতে এইটুকুই। হিন্দু-মুসলমান আধাআধি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই মোটেও। হরিসংকীর্তনের দল মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খোল-করতাল বন্ধ রেখে শ্রদ্ধা জানায়, নমস্কার করে কেউ কেউ। মহরমের মিছিল পেরোয় মুসলমান মহল্লা ছেড়ে হিন্দু মহল্লায়। চাঁদা তোলে, ছুরি-লাঠি-তলোয়ার খেলা দেখায়। বিয়েতে দু রকমের আয়োজন থাকে ধনীর ঘরে। এরা রাজনীতিতে যত না দড়, তার চাইতে বেশি সজাগ ধর্মকে নিয়ে যেন কেউ পলিটিক্স না করে। জাতপাতের দাঙ্গার উত্তেজনা এদের মনমরা করলেও তাপ ছড়ায় না।

ফারাক তাই আর্থিক ওঠা নামায়, অন্য কিছুতে নয়। মোহরদ্দি শেখ, পাঁচু শেখ, জোনাব ঘরামি, শরিফুদ্দিন সর্দার হল জমিঅলা ধনী। নোনটু কয়াল, নিরাপদ গায়েন, রাঘব সর্দারও তাই। এঁদের জমিতে সম্বচ্ছর খাটে ফরিদার বাপ, সাবেরাব ভাই, আক্ষয়, জীবন নস্করের ছেলেপিলেরা। বাড়ির কাজেও পড়ে থাকে কেউ কেউ। একেক পরিবার আট-ন'জন কাজের লোক পোষে, পালে। তারা বাজারে ডাবের কাঁদি কলার কাঁদি নিয়ে বেচে আসে, তরিতরকারি বেচে আসে হাটে। গরুর জাবনা বানায, চরাতে যায়, লাঙলে হাতও লাগায়। বীজ তলা তৈরী, ধান রোয়া থেকে কেরোসিন মেসিনে ধান ভানিযে চাল করা পর্যন্ত থাকে। সমস্ত মাঠের ধান উঠে গেলে, পরিপাট হয়ে গেলে—ভোজ খাওয়ায় মনিব। গরম ভুমো ডুমো ভাতে মাখা সবুজ সেদ্ধ কলাই। সঙ্গে ঘানিভাঙান চাষের সর্ষের তেল, পোড়ান লঙ্কা, পেঁয়াজ।

যখন কাজ মন্দা তখনও এদের পয়সা গুনে যেতে হয় মালিককে। পেটের তাগিতে ঘাটতির পর ঘাটতি জমে ওঠে মালিকের খাতায়। মরসুমে গতর লাগিয়ে শোধ হয়। সবাই সমান না। কেউ হিসেবমত খাটিয়ে নেয়, কেউ হিসেবের বাইরে। কারণ এরা কেউই অক্ষর চেনে না। হলেও হিসেবতো রাখতে জানে। এদের কোনও ইউনিয়ন নেই। যদি কোনও মনিবের চাতুরির প্রমাণ বেরিয়ে পড়ে তবে সমস্ত মজুর মিলে তাকে একঘরে করে। এছাড়াও মজুরদের রোয়াব বেশ সইতে হয় মনিবকে। কাজের ফাঁকে জলপানি-র একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী—কথা ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় রটে যায় বদনাম। এমনকি চুরি করে—ডোবাতে, জলাতে। মাছধরা নিয়ে, ঘাসকাটা নিয়ে, আপত্তি তুললে, একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় রসিদ গাজি, আছিরদ্দি গাজিরা। সাদা চোখে দেখতে গেলে এসব ঘটনা মালিকদের ওপর অন্যায় জুলুম বলে মনে হয়। কিন্তু মজুরদের চোখে তা

অন্যায্য হয়ে ওঠে না। যাদের আছে, তাদের কাছ থেকে সামান্য চেয়ে-চিন্তে, কিংবা এক-আধটু হাত সট্‌কা করলে এতই কি কমে যায়?

না। বিবেক-বিবেচনা, চরিত্রের সততা এসব বড় বড় কথায় ওদের বিশ্বাস নেই। মাথায় রাখা যায় না সব সময়। আবার এদের সাহায্য করেও দেখা গেছে—কাজে আসেনি। চোদ্দ পুরুষের স্বভাব, বলে না—'শুকো মাছের না যায় বোয় / কমিনের না যায় খোয়।' সহজে মোছার নয়। ফলে চুরি-চামারি হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্মানের, যোগ্যতার এবং মানানসই হয়ে ওঠার চরম মাপকাঠি।

তা জলজ্যান্ত দিনদুপুরে চুরিটা হয় কি করে? ধরা পড়ে না? পড়লেই বা। কেঁদেকেটে মুখ খারাপ করে পাড়ার লোক জড় করে বসে। ঐ মুখের সঙ্গে 'ভালোমানুষের ঝি'-রা পারবে কেন! শেষে যার জিনিস, তার মনে হয়—চোর ধরে কী এক অপরাধ করে ফেলেছে।

মোহরদ্দি শেখ হলো ঐ সাহায্য বাড়িয়ে রাখা লোকগুলোর মধ্যে একজন। জমিজমা অন্য ধনীদের তুলনায় কম হলেও মনটা ঐ দিকজোড়া ধু ধু মাটির মতো সহনশীল। বয়েস হয়েছে, সবকিছুই কাজের লোককে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে করে হিসেবের গড়বড় মেনে নেয়া, ওজন কম সহ্য করা, জোরজবরদস্তি আনাজ-তরকারি বাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার মতো ছ্যাঁচড়ামি—সবই সহ্য। দুই ছেলে। বড়জন বউ নিয়ে খিদিরপুরে থাকে। জমিজমার কোনও খোঁজখবরই রাখে না। অন্যজন এম.এ. পড়তে মেসে আছে। সেও সেই কলেজস্ট্রীটের কাছে। যদি মতি হয় গ্রামে থাকার, সামান্য নজর দিলেই হয়ত বেঁচে থাকবে চাষবাস, জমিজিরেত।

এক মেয়ে মোহরদ্দির—খুরশিদা। ডাকনাম খুশি। চাঁপাফুলের রং। নাক নকশায় এ পাড়ার কেউ ধারে কাছে আসে না। পড়াশোনায় ভালো। দেরি করতে তবু মন চায়না মোহরদ্দির। চারদিক থেকে কথা উঠছে। সে কথার মধ্যে কতটা অখলতা, আর কতটা আকচা-আকচি তা ভালোমতই টের পায় মোহরদ্দি শেখ। আসছে বছরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে—তেমন কথাবার্তা চলছে। কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যখানে।

কিছুদিন হলো বাড়িতে আসা যাওয়া করছে দূর সম্পর্কের এক শালির ছেলে শোহরাব। কথাটা উঠেছে সেখান থেকেই। শেষ অবধি তার হাতেই না তুলে দিতে হয় মেয়েটাকে। হলে, আফশোসের সীমা থাকবে না। ছেলেটা মুখে হামবড়াই করে। এখনও তেমন খোঁজখবর করা হয়নি কী আছে, আর কী নেই। দু-চাকার ফট্‌ফটি—মোটরবাইকে ধুলো উড়িয়ে আসে যখন, তখন কেই বা চোখ বুজিয়ে বসে থাকবে? হুলুই দেয়া একদল ন্যাংটো ছেলেপিলে আর দু চারটে কুকুর তো গাড়ির পেছন পেছন ছুটে আসে সামালি মোড়ের বাস রাস্তা থেকে। এই গাঁ অবদি। বেটি তাই দেখে নাচে। খুশির মা এখনও মনে করতে পারে না, তার কোথাকার কোন দূরসম্পর্কের বুনের বেটা শোহরাব। তবে ছেলেটার জমি-জমার জ্ঞান আছে ভালো। সম্পত্তি কীভাবে রাখতে হয়, তার পরামর্শ মাঝে মধ্যে সঠিক মনে হয়েছে মোহরদ্দির। পাড়ায় মানুষের মনকষাকষির কারণ সেটাও হতে পারে।

খুশি বিকেলে টানটান করে চুল বাঁধে, বিনুনি করে। তারপর ওড়না পরিপাটি করে

ঢেকে দেয় উদ্ধত আকর্ষণ। মাটির কলসি কাঁখে নিয়ে এগোয় ধীর পায়ে। এখানকার জলের তল বেশ নিচে। সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনও বাড়িতেই নিজস্ব টিউবওয়েল নেই। জল আনতে আধমাইল হাঁটা। তারপর লাইন দিয়ে গল্পগুজব আর জল ভরে আনা। সকাল বিকেল দুবার যেতে হয় জলের খোঁজে। শুধু খাওয়ার জন্যে। অন্য কাজ পুকুরেই।

এমনিতেই ধীর মেয়ে খুশি। চোখেমুখে তবুও যেন চোরা গর্ব লুকিয়ে থাকে রূপের। কলসি কাঁখে যখন সে হাঁটে, তখন তার রূপ ঢেউ তুলে বেড়ায়। যাদের কাকা বলে, সেইসব চ্যাংড়ারাও নানা অছিলায় কথা বলে, ওর সঙ্গে হাঁটে। শান্ত খুশি তাতে বিরক্ত হয় না। সবার সঙ্গে তার খোলামেলা আলাপ। মোহরদ্দি এ নিয়ে সামান্য শাসন করেও কোনও ইতরবিশেষ করতে পারেনি। খুশি জানে যতই সবাই ঘুরঘুর করুক না কেন, আব্বার নামের দৌলতে সাহস হবে না কারও নোংরামি করার। অথচ শোহবারের কাছে কিছুতেই সহজ হতে চায় না কথাবার্তা। তাতেই ভয় ধরে যায়। ভয়, আবার হিংসেও হয়। গাজিবাড়ির মানুষেরা যখন উঁকিঝুঁকি মেরে একনজর দেখতে চায় সুদর্শন শোহরাবকে—তখন। অথচ কী দেখায়, কী চলায়, কী শিক্ষা বা পয়সায়—খুশির নখের যুগ্যি নয়। তবুও, শোহবাবটা যেন কিছুই বোঝে না। ন্যাকা, ছিঃ।

নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ওঠে, আয়নার খুশিকে দেখে। দাঁত থেকে গোড়াকষি ফিতেটা হাতে নিয়ে ভেঙচায়। আর তারপরই কানে আসে মোটরবাইকের কট্ কট্, কট্ কট্ শব্দ।

গান থামিয়ে ঝাঁকা হাতে উঠে পড়ে হামিদা। ছড়িয়ে যায় কুচি কুচি নাড়ার কিছুটা। এবার ফ্রকের পেটে হাওয়া ঢুকিয়ে সে দৌড়ায়। ফট্‌ফটিখানা পাড়ার ভেতর সেঁধোবার আগে পৌঁছতে হবে রাস্তায়। বাকুলের পেছনবাড়ে, গোয়ালঘরের মধ্যে থেকে নজর রাখতে হবে। শুধু নাড়া-ই না। ফেরার পথে ঘুনি আজড়াতে হবে, আঁটিকতক কলমি তোলা আছে—শেখদের কুনি থেকে। কয়েকটা শাপলা। চুলোয় দেয়ার, মতো খানকতক নারকেলের শুখা পাতা—চুমরি নিতে হবে আড়া থেকে। গরু আর খাসি দুটোকে এখন নেয়া যাবে না। সাঁঝ বরাবর মাছের জাল তুলবে, সেইসঙ্গে ওদের নিয়ে ফিরবে। জলাটা পেরোয় হামিদা। আড়ায় ওঠে। আড়া ধরে ট্যাড়শ-বাড়ি পেরিয়ে বাখারি ঘেরা জমিটাও পার হয়—বাখারি ফাঁক করে। আবার নামে জলায়। তারপর নোনটু কয়ালের কুনির মোন বরাবর হাঁটুজলে।

হামিদার মা রাহিলা তখন খড়ো চালের বাতা থেকে কঞ্চি টেনে উনুন জ্বালানর তোড়জোড়ে ব্যস্ত। দড়ির দোলায় ঘুমিয়ে দুমাসের রক্তশূন্য ম্যাড়া বাচ্চা। মাটিতে মাদুরে আরও দু'জন। সরু হাত পা, ভুঁড়ো পেট, ন্যাড়া। কতই বা বয়েস, সাত বছর আর দেড় বছর।

নাড়ার ঝাঁকা ধপাস করে উঠোনে নামিয়ে দাঁড়ায় হামিদা। হাত পা সিঁটে, গায়ে জাড়কাঁটা। বড় বড় হাইনিঃশ্বেস, বুক দুটির ওঠানামা—রাহিলা দ্যাখে, খুশী হয় না। এত খরখর বাকুলে ফেরার আশা করে নি। মন্দ খোঁজেমেয়ের চোখেমুখে। বছর চারেকের আরেকটা শিশু হামিদার পেছনে এসে দাঁড়াল। ধুলোকাদা মেখে কোথা থেকে যে আসে,

ওদের তা নিয়ে মাথাব্যথা বড় একটা থাকে না। সে পয়লা হামিদার জামা ধরে টানে, তারপর মার কোলে গিয়ে আঁচলটা সরায়। দুধ খাওয়া শেষ হলে, যেমন এসেছিল, তেমনি আবার কোথায় চলে যায়।

আঁচল ঠিক করে বাহিলা। খবর তার কানেও এসেছে। সটান কঞ্চি হাতে ঘুরে দাঁড়ায় হামিদার সামনে। চুলের মুঠি এক হাতে, অন্য হাতে কিল। দমাদ্দম পড়তে থাকে বুকে। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল।

—হারামজাদি, এই কটা নাড়া নে তোর কোতায় দিবি রা? রাঁড় আমার। ভাতারের জমি থেনে চাড্ডি কাটকুটো নেসতি গতরে বেতা হয়? চুলোয় কি দোব রা—হাত পা? অবলা জন্তুগুনো কি তোর বাপের, হ্যাঁরা? সাঁজ অবদি তারা আঁটি চোঁসপে। মাছগুনো কে আনবে—হ্যাঁবা মাগী, ভাতারের জলায় উটতে শরম হয়? না, যা না, দুরো—উটগে যা না নাগরের ভিটেয়। চুন্নির জাত, চুন্নির বংশ কোত্থেকে এসে পড়ে মরেচে। ফট্‌ফটি চাইলে মিনসে এবার আসপে, তাই মা গিচি-বাপ গিচি করে দৌড়িচিস। নজ্জা শরম হায়া কায়া নি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। মর মর, গোলায় দড়ি জইড়ে ঝুলে পড়। বেরো—

কোন কথা বলা হয়ে ওঠেনা হামিদার। মারের থেকে গালাগালিতেই তার মুখ বন্ধ থাকে। এসব রোজের ব্যাপার। শুধু জামার পেছনের দুখানি বোতাম আরো ছিঁড়ে যায়। গলার ফাঁকটা বড় হয়ে ওঠে। নিচু হয়ে কাজকাম করতে গেলে চ্যাংড়াদের নজর চলে যাবে। কোনমতে হাত ছাড়িয়ে দাবায় ওঠে। তার পর বাঁশ খুঁটি ধরে পালটা আক্রমণ শানায়—

—চুন্নি আমি, না তুই? তোর বাপ চুন্নি, তোর মা চুন্নি। কার জন্যি চুরি করি রা! আসুক আজ তোর ভাতার, বলবো, সব বলবো তারে, মিছে কথা কইতে জোবানে আটকায় না? ইদিনে ঘাট থেনে ভিজে কাবডে উটে আস্তায় ডেঁইড়ে কতা কোস নি মোহরদ্দির হবু জামায়ের সাতে? শরম আচে তোর, আবার বলিস? কিছু আনবনি। শুইকে মারব তোদের —

জবাব যেন আসে হাঁড়ির আগুন মুখে—বেশ বলিচি, তুইও বোলগে যা না। বাকুলে হাত ধরে টেনে নে ছেঁড়া চ্যাটাই বসা। বসা না।

হামিদা এবার ভেঙে যায়। কথাগুলো সবটাইমিথ্যে নয়, অথচ এত লাগে কেন তা বোধবুদ্ধির বাইরে। কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়ে চুবড়ি হাতে উঠে পড়ে জলার উদ্দেশ্যে। বেশ মালুম পায় এর মাঝেই বাকুলের পাশ দিয়ে ফট্‌ফটিটা আওয়াজ তুলে, ছেলেছোকরা আর কুত্তাদের পেছনে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখতে পায়, খুশির মুখখানা আরও রাঙা হয়ে উঠেছে পড়ন্ত রোদ্দুরের ঝলকানিতে।

পাকা রাস্তার মোড়ে দোকানপাট সামান্য। রোজের দরকারি সামগ্রী ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পাড়ার পুরুষেরা এখানেই মিলিত হয় রোজ সন্ধেয়। পাওনাগণ্ডা হিসেব নিকেশ চলে। মনিব আর মজুরদের এ এক মিলন মেলা। কিছু কিছু চাষের আনাজ, মাছ, ফলপাকুড় আসে। সবই গ্রামের নিজস্ব ফলন। বাজার নয়, বাজারের মতো।

হামিদা সন্ধে পেরিয়ে 'রাস্তায়' চলেছে। মোড়ের নাম, শুধুই 'রাস্তা'। একহাতে শিকা-র মতো দড়িতে ঝোলান দুলতে থাকা ভাঁড়ে মাছ। বাচ্চা জ্যান্ত শোল, উলকো, কই।

ছলাক ছলাক নাচছে ভাঁড়ের জল। বগলে চাপা চটের টুকরো—মাটিতে পেতে বসতে হবে। মাথায় কয়েক আঁটি কলমি আর গোটা দুই লাউ। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা গামছা দিয়ে সেগুলোর পেট বাঁধা। তার পা চলছে, মুখখানাও থেমে নেই। গাঁয়ের পালান মুদির দোকান থেকে চিটেগুড় কিনে নিয়েছে খানিকটা—তাই চিবোচ্ছে। বাকিটা ইজেরের ট্যাকে পরম যত্নে রাখা। আধঘণ্টা হেঁটে সে রাস্তায় পৌঁছয়।

বেশিরভাগ দোকানেই কুপির টিমটিমে অলৌকিক আলো। বড় দোকানে বেচাকেনা বেশি—সেখানে হ্যাজাক। তারই সামনে রোজকার মতো, ওরই মাথার চ্যাটচেটে তেলের দাগ ধরা পিলারে ঠেস দিয়ে হামিদা বসে পড়ে। বিক্রি করে সবজি, মাছ। তারপর আব্বার সঙ্গে ঘরমুখো হয়। আব্বা ঐ সময়টা মজুরি নেয়, তাস খেলে। তারপর নেশা করতে যায় বিবিরহাটে। ঘরে ফেরার সময় অবশ্য নেশাটা ঝরে যায় কিছু। অসুবিধা হয়না হামিদার। বেশি নেশা থাকলেও ঘরে নিয়ে যাওয়ার দায় তার। এসবে শিশুকাল থেকে ও এতই সড়গড় যে, এটাই নিয়ম মাফিক জীবনযাত্রা—তা মেনে নিতে কোনও ধন্দে পড়েনি কোনও দিন। ঝামেলা বলতে একটাই। গাঢ় নেশা হলে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে আব্বা—যার এতটুকুও বুঝতে পারে না। আব্বার সঙ্গী নেশাড়ু হল সুদর্শন কাকা। দুজনে বলাকওয়া করে—হারামজাদা দেশের কিচ্ছু হবিনি। যত্ত কতা সব কইবে শালা নেতার বাপেরা, সুমুন্দি গরিপদের বলার রাইট নি। উত্তরে সুদর্শন বলে—রাঁড়ের বেটাদের কাছে কিনতি যাও—চড়া। আর চাষের সামগ্রী বেচতি যাও—মন্দা। ফেলে রেকে পইছে, সাড়ে সব্বোনাশ হয়ে গেল গা!

কলমি পড়ে আছে এক আঁটি, শাপলা সবটাই। কিছু মাছ এখনও জলে খল বলে আওয়াজ ছাড়ছে। শোল, উলকো—এসব সস্তায় পেয়ে কিনে নিয়ে গেছে, কিন্তু বাকি মাছগুলো কেনার লোকজন বুঝি রাস্তায় আজ আসেই নি।

রাহিলা বিবির ঝাঁটায় একটা কাঠিও নিটুট থাকবে না, সবই ভাঙবে ওর পিঠে—ভেবে সারা শরীর কাঁটা হয়ে যায় হামিদার। দোকানের হ্যাজাকটা দপ্ দপ্ করছে। সেই কাঁপা আলোর শিখায় হামিদার মুখ উথাল পাথাল। বুকের গুরুগুরু শব্দ যেন শোনা যায়। আব্বার আসার সময় হয়ে এল আসফাসে হাপিত্যেশ চোখ একবার বুলিয়ে যায় ভাবী খদ্দের খুঁজতে। হঠাৎ কোথা থেকে বুকের আওয়াজ যেন বাতাসে ভাসে, উঠে আসে রাস্তায়!

মোটরবাইক চালিয়ে শোহরাব একেবারে তার সামনে থামল। হাত ঘুরিয়ে পিঠের বোতাম লাগানোর চেষ্টা করে হামিদা। চুলগুলো কি পরিপাটি আছে! গামছাটাকে বুকের মাঝ বরাবর ঠিক করে নেয়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। হলদে কষ পড়া পায়ের নখগুলোকে লুকোবার চেষ্টা করে। জামাটাকে যতটা পারে হাঁটু নিচে নামায়, পা ঢাকে। চড়চড় করে গায়ে ফুটে ওঠে জাড়কাঁটা।

গুরুগুরু শব্দটা বুঝি বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে শোহরাবের হাতে। এক ধরনের ভয়। শোহরাবের হবু শউরের কুনির মাছ, জানতে পেরে গেছে নাকি! হায় খোদা। কেমন এক সুবাস নিয়ে এসেছে শোহরাব—চারপাশ তার গন্ধে মাতোয়ারা। এগিয়ে আসে হামিদার দিকে।

—জীয়ল মাছ্ রয়েছে? শোহ্‌রাব বলে।

হামিদা 'মাছ্' কথাটুকুই শুধু বোঝে, মাথা নাড়ে। শোহ্‌রাব সবগুলোকে ওজন করতে বলে ফিরে যায় গাড়িতে। বক্স থেকে সিগারেট বার করে জ্বালায়। ছোট চটের থলিটাও বার করে আনে।

হামিদা ওজন করতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলল। কয়েকটা কই, পাল্লা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে। কানকো বেয়ে দুরে পালাবার মতলব তাদের। গুছিয়ে তুলতে হাত কাঁপছে হামিদার। কতবার কত মাছ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে অনায়াসে। এখন কানকো ফুটে গিয়ে জ্বলতে লাগল হাত। চটের ব্যাগে মাছগুলোকে উপুড় করে দেয়ার আগে সে বলে—এই বেগে কইমাছ্ যাবিনি গো, কানকুরো ঘসে পেইলে যাবে!

শোহ্‌রাব চুপচাপ মানিব্যাগ বার করে।

হায় আল্লা! হামিদা আবার চমকে ওঠে। কুটুমের ডোবার মাছ—পয়সা দেবে কি গো! কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। ধরা পড়ার ভয়, অন্তত শোহ্‌রাবের সামনে—সে বড় লজ্জার। একবার ভাবল বলে,—নে যান গো, পয়সা লাগবেনি। কিন্তু যদি জানতে চায়, কেন? তখন কী উত্তর দেবে সে? তাই হাত পেতে টাকা নিতেই হয়।

শোহ্‌রাব চলে গেছে। পেট্রলের গন্ধ কিংবা তার সঙ্গে মিশে থাকা শোহ্‌রাবের দেহের সুবাস এখনও বুক ভরে টানছে হামিদাকে। একখানা দীর্ঘশ্বাস নিল সে, তাতে স্বস্তির চিহ্ন নেই। চুরি করে সে। 'চুন্নি' আর গয়না, টায়রা-টিকলি। তবু এভাবে যার ধন, তাকেই বেচে পয়সা নেয়নি কখনও। টাকার বদলে সে যেন তার মান ইজ্জত বিকিয়ে দিল, তার অহংকার বিকিয়ে দিল, তার ইমান বিকিয়ে দিল...।

হামিদা স্পষ্ট দেখতে পেল, কইমাছগুলো লাল লাল পুরুষ্ট কানকোয় ভর করে, চটের ব্যাগ বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে...আরও আলো বাতাসের দিকে।

ময়ূর

দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়

অস্থিরচিত্তে পদচারণায় রত ময়ূর। পরিচারিকার হস্তে তিনি আটটি শ্লোক প্রেরণ করেছেন বানপত্নী চন্দ্রাবলীকে। ওই নারীকে প্রথম যেদিন তিনি অবলোকন করেছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর চিত্তবৈকল্যের সূচনা। শুধু আকৃষ্টই হননি, তাকে পাওয়ার জন্য উন্মুখও হয়েছেন। চন্দ্রাবলী রূপসী, মেধাবিনী ও বিদুষী। বিবাহকালে ওই চন্দ্রাবলী ছিল কিশোরী, আজ সে তরুণী। বাধা একটাই, জ্ঞাতি সম্পর্কে সে ময়ূরের ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী। সর্বাঙ্গে যৌবন হিল্লোল। তা আরও দীপ্তিময়ী হয়েছে নারীত্ব ও ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে। আর ওই বানভট্ট সু-কবি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, বহু নারীতে আসক্ত। চন্দ্রাবলীর ন্যায় নারীরত্ন লাভ করেও তার প্রতি মনোযোগী নয়। বান তো তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। তার চরিত্র তো ময়ূরের নখদর্পণে। কিন্তু...নারী! সে যতই মেধাবিনী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না হোক না, সংস্কারের মানসিক লক্ষণরেখা অতিক্রম করতে পারবে কি? সে কি ময়ূরের নিকট ধরা দেবে? তদুপরি, সে একটি সন্তানের জননীও।

ময়ূর শয্যায় উপবেশন করলেন। তৎপরে উপাধানে বাহু ন্যস্ত করে শিরোদেশে করতল স্থাপন করে অর্ধশায়িত হলেন। দীর্ঘ বিনিদ্র রজনিসমূহ যাপনকালে মানসিক উত্তেজনা ভোগের পর এখন তিনি অবসন্ন বোধ করছেন। অনতি পরেই তাঁর স্মরণপথে উদিত হল স্বরচিত শ্লোকগুলি। পাঁচটি শ্লোক লিখেছেন তিনি শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে—যেগুলি তাঁর পৌরুষের পরিচায়ক। বাকি তিনটি রচনা করেছেন স্রগ্ধরা ছন্দে—এ ছন্দ কমনীয়। ময়ূর জানেন, নারী—পুরুষের মধ্যে সন্ধান করে পৌরুষ ও লালিত্যের যুগপৎ বিন্যাস। আর কাব্য তো নিজ শরীরে ধারণ করে স্রষ্টারই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য। জাগরুক নিশাগুলি তিনি ব্যর্থ যেতে দেননি, তাঁর পরিণত মনন ও সংরাগের তীব্রতায় ওই শ্লোকাষ্টকে মূর্তিমতী করে তুলেছেন চন্দ্রাবলী-র শরীরী সৌন্দর্য। কালে ওই শ্লোকগুলিই ময়ূরাষ্টক নামে খ্যাতি অর্জন করবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। এখন কেবল অপেক্ষা—প্রণয়িনীর সম্মতির।

গৃহসংলগ্ন উদ্যানবাটিকা থেকে বাতায়ন পথে ভেসে আসছে রজনিগন্ধার সৌরভ। বাসন্তিক কৌমুদীতে ভাসমান সমগ্র নগর। গৃহে ময়ূর একাকী অপেক্ষমান। তিনি মাতাপিতৃহীন, আজও কোনো নারীর পাণিগ্রহণ করেননি। ওই, ওই কী পদশব্দ পাওয়া যায় দাসীর? না ঃ। পার্শ্বস্থ সরণিতে পথিকের গমনশব্দ। তাঁর দ্রুততর হয়ে ওঠা হৃদস্পন্দন একটু স্তিমিত হয়।

দু-একটি নারী তাঁর জীবনে এসেছে, কিন্তু মনোমতো রমণীরত্নের সাক্ষাৎ তিনি আজও পাননি। কেবল এই চন্দ্রাবলীই। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার তিনি বাক্যালাপ করেছেন। কিন্তু সরাসরি প্রেম নিবেদনের সাহস পাননি। তাছাড়া দাসীহস্তে পত্র প্রেরণ বহুদিনকার সামাজিক প্রথা। কামশাস্ত্র সম্মতও বটে। তবে ললাটলিখন কী কে জানে। তিনি এবং বানভট্ট দুজনেই নৃপতি হর্ষের সভাকবি। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন, ময়ূর স্বয়ং

স্বরস্বতীর বরপুত্র। তথাপি রাজভ্রাতা কৃষ্ণের কৌশলে বিভ্রান্ত হর্ষবর্ধন বাণকেই রাজকবির সম্মান দিয়েছেন। কী না, বান—কৃষ্ণের সুহৃদ! হুঁ। এভাবেই যোগ্যতমের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না কোনোকালে।

দ্বারে করাঘাতের শব্দ। ময়ূর গাত্রোত্থান করলেন। দাসী দণ্ডায়মানা, নত শীর। তবে কি দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে? ময়ূর প্রশ্ন করেন, কী সংবাদ পরিচারিকা?

—চন্দ্রাবলী দেবী অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করছেন বলে জানালেন। তিনি প্রণয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

—শ্লোকগুলি ফেরত এনেছ?

—না, তিনি ফেরত দেননি। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।

ময়ূর ত্বরিৎগতিতে বেশ পরিবর্তন করলেন। কেন চন্দ্রাবলী আহ্বান করেছে, জানতেই হবে। নারী মনের কি বিচিত্র গতিপ্রকৃতি—কখনওই তা সরল নয়।

প্রণয়প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ সাক্ষাৎ করতে চায়। উপরন্তু শ্লোকগুলিও স্বন্নিকটে রেখেছে।

ময়ূর গমনকালে বাণের কথাও ভাবলেন। সে কী এই মুহূর্তে স্বগৃহে আছে? না। তাহলে চন্দ্রাবলী শ্লোকগুলি ফেরত দিত। স্বামীর সম্মুখে অপর পুরুষের লেখাগুলি নিজের কাছে রাখত না। আচ্ছা, চন্দ্রাবলী কেন তাঁকে বিমুখ করল।

বাণ যুবক, তিনি প্রৌঢ় ঠিকই, কিন্তু তিনিও সুপুরুষ। আর, নারী জানে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের অনুরাগ প্রগাঢ় হয়, সে রতিকলায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তবে কী চিরকালীন সেই সংস্কারই অনতিক্রম্য হয়ে উঠল ওই মোহিনীর মনে? হয়তো সে তাঁকে কামনা করে।

ময়ূর উপস্থিত হলেন বাণভট্টের আবাসে। অলিন্দে অপেক্ষমাণা চন্দ্রাবলীকে দেখে তিনি সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন। চন্দ্রাবলীর আনন মেঘবৎ গম্ভীর, কমল আঁখি দুটিতে চকিত ত্রাস ও বিস্ময়। পট্টবাসের অন্তরালে পুস্পস্তবকের মতো ঈষৎ নম্র স্তন, সুবিপুল উরু। নিটোল মসৃণ মণিবন্ধের স্বর্ণবলয়ে চন্দ্রমাস্পর্শজনিত বিকিরণ।

প্রথম কথা বললেন চন্দ্রাবলীই—আপনি কেন ওই আদিরসাত্মক শ্লোকগুলি আমাকে পাঠিয়েছেন? আপনি জানেন, আমি কুলবধূ, সর্বোপরি পুত্রবধূস্থানীয়া। কী করে আপনার এই প্রবৃত্তি জাগল, আর্য?

ময়ূর অল্প দ্বিধার পর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে কথা বললেও স্বকণ্ঠ অস্বাভাবিক ঠেকল তার নিজের কাছেই—আদিরসাত্মক অর্থাৎ তুমি অশ্লীল বলতে চাইছ। কিন্তু হে বিদুষী, তুমি তো জান, আলংকারিক বামনের উক্তি—যা ব্রীড়া, অমঙ্গল. জুগুপ্সা ও আতঙ্ক আনে—তাই অশ্লীল। এই শ্লোকগুলিতে তোমার অনাবিল সৌন্দর্য এবং আমার মনের আকুতি প্রকাশিত। এগুলিকে মন্দ বলছ কেন?

—আপনার সঙ্গে অলংকার শাস্ত্র আলোচনার সময় বা যোগ্যতা—এ দুই-ই আমার নেই। আমি সামান্যা নারী, বানভট্টের বধূ—এই আমার পরিচয়।

—আমি তোমাব প্রণয়প্রার্থী। দাসীর মাধ্যমে প্রণয়প্রস্তাব প্রেরণ বহুদিনের লোকাচার এবং তা কামশাস্ত্রসম্মত।

—হুঁ, কামশাস্ত্রসম্মত। শুনুন। বাভ্রব্য, নন্দিকেশ্বর, বাৎস্যায়ন—কামশাস্ত্র প্রণেতারা সকলেই ছিলেন পুরুষ। তাঁরা পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে মাংসময় এক আধার ব্যতীত অন্যকিছু ভাবতে পারেননি। নারী তো পুরুষের ক্রীড়নক মাত্র নয়। তারও নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে। তারও মন আছে। অল্পপরিচিতা এক যুবতি, যে আপনার পুত্রবধূস্থানীয়া—তাকে পত্রে প্রেম নিবেদন রুচিবিগর্হিত কাজ। বিশেষত, আপনি সুপণ্ডিত। এটা আশ্চর্য যে আপনি বোঝেন না, অগ্রে নারীর মন করায়ত্ত হলে তবেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়।

এই কথাগুলি বলার সময় চন্দ্রাবলী রোষে স্ফুরিতাধরা, তাঁর বিম্বৌষ্ঠ কম্পমান, শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে স্ফীত বক্ষে স্তনদ্বয়ের উচ্চাবচতা দৃষ্টি হরণ করে ময়ূরের। মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত ময়ূর বলে ওঠেন—চন্দ্রাবলী, দেখ আমার সুদৃঢ় শরীর তোমাকে বক্ষে ধারণ করার জন্য চঞ্চল, আমি তোমাকে চাই। তুমি আমার আহ্বানে সাড়া দাও।

—আমার ঘৃণা হচ্ছে আপনার প্রতি। অনুকম্পাও। আপনি নারীমাংসলোভী এক হীন পুরুষ, আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি, যে বক্ষে আপনি আমাকে ধারণ করতে চেয়েছেন, আপনার সে বক্ষ কুষ্ঠে আক্রান্ত হবে। আপনার দেহগর্ব ধূলিসাৎ হোক।

—হাঃ, অভিশাপে যদি সব হত, ময়ূর এই বাক্য উচ্চারণের অব্যবহিত পরই বাণভট্ট গৃহে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গে টলমল পদে শিশুপুত্র ভূষণভট্ট। সে কলোচ্ছ্বাসে ধাবিত হল মাতার প্রতি, মাতার বস্ত্রাঞ্চলদেশ ক্ষুদ্র দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে মুখাবৃত করল। অনতিপরে অল্প দোলায়মান অবস্থায় সে বস্ত্রাঞ্চল মুখ থেকে অপসারিত করে চঞ্চল এবং উৎসুক ভাবে ময়ূরের পানে দৃকপাত করল।

—কী ব্যাপার খুল্লতাত? কতক্ষণ আপনার পদার্পণ ঘটেছে? আসুন, আসন গ্রহণ করুন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়েছ তো?

শেষ বাক্যটি বাণ নিক্ষেপ করলেন চন্দ্রাবলীর প্রতি। ততক্ষণে বাণপত্নী অনেকাংশে আত্মসংবরণ করেছেন। বাটীর গুরুতর পরিবেশ সদ্য আগত বাণভট্ট বিশেষ অনুধাবন করতে পারলেন না। ময়ূর বললেন, না, আমি কিছু পুষ্পচয়নের জন্য এসেছিলাম। এই চৈত্রপূর্ণিমার রাত্রে... আমার গৃহের সমুদয় কুসুম তস্করে অপহরণ করেছে। আচ্ছা, আমি বিদায় নিলাম।

ময়ূর নতমস্তকে দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দুই

এক বৎসর অতিক্রান্ত। আবারও বসন্তকাল। ময়ূরের স্মৃতিতে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়েছে চন্দ্রাবলীর শরীরী সৌন্দর্যের আবেদন। ময়ূর সদা কর্মব্যস্ত। রাজসভায় কাব্যালোচনায় অংশগ্রহণ, গৃহে অধ্যাপনা—ইত্যাদি কার্যে তিনি ব্যাপৃত। শুধু মধ্যে মধ্যে বর্ষণমুখর গহন-রাতে, বজ্রমেঘগর্ভ সন্ধ্যায় তাঁর স্মৃতিপটে চকিতে উদিত হয় চন্দ্রাবলীর অভিমানাহত সেই মুখচন্দ্রিকা। বিস্মৃত হতে পারেননি তিনি—অবচেতনে সুপ্ত চন্দ্রাবলী তাঁর মন মাঝে মাঝেই দংশন করে যায়। ভ্রান্তি। কী সুবিপুল ভ্রান্তিতে তিনি নিমজ্জিত ছিলেন। ভেবেছিলেন, নারী সহজলভ্যা। তা নয়। চন্দ্রাবলী তো পণ্যাঙ্গনা নয়, সে গৃহবধূ,

তদুপরি ব্যক্তিত্বময়ী। হঠকারিতা তাঁরই হয়েছে। এক গোপন অপরাধবোধে তিনি এখন আক্রান্ত।

স্নানের জন্য তৈলমর্দনকালে ময়ূর লক্ষ করলেন তাঁর বক্ষস্থলে কয়েকটি শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি চিহ্ন। ময়ূর চিন্তিত হলেন। কীসের দাগ এ? তিনি স্নান ও ভোজনান্তে ভিষগাচার্যকে দাসীর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। ময়ূর মানী ব্যক্তি। তৎক্ষনাৎ বৈদ্যরাজের আগমন ঘটল। সকলের গৃহে তিনি অবশ্য স্বয়ং উপস্থিত হন না। শিষ্যদের প্রেরণ করেন, নতুবা রোগীকেই যেতে হয় তাঁর নিকট।

বৈদ্যরাজ অনুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করলেন ময়ূরের বক্ষত্বক। শ..ের মৃদু ঘর্ষণে ধুলিরেণুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ নির্গত হল দেহত্বক থেকে। কবিরাজ গম্ভীর হলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রশ্ন করেন, কয়দিবস যাবৎ এগুলি লক্ষ করছেন?

—আজই ভালোভাবে দেখলাম।

—ভীত হবেন না। আপনার কুষ্ঠ হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় এই প্রকার কুষ্ঠের নাম সিধা কুষ্ঠ। একাদশ প্রকার মহাকুষ্ঠের এটি অন্যতম। আরোগ্য যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। আপনাকে সংযমপূর্বক নিয়মাদি পালন করতে হবে।

—কুষ্ঠ! কুষ্ঠ! অভিশাপ। এতদিনে ফলবান হল। ঘর্মাক্ত, অবশ ময়ূরের স্বগতোক্তি বৈদ্যরাজের গর্ণগোচর হয়। তিনি মৃদু উৎকর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করেন, অভিশাপ?

ময়ূর আনুপূর্বিক তাঁকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। পরিশেষে নিজেকেই দোষারোপ করেন। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে ভিষগাচার্য প্রথমে চিন্তান্বিত হলেও কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন, অভিশাপে কুষ্ঠ হয় না। চরকসংহিতায় আছে—অতিরিক্ত গুরুপাক ভোজন, পরিশ্রান্ত হয়ে তৎক্ষনাৎ শীতল জলপান, দিবানিদ্রা, অজীর্ণকালেও আহার, অতিশয় লবন ও অম্লদ্রব্য সেবন, প্রচুর মাষকলাই ভক্ষণ ইত্যাদিতে কুষ্ঠ হতে পারে। তবে সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বায়ু পিত্ত ও কফ দূষিত হলে কুষ্ঠ হয়। তবে সিধা কুষ্ঠ সংক্রামক নয়।

—কীভাবে আমি নিরাময় ২.ত পারি?

—দারু হরিদ্রা, হরিতকি, এলাচি-র প্রলেপ অঙ্গে লেপন করে রৌদ্রে উপবেশন করবেন। দিনে একবার। তাছাড়া তমাল পত্র, মরিচ, হিরাকশ, মনঃশিলা ও শ্বেতসর্ষপ তৈলের মিশ্রণ সপ্তদিবস কাল রেখে তাও প্রত্যহ একবার দেহে লেপন বিধেয়। ত্রিফলার জলপান আবশ্যক।

যতদিন না সম্পূর্ণ আরোগ্য হন, ততাদন মাংস, মরিচ, গুড়, তৈল ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

—কতদিন সময় লাগবে?

—তা কয়েক বৎসর।

—আরোগ্য সম্ভবপর তো?

—অবশ্যই। আপনি বিদগ্ধ। আপনাকে কী বলব, আপনি জ্ঞাত আছেন যে কৃষ্ণপুত্র শাম্বও কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন অবশ্য এ দেশে এ রোগের চিকিৎসা হত না। চৈনিক চিকিৎসকদের পরামর্শে উনি আরোগ্য লাভ করেন। তবে রৌদ্রই এ ব্যাধির সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। শাম্ব দীর্ঘদিনের সূর্যালোক স্পর্শে আরোগ্য লাভ করে কোনারকে

সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আর একটি কথা, আপনাকে তো আর...

বাক্য সম্পূর্ণ করলেন না ভিষগাচার্য। ময়ূর বিষন্ন কণ্ঠে বললেন, জানি। নগরমধ্যে কুষ্ঠরোগীর স্থান নেই। নগরপ্রান্তে থাকতে হবে। তবে আমি চিন্তা করছি ভারত ভ্রমণের। যে অন্যায় আমি করছি, অগণিত মানুষের সান্নিধ্যে তা থেকে উদ্ধার পেয়ে শুদ্ধ হতে চাই। আর করব সূর্যসাধনা। ভালোই হল, ঈশ্বরের হয়তো ইচ্ছা, আমি নির্জন বাস করি। এই সময়টা সাহিত্য সাধনা ও দর্শন পাঠে ব্যয় করব।

—উত্তম সংকল্প। আমি তাহলে এখন বিদায় নিলাম।

ময়ূর নমস্কারান্তে ভিষগাচার্যকে দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় কথোপকথনে অতিক্রান্ত। তিনি বেশ পরিবর্তন করলেন। পরিব্রাজক বেশ ধারণের পর সঙ্গে নিলেন একটি দণ্ড, কিছু স্বর্ণমুদ্রা, একটি ঝুলিতে আহার্য পাত্র, কমণ্ডলু, সামান্য চিপিটক ও ফল, কলম এবং ভূর্জপত্র।

ময়ূর হাঁটছেন। অস্তরাগময় সূর্য এখন গমিতমহিম। রক্তসন্ধ্যা আসন্ন নিশীথের ইঙ্গিতবাহী। এতদিনের বিলাসী ময়ূর তমসাচ্ছন্ন পথ-প্রান্তর অতিক্রম করছেন। এই বিপুলা ধরণিতে তিনি আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। তিনি এখন পরিচয়হীন পথিকমাত্র, যার পদক্ষেপ কোনো এক শাশ্বত লক্ষ্যসন্ধানে। সূর্যের অন্তিম রক্তরাগটুকুও লীন হয়ে গেল দিগন্তে। ক্বচিৎ কুলায়গামী বিহগকুলের পক্ষতাড়নের দূরাগত শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোধূলি—কুহকের আলো-আঁধারিতে জগৎ বড়ো অস্বচ্ছ। ধীরে ধীরে দু-একটি পীতাভ নক্ষত্র প্রতিভাত হয় গগনে। কৃষ্ণপক্ষ, তাই ক্ষীণচন্দ্রের কাতর রেখায় উপলব্যথিত পথ প্রায় দুর্লক্ষ্য। রজনি গভীর থেকে গভীরতর হয়। সারমেয়কুল কখনও ময়ূরকে দেখে উগ্রতা প্রদর্শন করে কখনও গহন আঁধারে পথ মধ্যস্থ ইষ্টকখণ্ড তাঁর পায়ে বাজে। কৃষ্ণপক্ষের দুর্বল চন্দ্রকলাও ক্রমশ অদৃশ্য হল। বিশ্রান্ত ধরিত্রীর বুকে কেবল ময়ূর বিরামহীন, চলিষ্ণু।

তিন

সর্পজিহ্বার ন্যায় বেণি স্কন্ধের পুরোভাগে আনয়ন করে তা দুই হস্তে নিয়ে ক্রীড়ারত চন্দ্রাবলীকে দেখলে বোধগম্য হয় না তাঁর মন কতটা ব্যাকুল। ময়ূরকে অভিশাপ দেওয়ার পর বৎসরাধিক অতিক্রান্ত। এই এক বৎসর চন্দ্রাবলী অনেক ভেবেছেন ময়ূরের কথা। তাঁর নয়নে ভাসছে ময়ূরের উজ্জ্বল দুই চক্ষু, ঘাড়-নাসা, দীর্ঘ দেহ। হ্যাঁ, স্বামী বাণভট্টও সুপুরুষ। এবং তিনি যুবক, পক্ষান্তরে ময়ূর প্রৌঢ়। কিন্তু ময়ূর আজও অবিবাহিত। তবে কী তাঁর জন্যই। শিহরিত হয় চন্দ্রাবলীর আনখকেশ দেহ। অন্তরে এক পুলকমিশ্রিত বেদনা অনুভব করেন তিনি। বাণ তো বহু নারীতে আসক্ত ছিলেন একদা। নর্তকী হরিনিকা, অঙ্গ সংবাহিকা কেরলিকার সঙ্গে বাণের বিবাহপূর্ব জীবনে প্রগাঢ় জৈবিক সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন—এটাও সত্য। ওই তো সব মিত্রের দল—তাম্বূলদায়ক চণ্ডক, ঐন্দ্রজালিক চকোরাক্ষ। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী-পুরুষের সঙ্গেই যেন বাণের অধিক সৌহার্দ। অথচ কত অভিজাত বংশের সন্তান তাঁর স্বামী। কিংবদন্তী আছে, দেবী সরস্বতীর দেবর-পত্নী অক্ষমালার-র বংশধর বাণভট্ট।

হিরণ্যবাহ নদীর তীরে তাঁর জন্ম। আহা, কী সুন্দর নাম ওই নদীটির—হিরণ্যবাহ। তাঁরও ইচ্ছা করে কলস্বরা তটিনীর মতো প্রিয়সঙ্গমে যেতে। তাঁর স্বামী যদি সমুদ্রের মতোই বিশাল আভিজাত্যের অধিকারী হতেন। হ্যাঁ, বাণ সাগরের মতোই উদাসীন, এটা ঠিক। নচেৎ গৃহে তাঁর প্রতি অবিচার হচ্ছে দেখেও প্রতিবাদ করেন না কেন? তাঁর নিজস্ব কোনো অস্তিত্বই যেন এই ভবনে, বংশে নেই। বিবাহের অল্পকাল পরে রাজা হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণের আহ্বানে রাজসভা গমনকালে তাঁর স্বামীকে সজ্জিত করেছিলেন বাণেরই ভর্তৃহারা পিতৃষ্বসা মালতী। পত্নী হিসাবে এ দায়িত্ব তো তাঁরই অধিকারে। অথচ... কে না জানে, মাঙ্গলিক কার্যে বিধবারা অনভিপ্রেত। লোকাচার, স্ত্রী-আচার বলেও তো একটা কথা আছে। গৃহের সর্বময় কর্ত্রী ওই পলিতকেশ বৃদ্ধা মালতী। চন্দ্রাবলীর কোনো স্বাধীনতা নেই।

কিন্তু কেবল মানসিক আকর্ষণই তো বিচার্য হতে পারেন না। তিনি বাণের ঔরসজাত সন্তানের জননী। তদুপরি, সামাজিক ঔচিত্যবোধের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। একজনের পত্নী হয়েও তিনি অন্য পুরুষে আসক্ত হলে সমাজের দৃষ্টিতে 'পরপূর্বা' রূপে নিন্দনীয়া হবেন। নারীর স্বাধীন কায় মনের কোনো মূল্য নেই। শুধু নারী কেন, পুরুষের কী আছে? বিলাসকলার অধিকার শুধু রাজা এবং অভিজাতবর্গের।

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে চন্দ্রাবলী গবাক্ষের সম্মুখে এলেন। চৈতিবাতের সুবাতাসও যেন অসহ্য। অঙ্গাবরণ শিথিল করলেন। অন্ধকার দীর্ণ করে এক শুভ্র পেচক বাতাসে ধাবমান। চন্দ্রাবলী ক্রমশ অবসাদ এবং অবসাদজনিত উদ্বেগ বোধ করলেন। একবার। শুধু একবার যদি তিনি ময়ূরের নিকট যান, খুব কী অন্যায় হবে? সেই আসক্তির উষ্ণ স্পর্শে রঞ্জিত শ্লোকগুলি এখনও তাঁর কাছেই গচ্ছিত আছে। ওঃ, ময়ূর কী তীব্রভাবে তাঁকে কামনা করেন। সকলের অজ্ঞাতেই তো তিনি যাবেন। উত্তেজনাবশত তিনি অভিশম্পাত করেছিলেন, ঈশ্বর ময়ূরকে রক্ষা করুন। প্রত্যাখ্যানই তো যথেষ্ট ছিল। ক্রোধ, অপমানে আত্মহারা হয়ে তিনি ময়ূরকে অভিশম্পাত পর্যন্ত করে বসলেন। বস্তুত, তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, একবার ময়ূরকে মুখোমুখি দেখার, তাঁকে দেখলে ময়ূর কী দৃষ্টিতে তাকান, কী বলেন, তা দেখার।

অথচ কী ঘটল।

চন্দ্রাবলী বহু যত্নে বিবিধ বসন-ভূষণে নিজেকে সজ্জিত করলেন। বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করে পথে পা রাখলেন। সামান্য পথও মনে হল বড়ো দীর্ঘ। বোধহয় অনভ্যাসের ফলে এই ক্লান্তি ও ধৈর্যহীনতা।

দ্বারে করাঘাতের শব্দ পেয়ে পার্শ্বস্থ গৃহের এক নারী এলেন জিজ্ঞাসু নেত্রে। চন্দ্রাবলী প্রশ্ন করলেন, মাননীয় ময়ূর ভট্ট মহাশয় কোথাও গমন করেছেন? কখন প্রত্যাবর্তন করবেন?

প্রশ্ন করাকালীন তাঁর শরীরের ব্যগ্রতা, কণ্ঠের বিকৃতি নারী অতটা লক্ষ করল না বা করলেও স্বাভাবিক সৌজন্যবশত কৌতূহল প্রকাশের নিবৃত্ত রইল। সে জানাল ময়ূর এক পক্ষকাল পূর্বে গৃহ ত্যাগ করে অজ্ঞাতবাসে গেছেন।

—কেন?

—তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে।

চার

দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত। মাত্র সপ্তাহকাল ময়ূর গৃহে প্রত্যাবৃত। এখন মধ্যরাত-অতিক্রমী নিশা চলেছে উষালগ্নের অভিমুখে। ময়ূর অজিনাসনে উপবিষ্ট হয়ে অসমাপ্ত সূর্যশতকের অন্তিম শ্লোকগুলি লেখার চেষ্টারত। সম্মুখে প্রজ্জ্বলন্ত তৈলদীপ। ইতিমধ্যে এই দ্বাদশ বৎসরে ময়ূর রোগমুক্ত হয়েছেন অবশ্যই, কিন্তু মারণব্যাধির সাক্ষর তাঁর দেহে এখনও দৃশ্যমান। রচনাকালে ময়ূরের স্মরণপথে আসছে দীর্ঘ প্রবাসের অভিজ্ঞতা, রোগ যন্ত্রণা। প্রতিটি রাত্রিই তাঁর নিকট অন্ধকারের বার্তা আনত। তিনি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন সূর্যোদয়ের। সূর্য, রৌদ্র। আঃ, তা যেন বহন করত আনন্দের, জীবনের মুক্তির আস্বাদ। বিলাস ত্যাগ করে গত দ্বাদশ বৎসর ময়ূর কৃচ্ছ্রসাধনই কেবল করেননি, এসেছেন পৃথিবীর আরও নৈকট্যে। নারীবিলাস নয়, তার মন এখন অধিকৃত মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা ও আর্তিতে। সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর মনোনিবেশ অধুনা অধিক গাঢ়তর। তিনি যে ভোগসুখ অপেক্ষা জড়জগতের কষ্টের উপলব্ধি ও তার নির্বাসনের প্রতি আগ্রহীতর, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বুঝি পরিধানের চীরবাস, নিরলংকার গৃহ, ওই মৃত্তিকানির্মিত দীপাধার, যাতে এমনকী যে চন্দ্রাবলী ছিল একদিন তাঁর স্বপ্ন, আজ তাকেও কেমন ছায়াময়ী, দূরবর্তিনী মনে হয়।

অকস্মাৎ আবছায়াময় গৃহাভ্যন্তর আরও ছায়াঘন হল কারও উপস্থিতিতে। ময়ূর গ্রীবা উত্থিত করে সম্মুখে দেখলেন—চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলীরও তাঁর প্রতি পলকহীন দৃষ্টি। সেই প্রচণ্ড নিঃশব্দের মধ্যে ময়ূর যেন কিছুটা অন্যমনস্ক—হয়তো তিনি চন্দ্রাবলীর উপস্থিতিই বিশ্বাস করতে অপরাগ হচ্ছিলেন। চন্দ্রাবলী দেখছিলেন ময়ূরের সেই প্রশস্ত দেহ—আজ অনেক শীর্ণ। কুষ্ঠক্ষত লাঞ্ছিত দেহ ছায়াময় গৃহমধ্যে বীভৎসরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। চন্দ্রাবলীর হৃদয় মমতায়, অনুতাপে দ্রব হল। তাঁর মনে হল, তাঁরই জন্য ময়ূরের এত দুর্বিপাক।

ক্রমশ চন্দ্রাবলীর শরীরে, মনে অস্থিরতা উন্মেষ। হলেন বা আজ বিকৃত, তবু ওই ময়ূরই তো তাঁকে একবার তীব্রভাবে কামনা করেছিলেন। তাঁর অভিলাষ জাগে, আজও ময়ূরের হৃদয়ে সেই উত্তাপ আছে কিনা পরীক্ষা করতে।

তিনি মৃদু কিন্তু গম্ভীরভাবে ডাকলেন—ময়ূর। জীবনে এই প্রথমবার তিনি ময়ূরকে নামে সম্বোধন করলেন। ময়ূর যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিত হয়ে বলে উঠলেন—কী? তুমি?

ময়ূরকে প্রথমে বেশ বিভ্রান্ত এবং আড়ষ্ট দেখালেও এখন তিনি অনেক স্বাভাবিক। ময়ূর দেখছিলেন চন্দ্রাবলীর রূপ—প্রৌঢ়ত্বেও লালিত্য হারায়নি, নয়ন তেমনি মদিরেক্ষণা, তাঁর পরিধানে শুভ্র বসন, ললাটে শ্বেত চন্দনের একটি বিন্দু। কবরীতে একটি রজনিগন্ধার মালা—যার সৌরভ সেই ক্ষুদ্র গৃহকে সুবাসিত করে তুলেছিল। চন্দ্রাবলী বললেন, আমি এসেছি ময়ূর।

—কেন?

এই অণু প্রশ্নটি করার কালে ময়ূরের পুনরায় যে মানসিক চাঞ্চল্য জাগল, তা নারীত্বের সহজাত অনুভূতিতে চন্দ্রাবলী টের পেলেন। তিনি স্থিরভাবে ময়ূরের প্রতি দৃক্‌পাত করে নিবেদনের ভঙ্গিতে উচ্চাবণ করলেন, আমি তোমার আহ্বান স্বীকার করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে নাও। দেখ, আমার দুই উরু কামনায় কম্পিত।

কামনাবিধুর চন্দ্রাবলীর বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হয়ে পড়ল। বিস্রস্ত বসনের আবরণ অপসৃত হলে তাঁর অস্তায়মান যৌবনশিখার দীপ্তিতে রাতের অন্ধকার ঝলসে উঠল। জ্যোৎস্নার মৃদু রশ্মি তাঁর কটিতট, স্তনাগ্রচূড়া যেন আরও বাসনাপ্রখর করে তোলে। দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসে কম্পিত চন্দ্রাবলীর দেহ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন ময়ূর। ধীর স্বরে জানালেন—

তোমাকে দেওয়ার মতো আজ আমার কিছু নেই চন্দ্রাবলী। আমি বৃদ্ধ, প্রণয়কলার মানসিকতাও আমার নিঃস্ব। আমি অবগাহন করছি এখন দর্শন ও সাহিত্যে—মানুষকে যদি শাশ্বতের সন্ধান দেওয়া যায়। পারব কিনা জানি না।

—মনের তারুণ্য হারালে, শরীর শীতল হলে মানুষকে তুমি কী দেবে, ময়ূর? সত্যিই তাহলে কিছু দেওয়ার তোমার থাকবে কী? আমার দেহ, মন দিয়ে তোমাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তুলব, এসো...

ময়ূর অনড়। তিনি নতমস্তকে উপবিষ্ট। এইবার চন্দ্রাবলী তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ময়ূরের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে ময়ূরেব হস্তধারণ করে তাঁকে উত্থিত হতে আহ্বান জানালেন। দন্ডায়মান ময়ূরের সম্মুখে জানুতে ভর রেখে উপবিষ্টা হয়ে তাঁর পদাঙ্গুলি চুম্বন করলেন।

ময়ূরের দেহে মুহূর্তের জন্য রক্তধারা দ্রুততালে বহমান হল। তথাপি আত্মসংবৃত ময়ূর তাকে সযত্নে তুলে ধরে শান্ত কণ্ঠে বললেন—আত্মস্থ হও। তুমি ফিরে যাও চন্দ্রাবলী। আমার মন থেকে অন্ধকার দূর হয়েছে। প্রভাতে তোমাকে আমার গৃহ থেকে নির্গত হতে দেখলে মানুষ উভয়কে দোষারোপ করবে। এই দ্বাদশ বৎসর ভারত ভ্রমণ করে আমি সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ লক্ষ করেছি। তাদেব ন্যায়, নীতি, সততায় আমি মুগ্ধ। তুমিও পুরাতন প্রণয়কলহ বিস্মৃত হও।

উঃ কী নিষ্ঠুর ময়ূর। তিনি চন্দ্রাবলী—নাবীত্বের লজ্জা-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে আজ অভিসারিকা, সমর্পিতপ্রাণা। অথচ ময়ূর অচল, অটল। সত্যিই কী ময়ূর আজ নির্যৌবন? অথবা তার শরীর, মনের নিকট চন্দ্রাবলীই এখন বিড়ম্বনামাত্র। অধরা-মাধুরী উপভোগের আকাঙ্খা-রহিত কেমন এই পুরুষ ময়ূর? পৃথিবী টলে উঠল চন্দ্রাবলীর চোখের সামনে!

ময়ূর বাক্‌রহিত। তাঁর বোগজীর্ণ, বৃদ্ধ শরীর এই শাবীরিক, মানসিক উত্তেজনায় উদ্বেলিত। কোনোক্রমে তিনি অঙ্গনে এলেন। তখন জবাকুসুমেব মতো লোহিত বর্ণ কাশ্যপ পূর্ব গগনে ক্রমপ্রকাশমান। পক্ষীকুজনে প্রকৃতি মুখরিত। পবিত্র, মধুর প্রভাত বাতাস তাঁকে ক্রমশ সমাহিত করে তোলে। চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় যুক্ত করে ময়ূর তাঁর সূর্যশতকের সদ্যরচিত একানব্বইতম শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন—

নীলচক্ষু বিজৃম্ভ শ্রুতি জড়রসনং বিঘ্নিত ঘ্রাণবৃত্তি।
স্বব্যাপারক্ষম ত্বাং পরিমুষিত মনঃ শতাশমাত্রাবশোষম্।
বিশ্রস্তাঙ্গং গতিত্বা স্বপদ হরতাদ্ শ্রিয়ং বোর্ঝাজমা।

কাল ব্যালাবলীঢ়ং জগদগ্দ হবোত্থাপয়ন্ প্রাক প্রতাপঃ।

(কালরূপ হিংস্র জন্তুর প্রভাবে সমস্ত প্রাণী ও পৃথিবী হাই তুলছে, চক্ষু মেলছে, তাদের রসনার জড়তা কাটেনি, তাদেরগন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা কম, ক্রিয়া ব্যাপারে অক্ষম হওয়ার জন্য মন যেন তাদের চুরি হয়েছে, তাদের নিঃশ্বাসমাত্র বইছে, অঙ্গ শিথিল, দেহের সৌন্দর্য নাই; হে সূর্য তোমার প্রতাপ ঔষধের মতো উত্থিত হচ্ছে।)

এদিকে গৃহাভ্যন্তরে বিবশা চন্দ্রাবলী তখন লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দনরতা। তাঁর দেহে লাগছে ধূলিরেণু, তথাপি তিনি ভ্রূক্ষেপহীনা। যে নারী ছিল একদিনের ময়ূরের প্রার্থিতা, আজ তাকেই তিনি বিমুখ করলেন। চন্দ্রাবলী উঠে দাঁড়ালেন। নবোদিত সূর্যের হিরন্ময় আভা তাঁকে রাতের বিবশতা কাটিয়ে বাস্তব সচেতন করল। তিনি কপোলের অশ্রু মুছে বহির্গত হলেন ময়ূরের গৃহ থেকে, ধাবিত হলেন আপন আবাসের অভিমুখে। স্বর্ণাভ রৌদ্র তখন অন্ধকারের শীতলতা ছিন্ন করে পৃথিবীতে তাপের সঞ্চার করছে। চন্দ্রাবলীর মনে পড়ে গিয়েছে প্রিয়তম ভূষণভট্টের কথা। তিনি পত্নী, প্রেমিকা কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি সন্তানের জননী।

শূন্য অঙ্গন থেকে ক্ষীণ শ্বাস পরিত্যাগ করে ময়ূর কুটিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সম্মুখে এখনও বহু কাজ। সেই অসমাপ্ত কাজ তাঁকে সমাপ্ত করতে হবে। সূর্যশতক পূর্ণ করার মানসে তিনি উন্মুক্ত পুঁথির উপর খাগের কলম স্পর্শ করলেন।

জীবনময়ী

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বৃষ্টির পরে লাল শীর্ণকায় ইটগুলোর শরীর থেকে যে গন্ধ উঠে আসছে তার ভিতরেও যেন মৃত্যু মাখানো আছে। এমনই মনে হচ্ছে শাশ্বতর। শুধু বৃষ্টিভেজা এই ইটের দেয়াল থেকেই নয়, এখন যে একটা ঢিমে বাতাস বইছে, তার ছোটখাটো ঢেউতেও যেন মৃত্যুর ছোঁয়া। সেই হাওয়ায় কাঁপছে ইটের তৈরি দীর্ঘ থামের গায়ে বেড় দিয়ে ওঠা সাবলীলতার শাখা। গাছটা মনে হয় অনেকদিনের, জায়গাটাকে ঝুপসি করে রেখেছে। আর সেই ঝুপসি হয়ে থাকা পাতাদের মধ্যে দিয়ে প্লাস্টার ঝরে পড়া দীর্ঘ ইটের থামটা দেখা যাচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে। এমন ইটের থাম এখন আর দেখা যায় না। এমন উঁচু সিলিংও নয়। আর এই বাড়িকে ঘিরে যে বাগান তার যেন কোনও তুলনাই হয় না। বাইরের বড় গেটটা পিছনে রেখে এই বাগানের মধ্যে দিয়ে বিশাল প্রাচীন বাড়িটার দিকে এগোনোর সময় মনে হয় অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ ঘটছে ধীরে ধীরে। যতবার এই বাড়িতে এসেছে এমনই মনে হয়েছে শাশ্বতর।

আসলে এই দীর্ঘ থাম, ওই প্রাচীন ইট বা বাড়িটাকে ঘিরে নিম-আম-বাতাবি লেবু-কনকচাঁপা—আরও কত নাম-না-জানা গাছের যে জমাট উপস্থিতি তার জন্যে নয়, এই বাড়িতে যাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে আসত সেই মানুষটিই তাকে যেন অরণ্যের অনুভূতি দিত। জলজ্যান্ত একটা মানুষ নিজেই যেন অরণ্য। বাগানের ভিতর দিয়ে আসার সময় মনে হত চারপাশটার জন্যে এরকমই মনে হয়। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় মনে হত, সূর্যকান্ত নিজেই অরণ্য।

শেষ যেবার এখানে এসেছিল শাশ্বত, সেবার সূর্যকান্ত তাকে বলেছিলেন, তুমি এত পরিবর্তনকামী কেন বল তো?

বাগানেই সূর্যকান্তের পাশাপাশি হাঁটছিল শাশ্বত। একটু আগেই লুচি আর রাঙাআলুর তরকারি দিয়ে সকালের খাওয়া সেরে বাগানের রোদে নেমে এসেছে তারা। জিভের ওপরে রান্নার স্বাদটা খেলছিল তখন। করেছেন সূর্যকান্তের স্ত্রী মণিমালা। মণিমালা শাশ্বতর দূর সম্পর্কের মাসি। মাসির রান্না নিয়ে প্রশংসা করছিল আর তার মাঝখানেই সূর্যকান্তের ওই প্রশ্ন। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শাশ্বত। আমতা আমতা করে বলেছিল, পরিবর্তনকামী মানে! ঠিক বুঝলাম না...

এই তো সাত মাস হল কোম্পানিটাতে জয়েন করেছ, আগেরটাতে তো দেড় বছরের বেশি করলে না, তার আগেরটাতে এক বছর, কি ঠিক বলছি তো...

স্থির দৃষ্টি নিয়ে শাশ্বতর চোখে চোখ রেখেছিলেন সূর্যকান্ত। শাশ্বত ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ বিস্মিত। তার চাকরি-জীবন একটা ফ্লপিতে ঢুকিয়ে যেন মাথার ভেতর রেখে দিয়েছেন সূর্যকান্ত। কতটুকু সময় সে কাটিয়েছে মানুষটার সঙ্গে! দেড়-দু বছর পরে-পরে এক-একবার এসেছে। থেকেছে একটি কি দুটি রাত। সঙ্গে করে এনেছে একটা করে প্রশ্ন। সেটার উত্তর পাওয়া হয়ে গেলে ফিরে গেছে। চাকরি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে

এর আগে একবার এসেছিল। তখনই বলেছিলেন অনেক কথা। সবই মনে রেখেছেন হুবহু। শাশ্বত চমকে গিয়েছিল এই ভেবে মানুষটা এতটাই ভেতরে রেখেছেন তাকে!

সূর্যকান্ত হেসে বলেছিলেন, এবারেও তো সেই একই প্রশ্ন, নতুন কোম্পানিতে যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না তাই তো—

শাশ্বত আবার চমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সূর্যকান্ত হেসে বলেছিলেন, চলো, চলো, ভেব না এটা আমার গণনার ফল, তোমার মা চিঠি দিয়েছেন, লিখেছেন ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এত চিন্তিত যে রাতে ঠিকঠাক ঘুমোচ্ছ না...

সমস্ত বিস্ময় সরিয়ে রেখে শাশ্বত বলে উঠেছিল, এবার যে কনসার্নে যেতে চাইছি সেটা মাল্টি-ন্যাশনাল, হয়তো বাইরেও যেতে হতে পারে...

গাছের ঝরে পড়া শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যকান্ত পরিপূর্ণ না হেসে শুধু ঠোটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, তা বেশ তো...

না মানে সুট্ করবে কিনা, ফিরে এলে তো পুরনো সহকর্মীরা ছিঁড়ে খাবে...

শাশ্বতর কপালে কথার শেষে কয়েকটা হালকা ভাঁজ উঠেছিল। হয়তো মুহূর্তের জন্যে, কিন্তু সূর্যকান্তের চোখ এড়ায়নি, বলেছিলেন, এই বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সেই ষোলো, সতেরো হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছ, তাও তোমার কপালে কুঞ্চন! এখন যেখানে আছ সেখানে অসুবিধাটা কোথায়!

এই প্রশ্নের কোনও সহজাত উত্তর দিতে পারেনি সেদিন শাশ্বত। জিভ দিয়ে দাঁতের ভিতর দিকটা বার কয়েক চেটেছিল। চোখের কোণেব চামড়া কুঁচকে নিয়েছিল কয়েকবার। কপালের ওপরে ঠিক হয়ে থাকা চুল ঠিক করে নিয়েছিল একবার। তারপর বলেছিল, অসুবিধা কিছু নেই, মানে এক জায়গায় আটকে থাকা, মানে...

সূর্যকান্ত বুঝেছিলেন এই উত্তর আর এগোবে না। তাই শাশ্বতকে কেটে দিয়ে বলেছিলেন, মানে একটা পরিবর্তন চাই এই তো, ভাল হোক মন্দ হোক একটা পাল্টে যাওয়া চাই...

সূর্যকান্তের স্বরে একটা তিরস্কারের ধ্বনি রয়ে গিয়েছিল। শাশ্বত একটু আগে উত্তর দিতে পারছিল না এর পরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে যেন ভুলে গিয়েছিল। কি করে সে সূর্যকান্তকে বোঝায় যে জগতে সে রয়েছে সেখানে দৌড়ে এগিয়ে যাও, শুধু এগিয়ে যাও, একটা সুদূরত্বে পৌঁছে সেখানেই অবস্থান করবে তার উপায় নেই, যত কিলোমিটার তুমি দৌড়ে থাক না কেন থেমে গেলেই পিছিয়ে যাবে। তাহলে থেমে গিয়ে লাভ! কথাটা বোঝাতে পারেনি শাশ্বত।

সূর্যকান্ত বলেছিলেন, পাল্টালেই ভাল হয় এরকম মনে হয় কেন তোমার...এখন যেখানে আছ তার থেকেও তো খারাপ হতে পারে...

কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে, ভালও তো হতে পারে...

চেষ্টা! ফের হেসেছিলেন সূর্যকান্ত, ওটা মূর্খের আচরণ...

মূর্খের আচরণ! শাশ্বত ভিতরে বেশ রেগে গিয়েছিল।

তা না তো কি, তোমার দাদা সুগতও তো তার দ্বিতীয় বিবাহের আগে আমার কাছে এসেছিল একটা কথা জানতে যে তার এই বিয়েটা সুখের হবে কিনা, আমি

কী বলেছিলাম জানো, বিয়ে ব্যাপারটাই তোমার জন্যে সুখের নয়, ওর প্রথম বিয়ের আগেই তোমার মাকে এ কথা বলেছিলাম, তোমার মা শোনেনি শাশ্বত। এখন তো শুনছি দ্বিতীয় বিয়েও নাকি বেশি দিন টিকবে না—

শাশ্বত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অন্তরে। মা বোধহয় চিঠিতে জানিয়েছে। সূর্যকান্ত যা বলছেন তা সত্যি। বাগানের শুকনো পাতার ওপরে সূর্যকান্তের জুতো সামান্য নড়াচড়া করেছে আর তাতেই কিরকির করা একটা শব্দ উঠেছে। শাশ্বতর বুকের ভিতরেও সেই শব্দ। হাড়ের গায়ে যেন বালির গুঁড়ো ঘষে যাচ্ছে। সূর্যকান্তের প্রতি তখন একটা প্রবল শ্রদ্ধা, প্রবল ভয় যুগপৎ উঠে আসছে বুকের ভেতর থেকে।

তারপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন সূর্যকান্ত। একটা বিশাল ছাতা আকৃতির গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ তুলে বললেন, আসলে এ-সব আমার জ্যোতিষচর্চা, গণনা থেকে পাওয়া ভাবনা নয়, এই বিশাল বাগানের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে মনে হয়েছে সুখ জোর করে, চেষ্টা করে নিয়ে আসা যায় না, সে আসে তার সহজাত স্বাভাবিক পথে...। একটানা কথা বলতে বলতে সূর্যকান্তর সম্ভবত দমে ঘাটতি পড়েছিল, একটু থেমে নিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, এসব কথা আমার ভাবনায় কীভাবে এসেছে জানো, এই বড় বড় গাছ, এই বাগান—চারপাশের এই প্রকৃতিকে দীর্ঘদিন ধরে নিরীক্ষণ করতে করতে আমি দেখেছি গাছের ওই কচিকচি পাতা, তাদের শরীরে কত রকমের সবুজ, এক সময় শাখার আগায় ফুল—তার যে কত রকমের বাহার, কত রকমের রঙ—একসময় সেই ফুলই আবার পাল্টে গেল ফলে, তার আর এক সৌন্দর্য, কি ঘ্রাণ, সামান্য একটা উদ্ভিদের শরীরে তখন কত রূপ, কিন্তু কি অদ্ভুত এই যে এত রূপ হল ওর শরীবে তার জন্যে ওর সামান্য দৌড়ঝাঁপ নেই, রূপের সুখে চান করে ওঠা গাছটিকে কিন্তু এর এক ফোঁটাও নিজেকে জোগাড় করতে হয়নি, প্রজাপতির মতো, বাতাসের মতো ওরা যেন উড়ে এসে জড়ো হয়েছে ওর শরীরে। যদি ছুটোছুটি করে সুখ পাওয়া যেত তবে ওই বৃক্ষ, ওই সবুজ কি কোনওদিনই সুখী হতে পারত?

কোনও উত্তর সেদিন দিতে পারেনি শাশ্বত। বৃক্ষের এমন ব্যাখ্যা যে কোনদিনও শোনেনি। মনে হচ্ছিল বৃক্ষ যেন নিজেই নিজের উপলব্ধি শোনাচ্ছে। এই বিশাল বাগানের অসংখ্য গাছের ভিতরে থাকতে থাকতে সূর্যকান্ত নিজেই এক বৃক্ষ হয়ে গেছেন। সেবার এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরে আর কোম্পানি বদল করেনি শাশ্বত। সূর্যকান্তর বিশ্বাস যে তার গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল তা নয়, মনে হয়েছিল সূর্যকান্তর কথা অমান্য করলে তার বিপদ হতে পারে।

পরে অবশ্য মনে হয়েছিল সিদ্ধান্তটা সে ঠিকই নিয়েছে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পনিটাতে জয়েন করলে কলকাতা কেন হয়তো এই দেশেই থাকা হত না। তাহলে সিঞ্জিনীকে কী করে পাওয়া হত তার। আর না পেলে যে এমনই একটা মেয়ের জন্যে তাকে এক জীবন ঘুরে মরতে হত। এখনও পর্যন্ত সিঞ্জিনী নিখুঁত। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে গাওয়া 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাইলে কেমন হবে, আবার এই গানটাই কিশোবকুমার গাইলে কেমন শোনাত জানে সিঞ্জিনী। তিন

রকমই তাকে গেয়ে শুনিয়েছে। মাধ্যমিকে স্টার। উচ্চ-মাধ্যমিকেও স্টার। ফিলজফিতে অনার্স করার পরে সোসিওলজিতে এম. এ. চলছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে বছর উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করল সিঞ্জিনী, সে বছরেই সঙ্গীত প্রভাকরের সিকসথ্ ইয়ার সম্পূর্ণ করেছিল। ইচ্ছে করলে সঙ্গীতেই বি. এ. করে এম. এ. করতে পারত। বাণিজ্যিক সংস্থায় সিস্টেম অ্যানালিস্ট বাবা চায়নি মেয়ে এস্‌‌ব করুক। সিঞ্জিনী বাবাকে হতাশ করেনি। আবার মাকেও করেনি। বাংলার অধ্যাপিকা মা চেয়েছিল সঙ্গীতেই ফুটে উঠুক মেয়ে। ফিলজফি অনার্সের সঙ্গেই গান চর্চা এমন স্তরে নিয়ে গেছে সিঞ্জিনী, যে মাঝে মধ্যেই অনুষ্ঠানে ডাক পায়। সেটাও ঠিক যেন কথা নয়। আসলে নন্দন চত্বরে, রবীন্দ্রসদনের সিঁড়িতে বসে সিঞ্জিনীর সঙ্গে কথা বলার সময় শাশ্বত লক্ষ করেছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আছে যারা সিঞ্জিনীকে দেখতে পেলেই এগিয়ে আসবে কাছে। প্রথম প্রথম শাশ্বতর মনে হয়েছে ব্যাপারটা আর কিছু নয়, এটা সিঞ্জিনীর রূপ, যে রূপকে একটু একটু করে খুঁটিয়ে দেখলে শাশ্বত হয়তো তেমন কিছু পাবে না, কিন্তু এড়িয়ে যেতেও পারবে না, এড়িয়ে যাওয়া অন্য কথা, এক ব্যাখ্যাহীন সৌন্দর্য সে চোখ বন্ধ করেও উপলব্ধি করে ফেলবে। কিন্তু পরে বুঝেছে ঠিক রূপ নয়, ওর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার নয়, গান নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো সিঞ্জিনীর সঙ্গে কথা বলে কী রকম যেন উদ্দীপ্ত হয়। ওরা যা বলে সিঞ্জিনী যা বলে তার সব কিছু সবসময় শাশ্বত বুঝেছে তা নয়। তবে বুঝেছে একটা কথা—সিঞ্জিনী সামান্য নয়। সেই সিঞ্জিনীর হৃদয় পেয়েছে সে—কথাটা যতবার তার মনে সচেতনভাবে ভেসে উঠেছে ততবারই উষ্ণ হয়েছে শাশ্বত।

কিন্তু এই উষ্ণতাই সিঞ্জিনীকে ঘিরে তার ভাবনার একমাত্র রূপ নয়। মাঝে-মাঝে কোনও কারণ ছাড়াই এই উষ্ণতা ভেজা বালিতে পাল্টে যায়। কীরকম ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসা শীত বিকেলের রোদ হয়ে ওঠে। এর ঠিক কি কারণ কিছুই বুঝতে পারে না শাশ্বত। সিঞ্জিনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কী সিঞ্জিনী কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে তার কোনওটাই নয়। তার সঙ্গে কেন, কখনই কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না সিঞ্জিনী। আর ঝগড়া, সে তার কণ্ঠের খাতিরে কখনই করবে না। তাহলে? ভেজা বালি তার স্নায়ুর ওপরে পীড়া সৃষ্টি করলে সে মনে করার চেষ্টা করে উষ্ণতা নিভে যাওয়ার আগে কী কী ঘটেছিল।

শাশ্বতর মনে পড়েছিল সকালে সিঞ্জিনী সেদিন ফোন করেছিল। বলেছিল আজ একটাই ক্লাস, সোয়া বারোটায় শেষ হচ্ছে, তুমি কি করছ?

মোবাইলটা কানে চেপে কয়েক মুহূর্ত জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছিল শাশ্বত। সে কী করছে। কী করবে আবার! কম্পিউটারের কোনও আই.সি.'র মতো সদাসক্রিয় থেকে ভেবে যাবে সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি আরও বাড়ান যায় কী করে। আর এটাই তো তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তবুও ফোনটা পাওয়ার পরে কীরকম যেন হয়ে উঠেছিল ভিতরটা।

শাশ্বতকে নিরুত্তর থাকতে দেখে সিঞ্জিনী বলেছিল, জাদুঘরে যাবে, কতদিন যাওয়া হয়নি, সেই কবে গিয়েছিলাম—

শাশ্বত বলে উঠেছিল, তার থেকে জাদু দেখতে যাই চল...

মজা করো না, দোতলার গ্যালারিতে যা সব ছবি আছে না...

ফিলোজফি তাহলে এখন পেন্টিঙে ঢুকে পড়েছে!

এই তো, ফিলোজফি পড়েছি বলে সব সময় মোটা মোটা বই নিয়ে বসে থাকতে হবে, না, ফিলোজফি কত কিছুর মধ্যে আছে তুমি জান। ফিলোজফিরও প্র্যাকটিকাল থাকে জান?

ফিলোজফির প্র্যাকটিকাল। প্র্যাকটিকাল তো বিজ্ঞানের সাবজেক্টগুলোয় থাকে!

তুমি কিচ্ছু জান না, দু'টোর মধ্যে জাদুঘরের সামনে চলে এস, আজ আমি তোমার ফিলোজফি প্র্যাকটিকালের ক্লাস নেব...

ফোনটা কেটে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন একই কক্ষপথ ঘুরে চলা একটা ইলেকট্রনের যেন মুক্তি ঘটল। সে যেন অন্য অরবিটে ঘুরতে শুরু করেছে। কাজকর্ম ফেলেরেখে ফিলোজফির প্র্যাকটিকাল ক্লাস করতে বেরিয়ে পড়েছিল শাশ্বত।

এক একটা ছবি দেখছিল ওরা, আর সিঞ্জিনী তার ভিতরে ফুটে ওঠা জীবনের নানান বোধের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল শাশ্বতকে। এ পর্যন্ত সব কিছু বড় সুন্দর ছিল। জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঞ্জিনী বলেছিল, চল একটু নন্দন থেকে ঘুরে আসি...

কেউ আসবে?

না, না, এমনি..

তখনও কোথাও কোনও অসুবিধা ছিল না। পায়ে পায়ে চলে এসেছিল নন্দনে। সেদিন চেনা মুখ সেরকম কেউ ছিল না। একটা পাক দিয়ে বলল, বঙ্গ সংস্কৃতিতে যাবে।

সে তো সেই পার্ক স্ট্রিটের দিকে—

সিঞ্জিনী একটু অবাক হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ!

তাহলে তো জাদুঘর থেকে বেরনোর সময়েই গেলে হত, এখন তো আবার উল্টোদিকে যেতে হবে।

সোজা-উল্টোর কি হল। ঘুরতে বেরিয়ে এত ভাবে কেউ!

শাশ্বত চুপ করে গিয়েছিল। হেসেছিল স্মিত। ভুলটা যেন ধরে ফেলেছে।

বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব ঘুরেও দম ফুরল না সিঞ্জিনীর। সেখান থেকে লেক্সপো। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া। ফুচকা-আইসক্রিম-ভেলপুরি। হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্সে। ঘোড়াদের ঘাস খাওয়া দেখছে সিঞ্জিনী। চোখের পলক পড়ছে না। কোথাও আর তখন প্র্যাকটিকাল ফিলোজফি নেই। ওটা মুছে গিয়েছিল নন্দনে ঢুকেই। নন্দনটা মুছে গিয়েছিল বঙ্গসংস্কৃতিতে। সেটা আবার মুছে গেল লেক্সপোয়। যেন ঢেউয়ের শীর্ষদেশে দুলছে এক অপরূপ স্বর্ণালী পালক। ছুঁতে ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু হাত বাড়ালেই ঢেউয়ের ধাক্কায় সে চলে যাচ্ছে আর এক ঢেউয়ের মাথায়। দুলতে দুলতে সে হারিয়ে যাবে মহাসমুদ্রেই। এই দোলন ছাড়া কোনও অনুভূতিই যেন পৌঁছয় না ওই সোনালি পালকের শরীরে।

সেদিন বাড়ি ফিরে সারাটা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছিল শাশ্বত। বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো হয়ে ওঠা মন তাকে বারবার একটা প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড়

করিয়ে দিচ্ছিল—এই মেয়েটিকে বিয়ে করা কি ঠিক হবে? এই সিদ্ধান্তের পথ ধরে এক মহাভুল এসে তার জীবনযাপনে বাসা বাঁধবে না তো? আর তখনই সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলোর এক ক্ষীণ স্তম্ভ যেন প্রবেশ করেছিল। সেই আলোকস্তম্ভের মুখে সূর্যকান্তের মুখ। সূর্যকান্তই যেন একমাত্র পরিত্রাতা। শাশ্বত ঠিক করেছিল সিঞ্জিনীকে সঙ্গে করে একবার সূর্যকান্তর কাছ থেকে ঘুরে আসতে হবে। সূর্যকান্তই শাশ্বতর পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলে দিতে পারবেন সিঞ্জিনীকে বিয়ে করা ঠিক হবে কি হবে না।

পরিকল্পনামাফিক যোধপুর এক্সপ্রেসের এ.সি.টু টায়ারের দুটো টিকিট কেটে নিয়েছিল শাশ্বত। গয়ায় যখন নেমেছিল তখন ট্রেনটা একেবরে রাইট টাইম। লক্ষ্মণপুব যাওয়ার জন্যে সস্তায় একটা ট্রেকারও পেয়ে গিয়েছিল ওরা। আসলে এই যে সব কিছু এত মসৃণভাবে ঘটছিল তাতে শাশ্বত বুঝতেই পারেনি একটা বিষাদের খবর খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই কেউ যেন নিখুঁত আয়োজন সারছে।

সূর্যকান্তের বিশাল বাগান ঘেরা বাড়ির সুরকিব রাস্তায় পা রেখেই কীসের যেন একটা সংকেত পেয়েছিল। বড় বড় গাছগুলো যেন শোকের নীরবতা পালন করছে। দীর্ঘ বারান্দায় পা রাখতেই সম্পূর্ণ সাদা বেশে মণিমালাকে দেখে শাশ্বতর বুকের ভিতর থেকে একটা বিদ্যুৎরেখা উঠে এসে ছুঁয়ে গিয়েছিল তার চিবুক। মণিমালা শাশ্বতর দিকে এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি আসতে পারলেন না, তার আগেই বারান্দার ধারে রাখা কালো কাঠের বেঞ্চে ধপ্ করে বসে পড়েছিলেন। মণিমালার পেছনে তখন আরও কয়েকটা মুখ ভেসে উঠেছে। তাদের দু'-একজনকে অস্পষ্ট যেন চিনতে পারছিল শাশ্বত। সূর্য মেসোমশাইর মেজ ছেলে চন্দন। পাশে চন্দনদার বউ অনুরাধা। বছর ছয়-সাত আগে এ-বাড়িতে এলে ওদের দেখেছে। তারপর যখন এসেছে আর দেখেনি ওদের। সূর্যকান্তকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল ওদের অনুপস্থিতির কারণ। সূর্যকান্ত উত্তর দিয়েছিলেন শাশ্বতর প্রশ্নের। উত্তবের গায়ে লেগেছিল এক অদ্ভুত হাসি। বলেছিলেন, যে ছেলেটা এখানে জন্মালে, বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়িতেই বড় হল সে দু'লাইন ইংরেজি বলতে শিখে বলল এ বাড়ি নাকি জাঙ্গল! শুধু তাই নয় এ জমি-বাড়ি বিক্রি করে গয়া টাউনে চলে যাওয়ার জন্যে আমার ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছে। কথার শেষে হাসিটা আর ছিল না সূর্যকান্তর ঠোঁটে। 'আমার সেই বয়স থাকলে ওকে মেরে এই বাগানে আমি পুঁতে দিতাম শতু।' সূর্যকান্তের দুটি হাত ধরে নিয়েছিল শাশ্বত, বলেছিল, এত উত্তেজিত হবেন না। হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন সূর্যকান্ত, উত্তেজিত হব না মানে! ও জানে এই বাড়ি, এই বাগানের মানে? ওই বড় বড় গাছগুলো আমায় যা শিক্ষা দিয়েছে, তা কি কারুর কাছ থেকে পেয়েছি। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো, কত কিছু ঘটে চলেছে ওদের শরীরে, কিন্তু দেখো নিজের জায়গা ছেড়ে ওরা কি কোথাও কখনও গেছে! এই যে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা তো আসলে নিজের বিশ্বাসেব ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, এক জীবন একটা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কি সহজ কথা! আব সেটাকে কিনা কিছু পয়সার জন্যে বিক্রি করে দিতে হবে।

ধীরে ধীরে শাশ্বত জেনেছিল শুধু মেজ পুত্রই নয়, সূর্যকান্তের এই ভাবনার জন্যে বড় ছেলে, ছোট ছেলে সকলেই চলে গেছে এ-বাড়ি থেকে। শুধু চলে যাওয়াই নয়, সম্পর্কের সেতুটাও ভেঙে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সূর্যকান্ত যদি আজ বেঁচে থাকতেন, যদি কোনওভাবে মৃত্যুর সীমারেখা পেরিয়ে চলে আসতে পারতেন এই দীর্ঘ বারান্দায় দেখতে পেতেন সেই সেতুর সবকটা খুঁটি যে যার সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর আকুল হয়ে খুঁজছে সেতুর ছাদটাকে। সিঞ্জিনীর সঙ্গে ততক্ষণে সূর্যকান্তের তিন পুত্র মানে শাশ্বতর মাসতুতো দাদা আর তাদের বউদের আলাপ হয়ে গেছে। শাশ্বতকে করিয়ে দিতে হয়নি। বাতাসের মতোই যেন ওদের ভেতরে প্রবেশ করে গেছে সিঞ্জিনী। মৃত্যুর আবহাওয়ায় মানুষকে এতটা সাবলীল হওয়া কি মানায়? ভেজা বালির চরটা তখন ফের একটু একটু করে জেগে উঠেছিল শাশ্বতর ভিতরে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি না, কোথা থেকে ঘুরে এসে সিঞ্জিনী তাকে জানাল, জানো তো বড়দারা গোমোর স মিল তুলে দিয়ে লক্ষ্মণপুরে চলে আসছে।

সিঞ্জিনীর কথার উত্তরে অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল শাশ্বত। এক সময় সূর্যকান্তর এই উনিশ বিঘা বাড়ি ও বাগান থেকে মাত্র তিন বিঘা চেয়েছিল সূর্যকান্তের বড় ছেলে স্বপন মজুমদার। চাকরি খুঁজতে গোমোতে গিয়ে কাঠব্যবসার শুলুকসন্ধান পেয়েছিল। কাঠ জোগান দেওয়ার লোক আছে। কিন্তু চেরাইকলের জন্যে শেড চাই, জমি চাই। তিন বিঘা বিক্রি করলে সে টাকাটা আসে। সেটুকু বিক্রি করে বাবা টাকাটা দেবে না! অতি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল স্বপনের মাথায় তখন সূর্যকান্ত বলেছিলেন, বৃক্ষ দেখে কোনও শিক্ষা তো নিতেই পারলে না, উল্টে তাকে হত্যা করতে চায়। স্বপন বলেছিল লক্ষ্মণপুরে ফেরা তো দূরের কথা বাবার মুখাগ্নি করতেই আসব না। আর সিঞ্জিনী কিনা খবর এনেছে শ্বশুরের পয়সায় তৈরি স মিল বিক্রি করে বাবার ভিটেতে ফিরে আসবে স্বপনদা! আর এত কথা সিঞ্জিনী জানলই বা কি করে! জিজ্ঞেস করায় সিঞ্জিনীই উল্টে অবাক হয়ে বলেছিল, কেন! মেহেন্দি করতে করতে মেজোবউদিই বলল...

মেহেন্দি করতে করতে! বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাচ্ছিল শাশ্বত।

এই তো, বলেই নিজের হাতে দুটো উল্টে দেখিয়েছিল সিঞ্জিনী।

শাশ্বত দেখেছিল সিঞ্জিনীর তালুতে কালচে বাদামি রঙে অপরূপ আলপনা। কখন করলে! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল শাশ্বত।

কেন, ওপরে মেজোবউদির কাছ থেকে করলাম। সিঞ্জিনীর চোখেও অবাক্ হওয়ার ভাব।

আলাপ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি মাসতুতো দাদা আর বউদি সিঞ্জিনীকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অবসরে মাসির সঙ্গে কথা বলছিল শাশ্বত। আর সেই সুযোগে দু'হাতে মেহেন্দি করে ফিরে এলো সিঞ্জিনী!

শাশ্বতর চোখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝল সিঞ্জিনী কে জানে। বলল, আমি কি অত জানি, ওপরে গিয়ে দেখি সেন্টার টেবিলের ওপরে একটা আল্পনার বই, মেজোবউদিই বলল ওটা আল্পনার বই নয়, মেহেন্দির ডিজাইন, ইউ কান্ট বিলিভ

মি, ওরকম সুন্দর মেহেন্দির নকশা আমি দেখিনি...

সিঞ্জিনীকে কেটে দিয়েই শাশ্বত বলে উঠেছিল, দেখোনি বলেই মেহেন্দি করাতে বসে গেলে।

শাশ্বতর স্বরে কিছু একটা ছিল। তাই বোধহয় মণিমালা বলে উঠেছিল, ওরকম ভাবে বলছিস কেন, ও বাচ্চা মেয়ে, ওর হাত মেহেন্দি করার ইচ্ছে তো হতেই পারে...

শাশ্বত মাসির দিকে তাকিয়েছিল। সাদা থান পায়ের ওপর থেকে সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে। শাশ্বত তকিয়েছিল সিঞ্জিনীর হাতের দিকে। মেহেন্দির আল্পনায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিঞ্জিনীর কি একটুও মনে হচ্ছে না তার ওই অপরূপ মেহেন্দি মণিমালার শরীরের সাদা থানের সাদাকে বিকট করে তুলছে?

ওই মেহেন্দি করা যেন একটা শুরু ছিল। তারপর থেকেই সিঞ্জিনী এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছে। তখন সিঞ্জিনীর মেহেন্দি করাটাকে অনেক কষ্টে মেনে নিয়েছিল শাশ্বত। মেজদা গয়ায় গিয়ে চকলেট গুড়োদুধের সফল সেলসম্যান হয়ে উঠেছে। নিজের মারুতি ভ্যান চালিয়ে দোকান ভিজিট সারে। মেজোবউদি কলকাতার মেয়ে। বিয়ের আগের বিউটিসিয়ানের ডিপ্লোমাটা ফেলা যায়নি। বিউটিসিয়ান হয়ে গেছেন মেহেন্দিসিয়ান। গয়ার মহল্লা মহল্লায় মহিলাদের হাতে মেহেন্দি করে বেড়ান। বউদির ব্যাগে প্রায় সব সময়ই মেহেন্দির ইনস্ট্যান্ট প্যাক থাকে। সিঞ্জিনীর উৎসাহ দেখে হয়তো এই পরিবেশেও করে না দিয়ে পারেনি। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন মণিমালার ঘরে সকলে উপস্থিত, নেই শুধু সিঞ্জিনী তখন তো শাশ্বতর ভেতরে একটা ক্রোধ জেগে উঠছিল। সিঞ্জিনীর প্রতি যাবতীয় অনুভূতি সরে গিয়ে স্রেফ একটা রাগ ভেসে উঠেছিল। যেদিন তারা এখানে এসেছে তার তিনদিন আগে মারা গেছেন সূর্যকান্ত। মণিমালার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পরেও শাশ্বত বুঝতে পরেনি সে ঠিক কী করবে। থাকবে, না চলে যাবে। যে প্রশ্নের উত্তর সে জানতে এসেছিল তা আর কোনওদিনই জানা হবে না। অথচ চলে গেলে মণিমালা মনে করতে পারেন নিছক এক জ্যোতিষীর কাছেই আসত শাশ্বত। এই যে দূর সম্পর্কের মাসি-মেসোমশাই হওয়া সত্ত্বেও যোগাযোগের এক ক্ষীণ সেতু রয়ে গেছে সেটাও যেন মিথ্যে হয়ে যায়। অথচ সঙ্গে সিঞ্জিনী আছে। ওর থাকাটাই বা কে কীভাবে নেয়। মণিমালা সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বলছিলিস তো তোর বন্ধু, থাকুক না তোর সঙ্গে দু'-তিনটে দিন, ওপরে তোর বউদিদের সঙ্গে শোয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তবুও একটা কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল শাশ্বতর চোখে। মণিমালা বলেছিলেন, কেন ও তো আমায় বলল তিনদিনের জন্যে শান্তিনিকেতন যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তখন শাশ্বত সব কথা বলেছিল মণিমালাকে। শাশ্বত লক্ষ করেছিল সেই যেন বিষাদের মাঝখানে একটু আলো ফুটল। মণিমালা বলেছিলেন, ও মা, এই মেয়েটাকে তুই বিয়ে করবি! খুব ভাল, তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, এই মেয়ের জন্যে তুই মেসোর কাছে জানতে এসেছিলিস! হাঁদা কোথাকারের। আসলে উত্তরে শাশ্বত বোঝাতে পারেনি কোথায় বিঁধে আছে তার কাঁটাটা। তারপর সিঞ্জিনীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসতে অনেক

কথা বলেছিল। বলেছিল সিঞ্জিনীব গানের কথা। 'তাই!' বলে উঠেছিলেন মণিমালা। তখন আগের থেকেও বেশি আলো ফুটে উঠতে দেখেছিল মণিমালার মুখে। বলেছিলেন ও-কে নিয়ে কাল সকালে আমাব ঘরে আসবি, সকলকেই আসতে বলেছি, দরকারি কথা আছে...

সকালে মণিমালার ঘরে যখন শাশ্বত এসেছিল তখন মণিমালার কথা শুরু হয়ে গেছে মণিমালার কণ্ঠস্বর যেন পাতাল থেকে উঠে আসছে। মানুষের স্বরের গভীরে এত বিষাদ মেখে থাকে শোনা ছিল না শাশ্বতর। সাদা থানের বিবর্ণতা আর শরীরে নেই, ছেয়ে গেছে দৃষ্টিতেও। আসলে অনেকদিন পরপর কাব৺ ।ঙ্গে দেখা হলে একটা সমস্যা ঘটে যায়। শেষ দেখা প্রতিকৃতিটাই গেঁথে থাকে মনে। বারবার সেই মানুষটাকেই খুঁজতে যায় চোখ। মণিমালার গোল ভরন্ত মুখে কপাল বেশ চওড়া, মোটা হয়ে সিঁদুর সেই কপালের প্রান্তে পৌঁছে মুখটিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। লালপাড়ের গরদের শাড়ি পরনে, ঠাকুবঘব সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে গতকালের বাসি ফুল মালা ফেলছেন। দেবীমূর্তি স্বয়ং যেন দু'পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে প্রাচীন কালের দীর্ঘ বারান্দায়। এরকমই এক চিত্র মণিমালা সম্পর্কে শাশ্বতর মনে রয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে মণিমালাব মুখের দিকে তাকিয়ে, মণিমালার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল নীরবে কত বযস, কত ব্যথা জড়ো হয়ে গেছে ওই শরীরে। মণিমালা বলছিলেন, শেষ আট-ন' বছব তো তোমবা কেউই কাছে বইলে না, নিজেদের উন্নতির জন্যে বাইরে বাইরে থাকলে, অর্থও করেছ বেশ, সময় সময় পাঠিয়েছ, কিন্তু কেন পাঠিযেছ বল তো? কর্তব্য'ব থেকে বেশি যেটা ছিল তা হল নিজেদের যোগ্যতা দেখানো, এই যে ব্যবসার জন্যে বাবার কাছ থেকে চেয়েও কিছু পাওনি তারপরেও যে তোমরা হারোনি এটা বোঝাতেই তো...

মণিমালার কথার শেষে কী কারণে কে জানে, বিরতি ছিল। শাশ্বত দেখেছিল ঘবেব সমবেত দৃষ্টি মেঝের দিকে।

বিরতি মণিমালাই ভেঙেছিলেন। হেসেছিলেন। ঠোঁট বিন্দুমাত্র ফাঁক হয়নি। বলেছিলেন, এটা তোমাদের অহঙ্কার, তবে তোমাদেরও তো কোনও দোষ নেই, 'তোমরা তো কখনও এর আগে মৃত্যু দেখনি, তোমাদের বাবা গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে একটা কথা খুব বলতেন যে মৃত্যু দেখেনি সে খুব অহঙ্কারী হয়।

শাশ্বত ভেতরে ভেতবে কীরকম যেন চমকে উঠেছিল। এরকম অদ্ভুত কথা তো সে কখনও শোনেনি।

মণিমালা বলেছিলেন, এই বাগা৷৷ব জমি তোমবা কতবাব বিক্রি করতে বলেছ, এ নিযে বাবার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক খারাপ হযেছে, কিন্তু কেন বিক্রি করতে চাযনি জানো, এই বাগান থেকে জীবনেব অনেক মানে তোমাদের বাবা খুঁজে পেয়েছিলেন...

মণিমালার কণ্ঠে কি অনেক জল জমে গিযেছিল? না হলে ঢোঁক গিলেছিলেন কেন? ঢোঁক গেলার পবে কযেক মুহূর্ত কথাই বলতে পাবছিলেন না। তারপব বলেছিলেন, কী বলতেন জানো. এই বড বড গাছপালাগুলোর একটুও অহঙ্কার নেই।

দেখো কত ডালপালা ছড়িয়েছে, কত রকমের পাতা, কী সুন্দর সব ফুল, কত ফল, কী তাদের ঘ্রাণ, এই যে ওদের এত কিছু আছে এই নিয়ে ওদের কি একটুও অহঙ্কার আছে! কেন নেই জানো? ওরা প্রতিদিন মৃত্যু দেখছে, প্রতিমুহূর্তে দেখছে, এই যে এক একটা গাছের পাতা ওদের চোখের সামনে ঝরে যাচ্ছে, ওদের পায়ের সামনে পড়েই শুকিয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে একদিন, এই যে নিরন্তর ওরা দেখে চলেছে তাই ওদের কোনও অহঙ্কার নেই...

এরপরে কণ্ঠের বিষাদ শিশিরের মতো ভেসে উঠেছিল মণিমালার চোখের নীচে। মণিমালা আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিলেন। বললেন, তোমরা কেউ-ই জানো না, ওনার ক্যানসার হয়েছিল, ফুসফুসে।

শাশ্বত দেখেছিল তিন দাদারই চোখের মণি যেন পাথর হয়ে গেছে।

মণিমালা বলেছিলেন, চিকিৎসা করালে হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচতেন, কিন্তু উনি করাতে চাননি...

এবার শাশ্বতও অবাক হয়েছিল। নিজের অজান্তেই যেন বলে উঠেছিল, কেন!

উনি বলতেন আমারও অনেক অহঙ্কার ছিল, রিটায়ারমেন্টের পরে টাকাপয়সা নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকলে হত, বাড়ি না করতে পারলে ভাড়াবাড়িতেই থাকতাম, সস্তায় পেয়ে গেলাম বলে এত জমি, এই পুরনো হাওদাখানা কিনে কি হলো! কেউ কি থাকল এখানে! যখন কিনেছিলাম তখন ওদের কিছু একটা দেখিয়ে দেব ভেবেই তো কিনেছিলাম, রোগটা আমার শরীরে থাকুক মণি, ওটা থাকলে অহঙ্কার একটু একটু করে ঝরে যাবে...

কারও মুখে কথা ছিল না তখন। মণিমালা বলেছিলেন, তোমাদের বাবার শেষ ইচ্ছে কি ছিল জান তো, কোনও শ্রাদ্ধশান্তি হবে না, এই বাগানের মাঝখানটা পরিষ্কার করে তোমরা সকলে বসবে, বাবার কথা বলবে, গান গাইবে, তাতেই নাকি ওনার আত্মা শান্তি পাবে... .

শ্রাদ্ধশান্তি হবে না। বড়দা বলে উঠেছিল।

একথার উত্তরেও মণিমালা হেসেছিলেন। উনি কী বলতেন জনো মৃত্যু তো অতি তুচ্ছ ঘটনা, তা নিয়ে অনুষ্ঠানের কি অর্থ। দেখো না বাগানের গাছ থেকে দিবারাত্র প্রতিক্ষণে পাতা ঝরছে, এ নিয়ে কি গাছগুলো একটুও ব্যস্ত?

কেউ কোনও কথা বলেনি। এরকম গভীর অনুভবের একটি মানুষের শেষ ইচ্ছে নিয়ে কি কথাই বা থাকতে পারে? নীরবতাকে সম্মতি মনে করে মণিমালা শাশ্বতর দিকে তাকিয়েছিলেন বলেছিলেন, তুমি বলেছিলে না সিঞ্জিনী ভাল গান গায়, ওকে বলো চার-পাঁচটা গান গাইতে, তা সে কোথায়?

সমবেত মুখের মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে সিঞ্জিনীকে খুঁজছিলেন মণিমালা। শাশ্বত লজ্জায় সিঁটিয়ে গিয়েছিল। এরকম একটা ব্যাপাব। সকলেই রয়েছে। অথচ সিঞ্জিনী নেই। তাহলে কি মৃত্যু কোনওভাবেই স্পর্শ করে না ওকে! তাহলে তো ওর অসীম অহঙ্কার! এত অহঙ্কার কীসের! ওর অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার? ওর গানের গলা? ওর রূপ? ওর সহজভাবে চারপাশটা বশে নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা? কোনটা? ঠিক কোনটার

জন্যে ওর অহঙ্কার। কিন্তু এত অহঙ্কার যার, তাকে কি ভালবাসা যায়? সেই পড়ন্ত বিকেলের রোদ ফের ছেয়ে যাচ্ছিল শাশ্বতর মাথার ভিতরে। স্নায়ুগুলোকে ঠিক করে নিয়ে মেজ বউদিকে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গেই তো রাতে ঘুমিয়েছিল, কোথায় গেল?

মেজ বউদি বলেছিল, নীচে তো আমাদেব সঙ্গেই নামল, বলল একটু বাগান থেকে আসছি...

দ্রুত পিছনে ফিরেছিল শাশ্বত। নেমে এসেছিল বাগানে, এই সময় যাওয়ার কী মানে থাকতে পারে। জঙ্গল সরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শাশ্বতর মনে হয়েছিল মৃত্যু যাকে ছোঁয় না মানে আসলে সে তো ব্যাথাহীন। সে কি ভালবাসতে জানে।

সারি দেওয়া সেগুনগাছের নীচে সিঞ্জিনীকে খুঁজে পেয়েছিল শাশ্বত। উবু হয়ে বসে ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে ক্যামেরার লেন্স অ্যাডজাস্ট করছিল। সামনে সেরকম দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। সূর্যকান্তর বিশাল বাড়ির পিছন দিকের অংশ জঙ্গলের ভেতর থেকে জেগে রয়েছে। ওখানে বোধহয় কেউ থাকে না। পেল্লাই সব কাঠের পাল্লার ওপরে একটা লতা ছেয়ে গেছে। এটাকে ক্যামেরাবন্দি করার মানে।

কোনওকিছুর তোয়াক্কা না করে উবু হয়ে বসে থাকা সিঞ্জিনীর কাঁধ আলতো কবে নাড়িয়ে দিয়েছিল শাশ্বত।

এটা কি হলো! টানটান হয়ে দাঁড়িযে পডেছিল সিঞ্জিনী।

এটা কি হচ্ছে!

কি হচ্ছে মানে। দেখতে পাচ্ছ না! হ্যাভ আ ডিপ লুক।

ডিপ লুকই দেখেছিল শাশ্বত। আর ওর ফ্যাকাশে চোখের দিকে তাকিয়ে সিঞ্জিনী বলেছিল কিছুই দেখতে পাচ্ছ না! লতাগুলো অদ্ভুত না, মনে হচ্ছে না পাতাগুলোকে কে যেন আঠা দিয়ে পেস্ট করে দিয়েছে পুরনো দেয়ালটার ওপরে—

শাশ্বত আবার তাকিয়েছিল। বিশেষত্ব কিছু খুঁজে পায়নি। শুধু লক্ষ করেছিল লতাটা এলোমেলো বাড়লেও জংলা তৈবি করেনি। কিন্তু এর মধ্যে ছবি তোলার কি আছে।

সিঞ্জিনী ফেব উবু হয়ে বসে লেন্স ঠিক করে নিতে নিতে বলেছিল ছবিতে সাবজেক্টটা যা আসবে না...

শাশ্বত বেগে বলেছিল, এই ছবিটা তো পবেও নেওয়া যেতে পারত।

কী বলছ। এই লাইটটা পেতাম, প্রত্যেকটা আলোর একটা নিজস্ব রং থাকে, সেই মুহূর্তটা চলে গেলে রংটাও হারিয়ে যায়।

শাশ্বতর সমস্ত ভেতবটা বোবা। কী বলবে। সিঞ্জিনী গান জানে। সিঞ্জিনী সোসিওলজি জানে। শুধু অনার্সের পাঠ্যপুস্তকের ফিলোজফি নয়, গীতিকারের গানের ফিলোজফি বোঝে। আবার ক্যামেরাও বোঝে। এ তো আসলে নিজেকে যতটা পারা যায় ছুঁড়ে দেওয়া তারপর যতটা শুষে নেওয়া যায় শুষে নেওয়া। সে ভালবাসে সিঞ্জিনীকে। আর সিঞ্জিনী যেন চারপাশটাকে ভালবাসে অক্টোপাসের মতো। একটা মানুষ আর একটা অক্টোপাসের মধ্যে কতক্ষণ সম্পর্ক বজায় থাকে? অনেক ভেবেও কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারেনি শাশ্বত।

সেদিন দেরি হলেও মণিমালার ঘরে সিঞ্জিনীকে উপস্থিত করে অবস্থা সামলেছিল শাশ্বত। আগামীকাল বাগানের মাঝখানে সেই অনুষ্ঠানটা হবে। তাই আজ সকাল থেকে সকলেই ব্যস্ত। শাশ্বত বাগানেই ছিল। সিঞ্জিনী এসে বলল, রঘুনন্দন বলছিল আজ পূর্ণিমা তো, ফল্গুনদীর চরে বালিহাঁস নামবে, দারুণ নাকি লাগে, যাবে...

কেউ শুনেছে কিনা বুঝে নেওয়ার জন্যে চারপাশে হালকা করে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল শাশ্বত। তারপর অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সিঞ্জিনীর দিকে। ও কি বুঝতে পারছে না সূর্যকান্তের মৃত্যুতে বাগানের গাছগুলোও বিষাদগ্রস্ত! তাহলে এত উচ্ছলতা কেন!

শাশ্বতর এই অবাক হয়ে যাওয়া ভাবটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে সিঞ্জিনী বলল, কি হল যাবে কিনা বলো, সেই বুঝে গাড়ি ঠিক করতে হবে...

শাশ্বত আমতা আমতা করে বলেছিল, আজই যেতে হবে! কালকেই তো মেসোর অনুষ্ঠানটা—

আমরা তো সকালেই ফিরে আসব। বালিকার অবদার মেখেছিল সিঞ্জিনীর চোখে।

শাশ্বত বলেছিল, আজ আর কাল এই দুটো দিন বাদ দিলে চলে না!

কাল থেকে তো জ্যোৎস্না কমতে থাকবে যদি বালিহাঁস না নামে, রঘুনন্দন বলছিল পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ওরা শুকিয়ে যাওয়া ফল্গুনদীর ওপরে নামে...

সূর্যকান্তের ফাইফরমাস খাটার লোক রঘুনন্দনের সঙ্গে কখন এতটা আলাপ জমিয়ে ফেলল সিঞ্জিনী! কিছুই বুঝতে পারছিল না শাশ্বত। সিঞ্জিনী যে জলের মতো গড়াচ্ছে। কীভাবে ধরে রাখবে ওকে!

শাশ্বতকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দপদপানো পা ফেলে বাগান থেকে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল সিঞ্জিনী। যাওয়ার সময়ে বলেছিল যদি না যাও তাহলে আমি সন্ধের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাব—

ফিরে যাবে।

হ্যাঁ।

সকলে কি ভাববে।

সেটা তোমার ভাবনা, তুমি ভাবো—

বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল সিঞ্জিনী। শাশ্বতের মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে মৃত্যু নেমে আসছে। বাতাসে মৃত্যু মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। মাটি ফুঁড়ে শিকড়রা সব ছুটছে আকাশমুখে। তাদের কোষে কোষে শুধু মৃত্যু। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা এই মৃত্যু সূর্যকান্তের সেই মৃত্যু নয়।

অতিথির আবদারই জিতে গেছে শেষ পর্যন্ত। মণিমালাই ঠিক করে দিয়েছেন গাড়ি। শাশ্বতর মেঘলা মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, যা ঘুরে আয়, দেখবি খুব ভাল লাগবে, চাঁদনি রাতে একবার আমরা ওখানে পিকনিকে গিয়েছিলাম। গাড়িতে যখন উঠছিল, মণিমালা পিছন থেকে বলেছিলেন, রাতে যদি ফেরার অসুবিধা হয় তাহলে ফেরার দরকার নেই, ওখানে রঘুনন্দনের চাচার বাড়ি আছে, ড্রাইভার চেনে, কোনও অসুবিধা হবে না...। শাশ্বত কোনও উত্তর দিতে পারেনি। সামনের দিকে

মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। পুড়ে যাচ্ছিল দুটো কান। শুধু মনে হচ্ছিল পিকনিকের আবহাওয়া কি তৈরি হয় মৃত্যু-বাড়িতে। কে জানে। জানে, জানে। একজন জানে। সিঞ্জিনী জানে।

তারপর একটু একটু কবে পিচবাস্তা ঢুকে পড়েছে গাড়িব পেটের ভেতরে। এক সময় পিচ হারিয়ে গিয়ে রাস্তার বুকে জেগে উঠেছে খয়েরি মাটি, পাথর। শুকিয়ে থাকা ফল্গুর পাড় ধরে নিকটবর্তী লোকালয়ে রঘুনন্দনের চাচার কাছ থেকে ঘুরে এসেছে ওরা। রঘুর চাচা বলছিল আব কিছুক্ষণ পরে যখন জ্যোৎস্না নামবে তখন আকাশের বুক থেকে দোল খেতে খেতে ওড়নাব মতো বালিহাঁসের দল এসে নামবে চরায়। ধীরে ধীবে জ্যোৎস্না যখন ফিকে হতে থাকবে সেই বালিহাঁসের ওড়না আবার ফিরে যাবে আকাশে, জ্যোৎস্নায় পাখিগুলো এমন মাখামাখি হয়ে যায় যেন মনে হয় ওরা জ্যোৎস্নায় তৈরি। একটু একটু কবে অন্ধকার নামছে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য চরভূমি। দূরের দিকে গাছের সারি যে কৃষ্ণবেখা তৈরি করেছে সেখানেই যেন বিন্দুটা ভেসে উঠেছিল। বিন্দুটা ধীরে ধীবে একটা ঢেউ খেলানো রেখায় পাল্টে গেল। একটা ওড়না কে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে সেই দূব আকাশ থেকে এই মাটির উদ্দেশ্যে। শাশ্বত ঘাড় ঘুরিয়ে সিঞ্জিনীকে দেখল। এই অপরূপ দৃশ্যে সিঞ্জিনীর বুকের রক্ত ছলকাচ্ছে। সেই ঢেউ চোখের কিনারায় এসে পৌঁছেছে ওব। শাশ্বত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আজ না এলেই চলছিল না...

সিঞ্জিনী ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করছে। এই আলোয় কি ছবি পাবে কে জানে। তবুও বের করছে একটা প্রবল আবেগ ওব দু'গালেব টোলে ঢেউ তুলেছে। খুব স্বাভাবিক স্বরেই বলল, শুনলে না পূর্ণচাঁদ আকাশে না থাকলে ওরা আসে না...

পরের পূর্ণিমাতে নয় আসতাম—

যদি বেঁচে না থাকি—

স্ট্যান্ডের ওপরে ক্যামেরা বসানো হয়ে গেছে। শাশ্বতর বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। সিঞ্জিনী বলল, যদি বেঁচে না থাকি তখন...

বলেই ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে লেন্স অ্যাডজাস্ট করতে থাকল সিঞ্জিনী। বলল, কেউ বলতে পারে কে কখন মরে যায়..

লেন্স অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেছে। নীচু হয়ে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সিঞ্জিনী। ফের সেই হাসি। বলল, কি হলো! ওরকম পেপারওয়েটের মতো মুখ করে বসে আছ কেন.

শাশ্বত বোকাবোকা একটা হাসি হাসাব চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু সেটাও পুরোপুরি ঘটল না। তার আগেই সিঞ্জিনীর কথাগুলো তার যাবতীয় অনুভব শুষে নিল।

সিঞ্জিনী বলল, তুমি মনে করো তুমিই বোধহয় মৃত্যুতে বিশ্বাস করো, আমাব বোধহয় এসব বোধই নেই তাই না? কিন্তু তোমাব থেকে অনেক বেশি মৃত্যুতে বিশ্বাস করি আমি, এতটাই বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মুহূর্ত চূড়ান্তভাবে বেঁচে নিতে ইচ্ছে করে, আসার পথে তুমি বলছিলে না তোমার মেসোমশাই বলতেন মৃত্যুবোধ না থাকলে মানুষ অহঙ্কাবী হয়, গাছেরা প্রতিদিন মৃত্যু দেখে তাই ওরা অহঙ্কারী নয়, কিন্তু গাছের একটা পাতা ঝবে যাওয়াব মানে মৃত্যু হবে কেন। একটা পাতা

ঝরে যাওয়ার মানে গাছটার পুরনোকে ফেলে একটু নতুন হয়ে ওঠা, এই যে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে পাতা ঝরছে আর গাছটা তো প্রতি মুহূর্তে নতুন করে বেঁচে উঠছে, এরকম মনে হয় না তোমার!

শাশ্বত কী উত্তর দেবে, যে শুকনো চরের ওপরে সে বসে আছে তার নীচে কলধ্বনি শুরু হয়েছে। কলকল শব্দ বইতে বইতে জলরাশি তার উবু হয়ে বসে থাকা দু'পায়ের পাতার মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করেছে। শিরা-উপশিরা বেয়ে তারা ছুটছে।

সিঞ্জিনীর চোখ এখন ভিউফাইন্ডারে। আঙুলটা সাটারে উঠবে উঠবে করছে। সিঞ্জিনী বলল, মৃত্যুর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে এই প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকাটা আমি কার কাছ থেকে শিখেছি জানো?

ভিউফাইন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে বলল, গাছেদের কাছ থেকে...

শাশ্বত দেখতে পাচ্ছে একের পরে আর এক ওড়না নেমে আসছে আকাশের বুক থেকে। চরাচর জ্যোৎস্নাময়। শাশ্বতর মনে হচ্ছে ওরা নামুক। সারা রাত ধরে ওরা নামুক। রাত ফুরিয়ে গেলেও ওরা নামতে পারে। তার কোনও আপত্তি নেই। যদি কাল লক্ষ্মণপুরে ফেরা না হয়, নাই বা হল। জীবনের মানে তো সে আজ জেনে গেছে। এখন জ্যোৎস্নাময় এই অনন্ত চরাচরই যে শেষ কথা।

পরকীয়া

অঞ্জলি চক্রবর্তী

আসলে সেটা ছিলো একটা গল্প। গল্প নয়তো কি? এও কি কখনো সম্ভব? চেনা নেই জানা নেই হুস করে একটা লোক আপন হয়ে গেল—একি সিনেমা না কি? নায়কের সঙ্গে চলতি পথে নায়িকার ধাক্কা লেগে গেল, তাবপরই শুরু হলো বাইকে চেপে প্রেম, তাও আবার বিবাহিতা একটা মেয়ে, যার স্বামী সংসার ছেলে মেয়ে সবই বর্তমান। না, না, সুস্মি এটাকে কিছুতেই সত্যি বলে মানতে পারছে না। আবার ঘটনাটা গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারছে না। কোন্ এক অলৌকিক ঘটনায় একটা মানুষ, কত কাছে এসে গেল, তাকে সে ভুলবে কি করে? আর সেই বাতটাকেই বা অস্বীকার করবে কোন্ মনের জোরে?

সুস্মির জীবনটা বরাবরই একটা আগোছালো প্ল্যাটফর্মের মতন। সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ে যখন দৈব বা আপ্তবাক্য মেনে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে, সে-সময় ও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। আসলে সুখ জিনিসটা কি সেটাই ও আজও বুঝে উঠতে পারলো না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির অবশ্য বলেছেন অঋণী আর অপ্রবাসীরাই সুখী। অর্থাৎ যে নিজের দেশে বাড়ি বানায় আর সোপার্জনে জীবন-যাপন করে সেই সুখী। এই যদি সুখের সংজ্ঞা হয়, তবে তো অরুণাভকে নিয়ে ওর যথেষ্ট সুখী হবারই কথা। অরুণাভ, মানে সুস্মির স্বামী, একটা বড়ো কোম্পানির একজিকিউটিভ অফিসার, সকাল দশটা থেকে পাঁচটা তার সামনে বসে থাকে পি.এ. মিস্ সায়নী মিত্র। শুধু অফিসে নয় দরকার হলে অফিসের বাইরেও শপিং-এ সাহায্য করে। এহেন অরুণাভ একদিন কথায় কথায় সুস্মিকে বলেছিলো।

—তুমি তো মনটা করে রাখলে সোনায় মোড়া হীরের মতন, অনামিকা থেকে কেবলই দ্যুতি ছড়াচ্ছ। কিন্তু কারো দ্যুতি গ্রহণ করতে শেখনি। নিজেকে বিলোতে গেলে অন্যকেও গ্রহণ করতে হবে। না হলে লাইফ এন্‌জয় করতেই পারবে না।

এই লাইফ এন্‌জয়ের ব্যাপারটা সুস্মির মাথায় একেবারেই আসে না। সুস্মি অরুণাভের কথাটা মাঝে মাঝে ভাবে। হয়তো তার নিসঃঙ্গতার এটাও একটা কারণ। তার জীবনটা বড়ো একপেশে, দেওয়ালে আঁটা ক্যালেণ্ডারের মতন। ইউনিভারসিটির বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অসীমকেই ওর একটু ভালো লাগতো, অসীমের মধ্যে কেমন যেন একটা কবি কবি ভাব ছিলো, বোধহয় বাংলায় এম.এ. করে ওটা ওর সহজাত হয়ে গিয়েছিলো। এককালে সুস্মিকে ওর কিছুটা পছন্দও ছিলো। আজও হয়তো তার কিছু রেশ রয়ে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার যাওয়া-আসার অকারণ আধিক্য দেখলে। তবে সুস্মি ওকে তেমন একটা পছন্দ না করলেও একেবাবে অপছন্দ করে না। কারণ অসীমের সমসাময়িক সাহিত্যচর্চা ও জীবনচর্চা নিয়ে সরস আলোচনা ওর ভালোই লাগে। আশপাশের যে-সব প্যান-প্যানে ঘরোয়া আলোচনা তার চেয়ে এগুলো অনেক ভলো বলেই মনে হয়। শুধু আলোচনা নয়, মাঝে মাঝে অসীম সুযোগ মতো সুস্মিকে উপদেশও দিয়ে বসে।

সুস্মিব মধ্যে জীবনের ঘাটতি দেখলে বলে, দেখ্ সুস্মি, বার্ধক্য আর বৃদ্ধত্ব এক নয়। বয়স আমাদের বার্ধক্য এনে দেয় আর বৃদ্ধত্ব আসে মন থেকে। দেখ্না আমরা যে লেখালেখি করি, সাহিত্যের মাধ্যমে যে চরিত্রসৃষ্টি করি, তাদের সজীব করি, সুন্দব করি, এককথায় যৌবনের দূত করে তুলতে পারি, তার কারণটাই হলো আমরা মনে মনে সবাই যুবক, তা যদি না হতো তবে আমাদের সৃষ্ট সব চরিত্রই লোলচর্ম হয়ে লাঠি ধরতো।

অসীমের কথাগুলোর মধ্যে বেশ যুক্তি আছে। কথাগুলো শুনতে সুন্দব। সুস্মির ইচ্ছে করে এই বয়সেও এক একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে নিজেকে দেখে। আসলে এক-একটা মানুষ থাকে যাদের চোখে থাকে সর্বনাশের আলো, আর গায়ে থাকে প্রেম-প্রেম সুগন্ধি। সুস্মি এইসব লোকগুলোকে খুবই ভয় পায়। মনের ব্যাপারে ও একটা বেশি রকম স্বার্থপর। ওর মতে যে যার মতন থাকাটাই ভালো। বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ নেই। জীবনটা যাপন করার জন্যে অবশ্যই। তবে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। বাইরেটা যে কোনও ভাবে চলে গেলেই হলো। কিন্তু ভেতরটাতে বেশ একটা গল্প করার জায়গা থাকা চাই, সেখানে থাকবে তার স্বনির্বাচিত গল্প করার মতো, আড্ডা-দেওয়ার জায়গা। অথবা কোনও পছন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মনে মনে আড্ডা দিতে ওর খুব ভালো লাগে। তাই বাইরের কোনও লোককে সহজে ওর মনেই ধরে না। এহেন সুস্মির কিনা পরকীয়া রোগ? তাও আবার কবি নয়, সাহিত্যিকও নয়, এমন কি নিদেন পক্ষে তার মতন সামান্য রিপোর্টারও নয়। একেবারে অচেনা অজানা লোকের প্রেমে ডুবে যাওয়া। না-না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়, এভাবে মনকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কাগজের জন্যে বেশ কিছু ফিচার লেখা বাকি। সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছে। মাথার ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে বেশ কিছুদিন কাটানো গেছে। কিন্তু এবার তো টাকায় টান পড়বে। তাদের মতন ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারদেব ভবিষ্যৎ তো ঐ কাজের ওপরই নির্ভরশীল। দু-একটা ব্যক্তি ইনটারভিউ নেওয়া আছে সেগুলোকে সাজাতে হবে, একটা সাময়িকপত্রেব জন্য একটা আর্টিকেল লেখার কথা, সেটাও এখনো শুরু করা যায়নি, ওকে দেখতে আসার ভিড়ে। তারপর সেই পাহাড়ি জীবনযাত্রা নিয়ে একটা বড়ো রকমের লেখায় হাত দিতে হবে। এই লেখাটার কথা ভাবতে ভাবতেই মাথাব ব্যাণ্ডেজে হাত দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুস্মি হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল সে-সময়ের প্রাত্যহিকতা, ঘর-সংসার সব—সবকিছু।

বাসের মধ্যে আছে সুস্মি। জানলা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে পাথর গাছ নদী, কখনো কখনো মেঘ। ওর ইচ্ছে করছিলো নেমে একটু ছোঁয়া, কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যে নিচে ফিরতে হবে, তাই ড্রাইভার কোথাও দাঁড়াতে রাজি নয়। সুস্মির অবশ্য এই আসাটা প্রথম নয়, এর আগেও ও একা একা এসেছে অনেকবার। তবু যতবারই আসে ততবারই নতুন লাগে এই সব পাহাড়ি নদী পথ জনপদ। তাই যতটা পারে দু-চোখ দিয়ে শুষে নেওয়ার চেষ্টা করে। গাড়ি নামছে ঢালু পথে, দুপাশের পাহাড় আর খাদের মধ্যে চলছে লুকোচুরি খেলা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ড্রাইভার একটু স্পিড্ তোলে গাড়িতে, তারপরই প্রচণ্ড একটা শব্দ। গাড়িটা বোধহয় ধাক্কা খেল কোথাও। আর সুস্মির কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আবছা অন্ধকার। ঘরের আলোয় সুস্মি বুঝতে পারলো, একটা সম্পূর্ণ অচেনা

বাড়ির মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার মাথাটা যার হাতের মধ্যে ধরা তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। জ্ঞান ফিরতে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কাঁচের গেলাস থেকে গবম দুধ ওর গালে ঢেলে দিয়ে বললেন, খেয়ে নিন্। এখন একটু ভালো লাগছে তো? সুস্মি ভীষণ লজ্জা পেয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু মাথাটা কি রকম যেন ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ধরে ফেললেন, তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সুস্মি শুয়ে শুয়ে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। ঘরের আসবাব দেখে একেবারেই মনে হলো না সেখানে কোনও মহিলা থাকেন। একটা অদ্ভুত অজানা অনুভূতিতে চোখ বুজিয়ে নিল। একটু পরেই একজন ঘরে ঢুকলেন। হাতে ব্যাগ। সুস্মিকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে মৃদু স্বরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথায় চোটটা ভালোই লেগেছে। সারতে বেশ সময় নেবে। ভাগ্যিস ঐ অ্যাক্সিডেন্টে আপনার কিছু হয়নি, তাহলে আর আপনার স্ত্রীকে বাঁচানোই যেত না।

আপনার স্ত্রী কথাটা কানে যেতেই চমকে ওঠে সুস্মি, বেশ বিস্ময় নিয়ে তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, কিন্তু সে সময় অদ্ভুত একটা অনুরোধ ঐ দুটো কাতর চোখে। সুস্মি বাধ্য হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়, পাশ ফিরে শোয়। ভদ্রলোক ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সুস্মির বিছানার কাছে। ওর দিকে একটু ঝুঁকে বলেন, আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোনও উপায় ছিলো না, তাছাড়া—

সুস্মি আস্তে আস্তে চোখ তুলে বলে, বলুন তাছাড়া কি?

বিশ্বাস করুণ, আমি আপনার কোন অসুবিধেই করিনি। আসলে কাল রাত্রে গাড়ি এ্যাক্সিডেন্টের পর আপনার জ্ঞান ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আমার বাড়িতে এনেছিলাম। তারপর ডাক্তার লোকজন সব একে একে চলে যেতে একটা পুরো রাত আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোধহয় আপনাকে—

মাথা নীচু কবলে ভদ্রলোক। বিড় বিড় করে বললেন, তাই ডাক্তারবাবু আপনাকে আমার স্ত্রী মনে করাতে ততটা চমকে উঠিনি। আশা করি আমার অসহায়তাটুকু ক্ষমা করে দেবেন। একটু পরে সুস্মির দিকে চেয়ে বললেন, এতে অবশ্য অনেকটা সুবিধে হয়ে গেল। অনেক কৌতুহলী দৃষ্টি সরে গেল আমাদের ওপর থেকে, আর খুব সহজেই আমি আপনার কাছে আসতে পারলাম।

আবার ধাক্কা খেল সুস্মি, কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। ওর শরীর মন দুটোই দুর্বল হয়ে আসছে, পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক একটা গ্লাসে আবার একটু দুধ আর দুটো বিস্কুট এনে বললেন খেয়ে নিন। এই সব পাহাড়ি এলাকায় বেশি কিছু তো পাওয়া যায় না। আগে থেকে বলে রাখলে না হয়—

সুস্মি আবার মুখ খুলল, 'যা পাচ্ছি এই তো অনেক।' ভদ্রলোক কিছু বললেন না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুস্মিব দিকে। যেন বিশেষ আপন কাউকে খুঁজছেন। তারপর পরম সাবধানতায় ওকে তুলে ধরে দুধ আব বিস্কুট খাওয়ালেন। এই অসুস্থ শবীরে সুস্মিও যেন কোথাও একটা পরম নির্ভবতার আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল কিছু একটা অন্যায় কবে ফেলেছি। আপনার ব্যাগ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ কবে আপনার বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিযেছি।'

সুস্মি হঠাৎ জোরে একটা বিষম খেল। মনে মনে হাঁটতে হাঁটতে মোড় পেরিয়ে অন্য পথে চলে এসেছিলো, হঠাৎ ভদ্রলোক তার বহুদিনের চেনাপথটা এক ধাক্কায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অকারণেই ওর চোখের কোণদুটো চিক্ চিক্ করে উঠলো, সেসময় উনি আনলার সামনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা পোষাক বাতিল করছিলেন। তাঁর দেওয়া খবরটা সুস্মির বাড়িতে ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা এটা জানতে চাওয়া তার কর্তব্য। সমস্ত আনলা নামানোর পর একটা সার্ট চড়িয়ে চটিতে অতিরিক্ত আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে সুস্মি একটু একটু ক'রে গত রাতের ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলো। ডাক্তার বোধহয় যন্ত্রণার জন্যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলো। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু চোখ খুলছিলো দেখেছে একটা মানুষ নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, সুস্মি যন্ত্রণায় উসপাশ করতেই ধরে শুইয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আপনি ঘুমোন, আমি তো আছি। সুস্মি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করেছে 'আপনি?'

আমি তো কাল থেকে খুশিমতো ঘুমোবো, আজকেব রাতটা আমাকে জাগতে দিন প্লিজ। সুস্মি আবার তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে।

সকালের গাড়িতেই চলে এসেছে অরুণাভ। সঙ্গে মেয়ে এসেই হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। ওরাও যে-এ-দুদিন খুব টেনস্‌ড ছিলো সেটাও জানালো। তবে সুস্মির ফেরাটা ঠিক ছিলো না। সুস্মি আস্তে আস্তে বললো, তিনি তাঁর কর্তব্য করতে পেরেছেন কিনা জানতে গেছেন। অরুণাভ এবার একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'অন্য কোনও অসুবিধে?' সুস্মি উত্তর না দিয়ে শুধু মাথার ব্যান্ডেজটা দেখাল। অরুণাভ হা-হা করে হেসে উঠল, আরে না-না, আমি কি আর সেরকম কিছু—

ইতিমধ্যেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, হাতে স্ন্যাক্সের দুটো প্যাকেট। অরুণাভকে দেখে খুব খুশি। সহজ গলায় বললেন, এসে গেছেন দেখছি। নিন মশাই, আপনার জিনিসপত্র বুঝে নিন।

সুস্মি একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক আর ওকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। উনি তখন অরুণাভকে নিয়েই ব্যস্ত। বললেন, আপনাদের গাড়ি দশটায়। ৮-৩৫, অতএব এই সময়টা কিছুটা জলযোগের কাজে লাগানো যেতে পারে। বলে টেবিলের ওপর খাবারের প্যাকেটগুলো রাখলেন। তিনজনের খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন, কাল থেকে উনি খুবই চাপের মধ্যে আছেন। যতই হোক বিপদের সময় নিজের লোক কাছে না থাকলে—

সুস্মি সমস্ত দৃষ্টিশক্তি এক জায়গায় এনে চেষ্টা করলো কালকের মানুষটাকে খোঁজার, কিন্তু পেল না। কষ্টে ওর চোখে জল এসে গেল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলল, এত ভালো মানুষ গড়ার কি দবকার? একটা প্রচণ্ড অভিমান ওর বুকে চাপ দিচ্ছিল। কালকের সেই লোকটাই আজ তাকে তাড়াবার জন্য কেমন উঠে-পড়ে লেগেছে। কত অভিনয় মানুষ করে। অরুণাভ সুস্মিকে কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো, সুস্মিব গলা দিয়ে কিছুই নামতে চাইলো না।

ভদ্রলোক ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। ততক্ষণ অরুণাভের গোছগাছ শেষ। নিঃশব্দে ফিরে অত্যন্ত উদাসীনভাবে অরুণাভর হাতে কিছু ওষুধপত্র আর ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনটা দিয়ে বললেন, এগুলো রাখুন, পথে একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর ওখানে গিয়ে একটা ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন। আঘাতটা কম হয়নি কিন্তু।

সুস্মি আর একবার ম্লান হেসে ওঁর দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারেই দেখছেন না ওকে। বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল। অরুণাভ পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ভদ্রলোককে বললেন, আপনার ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারবো না। তবু বলছি অন্তত ওষুধ আর ডাক্তারের খরচ হিসেবে যদি এটুকু রাখেন। এবার ভদ্রলোক চট করে একবার দেখে নিলেন সুস্মির দিকে। তারপর অরুণাভর দুটো হাত ধরে বললেন, একজন মানুষ হিসেবে একজন মানুষের জন্যে আমি খুব সামান্য কিছু করেছি, আপনার কাছে আনুরোধ, সেই পরিচয়টুকু আমাকে রাখতে দিন।

অরুণাভ টাকাটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর সুস্মিকে ও মেয়েকে নিয়ে আস্তে আস্তে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

ভদ্রলোক অত্যন্ত স্বাভাবিক চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়েছে, হঠাৎ ভদ্রলোক চিৎকার করে বললেন, একটু দাঁড়ান। বলেই ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ওয়াটার বটলটা হাতে নিয়ে। সুস্মির হাতে বোতলটা দিয়ে বললেন, আপনার ওয়াটার বোতলটা, বোতলের সঙ্গে একটা নেমকার্ড—অভীক চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্টো পিঠে লেখা, মনে পড়লে খুঁজো। অরুণাভ দেখার আগেই সুস্মি কার্ডটা বুকের মধ্যে গুঁজে নিল, জলের বোতলটা এগিয়ে দিল মেয়ের দিকে। ততক্ষণে গাড়িটা বেশ কিছুটা গড়িয়ে গেছে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দিনগুলি

রবিশংকর বল

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে একটি গল্প লেখার কথা ভাবছে সোমদেব। কেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, আর কেনই বা তা নিয়ে গল্প লেখার কথা তার মাথায় এল, সোমদেব তা নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। জীবনে অনেক কিছুই বোঝা যায় না, সোমদেব জানে, তবু সেগুলি ঘটে। তার কেমন মনে হয়, এই সব ঘটনাগুলি বড়ো কোনো নকশার অন্তর্গত, যে নকশাটি আগেই তৈরি হয়ে আছে, শুধু নকশাটা জানা নেই বলেই ঘটনাগুলিকে এমন আকস্মিক আর কাকতালীয় মনে হয়। এর মধ্যে নিয়তির কথা ওঠার কোনো মানেই হয় না।

যেমন ধরা যাক জিগস পাজ্‌ল্‌। কোনো একটা বইতে যেন জিগস-পাজ্‌ল্‌ সম্পর্কে বেশ মজার কয়েকটি কথা পড়েছিল সে। পাজলের ব্লকগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা তো একটা সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করতে চাই, বক্ষগুলি কোন্‌ নিয়মে সামঞ্জস্যে আসবে, তাও আমরা জানি না, চেষ্টা করতে করতে একসময় হয়তো সম্পূর্ণ নকশাটা তৈরি হয়ে ওঠে। কীভাবে মিললে সম্পূর্ণ নকশাটা ফুটে উঠবে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকম, সোমদেব জানে, আমি যে জিগস-পাজ্‌ল্‌টা খেলছি, তার দুটি ব্লক হঠাৎই বেশ ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে আমাকে, অর্থাৎ ওই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও তা নিয়ে গল্প লেখার ভাবনা।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা সোমদেবের মনে হতেই পারে, কেননা কৈশোরে আনা ফ্রাঙ্কের ডায়ারি থেকে শুরু করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কিত বেশ কিছু বই সে পড়েছে। এমন নয় যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কে সোমদেবের আলাদা কোনো আগ্রহ আছে, কিন্তু বইগুলি যে সে পড়েছিল, তার কারণ, এই ধরনের বই কেমন করে যেন আমাদের হাতে এসে যায়, হয়তো তা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে বামপন্থার প্রতি এক অনিবারণীয় দৌর্বল্যের জন্য, যেমন সোমদেব অতি পরিচিত 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন', 'মানুষের মতো মানুষ', 'ইস্পাত' ইত্যাদি বইগুলিও পড়েছিল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লেখার কথা কেন তার মাথায এল, প্রশ্নটা সেখানেই, আর ইদানীংকালেও তার মধ্যে গল্প ইত্যাদি লেখার কোনো বাসনা জাগেনি। তাহলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লেখার কথা আমার মাথায় এল কেন? আর কী আশ্চর্য, আমি যতই এই ভাবনা মেরে ফেলার চেষ্টা করছি, ততই সে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আমি কখনো দেখিনি, দেখার প্রশ্নই ওঠে না। আমার যেটুকু জানা, তা বই পড়ে ও কিছু ফোটোগ্রাফ আর সিনেমা দেখে। দাহাউ, বুখেনওয়াণ্ড, আউশভিৎস, গুলাগ...এই রকম কিছু নাম আমি জানি। গল্প লেখার জন্য অভিজ্ঞতা দরকাব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বই পড়ে তো আর গল্প লেখা যায় না। এই ভূত তাহলে কোথা থেকে আমার মাথায় এসে চাপল?

ভূত চাপার উৎস যে সোমদেব একেবারেই শনাক্ত করতে পাবে না তা নয়। মাসখানেক আগে তার অফিসেরই নির্মাণ দত্ত—ছেলেটি লেখেটেখে—একটি বই নিয়ে

এসেছিল। সোমদেবের যা অভ্যাস, বই দেখলেই সে একবার ঝাঁক মারবে, তা সে যে বই-ই হোক না কেন, হাতে সময় থাকায় সে অনেকবার রান্নার বইও পড়েছে। এখনো অবশ্য অতটা পড়ার সুযোগ তার হয় না, অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে, সংসারে অনেক ঝক্কি, বিশেষ করে তার স্ত্রী তরুলতা বিছানায় শয্যাশায়ী হওয়ার পর থেকে। সোমদেব অনেকবার ভেবেছে, এতো বই সে পড়েছিল কেন? এখনো সুযোগ পেলেই পড়তে ইচ্ছে করে কেন? সে লেখে না, জ্ঞান সঞ্চয়ের কোন তীব্র আকাঙ্খা তার নেই, এমনকী একটি বই পড়ার পর শব্দ জুড়ে জুড়ে কেমন একটা জীবনের টান তৈরি হয়, যেন একটা খেলার মতো। এক একটা বইয়ের ভিতরে এক একরকম খেলার মাঠ, কখনো হাঁটছি, কখনো দৌড়াচ্ছি, কখনো সাইডলাইনে চুপচাপ বসে আছি। সোমদেব শুধু অনুভব করেছে, বইয়ের ভিতরে ডুবে গেলে তার অন্তরাত্মা কেমন সবুজ হয়ে ওঠে আর সেই সবুজে ছড়িয়ে যায় কতরকম শিশিরের স্পর্শ।

নির্বাণ দত্তর আনা বইটির নাম সে ভুলে গেছে, লেখকের নামও। সোমদেব এসব মনে রাখতে পারে না, শুধু এক একটা বইয়ে পড়া কোনো বৃত্তান্ত বা চরিত্র বা কোনো তথ্য মাছের মতো এক এক সময় ঘাই মেরে ওঠে তার ভিতরে। শুধু মনে আছে, সেই বইয়ের প্রচ্ছদে কাচের দরজা বা জানলার ওপারে বিবেকানন্দের মতো বুকের কাছে দুই হাত নিয়ে একটা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লেখক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে ঝাঁকড়া দাড়ি, কিন্তু গোঁফ ছিল না। বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে হঠাৎই দেখেছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কিত একটি বইয়ের ওপর লেখা। কোন্ এক রবার্টঅ্যান্টেলমি তাঁর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকার কথা লিখেছিলেন। সেই বইয়ের ওপর আলোচনা। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কে যেসব বই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে রবার্ট অ্যান্টেলমির বই কোথায় আলাদা সে কথাই লিখেছেন ওই লেখক। অ্যান্টেলমির বইতে কোনো গা-হিম-করা অত্যাচারের বিবরণ ছিল না, সেখানে লড়াকু কোনো মানুষ নেই, একের পর এক বিবর্ণ কিছু দিনের কথা, যার ভিতরে কতগুলো মানুষ ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। মরে যাওয়ার আগে তাদের নিজস্ব পরিচিত মুখ হারিয়ে যাচ্ছে। তারা কেউ আর কাউকে চিনতে পারে না, সবাই একইরকম, শুধু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জেগে আছে এক অন্ধকার খিদের তাড়না। আমি বুঝতেও পারিনি, কিন্তু ওই শুরু, লেখাটা পড়বার পর থেকেই কী এক আতঙ্ক আমার ওপর চেপে বসল, কেন সেই আতঙ্ক আমি জানি না। আতঙ্ক যদি হয়ও, তার জন্য আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লেখার কথা কেন ভাবব? কোথা থেকে এল এই ভাবনা? অথচ আমি বুঝতে পারছি, গল্পটা না লিখলে আমার নিস্তার নেই।

সোমদেব তাই বেশ কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে। গল্পটা তাকে লিখতেই হবে, এটুকু সে জানে, কিন্তু কোথায়, কখন, কীভাবে গল্পটা শুরু হবে আমি তো জানি না। তরুলতা বিছানায়, সোমদেব সকালে বাজার করে, শিউলিদি বসে রান্না করে দিয়ে যায়, সোমদেব তরুলতাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তাকে খাইয়ে দেয়, এটা ওটা গল্প করে, দেখে তরুলতার হাত-পায়ের আঙুলগুলি আরও বেঁকে যাচ্ছে, রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, তরুলতা মাঝে-মাঝেই যন্ত্রণায় গোঙায়, সোমদেব তখন তরুলতার সামনে

থাকতে পারে না, সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে, সামনের পুকুরে একটা হাঁস কেমন জল কেটে এগিয়ে চলেছে, তরুলতাও একদিন ওই রকম হাঁটত। তরুলতা কতদিন তার অসুখের পরিণতির কথা বলেছে, সোমদেব হাসতো, এসব কিচ্ছু হবে না, তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছো। কিন্তু একবার তরুলতার জন্য ব্লাড টেস্ট করাতে গিয়ে সোমদেব দেখল, এই অসুখ মানুষকে কোন্ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। আঠারো-উনিশের এক তরুণীকে সে দেখেছিল ল্যাবরেটারিতে, জলপাইগুড়ি থেকে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। হাত-পায়ের আঙুল ফুলে বেঁকে গেছে, চেয়ারে বসার মতো ক্ষমতা নেই তার, মাথার চুলে জট, গায়ে নোংরা, তার দুচোখ দিয়ে বিরামহীন জল ঝরছে। তরুলতাও কি এমন হয়ে যাবে, হয়ে যেতে পারে? সোমদেব ভাবতেও পারেনি।

বিছানা নেওয়ার পর তরুলতা একদিন বলেছিল, 'তুমি আবার বিয়ে করো সোম। আমার কোনো আশা নেই। আমাদের সংসারে তো নতুন কেউ এলোও না।'

সোমদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল আমাদের জীবনটা সিনেমা নয় তরু। সিনেমায় ওসব হয়—'

'কিন্তু তুমি তো এখনও অনেক কিছু চাও। আমার সঙ্গে কতদিন এভাবে থাকবে।'

'যতদিন আমবা বাঁচব।'

'কেন?'

'কেন জানি না।'

'আমাকে ফেলতে হবে বলে?'

'হয়তো তাই। মানুষের জীবনে ফেলাটা অত সহজ নয তরু। কাউকে ফেলে দিতে হলে নিজের জীবনের অনেকটাও ফেলে দিতে হয়।'

তরুলতা হো-হো করে হেসে উঠেছিল। 'তুমি গল্প লিখলে পাবতে।'

'কেন?'

'এত সুন্দর কথা বলতে পারো তুমি।'

'সুন্দর কথা বলে গল্প লেখা যায় না তরু। গল্প একটা স্বপ্ন। অনেক আগে আমি গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে লেখকের জীবনকে মিলিয়ে দেখতাম। একেবারে মেলে না। গল্প আসলে একটা স্বপ্ন।'

'কার স্বপ্ন?'

তরুলতার বিছানার পাশে চুপচাপ বসে থাকে সোমদেব। সত্যিই কার স্বপ্ন? কাব স্বপ্ন তার ওপর ভর করেছে যে সে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লিখতে চায়? তরুলতা কতবার জিগ্যেস করেছে, তুমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছো কেন? সে কিছু বলতে পারেনি। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে একটা গল্প লিখতেই হবে তাকে, এ কথা তরুলতাকে বলা যায় না। তরুলতাই বা বিশ্বাস কববে কেন? সে তো আর লেখক নয়।

'নির্বাণ, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?' কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাতে ধবাতে বলে সোমদেব।

অফিসে টেলিফোন করে সে নির্বাণকে ডেকে নিয়ে এসেছে। নির্বাণ ইতিমধ্যেই তিন পেগ শেষ করে ফেলেছে। সোমদেব তার প্রথম পেগেই ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। এসব খেতে ইচ্ছে করে না তার। পেটে পড়লেই বাথরুমে যেতে ইচ্ছে করে। তবু নির্বাণের জন্যই সে একটি পেগ সাজিয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও সে নির্বাণকে কথাটা বলতে পারছে না।

'কী ব্যাপার বলুন তো সোমদা, আপনি এত হেজিটেড করছেন কেন? যে কোনো অসুবিধের কথা আপনি আমাকে বলতে পারেন।'

কিন্তু নির্বাণ যদি আমার কথা শুনলে হো-হো করে হেসে ওঠে? আপনি গল্প লিখবেন সোমদা? শেষে আপনিও? এমনটা তো বলতেই পারে নির্বাণ, কেননা প্রত্যেক মানুষের এক একটা পরিচয় কেমন করে যেন তৈরি হয়ে যায়, তারপর আর সেই পরিচয় থেকে কেউ তাকে বেরিয়ে আসতে দেয় না, মানুষটা নিজেও বেরিয়ে আসতে পারে না। আমার কত কথা শুনে তো কত লোক এমনভাবে হেসে উঠেছে, যেন ওই কথা আমি বলতে পারি না, আমার মুখে মানায় না। তরুলতাকে একদিন বলেছিলাম, জানো তোমার এই অসুস্থতা নিয়ে সংসার সাজিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে না। মনে হয়, এই ঘরদোর ছেড়েছুড়ে তোমাকে কাঁধে নিয়ে কোনো তীর্থের পথে পথে হেঁটে বেড়াই। তরুলতা শুনলে হেসে উঠেছিল। তুমি—তুমি ঘরদোর ছেড়ে যাবে? কতবার বলে বলে তোমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারিনি, অফিস আর বাড়ির মধ্যে ঘুরে ঘুরে কী যে আনন্দ পাও তুমি। সত্যিই তো, তরুলতাই বা কী করে বিশ্বাস করবে আমার ওই ইচ্ছের কথা? কিন্তু তরুলতা, আমি সত্যিই তোমাকে নিয়ে তীর্থের পথে যেতে চাই, তুমি আর ভালো হবে না জানি, সেইজন্যই এখন আমাদের পথে বেরিয়ে পড়ার সময়।

'সোমদা, আপনি কি বউদির ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?'

'না।'

'তাহলে?'

'নির্বাণ—' সোমদেব আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, 'নির্বাণ—লেখার জন্য কী দরকার হয় নির্বাণ?'

'লেখার জন্য?' সোমদেব দেখে, নির্বাণের চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। 'কী লেখার জন্য?'

'ধরো গল্প—গল্প লেখার জন্য।'

'গল্প' নির্বাণ হাসে, 'কেন সোমদা? আপনি গল্প লিখবেন নাকি?'

'না-মানে—' অপ্রস্তুতের হাসি সোমদেবের মুখে, 'মানে, যারা গল্প-উপন্যাস লেখে, তাদের তো অরিজিন্যালিটি থাকা দরকার—মানে ভেতরে একটা মৌলিক—

নির্বাণ এবার সত্যিই হো-হো করে হেসে উঠে। 'অরিজিন্যালিটি?' সেটা কী সোমদা, আপনি জানেন?

'না মানে—'

'ওসব কথা বড়ো বড়ো লোকরা বলে সোমদা। আপনার আমার জন্য নয়। এত হাজার বছরের সভ্যতায় কোনটা অরিজিন্যাল আর কোনটা নকল, তা আমরা বুঝবো

কী করে বলুন। ওসব পণ্ডিতদের ব্যাপার আমরা লিখে আনন্দ পাই।' ঘোরলাগা চোখে দুলতে দুলতে কথা বলে যায় নির্বাণ। 'এছাড়া আপনার আর কিছু দরকার আছে সোমদা? আপনি অরিজিন্যালিটি ধুয়ে জল খাবেন। বাঁকুড়ার জমি কেমন, তা নিয়ে কুড়ি পাতা পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখার নাম যদি অরিজিন্যালিটি হয়, তাহলে সেই অরিজিন্যালিটিতে শিল্পীর কোনো প্রয়োজন নেই। ওটা আমিনের অরিজিন্যালিটি—হাঃ হাঃ—সোমদা, মাইরি, আপনি আমাকে মাল খাওয়াতে নিয়ে এসে পঞ্চায়েত প্রধানের অরিজিন্যালিটির কথা বলছেন!'

'না শোনো নির্বাণ—'

'কী শুনবো, কী? আপনার এইসব ছেঁদো কথা। এইজন্য আমাকে ডাকলেন? শুনুন সোমদা—'

সোমদেব নির্বাণের হাত চেপে ধরে। 'নির্বাণ, আমি এত কিছু জানি না, আমার বই পড়তে ভালো লাগে, নিজের খেয়ালে যা খুশি তাই পড়ি, আমি শিল্পসাহিত্যের ঘাতঘোঁত বুঝি না, নির্বাণ—'

'তাহলে?'

'আমার একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে।' সোমদেব প্রায় ফিসফিস করে বলে। 'কিন্তু নির্বাণ আমি তো জানি না, গল্প কিভাবে লেখে!'

'মার্ভেলাস!' নির্বাণ যেন লাফিয়ে ওঠে। 'এই তো চাই সোমদা।'

'তুমি ঠাট্টা করছো নির্বাণ?' সোমদেবের মুঠোর ভিতরে তার গ্লাসটা চেপে ধরে।

'না, সোমদা। আমরা যারা লিখি—আমাদের চারপাশের লেখকদের লেখা পড়তে পড়তে বোর হয়ে গেছি। কেউ নিজের কথা লেখে না সোমদা, সবাই অমরত্বের জন্য বড়ো বড়ো বিষয় ফেঁদে বসে আছে। একটা লোকও নিজের কথা লেখে না। আপনি লিখবেন, সোমদা।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনি তো লেখক নন। আপনার তো কোনো ছক নেই। আপনিই তো নিজের কথা বলতে পারবেন সোমদা। আমরা সব ছকবাজিতে আটকে গিয়েছি। শারদীয়ায় উপন্যাস লেখা রবিবারের পাতায় গল্প লেখা, তার ওপর সময় বুঝে কতরকম গল্প—ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনে গল্প, সংখ্যালঘুদের জন্য গল্প, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি ফাঁস করার গল্প—হাঃ হাঃ—বাংলা সাহিত্য এখন সাহিত্যের বাইরের নানা রকম দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। একমাত্র আপনিই লিখবেন নিজের কথা।'

'নির্বাণ, তুমি মজা করছো।'

'না সোমদা—'

'কিন্তু আমি তো গল্প লিখতে পারি না।'

'আপনি কখনো ওয়াকম্যান শুনেছেন সোমদা?'

'না।'

'ওয়াকম্যান কানে লাগিয়ে একদিন কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন। ধরুন বিসমিল্লা খান সানাইয়ে বসন্তবাহার বাজাচ্ছেন। সোমদা, কলকাতার ভিড়, জ্যাম, অতঅত মানুষেব

মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনার মনে হবে, চারিদিক থেকে জেগে উঠছে বসন্তবাহার, সোমদা আপনার এই চেনা শহরটা, দেখবেন, কীভাবে যেন বদলে গেছে, সব বাড়ি, রাস্তা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে বসন্তবাহারের সুর, গল্প তো এইরকম সোমদা, আপনার ভিতর থেকে একটা অন্য মানুষকে বের করে আনা।'

'আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লিখব নির্বাণ।'

'হ্যাঁ।' নির্বাণ হেসে ওঠে। 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনি মল্লিকার্জুন মনসুরের গলায় বিভাস বাজিয়ে দেবেন। তবেই না গল্প।

'আমি কিভাবে শুরু করব নির্বাণ?'

'যেভাবে আপনার জন্ম হয়েছিল। হাত-পা ছোড়াছুড়ি, কান্না—মল্লিকার্জুনের কণ্ঠে বিভাস—' নির্বাণের মাথা টেবিলে ঝুলে পড়ে, কথা নয়, শুধু একধরনের গোঙানি শোনা যেতে থাকে।

তরু, আমার এই গল্পটা তুমি শোনো, একমাত্র তুমি তরু, আমার সবকিছুই তো তুমি জানো, তরু তুমি শোনো, আমার এই গল্প আর কেউ বিশ্বাস করবে না, তরু আমি তোমার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি, তুমি চুপচাপ শুয়ে শোনো, আমার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গল্প।

আজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে। বার বছর বয়স অবধি বাবাকে দেখেছি আমি। কিন্তু ওই দেখাই মাত্র। সবসময় গুরুগম্ভীর বাবার কাছে ঘেঁষতে ভয় পেতাম আমি। আর এক এক দিন সন্ধেবেলা কোর্ট থেকে ফিরে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন বাবা। আমি কোনো কথা বলতাম না। চুপচাপ তাঁর হাত ধরে হাঁটতাম। বাবা অনেক কথা বলতেন, রাস্তা চেনাতেন, গাছ চেনাতেন, কিন্তু কী এক ভয়ে আমি কথা বলতে পারতাম না। একদিন কোর্ট থেকে ফিরে বুকের ব্যথা নিয়ে বাবা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ডাক্তার এসে শুধু জানাল, বাবা মারা গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার বেশ কিছু দিন পরে তাঁর ওকালতির বইয়ে ঠাসা ঘরে একটি বইয়ের ভিতরে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম উন্মুক্ত শরীর হেলেনের নাচের একটি ছবি। তরু, সেইদিন থেকে আমার শুধু মনে হতো, কেন বাবার সঙ্গে কথা বলিনি আমি? ওকালতির বইয়ের ভিতরে বাবা হেলেনের ছবি কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা আমি আর কোনোদিন জানতে পারবো না।

এতটা লিখে সোমদেব তার হাতের লেখায় ভরা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে থাকে। একে কি গল্প বলা যায়, তার নিজেরই সন্দেহ হয়। কলম বন্ধ করে সে চুপচাপ বসে থাকে। পাশের অন্ধকার ঘর থেকে ভেসে আসছে তরুলতার গোঙানি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুলতার যন্ত্রণাও বাড়ে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সোমদেব আর পারে না, সে পাশের ঘরে চলে আসে, বিছানা নয়, যেন সমুদ্রের বুকে একটি মৃতপ্রায় মাছের ওলোটপালোট, সে তরুলতার মাথায় হাত রাখে, অস্ফুটে ডাকে, 'তরু—'

'গল্প শুনবে তরু?'

'তুমি গল্প বলবে?' তরুলতার হাসিতে শরীরের যন্ত্রণা টের পায় সোমদেব।

'তরু, আমার তখন বয়স সতেরো কি আঠারো। পাশের বাড়ি থেকে একটি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে আমাদের বাড়িতে আসতো। ওর নাম টিঙ্কু। কবে থেকে যেন ওর

সঙ্গে এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম আমি। কী অদ্ভুত সেই যৌন সম্পর্ক। তরু, আমি কাউকে আজ পর্যন্ত বলতে পারিনি।'

'তুমি একটা বাচ্ছা ছেলের সঙ্গে—'

তরুলতা কথা শেষ না করে বালিশে মুখ গোঁজে।

'ওরও খুব ভালো লাগত তরু।'

'তুমি কখনও বলোনি আমাকে!'

সোমদেব চুপচাপ বসে থাকে, তার আঙুল তরুলতার চুলের গভীরে খেলা করে যায়। এসব কথা তো কাউকে বলা যায় না তরু। এমনকি যে-কাজ করার পর তোমার মনে হয়, এমনটা তো আমার করার কথা ছিল না, যে কাজ করার জন্য তুমি নিজের ভিতরে কেবলই দগ্ধ হচ্ছ, সে কথাও কাউকে বলা যায় না।

'তরু—'

'বলো।'

'আমি একটা গল্প লিখছি।'

'কাকে নিয়ে?'

'আমার গল্পটায় তেমন কোনো চরিত্র থাকছে না তরু। একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গল্প।'

'তুমি তো কখনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প দেখোনি।'

'তরু, আমি তোমাকে কত কথা বলিনি।'

'কী?'

'এক একদিন অফিসে সান্যাল সাহেবের কাছে কত ধমক শুনতে হয়। তরু, তুমি জানো না, সান্যাল সাহেব কিভাবে ঠান্ডামাথায় মানুষকে অপমান করতে পারে। তোমার এই অসুখের পর থেকে আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সান্যালসাহেব তো সব জানে তবু অপমান করতে ভোলেনা। তোমাকে আমি কতদিন এসে বলেছি। সান্যাল সাহেবের মুখের ওপর কেমন জবাব দিয়েছি, মুখ বুজে আমি লোকটার অপমান মেনে নিইনি।

'মেনে নেবে কেন?'

'কিন্তু তরু, আমি সত্যিই কোনো প্রতিবাদ করিনি। মুখ বুজে সান্যাল সাহেবের অপমান সহ্য করি। তুমি এসব জানো না। তোমাকে আমি বলিনি। সান্যাল সাহেবকে যেসব কথা আমি বলেছি, সবই তোমাকে বানিয়ে বলা তরু। ওসব কথা আমি কখনো বলতে পারিনি সান্যাল সাহেবকে।'

'তাহলে আমাকে বানিয়ে বলেছো কেন?' তরুর গলায় কান্নার কুয়াশা ছড়িয়ে যাওয়া টের পায় সোমদেব।

'তোমার চোখে ছোটো হয়ে যাওয়ার ভয়।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনো ছোটো করে দেখিনি সোম।'

'আমি জানি তরু। তবু সাজানো কথাগুলো যখন তোমাকে এসে বলেছি, তুমি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবতে, তাহলে আমিও পেরেছি, ঘাড় গুঁজে শুধু অপমান সহ্য করিনি।'

সোমদেব আবার লেখাটির সামনে এসে বসে, কালো অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর কী লিখব আমি? আমার মাথায় ভিড় করে আসছে নিজের জীবনের কত কথা। অথচ আমাকে তো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে গল্প লিখতে হবে। আমি কি কোনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বর্ণনা দিয়ে শুরু করব? তরু, কতদিন তোমাকে স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করতে পাবিনা। অনেকদিন থেকেই শরীরের বাসনা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। তোমার শরীব এমন এক পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল, যেখানে এইসব বাসনা-কামনার অর্থ নেই। আমার তবু ইচ্ছে হোতো। কতদিন তোমার উপর জোর করেছি, তুমি অনেক কষ্টে মেনে নিয়েছ। তারপর সেইটুকু ক্ষমতা তোমার রইল না। আমিও আর তোমার শরীরে আমার আকাঙ্খা ফুটে উঠতে দেখতাম না। দিনে দিনে রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি, হাত-পায়ের আঙুলগুলো ফুলে বেঁকে গেছে, শরীরের নানা জয়েন্ট ফুলে উঠেছে। অথচ এরই মধ্যে তুমি এক একদিন আমাকে কাছে পেতে চেয়েছো। কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারিনি। কেননা তোমার শরীরটা এখন শুধু এক আতঙ্ক, সেখানে আর কোনো ভাষা ফোটে না। বাজার করা, অফিস যাওয়া তোমার দেখাশোনা করা— এই এক বৃত্তাকার নিয়মের মধ্যে কেটে যাচ্ছে আমার জীবন। আগের মতো বই পড়তেও ইচ্ছে করে না আর। আমি একা বারান্দায় বসে থাকি, পাশের ঘর থেকে তোমার যন্ত্রণার গোঙানি ভেসে আসে। এখন আর তোমার পাশে গিয়েও বসতে পারি না। কেন পারি না তরু? তুমি ফুরিয়ে গেছ, ফুরিয়ে যাচ্ছো বলে? মাঝে মাঝে ভাবি তরু, তুমি কি আমার বোঝা হয়ে উঠছ? হয়তো তুমিই ঠিক বলেছো, আমার তো অনেক আকাঙ্খা আছে, কিন্তু তোমাকে ফেলতে পারছি না বলেই—

তরু, একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে কী যে করে ফেললাম। অনেকক্ষণ এক অদ্ভুত তাড়নায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, নিজের সঙ্গে কত লড়াই করলাম, তবু শেষ পর্যন্ত—। উত্তব কলকাতার একের পর এক গলি পেরিয়ে আমি মেয়েটার পিছুন পিছুন হাঁটছিলাম। তাবপর ও আমাকে নিয়ে গেল এক ভাঙাচোরা বাড়ির তিনতলার ঘুপচি ঘবে। টিম টিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। মেয়েটা আমাকে খাটের ওপর উঠিয়েই আমার প্যান্ট খুলে ফেলল। খাটের নিচেও যেন কারা ছিল। মেয়েটাই যা করবার করল, অথচ আমার শরীর যেন তখন পাথর, মেয়েটা এক সময় হা-হা করে হেসে বলে উঠল, এ তো কোনো সাড়াই নেই কো তোমার। তাহলে এলে কেন? ওঠো-ওঠো—টাকা বার করো—। খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে এল অন্য একটা মেয়ে আর একটা লোক। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটা আমার হাত থেকে টাকা নিয়েই প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আমাকে বার করে দিল। সেই তিনতলা বাড়ির ভাঙাচোরা, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল, আমি যেন কবরের ভিতরে শরীরের পচাগলা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছি।

'তরু—'

'বলো।'

'ঘুমিয়ে পড়ছো?'

'না।'

'যন্ত্রণা হচ্ছে?'

তরুলতা মৃদু হাসে। সোমদেবের কানে বেজে ওঠে, সেই কবে তরুলতা হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ত।

'তুমি কখনও পাপ করেছ তরু?'

'কী পাপ?'

'যে-কাজ তোমার করতে ইচ্ছে করে না, যে-কথায় তোমার মন সায় দেয় না।'

'তুমি করেছ?'

'পাপের কথা আমরা বলতে পারি না কেন তরু?'

'তুমি বলবে?'

'না।'

'লিখবে না?'

'আমি গল্প লিখতে পারবো না তরু। আমি গল্প লিখতে জানি না।'

'গল্প লিখতে হলে কী করতে হয়?'

'নির্বাণ বলেছিল, গল্প লেখা একটা জন্মের মতো। হাত-পা ছুঁড়ে বাচ্চার কান্না—মল্লিকার্জুনের গলায় বিভাস'—

'ঘুমিয়ে পড়ো।'

তরুলতা তার সাড়হীন, বাঁকা বাঁকা আঙুলে সোমদেবের মুখ আঁকড়ে ধরে। চেষ্টা করে বিছানা থেকে জেগে ওঠাব, কিন্তু পারে না। সোমদেব তাব মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনে। তরুলতার মুখ কেমন ফ্যাকাশে আর কঠিন। সেখানে আর অন্য কোনো ভাষা পড়া যায় না। সোমদেব ভাবল, আরো কত সাদা হতে হতে একদিন তরুলতাব মুখ হারিয়ে যাবে? আমার মুখও আর একদিন চেনা যাবে না। তাহলে কী থাকবে? শুধু এক আদিম খিদে তরু, আমরা বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম।

মানুষ যখন পাগল হয়

জয়ন্ত দে

'উফ! ওই দেখ আবার একটা!' চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে তুলে অনি যেন শিউরে ওঠে। কাপের চা টলে উঠলেও চলকায় না। অনি ঘাড় নিচু করে শাড়ি দেখে, না চা পড়েনি। টেবিলের উল্টো দিকে বসেছে তরুণ, কোলে জলের বোতল, টেবিলে টর্চ। তরুণ দেখে, মানুষ না এক মানুষ-মূর্তি।

সূর্যের আলোয় সোনালি রং লাগলেও এখনও রোদের বেশ তেজ। যদিও বসন্তকাল, সবে চৈত্রের শুরু, তবু যেন প্রকৃতি প্রখর গ্রীষ্ম। সকাল থেকেই হাওয়ায় আগুন। তবে এই সময়ের বিকেলবেলা বড় মনোরম। আর দিন-রাতের মাঝে বেশ অনেকটা সময়। এখন এদিকে লোকজন খুব কম। বেশিরভাগই স্থানীয় তার মধ্যে, টুরিস্ট প্রায় নেই বললেই চলে। বকখালিতে এখন অফ সিজন।

চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসেছিল অনি আর তরুণ। হোটেলের ঘরে তালা দিয়ে রাস্তায় এসে দেখল, না এখনও রোদের জ্বালা পোড়া কমেনি। ঘরে জানালার বাইরে সোনালি আলো দেখে অনি ভেবেছিল, রোদ মরে গেছে। কিন্তু রাস্তায় পা দিয়েই বুঝল, বিকেল নেমেছে অথচ রোদ মরেনি। তরুণ বলল, তবে এক কাপ চা খাওয়া যাক, বিকেল তো হয়েই গেছে; ততক্ষণে রোদের চড়া ভাবটা কেটে যাবে।' এখন তারা চা খেতে খেতে অপেক্ষা করছে রোদের শেষ তেজটুকু নিতে আসার। তারপরই লোনা হাওয়ায় ভেসে তারা সমুদ্রে যাবে।

অনির চোখে মুখে বিরক্তি, 'দেখছ কেমন হিংস্র চেহারা, যেন বেরলেই কামড়ে দেবে!' তরুণ চায়ের তলানিটুকু মুখে ঢেলে বিস্বাদে মুখ ভরে ফেলে। অনি দেখবে-না দেখবে-না করে শক্ত ঘাড় ঘুরিয়ে রাখে। কিন্তু তার চোখ তখন উলটানো বেঞ্চের পায়া, খাদ্যহীন দঙ্গল মাছির ফাঁকফোকর গলে জ্যামিতিক কোণ খোঁজে। 'কেমন দেখছে দেখ—যেন গিলে খাবে!'

অনির দৃষ্টিপথ ধরে তরুণ তাকায়। আগে যে তার চোখে পড়েনি তা নয়, তবু সে এবার অনির ডাকেই চোখ তুলে তাকাল। বেশ কিছুটা দূরে একজন মানুষ। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ঘন দাড়ির জঙ্গলে সারা মুখ ঢেকে। এলোমেলো চুল। ক্লান্ত নেতিয়ে থাকা শরীর। ধুলধুলে নোংরা ছেঁড়া প্যান্ট, লম্বা ঢোলা সোয়েটার টাইপের একটা গেঞ্জি গায়ে। মানুষটা অন্য এক বন্ধ দোকানের হেলে যাওয়া খুঁটি ধরে নির্বাক দাঁড়িয়ে। তরুণ দেখে ঠিক ওই মানুষটাকে ঢেকে বিকেলের সোনালি রঙটা আরও ঘন হয়ে আসে।

চায়ের দোকানে, ছেলেটি হাসে, 'ও খুব ভাল, শুধু লুইকে লুইকে দেকে আর ফুট করি পেলিয়ে যায়।'

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে দেখতে অনি ঘাড় শক্ত করে আর এখান থেকে পালিয়ে যেতে চায় তরুণ। হোটেলের আধ ফেলা ঝাঁপ, উলটানো বেঞ্চের সার সার পায়া, ছড়িয়ে বসা দু-একজন মানুষের ক্লান্ত ঘুম ঘুম শরীর—তাদের আড়ালে তরুণ মুখ গুঁজে আড়াল খোঁজে। কিন্তু তার চোখ বড় বিশ্বাসঘাতক—তন্ন তন্ন করে খোঁজে মানুষটার ভেতর মানুষটার খবর। ভেতর ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসে তরুণের, বলে, 'চলো অনি সমুদ্রের

দিকে যাই।' রোদের ভেতর নেমে পড়ে তারা। দু-পা হেঁটে তরুণ দেখে, তাদের শরীরে একফোঁটা সোনালি রং নেই। শুধু রোদ, শুধু রোদের জ্বালা পোড়া।

সরু পিচের রাস্তা এলোমেলো বালিতে ঢেকেছে। বালির সঙ্গে মিলেমিশে রংবেরঙা পলি প্যাক, কাগজের বাক্স-ঠোঙা, ভাঙা শামুকের খোলা, শুকনো ঝাউয়ের ডাল আর ছড়ানো ছিটানো ক্যাকটাসের ঝোপ। ঝোপ ভরে রয়েছে হলুদ ফুলে। পিছন ফিরে তরুণ দেখে, স্থির চোখে মানুষটা এখনও তাকিয়ে। তরুণ বালির ভেতর ক্রমশ ডুবে যাওয়া পায়ে শরীরের সমস্ত জোর জড়ো করে দ্রুত এগিয়ে যায়। বুকের মধ্যে শামুকের খোল ভাঙে।

অনিও পিছন ফিরে দেখে, স্ট্যাচুর মতো লোকটা দাঁড়িয়ে। চাওয়ার সঙ্গে উড়তে উড়তে বালির সঙ্গে মিশতে মিশতে অনি বলে, 'আচ্ছা, ওরা কি রেগে গেলে কামড়ে দেয়?' বালির ভেতর পলিপ্যাকে অনির চটি জড়িয়ে যায়। পা ছাড়াতে ছাড়াতে সে বলে, 'কামড়ালে কি ইঞ্জেকশন নিতে হয়? পেটে? চোদ্দখানা?'

তরুণের পায়ের তলায় হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য পৃথিবী। অনিব পায়েব ক্ষুব্ধ বালির ঢেউ। 'ভাল যদি না লাগে এলে কেন? সেই নামখানায় বাস থেকে নেমে থেকে দেখছি তোমার মুড অফ।'

তরুণ ভাবে, সত্যিই কি? তার আসার ইচ্ছে ছিল না ঠিকই কিন্তু অনির বায়না। পর পর চারদিন ছুটি, শুনে নেচে উঠেছিল অনি। তরুণ বলেছিল, 'মায়ের চিঠি এসেছে—শরীরটা নাকি খুব খারাপ। ভাবছি একবার দেশে যাব।'

অনি বলেছিল, 'না, এই তো ক'দিন আগেই মায়ের কাছ থেকে ঘুরে এলে, তারচে চলো দীঘা কিংবা বকখালি যাই।'

'এই গরমে। এখন বরং মায়ের কাছ থেকে ঘুরে আসি, ফিরে নয় এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে একটা হলিডে হোম বুক-টুক করে দার্জিলিং যাব।'

'হলিডে হোম বুক—ছুটি—ও অনেক দেরি। এখন ওই তিন-চার দিনের জন্য দীঘা কিংবা বকখালি চলো। দু দুটো বছর বিয়ে হতে চলল—তোমার সেই এক মানবাজার—বাড়ি ছাড়া কোথায় নিয়ে গেছে বলো?'

তরুণ হেসেছিল, তবু তো আমি বিয়ের আগে অনেক হিল্লি দিল্লি ঘুরেছি। কিন্তু আমার কথা ভাব, বাড়ির কাছে মুকুটমণিপুর তাই বার চারেক, একবার দীঘা আর এই চাকরি করতে কলকাতা—এ ছাড়া কোথায় গেছি আমি?'

'দীঘা গেছ, তবে বকখালি চলো। গরম তো কি হয়েছে? অফ সিজনে খাওয়া থাকার অনেক সুবিধে। ওই তো আগের সপ্তাহে মন্দিরারা ওইটুকু বাচ্চা নিয়ে ঘুরে এলো।

শেষমেশ বকখালি ঠিক হয়। বিয়ের পর এই প্রথম বেড়াতে যাওয়া—যে আনন্দ ওদের দুজনকে গ্রাস করে ফেলেছিল ক্রমে। তরুণ ভেবেছিল, উনি যখন বলছে এত করে...। সত্যিই তো বিয়ের পর ওকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়নি। মাকে বরং মাঝে নয় দু-একটা দিন ম্যানেজ করে দেখে আসা যাবে। তরুণ ভাবে এই পর্যন্ত তো ঠিকই ছিল, তবে?

নামখানায় বাস থেকে মাটিতে পা রাখতে গিয়ে আঁতকে উঠেছিল অনি। আপাদমস্তক ঘন নীল রং মেখে এক বদ্ধ উন্মাদ একেবারে পাদানি ঘেঁষে শুয়ে। সবাই তাকে ডিঙিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। সে নির্বিকার। হঠাৎ ঠিক তখনই তরুণের ভিতর এক নীল রঙের

মানুষের আবির্ভাব। মানুষটি ক্রমশ যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে। নীল হতে হতে মানুষটা আকাশে উধাও। সেই উধাও মানুষটাকেই তো খুঁজে চলেছে তরুণ। খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত, খুঁজতে খুঁজতে ভয় পেয়ে যায় তরুণ। অনিকে টানতে টানতে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢোকে। বলে, 'চলো যা হোক কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।' কিন্তু মিষ্টি মুখে তুলতেই গা গুলিয়ে ওঠে, চায়ের স্বাদ পানসে। জল খেতে খেতে গলা-বুক ভাসিয়ে অনি আবিষ্কার করে, ওই দেখ আর একটা, আর একটা।'

তরুণ তাকায়। এক জোড়া শূন্য চোখের দৃষ্টি তার দিকে ধেয়ে আসছে। সে শরীর মুচড়ে চোখ সরানোর চেষ্টা করে। কাছে, ভীষণ কাছে ঘোলা জলে পাক খেতে খেতে হাতানিয়া দোয়ানিয়া ছুটছে। অস্বচ্ছ কাদা-মাটি ঘোলা জল, নিশব্দে ভেতর ভেতর টান।

মানুষটা শূন্যে থুতু ছোঁড়ে, হাতছানি দিয়ে তরুণকে ডেকে হো হো হেসে ওঠে।

বিবক্তি অনির চোখে মুখে, 'কি রে বাবা শেষে কি পাগলের দেশে এসে পড়লাম।'

তরুণ দেখে, ঠিক তারই মতো দেখতে আর একটা মানুষ। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া ফর্সা রঙ, গালে এবড়ো খেবড়ো দাড়ি। ভাবে, সে যদি দাড়ি রাখত তবে কি এরকমই লাগত তাকে? তারও তো কোঁকড়ানো চুল, দাদার মতো না হলেও ফর্সা রঙ। দাদার সঙ্গে আরও ফারাক ছিল, এই দাড়ির। না হলে দুজনে প্রায় এক। তরুণ-অরুণ। অরুণ-তরুণ।

ছিপ ছিপ ঘোলা জল কেটে নৌকা চলে। অনি মৃদু টোকা দিয়ে তরুণকে ডাকে। তরুণ নদীর হাওয়ায় নৌকার ধাবে ঠেস দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওপারে চোখ রাখে। স্বস্তিতে দুচোখ জড়িয়ে আসে তার। অনি বলে, 'এখানে এত পাগল কেন?'

তরুণ ছিপ ছিপ শব্দেব সঙ্গে নিজের গলা মেশাতে মেশাতে বলে, 'হয়তো এখানে যা হোক কিছু খাবার-টাবার মেলে—সেই খাবারের লোভে লোভে।'

'ধুস, পাগল-ছাগল তাদের আবার খাওয়া, তাদের আবার লোভ। তরুণের কথা অনি নদীর হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়, একটু থেমে কেটে কেটে বলে, একটা টাকা ছুঁড়ে দিলে হত।'

তরুণ ভাবে মানুষটা কেন হেসে উঠল ওভাবে? মানুষটা কেন শূন্যে থুথু ছোঁড়ে? সবই তো নিজেব গায়েই আসে। কার ওপর ঘেন্না মানুষটার? তরুণ দেখে হাওয়ায় থুতু উড়ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো ধুলো থুতু! শীতের জীর্ণতা মুছিয়ে বসন্ত এল। কিন্তু তার সারা শবীরে এত ঘেন্না এত অপমান! বৈশাখ-কালবৈশাখী আসতে আর কত দেরি?

দুই

অনির নীলচে আকাশ রঙা শাড়িতে শুধু পাখি আর পাখি। এখন এই তুমুল হাওয়ায় পাখির দল ডানা মেলেছে। তাদের ভ্রমণ যেন কোন সুদূর থেকে। অনি বলে, 'আমি জানি তুমি কখনই আসতে চাওনি। এসেছ, আমার মন রাখতে। এখন এখানে এসে তার শোধ তুলছো।'

তরুণ হাসে, 'শোধ! তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ শোধ। এখানে এলেও তোমার মন পড়ে আছে পুরুলিয়ায়। তোমার মায়ের কাছে।' অনির শাড়ি নৌকার পালেব মতো পৃথিবীর যাবতীয় হাওয়া টানছে নিজেব কোলে।

তরুণ আবার হাসে, 'আমার মন আর আছে নাকি? সে তো কবেই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।' হু হু হাওয়া আসে সমুদ্র-গন্ধ। কিন্তু সমুদ্র? সে তো দূরে ভাঁটার টানে সরেছে।

অনি বলে, 'এতই যদি তবে আমাকে কালনায় মায়ের কাছে কিংবা শ্রীরামপুরে দিদির বাড়ি দিয়েই তুমি দেশে যেতে পারতে। তোমার ছুটিও কাটানো হত—দেশ ঘোরা, মাকে দেখা—সবই হত।'

'হ্যাঁ, সামনের হপ্তাতেই শনি-রবি ম্যানেজ করে যেভাবেই হোক একবার মাকে দেখে আসতে হবে।' সামনে সমুদ্র, খুব সামনে, এই ঝাউয়ের জঙ্গলের বাঁকেই—তরুণ দ্রুত পা চালায়।

'কি হয়েছে তোমার মায়ের?'

'চিঠি পড়োনি তুমি—? লিখেছে তো শরীর খারাপ—একবার আসতে।' সামনে উঁচু বালির পাহাড়। তরুণ বালির পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ খোঁজে।

'শরীর খারাপ না ছাই! দুই দিন ছাড়া ছাড়াই তো খবর পাঠাচ্ছে, লিখছে, শরীর খারাপ—একবার আসতে। এ সবই তোমার মায়ের অজুহাত, আমি বুঝি না!'

'কেন.আগেরবার তো বেশ শরীর খারাপ দেখে এলাম।'

'শরীর খারাপ তো কলকাতায় নিয়ে এলে না কেন? এখানে ভাল ডাক্তার হাসপাতাল, ঘরে বসে থাকলে তো আর অসুখ সারবে না। উনি তো স্বামী শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে নড়বেন না, তাহলে তুমি আর আমি কী করব? আসলে তোমার মায়ের মাথাটা গেছে।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এলোমেলো ছড়ানো ফণী মনসার কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চতুর্দিকে লকলক করে ওঠা কাঁটা। আর কাঁটার পাশে গলানো সোনার রঙে ফুল। তরুণ আঙুল বাঁচিয়ে ফুল ছেঁড়ে, নাড়েচাড়ে, হঠাৎ লক্ষ করে তার দু হাতে গলানো সোনা নয়, ধুলো ধুলো বালি রঙা কাঁটা। যা ফুলের পাপড়ির হলুদের আড়ালে অদৃশ্য ছিল। তরুণ বালির ওপর উবু হয়ে বসে হাত ঘষে।

ক্যাকটাসের ঝোপের আড়ালে উবু হওয়া তরুণ ঢেকে গেলে হঠাৎ অনির মনে হয়, সে একা। আশেপাশে কোথাও একজনও মানুষ নেই। শুধু ভয়ঙ্কর শূন্যে ঝাউয়েব দল। বিপজ্জনক হেলে দুলে সঙ্গী খুঁজছে। এক টুকরো মেঘও নেই তাদের মাথার কাছে। ঝোপের আড়াল ছেড়ে তরুণ আসে। বালি ঘষে ঘষে দু হাতের কাঁটা সরিয়েছে। তাকে দেখে অনি বলে, 'বাব্বা কি নির্জনতা গা ছম ছম করে!'

তারা আড়াল সরিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ে।

এদিকে সমুদ্র, দু চোখ জুড়ে জল, জল, লোনা জল। অনির পৃথিবীটা বড়, অনেক বড়, অসীম হয়ে যায়। ওদিকে ঝাউ দল। একমাথা ঝিরিঝিরি ডালপালা নিয়ে হাওয়ার সুরে গান ধরেছে।

অনি বলে, 'বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত। উনি যা করেন, কেন করেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তোমার চাকরি আছে—সংসার আছে, অথচ উনি এমন ভাবে খবর পাঠান, চিঠি পাঠান—শুনলেই ভয়ে হিম হয়ে যেতে হয়। অথচ গিয়ে দেখি উনি দিব্যি আছেন। শুধু শুধু কেন এই ডেকে পাঠানো? শুধু শুধু টাকা-শরীর-সময় ক্ষয় করে আমাদের ছুটে যাওয়া! বলো, এটা মাথা-খারাপ ছাড়া কিসের লক্ষণ?'

লোনা হাওয়া ঝাপটা মারে তরুণের চোখে মুখে। সামনে সমুদ্রের বুকে জেগে লম্বা ফিতের মতো চরা। আজ দুপুরে হোটেলে ভাত খাওয়ার সময় শুনেছিল বছর ছ-সাত আগের এক ঘূর্ণিঝড়ে এক বালির পাহাড় নাকি উড়ে গিয়ে ওই চরা জেগেছে।

হাওয়ায় ক্ষুব্ধ শাড়ি সামলাতে সামলাতে অনি বলে, 'আরও একটা ব্যাপার আমার ভাল লাগে না, কতবার ভেবেছি তোমাকে বলব, কিন্তু বলতে পারিনি।'

তরুণ দেখে হাওয়া কি ভাবে ঝড় হয়; সে ঝড়ের পিঠে চেপে এক বালির পাহাড় কি ভাবে উড়ে আসে তার দিকে। আকাশ কালো হয়ে সমুদ্রের জল ফুঁসে ওঠে। ঝাউয়ের মাথা ছন্দহীন হেলে দোলে।

অনি বলে, 'তোমাকে কারণে-অকারণে এত ডেকে পাঠায় কিন্তু তোমার মায়ের মুখে আমি কখনও তোমার নাম—তোমার কথা শুনি না। সব সময় অরু-অরু অরুণ। তোমার দাদার কথা। আজ তোমার দাদা বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন—তোমরা কেউই জানো না। অথচ তোমার মা কাছের ছেড়ে দূরেরটাকে বেশি জড়িয়ে ধরেছেন। যেন সে-ই তোমার মায়ের একমাত্র সন্তান—তুমি কেউ না। আমার মনে হয়, তোমাকে ডাকে—তোমার জন্য নয়, তোমার দাদার যদি কোনও খোঁজ পাও—যদি কোনও সন্ধান পাও সেই আশায়!' কান্নায় অনির গলা বুজে আসে।

তরুণ দেখে, বালির পাহাড়টা উড়তে উড়তে সমুদ্রের দিকে চলেছে। তার পিঠে ঝাউয়ের ডানা, সারা গায়ে ফণী মনসার হলুদ ফুলের পালক। চরার যন্ত্রণায় সমুদ্রের আর্তনাদ। তরুণের রক্তে জমাট সর পড়েছে। মাথার ভেতর চরা।

কলকাতায় পড়তে গিয়ে অরুণ ফিরল উন্মাদ হয়ে। একদিন ভোররাতে মা দেখল—দরজা খোলা, অরু নেই। চিকিৎসার মাঝ পথেই অরুণ উধাও হয়ে গেল। তরুণ খুঁজেছিল অনেক। থানা হাসপাতাল মর্গ। রেডিও টিভি কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। যেখানে খবর পাচ্ছিল, সেখানেই দৌড়াচ্ছিল। —সবাই-ই দেখে আসছিল অরুণের মতো। অরুর মতো। মা উতলা, চর্তুদিকে কত কত অরু। তরুণ দৌড়ে এসে পিছন থেকে চমকে উঠছিল। বড় চেনা। দাদার মতো। কিন্তু সামনে আসতেই তারা দাদা নয়। তারা মানুষও নয়—মানুষের মতো।

অরুণ ফিরল না। ক্লান্ত তরুণ। শেষমেশ একদিন চাকরি জুটিয়ে কলকাতা। মা ছাড়তে চাইছিল না। কিন্তু কি করবে তরুণ গ্রামে থেকে। মা বলল, 'আমার একটাকে খেয়েছে—তোকে ছাড়ব না।' কাকা বলল, 'তা বললে হয়! তারচে বিয়ে দিয়ে জোড়ে পাঠাও—কিচ্ছুটি হবে না।' কাকা পাত্রী দেখল। কালনার মেয়ে। কাকা বলল, 'কি দরকার ওদের কাছে অরুর সব কথা বলা? মাথা-খারাপ শুনলে না-জানি বংশের দোষ দেখে। তবে যদি বলতেই হয়, বলা হোক—অরু নিরুদ্দেশ!'

তরুণের বিয়ে হয়ে গেল। তবু অন্তঃস্থলে তরুণ একা, বড় একা হয়ে গেল। তরুণ বলে, 'উঃ! কি ভয়ঙ্কর নির্জনতা!'

তিন

অনি বলে, 'উঃ! কি ভয়ঙ্কর নির্জনতা—দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

অনি যেন বালির চরায় ফেলে দেওয়া মীনের মতো ছটফট করে ওঠে। আজ সকালে

জোয়ারে দেখেছিল, বাগদা মীনের তল্লাশ করে ফেরা মানুষের অবহেলায় বালির চবায় অসংখ্য অন্য মীনের হত্যালীলা।

এখন সেই হত্যালীলার বধ্যভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যায় তারা। অনি বলে, 'সেই কখন থেকে হাঁটছি—একটাও মানুষের মুখ দেখলাম না এখনও।'

কেটে ফেলা ঝাউয়ের বালি-মাটি ক্ষয়া শিকড়ে অনির কথা আটকে যায়। শিকড়ের কঙ্কাল শূন্যতা নিয়ে উপড়ে। অনি বলে, 'এত নির্জনতা সহ্য করা যায় না। গা ছমছম করে।'

তরুণ দেখে রং বেরঙা পলি-প্যাক বালিতে ঢেকে যাওয়া শরীর নিয়ে খলবল করছে। তার শব্দে গা শিরশির করে ওঠে। অনি বলে, 'ওইখানে সমুদ্রের মাঝে তো একটা বাড়ি ছিল—বাড়িটা কোথায়?'

সন্ধ্যা নয়, যেন আকাশ ছুঁয়ে বিষাদ নেমে আসছে। ঝাউয়ের জঙ্গলও আলো পুরিয়ে ঘন বঙ ধরেছে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায় পরস্পরে, যেন মাথায় মাথা লেগে যাবে। তাদের গানেও করুণ সুরের ছোঁয়া।

ভাঁটার সমুদ্র বেশ দূরে সরে গেছে। ঢেউয়ের অলঙ্কার খুলে শান্ত সমাহিত তার রূপ। জল থেকে প.টে পাটে উঠে এসেছে কালো শক্ত বালির চডা। সে কালো রঙ গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে্ এখন এদিকের সোনালি বালিতেও।

তরুণ দেখে, সন্ধ্যা এসে ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে অনিব শাড়ির রঙ। জমিন থেকে সারি সারি পাখি উড়ে গিয়ে আকাশ-রঙা শাড়ি কালো হয়ে এল। তরুণেব না-ফেলা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতরই প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনি কথা বলছে না, তরুণ কথা বলছে না, একটানা সমুদ্রের গর্জন, ঝাউপাতার ফিস ফিস—নির্জন আরও নির্জন করে তুলছে চতুর্দিক। তবু মাপা-পায়ে তারা হেঁটে যায়। তাদের পায়ে পায়ে অসংখ্য কাঁকড়ার গর্ত খোঁজার হুড়োহুড়ি। এবড়ো খেবড়ো সি-বিচ জুড়ে টিপটিপ গর্ত। পায়ের শব্দে গর্তের ভেতর কাঁকড়াদের শরীর সেঁধানো। তরুণ ভাবে, প্রত্যেকের জন্যই কি আলাদা আলাদা গর্ত?

তরুণও যেন এক গর্তে ঢুকেছে, একেবারে আলাদা নিজস্ব একটি গর্তে তাকে একা একা ঠাঁই নিতে হল? তার পাশেই তো অনি হাওয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে—অথচ তরুণ তাকে এ গর্তের ভেতর ডাকতে পারল না। খুলে দিতে পারল না বুকের ভেতরটা। ফলে অনি অচেনা অজানা শব্দে একা একা দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে ঢুকে পড়ল অন্য কোনও অন্য কোথাও নিজস্ব গর্তে।

কিন্তু একা। বড় একা একা। শোঁ শোঁ হাওয়ায় লোনা গন্ধ। চোখ জুড়ে জল জল, পায়ের নীচে শুধু বালি বালি—অনি ভয় পায়। বুক কাঁপে। হুড়োহুড়ি কবে মাথার ভেতর সব মুখ সব স্মৃতি কালো কালো গর্তে ঢুকে পড়ে। অনি বলে, 'এত নির্জনতা সহ্য করা' যায় না। মনে হয় পৃথিবীতে শুধু আমরা একা?'

গুমড়ে ওঠে তরুণ, 'একা একা বাঁচা যায় না অনি।'

অনি বলে, 'আমার বুকটা কেমন ফাঁকা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই নির্জনতা আমার সব কিছু শুষে নিচ্ছে তরুণ।'

তরুণ বলে, 'আমরা একা, মানুষ বড় একা হয়ে পড়ছে পৃথিবীতে।'

অনি বলে, 'এখানে একা থাকলে—আমি পাগল হয়ে যাবো।

তরুণ ভাবে, মা বড় একা। বাবা তো সে-ই কবেই চলে গেছেন, দাদাও মায়ের শূন্য বুকে আজ শুধুই ছবি। আর তারা—সে, অনি দূরে। যেন থেকেও নেই। মা আজ বড় একা।

অনি বলে, 'একা মানুষ কি এই নির্জনতায় পাগল হয়ে যায়।'

তরুণ বলে, 'মানুষ যখন পাগল হয়—তখন বোধহয় সব আলো নিভে, সব মুখ মুছে, বুকের ভেতরটা এভাবে নির্জন হয়!'

অনি বলে, 'ওই মানুষগুলোর হয়তো সবাই আছে, সবই আছে। হয়তো মা বাবা ভাই বোন বন্ধু—তবু একা। মানুষগুলোর বুকের ভেতর মাথার ভেতর নির্জনতা নিয়ে আরও একা হয়ে এলো।'

তরুণ বলে, 'মানুষগুলো আর মানুষ নয়—পাগল হয়ে গেল!'

দিনের শেষ আলোটুকু চেটেপুটে মুছে অন্ধকার নেমে এল। দু-একটা দু-একটা করে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে তারার আলোকমালায়। ক্রমে হালকা আলোয় ভরে উঠছে চরাচর। সমুদ্রের শরীরে অবিরত ফসফরাসের ঝিলিক। উধাও বালির পাহাড়। ঝাউয়ের মাথা ডুবে অন্ধকার গর্তে।

গর্তে একা। তরুণ শোনে নিঃশব্দে কে হেঁটে যায় মাথার ভেতর। সে অন্ধকারে দু চোখ গুঁজে দেয়। ক্রমশ তার ফর্সা রঙ পুড়ে তামাটে, একমুখ এলোমেলো দাড়ি, কোঁকড়ানো চুলের কালো মুছে ধূসর আভা। আর রক্ত যেন শীতল হয়ে বরফ হয়ে আসে। মস্তিষ্কের পাকে পাকে শিরশির অন্ধকার। ক্লান্ত হাত গড়িয়ে পড়েছে দুদিকে, এতোল বেতোল পায়ে হেঁটে চলেছে সে। এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারের দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ায় তরুণ। যেন তরুণ নয়, তারই দাদা—অরুণ!

তরুণ আর পারে না, সে কি পাগল হয়ে যাবে। অন্ধকারের পাতলা সর ছিঁড়ে তরুণ বলে ওঠে, 'মা বড় একা অনি! মা বড় একা!' অনি ভাবে, একা মানুষ কি একা হওয়ার নির্জনতায় পাগল হয়ে যায়।

তরুণ বলে, 'এই নির্জনতায় মাকে একা ছেড়ে আমরা কোথায় যাব অনি—কত দূর যাব?'

হু হু তুমুল লোনা হাওয়ায় তরুণ বুকের দরজা হাট করে খুলে দেয়।

কান্নার দাগ

পুষ্পল মুখোপাধ্যায়

রোববারের সকাল। শীতকাল তখন। ক্যারামটাকে ক্লাবঘরের বাইরে রোদ্দুরে নিয়ে এসে, সেটা গেম বোর্ড ছিল, বেস হয়ে ঝুলছিল আমার আর দেবুর গেম পয়েন্ট, বাস ভাড়া সমেত ম্যাটিনির নিউ এম্পায়ার। স্ট্রাইকার রেডি, আঙুল শক্ত হয়ে গেছে, মারতে যাব, মানু এসে খবর দিল, কণাদি মারা গেছে....

ক্যারাম ট্যারাম নয়, কণাদি ছিল আমাদের থিয়েটারের বন্ধু। সিনেমা সিরিয়াল ওযান ওয়াল ঠাকুর দেখা মেলা ময়দান—আবল তাবল কুটকাচালি কিচ্ছু না। এমন কি এক সঙ্গে থিয়েটার দেখার বন্ধুত্বও কোনদিন হয়নি আমাদেব, এ্যাকাডেমিতে নাথবতী, কতদিন বলেছি, কণাদি যাবি? নন্দনে আকাশকুসুম,—চল দেখে আসি। কণাদি যায়নি। আমাদের কারও সঙ্গে যায়নি কণাদি। কিন্তু আমাদের আগে আগেই ওর দেখা হয়ে গেছে গালিলেওর জীবন, পিটার ব্রুকের মহাভারত, দশচক্রের নতুন প্রযোজনা।

কণাদি শুধু থিয়েটারের বন্ধু ছিল আমাদের। আমাদের পাড়ার নাটক, সখের থিয়েটার। কণাদি পাড়ার মেয়ে। নাটকের সখ। পুজোর সময় নাটক তো আমাদের হবেই হবে, প্রতিবার হত। বই বাছা চলছে ঢিমেতালে। কণাদি কী করে ঠিক জানতে পেরে যেত। হঠাৎ একদিন সন্ধে বেলা, হয়তো সন্ধে নয়, অল্প অল্প রাত্তিব তখন, বুকের কাছে ধরা একটা নাটকের বই, আর অবধারিত কয়েক ডাল কাশ ফুল নিয়ে কণাদি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ত আমাদের ক্লাব ঘরে। আর তখন আমাদের ক্যারাম তাস ফুটবল ক্রিকেট চাকরি পাওয়া আর না-পাওয়া, আমাদের সব আড্ডা—ঢিমেতালে বই বাছা, সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে গিয়ে তখন নাটক শুরু হয়ে যেত।

কণাদি ছিল আমাদের নাটকের মেয়ে, আমাদের শরৎকালীন বন্ধু। আমাদের এই আকাশ-দেখা-যায়-না পাড়ায়—কোত্থেকে যে কণাদি কাশফুল খুঁজে পেত—সে খবর কাশফুলই জানে। কাশের ডাল কোলের ওপর রেখে, দুলতে-দুলতে, একবারও ফাম্বেল না করে, বুকে করে আনা ফুললেন্থ্ পড়তে শুরু করত কণাদি। আর সেকেন্ড সিন আসতে না আসতেই কতবার আমরা থামিয়ে দিয়েছি কণাদিকে।

কেন দেব না? কণাদির আনা নাটকে খালি গাদাগুচ্ছের গান। গান আর গান। আমাদের পাড়ার নাটক, উচ্চারণে মাষ্টার সব, অধিকাংশ সুবতাল কানা। সেখানে কে গাইবে অত গান? কার অত গলা?

কণাদি রাগ করত না, কোলের ওপর কাশফুল দুলত কণাদির, বল, তোরা কী বেছেছিস বল?

আমাদের বাছা নাটকে গান থাকত না, কিন্তু কণাদির বরাব্বর গানে উইকনেস। গাইতে পারলে না হয় কথা ছিল, গলায় সুর ছিল না তেমন, তবু ওকে গান গাইতে হবে। যে কোনও পার্টেই কণাদি গান ঢুকিয়ে দিত, মারাত্মক দুর্বলতা ছিল গানের ওপর। ওইটুকু তো দুর্বলতা, আমরা কণাদির শরৎকালীন বন্ধুরা মেনে নিয়ে ছিলাম।

না মেনে উপায়ও ছিল না। রিহার্সালে কিংবা নাটকের দিন—কোনদিন জ্বর হয়নি কণাদির। নাটকের তিন দিন আগে এসে বলেনি কোনবার, সরি, আমি পারব না...। আমাদের পাড়ার নাটক, বরাবর অ্যাকট্রেসের টান, সেখানে কণাদির ওই উৎসাহ আমাদেরই কৃতার্থ করে গেছে। দু'কলি তো গান মাত্র, বলেছি, ঠিক আছে গা তুই গান গা কণাদি...।

এমন কি নরেশদা, এককালের গ্রুপ থিয়েটার করা ডিরেক্টার আমাদের কণাদি আড়ালে ডাকত খচনশিল বলে, টুক করতে খচে যেত, পারফেকশান পারফেকশান করে চেঁচাত পাড়ার থিয়েটারে, সেই নরেশদা অব্দি কণাদির গান নিয়ে কিচ্ছুটি বলেনি কোন বার। কোনদিন।

যেন দু'কলি ওই গানের জন্যেই নাটক করতে আসা কণাদির, সারাটা রিহার্সাল ঠাই বসে থাকা। মেকাপ শেষে আয়না না ছাড়া সেও যেন ওই দুকলি গানের জন্যেই।

আয়না দেখতে বড্ড ভালোবাসত কণাদি। ড্রেস মেকাপ হয়ে গেলে আয়না ছাড়া আর কোন বন্ধুই থাকত না তখন। তখন কণাদি আছে, কিন্তু নেই। নিজের ছায়ার সামনে বসে কাজল কিম্বা চুল ঠিক করতে করতে ডায়লগ নয়, পার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া দু'কলি গান নিয়ে গুণগুন করত শুধু।

চোখে অনবরত একটা ঘুম-ঘুম ভাব ছিল কণাদির, কেমন একটা আপাত-অলসতা। ঠিক চোখে না, চোখের পাতায়। সেইটে খুব মানাত কণাদিকে, ওই ঘুম ঘুম, ওই অলসতা সব সময় কাজলে ডুবিয়ে রাখত কণাদি।

কাজলও ডুবেছে কত দিন। ধেবড়ে গেছে। সেই সব কাজল ধ্যাবড়ানো দিনে এন্তার পাট ভুল হত কণাদির। আমাদের ডিরেক্টার—খচনশিল নরেশদা-শম্ভু মিত্রের গলা করে খচে যেত খুব। ডিসিপ্লিনের কথা তুলত আমাদের পাড়ার থিয়েটারে। তাই শুনেই বোধহয় কম্পোজিশানেও গোলমাল করে দিয়ে কণাদি হেসে উঠত তখন। রিহার্সাল প্রায় পন্ড হয়ে যেত। যদিও হাসত কণাদি তবু ওর কোথাও হাসি থাকত না। ধেবড়ে যাওয়া কাজলে কণাদি ভেজলিন লাগাত হাসির। কণাদি কি জানত না কাজল সহজেই ওঠে, কিন্তু কান্নার দাগ—না-পোড়া নাভিকুন্ডলেও দগদগ করে। আর কেউ না-জানুক আমার বন্ধুরা, আমি জানতাম, ডুবে যাওয়া কাজলে কত ঝড়ঝাপটা ছিল কণাদির।

ঝড়ঝাপটার খবর দিত শিবুদা, কণাদির দূর সম্পর্কের দাদা। শিবুদার রাঙা-মূল রঙ, দেখতে জাপানিদের মতো। কণাদি কালো। চকচকে টানাটানা চোখ, চোখের সাদাটা এত সাদা মনে হত কথা বলা সাদা কাকাতুয়া। ওদের দেখলেই বোঝা যেত ওরা একমায়ের পেটের নয়। শিবুদার মা, মা-বাপ-মরা কণাদিকে মানুষ করেছিল। লেখা পড়া করায়নি। করালে কী দারুণ মাথা ছিল কণাদির, ফুললেন্থও পুরো মুখস্ত হয়ে যেত।

কণাদিকে কাঠি করত শিবুদার বউ, বেড়াল-বৌদি। বাচ্চা হয়নি, বেড়াল নিয়ে থাকে, দুরমুজ দুরমুজ গড়ন, বিষ ভাবত কণাদিকে। কণাদির ওপর বেড়াল-বৌদির অত্যাচার শুনে আমি বিজয়া করতে যাইনি একবার। একবার মুখের ওপর বলেই দিয়েছিলাম, বেড়াল আগে, না মানুষ আগে?

পরদিন শিবুদা এল উত্তেজিত হয়ে। উত্তেজিত হলে নিজের বউকে নিজেই শিবুদা

বেড়াল-বৌদি বলে। বলল, কাল অমন করে বললি কেন বেড়াল-বৌদিকে?

—কি বলেছি?

—ওই মানুষ আগে, না বেড়াল আগে।

—তাতে কী হয়েছে কী?

—কণাকে বেড়াল-বৌদি হেবি কেলিয়েছে। তোর জন্যে, তুই কেন বলতে গেলি ওসব? কণা কাল রাত থেকে না খেয়ে আছে। বেড়াল-বৌদি ভেবেছে কণাই তোকে লাগিয়েছে কিছু, আমি যে বলেছি ভাবতেও পারেনি।

—তা'লে আমি বলে দিয়ে আসি; কণাদি নয়, তুমিই বলেছ।

—তুই আমাকে ফাঁসাতে চাস নাড়ু?

—ফাঁসাবার কী হয়েছে, আবার যদি মারে?

—তবে তাই যা। বলে ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলল শিবুদা।

শিবুদার ছিল কাঁদা-রোগ। ক্লাবের সিনিয়ার দাদারা দশমীর রাত্তিরে শিবুদা ছাড়া মদ খেত না। মদ খেলে শিবুদা নাকি সন্ধ্যারাণীর মতো কাঁদে।

মদ না খেয়েও কাঁদত শিবুদা। ক্যারামে টোয়েন্টি নাইনে হেরেও কাঁদত। আমাদের নাটক দেখেও কতবার কেঁদে ভাসিয়েছে। তাই শিবুদা কাঁদলে আমরা হাসতে হাসতে পাঁচ মিনিট সময় দিতাম ওকে।

সেদিন পাঁচ মিনিটেও থামল না। আমি বললাম, যাও বাড়ি যাও, গিয়ে জোড় করে খাওয়াও কণাদিকে।

—ওর একটা বিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম রে নাড়ু, মেয়েটাও বেঁচে যেত...। সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদে ছিল শিবুদা। শিবুদার কান্না শুনে পার্কের দারোয়ান এসে হেসে গিয়েছিল।

আমাদের শখের থিয়েটার। পাড়ার নাটক। সব কিছু লাউড লাউড। কেউ কেউ স্টেজে গিয়ে ডিরেক্টার ভুলে নিজের মতোন করে আসে। খচনশিল নরেশদা হেবি খচে যায়, এই শেষ আর আসব না। বলে দমাদ্দম সিগারেট টানে। ফের আসে পরের বছর। ...ফাস্ট রোয়ে মহুয়াকে দেখে পাট ভুলে যায় সোমনাথ। রথি, আমাদের হিরো, অমিতাভ বচ্চনের মতো গলা, পাগলের পাট করে চিঠি পায় গৌতমের বোনের। হিরণ্য গ্রুপ থিয়েটারে চলে যায়। ...আমাদের এই সব ভুলে যাওয়া, চিঠি পাওয়া—অনেক দিন ভুলতে পারি না আমরা। গল্প হয়। হাসাহাসি হয়।

হয়তো হয়, এ সবের মধ্যে কণাদি থাকে না। ক্লাবের কোথাও কাশফুল থাকে না তখন।

সেটা কাশের সময় নয়। জানুয়ারি মাস। নাটক রিহার্সাল আড্ডা—সব ভুলে গেছি। ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দেব, গাধার মতো খাটছি দিন-রাত।

এইরকম এক রাতে শিবুদা এসে ডাকল আমায়।

পার্কের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে শিবুদা কাঁদছিল। কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া পার্কের আলো, পবিত্রর বোন, পরিমলের বৌদি—কাউকে মানছিল না শিবুদা।

আমি ধমকে উঠেছি, কী হচ্ছে কী? এরকম সিন করছ কেন?

শিবুদা কান্না থামিয়ে ফুঁপিয়েছে, কণা আজ বেড়াল-বৌদির কী একটু তেল নাকি মাথায় দিয়েছিল, দুপুর বেলা কণা যখন ঘুমচ্ছিল, ওর অত বড়বড় চুল—খোবলা খোবলা করে কেটে নিয়েছে. এই নাড়ু।

—বলো।

—এত দিন তোর কাছে কেঁদে-কেটে হালকা হয়েছি, আজ একটা কথা বলব, সিরিয়াসলি—

—না কেঁদে যা বলবে তাড়াতাড়ি বলো।

—তোর মাকে বলনা কণার জন্যে একটা পাত্র দেখে দিতে, এখানে থাকলে ও বাঁচবে না বেশিদিন।

—ঠিক আছে আমি মাকে বলব, তুমি চুপ করো।

অত সহজে শিবুদাকে কী চুপ করানো যায়? শিবুদা কাঁদছিল, পার্কের দারোয়ান এসে হেসে চলে গেল...

সেদিন রাত্তিরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেখি কণাদির কাটা চুল দিয়ে রক্ত পড়ছে, গলগল করে, ফিনকি দিয়ে, আর কে যেন কোথা থেকে চিৎকার করছে, এত রক্ত কেন! এত রক্ত কেন!

সকালেই মা কে বললাম। সব বললাম। এমন কি স্বপ্নটার কথাও।

মা শুনে বলল, চুল না হয় আবার হবে, কিন্তু লেখা পড়া? গায়ের রং?

—রঙ তো কী? কণাদি কী দেখতে খারাপ? কী দারুণ থিয়েটার করে।

—রাখ তো থিয়েটার, সিরিয়াল করলেও না-হয় বুঝতাম, লোককে বলা যেত। শিবুকে বল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে।

বিজ্ঞাপনের কথা বলে মা রান্না ঘরে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, হ্যাঁরে নাড়ু, তোর সিতুমামাকে একবার বললে হয়না?

সিতুমামা সোদপুরে থাকে। মায়ের মাসতুতো ভাই। ইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ায়। খুব বই পড়ে। সিতুমামার একঘর বই। যেন লাইব্রেরি। বিভূতিভূষণের পাশে মোটা মোটা ফিজিক্সের বই, বাঁধিয়ে রাখা সায়েন্স জার্নাল। সিতুমামার সর্বদা সায়েন্স-সায়েন্স।

রাঙাদিদা আর সিতুমামা—দু'জনের সংসার। দোতলা বাড়ির এক তলায় ভাড়াটে। ভাড়া দেওয়া দোকান ঘর। সচ্ছল অবস্থা ওদের। সিতুমামাকে দেখতে দারুণ। তবু এখনও বিয়ে করেনি সিতুমামা। করেনি, কেননা কোনও কোনও গ্রীষ্মকালে সিতুমামা পাগল হযে যায়। একবারে বদ্ধ উন্মাদ। তখন কাউকে আর চিনতে পারে না। 'নিউটন, নিউটন' করে পাড়া মাথায় করে। ছ'সাত দিন থাকে এরকম, তারপর নিউটন আপনিই নেমে যায় মাথা থেকে। ভালো হয়ে যায় সিতুমামা। নিজে থেকেই যায় ডাক্তারের কাছে, নিয়ম করে ওষুধ খায় নিজে থেকেই। কিন্তু গ্রীষ্ম তো ফুরিয়ে যায় না। আবার কোন কোন গ্রীষ্মে পাগল হয়ে যায় সিতুমামা। নিউটন নিউটন করে অন্যকেও পাগল করে ছাড়ে।

আমি ইয়ার্কি মেরেছি, সিতুমামা তুমি বরং দার্জিলিং এ সেটেল্ড কর যাও।

—কলেজস্ট্রীট কফি হাউস ছেড়ে দার্জিলিং কেন, মানস সরবরেও আমি থাকতে যাব না। খুব সিরিয়াসলি বলেছে সিতুমামা।

মা বলেছে, তা হোক একটু ছিটিয়াল, কণাও তো কালো।

—কালো বলে পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

—পড়াশোনাও তো তেমন করেনি।

—পাশ করলেই বুঝি শুধু পড়াশোনা হয়? কণাদি অনেক কিছু পড়ে। আমাদের লাইব্রেরির মেম্বার কণাদি।

—তা হোক, ওর পড়া মানে তো ওই নাটক নভেল, ওকে আবার পড়াশোনা বলে? আমি বলছি শোন, সিতু যদি রাজি হয় কণা বর্তে যাবে।

টেলিফোনে পাওয়া গেল না বলে, আমি নিজে গেলাম সোদপুর। সঙ্গে একটা ছবি কণাদির। নাটকের ছবি, মা বেছে দিল। সে ছবিতে কণাদির খোলা চুল, কপালে সিঁদুর, লাল পাড় সাদা শাড়ি। সঙ্গে একটা চিঠি, রাঙা দিদাকে লেখা। সিতুমামা ছিল না। ছবি দেখে রাঙা দিদা বলল, চোখ দুটি ভারি সুন্দর কথা বলছে। সিতুর অসুখের কথা মেয়েটা সব জানে?

তিনদিন পর সিতুমামা এল। এ সব কি কন্সপিরেসি দিদি? চক্রান্ত!

—বেশি চেঁচাস না, বয়েস কি বসে আছে? বিয়ে কর এবার।

—থাম দেখি, আজ ভালো তো কাল পাগল তার আবার বিয়ে।

—কিসের পাগল? ডাক্তার তো বলেছে সেরে যাবে।

—কলা যাবে। এতকাল সারল না।

—আচ্ছা ঠিক আছে, না হয় ধরে নিলাম সারল না; শোন সিতু, মেয়ে মানুষকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, তোর তো না হয় ছ'সাত দিনের অসুস্থতা, ও কণা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।

—মেয়েটা জানে, আমি পাগল হয়ে যাই?

—জানে। নাড়ু নাকি বলেছে।

—তাতেও রাজি?

—রাজি না হয়ে কি করবে, মা বাপ মরা মেয়ে।

—পাগল কে যে বিয়ে করতে চায়—সেও তো পাগল!

—বাজে বকিস না। রঙটাই কি সব? কি সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে, চোখ দুটো টানাটানা হরিণের মতো। তুই না করিস না সিতু, মেয়েটা খুব দুঃখিরে, আর বলতে নাই মাসি চোখ বুজলে তখন কে রেঁধে দেবে তোকে? ঘনঘন মুখেব সামনে চা ধরবে কে? আর এমনও তো হতে পারে সিতু, বিয়ের পর তুই ভালো হয়ে গেলি।

হা হা করে হাসল সিতুমামা, আমি কি বিয়ে পাগল নাকি? নানা, ওসব বিয়ে ফিয়ের মধ্যে আমি নেই।

এই বলে সিতুমামা কেটে পড়েছিল। কেটেই পড়েছিল সিতুমামা, না হলে ভাইফোঁটাতেও এল না সেবার।

শিবুদাই কণাদিকে পার্লারে নিয়ে গিয়েছিল। এবড়ো খেবড়ো চুলে কণাদি বয়কাট করে ফিরে এল পাড়ায়।

সিতুমামা কিম্বা শিবুদা—কেউই আর আসেনি, রাত্রিবেলা ডাকেনি আমাকে। আমারও তো সামনে পরীক্ষা, ব্যাঙ্কিং। অতসব মনে রাখলে চলে। দিন চলে গেল।...

হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা, শিবুদা অনেক দিন পর ডাকল আমাকে। এক্ষুনি চল, কণা কেমন করছে।

গিয়ে দেখি কণাদির কষ ভর্তি ফ্যানা। দাঁতে দাঁত তখনও লেগে আছে। কপালে উঠে গেছে চোখ।

হসপিটাল কণাদিকে ভর্তি করে নিল। পাম্প করে পেট থেকে বার করে আনল ন্যাপথলিন। পুলিশ কেস হল। দু'দিন পর জ্ঞান ফিরলে কণাদি বলল, দূর! আমি মত্তে মরতে যাব কেন?

আমি বলেছি, ন্যাকামি করো না, ন্যাপথলিন কি ল্যাবেনচুস নাকি? আর একটু দেরি হলেই ভোগে হয়ে যেতিস। মরবি যদি ন্যাপথলিন খেতে গেলি কেন? ঘরে এ্যাসিড ছিল না? কেরসিন তেল?

আমার রাগে কণাদি হেসেছে, সত্যিই আমি মরতে চাইনিরে নাড়ু, আমি মরে গেলে তোদের সঙ্গে নাটক করবে কে?

—তাহলে ন্যাপথলিন খেতে গিয়েছিলি কেন?

—ন্যাপথলিনে খুব ছোটবেলার গন্ধ আছে, আমি পাই। তুই ছোটবেলায় কোনদিন উনুনের মাটি খেয়েছিস নাড়ু? অনেক দিন পব বৃষ্টি হলে মাটি থেকে কিরকম সোঁদা গন্ধ বেরয়, খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করেনা? ন্যাপথলিনে সে রকম একটা গন্ধ পাই আমি, কতদিন ভাবি, খাব খাব, সেদিন সত্যি সত্যি খেয়েই ফেলেছিলাম।

পুলিশ বলল, পেশেন্টের মাথার গোলমাল।

সেদিন হঠাৎ দেখি কণাদি কাজল পরেছে। চোখের কথা বলা সাদা কাকাতুয়া কণাদির কথা বলতে লেগেছে আবাব। হাসপাতালে কোথায় যে কণাদি কাজল পেয়েছিল—সে খবর কাশফুল জানে।

ভালো হয়ে গেছিল কণাদি। তারপর কি হল হঠাৎ হাসপাতালে কি অনেক অনেক ন্যাপথলিন ছিল? সোঁদা গন্ধ মাটির মতন কণাদি সব খেয়ে ফেলেছে নাকি? মরতে য়। তবু মবে গেছে।

আমি মানুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কখন? কখন মারা গেছে?

মানু বলল, ওসব জানি না। শুধু কাঁদছে শিবুদাবা।

শিবুদার বাড়িতে বেশ ভিড়। শিবুদা কাঁদছে। বেড়াল-বৌদি কাঁদছে। ...কণা আর টিক করবে না...বেড়াল গুলো ছড়িয়ে ছিটিযে...আজ যে কণাব ছুটি হওয়ার কথা ল.. একটা বেড়াল কোলে উঠে পডল বেড়াল বৌদির. ওরে, কণা একবারে ছুটি নিয়ে ল...বেড়ালটাকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে বেড়াল-বৌদি মাথা ঠুকল দেয়ালে...

সবাই মিলে শোক কবলে সৎকার হয় না। আমরা কণাদির শরৎকালিন থিয়েটারের কুরা শক্ত হলাম।

হাসপাতাল যাচ্ছিলাম। ট্যাক্সিতেও কাঁদছিল শিবুদা। আমাদেরও কেউ কেউ কেঁদে ফেলছিল। চোখ মুছে আমি জিজ্ঞেস করেছি, হঠাৎ কি হল? ও শিবুদা, কখন সব হল?

—জানি না।

—সকালেই? নাকি রাত্তিরে?

—জানি না।

—জান না মানে?

—ভদ্রলোক সময় কিছু বলেনি আমাকে।

—কোন ভদ্রলোক?

—জানি না। এসে খবরটা দিয়েই চলে গেল। শিবুদা কাঁদছিল। আর ট্যাক্সি শুদ্ধু আমরা সবাই লাফিয়ে উঠেছি, তারমানে? হাসপাতালের লোক?

—বলতে পারব না। এসে বলল, কণা মারা গেছে। বলেই চলে গেল। আমি ধমকে উঠেছি, যেন সত্যিই মরেনি কণাদি, কেউ ভুলভাল বলে শিবুদাদের খোরাক করে গেছে, এই জন্যেই লোকে তোমাকে সন্ধ্যারাণী বলে, কান্নার চান্স পেযেছ আব ভাসিযে দিয়েছ, তোমাকে হসপিটাল জানায়নি, তুমি নিজে দেখনি, কে উটকো লোক বলে গেল আর—

—উটকো হবে কেন? উটকো লোকে এ্যাড্রেস দেয়? পকেট হাতড়ে শিবুদা একটা কাগজ বার করে, এই দেখ।

কণাদি মারাই গিয়েছিল। হার্টফেল।

দাহটাহ হয়ে গেলে পর, কণাদিকে নয়, সেই লোকটাকে মনে পড়ে গেল। কণাদির মৃত্যুর খবর দিয়ে যে লোকটা শিবুদার হাতে ঠিকানা দিয়েছিল, যদি কিছু দরকাব হয়— এই বলে। আমার কোন দরকার ছিল না, তবু গেলাম।

গিয়ে দেখি, গ্রীষ্ম নয়, শীতকাল তখন, শীতকালে সেই প্রথম পাগল হয়েছে সিতুমামা, তারপর আর সারেনি কোনদিন...।

পাতারা জানে শুধু

সমীর চৌধুরী

ফোনটা যখন এসেছিল তখন আমি বাথরুমে। এক সপ্তা হয়ে গেল যদিও, এখনও যেন কান পাতলে রিং হওয়ার শব্দটা শুনতে পাই। মায়ের যা স্বভাব! কিছুতেই কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করে উঠতে পারে না। তাছাড়া, আমার তো মনে হয়, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসেও মা ঐ যন্ত্রটায় সরগর হয়ে উঠতে পারেনি। ঘরে থাকলে আমিই ফোন করি সবসময় আর মা এমন ভাবে চেয়ে থাকে, যেন ঐ যে যন্ত্রটা শুধুমাত্র দুঃসংবাদই বহন করে আনে। তারপর মা যখন দেখে খুব সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে আমি তানিয়া বা সর্বজিতের সঙ্গে কথা বলছি, মায়ের কুঁচকে যাওয়া ভ্রূ আর মুখের অস্বাভাবিক ভাঙাচোরা রেখাগুলো ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে।

চুড়িদারটা আগেই খুলে ফেলেছিলাম। ব্রেসিয়ার আর প্যান্ট পরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করছি, জল নিয়ে খেলা করছি, আবার মাঝে-মধ্যে শাওয়ার একদম কমিয়ে দিয়ে দেখে নিচ্ছি নিজেকে। তানিয়া বলে, ও স্নান-ঘরেও চুড়িদার খোলে না। আমার কিন্তু এটাই ভাল লাগে। নিজের নাক, কান, ঠোঁট চিবুক—আরো কিছু নিচে ব্রেসিয়ারের ফাঁক দিয়ে স্তনের আভাস—এসব দেখতে দেখতে নিজের উনিশ বছরের শরীরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। চোখ বন্ধ করে শাওয়ারের জোর বাড়িয়ে দিই—ঝরনার উতলধারা দু চোখ অন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপরে।

প্রতিদিন এই উতলধাবার নিচে সর্বজিতের কথা ভাবি। মাকে আর তানিয়ার কাছে—বলতে গেলে কোনো কথাই গোপন করি না তো। তাই সর্বজিতের কথাও বলেছি ওদের। মাত্র দু-দিন আমাদের বাড়িতে এসেছে সে। মায়ের সঙ্গে আলাপ করাতে আমিই একদিন নিয়ে এসেছিলাম, আর একবার আমার জ্বর হয়েছিল, এক সপ্তা বাড়ি থেকে বেরোইনি, কলেজে যাইনি—তখন সে দেখতে এসেছিল আমাকে। দু'দিনে খুব বেশি হলে আধঘণ্টা ছিল সে। মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল বড় জোর দশ মিনিট। ঐটুকু আলাপেই মা বলেছিল, তোব সর্বজিত খুব অ্যামবিশাস ছেলে কিন্তু।"

'তোর সর্বজিৎ' কথাটা কানে খট করে বিঁধেছিল। আমি অন্তত কখনও মা-কে এভাবে বলি না। মায়ের সুখ-দুঃখেব সঙ্গে বিশেষ করে বাবা চলে যাবার পর নিজেকে আমি এমনবাবে মিশিয়ে ফেলেছি যে, আমাব আলাদা করে প্রিয় কিছু থাকতে পারে--এটা আমাব মনেই হয় না। মা আমার বন্ধু শুধু নয়—সব থেকে কাছের, প্রিয় বন্ধু আমার।

মা-ও সেটা জানে বা মনে করে; তাই আমি কলেজে ঢোকার আগেই মায়ের জীবনেব অনেক সব গোপন সুখ-দুঃখেব কথা, যার সব কিছু হয়ত মা বাবাকেও বলেনি—অথবা হয়তো বলেছে, আমি জানি না—মা কিন্তু সেই সমস্ত কথাই আমাকে বলেছে। সেভাবেই মাযেব সঙ্গে জযন্তবাবুর সম্পর্কেব কথা জেনেছিলাম। এমন নয় যে বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কে কোনো ফাটল ছিল। না, তা নয়। বাপিকে মা সেভাবেই ভালবাসত—যেভাবে একটা কুমারী মেয়ে সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে তার নিজস্ব পুরুষটিকে। বাপিও মা-কে তার সর্বস্ব দিযেছিল। মাযের জীবন ছিল সেই অর্থে কানায কানায পূর্ণ। সুন্দব স্বাস্থ্যবান, মনোযোগী স্বামী, অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য; না, নিজের কথা বলব না, কিন্তু মেয়ে

হিসেবে বা সন্তান হিসেবে মা বা বাপিকে তো কখনই দুঃখ দিইনি। স্কুলের রেজাল্ট বরাবর ভাল করেছি; মায়ের কথামতো গান শিখেছি, খুব ভাল না গাইলেও, দু-একটা ফাংশনে গেয়েছি। মায়ের দিকে তাকিয়ে আমাব মনে হয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত মহিলা যা চাইতে পারেন, মা তার সবই পেযেছেন। তবু, কী এক দুর্বোধ্য কারণে এত বছর পরেও মায়ের মনের কোণে অন্য একজন বাসা বেঁধে আছে। জয়ন্ত কাকু। এই কাকুটাতো আমি দেখিনি কখনও। শুধুমাত্র মায়ের কাছে শুনে শুনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। কলেজ যাইনি। জানলার ধারে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম আর মাঝে মাঝে হিস্ট্রি বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটা অশ্বত্থগাছের পাতাকে দেখছিলাম। অনেকদিন রেখে দেওয়ার জন্য পাতার সবুজটুকু খসে গিয়ে তার শিরাময় চেহারাটা রয়ে গেছে। এত সামান্য জিনিস, কুড়িয়ে পাওয়া একটা পাতা! কিন্তু কী সুন্দর তার রূপ!

অনেক দিন ধরে রয়েছে পাতাটা। ভেবেছিলাম সর্বজিৎকে দেব। কিন্তু কেন কে জানে, কিছুতেই এটা সর্বজিৎকে দিতে পারিনি। সর্বজিৎ শুধু অ্যাম্বিশাস নয়, ওর মন অনেক বস্তু দিয়ে ভরা। বাড়ির অবস্থা ভাল। বাবা খুব বড় সরকারি অফিসার, মা স্কুল টিচার। দিদি বিয়ের পর কানাডায় চলে গেছে। এখানে সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ইচ্ছে করলে বাড়িতে বসেই সামান্য ড্রিঙ্ক করে নেয়। ওর বাপি আর মাম ওকে এখনও নাইট ক্লাবে যাওয়ার জন্যে পারমিশান দেয়নি বলে ওর মনে দুঃখ আছে। ওর বন্ধু তথাগত ওর চেয়ে অনেক বেশি টাকা হাতখরচা পায়—এ কথা সে এমনভবে বলেছে যে, আমার মনে হয়েছে, এটাও ওর একটা দুঃখের কারণ। ওর একমাত্র স্বপ্ন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে চলে যাওয়া। গান, সাহিত্য বা ছবি দেখার মধ্যে ও তেমন তৃপ্তি পায় না। সময় পেলেই চ্যাটিং করতে ছোটে সাইবার কাফেতে। আমাকে একটু ফাকায় পেলেই ইউরোপ-আমেরিকার অবাধ জীবন, ফ্রি সেক্স—এসব নিয়ে জ্ঞান দেয়। একটুও ভাল লাগে না আমার। অশ্বত্থগাছের একটু পুরনো, শুকিয়ে-যাওয়া শিরাময় পাতা ওর হাতে তুলে দেব আমি, আমার ভালবাসার স্মারক হিসেবে—একথা যতবারই ভেবেছি—ভেতর থেকে কে যেন বাধা দিয়েছে আমাকে।

তো, বৃষ্টির দিনে হিস্ট্রি বইয়ের মধ্যে যখন বসে বসে পাতাটা দেখছি, মা পিছন থেকে এসে দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গোপন সম্পত্তির মতো ওটাকে আড়াল করার জন্য বইটা বন্ধ করলেও, মা ঠিক দেখে ফেলেছিল। একটা বাচ্চা মেয়ের মতো—যেভাবে মা হাসে আর কী—সেভাবে হেসে উঠে বলল, 'বাঃ, তুইও রাখিস!'

'কি বলো তো?' অকারণেই, তখনও পাতাটা গোপন করতে চাইছি আমি।

মা বলল, 'আহা, আমি যেন দেখিনি। তুই কি ভাবিস তুই একাই নাকি—আমিও তো এভাবে অশ্বত্থের পাতা বইয়ের পাতার ফাঁকে রেখে দিতাম।' বলতে বলতে মা আমার পাশে বসে পড়ল।

বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকার পর মা বলল, 'জানিস, আমি এই অশ্বত্থের পাতা প্রথম কাকে উপহার দিয়েছিলাম?'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এক মুহূর্তে সেই মুখ অন্য এক বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাপি চলে গেছে দেড় বছর হল। দিল্লিতে অফিসের কাজে গিয়েছিল বাপি, সেখানে রাস্তায় কার অ্যাকসিডেন্টে—

অ্যাকসিডেন্টের খবরটা প্রথম ফোনের মাধ্যমেই এসেছিল। সেই থেকেই সম্ভবত ফোন এলে মা কেমন ভয়-পাওয়া শিশুর মতো যন্ত্রটির দিকে চেয়ে থাকে।

যাই হোক, বাপি চলে যাবার পর, অন্তত ছ'মাস পর্যন্ত মায়ের যে রূপ আমি দেখেছি—কখনই ভুলব না তা। যেন ধারালো ছুরি দিয়ে কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছে। রাতের পর রাত মা ঘুমোত না। এমনকী প্রথম প্রথম ঘুমের ওষুধও, মা-কে ঘুম পাড়াতে পারে নি। অথচ এখন, এই মুহূর্তে অশ্বত্থ গাছের পুরনো, শিরাময় একটা পাতা মায়ের মুখে এমন এক আশ্চর্য আলো এনে দিল, যা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সেইদিন স্বপ্নের মতো একটা গল্প শুনিয়েছিল মা। কুড়ি-বাইশ বছর আগের ঘটনা সেসব। তার অধ্যাপক, বইপাগল, সাংসারিক জীবনে উদাসীন বাবার কাছে পড়তে আসত জয়ন্ত কাকু। অভাব, দারিদ্র্য আর নানা দুর্ভোগের আবরণে ঘেরা তার জীবন। বাবা ছিল না, ছিল বাতিকগ্রস্ত মা, স্বার্থপর শুধু এক ভাই আর বয়সে আট বছরের বড় এক দিদি—যার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানে; নিজের স্বামী আর সংসারের বাইরে মা যেন অন্য কিছু জানত না। ফলে সেই বাতিকগ্রস্ত, খিটখিটে মা-কে জয়ন্তকাকু ছাড়া দেখার কেউই ছিল না। বাবা একটা পয়সাও রেখে যায়নি। ভাইটা কম বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কীসব ব্যবসা-ট্যাবসা করত ঠিকই,—কিন্তু ঘরে কিছু দিত না। জয়ন্তবাবুকে টিউশানি করে পড়ার খরচ তো তুলতেই হত—সংসারেও টাকা দিতে হত। এই মানুষটাকে ভালবেসেছিল মা।

'কিন্তু তোমরা বিয়ে করলে না কেন?' আমার এই প্রশ্নে মুহূর্তে মায়ের মুখের রঙ বদল হয়েছিল। আঠারো বছরেও মেয়ের মতো মায়ের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। মা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বেশি পাকা-পাকা কথা না-বলে এবার পড়তে বোসো। আজ বিকেলে স্যারের কাছে পড়তে যেতে হবে মনে রেখো—তখন মুড অফ বললে শুনব না কিন্তু।" বলে আমাকে হতবাক করে দিয়ে মা উঠে পড়ল।

স্নান হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতেই মা একটা অবুঝ বালিকার মতো উচ্ছল খুশিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলল, 'বিদিশা, কার ফোন এসেছিল জানিস?'

'কার?' মায়ের খুশি দেখে আমিও একটু অবাক হলাম।

'সেই যে যাঁর কথা বলেছিলাম তোকে—তোর সেই জয়ন্তকাকুর।

জয়ন্তকাকু! বিস্ময়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

সেই বৃষ্টিভেজা দিনের পর মায়ের কাছে জয়ন্তকাকুর কিছু কিছু গল্প শুনেছি। কী রোমান্টিক সব ঘটনা! 'হাঁটতে হাঁটতে সারা কলকাতা চষে ফেলা, বৃষ্টিতে ভেজা, কত নম্বর একটা বাসে উঠে কোথায় গিয়ে যেন হারিয়ে যাওয়া! এইসব শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে কখন যেন একটা ছবি আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে। কিছুটা উদভ্রান্ত, এলোমেলো চুলের এক প্রেমিক পুরুষ। কেন কে জানে, নিজের অজান্তে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মা আমার মনের অবস্থা একটুও খেয়াল না করে বলল, 'রবিবার আমি আসতে বলে দিয়েছি—

'রবিবার! কি বলল?'

'আসবে বলেছে।' মা আগের মতোই উচ্ছল স্বরে বলল, 'এখন তো চেন্নাই থাকে। ওখানে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করে। ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছে। আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছে তোমার বাবার কথা শুনে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করেছিল—'

শেষদিকে মায়ের গলার স্বর একটু ভারি হয়ে এলেও, মায়ের মুখ থেকে সেই আশ্চর্য আলো হারিয়ে গেল না তাতে।

দুই

রবিবার সকাল থেকেই মায়েব ছুটোছুটি এমনভাবে বেড়ে গেল যে, চোখে না পড়ে উপায় নেই। কত সকালে মা উঠেছে, না-জিজ্ঞেস করেও বুঝতে পারছি, বেশ ভোর—ভোর বিছানা ছেড়েছে মা। কেননা, সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখলাম মায়ের চান হয়ে গেছে। সাড়ে সাতটায় অথবা তার একটু আগে রান্নার লোক কাজলদি আসে। সাড়ে নটায় আসে জোনাকি বলে একজন। জোনাকি ঘর মোছা, বাসন মাজা ছাড়াও কাপড কাচার কাজ করে। ঘব মোছা আব বাসন মাজার জন্য মাস মাইনে, কাপড়কাচাব জনা বালতি পিছু দশ টাকা দিতে হয়। বাতে আর আসে না জোনাকিদি। কাজলদি দু'বেলা আসে। সন্ধের সময় এসে মাকে চা দেয় প্রথমে, তারপর আমি ঘরে থাকলে যেদিন যেরকম আমার মুড থাকে, সেইমতো টিফিন তৈরি করে। আমি না থাকলে মা শুধু মুড়ি আর চা দিয়ে টিফিন করে। এরপর বাতেব খাবারেব জন্য দু-চাবখানা কটি সকালের মাছ—ডিম, বা মাংস, সবজি—কিছু না কিছু থাকেই—সেসব গবম-টবম করে রেখে চলে যায়। মোদ্দা কথা মাকে সংসারের টুকিটাকি দু'-একটা কাজ আর ব্যাঙ্কে যাওয়া-টাওয়া ছাড়া তেমন কিছু করতে হয় না। ফোন করলেই গ্যাস এসে যায়। এ পাড়ার একটা বেকার ছেলে ইলেকট্রিকের ও ফোনের বিল জমা দিয়ে আসে অনেকের সঙ্গে আমাদেরও। মাত্র কুড়ি টাকা দিতে হয় তাকে।

'এভাবে চললে তুমি কিন্তু মুটিয়ে যাবে, শুধু ফুড কন্ট্রোল করে হবে না। কিছু করো।' মাকে একদিন বলেছিলাম। জবাবে, মায়ের যা স্বভাব, বেশ আবেগ মেশানো স্বরে বলেছিল, 'সংসার করার সাধ আমার চলে গেছে। কিসের জন্যে কাজ কবব! তুই করবি, তোর আস্ত একটা জীবন পড়ে আছে। একটু থেমে যোগ করেছিল, ফের, 'আমি দেহে নয় রে, মনে বাঁচি। যাকে নিয়ে সংসার—'

বাকিটা আর বলেনি মা। তাঁর আগেই সরে গিয়েছিল।

এখন মা-কে, মায়ের ব্যস্ততাকে দেখতে দেখতে ভাবছি কথাগুলো। যেন বহুদিনেব শুকিয়ে যাওয়া একটা গাছে নতুন কবে পাতা গজাতে শুরু কবেছে।

কাজলদির জন্যে অপেক্ষা না কবে নিজেই চা বানিয়ে নিয়েছে। চায়ে চুমুক দিতে· দিতে এমনভাবে ঘরে ঢুকল যেন এখুনি ট্রেন ধরতে যাবে। তারপর আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কি হল, এখনও শুয়ে আছিস! ওঠ ওঠ—কত বেলা হয়ে গেল বলত। অত করে কাজলকে কাল বলে দিলুম একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য—সে-ও আজ দেরি করছে—'

এই সাত-সকালেই একটা দামি শাড়ি পরেছে। যতদূব মনে পরছে বছর চারেক আগে সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে গিয়ে বাবা এই শাড়িটা মা-কে কিনে দিয়েছিল। কপালে বহুদিন

পর আলতো একটা টিপও দেখছি—যেন উনিশ বছরের একটা মেয়ে! কথাগুলো বলেই আমার জবাবের অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মা। যাবার সময় বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে গেল।

দেখে আমার এত হাসি পেল যে কী বলব! উঠে বসে উত্তরের জানলাটা খুলে দিতেই রোদ ঝলমল আকাশ আর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হল মায়ের খুশিতে যেন পৃথিবী আর আকাশ হাসছে। সবকিছু কত সুন্দর! অথচ রোজ এমনটা মনে হয় না।

মায়ের বন্ধু কাবেরী বসুর ফোন এসেছিল একদিন। উনিই তো জয়ন্তকাকুকে ফোন নম্বর দিয়েছিলেন আমাদের। ওদের মধ্যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। তাছাড়া মা আর কাকুর সম্পর্কের কথাও জানতেন। তো, কাবেরী বসুই ফোন করে জয়ন্তকাকুর অসফল বিবাহিত জীবনের কথা বলেছেন মাকে। ডিভোর্স হয়নি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অথচ সম্পর্কও নেই তেমন। যেটুকু সম্পর্ক আছে তা শুধু টাকাপয়সার আর কুৎসিত ঝগড়াঝাটির। একমাত্র সন্তান, সেও থাকে বোর্ডিং-এ।

কথাগুলো আমার কাছে বলার সময় মায়ের মুখ-চোখ এমন অন্ধকারময় হয়ে উঠেছিল, যেমনটা দেখেছিলাম শুধু বাবা চলে যাবার পর। জীবনের তালগোল পাকানো নিয়তির বিরুদ্ধে একা, অসহায়!

ঘর ছেড়ে বাথরুমে ঢোকার আগেই রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়ল। কাজলদি এসে গেছে। মা তাকে বলছে কী কী রান্না করতে হবে। হ্যাঁ, মাছের কালিয়া ছাড়া মাংসও হবে! আর পোস্ত করবে, আলু পিঁয়াজ দিয়ে। ভীষণ ভালবাসে ও।

'কার কথা বলছেন বৌদি!' কাজলদির কৌতূহল।

মা সেকথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ডাল...হ্যাঁ, মুসুর ডালও তো ওর প্রিয় ছিল—'

কাজলদি মাকে বাধা দিয়ে বলল, 'জিনিস তো সবই আছে—কিছু কেনার নেই। বাজারও কাল করা আছে। কোথাও বেরোচ্ছেন নাকি?

'কেন বলো তো?' মায়ের স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি।

কাজলদি কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'না—আপনার হাতে ব্যাগটা দেখে বললাম।'

মা অপ্রস্তুত হযে দেখল, সত্যিই টাকা-পয়সার ব্যাগটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুটা বিভ্রান্তের মতো, বলল, 'ও, ভুল হয়ে গেছে! কেন যে ব্যাগটা বের করলাম!'

বলে কাজলদির অবাক চোখের সামনে দ্রুত রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মা।

বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল, আচ্ছা, এমন হয় না, কাকু ডিভোর্স পেয়ে গেল আর মায়ের সঙ্গে কাকুর—

না, আমাব অন্তত কোন আপত্তি থাকবে না, রেজিস্ট্রেশনে প্রথম সইটা আমারই থাকবে।

তিন

ন'টা বাজল, দশটা বাজল, এগারোটা বাজল। কাজলদি রান্না করে চলে গেছে। জোনাকিদিও চলে গেছে তার কাজ করে। তারপর সারা বাড়ি অকারণ ব্যস্ততায় ছুটে ছুটে মা যখন এটা হারিয়ে, সেটা ফেলে, কাবেরী বসুকে ফোন করে এবং তাকে ফোনে

না পেয়ে ক্লান্ত, তখনই, প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ কলিং বেলের আওয়াজ হল, আওয়াজটা পেয়েই মা অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে গেল। তারপর এমনভাবে আমারদিকে তাকাল যার অর্থ বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হল না।

আমারও বুকের ভেতরটা—কেন কে জানে— ধকবপকর করছে, তবু, যথাসম্ভব শান্তভাবে দরজা খুলতেই, কী আশ্চর্য, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। দু-দিনের না-কামানো দাড়ি, মাথার চুল কিছুটা এলোমেলো, পোশাকেও খুব ফিটফাট নয়—তেমন একজন দাঁড়িয়ে। আমার চিনে নিতে খুব অসুবিধে হল না জয়ন্তকাকুকে!

ড্রয়িংরুমে বেতের চেয়ারে কাকুকে বসতে দিয়ে আমি চেয়ে আছি দেখে কাকু হাসল। মায়ের কথাই ঠিক। পঞ্চাশ পেরনো মানুষটা হাসলে সত্যিই কেমন নিষ্পাপ দেখায়। কোনো আড়ষ্টতা নেই। এমনভাবে ঘরে ঢুকে বসল, হাসল আমার দিকে চেয়ে—যেন কত দিনের আলাপ! যেন কতবার এই ঘরে বসেছে!

পকেট থেকে কতগুলো চকোলেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমাব জন্যে! কাবেরীর কাছে তোমার কথা শুনেছি, কিন্তু ও এমনভাবে বলল--আসলে তুমি যে এত বড় হয়ে গেছ—আমি ঠিক বুঝিনি! জয়ন্ত কাকুর স্বরে সামান্য কুণ্ঠা প্রকাশ পেল। •

বললাম, 'তাতে কি হয়েছে। আপনি বসুন—আমি আসছি—'

বলেই দৌড়ে এসে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি মা আয়নায় নিজেকে দেখে নিচ্ছে। কত বছর পব দেখা হচ্ছে দুজনের? তা প্রায় বাইশ বছর পরে। বেশ বুঝতে পারছি, ভেতরে যে ঝড় বইছে মা তাকে শান্ত করে নিতে চাইছে।

'বসিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, পিছনে আমি।

বাইশ বছর পর দুজন নরনারী—যাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল—তাদের দেখা হলে, তিরিশ সেকেন্ড দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বোকার মতো হাসে, তাবপর জিজ্ঞেস করে 'ভাল আছো?' এখানে সেসবই হল, উপবন্তু মা দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল, 'এত দেরি হল?'

জয়ন্তকাকু একবার আমাকে দেখে নিয়ে মাযেব দিকে চেয়ে বলল, 'দুঃখিত! হয়ত আসাই হত না এবার। কাল ফিরে যাচ্ছি চেন্নাই। আজ সকালে ফোন এল—ছোট কাকার বড় ছেলে--আমার চেয়েও বয়েসে ছোট—হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মাবা গেছে। তেমন কিছু সম্পর্ক না থাকলেও—খবরটা যখন পেয়েছি তখন যেতেই হবে!

মুহূর্তে মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। এমনভাবে জয়ন্তকাকুব দিকে তাকাল মা, যেন তার ছোটকাকার ছেলের মৃত্যুর জন্য কাকুই দায়ি। বলল, 'আর ভাল লাগে না এসব শুনতে! শুধু মৃত্যু, অসুখ—'

কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতার পর মা বলল, 'কখনই তো সময়ে আসতে পারলে না আমার কাছে! সবসময় দেরি। যখন এলে, হাজারটা সমস্যা পেছনে নিয়ে! মায়ের গলায় চূড়ান্ত হতাশার সুর। আমি যে ঘরের মধ্যে আছি মা যেন সেকথা ভুলেই গেছে! জয়ন্তকাকু বেশ অস্বস্তিকর চাউনি মেলে আমাকে দেখে নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল।

মা চাপা ধমকের সুবে বলল, 'তা, কিছুক্ষণ অন্তত থাকবে তো? নাকি ধুলো পায়েই

ফিরে যাবে? খাওয়া-দাওয়াও তো করবে না—তাই না?

মায়ের এতগুলো প্রশ্নের উত্তবে কাকু শুধু বলল, 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আছি—'

'বেশ, শুনে খুশি হলুম! চলো, ভেতরে চলো—'

কাকুকে নিয়ে মা বাড়ির ভেতরে ঢুকল, আমি ড্রইং রুমেই বসে রইলাম। একটু নিভৃতি ওদের দরকার।

বসে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি। খুব বেশি হলেও পনের মিনিট। এর মধ্যে মায়ের চিৎকার ভেসে এল। মনে হল, মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে একেবারে।

আওয়াজটা আমার পড়ার ঘর থেকে ভেসে আসছিল। গিয়ে যা দেখলাম—তাতে মায়ের চিৎকার অস্বাভাবিক মনে হল না। মা কাকুকে বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে আমার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। আমাব পড়ার ঘব বাড়ির পেছনে। জানলা খুললে ওপাশের একটা বাড়ির কুয়োতলা পড়ে। কিছু আগাছার জঙ্গল। ওদিকের জানলাটা খোলা রাখলেই বেড়াল ঢোকে। রাতে কি কারণে খুলেছিলাম, বন্ধ করতে ভুলে গেছি। হুলোটা ঘড়ে ঢুকে কার্পেটেব ওপব পাযখানা কবে গেছে। কাকু ঘরে ঢুকে মোজা পায়ে সেই গু মারিযেছে। কার্পেটে তো বটেই, মেঝেতেও সেই গু লেগেছে। দুর্গন্ধে বমি আসার মতো অবস্থা!

কিন্তু যতই হোক, মায়ের লাফালাফিটা আমার একটুও ভাল লাগল না। প্রথমে মা চিৎকাব করে খানিকক্ষণ আমাকে বকে গেল জানলা খুলে বাখার জন্যে। তারপব কাকুকে মোজা খুলে ফেলে দিতে হল। সাবান দিয়ে হাত-পা ধুঁয়ে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসতে হল। প্যান্টে যদি গু লেগে থাকে, কাকুকে তাই শোবার ঘরেই ঢোকাল না আর। আমাব সাহায্যে প্রথমে কার্পেটটা গুটিয়ে ফেলল। কিন্তু মেঝেতে যে নাংরা লেগেছে। তার কি হবে।

বললাম, মা তুমি বরং কাকুর কাছে গিয়ে বোসো, আমি মেঝেটা ধুয়ে দিচ্ছি।'

মা চোখ পাকিয়ে বলল, 'খবরদার এদিকে আসবিনা। তুই ঘরে যা। উঃ ভগবান—কী যে কবি। এই গু শুকনো হযে যদি চারপাশে ছড়ায় নির্ঘাৎ জন্ডিস! এক্ষুণি ফোন করতে হবে—'

'কাকে ফোন করবে।' আমি তো অবাক।

'জোনাকি এখান থেকে বেবিয়ে যে বাড়িতে কাজে যায় তাদের ফোন নাম্বার আছে। ওকে ডাকি—যা চায দেব—ও গু আমি ঘাঁটতে পারব না।

মা ছুটল ফোন করতে আর আমি গিয়ে বস্‌লাম কাকুর কাছে। আমাকে দেখে কাকু লজ্জিত হাসল। বলল, 'তোমাদের বিপদে ফেলে দিলাম আমি।'

'তা কেন! আপনার পাযে লেগেছে, না হলে আমাব পায়ে লাগত।'

কাকু যেন আমাকে সান্ত্বনা দেবাব জন্যই বলল, 'ওর মধ্যে কিছু কিছু ছেলেমানুষি আছে—আগেও ছিল—'

অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু কিছু না বলে চেয়ে রইলাম কাকুব দিকে। বড় সুন্দর চোখ কাকুব। কী সুন্দর পুরুষালি চেহাবা! বুকের দিকে তাকালে মনে হয় ওখানে যেন একটা নাম না জানা সমুদ্র অথবা গভীব নির্জন একটা পাহাড়ি উপত্যকা লুকিয়ে আছে। কথাটা ভাবতেই আমাব শরীর কেমন শিরশিব করে উঠল। সর্বজিৎ, তথাগত বা আব আর কারা কারা সব আছে যেন—তাদেব চেয়ে কত আলাদা এই মানুষটা!

আমার লেখাপড়া নিয়ে কাকু কিছু প্রশ্ন করছিল। অন্যমনস্কভাবে তার জবাবে কিছু বলছি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হল, সামনে যে পুরুষ মানুষটা বসে আছে—এ জীবনে সে কিছুই পায়নি। কোনো নারীই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ একে দেয়নি।

কথাটা মনে হতেই বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল। ফোনে জোনাকিদিকে না পেয়ে কাকে যেন ডেকে আনতে গেছে মা, ঘর ধোয়ার জন্য। যাবার আগে কাকুকে চা মিষ্টি দিয়ে গেছে। আমি কাকুকে উঠে এলাম কিছুক্ষণের জন্য।

হিস্ট্রি বইটা নিয়ে ফিরে এলাম যখন, কাকুর চা শেষ। প্লেটে মিষ্টিগুলো পড়ে আছে দেখে বললাম, 'কি হল, ওগুলো খেলেন না যে!'

'খেয়েছি—আর না।' একটু থেমে কাকু বলল, 'এবার তো উঠতে হবে আমাকে। যেতে হবে—'

বাধা দিতে পারতাম। কিন্তু দেব না, মায়ের তো বাবা ছিল, এখনও আছে স্মৃতিব মধ্যে। তাছাড়া বাড়ি আছে, মেয়ে আছে, কার্পেট অপরিষ্কার হলে তাই নিয়ে চিন্তা আছে। কিন্তু আমার? আমার তো শুধু একটা শিরাময় গোপন পাতাই আছে।

সেই গোপন সম্পত্তি আমার জীবনের প্রথম পুরষের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'এটা—তোমার জন্য—'

কাকু অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আর আমি? কী বোকা মেয়ে দেখ, ওই সমুদ্রের মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পেরে এক ছুটে শোবার ঘরে পালিযে এসে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পরলাম। লোকে বলবে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি; কিন্তু আমি জানি, আমি আসলে গভীর আনন্দে হাসছি, অথবা—

জয়ী

বনজিৎ সবকাব

ডিস্ট্রৌবিযাব পেছনে ছোট্ট দিঘিটাব পাডে একবাব আসবেন? আজ ঠিক পাঁচটায়, আসবেন তো?

অনুবোধ মাখানো চিঠিটায কি ছিল জানি না। ব্যলকনিতে দোল চেযাবটায বসে দোল খাওযা ভুলে ভাবতে বসি, জযী কেন এ চিঠি লিখলো। কী বলবে ও? কী বলতে চায?

জযী এবাবে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। সাযেন্স গ্রুপটা দেখিযে দিই সপ্তাহে তিন দিন। পডাশোনায ভাল না হলেও সপ্রতিভ জযী বুদ্ধিমতী এবং যেটা একজন ছাত্র বা ছাত্রীব প্রযোজন তা হল ডিসিপ্লিন্‌ড হওযা। পডাশোনাব ব্যাপাবে বেশ সিবিযাস। যাব ফলে ওকে ভাল লাগতে বাধ্য যে কোন শিক্ষকেব।

জযী জানে, ডিসিপ্লিন্‌ড, ডেডিকেশান এবং ডিভোশান না থাকলে জয়ী হযে ওঠা মুশকিল। ঠিক এই তিনটে 'ডি'-কেই আমি জযীব ভেতব ঢুকিযে দিতে পেবেছি। পেবেছি বলেই জযী মাধ্যমিকে দাকণ বেজাল্ট কবেছিল। এবং আমাব আশা উচ্চ মাধ্যমিকেও ও ভাল ফল কববে।

কবজি উলটিযে সময দেখে নিযে ঘবে ঢুকে যাই। সময় আছে। তবুও যেন মনে হয় আজ বোধহয অন্যদিন। তাই প্যান্ট শার্টেব বদলে জানি না কেন লখনৌ চিকনেব কাজ কবা পাঞ্জাবি আব চোস্ত পাজামাটা পবে নিলাম। পবিপাটি কবে চুল আঁচডে ফবাসি পাবফিউম স্প্রে কবে যখন বেবলাম, মনটা আপনা থেকেই প্রফুল্ল হযে উঠেছে। ঠিক এ সময়ে বৌদিব সাথে দেখা হযে যাক মনে প্রাণে চাইছি না। হাজাব কাহন জবাব দিতে মোটেও ভাল লাগবে না এখন।

আমাব চোখেব সামনে জযী কিশোবী থেকে নাবী হযে উঠেছে, আমি দেখিনি। আজ দিঘিব পাডে বসে থাকা ওই আনত পান পাতা মুখ, পাতলা বক্তাভ ঠোঁট, বাঁশিব মত নাক মেযেটিই কি জযী? হাঁটুব ওপব চিবুক বেখে অনাবশ্যক নোখ খোঁটা, কিংবা দিঘিব পাডেব সাদা ঘাসফুলেব গাযে আলতো হাত বুলনো। লজ্জা বাঙা অকণ মুখে কথা নেই কোন।

আমি জযীকে দেখছি নিঃশ্চুপ সময বযে যায। আডচোখে জযী আমাকে একবাব দেখে নিযে পলকে চোখ নামায। অবোধ বোবা সে চাউনি। টেব পাই জযীব অস্বস্তি। বলি, কিছু বলছ না যে? তুমি কিন্তু ডেকেছিলে।

দু'হাতেব কবতলে মুখ ঢাকে জযী। চাপা অব্যক্ত শীৎকাবে পবিবেশটা অন্য এক আকর্ষক মাত্রা পায।

—তুমি পুকষ তুমি বোঝনি, বোঝ না? আমাকেই বলতে হবে। এভাবে আমাকে দিয়ে না বলা কথা বলিযে নেওযা তুমিই পাব জিষ্ণুদা।

ভীক বুকে আটকে যায যাবতীয কথা। ধডাস বুক থেকে উঠে আসে উডনচন্ডী

বেদুইন হাওয়া, নাড়িয়ে দেয় জয়ীর মাথা।

চাঁপা ফুলের কলীর মত আঙুল জয়ীর। সুচারু ভাবে কাটা ছুঁচলো নখ রাঙানো রক্তলাল পলাশে। জয়ী আমার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিলেও আমি আত্মবিস্মৃত হই না, কিন্তু অবধারিত ভাবে ঘায়েল হই।

যা বোঝার বুঝেছি। কোন মেয়ে যখন কোন পুরুষকে কোথাও দেখা করার জন্য ডাকে তখন বোধহয় এর আর অন্য কোন মানে থাকে না। জয়ীর চাওয়া আর আমার না চাওয়া তো এক হতে পারে না। তাই অনুচ্চারে বলি, ভালবাসি ভালবাসি।

—মুখ থেকে হাত সরাও। অনেকটা আদেশ দেবার ভঙ্গীতে বলি। জয়ী মুখ ঢেকেই রাখে। এবার ধমকে বলি, কী হল কথা কানে যায়নি?

জয়ী হাত সরায়। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় যেন বিষণ্ণ মুখটা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

—মুখ তোল, তাকাও আমার দিকে।

চোখ দুটো রুমালে মুছে, ফোৎ করে নাক টেনে জয়ী তাকায়। মেঘমেদুর চোখ আমাকে টলিয়ে দেয়। সমস্ত সংযম ভেঙ্গে পড়তে চায়। প্রাণপনে ধরে রাখি নিজেকে। তবুও গলার স্বরে অনিচ্ছাকৃত অনুরাগ মিশে যায়। তুমি কাঁদছিলে? জয়ী চোখ নামায়। ভীষণ বোকা বোকা লাগে ওকে। প্রেমে পড়লে ছেলেদের নাকি বোকা বোকা লাগে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও কি একই ব্যাপার ঘটে! হবেও-বা।

দুই

দুপুরের খাওয়া সেরে বিছানায় গড়ানোব অভ্যাস নেই। ঝুল বারান্দায় দোল চেয়ারে বসে প্রাকৃত অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখার খেলা খেলি। সিগারেট পোড়ে। আজও অভ্যাস বসে বসে আছি।

—এই যে মশাই, আসতে পারি?

—এস, কী ব্যাপার হে সখী—রবিবারের দুপুরে তোমাব কর্তাটি তোমায় ছেড়ে দিলেন যে বড়! পুরনো হয়ে গেলে নাকি?

—খুব ফাজিল হয়েছ।

—বল দেবী, নকল কর্তাটি তোমার জন্য কী করতে পাবে? কোমর জড়িয়ে ধবতেই রূপা বৌদি কপট রাগে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয। বলে, উঃ পারও বাবা। তোমরা দুটি ভাই-ই দেখছি বিচ্ছুর শিরমণি।

মোড়া টেনে নিয়ে বসে রূপা বৌদি। একটু গম্ভীর হওয়ার ভান কবে বলে, তোমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে?

—আমার অপরাধ?

—গুরুতর।

—মানে? দোল খাওযা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসি।

—তোমার লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেন্টস। অ্যাজ আ প্রবেশনারী অফিসার অব এস. বি আই। পোস্টেড এট নামচি, গ্যাংটক। স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস সাচ অ্যান্ড সাচ অ্যাজ ফলোস।

—গ্যাংটক?

—ইয়েস য়্যুর হাইনেস।

—প্লিজ বৌদি মজা করো না।

—মজা তো করছি না ভাই। বল, কী দেবে? দাঁড়াও আগে চিঠিটা দিই। ছেঁড়া খাম থেকে চিঠিটা পুনরায় বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরে, বলে, নাও।

—কোন দরকার নেই। আমি চাকরিটা করছি না বৌদি।

—কেন?

—তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ইল্লি! মিথ্যুক কোথাকার। জয়ী কে?

—জয়ী ়য়ী? মানে জয়ী!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়ী! ঠোঁট টিপে হাসে রূপা বৌদি।

—ওই যে গো...তুমি কালকের চিঠিটা খুলে পড়েছ নাকি?

—ও-মা, কপট বিস্ময়ে বৌদি বলে, তোমার চিঠি এসেছিল নাকি? এ কিন্তু ভারী অন্যায়। সেনসর বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া চিঠি তোমার কাছে যায় কী করে? দুলির মাকে দেখাচ্ছি মজা।

—ও বেচারিকে আবার ক্যান। সাত বাড়ি কাজ করে। অত কড়া নিয়ম ফলো করতে পারে?

—যাই বল ভাই, তোমাব চিঠির কথা জানি না তবে আজ সকালে একটা ফোন এসেছিল? নিরাশক্তভাবে বলি, কার?

—আহারে, নাম টিপে দিয়ে বৌদি বলে, জানে না যেন। কতদিন চলছে এসব অ্যাঁ? দাঁড়াও মাকে বলছি।

—প্লিজ বৌদি, ব্যাপারটা ঠিক এখনই যে কী, আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আসলে জয়ী ভীষণ ছেলে মানুষ বুঝলে। মনে হয় বিশেষ পাত্তা না দেওয়াই ভাল। একটু থেমে ফের বলি, কী বলছিল জয়ী?

—বলবো না। মিথ্যুক কোথাকার। লুকিয়ে চুরিয়ে জল খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আর আমার, সাথে অভিনয়?

—প্লিজ বৌদি, বিশ্বাস কর তেমন কিছু ঘটলে তোমাকে বলতামই। তোমাকে বলবো না তো কাকে বলবো বল?

—খুব হয়েছে।

ফোনটা এসেছিল ন-টা নাগাদ। তুমি ছিলে না। রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ফোনটা ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, জিষ্ণুদা আছেন? আমি বললাম, না। কিছু বলতে হবে? কেমন যেন হতাশ শোনাল মেয়েটির গলা। আবার বললাম কিছু বলতে হবে? ওপ্রান্ত থেকে মেয়েটি ফিস ফিস করে যেন বলল, না, শুধু বলবেন জয়ী ফোন করেছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বৌদির ঠেলা খেয়ে সম্বিত ফেরে। হাসি হাসি মুখ করে বৌদি বলে, নাঃ ভাবালে।

—মাধ্যমিক থেকে পড়াচ্ছি বুঝলে। খুব ভাল মেয়ে খুব—খুব।

—হুম!

তিন

আজ পড়ানোর কথা নয়। তবু সন্ধে আটটার দিকে না গিয়ে পারলাম না। কী যে হচ্ছে আমার গতকাল থেকে বোঝানো মুশকিল। অনেক কষ্টে গড়ে তোলা ব্যক্তিত্ব টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে জয়ী। কিছুতেই ধমকে দিতে পারি না। কলিং বেলে হাত ছোঁয়ানো মাত্রই জয়ী বারান্দায়। গেট খুলে ধরে, হাসি হাসি মুখে বলে, আসুন। ও যেন জানতই আমি আসবো। একটা কথাও না বলে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসি। পরিপাটি করে সাজানো টেবিল, গোছানো বই পত্তর। সামনে খাতা, খোলা নয় বন্ধ। তাতে কলম গুঁজে রেখে মার্ক করা। মনে হয় জয়ী লিখছিল একটু আগেও। জয়ী চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ায়। ওর শরীরের ঘ্রাণ পাই। ঘাড় ঘুরিয়ে বলি, পেছনে কেন, সামনে এসে বস। কালকে বিকেলের ঘটনাটা যেন আদও আমাদের জীবনে ঘটেনি এমনি ভেবে নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকি। অনাবশ্যক গম্ভীরতা বজায় রাখা বড় কষ্টের। তবুও বলি, বই নাও। নিজের মানুষটাকে এভাবে বলতে চাই না, তবুও বলতে হল।

—কী লিখছিলে? খাতা খুলে দেখি ইংরেজি। যদিও আমি ইংরেজি পড়াই না তবু দেখি। কারেকশন করে দিই। স্টার মার্ক দিয়ে কিছু কিছু লিখেও দিই। স্টার মার্ক দিতে দিতে ভীষণ বিরক্ত হই এ কি! যে মেয়ে আজ বাদে কাল পরীক্ষা দিতে যাবে তার এত ভুল কেন? সামনে বসা জয়ীর দিকে তাকাই। সে দৃষ্টিতে কী ছিল জানি না, জয়ী চোখ নামায়। অপরাধী অপরাধী মুখে বসে থাকে। কাঁচের চুড়ি ঘোরায়। খাতা দেখতে দেখতে মাথা না তুলে বলি, কার কাছে ইংরেজি পড?

ঢোক গিলে জয়ী বলে, নিজেই।

—কাল থেকে যে কদিন আছি প্রত্যেক দিন আসবো। ইংরেজিটাও পড়ে নেবে আমার কাছে বুঝেছ? জয়ী ঘাড় নাড়ে বাধ্য মেয়ের মত। আমার স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় ও যেন স্বস্তি পায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জিষ্ণুদা আমি একটু আসছি। জয়ী চলে যায়। সিগারেট ধরাই। এসট্রে খুঁজি। পাই না।

—জয়ী।

দূর থেকেই ও সাড়া দেয়, যাচ্ছি। ঘরে ঢোকে জয়ী। হাতে চায়ের কাপ।

—এসট্রেটা দাও তো।

চা-টা টেবিলে রেখে এসট্রেটা খুঁজে আনে ও। চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, বাড়িতে কেউ নেই নাকি?

—না। বাবা, মা, ভাই ওরা বিয়েতে গেছে।

—তুমি যাওনি কেন?

জয়ী কোন উত্তর করে না। চুপ করে থাকে।

—গতকাল আলোর প্রতিসরণের অংকগুলো করে রাখতে বলেছিলাম, করেছিলে?

—হুঁউ।

—বার কর। এসট্রেতে সিগেরেট গুঁজে দিই। ধোঁয়া ওঠে লতিয়ে। জয়ী খাতা বের করে এগিয়ে দেয়। খাতা দেখি। এলোমেলো লেখা। সুন্দর সাজানো গোটা গোটা লেখা ওর। অথচ আজ ওর হল কী! কাটাকাটি, নোংরা দায়সারা গোছের লেখা দেখে বিরক্তি আসে। তার ওপর সাধারণ ভুল। রাগে কলম ছুঁড়ে দিই খাতার ওপর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

—কাল থেকে আমি আর আসছি না। কোথায় থাকে মন? স্টুপিড! দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলি, তার ওপর ফাজিল হয়ে উঠেছ, ইম্‌পসিবল। ধমক খেয়ে জয়ীর চোখ ফেটে জল আসে। দ্রুত চলে আসে দরজায়। দুহাত আড়াল করে দাঁড়ায়। আর্তস্বরে বলে, যাবেন না, যাবেন না জিষ্ণুদা। আর হবে না, কক্ষনো হবে না, দেখবেন। ও হাত চে[illegible] [illegible]রে আমার। ওর ওই ভেজা চোখ, আকুতি, অস্ফুটে নড়ে ওঠা ঠোঁট, সমর্পণে সমর্পণে ভেসে যাওয়া ভীরু আবেদন আমাকে পাগল করে দিল। হুড়মুড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে আমার গাম্ভীর্য আর সংযমের বুলন দরওজা। বুকের কাছে ধরা পড়ে জয়ী। তৃষিত ঠোঁট নেমে আসে জয়ীর অধরোষ্ঠে। সাজানো দাঁতের পংক্তি পেরিয়ে তৃষ্ণা পৌঁছে যায় জয়ীর মুখ গহ্বরে। সিক্ত জিভের স্বাদ, জয়ী আমাকে পূর্ণ করে। তৃপ্ত করে! ভীরু ধরা পড়া পাখির মত ওর উষ্ণ কোমল বুক ভেদ করে উঠে আসা ধুক ধুক শব্দ আমাকে চার্জড করে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ জয়ী, সমর্পণে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া জয়ী কাঁপে।

আমি হেরে গেলাম। পঁচিশ বছরের এই আমি আঠারো ছোঁয়া এক চিলতে একটি মেয়ের কাছে হেরে গেলাম।

চেয়ারে বসে আরো একটা সিগরেট ধরাই। বুকের ভেতর এখনও বইছে তিরতিরে ঢেউ। সম্ভবতঃ বলা দরকার। তাই কথাগুলো সাজিয়ে নিই।

—জয়ী, তোমাকে বলা হয়নি। স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রুপে প্রবেশনারী অফিসারস্‌-এর পরীক্ষা দিয়েছিলাম জীবনদীপ ভবনে। ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। কাজে যোগ দিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দু'বছরের প্রবেশন পিরিয়ড শেষে পোস্টিং।

জয়ী তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। শূন্য দূরত্বে এসে ও আমার মাথার দু'পাশের চুল খাবলা দিয়ে ধরে। ওর দু'হাতের কাঁচের চুড়ির শীতল স্পর্শ পাই আমার দুই গালে। উচ্ছ্বাসে বলে, কী মজা, না? ও যেন ওর শিশুটিকে আদর করছে, ভঙ্গীটি এই রকম যা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

চার

এখানে আমি মুখোশ খুলে রাখি। উদার আকাশ আর এই এলায়িত তুষার শৃঙ্গের না জানা রহস্য আমাকে শিশু করে দেয়। কাজের শেষে ছুটির দিনে মগ্ন নির্জনতায় হাঁটি। শাল, পিয়াল, উইলো গাছের সারি পেরিয়ে, পাম আর বনঝাউয়ের দোলায় জয়ী জয়ী রব মুহূর্তে আমি উছল তরুণ। মুখের কাছে দুহাতের চেটোয় চোঙ বানিয়ে ডাকি জয়ী—জয়ী-ই-ই। আকাশ, বাতাস দূরের পাহাড় আমার সে ডাক ফিরিয়ে দেয়।

আমার কোয়ার্টারসের পাশ দিয়েই নেমে গেছে ছোট্ট একটা ঝর্ণা। সশব্দ উছল কণায় সারাদিন সারা রাত তার বয়ে যাওয়া। নীল-জল-যমুনায় জয়ীর চোখের স্বচ্ছতা। উপল

খণ্ডে বসে দু'হাত পেতে তাকে গ্রহণ করি সকাল সন্ধে। ঠোঁটের পরবাসে যেন পাই জয়ীর জিভের স্বাদ। শীতল সুবাস, গন্ধমাখা রেণু।

প্রায় প্রতিদিনই জয়ীর চিঠি পাই। নানান অনুযোগে অভিযোগে ভরা থাকে সেসব চিঠি। পাহাড়ি পথে সাবধানে চলাফেরার কথা, ঠান্ডা লেগে যাতে শরীর খারাপ না করে তার কথা। ঠিক সময়ে খাওয়া আর ঘুমনোর কথা। সর্বপরি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে জয়ী। কেন আমি চিঠির উত্তর দিই না। এই শেষ আর লিখবো না বলে শাসানো। আরো একজনের চিঠিতে পাই অন্য অভিযোগ। সখীকে তাহলে ভুলে গেলে? দুটি নারীর চারটি চোখ আমাকে সব সময় ঘিরে রাখে।

সময় কেটে যায়। ফায়ারপ্লেসে। গনগনে আগুনের দিকে চেয়ে মনে মনে বলি, জয়ী তুমি আমার কে? কে তুমি? জয়ীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার প্যাড টেনে নিই। প্যাডের ওপর হালকা সোনালী রঙে আঁকা নৃত্যরত নটরাজ। 'নাচ ময়ূরী নাচ রে। ঝুম ঝুমা ঝুম নাচ। ঐ এল আকাশ থেকে বরষা রাণীর সাজ রে।' পেখম মেলে ধরে আমার কলম।

জয়ী,

তোমার প্রতিটি চিঠিই পাই নতুন স্বাদে। তোমার অভিযোগের উত্তরে কী বলি বল তো? শুধু জেনে রাখ, ভালবাসা জানানোর জন্য চিঠি লেখার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় চিঠি লেখাটা একধরণের ফ্যাশান। যখন মনের সমস্ত ভাব ভাষা, ভালবাসা প্রকাশিত হয়ে যায় তারপরেও কী এমন গোপনীয় কথা থাকতে পারে যা চিঠির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হবে। এ এক ধরণের বিলাসিতা ছাড়া আর কিই-বা। ভাবতে ভাল লাগে, তোমার ভালবাসা পেয়েছি যা আমার ব্যক্তিগত গোপন সুরের মত, তবুও মনে হয় ভালবাসা এক দুর্বোদ্ধ খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রেমের শেষ পরিণতি পরিণয়ে এ কথা যেমন আমি বিশ্বাস করি না তেমনি আবার তোমাকে হারানোর কথা ভাবলে বুকেব সঙ্গোপনে খচখচ করে ওঠে কেন? এই মানসিকতার রকমফেরকে কী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? আদৌ যায় কি?

একেক সময় প্রেম নামক বস্তুটিকে খেলার খেলা মনে হয়। হয়তো রাগ করবে তবু জেনে রাখ কোন কোন সময়ে প্রেমের গুরুত্ব থাকে না, থাকে না দামও। চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান জলের তোড়ে খড়কুটোব মত কে কাব পাশে চলবে, কার সাথে কার যোগাযোগ ঘটবে ভেবে তো আশ্চর্য হওয়া যায় না। তাই প্রেম আমার কাছে এক নিষ্প্রাণ বৈচিত্রহীন আলাপন মনে হয়। যার মধ্যে বিশ্বের প্রসারতা নেই। শুধু সংকীর্ণ গন্ডির স্তূপ, অন্ধকারের গোলক ধাঁধাঁ। আবর্জনার মত সন্দেহের বিষ এসে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা। আমার এই মতবাদ একান্ত আমারই। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সাথে একমত নাও হতে পার। মনে রেখ জীবনটা সম্পাদ্য নয়, উপপাদ্য। যেখানে প্রমাণ করার ব্যাপার থাকেই, নয়? রাগ করলে? দুষ্টু কোথাকার! বাগ করো না। আসলে ভয় পাই। প্রেমের

একটা দায়িত্ব থাকেই, ঐ যে প্রমাণ করার কথাটা বললাম, এটা তাই। সারাজীবন তোমার ভালবাসা পাব তো? মনে হয় ব্যাপারটা একতরফা নয়। তুমি নিশ্চয়ই এ কথাটা মানবে।

প্রেমের মুক্তি কোথায় জান? প্রসারতায়, এ-কূল ছাপানো ও-কূল ছাপানো প্রেমের বন্যা ধরে রাখার জন্য তো প্রস্তুতি চাই, নয় কী?

চিঠি লিখি না বলে অভিযোগ করেছ। প্রেমকে বাঁধতে চাও সামান্য গন্ডির আওতায়? এভাবে কি সুখি হওয়া যায়? বোধহয় যায় না। অভিমান থেকেই জন্ম নেয় সংক্রামক সন্দেহ আর সেই সন্দেহই ডিনামাইট হয়ে ধ্বংস করে দেবে সুখের সংসার। তুমি বোঝ না, তুমি বোকা আর ছেলেমানুষ। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কি বলেছেন জান?

'দৈত্য দানো যা খুশি তাই/পারবে তুমি হতে/মানুষ হওয়ার অনেক তোমার বাকি।'

পাঁচ

আমার চলমান দিন অস্বস্তিতে ভরে যায়। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আমি। কোথায় যেন বেদনার ডমরু-ধ্বনি বেজে যায় একটানা। জয়ী কি রাগ করেছে? ও কেন চিঠি লিখছে না আর? আরও একটা কারণে বেশ টেনশানে আছি। জয়ীর রেজাল্ট বেরনোর মুখে। পরীক্ষার আগে কোচ করতে পারিনি। যদিও জানি রেজাল্ট ও ভাল করবেই তবুও না ভেবে যেন পারি না।

অবশেষে জয়ীর চিঠি এল। এই প্রথম ও তুমি সম্বোধন করে লিখেছে আমাকে। শিহরণের রেশটুকু মিলিয়ে যেতেই চোখে নেমে এল আঁধার। কী লিখেছে জয়ী!

আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমাব ভালবাসার যোগ্যতর হয়ে উঠতে পারলাম না। তাই বিদায় নিচ্ছি। তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি অনেক পথ পেরিয়ে গেছি। হাজার ডাকলেও আমার সাড়া পাবে না। অকপটে বলি পরীক্ষা ভাল হয়নি। রেজাল্ট ভাল হবে না। অব্যক্ত যন্ত্রণা আমাকে তাড়া করে ফিরছে এ ক'দিন। তোমার ওই তীব্র দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারবো না গো।

আর পড়তে পারি না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। স্থানুবৎ বসে থাকি। নামচি থেকে বাগডোগরা, বাগডোগরা থেকে এয়ারবাসে দমদম বিমান বন্দরে যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধে। এই পথটুকু কেমন করে যে পার হলাম আমি নিজেই জানি না। জয়ীদের বাড়িতে প্রথমেই যাব ভেবেছিলাম কিন্তু যেতে পারিনি। আমার সে অবস্থার কথা কীভাবে বর্ণনা করা যায়? কেউ কি পারে?

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ রূপা বৌদিকে দেখে বুকের জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। নিজেকে ধরে রাখা গেল না আর। মায়ের বুকে শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় খোঁজে আমিও বৌদির বুকে মুখ গুঁজে স্বান্তনা পেতে চাইলাম। অসীম মমতায় বৌদি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ভেঙ্গে পড়ো না, ছিঃ! তুমি না পুরুষ।

সারারাত ঘুমতে পারিনি। এই এক রাতেই আমাকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছে।

কী আশ্চর্য জয়ী আমার কে? মাস কয়েক আগেও তো এমন করে ও আমার রক্তের গভীরে বাসা বাঁধেনি।

এই সকালে এক দুর্বোদ্ধ টান আমাকে জয়ীদের বাড়িতে নিয়ে এল। অবিশ্বাস্য সেই যন্ত্রণা ক্রমশ ছেয়ে ফেলছে আমাকে। জয়ীর মা আমাকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন। সংযমে নিজেকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই। আমি যে এ বাড়ির গৃহশিক্ষক। আমার ওভাবে কেঁদে হালকা হতে নেই।

জয়ীর পড়ার টেবিল গোছানো। দেখে মনে হয় এখনই যেন এসে পড়তে বসবে। টেবিলে স্ট্যান্ডে ওর আবক্ষ ঠোঁট টেপা হাসির দুষ্টুমিভরা চাউনির ছবিটা কে রেখে দিয়েছে? টেবিলে মাথা রেখে অবরুদ্ধ আবেগ সামলাতে চেষ্টা করি। কেউ যেন মাথার ঘন চুলে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দিচ্ছে। দারুণ চমকে উঠি। জয়ী যেন বলল, তুমি কাঁদছিলে জিষ্ণুদা?

—স্টপ, স্টপ ইট জয়ী। মনে রেখ আমি তোমার টিচার নই।

—আমি জানি জিষ্ণুদা। কেঁদো না। আমি তো রেজাল্ট খারাপ করিনি। দেখ আমি ফার্স্ট ডিবিশন পেয়েছি, তিনটে সাবজেক্টে লেটার। তুমি খুশি নও?

—খুব, খুব খুশী জয়ী। য়্যাম প্রাউড অফ য়্যু। ভলকে ভলকে চোখের জল নেমে আসে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কেমন দৃষ্টিতে তাকাতাম তোমার দিকে? যা তুমি সহ্য করতে পারবে না বলেছ।

উদভ্রান্তের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। সারাদিন কেটে যায়। সন্ধে নামে। হ্যালোজেন আলোয় ধা-ধা করছে জায়গাটা। এই নাকি মহা শ্মশান। ক্রিমেটরিয়ামে পুড়ে যাচ্ছে জীবনের অবশেষ। পূণ্যতোয়া স্রোতোস্বিনীর দিকে এগিয়ে যাই। সহসা বুকের ভেতর থেকে ভারী পাথর সরে যায়। শরীর মন হয়ে উঠেছে পাখির পালকের মত। শিশুর উচ্ছ্বাস মেখে শিশু হয়ে যাই। হাতের চেটোয় চোঙ বানিয়ে মুখের কাছে ধরি। চিৎকার করে ডাকি, জয়ী-ই-ই।

স্রোতস্বিনী—আমার সে ডাক ফিরিয়ে দেয় না। কলকল করে বয়ে যায় মোহনার দিকে।

নিস্তব্ধ রাত্রির রাজপথে টলতে টলতে হাঁটি অনির্দিষ্ট ঠিকানায়। হাতের চেটোয় চোঙ বানিয়ে আর্ত চিৎকারে আবার ডাকি, জয়ী—জয়ী-ই-ই।

এই কংক্রিট শহর আমার সে ডাক ফিরিয়ে দেয় না, কোনদিন ফিরিয়ে দেবে না।

নিপুণা

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

সাতসকালেই বাড়িটার সামনে যেন কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। তবে হাতাহাতি-লাঠালাঠি-ফাটাফাটি নয়, বাকযুদ্ধ। তাও আবার একপক্ষের লম্ফঝম্ফ আর চেঁচামেচিই বেশি। অপরপক্ষ বলতে গেলে প্রায় নীরব। মাঝেমধ্যে শুধু ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা করে ব্যর্থ।

মহিলাটি একাই চিৎকার করে পাড়া মাত করে ফেলেছে। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে মহিলার বাড়ির সামনে। গোটা পাড়াই যেন উপচে পড়েছে। এমন মজা কে না দেখতে চায়!

মহিলাটির নাম নিপুণা। বয়েস বেশি নয়। বড়জোর বাইশ-তেইশ। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। স্বামী মস্ত বড় ব্যবসায়ী। দিনরাত শুধু ব্যবসার মধ্যে ডুবে থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা মুখে ব্যবসার কথা। ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না। এমনকী রাতে স্ত্রীর পাশে শুয়েও ব্যবসার কথাই বার বার বলে। নিপুণা রূপসী। অঙ্গে অঙ্গে তার যৌবন-তরঙ্গ। নিপুণা তার রূপ সম্বন্ধে সচেতন। পাড়ার অনেক যুবক কারণে-অকারণে নিপুণাদের বাড়িতে আসে। নিপুণারা বাড়িতে না থাকলে বাড়িটা দেখেও তারা শান্তি পায়। নিপুণার রূপ আর ফেটে পড়া যৌবন যে তাদের কাছে আসল আকর্ষণ তা নিপুণাও বোঝে। সত্যি-ই এ রূপ পাষাণকেও উতলা করে তোলে।

এই অপরূপা এখন যার বিরুদ্ধে সোচ্চার সে-ও এই পাড়ায় থাকে, কয়েকটা বাড়ি পরে। নাম আশিস—কবি আশিস মুখোপাধ্যায়। কলেজে অধ্যাপনা করে। মোটামুটি পাড়ার লোকজন তাকে সুনজরে দেখে। ভালবাসে। তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে এখনও পর্যন্ত কেউ কালি ছিটাতে পারেনি। অথচ তাকেই নিপুণা যা-তা বলছে। সবাই অবাক।

নিপুণা চেঁচিয়ে চলেছে—একজন প্রফেসর যে এত নীচ হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। একে প্রফেসর, তার উপর আবার কবি। ভেবে অবাক হচ্ছি এরকম একজন মানুষ না-বলে, না-কয়ে পরের বাড়িতে ঢোকে কী করে! তার চেয়েও বড় কথা আমার দিকে তাকিয়ে উনি হাসলেন কী করে! উনি আমাকে কী মনে করেন? আমি ঘরের বউ। আমার স্বামী আছে। এই কি একজন শিক্ষিত লোকের আচরণ? ছি...

অনেকে অবাক হলেও অনেকের মুখে আবার ছি-ছি। কেউ আবার বলছে ডালমে কুছ্ কালা হ্যায়। কেউ বলছে পাড়ার লোক না হলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতাম। বিশেষ করে নিপুণা-অনুরাগী যুবকরা তো রীতিমতো খাপ্পা। তবে বয়স্করা বলছে ব্যাপারটা জটিল। আশিসের মতো শিক্ষিত ভদ্র ছেলে হঠাৎ এরকম করতে যাবে কেন।

এইভাবে চলছে নানা কথা, নানা গুঞ্জন। লোকের ভিড় যত বাড়ছে নিপুণার গলার পর্দাও তত চড়ছে।

আশিস বলল—এইভাবে চ্যাঁচানোর কারণ তো বুঝে উঠতে পারছি না। এতে মান সম্মান বাড়ে না। লোকে হাসে।

এবার নিপুণার স্বামী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল—ন্যাকা। কী মতলবে আমার বাড়িতে ঢুকেছিলে? বলো...বলো সবার সামনে।

আশিস শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে নিপুণার দিকে তাকাল। মুখে কোনও কথা নেই।

নিপুণা জনতার দিকে চেয়ে আবাব চেঁচিয়ে উঠল—দেখুন আপনারা। আপনারাই বিচার করুন।

---হ্যাঁ, বিচার হওয়া উচিত। জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল।

আরেকজন বলল—আজই বিচার হয়ে যাক। ব্যাপারটা নাগবিক কমিটিতে তোলা হোক।

বিরক্ত আশিস বলল—তাই হোক। আজই মীমাংসা হয়ে যাক।

নিপুণাব স্বামী বলল—হয়ে যাক মানে হবেই। আমি এক্ষুণি নাগরিক কমিটিতে চিঠি দিচ্ছি। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

নিপুণার স্বামীর সে কী আস্ফালন! তার তর্জন গর্জনের ঠেলায় কেউ কথা বলতে পারছে না। নিপুণাও চুপচাপ। কেমন যেন অসহায় মনে হয় তাকে।

এই ভিড়ের মধ্যে নাগরিক কমিটির দু-চারজন লোকও রয়েছে। তারাই ঠিক করে আজই সন্ধে সাতটায় কমিটি বিচারে বসবে।

এই ঘোষণার পর ভিড় ভাঙতে শুরু করে। যেতে যেতে নিপুণা-অনুরাগী এক যুবক ফোড়ন কাটে—কবির ভাল মানুষ সাজা বেরিয়ে যাবে এবার। এমন ভাব দেখায় যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। শালা চিজ একখানা বটে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক যুবক বলে ওঠে—চিজ বলে চিজ। কবি অধ্যাপক আবার। ব্যাটা খুব চান্স নিয়েছিল মাইরি। ঠিকমতন সামলাতে পারল না। ইস, বেচারা...

অবশ্য কেউ কেউ আবার আশিসের পক্ষেই কথা বলছিল। আশিসের মতো ভাল ছেলে নাকি আজকালকার দিনে বিরল। অকারণে সে কারুর বাড়িতে ঢুকতে যাবে কেন! নিশ্চয়ই এর পেছনে কারণ আছে। এইভাবে যেতে যেতে নানা জন নানা মন্তব্য করে। সবার মুখে একই বিষয়।

গোটা পাড়ায় কৌতূহল ছড়িয়ে পড়েছে। যে যার বাড়িতে এই নিয়ে বলাবলি করছে। এমন টক-ঝাল-মিষ্টি খবর নিয়ে বাঙালি সমাজে কে না আলোচনা করে!

বাড়ি ফিরে জানলার পাশে বসে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে আশিস। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনে বলে 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্' দেবতারাই বুঝতে পারে না, আমি কোথাকার কে! কিন্তু তাই বলে এতদূর! এরকম বেইমানি যে ভাবাও যায় না। ছি...

মুহূর্তে অনুরাগের পর্দাটা সরে গেল আশিসের চোখের সামনে থেকে। কী ভালই না বাসত সে নিপুণাকে! এত বিশ্বাসও হয়তো জীবনে কাউকে সে করেনি। কিন্তু আজ নিজের চোখের সামনে যা দেখল তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে তার। ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠছে। নিপুণা যে এত নিচ হতে পারে তা সে কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। এরকম নারীর সঙ্গে প্রেম তো দূরের কথা, কথা বলাই বিপদ। মুখ দর্শনও পাপ। সেই পাপেরই ফল পেল সে আজ। এ শুধু ছলনাময়ী নয়, কালসাপ। কখন যে কীভাবে কাকে ছোবল মারবে

বলা মুশকিল। অথচ এই নিপুণাই কতদিন কতবার তার বুকে মুখ রেখে বলেছে আমি শুধু তোমার—তোমারই। কখনও আবার চোখের জলে আশিসের বুক ভিজিয়েছে আব আজ সে চালাকি করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এইভাবে অপমান করল। এর ফল তাকে পেতেই হবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আশিস বদলা সে নেবেই নেবে। এবং সন্ধে বেলায়ই নাগরিক কমিটির সামনে নিপুণার মুখোশ খুলে দেবে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে নিপুণা, কত ধানে কত চাল। প্রেমের অভিনয় সারা জীবনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে আশিসের। চাবিটা হাতে নিয়ে আলমারিটা খুলে বের করল সেই মারণ-অস্ত্র—মানে নিপুণার চিঠি। মন দিয়ে পড়তে লাগল চিঠিখানা :

প্রিয়তম,

সব সময় তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে শুধু তোমারই ছবি ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। তুমি আছো আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে। তুমিই তো আমার সব। তোমার জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত আমি।

আমি যার সঙ্গে ঘর করছি সে টাকা ছাড়া দুনিযায় আর কিছুই চেনে না। তার কাছে টাকা ধ্যান, টাকা জ্ঞান। টাকাই জীবনের সবকিছু। সব সময ডুবে থাকে সে ব্যবসার মধ্যে। তার জগৎটা খুবই ছোট। তুমি কবি। সারা বিশ্বজুড়ে তোমার জগৎ। এই জগৎটাই চেয়েছি আমি জীবনভর।

মানুষ যা চায় তা পায় না। আমি চেয়েছিলাম একজন কবি বা সাহিত্যিককে। পেলাম টাকা-আনা-পাই হিসেব কবা একজন লোককে। বলাকার মতো ভেসে যেতে চেয়েছিলাম অনেক দূরে। আটকে গেলাম ছোট্ট বন্ধ ঘরে। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি থাকতে পারছি না। তুমি এখান থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তুমি আমার ইহকাল, তুমিই পরকাল। তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাথী। তুমি ছাড়া আমি অচল। তোমাকে একটু দেখার জন্যে জানলাব পাশে প্রায সব সময় বসে থাকি। তোমার দর্শন পেলে আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে পাগল করে। তুমি তো জান আমি এখন জীবন্মৃত। আমাকে বাঁচাও।

দিন কয়েক আগে তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে আমি সেই মতো তৈরি হচ্ছি। তুমি তৈরি থেকো। যে কোনওদিন বেরিয়ে পড়ব। দু'জনে দূরে, বহুদূরে চলে যাব। কলকাতা আর ভাল লাগছে না। পাখি-ডাকা কোনও ছোট্ট মফস্বল শহরে দু'জনে 'স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর বাঁধব ভালবেসে।'

আগামীকাল সকাল আটটায় আমাদেব বাড়িতে চলে এসো। অনেক কথা আছে। ব্যবসার ব্যাপারে 'ও' ভোর পাঁচটায় কলকাতাব বাইরে কোথায় যেন যাবে। ফিরবে সেই সন্ধের পর। কাজের মেয়েটি ছুটি নিয়েছে। কাল সে আসবে না। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। তোমার চিন্তার কোনও কাবণ নেই। কলিং বেলও বাজাতে হবে না। আমি গেটের কাছে জানলার ধারেই বসে থাকব। তুমি কিন্তু

অবশ্যই আসবে লক্ষ্মীটি। ভুল যেন না হয়।

হৃদয়ের সব ভালবাসা উজাড় করে পাঠালাম। ইতি—

তোমার, শুধু তোমারই নিপুণা।

ভাল করে চিঠিটা পড়ল আশিস। একবার নয়, দু'বার পড়ল। মনে মনে বলল, ছলনাময়ী এবার যাবে কোথায়! আজ সবার সামনে তোমার মুখোশ খুলে দেব। তুমি যে কী চিজ তা সবাই জানতে পারবে।

অধীর আগ্রহে আশিস অপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তটির জন্যে।

শীতকাল। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল। সন্ধ্যা নামল শীতের কুয়াশা গায়ে মেখে। বাতাসে শীতের কামড়। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও উত্তেজিত আশিসের রক্ত গরম।

সন্ধে সাতটা। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দু'পক্ষই হাজির নাগরিক কমিটির অফিসে। হাজির পাড়ার লোকজনও। দারুণ মুখরোচক ব্যাপার। মজা দেখার জন্যে তাই লোকে লোকারণ্য। ফিস্‌ফিসানি চলছে ভিড়ের মধ্যে। সবাই বিচারের রায় শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

শুরু হল বিচার। প্রথমেই প্রশ্ন হয় নিপুণাকে।

প্রশ্ন—নিপুণাদেবী, আপনার সঙ্গে কি আশিসবাবুর আলাপ-পরিচয় আছে?

উত্তর—না।

আশিস কটমট করে নিপুণার দিকে তাকাল।

এবার প্রশ্ন নিপুণার স্বামীকে—আপনার সঙ্গে আশিসবাবুর কেমন সম্পর্ক গর্জনবাবু?

উত্তর—কোনও সম্পর্কই নেই। মুখ চেনাচিনি পর্যন্ত।

প্রশ্ন—আপনি তো এ-পাড়ায় দীর্ঘদিন আছেন। আশিসবাবুও। তবু দু'জনের মধ্যে কি বাক্যালাপও নেই?

উত্তর—সময় কোথায় আলাপ করার! আমি তো সব সময় ব্যস্ত থাকি আমার ব্যবসা নিয়ে।

প্রশ্ন—আপনাদের দু'জনের কারুর সঙ্গেই আশিসবাবুর আলাপ-পরিচয় নেই। তাহলে আশিসবাবু অকারণে আপনাদের বাড়িতে ঢুকলেন কেন?

উত্তর—সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

নাগরিক কমিটি আবার নিপুণাকে প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন—আশিসবাবুকে কি এর আগে আপনি দেখেননি, নিপুণাদেবী?

উত্তর—একপাড়ায় থাকি। কখনও-সখনও দেখলেও দেখতে পাবি। তবে আমার বড় একটা মনে নেই। তাছাড়া আমার মনে রাখার দরকারটাই বা কী!

নিপুণার কথা শুনে রাগে সারা দেহ কাঁপতে শুরু করল আশিসের। চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরল নিপুণার চিঠিখানা। মনে মনে বলল, তোমার যা প্রাণে চায় বলে যাও। শেষপর্যন্ত যাবে কোথায়। তোমার মৃত্যুবাণ তো আমার হাতেই ধরা আছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমার মুখোশ খুলে পড়বে। তারপর সবাই জানতে পারবে আসল সত্য।

হঠাৎ, নিপুণার চোখে চোখ পড়তেই আশিস চমকে উঠল। তার মনে হল নিপুণা মুখে যাই বলুক, চোখ অন্য কথা বলছে। সেই চোখ যেন আশিসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। অসহায় চোখের করুণ দৃষ্টি আশিসকে কিছুটা বিচলিতও করল। তবুও আশিস ক্ষমা করতে নারাজ। সবার সামনে নিপুণা যে অপমান তাকে করেছে সে তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। নিপুণার এই চোখ দেখেই একদিন সে ভুলেছিল, প্রেমে পড়েছিল। এই মায়াবী চোখ যে কী সাংঘাতিক তা সে আজ ভাল করেই টের পেয়েছে। কে জানে এই চোখ কত লোকের সর্বনাশ করেছে। তাই আশিস আজ নিপুণার শয়তানি প্রকাশ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার চোখে মুখে সেই আভাস।

নিপুণার মুখ বিবর্ণ। সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন আর নিজের মধ্যে নেই। চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। সারা দেহ অবশ হয়ে আসছে। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এক্ষুণি হয়তো সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। আশিস হয়তো জেরার আগেই চিঠিখানা নাগরিক কমিটির হাতে তুলে দেবে। ব্যস, তাহলেই সব শেষ। আত্মহত্যা ছাড়া গতি থাকবে না তার।

নাগরিক কমিটি আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছে এমন সময় জল—জল বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল নিপুণা।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হল। একটু পরেই নিপুণার জ্ঞান ফিরে এল। তাকে আর প্রশ্ন করা ঠিক নয় ভেবে নাগরিক কমিটি আশিসকে প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন—আপনি তো সবই শুনলেন, আশিসবাবু। এবার আপনি কী বলতে চান, বলুন।

উত্তর—ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ থাকলে ভাল হয়। কাল না হয় আবার বসা যাবে।

নিপুণার স্বামী বাধা দিয়ে বলল—যা হবার আজই হোক। কাল কেন?

আশিস কিছু বলার আগেই নাগরিক কমিটির একজন বললেন—আশিসবাবু তো ঠিকই বলেছেন। নিপুণা দেবী অসুস্থ। এ অবস্থায় তাঁকে জেরা করা ঠিক না।

ঠিক হল আগামীকাল নাগরিক কমিটি আবার বিচারে বসবে। সন্ধে সাতটায় দু'পক্ষকে হাজির হওয়ার কথা বলে দেওয়া হল।

পরের দিন। কাঁটায় কাঁটায় সন্ধে সাতটায় দু'পক্ষই উপস্থিত হল নাগরিক কমিটির সামনে। আগের দিনের চেয়ে আরও বেশি লোক জমেছে আজ। সবাই উদ্‌গ্রীব আশিসের কথা শোনার জন্যে।

প্রশ্ন—গতকাল তো সব শুনেছেন আপনি। এবার আপনার বক্তব্য বলুন।

কোটের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিপুণার দিকে তাকাল আশিস। নিপুণার চোখ তখন ছলছল করছে। মুখে তার অব্যক্ত বেদনা। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে কোটের পকেট থেকে এক্ষুণি চিঠিখানা বার করবে আশিস। সত্যিই চিঠিখানা বার করার জন্যে আশিস তৈরিও। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তাকে বলছে তুমি না কবি? কারোও ক্ষতি করা কবি-সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। মানুষের মঙ্গল করাই তাদের কাজ। তুমি কেন নিজেকে ছোট করবে।

আশিস যেন কেমন হয়ে গেল। চারদিকে একবার ভাল করে তাকাল। আশিসের

কথা শোনার জন্যে সবাই উৎসুক। একটা অখণ্ড নীরবতা। কি হয়—কি হয় ভাব। হঠাৎই নীরবতা ভাঙল আশিসের কথায়—আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন—আপনি তাহলে আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছেন?

উত্তর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—ভয়ের কিছু নেই আশিসবাবু। আপনি ভেবেচিন্তে বলুন।

উত্তর—আমার কিছু বলার নেই তো বললাম।

নাগরিক কমিটি অবাক। অবাক আশিসের বন্ধুবান্ধবও। অবাক হয়তো নিপুণাও। অবাক আরও অনেকে। নাগরিক কমিটি রায় দিল—আপনি একজন কবি। অধ্যাপনা করেন। পাড়ায় আপনার যথেষ্ট সুনাম। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কাজ আপনি করবেন না।

নিরুপায় নাগরিক কমিটি শুধু এইটুকুই বলল। তাছাড়া উপায় কি? ওখানে অনেকেই বুঝল আশিস মুখ খুলল না। খুললে হয়তো অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ত। তবে কেন যে আশিস এত বড় অপমান মুখ বুজে সহ্য করল তা তার বন্ধুবান্ধবও বুঝতে পারল না।

কলঙ্ক মাথায় নিয়ে নাগরিক কমিটির অফিস থেকে বেরিয়ে এল আশিস। নানা জন নানান কথা বলছে। নিপুণা-অনুরাগীদের মুখে মৃদু হাসি। অনেকের মুখ আবার বেদনায় কালো। গুঞ্জনের শেষ নেই।

রাত তখন অনেক। দুরন্ত শীতে সবাই লেপের মধ্যে ডুব দিয়েছে। গোটা পাড়া সুপ্ত নিস্তব্ধ। ঘুম নেই শুধু আশিসের চোখে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে নিপুণার ছবি। মনে পড়ছে নিপুণার কত কথা। মনে পড়ছে নিপুণার চিঠির ভাষা। ঘৃণায় বিষিয়ে উঠছে আশিসের মন। মনে মনে ভাবছে এই তো নারীর প্রেম। এদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এদের পক্ষে সব সম্ভব। এরা পারে না এমন কাজ নেই।

হঠাৎ অত রাত্তিরে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দে আশিস চমকে উঠল। আস্তে আস্তে দরজা খুলে সে অবাক। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকের দিকে।

—কী দেখছ অমন করে? ঘরে চল।

আশিস যন্ত্রচালিতের মতো ঘরে এল। নিপুণা ঘবে ঢুকে বলল—খুব রাগ হয়েছে তো? রাগ-টাগ পরে হবে। তৈরি হয়ে নাও। হাতে সময় নেই। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে।

আশিস নিপুণার মুখের দিকে তাকাল। আবার তার মনে হল 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্'... বিস্ময়ের ঘোর তখনও তার কাটেনি। বেশ কিছুটা ঘোরের মধ্যে যেন বলল—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। কেন, অন্য কেউ মনে হচ্ছে নাকি?

আশিসকে আমতা-আমতা করতে দেখে নিপুণা আবার বলল—আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো, লক্ষ্মীটি। সত্যি-সত্যিই 'ও'-র বাইরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সকালবেলা ও মত পাল্টে বলল আজ আর যাবে না, দু-একদিন পরে যাবে। তখন তোমাকে খবর দেওয়ারও উপায় ছিল না। তুমিও বাড়িতে এসে পড়লে। তাই ওরকম

অভিনয় করতে হয়েছে। হাজার হোক আমি তো নারী।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আশিস শুধু নিপুণাকে দেখছে।

সারা দেহে যৌবনের ঢল-নামা নিপুণা হঠাৎ নিজের বুকের উপর আশিসকে টেনে নেয়। চুম্বনের পর চুম্বনে তাকে বিপর্যস্ত করে কাজলটানা চোখ মেলে বলে—তুমি তৈরি হয়ে নাও। আর দেরি কোরো না, লক্ষ্মীটি।

আশিস নিপুণাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে—সত্যি-ই তুমি নিপুণা।

রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল দু'জনে। নিপুণার স্বামী হয়তো বিছানায় নিপুণাকে খুঁজছে। আশিসের বৃদ্ধ মা হয়তো অকাতরে ঘুমিয়ে আছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি হয়তো আশিসের ঘরে ঢুকে চমকে উঠবেন।

ততক্ষণে আশিস আর নিপুণা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে।

চোরকাঁটা

অরিন্দম বসু

শীতের সকালে,এক একদিন এমন রোদ্দুর ওঠে, মনে হয় পৃথিবীর সামনে খুব ভাল সময় এখন। মনে হয়, কোথাও কোনও গোলমাল নেই। গাছের পাতায়, মানুষের মুখে, আকাশের গায়ে কোথাও কোনও ময়লা লেগে নেই। রোদ্দুর বলে দেয়—আজ নয়তো কাল একটা ভালকিছু হবে। দেখো, হবেই।

জানলা খুলে দিতেই বিছানা ছুঁয়ে ঘরের মেঝেয় একটুকরো রোদ। আঁটো করে বাঁধা বিনুনি সারা রাতে আলগা হয়ে যায়। অন্য দিন তবু ঘুম থেকে উঠে মাথার চুলে দু হাত বুলিয়ে নেয় স্বাতী। আজ কিছু সময় সেই মোলায়েম রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন অবধি আসতে আসতে দেখল সেই রোদ আয়নার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আর সেইসব টুকরোয় ভেসে উঠেছে কলকাতার ছবি।

হৃদয়পুর থেকে ট্রেনে শিয়ালদায় এসে তারপব আবার ট্রেনে চেপে যাওয়া যেত যাদবপুর। কিন্তু অরুণ বলেছিল, মেট্রোয় আসুন। তাডাতাড়ি হবে। আমি যাদবপুর থেকে ওখানেই চলে যাব। তারপর দেখা যাবে।

কী যে দেখা যাবে স্বাতী জানে না। মেট্রো স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কলকাতার এ-দিকটা তার অচেনা। এত বড় শহরের পুরোটা কেউ চিনে নিতে পারে! আমি নিজেই তো এ শহরের কেউ নই। কলকাতার লোকেরা যাকে বলে মফস্বল—সেখানে থাকি আমি।

ভাবতে ভাবতেই স্ব্যতীর মনে হচ্ছিল—হৃদয়পুরে এত অটোর ধাক্কাধাক্কি নেই। রাস্তা খুঁড়ে সাবওয়ে তৈরির কাজ হয় না। গাড়ি, মানুষ, রিকশা মিলেমিশে গিঁট পাকিয়ে যায় না রোজ, স্টেশনে ট্রেন এলে তাকে ঘিরে ভনভন করে কিছু মানুষ। তারপর খানিকটা হইচই নিজের ভেতরে নিয়ে ট্রেন চলে যায়। ছেঁড়া শালপাতা, কাগজের ঠোঙা, ধুলো তার পিছু ধাওয়া করে হাঁফাতে হাঁফাতে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থমকে যায়। মেট্রোয় এসব কিছু নেই। মাটির তলায় কলকাতর সাজানো গোছানো মফস্বল।

স্বাতী কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল একবার। সাড়ে দশটা। এসময় তাব অফিসে· থাকার কথা। অরুণ কি আরও দেরি করবে আসতে? একা একটা মেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড়ের লোকজন তার দিকে তাকাবেই। তাকাচ্ছেও। স্বাতী শুধু তো চোখ দিয়ে অরুণকে খুঁজছিল।

ঠিক তখনই দূরে দাঁড়িয়ে স্বাতীকে দেখছিল অরুণ। অটো থেকে নেমে একটুআগেই সে ফুটপাথে এসে উঠেছে। এখনই হেঁটে যাওয়া যায় স্বাতীর দিকে। সামনে গিয়ে বলা যায়, অনেকক্ষণ এসে পড়েছেন? কিন্তু অরুণ যাচ্ছে না। তাব বদলে ঠোঁটে

সিগারেট চেপে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাস্তায়, ফুটপাথ ঘেঁষে একের পর এক গুবরেপোকা অটো এসে দাঁড়াচ্ছে। উগরে দিচ্ছে লোক। তারা অরুণকে একটা ল্যাম্পপোস্ট মনে করে পাশ কাটিয়ে কিংবা ছুঁয়ে দৌড়চ্ছে পাতালের দিকে। অরুণ মাথা উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল কতখানি একটা জায়গা কেমন যেন ফালতু ঝুলে আছে কলকাতার ছাতা হয়ে।এখন যারা দৌড়চ্ছে তারা যখন পুরী কিংবা দার্জিলিং যাবে তখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের দিকে। এমনই নিয়ম পৃথিবীর মানুষদের।

অরুণ মাথায় পাক্কা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি। লোকজনের ফাঁকফোঁকরে স্বাতীর দিকে চোখ রেখে সে কয়েক পা এগোল। স্বাতী এখনও তাকে দেখতে পায়নি। ঘড়ি দেখছে আবার। কেমন থোড়ের মতো রং তার হাতের। তুঁত-রং শাড়িতে নিজেকে মুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা মাখন রঙের কাপড়ের ব্যাগ। আরও কিছুটা এগিয়ে থমকে গেল অরুণ।

কেন যাচ্ছি আমি? কেনই বা এসেছে স্বাতী এত পথ উড়িয়ে? আমি স্বাতীর প্রেমিক নই। বন্ধু? বন্ধুত্বের বয়স, এই সময় অবধি ধরলেও সাড়ে চার দিন। তাহলে আজ আমরা এখানে কেন?

আঙুলের টুসকিতে সিগারেটের শেষটুকু দূরে ফেলল অরুণ। তারপর বড় বড় পা ফেলে একদম স্বাতীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ এসে পড়েছেন?

মুখ কিছুটা তুলে হাসে স্বাতী। এই ক'দিনেই খেয়াল করে দেখেছে অরুণ। তেমনই হাসল। না, এই কিছুক্ষণ।

আমিও তাই। দূর থেকে আপনাকে দেখছিলাম।

স্বাতী গলার ভেতরে দানা দানা করে হাসি গড়িয়ে দিল। কেন, দূর থেকে কেন?

অরুণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—জলরঙের ছবি দূর থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে স্বাতী।

স্বাতী চোখের পাতা নামিয়ে নেয়। এই কথাটা তার খুব সাজানো মনে হতে পারত। কিন্তু অরুণ এমন শ্বাস টেনে ভেতর থেকে কথা বলে যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

সে মুখ তুলে জানতে চাইল, ক্যামেবার ভেতর দিয়ে যখন অন্য কাউকে দেখেন, তখন কীরকম মনে হয়?

স্বাতীর হাতে চুড়ি নেই। গলায় কোনও হার নেই। ঠোঁটে লিপস্টিক কিংবা কপালে একটা টিপ অবধি নেই। গল্প উপন্যাসে এজন্য একটা শক্ত বাংলা থেকে অনেক সময়—নিরাভরণ, জানে অরুণ। না, এই মেয়েটার কানের পাতলা লতিতে বেঁধানো রয়েছে দুটো ছোট্ট সাদা দুল। তবে চোখ দুটিতে বিষাদ।

অরুণ থেমে থেমে বলল, ক্যামেরা? সেখানে তো অনেক ফ্রেম থাকে। কাছে দূরে আসা-যাওয়া থাকে। তার মধ্যেই যা-কিছু বাঁধাধরা। ক্যামেরা তো মনের ছবি তুলতে পারে না স্বাতী। সে দেখতে পায় এক্সপ্রেশন। ওসব কথা তোলা থাক।

এখন এই জায়গাটা থেকে পালানো দরকার।

কোথায় পালাবেন?

আমি তো আপনাকে সেদিন বলেছিলাম, আপনাদের ওদিকটায় যেতে পারলে হত।

মাথা নাড়ল স্বাতী। না, বাড়ির কাছাকাছি কোনও জায়গা আমার ভাল লাগে না। ওদিকে সব আমার চেনা।

আমার চেনা হত। বড় সুন্দর আপনাদের এই জায়গাটার নাম। হৃদয়পুর—

আপনাদের এদিকে কোনও হৃদয়পুর নেই?

হ্যাঁ, আছে তো। এই যে—। হাসতে হাসতে নিজের বুকে হাত রাখল অরুণ।

স্বাতী সেদিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। সাদা-নীল চেক কটস উলের একটা শার্ট পরেছে অরুণ। স্লেট রঙের বুক খোলা সোয়েটার। নেভি-ব্লু ট্রাউজারের শেষে তার পা ঢাকা বেল্ট লাগানো চটিতে। মাথায় কিছুটা অগোছাল চুল। গালে হালকা দাড়ি থাকলেও তার চোখা চেহারাটা বোঝা যায়।

আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক। আমরা আগে এখান থেকে চলে যাই যাদবপুর স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে পড়ব।

তারপর?

তারপর তো আমার একটা গান গেয়ে ওঠার কথা। তার আর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা—। কিন্তু সেটা একেবারে সিনেমা সিনেমা হয়ে যাবে। আগে চলুন তো, পরে দেখা যাবে।

রাস্তা পেরোতে পেরোতে স্বাতী আপনমনে হাসছিল। অরুণ এমনভাবে বলে—দেখা যাবে—যেন সামনে ঘন কুয়াশা। যেন সেটা সরে গেলেই ভেসে উঠবে অচেনা অদ্ভুত কোনও সুন্দর শহর।

যাদবপুর স্টেশনের জায়গায় জায়গায় দলা পাকিয়ে রয়েছে ভিড়। চায়ের স্টলে, টিকিট কাউন্টারে, প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে, মাটিতে পেতে রাখা বইয়ের দোকানের বইয়ের দিকে তাকিয়ে আঠা হয়ে লেগে আছে মানুষ। পুরোপুরি কাজের দিন এটা একটা। যে মানুষগুলো এখন গা ছেড়ে দিয়ে রয়েছে, ট্রেন এলে তারাই হুড়মুড় করে ছুটবে। এইসবের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়ল স্বাতী সেন আর অরুণ গুহরায়।

আপনার একটা ক্যাজুয়াল লিভ আজ গেল, না?

স্বাতী অরুণের দিকে না তাকিয়েই বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।

টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ বলল—আপনার অবশ্য সরকারি চাকরি, খুব ক্যাজুয়ালি একটা ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নেওয়া যায়।

কোনও শব্দ না করে হাসছিল স্বাতী। সেন্ট্রালের চাকরিতে অনেক নিয়মকানুন আছে। সেগুলো মানতে হয়। আমি মানি। আর ছুটিও তো অফুরন্ত নয়। আপনি যে টিকিটের লাইনে দাঁড়াচ্ছেন—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

টিকিট কাউন্টারের ওপরে একটা লম্বাটে টিনের বোর্ডে পরপর লেখা স্টেশনের

নাম। ভাড়া। অরুণ সেদিকে তাকিয়েছিল ঘাড় উচিয়ে। বলল, সেটাই তো ভাবছি। আমার একটা আধ-চেনা জায়গা আছে অবশ্য—

আধ-চেনা কী রকম?

আমার এক জ্যাঠামশায় সেখানে বাড়ি করেছিলেন। জায়গাটার নাম খুব অদ্ভুত। বিজনবাড়ি। অনেকদিন আগে, জ্যাঠা বেঁচে থাকতে একবার গিয়েছিলাম। সেই বাড়ি এখন শুনেছি ভাঙাচোরা হয়ে পড়ে আছে মাঠের মাঝখানে। ছেলেরা কেউ থাকে না। দুজনেই আমেরিকায়। এতদিনে সে বাড়ি হয়তো দখলই হয়ে গেছে।

ওখানেই চলুন তাহলে। বলতে বলতে স্বাতী তার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে পার্স বের করে আনল।

সেদিকে তাকিয়ে অরুণ বলল, আমার কাছে আছে বুঝলেন। ফুরিয়ে যেতে পারে যদিও। [illegible] না হয বলব।

এই সময় পেছন থেকে একজন এসে অরুণের কাঁধে হাত রাখল। কী রে, কোথাও যাচ্ছিস না কি?

হাসি হাসি মুখের লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল অরুণ। দেবাশিস! খবব কী তোর? আছিস কেমন?

স্বাতী কিছুটা সরে দাঁড়িয়েছে। দেবাশিসের গোলালো মুখে পান। মুখের একপাশে ঠেলে রেখেছে। বলল, ধরে নে ভালই আছি। পান চিবোতে চিবোতে কাজে যাচ্ছি যখন।

এদিকে কোথায়?

এদিকেই তো। আমি তো এখন সুভাষগ্রাম স্টেশনের স্টেশনমাস্টার।

অরুণ দেবাশিসকে ভাল করে দেখল একবার। তিরিশ বছরেই তুই একটা আস্ত স্টেশনের ওপর মাস্টারি করছিস। দারুণ কাণ্ড! পরে কী করবি রে!

হাত উল্টে হাসল দেবাশিস। ওই করব। চুল পাকবে, দাঁত নড়বে, তোর সঙ্গে হয়তো বিহারের সাহেবগঞ্জ স্টেশনে দেখা হয়ে গেল।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল এবার।

অরুণ হাত নেড়ে স্বাতীকে ডাকল। আমার বন্ধু, দেবাশিস ব্রহ্ম। আশুতোষে একসঙ্গে পড়তাম। অনেকদিন্ যোগাযোগ নেই অবশ্য। এ হল স্বাতী।

দেবাশিস বুকের কাছে হাত তুলে নামিয়ে নিল। অরুণ বলল, তুই এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করিস, বাড়িতে আসতে পারতিস একবার।

ভেবেছি জানিস। হয়ে ওঠেনি। কবে যে উঠবে তাও জানি না। শিফটিং ডিউটির অনেক ফ্যাচাং।

তুই পারলে একদিন বাড়িতে আসিস। বিয়ে করেছি। তখন নেমন্তন্ন করতে পারিনি। এখন এটাকে নেমন্তন্ন ধরে নে। তোরা যাচ্ছিস কোথায়?

কী যেন মনে পড়ার মতো করে অরুণ বলে উঠল—ভাল হয়েছে, এখন ওদিকে যাওযার কোন ট্রেন আছে বল তো?

ক্যানিং লাইনে? এখন লক্ষ্মী আছে একটা। কিন্তু উঠতে পারবি না।

লক্ষ্মী মানে? লক্ষ্মীকান্তপুর প্যাসেঞ্জার!

ওই নামেই চালু। পুরোহিতদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি আছে জানিস তো? ক্যানিং লোকাল কিংবা লক্ষ্মীতে যারা ডেলি চড়ে তাদেরও নিত্যকর্ম পদ্ধতি আছে একটা। না জানলে কোনও চান্স নেই ওঠার। তার ওপর এই গাড়িটা লেটেও আসছে। দেখতে পারিস। মনে হবে পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করছিস। তারপর ছিটকে পড়বি। দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে স্বাতীকে দেখল একবার। ওকে নিয়ে উঠতে পারবিই না। কোনও একজনকে স্টেশনেই থেকে যেতে হবে। পরে বারুইপুর লোকাল আছে একটা। সেটা ফাঁকা পাবি। তাতে হবে?

হতে পারে।

তাহলে ওটাতেই যা। গল্প করতে করতেও চলে যেতে পারিস হয়তো। আমি চলি বুঝলি। এই গাড়িটাতেই বেরিয়ে যাব। চলি হ্যাঁ—বলে দেবাশিস স্বাতীর দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ওরা দুজন দেখল, যাওয়ার পথে প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকে লাইনে পানের পিক ফেলল স্টেশনমাস্টার। তারপর চেঁচিয়ে বলল, ওভারব্রিজ দিয়ে ওই প্ল্যাটফর্মে চলে যাস। ওখানেই আসবে।

স্বাতী অরুণের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল এবার। ট্রেনের গোলমাল, ভিড়ের ঝাপট—এসব তার খুব জানা আছে। তবু তার মনে হচ্ছিল—আজকের দিনটাতে এসব না হলেও পারত। সে বলল, পরের ট্রেনটা কী বিজনবাড়ি যাবে?

বিজনবাড়ি অবধি কোনও ট্রেন তো যায় না।

তাহলে?

বারুইপুর থেকে ট্রেকার সার্ভিস আছে। আশপাশের অনেক জায়গায় যায়। কোনও একটা নিশ্চয়ই বিজনবাড়িও যাবে।

স্বাতী সোজাসুজি তাকাল অরুণের চোখে। ও তাই বুঝি! নিশ্চয়ই যাবে, না।

হেসে ফেলল অরুণ। দাঁড়ান, আগে টিকিটটা কেটে নিই। যাব যখন ঠিক করেছি তখন যাওয়া হবেই।

অরুণ কাউন্টারের দিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় স্টেশন মাড়িয়ে মানুষে ঠাসা একটা ট্রেন এসে পড়ল। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে জমাট বাঁধা ভিড়ে ঢেউ উঠেছে। স্বাতীর মনে পড়ে গেল ঘরের ঠাণ্ডা মেঝে ছুঁয়ে থাকা সকালের সেই একফালি রোদ। একটু আগে অরুণের মুখে সেই রোদ্দুরই যেন হেসে উঠেছে। তবুও স্বাতী ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল। কেন এসেছি আমি এখানে? কেনই বা যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি এই লোকটার সঙ্গে? আমি অরুণের প্রেমিকা নই। বন্ধু? বন্ধুত্বের বয়স মাত্র সাড়ে চার দিন। তাহলে? এভাবে কি কিছু হয়?

ওভারব্রিজে উঠে অরুণ কিছুটা আগে হাটছিল। স্বাতী ডাকল। অরুণ, একটু থামুন এখানে।

শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে সামনে এসেছে স্বাতী। হাওয়ায় উড়ছে তার চুল। ট্রেন চলে যাওয়ায় এখন এখান থেকে অনেক দূর অবধি রেললাইন দেখা যাচ্ছে। চারপাশে

ক্যালেন্ডারের পাতা ফরফর করে উড়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার নয়।

অরুণ সিগারেট ধরিয়েছে। আলগোছে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। বড্ড টানছে।

আপনি প্রতুলদাকে কতদিন চেনেন অরুণ?

প্রতুলদা, প্রতুল মিত্র। হ্যাঁ তার কথা তো উঠতেই পারে। অরুণ ভেবে অবাক হল—এতক্ষণ সেই লোকটাকে এসবের বাইরে রেখেছিল সে। একগাল দাড়ি আর চশমার পুরু কাচ নিয়ে প্রতুল ভেসে উঠেছে এবার।

প্রতুলদাকে আমি চিনি এই বছর চারেক। সেই অ্যাড এজেন্সিতে দুজনের চাকরি করার সময় থেকে। তারপর আমি কাজটা ছেড়ে দিলাম। ও রয়ে গেল। পরে প্রতুলদার যোগাযোগেই ডকুমেন্টারির কাজ পাই আমি। মেদিনীপুর জেলা পরিষদের হয়ে দুটো ছবি করেছিলাম। হেল্‌থ আর লিটারেসি। হুগলিতে স্যানিটেশন নিয়েও একটা কাজ হয়েছিল। নিজের মনের মতো ছবি করতে চাইলেই তো করা যায় না স্বাতী। আগে-পরে অনেককেই এসব করতে হয়।

প্রতুলদাকে আমি কিন্তু চিনি সেই ছোটবেলা থেকে। ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। প্রতুলদা একটা আধপাগল লোক। ওর কথায় আপনি ভরসা করেন?

অরুণ এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল,চিৎপুর রোড নিয়ে আমার ডকুমেন্টারি যখন গোর্কি সদনে দেখানো হয় তখন প্রতুলদার চেনাজানা অনেকে এসেছিল। আপনিও কি ছিলেন স্বাতী? যত দূর মনে হয়—না।

রোজ যত মানুষ দেখেন সকলের মুখ মনে থাকে কি আপনার?

না, তা কী করে হবে। তবে প্রোমোশনাল ছবির বাইরে ওইদিনই তো যাকে বলে একদম আমার নিজের ছবি দেখানো হল—

আমি সেদিন যেতে পারিনি। আপনার কোনও ছবিই দেখা হয়নি আমার।

অ্যাকাডেমিতে যেদিন আপনার আসার কথা ছিল সেদিনও কিন্তু আপনি আসেননি স্বাতী। একে তো প্রতুলদা এসেছিল দেরি করে। বোধহয় ইচ্ছে করেই। যাতে আপনার সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়ে যায়। বলেছিল রোগা, লম্বা, ফরসা একটা মেয়ে আসবে টিকিট কাউন্টারের সামনে দেখলেই চিনতে পারবি। বুঝুন! ওইরকম বললে কেউ চিনতে পারে! কত মেয়েকে যে আপনি বলে ধরে নিয়েছিলাম!

বললাম তো। প্রতুলদা একটা আধপাগল লোক।

তখন থেকে আধপাগল আধপাগল বলছেন কেন বলুন তো?

কেননা প্রতুলদা বলেছে আপনি নাকি পুরো পাগল।

অরুণ মুখ তুলে হা-হা করে হেসে উঠল। রেল কোম্পানি ওভারব্রিজ তৈরি করেছে বোধহয় হাওয়া খাওয়ার জন্যই। বেশির ভাগ লোকই লাইন টপকে পারাপার করে। তবু যে কজন এখন এই ওভারব্রিজে রয়েছে তারা অরুণের হাসিতে ঘুরে তাকাল দুজনের দিকে।

এর পরই কিন্তু স্বাতী অরুণের হাসি নিবিয়ে দিল তার কথা দিয়ে। এভাবে কি কিছু হয় অরুণ?

কীভাবে?

এই যে প্রতুলদা চেষ্টা করছে দুজন মানুষকে দেখা করিয়ে দেওয়ার। কিছুদিন আগে ওর ছেলের জন্মদিনে যে আপনাকে যেতে বলেছিল সেটা আমায় বলেনি।

আমাকেও না। আমি পরে বুঝেছিলাম।

প্রতুলদার কাছ থেকে আমার অফিসের ফোন নম্বর জেনে আমায় ডেকেছিলেন কেন?

জানি না স্বাতী। আপনি তো নাও আসতে পারতেন। কেন এসেছিলেন?

আমিও জানি না।—বলে স্বাতী চোখ নামিয়ে নিল। অরুণ সেদিকেই তাকিয়ে। এখন আরও বিষণ্ণ লাগছে এই মেয়েটির চোখ। নাকি কোনও মায়া? সে ঠিক বুঝতে পারে না।

স্বাতী মুখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। খুব নিচু গলায় সে বলছিল—আপনি তো আমার অনেক কথাই জানেন না। জানলে—।

লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় চটির ঘষায় ঠং ঠং শব্দ উঠছে। সেটা ছাপিয়ে অরুণ বলল, আমার কথাই বা আপনি কতটুকু জানেন। সব কিছু কি জানা যায় সব সময়! আচ্ছা, আমরা এত আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলে চলেছি কেন?

স্বাতী কিছু বলল না। সামনে, প্ল্যাটফর্মে আবার একটা ভিড়। তবে বেলার দিকের ভাঙা বাজারের চেহারা। অনেক মানুষ কাঁচিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে আগের ট্রেন। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে অরুণ হঠাৎ বলল, তুমি কি আগে কখনও ট্রেকারে চড়েছ স্বাতী?

রোগা ভাঙাচোরা পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে লজঝড়ে একখানা গাড়ি আসছিল। তার উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ধুলোর পরত। গর্ত বাঁচাতে মাঝেমধ্যে সেই গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে নেমে যাচ্ছে বলে আরও ধুলো পাকিয়ে উঠছে হাওয়ার সঙ্গে। বিজনবাড়ির ঝিমিয়ে পড়া বাজার এলাকায় খাপরার চালের চা দোকানে যে ক'জন অকেজো লোক বসেছিল, তারা একবার দূরের ট্রেকারটার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। যাবে আর কোথায়। এখানেই তো থামবে এসে। তারপর আবার যাবে কালিকাপুর কিংবা চাকবেড়ে।

হেলপার ছেলেটিকে টাকা দিতে গিয়ে অরুণ দেখছিল—তার মাথার চুলে, চোখের পাতায় ধুলোর পাউডার। আর সকলে গাড়ির ভেতরে থাকলেও এই ছেলেটা নিজেকে বাইরে টাঙিয়ে রেখেছি একরকম। অন্যরা নেমে যে যার পথে হাঁটছে। দু-একজন চায়ের দোকানের বেঞ্চে জায়গা নিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে ট্রেকারের ইঞ্জিন ঘড়ঘড়ে গলায় এখন দূরের লোক ডাকবে।

অরুণ বলল, এখনই হাঁটবে নাকি এখানে দাঁড়িয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে নেবে।

যাঃ, অতটা কিছু নয়—বলতে বলতে হেসে ফেলল স্বাতী। হাত দিয়ে টেনেটুনে সে শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিল। তাঁতের শাড়ির এই এক ঝামেলা। বড্ড ছড়িয়ে যায়।

অতটা নয় বলছ। যাওয়া যাক তাহলে। হাঁটাও হবে আড়মোড়া ভাঙাও হবে। আমার তো এক এক সময় মনে হচ্ছিল ট্রেকার নয়, টুথপেস্টের টিউবের মধ্যে

ঢুকে পড়েছি। বাইরে থেকে কেউ চাপ না দিলে আর বেরুতে পারব না।

ঝাঁপ ফেলা দোকানঘর—পায়ে পায়ে থেঁতলে যাওয়া ফুলকপির পাতা—রোদের আরামে শুয়ে থাকা একটা কুকুর—ব্যাপারিদের উলটে রাখা খালি ঝুড়ি—বাঁধানো অশ্বত্থতলার শনিমন্দির পেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে এই গঞ্জ মতো জায়গাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এখানে আসতে আসতে রোদের বয়সও বেড়ে গিয়েছে অনেকটা।

অরুণ পেছনে তাকিয়ে একবার দেখল ট্রেকার এখনও দূরেই দাঁড়িয়ে। মুড়ির কৌটো মনে করে ওরা লোক তুলছিল। যেন ঝাঁকিয়ে নিলেই আরও ধরবে। সরতে সরতে বুকের কাছে ঘেঁষে এসেছিল স্বাতী। তার শাড়ির গন্ধ, মাথার চুলের আর শারীর নরম সুবাস এখনও সঙ্গে নিয়েই হাঁটছে অরুণ।

দু-একদিন আগেই রাতে নিজের ঘরে বিছানার কাছে পা ফেলতেই কী একটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। চমকে উঠে দেখে একটা চড়ুই পাখি। ছটফটাচ্ছে। ধূসর পেট। মুখটা উঁচু করে তার দিকেই তাকিয়ে। পা দুটো দু পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে জখম হয়েছে হবে। নাকি অন্য কোথাও ধাক্কা খেয়ে তার ঘরে এসে পড়ে রয়েছে। হাত দিয়ে আস্তে করে চেপে ধরে অরুণ। সামান্য একটু নড়ে ওঠে পাখিটা। দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় রেখে দিয়েছিল তাকে। সকালে উঠে দেখে নেই।

আজ তার পাশে ঠিক সেই চড়ুইপাখি হয়ে বসেছিল এই মেয়েটি। মুঠোর ভেতরে নিয়ে নিলে সেইরকম নরম লাগত হয়তো।

আপনার এই বিজনবাড়ি তো ততটা বিজনবিভুই নয়। এত লোক—বলতে বলতে স্বাতী দাঁড়িয়ে গেল। এ কী এখানে তো রেললাইন রয়েছে। তবে যে—

অরুণ লাইন পেরিয়ে গিয়ে বলল, সে তো থাকতেই পারে। ট্রেন তো কত জায়গাই ছুঁয়ে চলে যায়। সব জায়গায় কি থামে?

এখানে থামলে বেশ হত। আমরা চট করে নেমে পড়তে পারতাম। আচ্ছা, তুমি ঠিকঠাক চিনতে পারছ তো অরুণ? পথ ভুলে যাওনি তো!

অরুণ বুঝতে পারছিল, স্বাতী এখনও আপনি আর তুমির মাঝখানে যাতায়াত করছে, বলল, এই সোজা রাস্তাটাই হবে। খানিকটা গিয়ে একটা বুড়ো বটগাছ থাকার কথা। এসো।

এখনও ডানদিক বাঁদিকে কিছু পাকা বাড়ি। গো-খাদ্যের দোকান, অন্নপূর্ণা সার হাউস। মিষ্টির দোকানে সাজানো দানাদারের ওপর মাছি ঘুরছে। ডাক্তার পালের নার্সিংহোমের দোতলা বাড়ি। পাশেই নার্সারি স্কুল—চিলড্রেন্স ওন হেভেন। শিশুদের নিজেদের স্বর্গের টিনের বাক্সগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। এসব জায়গায় শহরতলিকে ছুঁয়ে ফেলেছে শহর। শহরেরও তো হাত-পা বাড়ে।

যদিও আরও কিছুটা হাঁটার পর একটা সরু খাল এসে গঞ্জকে আলাদা করে দিল। জল আড়াল করে ভাসছে কচুরিপানা। খালের পাশে যে জমি গড়িয়ে নেমেছে সেই জমির ওপরে বাবলাগাছের সারি। সেইসব গাছের নীচে ছায়া আর রোদ্দুর হাওয়ায় কাঁপছে পাশাপাশি। দূরে কোন ইটভাঁটার চিমনির মাথায় রোদ।

বুড়ো বটগাছ থেকে ধুলোয় ঝরে পড়া লালচে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চওড়া মাটির রাস্তায় ঘুরল দুজনে। খালের পাশে একটা উঁচু বাঁধ মতো। নারকেলগাছের পাতায় খসখস শব্দ হাওয়া ভাসিয়ে আনছে এদিকে। তাবপর আরও গাছগাছালি ছুঁয়ে নিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো মাঠের দিকে। অঘ্রাণের খোড়ো ধানখেতের মাঝখানে।

একটা মাটির বাড়ির সামনে মাটিতেই ছড়িয়ে রাখা গম, রোদ খাওয়াতে। দু-একটা চড়ুই আর শালিক ফুড়ুত ফুড়ুত উড়ছে আর মাঝেমধ্যে ঠোঁটে করে উল্টে দিচ্ছে গমের দানা। কোমরে ঘুনসি বাঁধা একটা ল্যাংটো ছেলে সেই বাড়ি থেকে একছুটে বেরিয়ে এই দুজনকে দেখে থমকে গেল।

স্বাতী কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অরুণ বলল, ওই যে সেই বাড়িটা।

বাদিকে একটা হিজলগাছ বেঁকে দাঁড়িয়ে। ডানদিকের জারুলগাছটা সোজা। যেন ওই বাড়িতে যাওযার দরজা। হাট করে খোলা।

আগাছা আর ঘাসে ঢাকা একছটাক জমি মাড়িয়ে ওরা বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তিন ধাপ সিঁড়ির একটা যেন মাটির ভেতরে বসে গিয়েছে। বারান্দার মেঝেয় বড় বড় খোঁদল। চৌকো পিলারে, দেওযালে ফাটল। সিমেন্টের চটা উঠে গিয়ে অনেক জায়গা থেকেই ঝুরো হয়ে বালি খসে গিয়েছে। দোতলার জন্য ইটের খাঁচা কবা হয়েছে একসময়। ওপরে জানলা দরজা কিছুই বসেনি। কালচে সবুজ হয়ে যাওয়া ইটের ফাঁকফোকরে বুনো গাছের, অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে বুড়ো বাড়িটাকে ঠাট্টা করার জন্য হয়তো।

ফ্যাকাশে, নিঝুম বাবান্দায় গিয়ে দাঁড়াল অরুণ। একতলার জানলাগুলোর ভাঙা দু-একটা পাল্লা বেঁকে ঝুলে আছে বাইরের দিকে। দরজা বলে কিছু নেই। বারান্দার দেওয়াল আর সিলিং যেখানে মিশেছে, সেদিকে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে অরুণ। স্বাতী দেখল—বেশ বড় সাইজের ঘটি হয়ে সেখানে ঝুলছে মৌমাছির চাক।

মানুষের বাড়ি ভাঙল কী রইল তাতে ওদের কি যায় আসে না, না স্বাতী!

এবকম একটা জায়গায় কেন বাড়ি করেছিলেন তোমার জ্যাঠামশাই? অদ্ভুত মানুষ তো।

সত্যিই অদ্ভুত। বাবা-কাকারা নাকি বারণ করেছিল। শোনেননি। কলকাতায় থাকতে চাইতেন না। মারা গেছেন ধরো বছর আটেক হল। তার আগে থেকেই অবশ্য দাদারা বাইরে। তিন বছর আগে আমায় পাঠানো হয়েছিল বাড়িটা দেখতে, জেঠিমা মারা যাওযাব পর। জেঠু এসে একাই থাকতেন। মাঝেমধ্যে কলকাতায় যেতেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। খুব দূরের লোক বলে মনে হত তখন। চাষবাসের গল্প করতেন। মরিচশাল ধান থেকে নাকি ভাল খই হয়। গরুও পুষেছিলেন এখানে। তার দুধ, দুধের দই আমরা কিন্তু খেয়েছি। বাড়ির সকলে। জ্যাঠামশাই একদিন বললেন, বাড়ির সামনের খালে আজ মাঝ ধরা পড়েছে। জ্যান্ত কই। আমি দেখতে পাই স্বাতী—বিকেলের সময় কাঁকড়া-চাষিরা ক্যানিংয়ের দিক থেকে এসে উঠেছে এই বাড়ির সামনে। উঠোনে চুলো ধরিয়ে তাতে কাঁকড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। তিন-চারশো ওজনের এক একটা। বলছে—বাবু, মদ আনাও। পাকা চুলের ভেতরে হাত দিয়ে জ্যাঠামশাই বাবাকে

লতেন—জানিস অনিরুদ্ধ, তাড়ি খেলে নাভির কাছটা কেমন চিনচিন করে। তখন বিশ্বাসই হত না যে জ্যেঠু একটা কলেজে বাংলা পড়াতেন কখনও।

একসঙ্গে এত কথা বলে অরুণ এবাব একদম চুপ করে গেল। এই গভীর দুপুরের ভেতর থেকে কোথাও একটা পাখি টি-টি-টি করে নাগাড়ে ডেকে চলেছে।

স্বাতী বলল, ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে নিশ্চয়ই। যাওয়া যায় না ওখানে?

দুজনে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় সরু গলায় কে যেন দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল—কোথায় যাচ্ছেন, ওখানে ঢুকছেন কেন?

দুজনের কেউই এতক্ষণ খেয়াল করেনি। বাড়িটার পাশেই [illegible] পুকুরে বুকজলে দুই কিশোর দাঁড়িয়ে। তাদেরই একজন চেঁচিয়ে উঠেছে।

অরুণ হাত দিয়ে ওপরে দেখাল। ছেলেটা আবার বলল, ও বাড়িতে কেউ থাকে না।

অরুণ চেঁচিয়ে বলল, জানি।

আচ্ছা, তাহলে যাও। বলেইছেলেটা পাশের জনকে ডেকে নিয়ে জলে ভেসে যাচ্ছিল আবার। যেন এই খবরটুকু দেওয়াই ওদের কাজ।

ওপরে উঠেই দুজন দেখল—একটা ঝাঁকড়া জামগাছ অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এতদিন বাদে এরা কারা। বাড়ির পিছনদিকেও আগাছা। আবার জামের পাশে একটা সবেদাগাছও রয়েছে। যজ্ঞডুমুর প্রায় হেলান দিয়ে রয়েছে বাড়ির গায়ে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরের মাঠ, ঘরবাড়ি, আকাশ। পায়ের নীচে খরখরে মেঝের দিকে তাকাতে গিয়েই অরুণ দেখল স্বাতীর শাড়িতে লেগে রয়েছে কয়েকটা চোরকাঁটা।

মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই। আকাশকে ছাদ ভেবে উঠে যাওয়া দুটো পিলারের মাঝখানে স্বাতী দাঁড়িয়ে। ক্যামেরার ফ্রেমের কথা মনে হল অরুণের। তখনই সেই ফ্রেমে ঘুরে দাঁড়াল স্বাতী। তুমি কুতুবমিনার দেখেছ অরুণ?

কুতুবমিনার! সেই কোন ছেলেবেলায় দিল্লি গিয়েছিলাম একবার।

আমি গিয়েছিলাম বড়বেলায়। বাবা, মা ভাই—সকলে মিলে। কলেজে পড়ি তখন। কুতুবমিনার থেকে একটু দূরে আলাউদ্দিন খিলজি আর একটা মিনার তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন—সেটা কুতুবমিনারেব দ্বিগুণ উঁচু হবে। পারেননি। কিছুটা হতে না-হতেই মারা যান। সকলে কুতুবমিনার দেখে, ওই ভাঙাচোরা জায়গাটা কেউ দেখে না। আমরা দেখেছিলাম। আমি [illegible] বাবা একটা উঁচু ঢিপির ওপর পা রেখে রেখে উঠেছি। মিনারের কাজের জন্য তার বাইরেটা বোধহয় গোল করেপাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছিল। কী ঠাণ্ডা ভেতরটা।

যেন নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বাতী এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছিল। ওই মিনারের চারপাশটা কেমন যেন ছায়া ছায়া। শক্ত পাথরে হাত রেখে কীরকম লাগছিল। যিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি তো একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাথরে হাত রেখে মনে হয়েছিল—স্বপ্ন দেখা কী কঠিন। স্বপ্নে যা দেখি তা বানিয়ে তোলা কত কঠিন!

স্বাতী চুপ করার পরও আবও কিছুটা সময় নিল অরুণ। তারপর বলল, তোমায় কিছু কথা বলার ছিল স্বাতী। এক বছর ধরে মাঝেমধ্যেই প্রতুলদা তোমার কথা বলেছে আমাকে। ও হয়তো নিজেব মতো করে কিছু ভেবে নিয়েই বলেছে। কিন্তু আমি জানি—আমার জীবনের সঙ্গে কোনও মেয়েকে জড়িয়ে নেওয়া খুব শক্ত। আমি চাকরি করি না। করবও না কোনও দিন। স্বপ্ন দেখি ভাল ছবি করব। কিন্তু ওই যে তুমি বললে না—স্বপ্ন যা দেখি তা বানিয়ে তোলা কঠিন। কবে যে কী করতে পারব নিজেই জানি না। ক্যামেরার ফোকাস আগুপিছু করে অনেক কিছু স্পষ্ট করা যায়। কিন্তু জীবন তো ক্যামেরা নয়। আর তাছাড়া—। তুমি শুনছ স্বাতী?

শুনছি। আমারও বলার আছে।

আগে আমি বলে নিই। মাঝখানে প্রতুলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না ঠিকমতো। ও অনেক কিছু জানে না। বছরখানেক আগের কথাই বলছি। একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার। সেটা যে ঠিক কী তার কোনও ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। মাধুরীর স্বামী আছে, সংসার আছে জেনেও আমি—। ও এসব কিছুর তোয়াক্কা করত না। আমি—

থেমে গেল অরুণ। সে দেখতে পাচ্ছিল—স্বাতী তার ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রয়েছে। তাকিয়ে রয়েছে দূরে।

অরুণ বলল, মেয়েদের শরীরের সবটুকু আমি জানি স্বাতী। মাধুরীর কাছ থেকেই জেনেছি সব। একদিন নয়। অনেকদিন।

স্বাতী তার ঠোঁট আলগা করে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এখান থেকে চল অরুণ।

অনেক দূর থেকে হাওয়ার পিঠে চেপে গান আসছিল এখানে। রোদ নরম হয়ে এলেও একটা গোটা দিনের গন্ধ এখনও রয়ে গিয়েছে চারপাশে। শুধু বাঁশঝাড়ের নীচে ছায়া দুলছে পাতার। আমগাছের ডালে শালিখদের ঝুটোপাটি।

চটি খুলে রেখে ঘাসে পা ডুবিয়ে বসেছে স্বাতী। এখনও তার শাড়ির পাড়ের কাছে আটকে রয়েছে কয়েকটা চোরকাঁটা। হাতের বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে রেখেছে। ভাবছিলসে—আজ কি পুজো আছে কোনও? নাকি অন্য কিছু! নইলে গান আসে কোথা থেকে। অনেকটা পথ পেরোতে গিয়ে গানের কথা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। তাতেই বা কী আসে যায়। জানা কথা জানা সুর।

চুপকরে অরুণও শুনছিল। আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও...আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা...ধুইয়ে দাও....।

স্বাতী যেখানে পা রেখেছে তার কিছুটা দূরে গিয়েই ঘাস-জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে সর্ষে খেতের ভেতরে। আর বাতাসের ভেতরে সবুজ পাতা নিয়ে অল্প অল্প দুলছে সর্ষে খেতের হলুদ সব ফুল। রোদ গায়ে মেখে সেসব যেন আরও হলুদ দেখাচ্ছে।

অরুণের মনে হচ্ছিল—বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারা এখানে বসে আছে, কই কেউ

তো এখান দিয়ে হেঁটে গেল না। আসার পথে একটা ছোট্ট সাঁকো পেরিয়ে গ্রাম পাওয়া গিয়েছিল। দুপুরের অলস চেহারার মাটির ঘর কিছু। খড়ের গোলা। ছোট মাঠে বল নিয়ে ছুটছিল কিছু ছেলে। মাদুর বিছানো মাটির দাওয়ায় একটা ট্রানজিস্টর বাজছিল একা একাই। তাদের ছাড়িয়ে এসেছে দুজনে। এই দিকের পৃথিবীতে তা হলে কি কেউ থাকে না। নাকি তারা আসবে বলে সকলে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে!

স্বাতীর দিকে তাকাল সে। এত সময়ে একটা-দুটো কথা বলেছে। বাঁশের সাঁকো পেরনোর সময় হাত ধরতে হয়েছে তার। এই মাঠ, সুপুরিগাছের সারি, সর্ষে খেতের ফুল আর এই মেয়েটিকে মনে রাখবে অরুণ। এখানে কিংবা এখান থেকে দূরে একসময় একটা নদী ছিল। বিদ্যাধরী। এখন আর তাকে খুঁজে পায় না কেউ। তবু মনে তো রেখেছে মানুষ। কত কথাই যে পাকাপাকি চোরকাঁটা হয়ে মাথায় গেঁথে যায়।

এইসময় স্বাতী মুখ তুলে তাকাল তার মুখে। আমার বাড়ির কথা তুমি তো শুনেছ অরুণ?

হ্যাঁ, প্রতুলদার কাছে শুনেছি।

বাবা যখন চার বছর আগে মারা যায় তার মাত্র ন'-দশ মাস আগেই আমি চাকরিটা পেয়ে গেছিলাম। নইলে আমার মা আর ভাইকে না খেয়ে মরতে হত। আমি কলেজ ছাড়ার আগেই বাবা রিটায়ার করে যায়। এটা-সেটা করে সংসারটা চালিয়ে নিত কিন্তু ভাইয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা যে বাবা কীভাবে জোগাড় করত ভাবতেও পারি না। তুমি কখনও স্প্যাস্টিক কাউকে খুব কাছ থেকে দেখেছ?

না। একেবারেই না।

দেখলে বুঝতে পারতে। মা আর ভাইয়ের কাছ থেকে আমি সরে গেলে ওরা মরে যাবে। রোজ অফিস থেকে ফেরার পর ভাই যখন এসে আমায় জড়িয়ে ধরে তখন—। ভাল করে কথাই বলতে পারে না। হাঁটতে কষ্টও হয় ওর। আজ যখন বেরচ্ছি, মা জানতে চাইল। আমি মাকে সব বলি। আজ বলতে পারিনি। বললাম, বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। মা, ভাই ছাড়া আমি আর কারও কাছে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না অরুণ। কাউকে এসব বলবই বা কেন?

স্বাতীর কথা শুনতে শুনতে তার চোখের মণিতে এতক্ষণ সর্ষে খেতের ছবি দেখতে পাচ্ছিল অরুণ। এবার দেখল—সেই ছবি জলের তাপে আবছা হয়ে যাচ্ছে। এই তো পাশে রয়েছে স্বাতীর হাত। ইচ্ছে করলেই অরুণ সে হাতে হাত রাখতে পারে। পারছে কোথায়?

স্বাতী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সেভাবেই বলল, প্রতুলদা জানে রণজয়ের কথা। আমার সঙ্গে পড়ত সায়েন্স কলেজে। বাড়িতেও আসত। মা কিছু বুঝতে চায় না। ওকে আসতে বলত। বাবা তখন সেরিব্রাল হয়ে একদম বিছানায়। রণজয় বাঙ্গালোরে চাকরি পেয়েছে। আমায় বলল—চল। সেদিন আমাদের বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ও আমায়—। আমার ঠোঁটে—।

স্বাতী কিছুক্ষণ থামল। তারপর বলল, মেয়েরা বোধহয় এভাবে বলে না, না অরুণ।

আর কিছু বলবে না?

বাঙ্গালোরে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রণজয় আমাকে যেখানে যেতে বলেছে, গিয়েছি। আরও বেশ কয়েকবার ও—। আমি কিছু বলিনি। বলতে পারিনি। জানতাম, আর কোথাও যাওয়া হবে না আমার।

এখন আর কোনও কথা নেই। হাওয়ায় বাঁশপাতার সরসর শব্দ শুধু। ঘাসেব ওপর একটা পাখি এসে বসে ইতিউতি দেখছে। তার শরীরের ওপর দিকটা বাদামি, বুকের কাছে নরম বোমে বেলে রং। মাথায় ঝুঁটি। অরুণ মন দিয়ে দেখছিল। কী পাখি এটা। তীই-উই শব্দ তুলে ওই যে উড়ে যাচ্ছে সে।

অরুণ উঠে দাঁড়াল। চল স্বাতী।

কোথায়?

সর্ষে খেতের ফুল কাছ থেকে দেখেছ কখনও? ছুঁয়ে দেখেছ? চল যাই ওখানে।

গড়ানে জমি দিয়ে ওরা সর্ষে খেতের কাছে নেমে এল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে তার ভেতরে চলে যাচ্ছিল দুজনে। দু পাশে হাত ছড়িয়ে ফুল ছুঁয়ে নিচ্ছিল স্বাতী। তার মনে হল, সোনালি-সবুজ এই মাঠ নীল আকাশের গায়ে লেগে রয়েছে বুঝি। দূর থেকে তাদের দেখলে যদিও অন্য কেউ ভাবতে পারে—আকাশের রং পৃথিবীব গায়ে ছুঁয়ে গিয়েছে। একটু পরেই হয়তো নীল কুয়াশা এসে মুছে দেবে এই ছবি।

স্বাতী—। ডাকল অরুণ। আলের ওপর দিয়ে দৌড়লে পড়ে যাবে কিন্তু।

মোটেই না। তুমি কিছুই জানো না। জানো, ছোটবেলায় একদিন স্কুল থেকে একা একা ফিরছিলাম, আর মা জানলা দিয়ে দেখছিল বলে রাগ করে আমি রাস্তাতেই বসে পড়েছিলাম।

তাই বুঝি! বলে অরুণ এগিয়ে এসে স্বাতীর হাত ধরল। তার চোখের মণিতে এখন জলেরতাপ নেই। চারপাশের পৃথিবীর ছবি সেখানে।

কাঁধের ব্যাগ মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তুলল না স্বাতী। অরুণের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়েও নিল না। ঠোঁটে হাসি নিয়ে সে বলল এভাবে কিছু হয় বুঝি?

অরুণ হেসে বলল, জানি না তো।

টেককা টেককি

কণা বসু মিশ্র

ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসেছিল তিলক। ওর চোখের সামনে দিয়ে সকাল ফুরিয়ে যাচ্ছে। রোববার অথচ বেরোতে পারেনি। এই রোববারেই সকালটাই সব থেকে দামি মনে হয় তিলকের কাছে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সামনের রাস্তাটায় রীতিমতো জল দাঁড়িয়ে গেছে। আকাশ এখন মেঘলা। তিলক শীতকাতুরে হলেও শীত ভালবাসে। গরম মোটেই সহ্য হয় না ওর। লোডশেডিংযের দাপটে প্রায়ই ও সর্দিগর্মিতে ভোগে। অসহ্য গরমের পর সবে বর্ষা নেমেছে। সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। তিলক বারান্দায় বসে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাগানের আমগাছের ডালে কাকের বাসা দেখছে। কদিন ধরে ঠোঁটে করে খড়কুটো এনে কাকটা দিব্যি বাসা বানিয়েছে। তারপর ডিম পেড়েছে। এখন যত্ন করে সেই ডিমে তা দিচ্ছে। ঝড়ের বেগে সব ডালপালা তখন ওলোট পালোট খাচ্ছে, কাকটা অসহায় ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তিলক ভাবে, কাকটাকে যদি ও সাহায্য করতে পারত।

ওদিকে তিলকের বউ রান্নাঘর থেকে তখন হাঁক পাড়ছে, কি গো বাজার টাজার যাবে না?

তিলকও চেঁচায়, এই জল কাদায় যাই আর কি? খিচুড়ি আলু পেঁয়াজ ভাজা আর ডিমভাজা করে দাও। ফার্স্ট ক্লাস। আজ তো খিচুড়ি খাবার দিন।

তিলক একেই কুঁড়ে। বাজারে যেতে চায় না। তারপর আবার বৃষ্টি হওয়ায় পোয়া বারো। কিন্তু বৌয়ের হাত থেকে কি আর রেহাই আছে? তেড়ে আর এক চোট বৃষ্টি নামে। তিলক মনে মনে খুশি হয়ে একটা সিগারেট ধরায়।

তিলকের বৌয়ের গলা শোনা যায় রান্নাঘরে। তিরিক্ষি মেজাজে কী নিয়ে যেন ঝিয়ের সঙ্গে চেঁচামেচি করছে। তিলক জানে, আসল ঝালটা তিলকের ওপরেই ঝাড়ছে। ঝি উপলক্ষ্য মাত্র। তবু তিলক নট নড়ন চড়ন।

ওর চোখের সামনে উঠোনের ওই প্যাঁচপেচে কাদা। আমের ডালটা যদি ভেঙে [illegible] মাথায় পড়ে?

তিলক মরলে বৌ বড়লোক। কথাটা ভেবেই চাপা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে [illegible]। তিলকের বৌ কাপড়ে হলুদ মুছতে মুছতে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত নেড়ে [illegible] গলায় বলে, শুধু চালে ডালে চড়িয়ে দিলেই হবে? নুন আনবে না? পেঁয়াজ আ[illegible], ডিমভাজা, আলু ভাজার ফরমাশও তো আছে?

তিলকের মাথায় ধাঁই করে বেজে ওঠে পেঁয়াজ শব্দটা। তিলক ব্যঙ্গ মেশ[illegible] বলে, আমাদের বাড়ি বাপু পেঁয়াজ টেঁয়াজ চলত না। পেঁয়াজ, মুরগি, এস[illegible]গুলো তুমি আসার পরই আমদানি..। তিলকের বৌ তেলে বেগুনে জ্বলে ও[illegible]।

—কী কী বললে? আমি এসে? আমি এসে তোমার জিভের স্বাদ [illegible]য়েছি বল? জানতে কিছু? পেঁয়াজ ছাড়া কি মশুর ডালের পালা খিচুড়ি হয়? পেঁ[illegible]মেটো [illegible]? এতদিন তো শুধু খেয়েছ তোমরা মুগডালের খিচুড়ি।

তিলক হেসে বলে, খিচুড়িতে কেমন পুজো পুজো ভাব বল [illegible]

—কী, কী বললে?

তিলক বিড়বিড় করে বলে, ভ্যামভ্যান উইম্‌কল।

—কী বললে?—এবার তিলকের বৌয়ের গলার স্বর আরও চড়া। তিলক কথা ঘুরিয়ে মুচকি হাসে। বলে, বলছিলাম ভোগের খিচুড়িই হোক না আজ।

তিলকের বৌ চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, বললেই হল? কোথায় তোমার গরম মশলা ঘি নারকেল, পেস্তা বাদাম কিশমিশ?

তিলক বৌয়ের ফর্দ শুনে আঁতকে ওঠে।—এসব তোমার স্টকে নেই?

—কী করে থাকবে? বাজার যাও কদিন?

—তুমিও তো যেতে পার। তুমি তো বাপু পর্দানসীন যুগের বালিকা বধূটি নও?

—নই। কিন্তু কেন যাব? তুমি রান্নাঘরের হেঁসেলটি ধরবে? আজকাল তো ফিফটি ফিফটির যুগ, তাই না? দুজনেই দুজনের কাজ সমান ভাবে ভাগ করে নেব।

—বেশ, তুমি তবে অফিস যাও?

—অফিস তো যেতুম। চাকরিটা ছাড়িয়ে দিলে কেন? হেঁসেলটা ধরার জন্যে নয়?

—যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।

—এখন একথা বলছ, কিন্তু সেদিন? আমি তো তাই চেয়েছিলুম?

কথা চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। অশান্তির ঝড় উঠবে। তিলক চট করে বলে বসে, বৌ ট্রামে, বাসে, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি খেয়ে চাকরি করতে যাবে, আর আমি তাই বসে বসে দেখব?

—ওসব ছাড়ো, ঢের হয়েছে আদিখ্যেতা। এবার ভোগের খিচুড়ি না কী বলছিলে, তাই বল?

তিলক বলে, কী বলব? ঘরে কি মুগডাল, গোবিন্দভোগ নেই? নারকেল, কাজুর দরকার কী? আমার মাও তো খিচুড়ি করতেন।

তিলকের বৌ বলে, কী বললে। তোমার মা ঘি গরমমশলা পেস্তা ছাড়া ভোগের খিচুড়ি করতেন কী করে? ভোগের খিচুড়ি বলতে আমরা তাই বুঝি গো। তোমাদের বাড়িব সঙ্গে আমাদের বাড়ির ঘরানার এটাই ফারাক। আমি বনেদি বাড়ির মেয়ে বুঝলে?—কথাগুলো বলেই তিলকের বৌ ব্যঙ্গের হাসি হাসে।

বৌয়ের কাছে হেরে গিয়ে তিলক মনে মনে লজ্জা পায়। কারণ, তিলক জানে, ওর বাপের বাড়ির গল্পের এখানেই শেষ নয়। তিলক তাড়াতাড়ি নিজেকে সামনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোগের খিচুড়ি আমার মাও অমনি করে করতেন। তবে এখানে মানুষের ভোগের প্রশ্ন উঠছে কিনা।

তিলকেব বৌ ভেঙে পডা এলোখোঁপা ঠিক করতে করতে বলে, দেবতার ভোগ শেষ পর্যন্ত কাদের পেটে যায় মানুষছাড়া?

তিলক বলে, আহা! থামবে? এই বৃষ্টির মধ্যে দোকানপাট কি তেমন খুলেছে বল? তুমি বরং সস্তার খিচুড়ি টিচুড়ি কিছু একটা করে দাও।

তিলকের বৌ ফের জ্বলে ওঠে। বলে না, সস্তা নয়। সস্তার খিচুড়ি আমি জানি না। আমি তো সস্তা বাড়ির মেয়ে নই? জানব কী করে?

—মুশকিল! জানা উচিত ছিল। দ্যাখো দেখি, এই দুর্দিনের বাজারে...।

তিলকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওর বৌ বলে, তোমার মায়ের তাহলে মেয়ে

দেখতে যাবার সময় বলা উচিত ছিল, তুমি সস্তার রান্না কী শিখেছ মা? তা না বলে উনি তো আমায় পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারির রেসিপি জিজ্ঞেস করেছিলেন? ছেলের ক্ষমতার কথাটা ভেবে সস্তার রান্নার রেসিপি জিজ্ঞেস করলেই পারতেন?

বৌয়ের কাছে মুখ ঝামটা খেয়ে তিলক চুপ করে যায়। এমন সুন্দর বর্ষার সকাল! কোথায় রসের কথা বলবে তা নয়। কী ঠিকুজি মিলিয়েই না মা বিয়ে দিলেন আহা! কিন্তু সেই বা কম যাবে? তিলক বলে, ওসব রান্নার রেসিপি জিজ্ঞেস করলেই তুমি পারতে? এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন কোনো হাই ফাই ঘর থেকে আসছ তুমি।

তিলকের বৌ বলে, তাহলে কী আর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হত?

—সক্কালবেলা তুমি কি থামবে? তিলকের বৌ বলে, তুমি যত জোরে চ্যাঁচাবে, আমিও তত জোরে চ্যাঁচাব। তিলক বলল, তা আর চ্যাঁচাবে না? জ্যোতিষীকে দিয়ে ফলস্ কুষ্টি করে তো তোমার মা বিয়ে দিয়েছিলেন।

তিলকের বৌ চোখ কপালে তুলে বলে, আর তোমার মা বুঝি ধোওয়া তুলসী পাতা? উনি যাননি পঞ্চানন জ্যোতিষীর কাছে তাঁর ছেলের নতুন কুষ্টি করতে?

তিলক বলে, গিয়েছিলেন নিশ্চয়। যেমন তোমার মা গিয়েছিলেন।

—এই খবরদার আমার মা তুলে কথা বলবে না বলছি। অত ছোট কাজ আমার মা করেন না বলছি।

—আমার মা-ই বুঝি করেন?—তিলক চেঁচিয়ে বলে, তিলকের বৌ ততোধিক চেঁচায়।—উনি স্বর্গে গেছেন। ওঁকে নিয়ে আব কথা বাড়াতে চাই না। তোমাদের পরিবারের নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা।

বৌয়ের সঙ্গে তর্কে তিলক একেবারেই পেরে ওঠে না। ও দারুণ রেগে যায়। ও পাঞ্জাবির পকেট বাজিয়ে বলে, তোমার মা, বাবা কি খোঁজ খবর না নিয়েই বিয়ে দিয়েছিলেন? আমার অফিসে যান নি খবর নিতে? আমি রিটায়ার করলে কত পাব, না পাব, একেবারে ক্যালকুলেশন করেই না ওঁরা...।

—থামো, থামো।—তিলকের বৌ বলে, তোমার মা বড়ো গল্প করে বলেছিলেন, বিয়ের পরই নাকি তুমি ফরেন চলে যাবে?

—ফরেন?—তিলক কপালে চোখ তোলে। বলে, একথা আবার কে বলল?

তিলকের বৌ চোখ ঘুরিয়ে বলে, কে আবার বলবেন? তোমার মা-ই বলেছিলেন।

তিলকের মেজাজ এবার সত্যি চড়ে যায়। ও দুহাত অস্থিরভাবে চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে বলে, বাজে বকবে না বলছি। একদম বাজে বকবে না। আমার মায়ের তো আর মাথা খারাপ হয়নি? তিলকের বৌ বলে, মাথা খারাপ কেন হবে? একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মাথাতেই বলেছিলেন উনি।

—দ্যাখো, আমার মায়ের নামে মিথ্যা বলবে না বলছি।

তিলকের বৌ কপালে হাত ছুঁযে বলে, ছিঃ! মিথ্যে বলব কেন? উনি স্বর্গে গেছেন। ওঁর নামে কি মিথ্যে বলতে পারি? তিলক কোনো কথা বলে না। ও গম্ভীরভাবে বারান্দায় মোড়ার ওপর বসে বসে পা দোলায়। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকতেন? ও সোজা গিয়ে চেপে ধরত ওঁকে। মায়ের স্বভাবই ওই ছিল, ছেলের ক্ষমতা থাক বা নাই থাক, বানিয়ে বানিয়ে তিলকে তাল করা। বিয়ের বাজারে ছেলের দাম তো বাড়ালেন, এখন ঠেলা সামলাবে কে?

তিলককে জব্দ করতে পেরে তিলকের বৌ মহা খুশি। আড়চোখে সে স্বামীকে জরিপ করতে করতে বলে, তোমার মা অবশ্য মিথ্যে বলেন নি। সত্যি তো ফরেন গিয়েছিলে তুমি। বাংলাদেশে যাওনি—কথাগুলো বলেই ও মুখ টিপে হাসে।

অপমানে তিলকের মুখ লাল। সে আগুন চোখে স্ত্রীকে দেখে। তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে, থামবে?

ঠিক সেই সময় গেট খুলে কারা যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তিলক একগাল হেসে বলে, একেবারে কাকভেজা হয়ে যে। আরে, এসো বোসো।

তিলকের বৌ পর্দা সরিয়ে বলে, ওমা, তোমরা? বোসো, বোসো।

তিলক ত্যারছা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। আগন্তুক মহিলাটির চোখে মুখে হাসির বান। বলে যাক, চিনতে পারছ?

তিলকের বৌ বাঁকা হাসি ছুঁড়ে বলে, কী যে বল? ও মুখ কি ভোলবার? তিলক বিরক্ত হয়, বৌয়ের ব্যঙ্গে। মহিলা তিলকের পূর্ব প্রেমিকা। বর্তমানে বন্ধুপত্নী। ওদের প্রেম যদিও বেশিদূর এগোয় নি। এই আড়ে আড়ে চাওয়া, কথার পৃষ্ঠে দু-একটা কথা ছোঁড়া। লুকিয়ে চুরিয়ে দূর থেকে চোখাচোখি। পয়লা বৈশাখের সকালে শুভেচ্ছা জানানোর ছলে একে অন্যকে রক্ত গোলাপ দেওয়া। হাতে হাত ছুঁইয়ে প্রেমেব প্রতিশ্রুতি। এই আর কী। কিন্তু সেই পূর্বরাগের পালা চলতে না চলতেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরই তিলক আবিষ্কার করে, ওরই এক বন্ধু ওর প্রেমিকার স্বামী।

সেই সব গল্পই দুর্বল মুহূর্তে তিলক করেছে বৌয়ের কাছে। ব্যস, আর যায় কোথায়? উঠতে বসতে সেই খোঁটা।

বন্ধু-পত্নী এলেই তিলক-আজকাল খুব স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। বুকের ভেতর পাথর চাপা যন্ত্রণা নিয়েও তিলক হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানায়। এখন তিলক ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে বন্ধুর দিকে আর একটা এগিয়ে দেয়।

সহাস্যে বন্ধু-পত্নীকে বলে, তারপর? অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল? এ রাস্তা দিয়ে কি আর হাঁটা টাটা হয় না? বন্ধুপত্নীও কলকল করে ওঠে, আমাদের বাড়িটাই কি খুব বেশি দূরে? মনে আছে নিশ্চয়?

তিলক উত্তর দেবার আগেই ওর বৌ বলে ফেলে, না না, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবার নয়। তিলক শ্যেনদৃষ্টিতে বৌয়ের দিকে তাকায়। এতদিন বাদে দেখা, কিন্তু এভাবে বাগড়া দিলে কি কথা জমে? বৌয়ের মুখ নাড়া খেয়ে যে তিলক শামুকের খোলের মধ্যে গুটিয়েছিল, সেই তিলকই এখন একটু একটু করে বেরিয়ে আসে। তিলক ভাবে, এই বিবাহ শব্দটার মধ্যেই যত গণ্ডগোল। বিয়ে ফিয়ে না কবলে তো দিব্যি বন্ধু-পত্নী টত্নীদেব নিয়ে চালিযে দেওয়া যেত।

তিলকের বন্ধুটিও কম স্মার্ট নয। তিলকের বৌয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে, কী ব্যাপার? আমার বৌ ই বুঝি এ বাড়ির প্রধান অতিথি? আমি আর কেউ নই? আমায় বসতে বললি তো?

তিলকের বৌ ব্যস্ত হয়ে বলে, বসুন বসুন। এক যাত্রায় পৃথক ফল, তা কি হতে পারে?

গোঁফ মুচড়ে তিলকের বন্ধু আয়েশ করে বসে। তিলকের দিকে তাকিয়ে বলে, জানিস তো বেশিদিনের অদর্শনে সম্পর্কটা জোলো হয়ে যায়।

তিলকের বৌ বলে, তাই নাকি। আমার তো মনে হয়, সম্পর্কটা আরো গাঢ় হয়। আমাদেরই দেখুন না, রোজকার এই মাজাঘষা জীবনে...। তিলকের বৌ আরো কী বলতে চায়। কিন্তু তিলক কড়া চোখে একবার তাকিয়ে বৌকে থামিয়ে দেয়। তিলক ভাবে এই মুখরা স্ত্রীলোকদের জন্যেই সংসারে যত অঘটন। ওর বন্ধু-পত্নী তখন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখছে। গোটা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে ে.সে তিলকের একদা প্রেমিকা বলে, যা একখানা বাড়ি করেছেন, দারুণ।

তিলক খুশি হয় না। ওর মুখটা ব্লটিং পেপারের মতো চুপসে যায়। সেই মুহূর্তে ওর চোখ চলে যায় ঘরের ফাটা দেওয়ালের দিকে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। এক বছরও হয়নি বাড়ির বয়স। এরই মধ্যে দেওয়াল ফেটে চৌচির। সিমেন্টে ভেজাল। কন্ট্রাকটর পয়সা মেরেছে। তিলক ভাবে সত্যিই কি প্রশংসা করল নাকি ওটা ওর শ্লেষ? তিলক কিছুই বলে না চুপ করে থাকে। ওর বৌ-ই বলে, বাড়ির মালিক যদি মিষ্টি হয়, তবে ফাটা বাড়িও মিষ্টি কী বল?

বেকায়দায় পড়ে তিলক ভেতরে ভেতলে জ্বলতে থাকে। সেই বেকায়দা অবস্থা থেকে ওকে অবশ্য উদ্ধার করে ওই একদা প্রেমিকাটিই। সে বলে, বাড়ির মালিক মিষ্টি না টক, ঝাল, তেতো সে ভাই যে ঘর কবে সে বোঝে। মিষ্টি হলেই বা, মিষ্টির ভাগটা তার ভাগ্যে জোটে কি?

তিলকের বন্ধু বলে, চ্যাপ্টারটা এখন বন্ধ করলে হয না?—সে তার স্ত্রীর দিকে তাকায়। তিলক তাড়াতাড়ি বৌকে বলে, যাও যাও চটপট চা করে নিয়ে এস। লাহিড়ীর গিন্নি একেবারে ভিজে ফিজে গেছে।

তিলক সহজভাবে ওদেব দিকে তাকায়। কিন্তু তিলকের বৌয়ের বুকে কথাটা ধক্ করে বাজে। তিলকের বৌ ভাবে, আহা, সে কি এ বাড়ির দাসী বাদি? লাহিড়ী গিন্নির জন্যে চা করতে যাবে? তিলকের বৌ তাই সঙ্গে সঙ্গেই নড়ে না। উল্টে তিলককে বলে, তুমি যাও তো চটপট বাজারটা সেরে ফেল। চায়ের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। তারপরই তিলকের বৌ অদ্ভুত এক কাণ্ড করে ফেলে। সে খপ করে লাহিড়ী গিন্নির হাত চেপে ধরে গলায় মধু ঢেলে বলে, এসো ভাই, কাপড়টা ছেড়ে ফেলো।

অপ্রস্তুত লাহিড়ী গিন্নি বলে, আমার কিছু অসুবিধে নেই। সিনথেটিক শাড়ি। হাওযায় দিব্যি শুকিয়ে যাবে।—কথাগুলো বলেই লাহিড়ীর বউ উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যানের রেগুলেটারের গতিটাকে বাড়িয়ে দেয়। শাড়ির আঁচলটা ছড়িয়ে ধরে পাখার নিচে। সময়টা বর্ষাকাল হলেও শীতকাতুবে তিলক খক খক করে কাশে। এতক্ষণে ওদের দুজনেরই খেয়াল হয়, তিলকের গায়ের চাদরটাব দিকে। লাহিড়ীর বউ হেসে বলে, কী ব্যাপার? আপনাব গায়ে দি দার্জিলিং পাহাড়?

তিলক লাজুক লাজুক হাসে। তিলকের বউ বলে, ওর তো সব সময় শীত শীত বাতিক।

লাহিড়ীর বউ অন্যমনস্কভাবে বলে, জানি?

তিলকেব বউ আড়চোখে তাকিযে বলে, জানো?

তিলক সপ্রতিভভাবে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, পূর্বজন্মেব স্মৃতি থেকে।

তিলকের বন্ধু লাহিড়ী বলে, তোমরা আপাতত পূর্বজন্মের স্মৃতিচাবণ কর। আমি একটা সিগারেট ধরাই।

লাহিড়ীর কথায় সবাই হেসে ফেলে। তিলকের বউ উঠে দাঁড়ায়। এবার সত্যি সে চা করতে যায়। বউয়ের পেছন পেছন তিলকও যায় রান্নাঘরে। তিলক গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে, কিগো শুধু চা-ই দেবে? কিছু আনতে টানতে হবে না?

তিলকেব বউ কোনো জবাব দেয় না। গুম হয়ে থাকে। তিলক নরম গলায় আমতা আমতা করে, মানে ওরা ভিজে টিজে এল তো? আর অ্যাদ্দিন বাদে এল, তাই বলছিলাম, গরম চপটপ...।

তিলকের বউ ফোঁস করে ওঠে, এই না বাজার করার নামে তোমার জ্বর এসেছিল?

তিলকের আর দ্বিতীয় কথা বলা হয় না। ও কেন্নোর মতো গুটিয়ে যায়। তিলক ভাবে, ধিক্ তার পুরুষ জন্ম। এই রকম চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়েও বউয়ের বিনা অনুমতিতে ভূতপূর্ব প্রেমিকার জন্য কিছু খাবার দাবার আনার সাহস নেই আর? গোমড়া মুখে ফিরে গিয়ে বাইরের ঘরেই বসে তিলক। ভিজে কাপড়ের মধ্যে থেকে ভুবভুর করে বন্ধু-পত্নীর গায়ের মিষ্টি গন্ধ। তিলক সাবধানে টেনে নিঃশ্বাস নেয়। চোরের মতো চেয়ে দেখে বন্ধু পত্নীকে। লাহিড়ীর বউ আরও গোলগাল হয়েছে। তিলক চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে, এই পুরুষোচিত বিশাল শরীরটা নিয়েও সে মেয়েমহলে ভিতুই থেকে গেল? শুধুমাত্র অধিমাত্র অধিকার প্রয়োগের অভাবে সে এই মেয়েটির জীবনসঙ্গী হতে পারল না।

তিলকের বউ খানিকবাদে চা নিয়ে আসে। অন্য প্লেটে চানাচুব। কিছু পকৌড়াও ভেজে এনেছে বউ। তিলক অবাক হয়। তিলককে আরও অবাক করে দিয়ে বউ বলে, বিষ্টি ফিষ্টি পড়ছে, আমাদের সঙ্গে আজ দুটো খিচুড়ি হয়ে যাক না?

কথাটা ছুঁড়েই সে তিলকের দিকে তাকায়। তিলক বোঝে, বউ ওকে টেক্কা দিতে চায়। তিলকের হয়তো খুশি হওয়াই উচিত ছিল। লাহিড়ী আর লাহিড়ীর বউ কিছু বলার আগেই তিলক তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁ, ওদের বয়েই গেছে তোমার খিচুড়ি খেতে। রোববারের দুপুর। ওদের হয়তো অন্য কোনো প্রোগ্রাম ট্রোগ্রাম...।

লাহিড়ীর বউ বলে, না সেসব কিছুই নেই। দুপুরটা কাটিয়ে যেতে পারলে তো আমাদেরও ভালই লাগত। কিন্তু ছেলে মেয়েকে ফেলে এসেছি তো? চায়ের কাপে চুমুক মেরে লাহিড়ী বলে, আড্ডার পক্ষে খিচুড়ি কিন্তু উত্তম। বৃষ্টিও পড়ছে। তিলক তাস ফাস চলবে নাকি?

তারপর নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি না হয় বাড়ি যাও। অনেকদিন পর আমাদের আজ এখানে তাসের আড্ডাই হোক।

ফ্যাসফেসে গলায় তিলক কী বলতে যায়, তিলকের বউ হেসে বলে, ওই বা যাবে কেন? একটা দুপুব কাজের লোকই না হয় ছেলেমেয়েকে দেখবে। ফোন কবে দিলেই হয়?

তিলক আশ্চর্য হয়, তার বউ হাত গলে বেরিয়ে গিয়ে কেন বারবার প্রথম হবে? তিলককে জিততে দেবে না? এখন যে খেলার চালটা তার বউ চালছে, তাতে অবশ্য তিলক খুশি। স্বামীর পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে ভদ্রতা করে বউ উদার হতে চায়। তো হোক না। চায়ের কাপ শেষ কবে তিলক হাসি মুখে উঠে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে তিলকও খুব উদার হয়ে যায়। বউকে বলে, দাও বাজারের ব্যাগটা।

তিলকের বৌয়ের চোখে তখন ছুরির ধার। তিলক বউকে এবার গ্রাহ্য না করে সাহসী

। লাহিড়ী, লাহিড়ীব বউ দুজনেই বাধা দিয়ে বলে, এই না খিচুড়ির মেনু হল?
বার বাজার কেন?

ক বলে, শুধু খিচুড়ি খাওয়ালে আমার বউয়ের প্রেসটিজ থাকবে? সেই সঙ্গে মাছ ভাজা যদি না হয়? এই বর্ষার বাজারে যা ইলিশ উঠছে না?

লকের বউ তাড়াতাড়ি বলে, টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে দিই? আসবার পথে অন্নপূর্ণা স থেকে কিছু কষা মাংসও নিয়ে এসো।

লক এবাব বিপদে পড়ে যায়। ও মনে মনে গজরায়, মাসের শেষ। পকেট ফাঁক্কা। গে প্রেস্টিকা...। তিলক ভালই জানে বউ ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না। বাড়িতে রান্নার মেলা তুললে ও সুড়সুড় করে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তিলক বলে, স্তোরাঁর মাংস খাওয়াবে? তার চেয়ে বাড়িতেই তুমি মাংসটা...। তোমার হাতের কষা স তো চমৎকার।

তিলকের বউ কিন্তু খুশি হয়। হেসে বলে, থাক এদের সামনে আর স্ত্রৈণভাব দেখাতে বে না। অন্নপূর্ণার কষা মাংস তো তোমার খুব প্রিয়। বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীকে তোমার য় রেস্তরাঁর কষা মাংসের টেস্টটা করানোর সুযোগ যখন পেয়েইছো...।

লাহিড়ী, লাহিড়ী বউ আর একবার বাধা দেয়। তিলকের বউ ততক্ষণে স্বামীর হাতে টিফিন ক্যারিয়ার আর বাজাবেব ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়েছে। জোর করে সরু এক ফালি হাসি টেনে বেরিয়ে যায় তিলক। ভাবে,এক মাঘে শীত যায না। ও দুপুরে এর শোধ তুলবে। বউকে সে চেনে।

তাসের আড্ডায় ওরা তিনজন দারুণ জমাবে। তিলকের বউ তাস চেনে না। খেলতে জানে না। লাহিড়ীর বউ তাসে ওস্তাদ। তিলক তাস খেলতে খেলতে লাহিড়ীর বউয়ের চোখে চোখ ফেলতে ফেলতে মাংসের খরচের টাকাটা তুলে নেবে।

বাজার নামিয়ে তিলক বলে, কই গো শুনছ? নাও তুমি তোমার অতিথিদের ইলিশ মাছ ভাজা খাইয়ে শখ মেটাও। আমরা তাসে বসি।

তিলকের বউ বলে, ওমা সেকি! ওর সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব না? সেজন্যই তো আটকালুম। এসো, এসো, ভাই...। লাহিড়ীর বউয়ের হাত ধরে তিলকের বউ প্রায় টেনেই নিয়ে যায় রান্নাঘরে। মোড়ায় বসতে দেয়।

তিলক চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। তিলকের মনে হয়, সংসারের এই ম্যারাথন রেসে তিলক আর তার বউ যেন অনবরত ছুটছে। তিলক যতই আগে ছুটতে চাইছে, ততই সে পিছিয়ে পড়ছে। এভাবে তাকে হারিয়ে দিয়ে তিলকের বউ বিজয়িনীর হাসি নিয়ে যেন তিলককে বলছে, বোকা, বোকা, বোকা...।

তিলক ভাঙা মন নিয়ে তাসের আসরে বসে। কিন্তু এখানে সে হেরে যায়। বিবিহীন তাসের আসলে ওর যেন সব গোলমাল হতে থাকে। রান্নাঘর থেকে তখন ভেসে আসে, তিলকের বউয়ের অজস্র কথা আর হাসির টুকরো। লাহিড়ীর বউয়ের রিনবিনে গলা।...

সবুজ ব্যাঙ

সুব্রত সরকার

সন্দীপন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। সবুজ ব্যাঙটাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। যাবে
আমরা কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারছি না, এতদূর থেকে এই পাহাড়, জঙ্গল, নদ
সান্নিধ্য ছেড়ে ব্যাঙটা কলকাতার দূষণে বাঁচবে না। মরে যাবে। যাবেই। সন্দীপন
অবুঝ। অদ্ভুত অবুঝ। ওর সেই কথার ঝিলিমিলি, সবুজ ব্যাঙটা বাঁচবে। ওকে বাঁচাতে
হবে। লালদীঘির শান্ত জলে ওকে আমি ছেড়ে দেব। ও খেলবে, গাইবে, নাচবে, প্র
আনন্দে হাসবে। আমার প্রিয় শহর, প্রাণের শহর কলকাতা ওকে পেয়ে সবুজ,
সবুজ হয়ে যাবে। তারপর একদিন আমার শহরে ক্যারল আসবে। বৃষ্টি নামবে

ফালুট থেকে গোর্কে—ট্রেক করে আজ সকালেই আমরা এসে পৌঁছেছি
অসাধারণ যাত্রাপথ! ঘন নিবিড় ছায়াঘেরা সবুজ এক বনপথে আমরা চার বন্ধু হাঁটা
হাঁটতে হাঁটতে কখন যে পৌঁছে গেলাম ছবির চেয়েও সুন্দর এক পাহাড়-জঙ্গল
ছোট্ট উপত্যকায় বুঝতে পারিনি। উপত্যকার নাম গোর্কে। গোর্কের সবুজ বাগা
এঁকেবেঁকে চলে গেছে রম্মাম নদী। নদী নয়, যেন প্রেয়সী। প্রিয়তমা! সন্দীপন প্র
দেখেই রুকস্যাকটা ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মতো ছুটে গেল। সে দুর্দান্ত একটা চিত্রকল্প
গোর্কের সবুজ বাগানে সন্দীপন ছুটছে। দূরে রম্মাম। আরও দূরে শত শত শতাব্দী প্রাচীন
অরণ্য। পাহাড়। শিলাখণ্ড। কবেকার প্রাচীন একটা গ্রামীন সভ্যতা। ছড়ানো-ছিটানো কি
ভূমিপুত্র। তার মধ্যে দিয়ে একটা পাগল, আদ্যপান্ত নাগরিক, আমাদের প্রিয়তম সন্দীপন
ছুটছে। আমরা দু'চোখ-ভরা মুগ্ধতায় চেয়ে রইলাম ওর ছুটে-যাওয়া সেই বিশাল
ক্যানভাসটার দিকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, ঠিক ভাতঘুম নয়, পথশ্রমের ক্লান্তিতে শ্রান্ত শরীর একটু
এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছি তিন বন্ধু। সন্দীপন ঘরে নেই। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সন্দীপন
বলে, "রিমিঝিমি গিরে শাওন।" ও তাই ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ওর মতো বাউলকে
আটকায় কার সাধ্যি!

কাল রাতে ফালুটের ট্রেকার্স হাটে অনেক রাত আবধি আমরা হৈ চৈ করেছিলাম
সে একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা! আমাদের সঙ্গে নাচে, গানে, গল্পে মেতে উঠেছিল নেদারল্যাণ্ডস
থেকে আসা একজোড়া কপোত কপোতী। লন্ডন থেকে আসা মধ্যবয়স্ক রহস্যময় এক
সাহেব পিটার। ক্যারল নাম্নী এক সুইস কন্যা। আর এক গুচ্ছ নেপালি কিশোর-কিশোরী।
ওরা এসেছিল সিকিমের জোড়থাং থেকে। সন্দীপন কোনও দিন যা করে না, কাল রাতে
অদ্ভুত আবেগে ভেসে গিয়ে সুইস কন্যাকে দেখে গিয়ে উঠেছিল, 'আমি চিনি গো চিনি
তোমারে, ওগো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী ..' গান সম্পূর্ণ করতে
পারেনি সন্দীপন। হয়তো পুরো গানটা ঠিক জানেও না। কিন্তু ক্যারল হঠাৎই উচ্ছ্বসিত
হয়ে বলে উঠেছিল, 'ইয়েস, আই নো দা সঙ। ইট ইজ টেগোর্স সঙ।' সন্দীপন অদ্ভুত
খুশিতে সে মুহূর্তে ঝলসে উঠেছিল। দেখে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ প্রেমিককে
আমরা দেখছি। সন্দীপন হেসে বলেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর এক্সিলেন্স।'

ক্যারল প্রত্যুত্তরে কিছু বলেনি। হেসেছিল। শুধুই হেসেছিল। তারপর রাতে ডিনার

টেবিলে মোমের আলোয় আমরা সবাই একসাথে বসে যখন খিচুড়ি খাচ্ছি, ক্যারল হঠাৎই চামচ সরিয়ে রেখে আমাদের মতো হাত দিয়ে খিচুড়ি খাওয়া শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই ঠিক খেতে পারছে না। আমরা হাসছি। সন্দীপনও হাসছে। ক্যারলের হাত থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে খিচুড়ি। ক্যারল খিচুড়ি নিয়ে নাজেহাল। একসময় অসহায়ের মতো বলে উঠল, 'হেল্প মি, প্লিজ!' বুড়ো খোকা সন্দীপন হঠাৎই একটা কাণ্ড করে বসল সে সময়। ওর এঁটো হাত দিয়েই ক্যারলের মুখে খিচুড়ি তুলে দিল। ক্যারল নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে হাসতে হাসতে খিচুড়ি খাচ্ছে। সবাই হাসছে। উপভোগ করছে। পিটার সাহেবতো হেসে কুটি কুটি, 'হাউ নাইস! ফানি, ফানি।' নেপালি কিশোর-কিশোরীরাও খুব হাসছে। নেদারল্যান্ডের যুবক-যুবতী লাজুক লাজুক চোখে পরস্পরকে দেখছে। দিবাকর মল্লিকদাকে চোখ টিপল। মল্লিকদাও চোখের ইশারায় হাসল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, অপরূপ এক প্রেমের দৃশ্যের ~ এ হয়ে চলেছে। আর যেন শুনতে পাচ্ছি, ক্যারল ফিস্ ফিস্ করে সন্দীপনকে বলছে, 'ইউ হ্যাভ রিড মাই মাইণ্ড, 'ইউ হ্যাভ রিড মাই মাইন্ড।'

দুই

মল্লিকদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। দিবাকর ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করছে। আমি আধোঘুমের মধ্যে স্মৃতিকাতরতায় ডুবে গিয়েছিলাম। এমন সময় দরজার কাছ থেকে ভেসে এল সন্দীপনের চিৎকার, 'ওরে ঘুমকাতুরে খোকার দল, শালা বেড়াতে এসেছো, না ঘুমোতে?'

হকচকিয়ে উঠলাম সকলে। মল্লিকদার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। দিবাকর হাতে ক্যামেরা নিয়েই চেয়ে আছে। আমি আবেশ ভেঙে উঠে বসেছি। সন্দীপন সর্বাঙ্গ ভেজা শরীরে অদ্ভুত নাচের ছন্দে দুলে দুলে ঘরে ঢুকে এসে বলল, 'কী এনেছি দেখো। ওকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব।'—

আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সন্দীপনকে দেখছি। এই শীতের দেশে বৃষ্টিতে ভিজেও ও কেমন বিভোর হয়ে আছে। ওর বৃষ্টিভেজা হাতের তালুতে চুপটি করে বসে আছে একটা সবুজ শান্ত ছোট্ট ব্যাঙ। যেন ব্যাঙ নামক কোনও প্রাণী নয়, পারিজাত নামক কোনও পুষ্প। কোনও এক নন্দনকানন থেকে তুলে এনেছে সন্দীপন। কী গভীর মমতায়, ভালবাসায় সন্দীপন দু'হাতের মুঠোয় ধরে রয়েছে সবুজ ছোট্ট ব্যাঙটাকে।

দিবাকর ঘেন্নায় মুখ ভেংচে বলল, 'ছিঃ, ফেল, ফেলে দে বলছি। শালা ঘা হয়ে যাবে হাতে।'

মল্লিকদা হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি কি পাগল হলে? ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবে?'

আমি কী বলব ভেবেই পাচ্ছি না। অবাক হয়ে সন্দীপনকে দেখছি। সন্দীপন দুলে দুলে নাচছে। ওর হাতের তালুতে ধরা সুবজ ব্যাঙ, মুখে অনাবিল হাসি।

রম্মাম নদীর কবেকার কোন প্রাচীন এক পাথরের কোল থেকে সন্দীপন তুলে এনেছে সবুজ ব্যাঙটাকে। এমন সবুজ ব্যাঙ আমরা কেউ কোনও দিন দেখিনি। সন্দীপন বলছে, 'এটা সভ্যতার সেই উষালগ্নের ব্যাঙ। ওর চোখের নীচে একটা মণি আছে। অদ্ভুত একটা জ্যোতি আছে। ও এক জ্যোতির্ময় সবুজ পরমাত্মা। গৌতম বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, যীশু—সবাই সবাই ওকে দেখেছে। ওকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। যাবই।' বলে হাসতে লাগল সন্দীপন। আমরা ওকে বুঝে উঠতে পারছি না। অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলছে। 'আমার শহর কলকাতায়

এই গোর্কের মতো একটা গ্রাম হবে। সেখানে রম্মামের মতো একটা নদী থাকবে। সেই নদীতে এই সবুজ ব্যাঙটাকে আমি ছেড়ে দেব। তারপর একদিন আমার শহরে ক্যারল আসবে। বৃষ্টি নামবে।'

দিবাকর এবার আর ধৈর্য রাখতে পারল না। 'শালা ইনটেলেকচুয়াল, আঁতলামি হচ্ছে'—বলতে বলতে নেমে এল বিছানা থেকে, 'ফেল-ফেলে দে বলছি ব্যাঙটাকে।'

'না!' সন্দীপন রুখে দাঁড়িয়েছে। 'ফেলব না।' রাগী ক্রোধোন্মত্ত এক সন্দীপন।

দিবাকর এক পা, দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

সন্দীপন এক-পা, দু-পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

যেন এক যুদ্ধ-দৃশ্য। মল্লিকদাও নেমে এসেছে, 'কী হচ্ছেটা কী এসব!'

'ওকে ব্যাঙটা ফেলে দিতে বলুন।' দিবাকর চরম হুঁশিয়ারি দিল।

প্রত্যুত্তরে সন্দীপন চিৎকার করে উঠল, 'মল্লিকদা ওকে থামতে বলুন। আর একপা এগোলেই ও ধ্বংস হয়ে যাবে!'

আমার হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল। আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। বাক্‌যন্ত্র বিকল। কথা বলতে পারছি না। শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে। শুনছি। শুধুই শুনছি। সন্দীপন বলছে, ওকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। যাবই। ওকে পেয়ে কলকাতা সবুজ, আরও সবুজ হয়ে যাবে। তারপর একদিন আমার শহরে ক্যারল আসবে। বৃষ্টি নামবে!...